أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

তাদাব্বুরে কুরআন

প্রথম খণ্ড

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

www.pathagar.com

তাদাব্বুরে কুরআন

প্রথম খণ্ড

মূল
মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
অনুবাদ
হাফেয মাওলানা আবু আশরাফ
মাওলানা আবদুর রশীদ
মুফতী মাওলানা আবদুল মান্নান
মাওলানা সাঈদ আহমদ
মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব ঃ আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৩৬০

১ম প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৬
অগ্রহায়ণ	১৪১২
ডিসেম্বর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TADABBURE QURAN-1st Volume by Moulana Amen Ahsan Islahe. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! অবশেষে আধুনিক প্রকাশনী পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর 'তাদাব্বুরে কুরআনের' বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পারলো। তাফসীর অনুবাদ ও প্রকাশের খানিকটা প্রতিযোগিতার মহড়ায়ই আধুনিক প্রকাশনীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এ কাজটি করতে হয়েছে। এজন্য আবারও করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

আল্লাহর দীনকে বুঝার ও তাঁর দীনকে কায়েম করার জন্য গোটা বিশ্বে এক বিরাট আলোড়ন চলছে। এ আলোড়ন ও আন্দোলনকে সফল হবার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আল্লাহর বাণী কালামুল্লাহকে বুঝার। কুরআন বুঝা ও এর উপর বাস্তব আমল করা ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনকে সফলতার দুয়ারে পৌঁছাবার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুনিয়ার পরিসমাপ্তি আল্লাহর দীনের উপরই ঘটবে। আল্লাহর শোকর—এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গোটা দুনিয়ায়ই এখন কাজ চলছে। এরই ফলে যুগে যুগে কালে কালে কুরআনের বহু তাফসীর বিশ্বের সব জায়গায় অসংখ্য ভাষায় অনেক মনীষী ও মুজাদ্দিদগণ লিখেছেন। বাংলা ভাষায় তাফসীরের সংখ্যা আজ আর কম নয়।

এর সাথে নতুন করে সংযোজিত হলো আর একটি নতুন তাফসীর 'তাদাব্বুরে কুরআন'। মনীষীদের লিখা সব তাফসীরই এক একটা এক এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকটি তাফসীরই সে সময়ের প্রেক্ষাপটে ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে লিখা। সবগুলো তাফসীর খুবই মূল্যবান ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব প্রয়োজনীয় আল্লাহর এক নেয়ামত। বিশ শতকের মনীষী আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর সময়ের দুনিয়ার সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থাকে দৃষ্টিতে রেখে 'তাদাব্বুরে কুরআন' লিখেছেন।

এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. আয়াতের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস।

খ. আভিধানিক অর্থের সাথে সাথে শব্দের প্রয়োগ বিধি ও অর্থের প্রকাশ।

গ. অনুবাদের আগে ভূমিকাধর্মী আগাম নির্দেশ।

ঘ. কুরআনিক ভাষ্যের আলংকারিক বিশ্লেষণ।

ঙ. অধ্যয়নের পথনির্দেশনা।

চ. কুরআনের ভিতর থেকেই শানেনুযূলের প্রেক্ষাপট নির্ধারণ।

www.pathagar.com

ছ. সর্বোপরি সূরা ও আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র। যার তাফসীরী দৃষ্টান্ত এর গোটা অঙ্গন জুড়ে বিস্তৃত।

এ পর্যায়ে আমরা সফল কি বিফল সে বিবেচনা পাঠকবৃন্দের। তবে আমরা মনে করি নিবিষ্ট মনে অধ্যয়নকারী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক পাঠকবৃন্দের জ্ঞানপিপাসা এদ্বারা বহুলাংশে নিবারণ হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবের আবরণে আজ লাখোকোটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের খেদমতে এর প্রথম খণ্ড উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছে। তাই মহান আল্লাহর দরবারে আমরা আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

	আয়াত	পৃষ্ঠা
হাফেজ মাওলানা আবু আশরাফ	১-৪৬	১-২৫৬
মাওলানা আবদুর রশীদ	৪৭-১২১	২৫৭-৩৮৬
মুফতী মাওলানা আবদুল মান্নান	১২২-১৪৬	৩৮৭-৪৬২
মাওলানা সাঈদ আহমদ	১৪৭-২২৩	৪৬৩-৬৫০
মাওলানা আতিকুর রহমান	২২৪-২৮৬	৬৫১-৭৯২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

০ প্রসঙ্গ কথা ২৯
ভূমিকা ৩২

১. তাফসীর লিখার উদ্দেশ্য এবং কুরআন বুঝার মাধ্যম ৩২

২. কুরআন বুঝারভিতরগত মাধ্যম ৩২
আল কুরআনের ভাষা ৩৩
যোগসূত্র ৩৭
দুটি প্রশ্ন এবং তার জবাব ৪০
যোগসূত্রের মর্যাদা ও মূল্যমান ৪১
যোগসূত্র বিষয়ক প্রশ্ন ৪৩
আল কুরআনের সার্বিক যোগসূত্র ৪৬
সামগ্রিক যোগসূত্রের যাহেরী দিক ৪৬
সামগ্রিক যোগসূত্রের গোপন দিক ৪৭
কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর ৪৯

৩. কুরআন অধ্যয়নে বাহিরের মাধ্যম ৫১
মশহূর ও মুতাওয়াতির হাদীস ৫১
হাদীস এবং সাহাবীগণের উক্তি ৫৩
শানেনুযূল ৫৩
তাফসীর গ্রন্থ ৫৫
পূর্বতন আসমানী কিতাব ৫৬
ঐতিহ্যবাহী আরব ইতিহাস ৫৭

৪. কুরআন শিক্ষার্থীদের জন্য কতিপয় নির্দেশনা ৫৮
নিয়তের পবিত্রতা ৫৮
কুরআনকে উচ্চতর কালাম স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় ৫৯
কুরআনের দাবী অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তনের সংকল্প ৬২
তাদাব্বুর (নিবিড় চিন্তা করা) ৬৪
আল্লাহর নিকট হেদায়াতের প্রার্থনা ৬৫

৫. তাফসীর প্রসঙ্গে কতিপয় বিশেষ বক্তব্য ৬৬

বিসমিল্লাহ-এর তাফসীর ৬৯

১. আলোচ্য আয়াতের ঐতিহাসিক মর্যাদা ৬৯
২. এ আয়াত দোয়ার অর্থবোধক ৬৯
৩. আয়াতে বর্ণিত আসমাউল হুসনা ৭১
আল্লাহ ৭১
রহমান ও রহীম ৭২
৪. কুরআন কারীমে উক্ত আয়াতের মর্যাদা ৭৩

১. সূরা আল ফাতিহা-এর তাফসীর ৭৫

ক. সূরার আলোচ্য বিষয় ৭৭
খ. সূরার বর্ণনাভঙ্গি ৭৭
সূরা ও তরজমা ৭৮

১. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা ৭৮
'হামদ' শব্দের বিশ্লেষণ ৭৮
'রব' শব্দের বিশ্লেষণ ৭৯
'দীন' শব্দের বিশ্লেষণ ৮০
ইবাদাত শব্দের বিশ্লেষণ ৮১
অনুগ্রহপ্রাপ্ত কারা ? ৮৪
গযবে পতিত কারা ? ৮৪
পথভ্রষ্ট কারা ? ৮৫

২. সূরার যৌক্তিক দিক ৮৬
তাওহীদ ও আখেরাতের দলিল ৮৬
কৃতজ্ঞতার প্রেরণা দীনের ভিত্তিস্বরূপ ৯০
ভয়ের অনুভূতিকে দীনের বুনিয়াদ সাব্যস্ত করা চলে না ৯১

৩. রেসালাতের প্রয়োজনীয়তার দলিল ৯২

৪. দোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ৯৩
সূরার প্রতিক্রিয়া ৯৩
দোয়ার মাহাত্ম্য ৯৪

www.pathagar.com

৫. এক নযরে কুরআনের ভূমিকার মর্যাদা লাভের কারণসমূহ	৯৬
তিনটি মৌলিক শিরোনাম	৯৬
৬. পরবর্তী সূরার সাথে এর যোগসূত্র	৯৮
২. সূরা আল বাকারা-এর তাফসীর	**১০১**
ক. সূরার বিষয়বস্তু	১০৩
ঈমানের দাওয়াত ও এ সূরার মুখ্য বিষয়	১০৩
ঈমান বির্‌ রেসালাতের গুরুত্ব	১০৩
খ. সূরায় সম্বোধিত সম্প্রদায়	১০৪
এ সূরার মূল সম্বোধন ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি	১০৪
গ. সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা	১০৫
ভূমিকা	১০৫
ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান	১০৬
ইহুদীদের প্রতি সতর্কবাণী	১০৭
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা	১০৭
হুকুম আহকাম	১০৮
আল্লাহর পথে জিহাদ	১০৯
পরিশিষ্ট	১০৯
আয়াত ঃ ১-৫ ও তরজমা	১১০
১. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা	১১০
'হুরূফে মুকাত্তাআত' সংশ্লিষ্ট সূরার নাম	১১০
'মুকাত্তাআত'-এর অর্থ	১১১
'হুরূফে মুকাত্তাআত' সম্পর্কে মাওলানা ফরাহীর দৃষ্টিভঙ্গি	১১২
'যালিকা' ও 'হাযা' শব্দের তাৎপর্য	১১৪
কিতাবের অর্থ	১১৫
لَارَيْبَ فِيْهِ বাক্যের সঠিক মর্ম	১১৬
هُدًى-এর অর্থ	১১৭
মুত্তাকীর অর্থ	১১৮
ঈমানের অর্থ	১১৯
গায়েব শব্দের বিশ্লেষণ	১২০
بِالْغَيْبِ-এর (ب) 'বা' স্থানবাচক বর্ণ	১২০
ইকামাতে সালাতের অর্থ	১২২
সালাত শব্দের অর্থ	১২৪
ঈমান ও ঈকানের পার্থক্য	১২৪
হুদা শব্দের অর্থ	১২৫
২. এক নযরে ১-৫ আয়াতের সমষ্টিগত আলোচনা	১২৫
৩. কতিপয় ইশারা-ইঙ্গিত	১২৭
ইহুদী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধি	১২৮
কুরআনের প্রতি ঈমান না আনার কারণ	১২৮
৪. কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর	১৩২
তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর	১৩৫
ইসলামসম্মত মৌলিক সৎকর্ম	১৩৮
৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬-৭ আয়াত	১৩৯
আয়াত ঃ ৬-৭ ও তরজমা	১৩৯
৬. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা	১৪০
কুফরীর হাকীকত	১৪০
اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে ?	১৪০
ভীতি প্রদর্শনের হাকীকত	১৪৪
খাতামার অর্থ	১৪৫
সামউন (سَمْع) একবচনে উল্লেখের কারণ	১৪৫
৭. অন্তরে মোহর মারার তত্ত্বকথা এবং এ সম্পর্কিত ইলাহী বিধান	১৪৬
জবর ও এখতিয়ারের ব্যাখ্যা	১৪৯
৮. ৬-৭ আয়াত দুটির মূল বক্তব্য	১৫১
৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৮-১৬ আয়াত	১৫৩
আয়াত ঃ ৮-৯ ও তরজমা	১৫৩
১০. শব্দ বিশ্লেষণ	১৫৪
اَلنَّاسُ-এর অর্থ	১৫৪
خدع ও مخادعة-এর অর্থ	১৫৪
মারাদুন (مَرَضٌ) শব্দের অর্থ	১৫৫
مَرَضٌ তথা রোগ বৃদ্ধির আলোচনা	১৫৫

www.pathagar.com

فَسَادَ فِى الْاَرْضِ-এর হাকীকত ১৫৬
শয়তান শব্দের বিশ্লেষণ ১৫৭
আল্লাহর বিদ্রূপ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ১৫৭
ইশতিরাউন (اشتراء) শব্দের অর্থ ১৫৮
১১. এ ইঙ্গিত কাদের প্রতি ? ১৫৮
ইহুদীদের একটি বিশেষ দল ১৫৮
১২. ৮-১৬ আয়াতের সামষ্টিক পর্যালোচনা ১৬০
১৩. একটি সন্দেহের নিরসন ১৬৫
১৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭-২০ আয়াত ১৬৬
আয়াত ঃ ১৭-২০ ও তরজমা ১৬৭
১৫. শব্দ বিশ্লেষণ ১৬৭
صَيِّبٌ শব্দের অর্থ ১৬৭
سَمَاءٌ শব্দের অর্থ ১৬৮
صَوَاعِقَ শব্দের অর্থ ১৬৮
১৬. উপমাদ্বয়ের ব্যাখ্যা ১৬৮
উপমা সম্পর্কে নীতিগত আলোচনা ১৬৮
প্রথম দৃষ্টান্তে উল্লেখিত পাত্র কে ? ১৬৯
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ১৭০
১৭. দুই দলের তুলনামূলক পার্থক্য ১৭১
১৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২১-২৯ আয়াত ১৭৩
আয়াত ঃ ২১-২৯ ও তরজমা ১৭৪
১৯. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ক আলোচনা ১৭৬
শহীদের অর্থ ১৭৮
মূর্তি প্রতিমার শাস্তি হওয়ার কারণ ১৭৯
জান্নাত প্রসঙ্গে আলোচনা ১৮০
قَوْلٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ ১৮১
রিযিক দুই প্রকার ১৮২
اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ শব্দের অর্থ ১৮২
তামছীল (تَمْثِيْل)-এর মূল্যায়ন ১৮৩
ফিসকের অর্থ ১৮৪
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার গুরুত্ব ১৮৫
বিশেষ দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় কুফরীর মর্মকথা ১৮৬
سَمَاءٌ - تَسْوِيَهْ - اِسْتَوٰى-এর অর্থ ১৮৭
২০. ২১-২৯ আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ ১৮৮
২১. কতক দলিলের ব্যাখ্যা ১৯০
তাওহীদের প্রমাণ ১৯০
রেসালাতের প্রমাণ ১৯২
কিয়ামত সম্পর্কে প্রমাণ ১৯৪
২২. কুরআন শরীফের মাহাত্ম্যের দুটি দিক ১৯৫
সমগ্র জিন ও ইনসান কুরআনের নমুনা পেশ করতে অপারগ ১৯৫
কুরআনের মাহাত্ম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ১৯৫
২৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩০-৩৯ আয়াত ১৯৭
আয়াত ঃ ৩০-৩৯ ও তরজমা ১৯৮
২৪. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা ২০০
اِذْ শব্দের বিশ্লেষণ ২০১
مَلٰئِكَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ ২০১
خَلِيْفَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ ২০২
فَسَادَ فِى الْاَرْضِ (বিশৃংখলা সৃষ্টি) -এর অর্থ ২০৩
تَسْبِيْحٌ শব্দের অর্থ ২০৪
نُقَدِّسُ لَكَ -এর বিশ্লেষণ ২০৪
আদম (আ)-কে কিসের নাম শেখানো হয়েছে ২০৫
سُبْحَانَكَ শব্দের বিবিধ ব্যবহার ২০৭
আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট অদৃশ্যের পূর্ণ জ্ঞান নেই ২০৭
سَجْدَهْ শব্দের অর্থ ২০৯
সম্মান প্রকাশক সাজদা প্রদানের বিধান ২০৯
ফেরেশতাদের আদমকে সাজদা করা ঃ বাস্তবতা ও কার্যকারণ ২০৯

www.pathagar.com

বনী ইসরাঈলের জন্য এক অমোঘ শিক্ষা ২১০
আদমকে সাজদা করার নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ২১০
اِبْلِيْس। শব্দের বিশ্লেষণ ২১১
এক আপত্তির জবাব ২১২
الشَّجَرَة। বলে কি বুঝানো হয়েছে ২১৩
اِهْبِطُوْا। সম্বোধনটি কাদের প্রতি ? ২১৪
মানবজাতি ও শয়তানের মাঝে স্বাভাবিক সম্পর্ক ২১৫
تَوْبَة শব্দের অর্থ ২১৬
তাওবা সম্পর্কে আল্লাহর রীতি ২১৭
নবুওয়াতের ধারা প্রবর্তনের প্রথম অঙ্গীকার ২১৭
ايت শব্দের বিশ্লেষণ ২১৮

২৫. **শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা (৩০-৩৯)** ২১৮
খেলাফত ও তার দায়-দায়িত্ব ২১৯
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ২২০
গোনাহ ও অন্যায়ের উৎস ২২০
আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি কাজে নিগূঢ় রহস্য নিহিত ২২১
আদম ও ইবলিসের গোনাহে পার্থক্য ২২২
নবুওয়াত ও রেসালাতের প্রয়োজনীয়তা ২২২

২৬. **পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪০-৪৬ আয়াত** ২২২
আয়াত ঃ ৪০-৪৬ ও তরজমা ২২৩

২৭. **শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা** ২২৪
'ইসরাঈল' শব্দের ব্যাখ্যা ২২৪
'নেয়ামত' শব্দের ব্যাখ্যা ২২৫
عَهْد-এর অর্থ—নবী করীম (স) সম্পর্কে عَهْد (অঙ্গীকার) ২২৬
رَهْبَت-এর অর্থ ২২৮
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ-এর প্রকৃত অর্থ ২২৮
اَوَّلَ كَافِرٍ-একটি কথার কথা ২২৯
كفر শব্দের অর্থ ২২৯
نَهِى (নিষেধ)-এর সাথে قَيْدٌ (শর্ত) যুক্ত করার মর্ম ২৩০
একটি সন্দেহের অপনোদন ২৩১
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মর্ম প্রকাশের একক পদ্ধতি ২৩১
خشوع এবং تقوى، رهبت একই মর্মে বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি ২৩২
لبس حق بالباطل-এর অর্থ ২৩৩
وَتَكْتُمُوْا এর اعراب। বাক্য বিশ্লেষণ ২৩৪
زَكٰوة -শব্দের তাৎপর্য ২৩৬
رُكُوْع শব্দের বিশ্লেষণ ২৩৬
নামায ও যাকাতের ব্যাপারে ইহুদীদের বিরোধিতা ২৩৭
بِرّ-এর বিশ্লেষণ ২৩৮
صَبْر শব্দের তাৎপর্য ২৪০
وَاِنَّهَا শব্দের هَا-এর ইঙ্গিত কোন দিকে ২৪২
خُشُوْع-এর বিশ্লেষণ ২৪৪
'যুন্ন' (ظَنّ) শব্দের তাৎপর্য ২৪৫

২৮. **৪০-৪৬ আয়াত সমষ্টির মর্ম বিন্যাস** ২৪৭
কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াতের তিনটি দিক ২৪৭

২৯. **ইসলামে নামাযের গুরুত্ব** ২৫১
দুই দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযের আলোচনা ২৫১
নামায ও যাকাত শরীআতী বিধি-বিধানের ভিত্তিমূল ২৫১

৩০. **ধৈর্য ও নামায দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্যের চাবিকাঠি** ২৫৩

৩১. **জাতীয় সংশোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে ৪০-৪৬ আয়াত সমষ্টির বিশেষ শিক্ষা** ২৫৬

৩২. **পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪৭-৬২ আয়াত** ২৫৭
ইহুদীদের সামনে তিনটি নিগূঢ় বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা ২৫৮

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৪৭-৬২ ও তরজমা ২৫৯

৩৩. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ এবং আয়াত সমূহের বিষদ ব্যাখ্যা ২৬৩

বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বের ধরন ২৬৩

শাফায়াতের অর্থ ২৬৪

আরবীর একটি পদ্ধতি ২৬৪

ال-এর ধারণা ২৬৫

سوم-এর অর্থ ২৬৬

بلاغت অর্থাৎ ভাষার লালিত্যের একটি দিক ২৬৬

ঘটনাসমূহকে উপস্থাপন করার একটি বিশেষ ধরন ২৬৭

বাছুর পূজার ঘটনা ২৬৮

ফুরকান বলতে কি বুঝায় ২৬৯

بَرِء শব্দ দ্বারা কি বুঝায় ২৭০

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর উদ্দেশ্য ২৭০

বনী ইসরাঈলের সন্দেহ প্রবণ মানসিকতা ২৭২

একটি সংশয়ের অবসান ২৭৩

'মৃত্যু' শব্দ দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে ২৭৩

مَنّ-এর বিশ্লেষণ ২৭৪

سَلْوٰى-এর বিশ্লেষণ ২৭৬

قريه (জনপদ)-এর তাৎপর্য ২৭৭

سجده-এর অর্থ ২৭৭

الباب শব্দের ব্যাখ্যা ২৭৮

حطة-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ২৭৮

احسان-এর ভাবার্থ ২৭৯

দোয়া পরিবর্তনের ধরন ২৭৯

رِجْس এবং رِجْز-এর অর্থ ২৮০

পানির জন্য মূসা (আ)-এর দোয়া ২৮১

প্রত্যেক গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘাট ২৮২

নেয়ামতের হক বা দায়িত্ব ২৮২

ثوم, فوم, قثاء, بقل-এর ভাবার্থ ২৮৩

বনী ইসরাঈলের হীন চরিত্রের একটি উদাহরণ ২৮৪

مصر বলতে কি বুঝায় ২৮৪

مَسْكَنَتْ-এর ভাবার্থ ২৮৫

ইহুদীদের লাঞ্ছনার কারণ ২৮৫

يَهُوْد শব্দের বিশ্লেষণ ২৮৬

نَصَارٰى শব্দের বিশ্লেষণ ২৮৯

صَابِئِيْن শব্দের বিশ্লেষণ ২৯১

৩৪. আহলে কিতাবের জন্য কি রাসূল (স)-এর ওপর ঈমান আনয়ন করা অত্যাবশ্যক নয় ? ২৯২

৩৫. মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ হুশিয়ারী ২৯৮

৩৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬৩-৮২ আয়াত ২৯৯

আয়াত ঃ ৬৩-৮২ ও তরজমা ৩০০

৩৭. শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা ৩০৪

মীছাক (অঙ্গীকার) দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ৩০৪

মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরার ভাবার্থ ৩০৫

আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্বের প্রদর্শনী ৩০৫

আসল অঙ্গীকার (ميثاق) ৩০৫

পরবর্তীদেরকে পূর্ববর্তীদের কার্যকলাপের জন্য দায়ীকরণ ৩০৬

ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি উদাহরণ ৩০৭

ইহুদীদের চেহারা পরিবর্তনের ধরন ৩০৭

نَكَالًا-এর ভাবার্থ ৩০৮

ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দ্বিতীয় উদাহরণ ৩০৯

ইহুদীদের বিকৃত স্বভাব ৩১০

حق-শব্দের ব্যাখ্যা ৩১২

একটি অতিরিক্ত বাক্য ৩১২

কেসাসের মধ্যে সকলের জীবন নিহিত আছে ৩১৪

অন্তর কখন কঠিন হয় ৩১৫

নষ্ট অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে থাকে ৩১৫

একটি বিষয়ের প্রতি আনুসংগিক দৃষ্টি আকর্ষণ ৩১৬

www.pathagar.com

تحريف-এর অর্থ এবং এর ধরন ৩১৭
ইহুদীদের ঈমানের দাবীর প্রকৃত স্বরূপ ৩১৮
أُمِّىٌّ বা নিরক্ষর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ৩১৯
সাধারণ ইহুদীদের ব্যাধী ৩২০
মনগড়া ফতোয়া ৩২১
মিথ্যা ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার একটি উদাহরণ ৩২২
ইহুদীদের ধারণার অপনোদন ৩২৩

৩৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ
৮৩-৯৬ আয়াত ৩২৩
ইহুদীদের অহংকার ও দর্পের ওপর আঘাত ৩২৩
ইহুদীদের হঠকারিতা ৩২৪
ইহুদীদের ঈমানের দাবীর স্বরূপ ৩২৪
ইহুদীদের বিরুদ্ধে খোদ ইহুদীদের বিবেকের সাক্ষ্য ৩২৪
আয়াত ঃ ৮৩-৯৬ ও তরজমা ৩২৫

৩৯. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ
এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৩২৮
বনী ইসরাঈল থেকে গৃহীত প্রাথমিক অঙ্গীকার ৩২৯
আল্লাহর হকের পর সবচেয়ে বড় হক ৩২৯
সদ্ব্যবহার এবং অধিকার আদায় ৩৩০
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا-এর মর্মার্থ ৩৩০
নামায এবং যাকাত দ্বারা সমস্ত নেকীকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয় ৩৩৩
ইহুদীদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত ৩৩৩
আরো একটি প্রতিজ্ঞার কথা ৩৩৪
পূর্ববর্তী লোকদের প্রতিজ্ঞার দায়িত্ব বর্তায় পরবর্তী লোকদের ওপর ৩৩৪
একদিকে দীনের বিরোধিতা, অপরদিকে দীনদারীর প্রদর্শনী ৩৩৫
اشتراء শব্দের অর্থ ৩৩৬
প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা ৩৩৭
أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ বা রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করার অর্থ ৩৩৭
قُلُوبُنَا غُلْفٌ-এর মর্মার্থ ৩৩৮
ইহুদীদের প্রতি আল কুরআনের অনুগ্রহ ৩৩৯
اشتراء-এর মর্মার্থ ৩৪০
ইহুদীদের ঈমান কুরআনের ওপরও নেই তাওরাতের ওপরও নেই ৩৪২
ইহুদীদের ঈমানের দাবীর অপনোদন ৩৪২
কথার মাধ্যমে অবস্থার বর্ণনা ৩৪৩
ইহুদীরা মুশরিকদেরকেও অতিক্রম করে ফেলেছে ৩৪৫

৪০. এ আয়াতগুলোর কতিপয় শিক্ষা ৩৪৬
আল্লাহ তাআলার শরীআতের হক এর সমস্ত বিধি-বিধানের ওপর আমলের মাধ্যমে আদায় হয় ৩৪৬
হক গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ৩৪৬
জীবনের প্রতি লোভ আল্লাহর ভালবাসার পরিপন্থী ৩৪৭

৪১. পরবর্তী আলোচনা ঃ
৯৭-১০৩ আয়াত ৩৪৭
কুরআনের সাথে ইহুদীদের শত্রুতার বিস্তারিত বর্ণনা ৩৪৭
আয়াত ঃ ৯৭-১০৩ ও তরজমা ৩৪৮

৪২. শব্দের বিশ্লেষণ এবং
আয়াতের ব্যাখ্যা ৩৪৯
কুরআনের বিরোধিতায় জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা ৩৫০
কথা কোথা থেকে কোথায় পৌছেছে ৩৫১
بينات-এর মর্ম ৩৫২
فسق-এর অর্থ ৩৫৩
رسول দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে ? ৩৫৪
আল্লাহর কিতাবের স্থলে যাদু ও যাদু বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ৩৫৫
হারুত ও মারুতের প্রতি কি জিনিস অবতীর্ণ হয়েছিল ? ৩৫৬

www.pathagar.com

বস্তু ও কথার আধ্যাত্মিক
গুণাগুণ সংক্রান্ত বিদ্যা ৩৫৮
ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে
শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম সতর্কতা ৩৫৯
ফেতনা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে ৩৬০
ইহুদীদের কাপুরুষচিত তামাশা ৩৬০
উপকারিতা এবং অপকারিতা
আল্লাহর ইচ্ছাধীন ৩৬১
তাওরাতে যাদু বিদ্যার
ওপর নিষেধাজ্ঞা ৩৬১

৪৩. আয়াত ৯৭-১০৩ সম্পর্কিত
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কথা ৩৬২
ছোট গোমরাহী বড় গোমরাহীর
দ্বার উন্মোচন করে দেয় ৩৬২
আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের
মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ৩৬৩
আল্লাহর কিতাবের সাথে
নির্ভেজাল সম্পর্কের জন্য শর্ত ৩৬৩

৪৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১০৪-১২১ আয়াত ৩৬৪
আরবদেরকে পথভ্রষ্ট করার
জন্য ইহুদীদের অপতৎপরতা ৩৬৪
আয়াত ঃ ১০৪-১২১ ও তরজমা ৩৬৪

৪৫. শব্দের বিশ্লেষণ এবং
আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা ৩৬৮
رَاعِنَا-এর ভাবার্থ ৩৬৮
রাসূল (স)-এর মজলিসে
ইহুদীদের দুর্বৃত্তপনা ৩৬৮
শব্দাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট
এক মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের তাৎপর্য ৩৬৯
বিরোধীদের গোপন
মানসিকতার ওপর আলোকপাত ৩৭০
نَنْسَخْ-এর তাৎপর্য ৩৭১
ইহুদীদের কুমন্ত্রণা খণ্ডন ৩৭১
জবাবের একটি বিশেষ দিক ৩৭২
سوال শব্দের ভাবার্থ ৩৭২
মুসলমানদের প্রতি একটি সতর্কবাণী ৩৭৩
ইহুদীদের প্রতি হুশিয়ারী ৩৭৪
বিরোধীদের বিরোধিতার দাওয়াই ৩৭৫
মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার
জন্য ইহুদী-নাসারাদের যৌথ প্রচারণা ৩৭৬
নাজাতের আসল পথ ৩৭৭
ইহুদী এবং নাসারাদের
পারস্পরিক তর্কযুদ্ধ ৩৭৭
একের উপাসনালয় অপর
কর্তৃক ধ্বংস সাধন ৩৭৮
ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ ৩৮০
وَلَدٌ-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ৩৮১
আকীদা বা ধ্যান-ধারণার বিভ্রান্তি ৩৮১
بديع-এর বিশ্লেষণ ৩৮১
আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার
বিস্তারিত বর্ণনা ৩৮১
মুশরিকদের কতিপয় দাবীর জবাব ৩৮২
নাসারা ও ইহুদীদের আসল রোগ ৩৮৪
সৎকর্মশীল আহলে কিতাবের উল্লেখ ৩৮৫

৪৬. নসখ বা রহিত করণের
তাৎপর্য ও তার প্রয়োজনীয়তা ৩৮৭
নসখের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো থেকে
অধিক ভালোর দিকে ৩৮৭
দীনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে
রহিতকরণ ৩৯১
আল্লাহ প্রদত্ত জীবন
বিধানের পবিত্রকরণ ৩৯১
ইসলামী শরীআতে
নসখের (রহিতকরণের) ধরন ৩৯৩

৪৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১২২-১৪১ আয়াত ৩৯৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা ৩৯৮
আয়াত ঃ ১২২-১৪১ ও তরজমা ৪০০

৪৮. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ৪০৪
ইবতিলা বা পরীক্ষার উদ্দেশ্য ৪০৪
كَلِمَاتٌ-এর তাৎপর্য ৪০৫
হযরত ইবরাহীম (আ)-কে
পুত্র কুরবানী করার পরীক্ষা ৪০৬

www.pathagar.com

মুশরিকরা আল্লাহর এ
প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম ৪০৭
بَيْتَ-এর উদ্দেশ্য বায়তুল্লাহ ৪০৮
مَثَابَةً-এর অর্থ ৪০৮
لِلنَّاس (মানুষের জন্য)-এর অর্থ ৪০৮
তাওরাতে কা'বাঘরের বর্ণনা ৪০৯
"মাকামে ইবরাহীম"-এর ব্যাখ্যা ৪১১
আমাদের ও ইহুদীদের মাঝে
বিতর্কিত বিষয় ৪১১
مُصَلّٰى (মুসাল্লা) দ্বারা
বায়তুল্লাহর ব্যাখ্যা ৪১৩
কা'বাঘর পবিত্রকরণের উদ্দেশ্য ৪১৩
তাওয়াফের অর্থ ও তাৎপর্য ৪১৪
এতেকাফ-এর তাৎপর্য ৪১৫
রুকূ' ও সাজদার তাৎপর্য ৪১৫
হারেম এলাকার দুটি বিশেষ সমস্যা ৪১৫
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর
মাকবুল দোয়া ৪১৬
কি কি ভাবে হযরত ইবরাহীম
(আ)-এর দোয়া কবুল হয়েছে ৪১৬
হারাম মাসসমূহ ৪১৬
বহিরাগত ভয় থেকে নিরাপত্তা ৪১৭
আর্থিক সচ্ছলতার বিভিন্ন দিক ৪১৭
এক প্রশ্নের জবাব ৪১৮
ثمرات-এর অর্থ ৪১৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শর্ত ৪২০
কা'বাঘর নির্মাণ করার সময় হযরত
ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া ৪২১
দোয়ার বিবরণ ৪২১
ارءت (ইরায়াত) শব্দের মর্ম ৪২২
مَنَاسِكَ-এর ব্যাখ্যা ৪২৩
তাওবার মর্ম ৪২৩
দোয়ার সম্পর্ক হযরত
ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের সাথে ৪২৩
তেলাওয়াতে আয়াত-এর তাৎপর্য ৪২৪
কিতাব ও হিকমাতে তা'লীম
-এর তাৎপর্য ৪২৫
হেকমত-এর বিশ্লেষণ ৪২৫
تزكيه-এর অর্থ ৪২৬
عزيز ও حكيم-এর তাৎপর্য ৪২৬
سَفِهَ শব্দের বিশ্লেষণ ৪২৭
ইসলামের অর্থ ৪২৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অসিয়ত ৪২৯
দীন-এর ব্যাখ্যা ৪৩০
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসিয়ত ৪৩১
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর
অসিয়তের উদ্ধৃতি দেয়ার নিগূঢ় রহস্য ৪৩১
অসিয়ত ও অসিয়তের
জবাবের কতিপয় সূক্ষ্ম দিক ৪৩২
আলোচনার সারকথা ৪৩৩
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মূল
দীন হলো ইসলাম ৪৩৩
حنيف-এর অর্থ ৪৩৪
মুসলিম উম্মার নীতি ও অবস্থান ৪৩৫
আসবাত-এর অর্থ ৪৩৫
রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করা ৪৩৫
ইহুদী ও খৃস্টানদের জন্য
মুক্তির পয়গাম ৪৩৬
ইহুদী ও খৃস্টানদের
দাওয়াত প্রদান ৪৩৭
ইহুদী ও খৃস্টানদের থেকে
সম্পর্কচ্ছেদের চূড়ান্ত ঘোষণা ৪৩৭

৪৯. নবী (স)-এর পদমর্যাদাগত
অপরিহার্য কর্তব্যসমূহ ৪৩৮
নবী (স)-এর কর্তব্যসমূহ ৪৪০
আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ৪৪০
তা'লীমে কিতাব ও হেকমত ৪৪১
তাযকিয়া ৪৪২

৫০. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১৪২-১৬২ আয়াত ৪৪৪
আয়াত ঃ ১৪২-১৬২ ও তরজমা ৪৪৫

৫১. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াত
সমূহের ব্যাখ্যা ৪৪৯
ইহুদীদেরকে নির্বোধ বলার কারণ ৪৫০

পূর্ব থেকেই কিবলা পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত	৪৫০
কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে ইহুদীদের আপত্তি	৪৫১
ইহুদীদের আপত্তির জবাব	৪৫১
মধ্যপন্থী জাতি	৪৫২
মধ্যপন্থী জাতির পদমর্যাদাগত দায়িত্ব	৪৫৪
جَعَلَ-এর মর্ম	৪৫৫
عَلِمَ يَعْلَمُ-এর ব্যাখ্যা	৪৫৫
বায়তুল মাকদিসকে অস্থায়ী কিবলা নির্ধারণ করার যৌক্তিকতা	৪৫৫
দীনের মধ্যে পরীক্ষা করার হেকমত	৪৫৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব	৪৫৭
আরবী ভাষার এক বিশেষ পদ্ধতি	৪৫৮
কিবলা পরিবর্তনের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপেক্ষা করার কারণ	৪৫৯
কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত মৌলিক বিধান	৪৬০
বাক্যের বাচনভঙ্গি পরিবর্তনের তাৎপর্য ও ভাষাগত অলংকার	৪৬০
এ কিবলা সঠিক হওয়ার বিষয়টি আহলে কিতাবের নিকট স্পষ্ট ছিল	৪৬১
মনোযোগ আকর্ষণ	৪৬১
উপমায় নিহিত অলংকারিত্ব	৪৬৩
বাক্যের উদ্দেশ্যকে উহ্য রাখার অলংকার	৪৬৩
كُلّ শব্দের অর্থ	৪৬৪
কিবলা পরিবর্তন জনিত বিষয়ে আহলে কিতাবদের কর্মনীতির প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ	৪৬৪
দাসত্ব কবুলের পথ-পরিক্রমায় কিবলা একটি মাইলফলক	৪৬৫
সফররত অবস্থায় কিবলা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ	৪৬৭
পুনর্বার নির্দেশ দানের গূঢ় রহস্য	৪৬৮
মহান আল্লাহ ও মুসলিম জাতির মধ্যে এক মহান চুক্তি	৪৭১
নেতৃত্ব পদের জটিলতাসমূহ ও তার সমাধান	৪৭২
জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক ধারণা	৪৭৪
ভবিষ্যতের বিপদাপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৪৭৫
ভয়	৪৭৫
অর্থনৈতিক সমস্যাদি	৪৭৫
সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি	৪৭৬
ফল-ফসল	৪৭৬
ধৈর্যশীলদের ঢাল	৪৭৭
صلوت শব্দের তাৎপর্য	৪৭৮
মূল আলোচনার ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন	৪৭৮
মূল কুরবানীস্থল মারওয়া	৪৭৯
شَعَائِر-এর মর্মার্থ	৪৭৯
নিদর্শনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মৌলিক কথা	৪৮০
সাঈ'র নির্দেশের ধরন	৪৮২
ইহুদীদের সত্য গোপন	৪৮৪
তাওবার জন্য শর্ত	৪৮৫
৫২. পরবর্তী আলোচনা ঃ	
১৬৩-১৭৬ আয়াত	৪৮৬
সূরার দ্বিতীয় অধ্যায়	৪৮৬
আয়াত ঃ ১৬৩-১৭৬ ও তরজমা	৪৮৭
৫৩. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা	৪৯০
رَحْمٰنُ ও رَحِيْمٌ-এর উল্লেখের দুটি দিক	৪৯০
আসমান ও যমীনের নিশানীসমূহের প্রতি একটি সার্বিক ও সর্বাত্মক ইঙ্গিত	৪৯৩
دَابَّة শব্দের ব্যবহার	৪৯৪
تَصْرِيْفِ رِيَاحٍ-এর তাৎপর্য	৪৯৪
تَسْخِير বলতে কি বুঝায়	৪৯৫

বুদ্ধিবৃত্তির প্রশিক্ষণ ৪৯৬
কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতসমূহের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ৪৯৬
১৬৪ আয়াতের ওপর একটি, বিশেষ পর্যালোচনা ৪৯৮
ভালবাসা পাওয়ার প্রকৃত হকদার আল্লাহ ৫০০
اسباب শব্দের অর্থ ৫০২
অনুসৃতগণ ও অনুসারীগণ ৫০৩
আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছু হালাল ও হারাম করা শিরক ৫০৪
শয়তানের জন্য প্রকাশ্য দুশমনের ব্যবহার ৫০৮
امر শব্দের অর্থ ৫০৯
سوء শব্দের ব্যবহার ব্যাপক অর্থে ৫১০
فحشاء শব্দের অর্থ ৫১০
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৫১১
যাচাই-বাছাই করে পূর্ববর্তীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ৫১১
نَعَقَ يَنْعِقُ-এর অর্থ ৫১২
উপমার উপমা ৫১২
মুসলমানদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীকরণ ৫১৩
ইবরাহিমী শরীআতে হালাল ও হারাম ৫১৪
প্রকাশ্য অপবিত্রতা ও প্রচ্ছন্ন অপবিত্রতা ৫১৫
اضطرار-এর তাৎপর্য ৫১৬
অনুমতি বাধ্যবাধকতা ৫১৬
কিতাবধারীদের কতক হারামকৃত বস্তু ৫১৭
কিতাবধারীদের প্রতি ধিক্কার ৫১৮
অসন্তোষের কারণ ৫১৯

৫৪. অনুমতি ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিকোণ ৫২০

৫৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭৭ আয়াত ৫২২
দীন নিছক কতিপয় প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতার নাম নয় ৫২২
আয়াত ঃ ১৭৭ ও তরজমা ৫২২

৫৬. শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ ৫২৩
بر-এর অর্থ ৫২৩
এ উম্মতের জন্য একটি সতর্কবাণী ৫২৪
ঈমান ও তার অংশসমূহ ৫২৫
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ৫২৫
عَلٰى حُبِّهٖ-এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল ৫২৭
দানের খাতসমূহ ৫২৮
নামায ও যাকাত ৫২৯
বাক পদ্ধতির পরিবর্তন ৫৩০
দীনের ব্যাপারে চরিত্র ও কর্মের গুরুত্ব ৫৩১
ধৈর্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণ ৫৩১

৫৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭৮-১৭৯ আয়াত ৫৩৩
শাস্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার দুটি ভিত্তি ৫৩৩
আয়াত ঃ ১৭৮-১৭৯ ও তরজমা ৫৩৩

৫৮. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের বিশ্লেষণ ৫৩৪
'কিসাস'-এর অর্থ ৫৩৪
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৫৩৫
কিসাসের দায়িত্ব সরকারের ৫৩৫
কিসাসে নিহতের অভিভাবকদের ইচ্ছাকে মূল্য দেয়ার যুক্তি ৫৩৬
কিসাসে সাম্যের ব্যবস্থা ৫৩৬
রক্তমূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতা ৫৩৭
আইন আবেগ অপেক্ষা উচ্চতর ৫৩৮
শাস্তি-বিধান কি অযৌক্তিক ? ৫৩৯

৫৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮০-১৮২ আয়াত ৫৪১
আয়াত ঃ ১৮০-১৮২ ও তরজমা ৫৪২

৬০. শব্দের পর্যালোচনা ও আয়াতের বিশ্লেষণ ৫৪২
'অসিয়ত'-এর তাৎপর্য ৫৪২
অসিয়তের জন্য দুটি শর্ত ৫৪৩

www.pathagar.com

সম্পদ বুঝাতে خير শব্দের ব্যবহার ৫৪৩
মা'রূফ ও শরীআতের মধ্যে সম্পর্ক ৫৪৩
অসিয়তের নির্দেশটি ছিল
অন্তর্বর্তীকালীন ৫৪৪
সাক্ষীদের বিরাট দায়িত্ব ৫৪৪
خوف শব্দের অর্থ ৫৪৫
جنف -এর অর্থ ৫৪৫
اثم শব্দের অর্থ ৫৪৫
রদ-বদল করার নিষিদ্ধতা
সংশোধনের নিষিদ্ধতার সমার্থক নয় ৫৪৬

৬১. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১৮৩-১৮৭ আয়াত ৫৪৬
আত্মশুদ্ধির জন্য রোযার বর্ণনা ৫৪৬
আয়াত ঃ ১৮৩-১৮৭ ও তরজমা ৫৪৮

৬২. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৪৯
'সাওম' শব্দের বিশ্লেষণ ৫৪৯
রোযা আত্মপ্রশিক্ষণের প্রাচীনতম
ইবাদাত ৫৫০
রোযার উদ্দেশ্য ৫৫০
ايام معدودت বলতে কি বুঝায় ? ৫৫১
একটি ভুল ব্যাখ্যা ৫৫২
প্রকৃত সমস্যা ও তার সমাধান ৫৫৪
রোযার জন্য রমযান মাসকে
নির্বাচন করার রহস্য ৫৫৬
রোযার বিধানের গূঢ়তত্ত্ব ৫৫৮
সন্দেহ ও সংকটে আল্লাহর
প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ ৫৫৯
আল্লাহ ও বান্দাহর সম্পর্ক ৫৬০
একটি সন্দেহের অপনোদন ৫৬১
রোযা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর জবাব ৫৬২
স্বামী-স্ত্রীর জন্য পোশাক হওয়ার
রূপক উপমার অলংকার ৫৬৩
'খিয়ানত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ? ৫৬৫
দাম্পত্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য ৫৬৬
এ'তেকাফ বলতে কি বুঝায় ? ৫৬৭

৬৩. মানুষের কর্মক্ষমতার ওপর
রোযার প্রভাব ৫৬৭

৬৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১৮৮ আয়াত ৫৭১
রোযার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী
বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক ৫৭১
আয়াত ঃ ১৮৮ ও তরজমা ৫৭১

৬৫. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৭২
اكل اموال بالباطل-এর উদ্দেশ্য ৫৭২
ادْلاَء শব্দের তাৎপর্য ৫৭২
উৎকোচ নিষিদ্ধ হওয়ার
বিভিন্ন দিক ৫৭৩

৬৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ
১৮৯-২০৩ আয়াত ৫৭৪
আয়াত ঃ ১৮৯-২০৩ ও তরজমা ৫৭৫

৬৭. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৭৯
اهلة শব্দের অর্থ ঃ প্রশ্ন উদ্ধৃত
করার কুরআনী পদ্ধতি ৫৭৯
প্রশ্ন ছিল 'সম্মানিত মাস' সম্পর্কে ৫৮০
একটি সংস্কারমূলক সংশোধনী ঃ
আরববাসীদের হজ্জকালীন
বিদআতসমূহ ৫৮১
সম্মানিত মাসে আত্মরক্ষামূলক
যুদ্ধ বৈধ ৫৮৩
'ফিতনা' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য ৫৮৪
উপরোক্ত অনুমতির প্রমাণ ৫৮৪
সাবধানতার প্রতি গুরুত্বারোপ ৫৮৫
فان انتهوا-এর তাৎপর্য ৫৮৫
কুরাইশ কাফের ও মুসলমানদের বিতর্ক ৫৮৫
হারাম এলাকায় ইসলাম ভিন্ন
অন্য কোনো দীনের স্থান নেই ৫৮৮
রাসূলদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ৫৮৮
পবিত্র ভূমির সুরক্ষায়
মুসলমানদের দায়িত্ব ৫৮৯
আরবী ভাষার একটি নিয়ম ৫৮৯
যেসব বিষয়ে অবমাননা করা
নিষিদ্ধতার কিসাস ৫৯০
জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ ৫৯১
অর্থ ব্যয় ও ইহসান-এর অর্থ ৫৯২

www.pathagar.com

উমরার ধরন ও প্রকৃতি	৫৯৩
১৯৬ আয়াতের প্রকৃত অর্থ	৫৯৩
সম্ভাব্য বিপদাপদ সম্পর্কে পথনির্দেশ	৫৯৪
مَحِلُّ শব্দের অর্থ	৫৯৫
কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করার কাফ্ফারা	৫৯৫
বহিরাগত হাজীদের জন্য একটি সুবিধা	৫৯৬
'হজ্জ' শব্দের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার	৫৯৭
مَعْلُومَاتٌ শব্দের অর্থ	৫৯৭
হজ্জকালে স্ত্রীসহবাস, গুনাহ ও ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া নিষেধ কেন ?	৫৯৭
ভাষার এক বিশেষ রীতি	৫৯৮
فَضْلٌ দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে	৫৯৯
জাহেলী প্রথার বিরুদ্ধাচরণ	৫৯৯
কুরাইশী কৌলিন্যের ওপর একটি আঘাত	৬০০
একটি অনর্থক কাজের সংস্কার	৬০১
দুনিয়া লোভীদের সতর্কীকরণ	৬০১
সঠিক কর্মপদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত	৬০২
وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-এর তাৎপর্য	৬০২
হজ্জের মহাসম্মেলন হাশরের দিনের মহাসম্মেলনের স্মারক	৬০৩
৬৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ	
২০৪-২১৪ আয়াত	৬০৪
আয়াত ঃ ২০৪-২১৪ ও তরজমা	৬০৫
৬৯. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা	৬০৭
মুনাফিকরা কাজে দুর্বল ও কথায় পটু হয়ে থাকে	৬০৭
ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর	৬০৯
দীনদারীর মিথ্যা দাবীদারদের আত্মম্ভরিতা	৬১০
নিষ্ঠাবানদের উৎসাহ প্রদান	৬১১
سِلْمٌ-এর তাৎপর্য	৬১২
كَافَّةً বলতে কি বুঝায় ?	৬১২
মুনাফিকদের নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের প্রতি আহ্বান	৬১৩
খণ্ডিত আনুগত্য শিরক	৬১৪
بَيِّنَاتٌ-এর অর্থ	৬১৪
عَزِيْزٌ ও حَكِيْمٌ-এর ব্যাখ্যা	৬১৫
নির্ভরযোগ্য ঈমান	৬১৬
বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য ঈমানের পথ উন্মুক্ত হয়	৬১৬
نِعْمَةُ اللّٰهِ বলতে কি বুঝায় ?	৬১৭
বাতিলপন্থীদের দৃষ্টিবিভ্রম	৬১৭
হক ও বাতিল উভয়ের জন্য অবকাশ দানের বিধি	৬১৮
ঈমানদারদের উৎসাহিত করল	৬১৯
২১৩ আয়াতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গতি	৬২০
মুসলিম জাতির সুমহান দায়িত্ব	৬২০
সত্যের ধারক বাহকদের পরীক্ষার কষ্টিপাথর	৬২১
৭০. পরবর্তী আলোচনা ঃ	
২১৪-২২১ আয়াত	৬২২
আরবের জাহেলী সমাজে জুয়া ও মাদকের সংযুক্তি	৬২২
আরববাসীদের এক সুপ্রিয় ঐতিহ্য	৬২২
আয়াত ঃ ২১৪-২২১ ও তরজমা	৬২৪
৭১. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা	৬২৬
প্রশ্নকারীদের গোপন মানসিকতা	৬২৬
জবাবের দুটি দিক	৬২৭
অনিবার্য পরিস্থিতিতে ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহর শেষ সীমা	৬২৮
সম্পদ দ্বারা যুদ্ধ ও জীবন দিয়ে যুদ্ধ	৬২৯
জিহাদের একটি বিশেষ দিক	৬২৯
পবিত্র মাসসমূহ সম্পর্কে আরো প্রশ্ন ও তার জবাব	৬৩০
পবিত্র মাসসমূহের সম্মান রক্ষার কিসাস	৬৩০
ফিতনার মূলোৎপাটন	৬৩১
একটি যথোচিত ভীতি প্রদর্শনের স্থান	৬৩১
ধর্মত্যাগের শাস্তি	৬৩২
সত্যের ওপর অটল থাকার মর্যাদা	৬৩২

www.pathagar.com

জুয়া ও মাদক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ধরন ৬৩৩
ক্ষতিকর জিনিস সম্পর্কে
ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিকোণ ৬৩৩
একটি ভুল ধারণা ৬৩৩
ভুল ধারণার কারণসমূহ ৬৩৪
ক্রমান্বয়ে জবাব দানের যৌক্তিকতা ৬৩৫
একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সংযোজন ৬৩৬
عفو শব্দ থেকে সমাজতন্ত্রের
প্রমাণ গ্রহণের ভ্রান্ত ধারণা ৬৩৭
এতিমদের ব্যাপারে সমাজের দায়িত্ব ৬৩৭
عنت শব্দের অর্থ ঃ ইসলামী
শরীআতের প্রকৃতি ৬৩৯
মুশরিক নারীদের বিয়ে করার
নিষিদ্ধতা ৬৩৯
مُشْرِكٰتٌ ও مُشْرِكِيْنَ-এর
পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার ৬৩৯
পসন্দ ও অপসন্দের ইসলামী মাপকাঠি ৬৪০
জীবনের ওপর আত্মীয়তার
সম্পর্ক সম্বন্ধের প্রভাব ৬৪০

৭২. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২২২-২৩১ আয়াত ৬৪২
আয়াত ঃ ২২২-২৩১ ও তরজমা ৬৪৩

৭৩. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ৬৪৬
রজঃস্রাবকালীন দিনগুলোর বিধান ৬৪৬
স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার সীমা ৬৪৬
সকল প্রাকৃতিক বিধান শরীআতেরই
অংশ বিশেষ ৬৪৭
'তাওবা' ও 'তাতাহ্হুর'-এর তাৎপর্য ৬৪৭
নারীদের বেলা শস্যক্ষেত্রের উপমা ৬৪৮
স্বাধীন ও বাধ্যবাধকতার সীমা ৬৪৮
'পরিবার পরিকল্পনা'-দর্শনের অসারতা ৬৪৯
আল্লাহর কসম লক্ষবস্তু নির্ধারণের অর্থ ৬৫১
বির্, তাকওয়া ও ইসলাহ্ বলতে
কি বুঝায় ৬৫১
২২৪ আয়াতটি হচ্ছে
বিভিন্ন মাসয়ালার ভূমিকা ৬৫১
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অনিচ্ছাকৃত
কসমসমূহ ৬৫২
'ঈলা'র হুকুম ৬৫৩
قروء (কুরু') শব্দের অর্থ ৬৫৪
তালাকের ইদ্দত পালনের যৌক্তিকতা ৬৫৫
স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার রয়েছে ৬৫৫
গৃহের কর্তৃত্বশীল হবে পুরুষ ৬৫৬
'আযীম' ও 'হাকীম'-এর ব্যাখ্যা ৬৫৭
তালাক দেয়ার সঠিক পন্থা ৬৫৭
পুরুষের মহানুভবতার দাবী ৬৫৮
খুল'আ তালাকের বিধান ৬৫৯
একটি যুক্তিসংগত বাধ্যবাধকতা ৬৬০
'নিকাহ' শব্দের অর্থ বিবাহ বন্ধন ৬৬১
বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ৬৬১
মুত'আ ও হালালের মধ্যে পার্থক্য ৬৬২
একটি দলিল বিহীন কথা ৬৬২
আল্লাহর শরীআতের সাথে
উপহাসের পরিণাম ৬৬৩

৭৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২৩২-২৩৭ আয়াত ৬৬৪
আয়াত ঃ ২৩২-২৩৭ ও তরজমা ৬৬৪

৭৫. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ
এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৬৬৭
عضل শব্দের অর্থ ৬৬৭
তালাকপ্রাপ্তা নারীর পথে
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না ৬৬৮
দুধ পান সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসয়ালা ৬৬৯
বিধবার ইদ্দত ৬৭০
ইসলামী সমাজে আবেগ
অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৬৭১
সদাচরণকারীর ওপর একটি হক ৬৭২
পুরুষের মহানুভবতার দাবী ৬৭৩
হাল যমানার সমাজবিদদের
জন্য একটি সতর্কবাণী ৬৭৩

৭৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২৩৮-২৪২ আয়াত ৬৭৪
নামায গোটা দীনের জন্য দুর্গ স্বরূপ ৬৭৪
আয়াত ঃ ২৩৮-২৪২ ও তরজমা ৬৭৭

www.pathagar.com

৭৭. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ
এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৬৭৮
নামাযের সংরক্ষণ ৬৭৮
'সালাতুল উস্‌তা' বলতে কি বুঝায় ৬৭৮
'সালাতুল খাওফ' বলতে কি বুঝায় ৬৭৯
নবী করীম (স)-এর শিক্ষা
হুবহু আল্লাহর শিক্ষা ৬৮০
বিধবার জন্য অসিয়তের
সাময়িক নির্দেশ ৬৮১
গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত
অধিকারের মর্যাদা ৬৮২

৭৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২৪৩-২৫৩ আয়াত ৬৮৩
পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু পরম্পরার
প্রতি ইংগিত ৬৮৩
পরবর্তী বিষয়বস্তুসমূহের
সারসংক্ষেপ ও তার বিন্যাস ৬৮৩
আয়াত ঃ ২৪৩-২৫৩ ও তরজমা ৬৮৪

৭৯. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ
এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৬৮৮
اَلَمْ تَرَ শব্দ দ্বারা সম্বোধনের ধরন ৬৮৮
'মউত ও হায়াত' শব্দদ্বয়ের মর্মার্থ ৬৮৮
"যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী
ছেড়ে পালিয়েছিল"-এর সাথে
সংশ্লিষ্ট ঘটনার স্বরূপ ৬৮৯
ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ৬৯২
জিহাদের জন্য দুটি প্রেরণাদায়ক বিষয় ৬৯২
আল্লাহর পথে ব্যয়ের অর্থে ঋণ
শব্দের ব্যবহার ৬৯৩
'কর্যে হাসানা'-এর মর্মার্থ ৬৯৩
ملاء শব্দের বিশ্লেষণ ৬৯৪
ملك শব্দের মর্মার্থ ৬৯৫
২৪৬ আয়াতের শিক্ষা এবং
ঘটনার ধরন ৬৯৫
بَعَثَ শব্দের মর্মার্থ ৬৯৭
তালুত ও সাউল ৬৯৭
তালুতের মনোনয়ন ও এ ব্যাপারে
বনী ইসরাঈলের আপত্তি ৬৯৭
আপত্তির জবাব ৬৯৮
তাবুতের মূল তত্ত্ব ৬৯৯
سَكِيْنَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ ৬৯৯
বনী ইসরাঈলের মাঝে
তাবুতের প্রত্যাবর্তন ৭০০
তাবুতের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে
তাওরাত ও কুরআনের
বর্ণনার বিভিন্নতা ৭০১
কুরআনের বর্ণনা সঠিক
হওয়ার কারণসমূহ ৭০১
বদর যুদ্ধের ছবি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ৭০৫
সৈন্যদের আনুগত্যের পরীক্ষা ৭০৫
বিজয় আধিক্য ও স্বল্পতার মধ্যে
নিহিত নয় বরং ঈমান ও
মনোবলের ওপর ৭০৭
সৈন্যদের পরীক্ষা সম্পর্কে তাওরাত
ও কুরআনের বর্ণনাসমূহের পার্থক্য ৭০৭
নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক থেকে
কুরআনের বর্ণনা তাওরাতের
বর্ণনা থেকে ভিন্নতর ৭০৮
কুরআনের বর্ণনা সঠিক,
সঙ্গতিপূর্ণ ও সার্থক ৭০৯
জালুত ৭০৯
হযরত দাউদ (আ)-এর
জীবনের সূচনা ৭০৯
জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও
তার যৌক্তিকতা ৭১১
নবী করীম (স)-এর প্রসংগ ও
তাঁর রিসালাতের প্রমাণ ৭১২
রাসূলদের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ৭১৩
হেদায়াত ও গোমরাহীর
ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ৭১৪

৮০. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২৫৪-২৫৬ আয়াত ৭১৫
আয়াত ঃ ২৫৪-২৫৬ ও তরজমা ৭১৬

৮১. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৭১৭
আল্লাহর পথে ব্যয়ের যুক্তি ৭১৭

www.pathagar.com

قَيُّومٌ শব্দের অর্থ ৭১৮
سِنَةٌ শব্দের অর্থ ৭১৮
كُرْسِى শব্দের অর্থ ৭১৮
আয়াতুল কুরসী একত্ববাদের
এক বিরাট নিদর্শন ৭১৯
শাফাআতের তাৎপর্য ৭২০
طاغوت শব্দের বিশ্লেষণ ৭২২
لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-এর মর্মার্থ ৭২৩
এটা স্বভাবগত বাধ্যবাধকতার
বিলুপ্তি ঘোষণা ৭২৩
আইনগত বাধ্যবাধকতা নয় ৭২৪

৮২. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২৫৭-২৬০ আয়াত ৭২৭
আয়াত ঃ ২৫৭-২৬০ ও তরজমা ৭২৮

৮৩. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ
এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৭৩০
وَلِىٌّ শব্দের অর্থ ৭৩০
ظُلُمٰتٌ ও نُور শব্দদ্বয়ের অর্থ
এবং তার প্রকৃতি ৭৩০
হেদায়াত ও গোমরাহীর
ব্যাপারে মৌলিক তত্ত্ব ৭৩০
২৫৮ আয়াতে اَلَّذِىْ বলতে কাকে
বুঝানো হয়েছে ৭৩১
অবতার বাদশাহর ধারণা ৭৩১
গোমরাহীর সবচেয়ে বড়
কারণ অহংকার ৭৩২
নবীদের বিতর্ক পদ্ধতি ৭৩২
হেদায়াত ও গোমরাহীর
ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ৭৩৩
اَوْ অব্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্র ৭৩৪
একজন মু'মিন বান্দাহ যিনি
দৃঢ় বিশ্বাস লাভে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন ৭৩৪
২৫৯ আয়াতে اَلَّذِىْ শব্দ দ্বারা
কাকে বুঝানো হয়েছে ৭৩৫
হিযকীঈল নবীর একটি
অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন ৭৩৫
কুরআন ও তাওরাতের মধ্যে
মতভেদের ধরন ৭৩৬
আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার
জন্য অদৃশ্য জগত ভ্রমণ ৭৩৬
اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهٖ প্রশ্নটির ধরন ৭৩৬
বনী ইসরাঈলের জন্য
জীবনের পয়গাম ৭৩৮
একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব ৭৩৯
اطمينان শব্দের মর্মার্থ ৭৩৯
فَصُرْهُنَّ শব্দের বিশ্লেষণ ৭৪০
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর
আবেদন বক্ষদেশ প্রশস্তের
উদ্দেশ্যে ছিলো ৭৪০
পাখির ঘটনাটি ছিলো হযরত
ইবরাহীম (আ)-এর
বিশেষ পর্যবেক্ষণ ৭৪২

৮৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ
২৬১-২৭৪ আয়াত ৭৪২
আয়াত ঃ ২৬১-২৭৪ ও তরজমা ৭৪৩

৮৫. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ ও
আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৭৪৬
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর মর্মার্থ ৭৪৬
আল্লাহর পথে ব্যয়ের দৃষ্টান্ত ৭৪৭
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ বলতে কি বুঝানো হয়েছে ৭৪৭
আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রতিদান
লাভের প্রকৃত হকদার ৭৪৮
আন্তরিকতাপূর্ণ একটি বাক্য
সেই দান অপেক্ষা উত্তম
যার সাথে মনোকষ্ট বিদ্যমান ৭৪৯
'গনী' এবং 'হালীম' গুণের দাবী ৭৪৯
صَفْوَانٌ শব্দের অর্থ ৭৫০
وَابِلٌ শব্দের অর্থ ৭৫০
صَلْدٌ শব্দের অর্থ ৭৫০
উপমাটিতে অংকিত চিত্র ৭৫০
হেদায়াতের প্রকারভেদ ৭৫১
تثبيت শব্দের অর্থ ৭৫২
ইনফাক হচ্ছে নফসের প্রশিক্ষণ
বা ট্রেনিং-এর জন্য একটি সাধনা ৭৫২

www.pathagar.com

رَبْوَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ	৭৫২
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করা হয় তার উপমা	৭৫৩
উদ্যান সম্পর্কে আরববাসীর কল্পনা বা অনুভূতি	৭৫৩
اعصار শব্দের বিশ্লেষণ	৭৫৪
উপরোক্ত উপমার আরো ব্যাখ্যা	৭৫৪
طَيِّبٰتٌ শব্দের মর্মার্থ	৭৫৫
অপবিত্র মাল ব্যয় করলে কবুল হয় না	৭৫৫
غنىٌّ ও حميد-এর ব্যাখ্যা	৭৫৫
فَحْشَاءُ বলতে কি বুঝায়	৭৫৬
ইনফাকের পথে বাধাসমূহ	৭৫৬
ইনফাক হেকমতের কোষাগারের চাবিকাঠি	৭৫৭
نذر শব্দের মর্মার্থ	৭৫৮
গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করার মর্যাদা	৭৫৯
হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাত বা চিরন্তন নীতিমালা	৭৫৯
আল্লাহকে দেয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের জন্য সঞ্চয় করা	৭৬০
لَايَسْئَلُوْنَ আয়াতের মর্মার্থ	৭৬১
৮৬.পরবর্তী আলোচনা ঃ	
২৭৫-২৮৩ আয়াত	৭৬২
সুদ হচ্ছে দান বা ইনফাকের বিপরীত	৭৬৩
আয়াত ঃ ২৭৫-২৮৩ ও তরজমা	৭৬৩
৮৭. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা	৭৬৭
ربوا (রিবা) শব্দের মর্মার্থ	৭৬৭
تخبط শব্দের বিশ্লেষণ	৭৬৭
مس শব্দের অর্থ	৭৬৮
আল্লাহর পথে ব্যয়কারী ও সুদখোরের সাথে আল্লাহর আচরণ	৭৬৮
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -এর অবস্থান	৭৬৯
ব্যবসায়ী ও সুদখোরের মূলধনের পার্থক্য	৭৬৯
সেবামূলক কাজ ও সামাজিক বিভিন্ন প্রকল্পের সুদ	৭৭০
সুদখোরদের প্রতি সতর্কবাণী	৭৭১
গুনাহের পরিবেষ্টন সার্বক্ষণিক আযাবের কারণ	৭৭২
সুদের প্রাচুর্যহীনতা এবং দানের প্রাচুর্য	৭৭৩
সুদের প্রাচুর্যহীনতার কারণ	৭৭৪
সুদী লেনদেনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত	৭৭৫
সুদখোরদের প্রতি চরমপত্র	৭৭৫
সুদের পৃষ্ঠপোষকদের একটি দাবী ও তার জবাব	৭৭৬
আরব দেশে ব্যবসায়িক ঋণের ওপরও সুদ নেয়ার প্রচলন ছিলো	৭৭৭
ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতাদেরকে ক্ষতি ও ঝগড়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য কিছু দিকনির্দেশনা	৭৭৮
رِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ -এর মর্মার্থ	৭৮১
اثم قلبه-এর তাৎপর্য	৭৮১
رهن বা বন্ধকের হুকুম	৭৮২
বন্ধক সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা	৭৮২
৮৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ	
২৮৪-২৮৬ আয়াত	৭৮৩
আয়াত ঃ ২৮৪-২৮৬ ও তরজমা	৭৮৪
৮৯. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা	৭৮৫
অন্তরের গোপন বিষয়ের হিসেব নেয়ার মর্মার্থ	৭৮৬
আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর হেকমতের সাথে সংযুক্ত	৭৮৬
২৮৪ আয়াতে দু ধরনের যোগসূত্র রয়েছে	৭৮৬
বেঈমানদের প্রতি বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন	৭৮৭
আইন পালনের ক্ষেত্রে নবী ও তাঁর উম্মত সমান	৭৮৭

www.pathagar.com

সকল নবী ও সব কিতাবের প্রতি সমভাবে ঈমান পোষণ করতে হবে	৭৮৮
বর্ণনাভঙ্গির পরিবর্তনে বালাগাত বা বাগ্মীতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব	৭৮৮
سمع وطاعت-এর মর্মার্থ	৭৮৯
ক্রিয়া বিলোপ করার উপকারিতা	৭৮৯
শোনা ও মানার স্বীকৃতির সাথে দোয়ার সম্পর্ক	৭৮৯
দোয়ার মাঝখানে পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাক্য	৭৯০
خطا ও نسينا-এর মধ্যে পার্থক্য এবং এ দোয়ার যৌক্তিকতা	৭৯১
اصر শব্দের মর্মার্থ এবং এ দোয়ার রহস্য	৭৯১
সাধ্যাতীত পরীক্ষাসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দোয়া	৭৯১

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রসঙ্গ কথা

স্বপ্ন দীর্ঘদিনের—আমার রচনাবলী বিশেষত তাদাব্বুরে কুরআনের ছাপা ও প্রকাশের দায়িত্ব এমন ব্যক্তি গ্রহণ করুন, যিনি এ রচনাবলীর গোটা অঙ্গন জুড়ে প্রবাহিত ও মিশে থাকা চিন্তা-চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে আছেন। মহান আল্লাহর লাখো শুকরিয়া আমার প্রবীন সাথী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ জনাব মাজেদ খাওয়ের সাহেবের মাধ্যমে তিনি সে আশা পূরণ করে দিয়েছেন। কেবল আমার চিন্তার সাথেই নয়, বলতে গেলে গোটা ফরাহী চিন্তার সাথেই তিনি একাকার হয়ে আছেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান 'ফারান ফাউণ্ডেশন'কে সূচনা লগ্ন থেকেই এর প্রকাশনায় নিয়োজিত করার অন্তরালে তাঁর সাহসী ভূমিকা ও আন্তরিকতার প্রমাণ লক্ষ করা যায়। এ কাজে তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তাই পূর্ণ আস্থার সাথে আমি বলতে পারি সে দায়িত্ব পালনে তিনি সক্ষম হবেন এবং যথাযথভাবেই। আল্লাহ চাহে তো তাদাব্বুরে কুরআন ও হাদীস প্রকাশনীর সক্রিয় সহযোগিতায় সে কুরআনী দর্শন বাস্তবের সাক্ষী হয়ে তদুপরি আধুনিক চ্যালেঞ্জের প্রমাণ সিদ্ধ আসল জবাব হিসেবে অচিরেই জনগণের হাতে পৌঁছে যাবে।

নিজ রচনাবলীর মান নির্ণয় করতে যাওয়া আমি ধৃষ্ঠতা মনে করি। তবে প্রখ্যাত দার্শনিক কান্টের সূরে কণ্ঠ মিলিয়ে আমারও একই কথা : "চিন্তার সবটুকুই আমি লিখনিতে ব্যক্ত করেছি—বলতে পারি না, তবে হাঁ—যা কিছু লিখেছি গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝেসুঝেই লিখেছি, এ দাবী অবশ্যই করতে পারি।" তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআনকে বাস্তবে রূপ দেয়ার পিছনে আমার জীবনের ৫৫টি মূল্যবান বছর গড়িয়ে গেছে। তন্মধ্যে ২৩ বছর কেটেছে শুধু পাণ্ডুলিপি রচনায়। এর সাথে আমার অনুসৃত উস্তাদ মরহুম মাওলানা হামীদুদ্দীন ফরাহীর কুরআন বিষয়ক চিন্তা-গবেষণার সময়কাল যুক্ত করা হলে তাদাব্বুরে কুরআন গ্রন্থটিকে প্রায় শতাব্দী জুড়ে চিন্তার স্বার্থক ফসল বলা যায়। বলতে গেলে মরহুম ফরাহীর চিন্তাধারাকেই আমি ভাষার আবরণে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মরহুম উস্তাদের সার্বিক চিন্তাধারার সাথে যুক্ত করা বেআদবীর শামিল বটে, কিন্তু বাস্তবতা এটাই—আজীবন তাঁর সুরেই আমি সুর মিলিয়েছি। আমার চিন্তা মূলত তাঁরই গবেষণার ফলশ্রুতি। সে কারণে নিজ ভাবনাকে আমি তাঁর চিন্তার আদলে সম্পৃক্ত করার দুঃসাহস দেখিয়েছি। এটা বেআদবীর কাতারে গণ্য হলে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আমার উপায় কি ?

বড়ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয় বাস্তবের অভিব্যক্তি হিসেবেই আমার উপরোক্ত কথার অবতারণা। উদ্দেশ্য—যারা আমার লেখার সমালোচনা করতে আগ্রহী, তারা সানন্দে তা করতে পারেন। তবে আমার পরিবেশিত তথ্য প্রমাণও যেন তাদের নযরে উজ্জ্বল থাকে, সে অনুরোধ আমি করতেই পারি।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—উস্তাদগণের মুখে যুগ যুগের শোনা কথা এবং প্রচলিত কিতাবাদিতে পঠিত বিষয় বক্তব্যই আমার লিখায় স্থান পাবে বলে যাদের ধারণা, আমার দ্বারা তাদের সে খাহেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আশা না করাই ভাল। কেননা আমার মতে একমাত্র কুরআন-হাদীসই হুজ্জত ও দলিল হওয়ার যোগ্য অন্য কিছু নয়। এক্ষেত্রে বরং চিন্তা-গবেষণাকেই আমি মানবীয় মর্যাদা ও ইনসানী ফযীলতের সর্বোচ্চ স্তর মনে করি। কার্যত আমার চেষ্টা হল—শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং যুগ যুগান্তরব্যাপী কুরআন-হাদীসের গবেষণাধর্মী চর্চার থেমে যাওয়া প্রবাহ আপন গতিতে আবার ছুটে চলুক। উদ্ভাবনীর অচলগতি আরেকবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক। এ ব্যাপারে করার মত আমার সামর্থে যদি কিছু থাকে, তবে নির্দ্বিধায় আমি তা করে যেতে চাই। আমার বিশ্বাস—নিয়ত বিশুদ্ধ হলে আল্লাহ চাহে তো চেষ্টার প্রতিদান আমি পাবই পাব।

এখানে কাকতালীয়ভাবে ঘটে যাওয়া দুটি বিষয়ের উল্লেখ তাদাব্বুরে কুরআন পাঠকদের উৎসাহ বর্ধনে সহায়ক হবে বলে আশা করি ঃ (ক) কুরআন কারীমে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ তাদাব্বুরে কুরআনের পৃষ্ঠা সংখ্যাও সমপরিমাণ এ যেন প্রতিটি আয়াতের তফসীরের অনুকূলে এক পৃষ্ঠা বরাদ্দের নামান্তর। (খ) কুরআন কারীমের অবতরণ কাল ২৩ বছর। তাদাব্বুরে কুরআনের পাণ্ডুলিপি রচনায়ও একই সময় ব্যয় হয়েছে। ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ তথা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ ছাড়া একে আর কি বলা যায়? উপরোক্ত ভূমিকার পর তাদাব্বুরে কুরআনের চলতি প্রকাশে আনীত সংশোধনীর প্রতি এক নযর ঃ (১) কলেবরে ভারসাম্য আয়ননের লক্ষে খণ্ড সংখ্যা আটের পরিবর্তে নয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ পরিবর্তন কেবল প্রথম চার খণ্ডের বেলায়। অর্থাৎ চার ভেঙ্গে পাঁচ খণ্ড করা হয়েছে। শেষের চার খণ্ড পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। ফলে এখন খণ্ডসমূহের অবয়বগত ভারসাম্য হীনতা দূরীভূত হয়েছে।

(২) মূল কুরআনের আদ্যপ্রান্ত পুরোটার ওপর সতর্কতার সাথে পুনরায় নযর বুলানো হয়েছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

(৩) জটিলতা নিরসনকল্পে কোনো কোনো শিরোনাম সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

(৪) শিরোনামসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

(৫) প্রয়োজনে উপশিরোনাম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৬) পূর্ব প্রকাশে কোনো কোনো স্থানে আয়াতের তাফসীর কিংবা তরজমা বাদ পড়েছিল। সংশোধনীর মাধ্যমে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে।

(৭) পূর্বতন সংস্করণে তফসীরের বেলায় কোনো কোনো স্থানে আয়াতের অস্পষ্ট উদ্ধৃতি ছিল। চলতি সংস্করণে পূর্ণ আয়াত উল্লেখ দ্বারা সে জটিলতা দূর করা হয়েছে।

(৮) প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে সূরার নাম-নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(৯) প্রতি খণ্ডে বিস্তারিত সূচী সন্নিবেশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গ্রন্থের মানোন্নয়ন কল্পে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দুটি দিক ঃ

(ক) 'নেয়ামুল কুরআন' শিরোনামে বিষয় ও মর্ম অনুসারে সাজিয়ে সমগ্র মূল কুরআন ও কুরআনের অনুবাদ তাদাব্বুরে কুরআনের অনুবাদ অনুসারে এক স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশ করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এতে প্রত্যেক সূরায় বর্ণিত মূল বিষয়ের নীতিগত পর্যালোচনা এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞানগত আলোচনা করা হয়েছে ; সাধারণ পাঠকবর্গ যাতে কুরআনের বক্তব্য বিষয় ও তার ধারাবাহিক যোগসূত্র অনুধাবনে বঞ্চিত না থাকে। যা কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য। তাদাব্বুরে কুরআন থেকে সতর্ক চয়নের মাধ্যমে একে সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব জনাব মাজেদ খাওয়ের সাহেবের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও উচ্চতর আঙ্গিকে সাজানোর সকল প্রস্তুতি রীতিমত সম্পন্নও হয়ে আছে। উপরন্তু নিবেদিত প্রাণ খালেদ মাসউদ সাহেব তাদাব্বুরে কুরআনের প্রয়োজনীয় টীকা পাদটীকা ইত্যাদি সংযোজনে সদা নিয়োজিত আছেন। অতএব সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় আল্লাহ চাহেতো পরিকল্পিত কপি শীঘ্রই বাজারে এসে যাবে।

(খ) প্রতি খণ্ডে সূচীপত্র যুক্ত আছে। সবগুলো সূচীপত্র একত্রে জমা করে ইনডেক্স্ আকারে পৃথক একটি খণ্ড প্রস্তুতের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ক্রমিক হিসেবে এটি হবে দশম খণ্ড। আল-কুরআন গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী ও উপকারী হবে বলে আমার ধারণা। আল-কুরআনের ভাষায় এখন تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ অর্থাৎ, সংখ্যা হিসেবে একে পরিপূর্ণ দশ বলাই সঙ্গত। এ হলো আমাদের পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তবের আলো দেখবে সেটিই যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যেহেতু চূড়ান্ত ফায়সালা তাঁরই। আমাদের করণীয় কেবল আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকা।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

লাহোর
৮ শাবান ১৪০৩ হিঃ
২২ মে ১৯৮৩ ইং

বিনীত
আমীন আহসান ইসলাহী

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইতিপূর্বে 'তাদাব্বুরে কুরআন' শিরোনামে একটি পুস্তিকা আমি রচনা করেছিলাম। যার ২/৩ এডিশন সম্ভবত ছাপাও হয়েছিল। ইচ্ছা ছিল এটাকেই তাফসীরের ভূমিকা হিসেবে জুড়ে দেয়া হবে। এটা বেশ আগের কথা। যে কারণে নতুন ভূমিকা লিখার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করে দেখা গেল ভূমিকা হিসেবে একে চালিয়ে দেয়াটা তাফসীরের সাথে যুলুমের নামান্তর। কারণ একে তো বহু পূর্বে লিখিত হওয়ার দরুন উক্ত পুস্তিকায় বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এর কোনো কোনো স্থানে সামঞ্জস্যহীন দীর্ঘ বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই সমস্ত জরুরী কাজ বাদ দিয়ে আমাকে তাফসীরের নতুন ভূমিকা লিখায় মনোযোগ দিতে হলো। আল্লাহ তাওফীক দিন।

১. তাফসীর লিখার উদ্দেশ্য এবং কুরআন বুঝার মাধ্যম

এ তাফসীর লিখার পিছনে আমার মূল উদ্দেশ্য এমন একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করা যার বিবরণে যাবতীয় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব প্রায় ত্রুটি-বিচ্যুতির ছোবল এড়িয়ে স্বাধীন ও মুক্ত মনে প্রতিটি আয়াতের সঠিক মর্ম, আসলভাব ও যথার্থ আবেদন চিহ্নিত করা হবে। উদ্দেশ্যের চাহিদা অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই আমি কুরআন বুঝার লক্ষে প্রথমত সে সকল মাধ্যমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি, যা স্বয়ং কুরআন কারীমে বিদ্যমান। যথা—কুরআনের ভাষা, এর বাচনভঙ্গি, আয়াতসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র, প্রমাণ সিদ্ধ বক্তব্য ও দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা। দ্বিতীয়ত—হাদীস, ইতিহাস, পূর্বতন আসমানী গ্রন্থ, তাফসীরের কিতাব ইত্যাদি কুরআন বহির্ভূত মাধ্যমসমূহ অনুসরণ করেছি। এগুলোর সাহায্য আমি আপন সাধ্য ও প্রয়োজনমত নিয়েছি বটে, তবে ভিতরগত মাধ্যমের অধীন হিসাবে। কুরআনের শব্দ, বাচনভঙ্গি, প্রমাণ ও উপমার আলোকে যে বিষয় স্পষ্টতর বুঝা গেছে, সেটি আমি গ্রহণ করেছি। এর বিপরীত কোনো বিষয় বক্তব্য প্রকাশ পাওয়া অবস্থায় এর মূল্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী আমি সেটিকে যথাযথ যাচাই করেছি। দীনী ও এলমী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি গুরুত্বের অধিকারী হলে গভীর পর্যালোচনার আলোকে তাকে অনুধাবন করতঃ আমি সঠিক মর্ম নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। আর গুরুত্বের বাহন কিংবা অর্থবহ না হলে সেটি আমি এড়িয়ে গেছি। কেননা অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম আমি অর্থহীন প্রয়াস মনে করি।

২. কুরআন বুঝার ভিতরগত মাধ্যম

আলোচ্য গ্রন্থে উপরোক্ত মাধ্যম দুটি থেকে আমি কি ধরনের সাহায্য নিয়েছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাই। এ ব্যাপারে ভিতরগত মাধ্যম সম্পর্কে আমার প্রথম আলোচনা।

www.pathagar.com

আল কুরআনের ভাষা

কুরআন কারীম আরবী ভাষায় নাযিল করা গ্রন্থ। তবে এর ভাষণ কথ্য কিংবা নিম্নমানের ভাষার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। কার্যত কুরআনের বাচনভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, যুক্তি-প্রমাণ, শব্দ ও বাক্যের পরস্পর গাথনি এবং রচনাশৈলী এমনই অলংকার শোভিত, যাকে মুজিযা তথা অলৌকিক আখ্যায়িত করা ছাড়া উপায় নেই। এ জাতীয় কালাম রচনা করা জিন-ইনসান কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রচলিত আরবী বাকরীতি পুরোপুরি অনুসরণ না করে আল কুরআনের বাগধারা মূলত নিজস্ব ও স্বতন্ত্র গতি অনুসরণে প্রবাহিত, যাকে মানবীয় বাগ-ব্যঞ্জনার সাথে তুলনা করা অর্থহীন। কুরআনিক বাচনভঙ্গি কি পরিমাণ অলংকার সমৃদ্ধ আরবের প্রখ্যাত কবি লবীদের ঘটনায় কিঞ্চিত অনুমান করা যায়। লবীদ ছিলেন কালজয়ী সাবআ মুআল্লাকা তথা গীথিকা সপ্তকের সর্বশেষ কবি ও কাব্যকার। তাঁর একটি কবিতার সম্মানে সমকালীন আরব কবি গোষ্ঠী ওকাযের মৌসুমী মেলায় তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছিল। শুধু কি তাই, তৎকালীন আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী মহাকবি লবীদ রচিত কবিতামালা কা'বা ঘরের দেয়ালে বছরব্যাপী ঝুলিয়ে পর্যন্ত রাখা হয়েছে, এটা ছিল কবির প্রতি সম্মানের নিদর্শন। পরবর্তীতে যখন ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান শুরু হলো, এর মর্মবাণী তাঁর মনের দুয়ারে তীব্র আঘাত হানে। এক পর্যায়ে অন্তর খুলে গেলে তিনি ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। এখন তিনি সাচ্চা মুসলমান। যতই পাঠ করেন কুরআনের অলৌকিক ব্যঞ্জনা, ভাষালংকারের অনাবিল ব্যঞ্জনা তাঁকে বিমূঢ় বিমোহিত করে তোলে। কারণ তিনি কবি। তিনি বুঝেন শব্দ ও বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে অলংকারের উপস্থাপনা কত যে নিখুঁত উপমার প্রয়োগ কত যে নিপুণ। মানব রচিত কোনো কাব্য কবিতা এর তুল্য হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। পরিশেষে তিনি কাব্য চর্চার পাঠ চুকিয়ে দেন। আরব কবিকুলের সেজদার পাত্র, ভাষালংকারের গর্বিত প্রতীক ও কবিসম্রাট লবীদের এহেন অঙ্গনবিচ্যুতি মানসিকতার জনমনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এখন আপনার কাব্য চর্চার প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণ কি ? স্বল্প ভাষণ জ্ঞানী লোকের স্বভাব। তাই তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন ঃ أَبَعْدَ الْقُرْآنِ ؟ –কুরআনের পরেও কি ? (অর্থাৎ কুরআন কারীমই তো যথেষ্ট। এরপর কাব্য চর্চার অবকাশ কোথায় প্রয়োজনই বা কি ?) আরবীয় কবিসম্রাট ও আরবী ফাসাহাত-বালাগাতের প্রতীকের পক্ষ থেকে কুরআনিক অলংকারশৈলীর এহেন অকপট স্বীকৃতি স্পষ্টত প্রমাণ করে ভাসালংকারগর্বী আরবী কবির দর্প আজ কুরআনের সামনে ভূলুণ্ঠিত-আত্মসমর্পিত। এখন থেকে আল কুরআনের সামনে চোখ তোলার অবকাশ কারো থাকতে পারে না—থাকা সঙ্গত নয়।

কুরআন কারীমের ন্যায় উচ্চমানের ভাষাশৈলী সমৃদ্ধ ও অলংকার শোভিত কালামের সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা আন্দাজ করা কেবল তরজমা-তাফসীর কিংবা ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই বরং উচ্চতর মেধা-মনন, ভাষার গভীরতা অধিকন্তু যে ভাষার কালাম সে ভাষায় নিখুঁত পণ্ডিত্য। বলাবাহুল্য কোনো ভাষায় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এর জন্য জন্মগত প্রেরণা, সূক্ষ্ম মননশীলতার সাথে

www.pathagar.com

সাথে কাঙ্ক্ষিত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনে বিরামহীন সাধনা অপরিহার্য। কেননা যুগ যুগ ধরে অকৃত্রিম সাধনার ফলেই কেবল ভাষাগত ব্যুৎপত্তি আর প্রেরণাধর্মী সুশীল মনোবৃত্তি আর্জিত হতে পারে। উপরোক্ত আলোচনা সে সকল লোকদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা কালামের ভাষায় কথা বলে এবং এটা তাদের মাতৃভাষা। কিন্তু কেউ যদি ভিন্নভাষী হয়, তবে তার জন্য সে যোগ্যতা অর্জন করা দারুন কঠিন ব্যাপার।

আরবী ভাষা বিশেষত কুরআনী ভাষার ব্যাপারে অপর সমস্যা হলো যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছিল সে ভাষা আজ কোথাও প্রচলিত দেখা যায় না।

বর্তমানে আরব-অনারব উভয় দেশে যে আরবী পড়া ও পড়ানো হয়, লিখা কিংবা বলা হয়, উচ্চারণ-বাচনভঙ্গি, শব্দ পরিভাষা ইত্যাদি কোনো দিক থেকেই তাকে কুরআন ভিত্তিক আরবীর প্রবচন বলা যায় না। একে বরং কুরআন বহির্ভূত ব্যতিক্রমী আরবী বলাই সঙ্গত। আমাদের এদেশীয় দীনী মাদ্রসাসমূহে যে আরবী পড়ানো হয়, তা মূলত ও কার্যত কালউবী, নাফহাতুল ইয়মান কিংবা বড়জোর মাকামাতে হারীরী ও দেওয়ানে মুতানাব্বী ধাঁচের আরবী। অপরদিকে আরব, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি আরব দেশগুলোতে প্রচলিত ও কথিত আরবী কোন্ মানের, কোন্ জাতের, সেসব দেশের পত্র-পত্রিকায় দৃষ্টি দিলে সহজেই তা অনুমান করা যায়। ভাষা হিসেবে এটাও আরবী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা কুরআনী আরবী পরিচয় বহন করে না। কুরআনমুখী আরবীর প্রেরণা কিংবা আবেদনও জাগিয়ে তোলে না। সেটা বরং কুরআন বিবর্জিত ভিন্নতর এক স্বতন্ত্র আরবী, যা কুরআনী অঙ্গন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। কুরআন কারীম হারীরী-মুতানাব্বী কিংবা মিসর সিরিয়ায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ভাষাকে বাহন বানিয়ে নাযিল হয়নি। নাযিল হয়েছে বরং ইমরাউল কায়েস, আমর বিন কুলসূম, যুহাইর, লবীদ প্রমুখ কবি-কাব্যকার এবং কুস্ বিন সায়েদার ন্যায় শীর্ষমানের খতীবদের ব্যবহৃত ভাষায়। তাই কুরআনী ভাষার বচন-সংক্ষেপ এবং অলৌকিকতা অনুধাবন করতে হলে প্রাগৈসলামিক যুগের কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য-কবিতার মানগত স্তর এবং দোষগুণ বুঝার রুচিবোধ থাকা জরুরী। কেউ যদি সে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম না হয়, তাহলে তার পক্ষে বুঝা আদৌ সম্ভব হবে না। কুরআন যে আরবী ভাষার কত বড় পরিশীলিত নমুনা, তার যাদুকরী আকর্ষণ কত যে তীব্র এটাও সে বুঝতে পারবে না। কুরআনের প্রভাব যে কত প্রচণ্ড—যার তোড়ে সমকালীন আরব পণ্ডিতবর্গের ভাষালংকারগর্বী দাপট চিরদিনের জন্য ধূলায় মিশে গিয়েছিল।

সন্দেহ নেই জাহেলী যুগের কবি-খতীবদের ভাষণ কবিতার উল্লেখযোগ্য অংশ যুগ-যুলুমের নির্মম আঘাতে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতটা পরিমাণ ভাণ্ডার এখনো মওজুদ রয়েছে, যা মূল উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট হতে পারে। বিগত পঞ্চাশ বছরে জাহেলী কবি-সাহিত্যিকদের এমনসব রচনা সম্ভার প্রকাশিত হয়েছে, যা পূর্বে দুর্লভ ছিল। তাদের কালামসমৃদ্ধ সংকলন বলতে গেলে এখন হাতের নাগালে। যেগুলোকে আরবী ভাষার সংরক্ষিত ভাণ্ডার বলা যায়। অবশ্য এর সবই যে শালীন ভাষণে সমৃদ্ধতা নয়। কিছু কিছু অশালীন কথাবার্তাও তাতে লক্ষ করা যায়। তবে শ্লীল-অশ্লীল-শালীন-

www.pathagar.com

অশালীনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সহজেই করে নিতে পারেন। জাহেলী খতীবগণের মুক্তঝরা ভাষণ-বক্তৃতা অবগত হওয়ার জন্য ইতিপূর্বে জাহেয, মুবাররাদ, ইবনে হাদীদ প্রমুখের গ্রন্থাবলীর আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সে সমস্ত ভাষণ সমৃদ্ধ পৃথক পুস্তিকা প্রকাশ পাওয়ায় সে প্রয়াজন অনেকটা পূরণ হয়েছে বলা যায়। মোটকথা আগ্রহী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তির রুচি ও স্বাদের পরিতৃপ্তির যথেষ্ট উপাদান বর্তমানে মওজুদ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু মনের সাহস ও আন্তরিক প্রচেষ্টার।

আমার কথাটাকে আত্মগর্বী রূপ দিয়ে এ অর্থে নেয়া ঠিক হবে না—নিজের মধ্যে প্রেরণার প্রাচুর্য আছে বলে আমি উচ্চ কণ্ঠের দাবীদার। কুরআনী ভাষার ধরন কি, তার সাহিত্যিক রস-মাধুর্য পরিমাপের তুলাদণ্ড কি হওয়া উচিত ? এসব চিহ্নিত করাই আমার কথার মূল প্রতিপাদ্য। এ ব্যাপারে আমি বেশি কিছু করতে পারিনি। আমি কেবল এটুকুই করেছি—তাফসীর লিখার পূর্বে আমার সাধ্য-সংগ্রহে থাকা জাহেলী যুগের সাহিত্য ভাণ্ডার মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। কুরআনের সাহিত্য, ব্যাকরণ ও মর্মগত বাহ্যিক জটিলতা নিরসনযোগ্য সহায়ক রচনাবলী অধ্যয়নও আমার প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়েনি। আমি নিঃসংকোচে বলতে চাই—এ ব্যাপারে যা কিছু করেছি তাতে আমার তুলনায় মরহুম উস্তাদ হামীদুদ্দীন ফরাহীর অবদানই সর্বাধিক। তাফসীর লিখার প্রয়োজনীয় উপাদান তিনি পূর্বেই চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। যা তাঁর রচনাবলী থেকে সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এখানে বলতে গেলে আমার কৃতিত্ব এটুকুই—কুরআনের আপাত জটিল বিষয়-বক্তব্য সমাধান পর্যায়ে তার অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতি ও পরিভাষাগুলো যাচাই করা এবং সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর বিষয়াবলী নিরীক্ষণে মরহুম উস্তাদের সংগৃহীত উপাদানগুলো আমি অনায়াসে কাজে লাগিয়েছি।

কুরআনের কেবল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি বিষয়ে নয়, বরং আরবদের দৈনন্দিন জীবন-ধারা, সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-তমদ্দুন, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, পরিবেশগত চিন্তা-চেতনা, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ যাচাইয়ের মাপকাঠি, জীবন চলার গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সার্বিক বিষয়-আশায় বুঝার ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে যে নির্দেশনা পাওয়া যায়, অন্য কোথাও থেকে তা পাওয়া যায় না। অথচ কুরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও ভাব-দর্শন যে ব্যক্তি নিজে বুঝতে এবং অপরকে বুঝানোর আগ্রহ পোষণ করে, তার জন্য উপরোক্ত বিষয়সমূহের অবগতি একান্ত জরুরী। আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য এখানেই—আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা পরিহার করে আরব জনগোষ্ঠীর জীবন দর্শন থেকে সে অন্যায়-অকল্যাণের বিষদাঁত নির্মূল করেছে। অপরদিকে তাদের জীবন প্রবাহে কল্যাণের সে বীজ এতদিন সুপ্ত ছিল, সেগুলোকে বিকশিত করেছে। সে কারণে কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বার এমন সব ইশারা-ইঙ্গিতের অবতারণা লক্ষ করা যায়, সেগুলো স্পষ্টকথায় বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জাহেলী কুসংস্কার শিকড় গেড়েছিল। সাথে সাথে এটাও জানতে হবে—সংস্কারের অস্ত্র দিয়ে ইসলাম কোথায় ও কিরূপে আঘাত হেনেছে। বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য উপমার আলোকে বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু এখানে

সীমিত পরিসরে আলোচনা, তদুপরি তাফসীরে যথাস্থানে দৃষ্টান্ত বর্ণিত হবে। তাই ইঙ্গিত-ইশারাই এখানে যথেষ্ট বলে মনে করি।

প্রণিধানযোগ্য—আমাদের ইতিহাস গ্রন্থরাজিতে, জাহেলী আরবদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার অধিকাংশ তথ্যই ভাসা ভাসা ধরনের। এদ্বারা আমার দেয়া ইঙ্গিত বিষয়ে সঠিক তথ্যের আলো অতি অল্পই পাওয়া যায়। আমাদের ইতিহাসবেত্তাগণ সাধারণত আরব জনসমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, এটা কোনো মানব সমাজের ইতিহাস বলে স্বীকার করা যায় না। একে বরং চারপায়ে চলা জংলী হায়েনার ইতিহাস বলাই সমীচীন। এ ইতিহাস পাঠে কল্পনাই করা যায় না—এটা সেই মানবসমাজের জীবন কথা কোনোকালে যারা মিল্লাতে ইবরাহীম ও দীনে ইসমাঈল (আ)-এর অনুসারী ছিল। তাহলে এ জাতীয় ইতিহাস তাঁরা লিখতে কেন গেলেন ? সঙ্গত এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়—এছাড়া ইসলামের অলৌকিক ক্ষমতা ও কালজয়ী দীপ্তি প্রকাশের কোনো উপায়-অবলম্বন তাঁদের হাতে বর্তমান ছিল না। তাঁদের ধারণা—একপাল বন্য পশু ধরে এনে জগতজয়ী বানিয়ে দেয়াটাই ইসলামের বিরাট কেরামতী। এর অন্তরালে সত্যের পরশ কিছুটা আছে বটে। কিন্তু অপর দিক এতে উপেক্ষা করা হয়েছে। সেটা হলো—আরবরা যদি এমনি বন্য প্রাণী হয়ে থাকে, তাহলে আল কুরআনের ন্যায় আসমানী গ্রন্থের বাহক হওয়ার সৌভাগ্য তারা পায় কিরূপে ? এ প্রশ্ন প্রথম থেকেই আমার মনে দাগ কাটে। যে কারণে ইতিহাস গ্রন্থের চর্চা বাদ দিয়ে জাহেলী আরব সাহিত্যে বর্ণিত আরব সমাজের দোষ-গুণ উভয়দিক অধ্যয়নে আমাকে মনোযোগ দিতে হয়। সে প্রচেষ্টার ফলে আমার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। যাকে তাফসীরের কাজে আমি পুরোপুরি ব্যবহার করেছি।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায়—সীমিত অর্থ পরিহার করে ভাষাগত বিষয়টিকে আমি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। আমার মতে কুরআন বুঝা ও চর্চার ক্ষেত্রে সেই ভাষা ও সাহিত্য রসবোধ, অলংকার-মাধুর্য আকর্ষণে দুর্বার মননশক্তিই কার্যকর হাতিয়ার—যে ভাষার আবরণে কুরআন নাযিল হয়েছে। যার মধ্যে সে বোধশক্তির কমতি কিংবা শূন্যতা বিরাজমান, তার পক্ষে কুরআনের অলংকার মহিমা, বক্তব্যের চমৎকার উপস্থাপনা বুঝে ওঠা কঠিন। এমনকি না পারার সম্ভাবনাই ষোলআনা। অনেকে আমার নিকট প্রায়ই জানতে চায়—কুরআনের জটিলতা সমাধান কল্পে তারা কোন্ অভিধানের আশ্রয় নিবে ? এদ্বারা বুঝা যায়—তাদের ধারণা কাঙ্ক্ষিত অভিধানটি পেয়ে গেলে জটিলতা সমাধানের কলকাঠি এখন হাতের নয় একেবারে আঙ্গুলের ডগায়। কেবল চাপের অপেক্ষা। অথচ এ ধারণা নিতান্ত ভুল। তবে ভাষাগত প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তির জন্য ব্যবহারিক অভিধান উপকারী জিনিস বটে, কিন্তু এ ঘরে যার দৈন্যদশা শূন্য হাত বোঝায় বোঝা অভিধান তার কোন্ কাজের ? এ পর্যায়ে "লেসানুল আরবের" সাহায্যই আমি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেছি। কারণ লেসান গ্রন্থকার আরবদের চলমান প্রয়োগ, প্রবচনের ব্যবহার ও উপমার মাধ্যমে শব্দের বিভিন্ন দিক, ক্ষেত্র ভেদে প্রয়োগের বিভিন্নরূপ উল্লেখ করে সহজবোধ করে দেন। এটা বড়

www.pathagar.com

উপকারী ও ফলপ্রসূ নীতি। আমি মনে করি লেসানের এদিকটা অতি গুরুত্বের দাবীদার। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এর শরণাপন্ন হওয়া কল্যাণকর। কুরআনী শব্দের মর্মার্থ নির্ণয়ে সময়বিশেষে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের রকমারি উক্তি উদ্ধৃত করার কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ সাধারণ লোকেরা এটাকে বিরাট গবেষণা কর্ম মনে করে থাকে। কেউ কেউ ইমাম রাগেব রচিত 'মুফরাদাত'কে বিশেষ মর্যাদা ও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অবশ্য আনুষঙ্গিকতা বর্জিত খাঁটি কুরআনী শব্দের অভিধান হিসেবে এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জটিলতার সমাধান কামনায় আমি যতবার এর আশ্রয় নিয়েছি, নৈরাশ্য ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।

যোগসূত্র

কালাম তথা কথাবার্তার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র অপরিহার্য অংশ। যার অবর্তমানে মানসম্মত রচনা বা উক্তির কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু চরম অলংকার সমৃদ্ধ ও নির্মল সাবলীলতার শৈলচূড়ায় অবস্থান সত্ত্বেও কতিপয় লোকের নিকট এহেন অলৌকিক ভাষণ মণ্ডিত আল কুরআন যোগসূত্র বিহীন একটি শূন্যগর্ভ কিতাব। যার আয়াত ও সূরাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ভাবতে অবাক লাগে শত্রু-মিত্র সকলের অবিসংবাদিত মতে যে গ্রন্থ গোটা বিশ্বকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, যার মরমী সুরে জগদ্বাসী মুগ্ধ বিমোহিত, যে গ্রন্থ মহাবিশ্বের চিরস্থায়ী চ্যালেঞ্জ, তার ভাষণ বক্তব্য পরস্পর সম্পর্কহীন ফাঁকা বুলি হয় কিরূপে ? যে গ্রন্থ বিশ্বমানবতার চিন্তা-চেতনা নতুন বুনিয়াদে দাঁড় করিয়ে তদুপরি তাকে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম, তার ভাষ্য সূত্রহীন ছাড়াছাড়া—কথাটা বিস্ময়ের ঝাঁকুনি দেয় বৈকি।

কুরআনিক ভাষ্যের অন্তরালে যোগসূত্র কিংবা তরতীব (বিন্যাস ধারা) যদি না-ই থাকে, তবে তা যে ক্রমধারায় নাযিল হয়েছে সে বিন্যাস অনুসারে সংকলন করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু সর্বজন বিদিত কথা কুরআনের সংকলন নাযিল ধারা অনুসরণে হয়নি। হয়েছে নবী করীম (স)-এর নির্দেশে স্বতন্ত্র নিয়মে, যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয়ত সমতার ভিত্তিতে সংকলনেরও একটা সুযোগ ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যা সমপরিমাণে বিন্যাস করে দেয়া। অথচ বাস্তবের সাক্ষ্য এর বিপরীত। ছোট-বড় সব ধরনের সূরাই কুরআনে সন্নিবেশিত। কোনো কোনো ছোট সূরাকে আবার বড়টির পূর্বে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হাফেযদের সুবিধার জন্য অসম সূরা বিভক্তির প্রয়োজন ছিল না। পারায় পারায় বিন্যাসই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সবাই জানে—সূরা-পারার এ ক্রমবিন্যাস, ধারাবাহিক এবং সাজানি নবী করীম (স)-এর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের করণীয় এখানে কিছুই ছিল না। তবে পারা বিভক্তি কার্যত অনেক পরের ঘটনা।

এ সমস্ত কারণের প্রেক্ষাপটে আলেমগণের একাংশ কুরআনের আয়াত কাঠামোর গভীরে যোগসূত্রে জড়ানো মযবুত বাঁধন আকার জোরসমর্থক পূর্ব থেকেই ছিলেন—এখনো আছেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ এ বিষয়ে পুস্তক পর্যন্ত লিখেছেন। আল্লামা

সুয়ূতী তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ইতকানে লিখেন ঃ আল্লামা আবু জাফর বিন যুবায়ের ও শায়খ আবু হাইয়্যান সূরাসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র বিষয়ে "আল বুরহান ফী মুনাসাবাতে তারতীবে ছুয়ারিল কুরআন" শীর্ষক বিশেষ কিতাব রচনা করেছেন। আমাদের সমসাময়িক আলেম শায়খ বুরহানুদ্দীন বেকাঈ রচিত "নসমুদ্দুরার ফী তানাসুবিল আয়ে ওয়াস সূয়ার" (نظم الدرر فى تناسب الاى والسور) শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থটিও একই যোগসূত্রধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে লিখা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী নিজের রচিত একটি কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যাতে তিনি "নযমে কুরআন" (কুরআনের যোগসূত্র) ছাড়া এর মুজিযার দিকটিও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। নযমে কুরআনের গুরুত্ব স্বীকার করে তিনি বলেন ঃ "নযম ও তারতীব (যোগসূত্র ও বিন্যাস) জ্ঞান বড় উচ্চমানের বিষয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল হওয়ার দরুন মুফাস্‌সীরগণ সেদিকে অল্পই দৃষ্টি দিয়েছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বিষয়টাকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি ঃ "কুরআন কারীমের জ্ঞান ভাণ্ডার পারস্পরিক যোগসূত্র ও বিন্যাসের অন্তরালে নিহিত।" তিনি তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا - حم السجده আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন ঃ "কিছু লোকের ধারণা—অসৎ উদ্দেশ্যে যারা মন্তব্য করে—আজমী ভাষায় কুরআন নাযিল হলে উত্তম ছিল। তাদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। যার অর্থ—কুরআনের আয়াতগুলো কেবল একের পর এক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে পরস্পর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার মতে এ ধরনের কথা বলা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঘোর অবিচারের নামান্তর। উপরন্তু একথার ভিতর থেকে আপত্তির প্রতিবাদের একটা প্রচ্ছন্ন সুরও ভেসে উঠে, যা প্রজ্ঞাময় কুরআনের দিকে গড়ায়। এমতাবস্থায় কুরআনকে অলৌকিক মর্যাদায় আসীন বলা তো দূরের কথা সুবিন্যস্ত একটি গ্রন্থ স্বীকার করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে সূরাটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুসংবদ্ধ কালাম বলাটাই সঠিক। (এরপর প্রায় আঠার লাইনে সূরার সংক্ষিপ্ত বাখ্যা ও যোগসূত্র বর্ণনার পর তিনি বলেন ঃ) হকপন্থী কোনো গ্রন্থকারের পক্ষে মেনে নিতে দ্বিধা হওয়ার কথা নয়—আমি যে নিয়মে তাফসীর করেছি একই পন্থা অনুসরণে তাফসীর করা হলে সম্পূর্ণ সূরাটিকে অভিন্ন বিষয়বস্তুর অর্থবোধক মনে হবে। একইভাবে দেখা যাবে এর আয়াতগুলো একক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে যায়।"

আল্লামা মুখদূম মাহায়মী আলোচ্য ধারার একজন বরণ্যে ব্যক্তিত্ব। তাফসীরে মাহায়মী নামে প্রসিদ্ধ 'তাফসীরুর রহমান ওয়া তাইসীরুল মান্নান' শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থে তিনি নিজের অভিরুচি ও স্বতন্ত্র ধারা অনুসারে আয়াতের যোগসূত্র বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। একই মতাবলম্বী অপর ব্যক্তিত্ব আল্লামা ওয়ালীউদ্দীন মালবী নযমে কুরআন সম্পর্কে লিখেন ঃ কুরআন করীম অবস্থার প্রেক্ষাপটে ও ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ার সুবাদে যারা বলেন—এতে যোগসূত্র তালাশ করা অর্থহীন, তারা আসলে ধোঁকায় পড়ে আছেন। কুরআন মজীদ ধীরে এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বিন্যাস ধারায় যে গভীর হেকমত ও সুপ্ত জ্ঞান সাগর নিহিত রয়েছে সেটাও স্মরণ রাখা দরকার।

www.pathagar.com

উপরোক্ত তফসীলী কথার আলোকে একান্ত স্পষ্ট হয়ে যায়—কুরআনের যোগসূত্র আছে কি নেই বিষয়ে একপক্ষের ধারণা ভ্রান্তিকর বটে, কিন্তু প্রথম থেকেই অপর এক দল এমনও রয়েছেন এ ব্যাপারে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি অভ্রান্ত ও পরিশুদ্ধ পর্যায়ের। সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা কালামে এলাহীর খেদমত বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য—যারা যোগসূত্র 'নেই' বলতে আগ্রহী, এ অস্বীকৃতির পথে তারা কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন কিংবা যোগসূত্রহীনতাকেই তারা কালামুল্লার মহিমা ও চমৎকারিত্বে বিশ্বাসী—একথা বলারও কোনো সুযোগ নেই। বরং তাদের অনুসৃত কারণ বলতে গেলে এটাই—কুরআনের স্থানে স্থানে পারস্পরিক যোগসূত্রের অভাব তারা অনুভব করেছে অথচ সমাধান তাদের জানা নেই। এমতাবস্থায় দুর্বল যতই হোক উপায় অবলম্বন একটা পাওয়া গেলেই হলো। তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে কার্পণ্য করেনি।

এক্ষেত্রে কুরআনকে অভিযুক্ত না করে সকল ত্রুটি নিজের উপর চাপিয়ে নিলেই তারা আন্তরিকতা ও ন্যায়নীতির অনুসারী বিবেচিত হতেন। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকানো হলে দুটি বিষয় তাদের পক্ষে যাবে সে কারণে তাদেরকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। একে তো কুরআনের যোগসূত্র তালাশ করতে যাওয়াটাই কার্যত পাহাড় কেটে সাগর বানানোর তুল্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যার জন্য জীবন উৎসর্গ করা সকলের কাজ নয়। যে কেউ তা পারেও না। দ্বিতীয়ত যারা কুরআনে যোগসূত্র থাকার সমর্থক, তাদের খেদমতের যথার্থ মূল্যায়ন স্বীকার করা সত্ত্বেও না বলে উপায় থাকে না—এ অঙ্গনে প্রমাণ সিদ্ধ এমন কোনো অবদান রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যা এক্ষেত্রে প্রাণপাতকারী ত্যাগী পুরুষদের উৎসাহ বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হতে পারে। ওপরে সম্মানিত যে সকল গ্রন্থকারের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের তিনজনের কিতাব অধ্যয়নের সুযোগ আমার হয়েছে। কোনো প্রকার তাচ্ছিল্য না দেখিয়ে এবং অবমূল্যায়নের ভাব পরিহার করেও আমি সবিনয় আরয করতে চাই, তাঁদের কারো গ্রন্থ থেকেই সমস্যার সমাধান কিংবা জটিলতা নিরসনে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাওয়া থেকে আমাকে বঞ্চিতই থাকতে হয়েছে। মাহায়মী ও ইমাম রাযীর তাফসীর গ্রন্থ দীর্ঘ দিন আমি অধ্যয়ন করেছি। ইমাম রাযীর তাফসীর তো আমার হাতের কাছেই, অধ্যয়নও করে থাকি। কিন্তু বলতে কি—তাতে যে ধরনের যোগসূত্রের কথা তাঁরা উল্লেখ করতে চান, সে সূত্র দ্বারা পরস্পর সম্পর্কহীন যে কোনো দুই জিনিসকে একত্রে জোড়ানো সম্ভব।

অথচ কার্যত এখানে প্রয়োজন ছিল কুরআনের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রকে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা। যা পাঠ করে মুক্তমনের পাঠক মাত্রই সেটিকে অন্তরের আওয়াজ হিসেবে বিবেচনা করে নেয়। কিন্তু নৈরাশ্যজনক ও অকার্যকর কিছু উক্তি ছাড়া কল্যাণবাহী কোনো সমাধান অথবা নির্দেশনা লক্ষ করা যায় না। ফলে যোগসূত্র তালাশ করাকে লোকেরা "পাহাড় কেটে ঘাস বহন" প্রবাদের অর্থবোধক মনে করে নিয়েছে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম স্বার্থক ও ফলপ্রসূ অবদান আমার উস্তাদ মাওলানা হামীদুদ্দীন ফরাহীর। জোরালো যুক্তি ও গ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে বিষয়টাকে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সূরার স্বার্থক যে ব্যাখ্যা তিনি

www.pathagar.com

দিয়েছেন, যেগুলো নিরপেক্ষ মনে অধ্যয়ন করা হলে অনায়াসে বুঝা যাবে প্রতিটি সূরা চমৎকার যোগসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে। এর মনোহারী চিত্র যেন মনের আকাশ দীপ্তিময় করে আছে। অধিকন্তু "দালায়েলুন্নেযাম" নামে মাওলানার একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে আছে। যা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভ হয়নি। কিন্তু মাওলানার তাফসীরের কিছু অংশ এবং তাফসীরের ভূমিকা আরবী-উর্দু উভয় ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। সেগুলো যথাযথ অধ্যয়ন করা হলে ন্যায়পন্থী ও বিবেকবান যে কোনো ব্যক্তিকে দুটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। (ক) কুরআনের মধ্যে যোগসূত্রের অবস্থান অস্বীকার করা মস্ত বড় যুলুম। (খ) কুরআনের হেকমত ও জ্ঞানভাণ্ডার মূলত এর যোগসূত্রের অন্তরালে নিহিত। মাওলানা যদি আর কিছু দিন বেঁচে থাকার সুযোগ পেতেন আর তাফসীর গ্রন্থটি সমাপ্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো, তাহলে বিরুদ্ধাবাদী লোকদের বিপক্ষে একটি মযবুত ও প্রমাণ সিদ্ধ দলিল হতো তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমাদের নিছক দুর্ভাগ্যই বলতে হবে—তাফসীরের সামান্য অংশই তাঁর পক্ষে লিখা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষত বড় সূরার কোনো একটিও শেষ করার সুযোগ তিনি পাননি। বিষয়টা কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা বিচিত্র নয়—অপেক্ষাকৃত ছোট সূরার নযম বর্ণনায় তিনি সফল হয়েছেন বটে, তাই বলে বড় সূরার যোগসূত্র ব্যাখ্যায়ও তদ্রূপ কামিয়াব হবেন এমন কোনো কথা নেই। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতার সম্ভাবনাও তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। সন্দেহ নেই সূরা আল বাকারা, সূরা আলে ইমরান ইত্যাদি বড় বড় সূরার যোগসূত্র ব্যাখ্যায় দৃশ্যত যে পরিমাণ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, ছোট সূরার বেলায় তদ্রূপ হতে হয় না। বিশেষত সূরা আল বাকারার সুপ্ত জট খুলতে যাওয়া তো রীতিমত দুঃসাহসিক অভিযান সমতুল্য। এ ধারণার বশতবর্তী হয়েই তাফসীরের কাজ আমি সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করেছি। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের জটিলতা নিরসনে যদি আমি কামিয়াবীর মুখ দেখতে পাই, তাহলে মানুষের মনের সন্দেহ দূরীকরণে এটি বিশেষ কার্যকর প্রমাণিত হবে বলে আমার ধারণা। আমার সে প্রচেষ্টা কতটুকু সফল কি বিফল সে বিবেচনা পাঠকবৃন্দের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়াই সমীচীন মনে করি। তবে এতটুকু জোর গলায় বলতে পারি যাকিছু লিখেছি বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব এবং নিজের ওপর পূর্ণ আস্থাসহকারে লিখার চেষ্টা করেছি। কোথাও অতিরঞ্জন কিংবা বানোয়াটের আশ্রয় না নিয়ে সত্য ও সাবলীল পথে এগিয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা আমি একান্তই স্বীকার করি যা থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করা ধৃষ্টতার নামান্তর। (ক) হয়তো কোনো বিষয়ের মর্ম উদ্ধারে আমার বিবেক ব্যর্থ হয়েছে। ফলে কথাটা সঠিক অর্থে আমি বুঝে উঠতে পারিনি। অথবা (২) বুঝে এসেছে, কিন্তু লিখতে গিয়ে কলম আমাকে সাহায্য করেনি। সে কারণে কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

দুটি প্রশ্ন এবং তার জবাব

নযম বা যোগসূত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করে না এমন সব লোকেরা সাধারণত দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। প্রথমত, কুরআন কারীমে যোগসূত্র যদি থেকেই

www.pathagar.com

থাকে, তবে সেটা নিছক সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজাতীয় বিষয়। যার ওপর কুরআন বুঝা কিংবা না বুঝা নির্ভর করে না। এমতাবস্থায় এর ওপর এত জোর দেয়ার কি প্রয়োজন ? দ্বিতীয়ত এতে নযম যদি থাকেই তবে এত সূক্ষ্ম ও এত গোপন থাকার কি অর্থ যে, এর সন্ধান পেতে বছরের পর বছর একনিষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন পড়ে। এরপরও যে কেউ তার নাগাল পায় না। বরং নগণ্য কয়েকজনই কেবল সে পরশমণির সন্ধান পেয়ে থাকে। প্রশ্ন দুটির জবাবে আমি সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

যোগসূত্রের মর্যাদা ও মূল্যমান

কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও ভাবের সাথে যোগসূত্রের নিবিড় কোনো সম্পর্ক নেই মনে করা এবং ভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে এর মর্যাদা ও মূল্যবান অস্বীকার করত একে নিছক জ্ঞানগত সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিশারী সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর কথা। আমরা তো বরং এর মূল্যমান এভাবে নির্ধারণ করে থাকি যে, কুরআনী হেকমত ও জ্ঞান ভাণ্ডারে পৌঁছতে হলে একমাত্র এর মাধ্যমেই সম্ভব। তাই আমাদের মতে যোগসূত্রের নির্দেশনা ছাড়া কুরআন অধ্যয়নকারী ব্যক্তি বড়জোর বিচ্ছিন্ন কতিপয় বিধিবিধান আর আলগা ধরনের কিছু হেদায়েত লাভে সক্ষম হতে পারে—এর বেশি কিছু নয়। অবশ্য আল কুরআনের ন্যায় একটি মহাগ্রন্থের ছিন্নই হোক আর আলগা যে কোনো হুকুম-হেদায়েত লাভ করতে পারা কম কথা নয়। তবে পারিবারিক চিকিৎসার বই পড়ে কয়েকটা জড়িবটির দ্রব্যগুণ জেনে নেয়া আর বিজ্ঞ চিকিৎসক সেটাকে রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবন রক্ষাকারী ঔষধে রূপান্তর করার মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান। তাজমহল নির্মাণে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, পৃথকভাবে তার দু একটা মসলা অন্যান্য ইমারতে লাগানো হতে পারে—সন্দেহ নেই। কিন্তু তাজমহল দুনিয়াতে একটাই—যার কোনো বিকল্প কিংবা দ্বিতীয় নেই। আরবী ভাষা-ব্যাকরণ ও বাকরীতি অনুসারেই কুরআনের শব্দ ও বাক্য সমষ্টি গঠিত, এত সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আসমানী বিন্যাসধারা একে যে পূর্ণতা ও ভাব মাধুর্যের শৈলচূড়ায় আসীন করেছে, জগতের কোনো জিনিস তার মোকাবিলা করতে পারে না।

বংশের যেমন প্রবাহ থাকে, যার মাধ্যমে নিম্ন পুরুষেরা নিজেদের আদি পুরুষের সাথে মিলিত হয়। সমাজ জীবনে আবার তাদের নামে পরিচিতিও পায়। ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডও তদ্রূপ প্রবাহের তোড় বেয়ে আপন উৎসে পতিত হয়। কোনো সময় একটি সৎকাজকে আমরা সাধারণত. সৎকাজ মনে করি। অথচ তার সম্পর্ক সেই উৎসের সাথে, যার অঙ্গন থেকে কর্মটির কাণ্ড-শিকড়, শাখা-প্রশাখা উৎসারিত ও বিকশিত হয়েছে। মন্দের বেলায়ও একই কথা। কোনো সময় একটি অসৎকাজকে আমরা আমলে আনতে চাই না। গুরুত্ব দিতে অবহেলা করি। অথচ তার যোগসূত্রের অপর প্রান্ত ডিপোর একেবারে অতল ছুঁইয়ে আছে। যেখান থেকে জীবন বিনাশী রোগ জন্ম নেয় আর আক্রান্ত মানব গোষ্ঠীকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়। ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধ ও দীনের হেকমত যে ব্যক্তি জানতে আগ্রহী, ভাল-মন্দ, সৎ-অসতের পার্থক্য, গুণগত পরিচয় এবং পর্যায়ক্রমিক গতিধারা অবশ্যই তাকে জানতে হবে। নতুবা যক্ষ্মা রোগের

www.pathagar.com

আলামতকে সর্দী জ্বরের লক্ষণ আর সর্দীর উপসর্গ দেখা দিলে ক্ষয়রোগের আগমনী বার্তা সাব্যস্ত করে বসা তার পক্ষে বিচিত্র নয়। এমনকি আশংকা প্রবল বলাই সমীচীন। কুরআনের এ তত্ত্বকথা কালামের অংশ দ্বারা নয়, পূর্বাপর মিলিয়ে পূর্ণ বিষয়বস্তুর আলোকেই বরং স্পষ্ট হতে পারে। কেউ যদি একটি সূরার আয়াতসমূহের পারস্পরিক তত্ত্বপূর্ণ যোগসূত্র বিষয়ে অবগতি লাভ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে কেবল পৃথক পৃথক আয়াতের অনুশীলন দ্বারা তার সে জ্ঞান আদৌ আসতে পারে না।

কুরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় নৈতিক আলোচনার সমর্থনে মানব প্রকৃতি-আত্মিক, ঐতিহাসিক ও নভোমণ্ডলীয় প্রমাণ উপস্থিত করেছে। সেগুলো যুক্তিভিত্তিক তারতীব ও দর্শনপূর্ণ বিন্যাস ধারায় সুসজ্জিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। সুসংবদ্ধ এ তারতীব যার দৃষ্টিতে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠে, একান্ত অভিনিবেশ এবং পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সূরাটি অধ্যয়নকালে তার স্বতঃস্ফূর্ত ধারণা হবে, আলোচ্য বিষয়বস্তুর ওপর সে একটি প্রমাণসিদ্ধ, ব্যাপক-সুসংহত ও মর্মস্পর্শী ভাষণ পাঠে নিমগ্ন রয়েছে। পক্ষান্তরে সে তারতীব তথা বিন্যাসধারা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি খণ্ড বিষয়ে একটা আবছা ও অস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে বটে, কিন্তু সূরায় বর্ণিত হেকমত ও তত্ত্বজ্ঞানের পরশ থেকে তাকে পুরোপুরি বঞ্চিতই থাকতে হবে। এটা হলো আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও একটা বাঞ্ছিত দিক। অপরদিকে এর সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের গুরুত্বও কম করে দেখার উপায় নেই।

মুসলিম জাতির ঐক্য আল্লাহর রশি দিয়ে বাঁধা, কথাটা সকলের জানা। বলা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে নয় আল্লাহর সে রশিকে তোমরা শক্ত হাতে ধর এবং সম্মিলিতভাবে। অতএব আমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনের ফায়সালাকে চূড়ান্ত সমাধানরূপে মেনে নেয়াটাই এ আদেশের স্বাভাবিক চাহিদা। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হয়—যে কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা আমাদের ঈমানের দাবী, স্বয়ং সে কুরআন সম্পর্কেই আমরা ঐকমত্যের প্রমাণ দিতে সক্ষম হই না। একই আয়াতের শত ব্যাখ্যা শত মত। যা বিপরীত অর্থ বহন করে ভিন্ন পথে ছুটে। অথচ নিজেদের কাছে এমন কোনো জিনিসও নেই যদ্দারা সঠিক-সত্য মতটি বেছে নেয়া যায়। কোনো কথার ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা দিলে তার পূর্বাপর সম্পর্ক এবং আনুষঙ্গিক পরিবেশ পরিস্থিতি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত নেয়াটাই হল তা দূর করার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপায়। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে সর্বনাশা বিপদ হলো, এর মধ্যে যে পূর্বাপর সম্পর্ক ও গভীর যোগসূত্র জড়িয়ে আছে সে কথাটা লোকেরা স্বীকারই করে না। ফলে দুর্গতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে সৃষ্ট মতবিরোধগুলোর সুরাহা তো হয়ইনি, বরং এর প্রত্যেকটি নিজস্ব ধারায় শক্তি সঞ্চয় করে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। আমাদের ফেকাহ শাস্ত্রীয় বহু মতবিরোধ শুধু পূর্বাপর সম্পর্ক ও অন্তর্নিহিত যোগসূত্র তলিয়ে না দেখার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আগে-পিছের সম্পর্ক ও যোগসূত্র বিবেচনা করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে একের অধিক দ্বিতীয় মতের কোনো অবকাশই পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

ফেকাহর মতানৈক্য যতটুকু ক্ষতিকর তার চেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ ক্ষতি করেছে আমাদের সমাজের বেদাতী ফের্কাগুলো। যার যার সমর্থনে দলীল হিসেবে এদের অধিকাংশই আশ্রয় নিয়েছে কুরআন কারীমে। পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে আয়াতের ভিতর মনগড়া অর্থ ঢুকিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার কৌশল এরা উত্তমরূপে কাজে লাগিয়েছেন। ব্যস—শব্দ এখন শূন্য ঘরে এসে গেল। এবার তাকে নিজস্ব অর্থের পোশাকে সাজাও, বানোয়াট মর্মের লেই দিয়ে মেরামত কর, সবই সহজ —সবই কুরআন। ঠেকায় কে ? এভাবে শব্দের খোলসে এমন অর্থ ঢোকানো যায়, স্বয়ং বক্তা যার কল্পনাই করেনি। এ জাতীয় বহু আয়াতের উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যায়- যেগুলো ভাষণ-বক্তৃতায় অহরহ উচ্চারিত হয়, বই-পুস্তকে দেদারসে লিখা হয়— যেগুলো নিতান্ত ভুলই নয়, মানুষকে গোমরাহীর পথেও ঠেলে দেয়। কিন্তু কথা লম্বা হওয়ার ভয়ে তা থেকে আমি বিরত রইলাম। একদিকে অবস্থা এই। অপরদিকে কোন্ পরিবেশে আয়াত নাযিল হয়েছে, তখন পরিস্থিতি কি ছিল এবং এর সাথে পূর্বাপর সম্পর্কই বা কি ? এসব কথা তলিয়ে দেখার ভাগ্য কারো হয় না। মোটকথা তাদের মতে কুরআনী আয়াতের গভীরে পারস্পরিক সম্পর্ক, পূর্বাপর যোগসূত্র, নাযিল হওয়াকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অথচ অনিবার্য বিষয়গুলোর কোনো গুরুত্ব আছে বলে আদৌ মনে হয় না। এ বিষয়ে তারা মাথা ঘামাতেও রাজি নয়।

আলোচ্য তাফসীর গ্রন্থে যোগসূত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিধায় আগাগোড়া সর্বত্র আমি একই মত অনুসরণ করেছি। অন্য কথায় অভিন্ন ও একক মত অনুসরণে আমি বাধ্য হয়েছি। কারণ আমার মতে যোগসূত্রকে অপরিহার্য বিষয় ও অনিবার্য দিশারী স্বীকার করত লক্ষপানে অগ্রসর হলে মতবিরোধের তেপান্তরে চক্কর খাওয়ার প্রশ্নই থাকে না। কোনো সহীহ-শুদ্ধ বিষয়টি তখন জীবন্ত আকারে সামনে এমনভাবে উপস্থিত হয়—কেউ যদি একেবারে অন্ধ, বোবা কিংবা পক্ষপাতিত্ব রোগে আক্রান্ত না হয়, তবে সে জীবন দিতে পারে, কিন্তু তাকে পরিত্যাগ এমন কি সামান্য উপেক্ষার নযরে দেখাও তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

যোগসূত্র বিষয়ক প্রশ্ন

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হতে পারে—কুরআন বুঝার জন্য যোগসূত্রের গুরুত্ব যখন অপরিসীম, যার বিকল্প চিন্তা করা যায় না। এমতাবস্থায় একে এত গোপন রাখার কি অর্থ—যার জট খুলে স্পষ্টতার আলোকে আনতে ইমাম রাযীর ন্যায় প্রাজ্ঞ মনীষীর চেষ্টা-সাধনা পর্যন্ত পুরোপুরি কামিয়াব হতে পারেনি ? এর জবাব কয়েক প্রকারে দেয়া যায়।

প্রথমত, গভীর দৃষ্টিতে চিন্তার আশ্রয় নিলে অনায়াসে বুঝা যাবে এ প্রশ্ন আসলে কুরআনের প্রতি আসেই না। আমরা নিজেরাই বরং এর আওতায় পড়ে যাই। কেননা কুরআন প্রথম অবস্থায় যাদেরকে সম্বোধন করেছে, তাদের মধ্যে কোনো জটিলতা ছিল না, প্রশ্নেরও অবকাশ দেখা দেয়নি। ভাষা তাদের নিজস্ব, পারিপার্শিক অবস্থায় তারাই

www.pathagar.com

জড়িত। দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যা, নিত্য দিনের আপত্তি-অভিযোগ ইত্যাকার যাবতীয় প্রশ্ন তাদের আপন ঘরের বিষয়। কুরআন যাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছে তারা সবাই উপস্থিত। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা আর লালিত মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত। ভাব ও ভাষার সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু এসবই তাদের একান্ত জানা শোনা ব্যাপার। যে কারণে কুরআনের অতি সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিতের মর্ম উদ্ধার করতে তাদের বেগ পাওয়ার প্রশ্ন ছিল অবান্তর। কোনো আয়াত নাযিল হলো—অমনি তার ইশারা-ইঙ্গিত, নাড়ী নক্ষত্র তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এমনকি আয়াতের ভাব-দর্শন লুফে নিতে তাদের জটিলতা আর অসুবিধা নামের কোনো জঞ্জালের ছায়া মাড়াতে হয়নি। এ তো গেল সাধারণ আরবদের হাল-অবস্থা। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে যারা ছিলেন সমাজের উচ্চ পর্যায়ের, চিন্তাশীল, প্রজ্ঞাবান, তদুপরি অবস্থা ও পরিবেশের সাথে নিজেরা জড়িত ও সম্পর্কযুক্ত, তাদের পক্ষে আয়াতের উদ্দেশ্য না বুঝার, মর্ম উদ্ধারে সক্ষম না হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। কিন্তু আমাদের অবস্থা সর্বদিক থেকে ভিন্নতর। ভাষা আমাদের অপরিচিত, পরিবেশ-পরিস্থিতি আমরা জানি না, নিত্যদিনের সমস্যার সাথে আমরা জনিত নয়। আর সময়ের হিসেবে তো আমরা দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে। এহেন পরিস্থিতিতে কুরআনের মর্ম উদ্ধারে আমাদের জটিলতার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অবশ্য ব্যবহারিক ও চারিত্রিক প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় জেনে নেয়া ভিন্ন কথা এবং আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। কিন্তু কেউ যদি যোগসূত্র বিষয়ক সূক্ষ্ম ও তত্ত্বকথা, বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিকতা এবং কালামের রহস্য ও মূল তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়, তাহলে স্বতসিদ্ধ কথা প্রথমত কুরআনের ভাষা শিক্ষা করে ভাষাগত অন্তরায় দূর করতে হবে। অতপর মেধা ও চিন্তার প্রবাহ বৃদ্ধি এবং পরিধির বিস্তার ঘটিয়ে কালের ব্যবধান ঘুচাতে হবে। যাতে পাঠক ও কুরআন অবতরণ কালের মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধান দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ উদ্দেশ্য কেবল গভীর চিন্তা ও জ্ঞান সাধনার গতিশীল অনুশীলনের মাধ্যমেই হাসিল হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কোনো বিষয়ের আংশিক ও সমষ্টিগত জ্ঞানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। খণ্ডিত অংশের জ্ঞান লাভ করা তুলনামূলক সহজ। কিন্তু দীর্ঘ সাধনা ছাড়া সমষ্টিকে জানা সম্ভব হতে পারে না। বাক্যটা কিরূপে বিন্যাস দেয়া হয়েছে। পরস্পর সাজানো শব্দগুলো কার সাথে কি সম্পর্ক ? সে বিষয়ে জানাটাই যোগসূত্রের মূল কথা। অবশ্য অমুক আয়াতের সাথে অমুক আয়াতের সম্পর্ক এই—কেবল এতটুকু নির্দেশ করাই এর মূল উদ্দেশ্য নয়। কার্যত যোগসূত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো—দীন ও আখলাক-চরিত্রের অংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করা। উদ্দেশ্য হিসাবে যার মর্যাদা অতি উচ্চে এবং কুরআনের হেকমত বা তত্ত্ব ও দর্শন মূলত এটাই আর হেকমত একটি গোপন ভাণ্ডার। যার সন্ধান পেতে অক্লান্ত সাধনা ও বিরাট ত্যাগ-তিতিক্ষার আশ্রয় নিতে হয়। কেউ যদি কেবল বাস্তব জীবনে করণীয় ও আমলযোগ্য হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধানগুলো জানতে চায়, তাহলে কুরআন গবেষণায় বেশী গভীরে না গিয়ে অধিক

www.pathagar.com

পরিশ্রমে জড়িয়ে শুধু ভাসা নযরে পাঠ করে যাওয়াই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি দীনের হেকমত, কুরআনের দর্শন ও ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধ জানতে আগ্রহী, কুরআন গবেষণায় আত্মনিয়োগ হলে জীবনপাত সাধনা ছাড়া তার জন্য বিকল্প কোনো উপায় চিন্তা করা যায় না।

তৃতীয়ত, কুরআন বিজড়িত আরবী ভাষার এমনকিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একান্তভাবে কেবল তারই। অন্য কোথাও এর সংশ্লিষ্টতা নেই বললেই চলে। নিজের দাবী প্রমাণ করার জন্য যে পরিমাণ শব্দের প্রয়োজন-ততগুলো শব্দের সাহায্য নেয়া এবং যে পরিমাণ শব্দ প্রয়োগ করাই উচ্চতর অলংকার মণ্ডিত আরবী (بليغ عربى) ভাষার নিয়ম। সীমা অতিক্রম করে কেউ যদি অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করে এবং কথা বাড়িয়ে বলে, তাহলে আরবী অলংকার শাস্ত্রীয় বিধান মতে এটা দূষণীয়। এটাকে বক্তার অক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আরবের অধিবাসীরা জন্মগতভাবে প্রখর ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিল। তাই আপন বুদ্ধিমত্তাবলে শ্রোতা বুঝে নিতে পারতো অথবা বুঝে নেয়া উচিত, এমন সব শব্দগুচ্ছ কালামের ভেতর থেকে বিলোপ করে দেয়া ছিল তাদের বাকরীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন নাযিল হওয়াকালীন আরবী সাহিত্য ও কুরআন গবেষণা দ্বারা তাদের ব্যবহারিক বহু নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলোর অনুসরণে তারা এ সংক্ষেপ ও বিলোপ কার্য সাধন করে নিত। আমার উস্তাদ মরহুম মাওলানা ফরাহী 'কিতাবুল আসালীব' শীর্ষক পুস্তকে সে নিয়মগুলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুবিন্যস্ত ধারায় বর্ণনা করেছেন। এ স্বল্প পরিসরে সে নিয়মগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা আমি সমীচীন মনে করি না। তবে আমি উদাহরণ স্বরূপ তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে চাই। যেমন আমাদের ও আরবদের বাকরীতির কথাটাই ধরা যাক। একটি কথা বলার পর তার স্বপক্ষে দলীল, উপমা, ফলাফল, সম্পূরক অথবা অন্য কোনো দিক উল্লেখ করতে চাইলে পূর্বাপর উভয় কথার মধ্যকার যোগসূত্র অবশ্যই আমরা পুনরালোচনা করে থাকি। এটা আমরা করি কথাটা অধিক স্পষ্ট করার জন্য। এজন্য আমাদের ভাষায় বিভিন্ন নিয়ম ও একাধিক শব্দের প্রচলন রয়েছে। যার সাহায্য ছাড়া আমরা অগ্রসর হতে পারি না। কিন্তু এক্ষেত্রে আরবদের ব্যবহার স্বতন্ত্র ধরনের। যোগসূত্র ও মাধ্যমের পুনরুল্লেখ পরিহার করে তারা শ্রোতার বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে। তাদের কথা হলো—যতটুকু দরকার আমি বলেছি, বাকিটা স্মরণ হলে সে পূরণ করে নিক। আরবদের নযরে এটাই পাণ্ডিত্য, ভাষালংকার এরি অন্তরালে নিহিত। কিন্তু যোগসূত্রের এ বিলুপ্তিটাই আমাদের বাগধারায় ব্যবহারিক জটিলতা ডেকে আনে। আমাদের বাগ ব্যবহারে যোগসূত্রের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব নেই বিধায়, তদুপরি এ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন অজ্ঞতার কারণে প্রত্যেক কথাকে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে বসি।

চতুর্থত, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর কালাম সুবাদে পূর্বাপর সমস্ত জ্ঞান তাতে সন্নিবেশিত রয়েছে। বিগত চৌদ্দশ বছরের ন্যায় কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবকে সে পথ দেখার, সত্যের সন্ধানে ধন্য করবে। জ্ঞানের যে সাগর, মা'রেফাতের যে খনি তাতে

লুকিয়ে আছে, সারা দুনিয়ার মানুষ নিজ নিজ পাত্র ভরে আহরণ করা সত্ত্বেও তার সুপ্ত খাজানায় সূচাগ্র পরিমাণ কমতি হবে না। কেননা এই যে অফুরন্ত ভাণ্ডার, যার সীমা নেই, শেষ থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআনের সে জ্ঞান ভাণ্ডার আল্লাহ তার শব্দ ও যোগসূত্রের অন্তরালে গোপন রেখেছেন। তাই পঠন-পাঠনে সরল হলেও এটা এত সহজবোধ্য কিতাব নয় যে, দু চার বার পাঠ করেই আপনি যার গুপ্ত রহস্য ও আসল মর্ম উদ্ধারে সক্ষম হয়ে যাবেন। এর অবস্থা মূলত মাটির তলে লুকায়িত খনির ন্যায়, যার দু-দশ হাত উত্তোলনের পর পদার্থ ফুরিয়ে যায় না। বরং খোদাই করে করে এর যত গভীরে যাওয়া হবে সম্পদ কেবল বের হতেই থাকবে। যে কারণে একে শুধু দু-চার বার পাঠের আদেশ দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, বার বার পড় আর চিন্তা কর, আজীবন করতে থাক।

আল কুরআনের সার্বিক যোগসূত্র

ওপরে এ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের কথাই কেবল বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি সূরা নির্দিষ্ট একটি একক। যার অংশগুলো পৃথক শিরোনাম ও স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এবার আরেকটু অগ্রসর হয়ে আমি বলতে চাই—একইভাবে অপর একটি সামগ্রিক সূত্র আছে, যা আদ্যোপান্ত গোটা কুরআনী ভাব-মর্মকে আপন গাঁথুনিতে জড়িয়ে রেখেছে। আর সে সূত্রের যাহের বাতেন দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি দৃশ্যমান-সকলেই যাকে দেখতে ও মোটামোটি জ্ঞান থাকলে বুঝে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি গুপ্ত ও অদৃশ্য। গভীর অধ্যয়ন এবং অক্লান্ত সাধনা বলেই কেবল এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। উভয় দিক সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইচ্ছা রয়েছে। প্রথমে যাহেরী দিকের কথায় আসা যাক।

সামগ্রিক যোগসূত্রের যাহেরী দিক

কুরআনের সূরাগুলো বর্তমানে যে ধারবাহিক প্রক্রিয়ায় সাজানো রয়েছে, তার আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায় মক্কী-মাদানী মিলিয়ে সূরাগুলো সাত গ্রুপে বিভক্ত। এর প্রত্যেকটি গ্রুপ এক বা একাধিক মক্কী সূরা দ্বারা শুরু হয়ে এক বা একাধিক মাদানী সূরা দ্বারা শেষ হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রুপের শুরু মক্কী আর শেষে মাদামী সূরার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

১. প্রথম গ্রুপটি সূরা ফাতিহা থেকে শুরু হয়ে সূরা মায়েদা পর্যন্ত শেষ হয়েছে। এ গ্রুপে সূরা ফাতিহা মক্কী বাকী চার সূরা মাদানী।

২. সূরা আনআম-আরাফ দুটি মক্কী সূরা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা আনফাল-তাওবা দুটি মাদানী সূরা দ্বার দ্বিতীয় গ্রুপ সমাপ্ত হয়েছে।

৩. সূরা ইউনুস থেকে সূরা মু'মিনূন পর্যন্ত চৌদ্দটি মক্কী সূরা দ্বারা তৃতীয় গ্রুপ শুরু হয়ে মাদানী সূরা আন নূরে শেষ হয়েছে। এ গ্রুপের সূরা আর রা'দ ও সূরা হজ্জ সূরা

www.pathagar.com

দুটিকে কেউ কেউ মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু এ ধারণা ভুল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে তাফসীরে করা হবে।

৪. ফুরকান থেকে সূরা আহযাব পর্যন্ত সূরা সমষ্টির সমন্বয়ে চতুর্থ গ্রুপ গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম আটটি সূরা মক্কী আর শেষের সূরা আহযাব সূরাটি মাদানী।

৫. পঞ্চম গ্রুপ সূরা আস সাবা থেকে শুরু হয়ে সূরা হুজরাতে সমাপ্ত হয়েছে। এতে প্রথম তেরটি মক্কী শেষের তিনটি মাদানী সূরা।

৬. ষষ্ঠ গ্রুপ সূরা কাফ থেকে শুরু হয়ে সূরা আত তাহরীমে শেষ হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম সাতটি মক্কী শেষের দশটি মাদানী সূরা। অবশ্য কেউ কেউ সূরা আর রহমানকে মাদানী বলে উল্লেখ করেছেন। যথাস্থানে সূরার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনাকালে এ উক্তির অসারতা প্রমাণ করা হবে।

৭. সূরা মুল্‌ক থেকে শুরু হয়ে সূরা আন নাস পর্যন্ত সপ্তম গ্রুপ শেষ হয়েছে। আমাদের মতে অন্যান্য গ্রুপের ন্যায় এতেও মক্কী-মাদানীর ধারাবাহিকতা রয়েছে। কিন্তু সূরা দাহ্‌র ও শেষের কয়েকটি সূরার ব্যাপারে মতবিরোধ থাকার দরুন এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা যথাস্থানে তাফসীরে করাটাই আমি সঙ্গত মনে করি।

জ্ঞানী মাত্রেরই জানা থাকার কথা—সূরা সমষ্টির এ ধারাবাহিকতা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত, কাকতালীয় ঘটনা আদৌ হতে পারে না। লাওহে মাহফুযে যে তারতীবে কুরআন করীম সংরক্ষিত, নবী করীম (স) প্রতি রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে যে তারতীব অনুসারে কুরআন পাঠের পারস্পরিক অনুশীলন করতেন বর্তমানের সূরা সমষ্টি সে একই তারবীবে ও অভিন্ন ধারাবাহিকতায় সংকলিত হয়েছে। একই তারতীবে সাহাবীগণ (রা) পরস্পর কুরআনের তেলাওয়াত শুনতেন—অপরকে শুনাতেন। হযরত ওসমান গনী (রা)-ও এ একই তারতীব অনুসারে কুরআনের বিভিন্ন কপি সংকলন করতঃ ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এ তারবীব হেকমত ও প্রজ্ঞার পরশ শূন্য কল্পনা করা যায় না।

সামগ্রিক যোগসূত্রের গোপন দিক

উপরোক্ত সাতটি গ্রুপকে সামনে রেখে একনিষ্ঠ মনে বারংবার অধ্যয়নের আশ্রয় নেয়া হলে আদিগন্ত বিস্তৃত কুরআনী তারতীবের অন্তরালে কত যে হেকমত, রাশি রাশি তত্ত্বজ্ঞানের কি বিশাল ভাণ্ডার যে লুকিয়ে রয়েছে, তার জীবন্ত ছবি অনায়াসে ভেসে উঠতে পারে। যার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রতিটি সূরার একটি আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট থাকে। যার সাথে সূরার অশংগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে এবং একে কেন্দ্র করেই সেগুলোর আলোচনাধর্মী আবর্তন চলতে থাকে। তদ্রূপ প্রতিটি গ্রুপেরও একটা সামগ্রিক বিষয়বস্তু রয়েছে। যার সাথে গ্রুপ ভুক্ত সূরাগুলোর নাড়ীর সম্পর্ক। বলা বাহুল্য প্রত্যেক গ্রুপে আলোচ্য বিষয়বস্তুর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে মূলত অভিন্ন বটে, কিন্তু সে অভিন্নতার সাথে সামগ্রিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য সর্বত্র বিরাজমান। প্রতি গ্রুপের বিষয়বস্তু নিয়ে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। বরং সে আলোচনার উপযুক্ত জায়গা মূলত তাফসীর পর্বে এবং প্রতি গ্রুপের ভূমিকা বর্ণনায়। তবে দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে এতটুকু স্মরণ রাখুন—কোনো গ্রুপে শরীআতের বিধিবিধান ও হুকুম-আহকামগত বিবরণের প্রাধান্য, কোনো গ্রুপে মিল্লাতে ইবরাহীমের ইতিহাস-ঐতিহ্য, নিয়ম-নীতি, কোনো গ্রুপে হক-বাতিলের সংঘর্ষ এবং এ ব্যাপারে ইলাহী প্রতিবিধানের ব্যাখ্যা-বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। কোনো গ্রুপে আবার দেখা যাবে রেসালাতের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। কোনোটাতে তাওহীদ প্রসঙ্গ, তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং তাওহীদের দাবী বর্ণিত হয়েছে। কোনো গ্রুপে হাশর নশর ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচানা। অধিকাংশ মক্কী সূরা সমন্বয়ে গঠিত সর্বশেষ গ্রুপে রয়েছে ভীতি প্রদর্শনকারী ধমকের সুর। যা গোটা আরব ভূ-খণ্ডে তোলপাড় ও আলোড়ণ সৃষ্টি করে দেয়।

২. গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হলে প্রত্যেক গ্রুপের মাদানী সূরাগুলো মর্ম ও ভাবগত দিক দিয়ে গ্রুপের সামগ্রিক ভাবধারার সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম। অনুরূপ সে গ্রুপের মক্কী সূরার সাথেও শিকড়-শাখার ন্যায় ভাব সাদৃশ্যের একটা অনাবিল সম্পর্ক বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়।

৩. এক সূরায় কোনো বিষয় অস্পষ্ট বর্ণিত হলে সে গ্রুপের অন্য সূরা বিষয়টিকে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করে দেয়। অর্থাৎ সূরাগুলোর বর্ণনাধারা একে অপরের শূন্যতা পূরণ করে দেয়। যে কারণে গ্রুপভুক্ত সূরাগুলো পরস্পর সমার্থবোধক হিসেবে ভাবের সেতু রচনা করত বর্ণনার আকাশে যেন মনিকজোড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কথায় উভয়ের মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের সম্পর্ক বলা যায়। বড় সূরার মধ্যে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান, ছোট সূরার মধ্যে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের দৃষ্টান্ত মনে করুন। সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন সমধর্মী ও জোড়ায় জোড়ায় সৃজিত, একই নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোকেও সমার্থবোধক ও সমভাবের আদলে জোড়ায় জোড়ায় বিন্যাস দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—নবী করীম (স) নামাযে কুরআন তেলাওয়াতকালে সাধারণত ভাবের মিল রেখে সূরা চয়ন করতেন। মনে হতো পঠিত সূরাগুলো যেন একই ভাবের সূতায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সে মতে প্রায় তিনি সূরা কিয়ামার সাথে সূরা আদ দাহর, সূরা আস সফের সাথে সূরা জুমুআ এবং সূরা আ'লার সাথে সূরা গাশিয়া মিলিয়ে নামায পড়তেন।

৪. অবশ্য একমাত্র সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের ভূমিকা সুবাদে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। সূরা ফাতিহার তাফসীরে আমি আলোচনা করেছি—এটি যেমন আপন গ্রুপের ভূমিকা পর্যায়ের, তদ্রূপ একে সমগ্র কুরআনেরও ভূমিকা সাব্যস্ত করা যায়। কেননা এর সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমগ্র কুরআনের মৌলিক বিষয়গুলো সমন্বিত আকারে আলোচিত হয়েছে। এর একাধিক নামের মধ্যে 'কাফিয়া' নামটি বেশ পরিচিত। যার আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায় এর অন্তরালে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অর্থ নিহিত রয়েছে। সাথে

www.pathagar.com

অপর কোনো সূরা যদি যুক্ত নাও হয়, তথাপি ভাব প্রকাশে তার এতটুকু অসুবিধা নেই। এমনকি তা কারো মুখাপেক্ষীও নয়।

৫. কুরআনের কোনো কোনো সূরা অনুগামী পর্যায়ের, যা অপর সূরার সমকক্ষ হওয়ার মর্যাদা রাখে না। বরং পূর্ব সূরার কোনো একটি প্রচ্ছন্ন দিক স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। যেমন পূর্ব সূরার একটি আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অস্পষ্টতা দূর করার লক্ষে সূরা হুজুরাত নাযিল হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা তাফসীরে লক্ষ করুন।

৬. প্রতি গ্রুপের বিষয়বস্তু নিয়ে পৃথক পৃথক চিন্তা করা হলে স্পষ্টত বুঝা যায়—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতের পর্যায়গুলো সকল গ্রুপে সমহারে আলোচিত হয়েছে। তবে এ আলোচনার ধরন ও দিক ভিন্ন। আর সংক্ষেপ ও বিস্তৃতির প্রকৃতিও এক নয়।

৭. অরেকটা বিষয় লক্ষণীয়—উল্লিখিত গ্রুপগুলোর মধ্যে বিধিবিধান ও শরীআত বিষয়ক গ্রুপকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। আর সাজা-শাস্তি, ভয়-ভীতিমূলক বিষয় গ্রুপ এসেছে সবার শেষে। এদ্বারা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ যে মানুষকে ভ্রান্ত পথের অনুসরণ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে দাঁড় করানো, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর অভ্রান্ত সে পথটি যে একমাত্র ইসলামী শরীআত—সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই যে বিষয়টি মূল উদ্দেশ্য, তার আলোচনা সবার আগে হওয়াটাই সঙ্গত কথা। বলা বাহুল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া ইসলামী শরীআতই উম্মতে মুসলিমার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। যা অবমূল্যায়নের পরিণামে আহলে কিতাবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে মুসলিম জাতির দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে। যে কারণে তাদের পদচ্যুতি ও ইসলামী শরীআতের গতি-প্রকৃতি ও মূল্যবোধের তফসীলী আলোচনা প্রথম গ্রুপে স্থান পাওয়াটাই সঙ্গত ছিল, কার্যত হয়েছেও তাই। স্থির মনে চিন্তা করা হলে অনায়াসে বুঝে আসার কথা কুরআনের প্রথম ও শেষ গ্রুপের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি ইমারতের ভিত্তি ও নির্মাণ কাঠামোর সম্পর্কের অনুরূপ। নির্মাণের বিধান সূত্রে ভিত্তি গড়ানো হয় সর্বাগ্রে। অতপর অবকাঠামোর নির্মাণে হাত দেয়া হয়। কিন্তু কাজ শেষে অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে যায়। এখন অবস্থা হলো—সবার আগে শুরু করা ভিত্তি নিচে গেল। সামনে ভাসে কেবল উপরে দাঁড়ানো ইমরাতের বিশাল দেহ কাঠামো।

কুরআন কারীমের সূরা বিভক্তির এই সাতটি গ্রুপ যখন আমার নযরে ভাসে আর দেখতে পাই—সূরাগুলো জোড়ায় জোড়ায় বিন্যাস দেয়া তখন সূরা হিজরতের وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ - الحجر : ٨٧ আয়াতের প্রতি চিন্তার প্রবাহ সহসা ধাবিত হয়। কিন্তু বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিধায় যথাস্থানের জন্য রেখে দেয়াই সমীচীন।

কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর

এ গ্রন্থে আমার অনুসৃত তৃতীয় নীতি হলো স্বয়ং কুরআনের সাহায্যে কুরআনের তাফসীর করা। কেননা اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا - زمر: ٢٣ "অর্থাৎ

পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একে অপরের নযীর সাদৃশ্য কিতাব দ্বারা আল্লাহ একটি প্রাঞ্জল ও সুষম কালাম নাযিল করেছেন।"-(সূরা আয যুমার, ২৩ আয়াত) মর্মে কুরআন নিজেই তাঁর পরিচয় ব্যক্ত করেছে।

কুরআন নিজেই কথাটা বার বার স্পষ্ট করেছে—জ্ঞান-গবেষণা ও হেকমতপূর্ণ বিষয়গুলো তাতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর জন্য তাসরীফ (تَصْرِيْفٌ) শব্দের প্রয়োগ একাধিক লক্ষ করা যায়। যার অর্থ ঘুরানো। কুরআন পাঠকালে একই বিষয় বিভিন্ন সূরায় বার বার আলোচনা দ্বারা কথাটা বুঝে নিতে আপনার আদৌ কষ্ট হবে না। ফলে শিক্ষানবিশের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এটাতো একই কথার পুনরালোচনা মাত্র। কিন্তু চিন্তাশীলের সামনে কথা পরিষ্কার—একই বিষয়ে নিরেট পুনঃচর্চা ও পুনরাবৃত্তির দোষ থেকে কালামে ইলাহী সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূত-পবিত্র মর্যাদায় আসীন। কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও একই কথার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়, আসলে ব্যাপার তা নয়। এক কথায় আলোচনা যতবার আসুক, প্রত্যেকবারের প্রসঙ্গ ও পরিবেশ থাকে বিভিন্নমুখী। অর্থাৎ মানুষের জীবন যেহেতু অন্তহীন সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ এবং সেগুলোর আবর্তন মূলত জীবন কেন্দ্রিক, কাজেই সমাধানের আলোচনায় জীবন প্রসঙ্গ তো আসতেই হবে। তাই এটাকে এক কথার আপত্তিকর পুনরালোচনা বলা যায় না। যেমন এক জায়গায় কোনো বিষয় অস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, অন্যত্র তার ব্যাখ্যায় বিশদ আলোচনা হয়েছে। অনুরূপ একস্থানে কোনো বিষয় অনির্দিষ্ট বলা হয়েছে অন্যখানে পূর্বাপর সম্পর্ক যোগে তা নির্ধারিত হয়ে যায়। মোটকথা অবস্থার প্রেক্ষাপট ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই কথা বার বার আলোচিত হয় বটে, কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তনের দরুন তাকে বিরক্তিকর অথবা অকারণে আলোচনার দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করা যায় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি—একই শব্দ এক আয়াতে অস্পষ্ট অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট, এক স্থানে দাবীর স্বপক্ষ দলিল আমার বুঝে আসেনি অন্যত্র একই দলীল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট লক্ষ করেছি।

শ্রোতা কিংবা পাঠকের মনে বক্তব্য বিষয়টি বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই মূলত কুরআনী বাচনভঙ্গিতে উপরোক্ত নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। গর্বিত সুরে নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া হিসাবে বলি—কুরআনের সঠিক মর্ম উদ্ধারে যেখানেই জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি এবং যতই দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, স্বয়ং কুরআনেই তার সমাধান আমি পেয়ে গেছি। যা অন্য কিছুর আশ্রয়ে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে মীর আনীসের ছন্দ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন ঃ

اگر پھول مضمون وتو سورنگ سے باندھوں

(অর্থাৎ একটি ফুলের কীর্তন গাওয়া আর তার বন্দনা করাই যদি আমার বক্তব্য বিষয় সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার গায়ে শত রং-এ রং চড়িয়ে বর্ণনা করাই আমার কবিত্বের রীতি।)

হতে পারে, এটা তার কবিসুলভ অতিরঞ্জন প্রয়াস, আপন কাব্য সম্পর্কে যা তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কুরআনের বেলায় অতিরঞ্জনের প্রশ্ন আসে না। পরম সত্য কথা যে, এর প্রতিটি বিষয় ভাবের মাধুরী নিয়ে শত রূপে এ হাজির হয়। যা জ্ঞানী লোকের পক্ষে বুঝে নেয়া আদৌ কষ্টকর নয়।

এটা শুধু মুখের বুলি নয়—বক্ষমান তাফসীরের পাঠকবর্গ আল্লাহ চাহে তো অনায়াসে অনুমান করতে সক্ষম হবেন—আয়াত সমষ্টির পারস্পরিক যোগসূত্র ও ব্যাখ্যা নির্ধারণে মূলত কুরআনের ওপরই আমি নির্ভর করেছি। এমনকি শাব্দিক ও বর্ণনাগত জটিলতা নিরসনে প্রায় ক্ষেত্রে কালামে এলাহীকে আমি অনুসরণ করেছি। এর কারণ এই ছিল না যে, আরবী ব্যাকরণ কিংবা অভিধানের উদ্ধৃতি দানে আমি অপারগ ছিলাম। আমি বরং এটাই দেখাতে চেয়েছি—মর্ম ও ভাবের ন্যায় শব্দ ও সাহিত্যিক জটিলতা নিরসনের ক্ষেত্রেও অন্য সবের তুলনায় পবিত্র কুরআনই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও বিকল্পহীন সূত্র। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ এ মূল কথাটা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

৩. কুরআন অধ্যয়নে বাহিরের মাধ্যম

এ তাফসীরে বাহিরের যে সমস্ত মাধ্যমের আশ্রয় আমি নিয়েছি, সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

মশহুর ও মুতাওয়াতির হাদীস

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ওমরা, সাঈ, তাওয়াফ, কুরবানী, সাফা-মারওয়া, মসজিদে হারাম ইত্যাদি কুরআনী পরিভাষার ব্যাখ্যায় আমি মুতাওয়াতির হাদীসের ওপর শতকরা একশ ভাগ নির্ভর করেছি। কারণ কুরআন ও শরীয়তের পরিভাষার ব্যাখ্যা দেয়া—অর্থ নির্ণয় করার অধিকার একমাত্র এর বাহক নবী মুহাম্মদ (স)-এর। এক দিকে আসমানী কিতাবের বাহক তিনি। অপরদিকে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, পারিভাষিক মর্ম নির্ধারণ, ব্যক্তিগত আমল দ্বারা উদ্দেশ্যের বাস্তব আদর্শ কায়েম এবং বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়া তাঁর নবুওয়তী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে তিনি দ্বীনের মুআল্লিম এবং বর্ণনাকারীও ছিলেন। আর নবুওতের অংশ হিসাবেই তাঁকে এসব দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এখন সঙ্গত প্রশ্ন কেবল এই থাকে—অমুক পরিভাষার এ অর্থ নবী করীম (স) ব্যক্ত করেছেন কিনা, অকাট্য প্রমাণ সূত্রে সেটি জেনে নেয়া অবশ্য দীনের প্রচলিত পরিভাষা ও তার মর্ম অবগত হওয়ার জন্য এ প্রশ্ন তেমন গুরুত্ব বহন করে না। কারণ এ জাতীয় পরিভাষার সঠিক মর্ম বাস্তবাকারে মুতাওয়াতির হাদীসে সুরক্ষিত রয়েছে। আর কুরআন করীম যে অকাট্য প্রমাণ সূত্রে প্রমাণিত, মুতাওয়াতির হাদীসগুলোও সে একই সূত্রের বলিষ্ঠ সমর্থনে প্রমাণিত। একইভাবে উম্মতের সে ধারাবাহিক সূত্র কুরআন করীম পৌঁছিয়েছে, শরীআতের সমস্ত পারিভাষিক অর্থের বাস্তব রূপ সে একই সূত্রে আমাদের নিকট উপস্থিত করেছে। পার্থক্য কেবল এ প্রথমটি কওলী প্রবাহ, দ্বিতীয়টি বাস্তব ও আমলী প্রবাহ। কাজেই কুরআনের অকাট্যতা স্বীকার করা যদি আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়, তাহলে অন্যবধি সরবরাহকৃত

www.pathagar.com

সকল পারিভাষিক অর্থের আমলীরূপ স্বীকার করা ওয়াজিব না হওয়ার কোনো কারণ আদৌ থাকতে পারে না। অবশ্য এ সবের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, সেটা তেমন ধর্তব্য নয়। দীনের ওপর তার বিশেষ প্রভাবও পড়ে না। কুরআন যেমন—অকাট্য সত্যরূপে সবাই জানে ও মানে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তদ্রূপ অনিবার্য করণরূপেই স্বীকার করা হয়। অবশ্য কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেটা তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এক্ষেত্রে দলিলই হলো আসল মাপকাঠি। দলিলের সমর্থন যার কাছে সেদিকে প্রবল তারই ওপর সে আমল করতে পারে।

মুনকিরে হাদীস সম্প্রদায়ের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতাই বলতে হয় যে, তারা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত, ওমরা, কুরবানী ইত্যাদি শব্দের শরীআতসম্মত পারিভাষিক অর্থ পরিহার করে নিজেদের মনগড়া-বানোয়াট অর্থ ঢুকিয়ে তাতে পরিবর্তনের প্রবাহ চালু করতে বেজায় তৎপর। অথচ পারিভাষিক অর্থ কারো রটনার ফসল নয়। বরং সমগ্র উম্মতের মুতাওয়াতির তথা অকাট্য ধারাবাহিক সূত্রে অত্যন্ত সুরক্ষিত ও অক্ষত অবস্থায় সে অর্থ আমাদের পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে। তাদের এ ধৃষ্টতা কার্যত স্বয়ং কুরআন করীমেরই স্পষ্টতর অস্বীকার। কারণ যে পরম্পরা সূত্র সুসংহত অবস্থায় কুরআনকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, সে একই সূত্র পারিভাষিক ও আমলী অর্থেরও বাহক। কাজেই তারা যদি দ্বিতীয়টি অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় কুরআন সঙ্গত কোনো কারণ বাকী থাকে না। অপর পক্ষে রেওয়ায়েত পরম্পরা বাদ দিয়ে কেবল অভিধানের ভিত্তিতে মর্ম নির্ধারণ করাটাও ভ্রান্তিকর উপায়। যথা সওম-সালাতের (রোযা-নামায) আভিধানিক অর্থ যাই থাকুক গ্রহণযোগ্য কেবল শরীআতসম্মত অর্থই এ সমস্ত দীনী পরিভাষা সম্পর্কে মাওলানা ফরাহী (র) তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় লিখেন ঃ "একইভাবে নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, যুদ্ধ-জিহাদ, সাফা-মারওয়া, মসজিদে হারাম, হজ্জের নিয়ম-নীতি ইত্যাদি এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলসমূহের পরম্পরাগত পারিভাষিক অর্থ আজো পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অক্ষুণ্ন রয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে আংশিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে বটে, কিন্তু সেটা তেমন গুরুতর ব্যাপার নয়, যা উপেক্ষা করা যাবে না। যেমন দেশভেদে বাঘের আকার-আকৃতিগত পার্থক্য কিছু না কিছু আছেই। কিন্তু তাই বলে তার রক্ত-চোষা স্বভাবের কথা কারো অজ্ঞাত নয়। অস্বীকারও কেউ করতে পারে না। তদ্রূপ খুটিনাটি মতভেদ সত্ত্বেও নামায বলতে সে বিশেষ আমলকেই বুঝায়—যা মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করে এবং এটাই শরীআতের কাম্য। বস্তুত দীনের শাশ্বত মূল্যবোধ ও কুরআনী শিক্ষা বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরাই কেবল এ সমস্ত খুটিনাটি ব্যাপারে অধিক চর্চায় মেতে উঠে এবং মতবিরোধের তুফান ছুটায়। সুতরাং কুরআনে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিবরণ বর্ণিত হয়নি, এ জাতীয় পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেলে সঠিক সমাধান এটাই যে পরিমাণ এবং যে অংশে গোটা উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত, তার ওপর আমল কর। খবরে ওয়াহেদ তথা দুর্বল রেওয়ায়েত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই উত্তম। অন্যথায় নিজেতো সন্দেহ বাণে বিদ্ধ হবেই, পরের আমলকেও ভুল সাব্যস্ত করবে। অথচ মীমাংসা করার মত কোনো মাপকাঠি নিজের কাছে মওজুদ পাওয়া যায় না।"

www.pathagar.com

দীনী পরিভাষাসমূহের ব্যাপারে উপরোক্ত পন্থাই আমার মতে বিশুদ্ধ। এ ময়দানে চলতে গিয়ে এ নীতিই আমি অনুসরণ করেছি। অবশ্য কুরআন-হাদীসের আলোকে এর কল্যাণধর্মী কারণও আমি ব্যক্ত করেছি।

হাদীস এবং সাহাবীগণের উক্তি

হাদীস এবং সাহাবীগণের উক্তি কুরআনের ন্যায় শরীআতের অকাট্য দলিল নয়। তবে যন্নী তথা ধারণা প্রসূত হওয়া সত্ত্বেও তাফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সূত্র। বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেলে এ দুটোর গুরুত্ব মুতাওয়াতির হাদীসের সমপর্যায়ের হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিশুদ্ধতা অকাট্য নয় বিধায় এগুলোর সাহায্য এতটুকু নেয়াই বিধিসম্মত, যতটুকু শুদ্ধতর হাদীসের সাথে মিল খায়। হাদীস ও সাহাবীর উক্তিকে যারা কুরআনের ওপর প্রাধান্য দিতে আগ্রহী তারা মূলত কুরআন-হাদীস কোনোটারই স্তর বিন্যাস করতে জানে না। অপরপক্ষে এ দুটোকে আদৌ দলীল হিসেবে যারা স্বীকার করে না, তারা মূলত কুরআনের পরে সর্বাধিক মূল্যবান আলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে ফেলে। এক্ষেত্রে হাদীসকে আমি কুরআনের উৎস থেকে নির্গত উদ্ভাবন বলে মনে করি। যে কারণে শুধু আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করাটাই আমি যথেষ্ট মনে করি, বরং এর পরিধি বাড়িয়ে হাদীসের ভাণ্ডার তথা সমস্ত হাদীস থেকেই সাহায্য নিতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। বিশেষত কুরআনী হেকমত বিষয়ে হাদীস থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়েছি, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। কুরআনিক আয়াতের বিপরীত অর্থবোধক কোনো হাদীস পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমি বিরত থাকার পন্থা অবলম্বন করেছি। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনার পর যখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি—হাদীস মানতে গেলে কুরআন বিরোধিতা কিংবা ইসলামের কোনো মূলনীতির ওপর আঘাত আসার সম্ভাবনা প্রবল, তখনি কেবল হাদীস বর্জনের উদ্যোগ নিয়েছি। বিশুদ্ধ হাদীস সাধারণত কুরআন বিরোধী হতে দেখা যায় না। বিরল ঘটনা হিসেবে তদ্রূপ যদি কোথাও ঘটেই যায়, তাহলে সেখানে কুরআনের প্রাধান্যকেই আমি সঙ্গত বিবেচনা করেছি। সাথে সাথে এ প্রাধান্যের যৌক্তিকতাও আমি ব্যাখ্যা করেছি।

শানেনুযূল

শানেনুযূল সম্পর্কে আমার অনুসৃত নীতি নিজের ভাষায় ব্যক্ত না করে আমার উস্তাদ মাওলানা ফরাহীর (র) উক্তি উল্লেখ করাই আমি সমীচিন মনে করি। শানেনুযূল সম্পর্কে নিজের তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেন ঃ শানেনুযূল সম্পর্কে কারো কারো মনে ভ্রান্তিকর ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে—কোনো আয়াত কিংবা সূরা নাযিল হওয়ার কারণই হলো শানেনুযূল। অথচ এ ধারণা নিতান্ত ভুল। আসলে কালামে আলোচিত সমকালীন জনগোষ্ঠীর হাল-অবস্থা এবং জীবন যাত্রার ধরনটাই হলো শানেনুযূলের সারকথা। বস্তুত প্রত্যেক সূরায় এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয় উপলক্ষ করে আলোচনা

www.pathagar.com

আবর্তিত হয়। আর উদ্দিষ্ট সে বিষয়গুলো সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং শানে নুযূল জানতে হলে বাইরে তাকানোর প্রয়োজন নেই, সূরার ভিতর থেকেই তাকে উদ্ধার করে নিতে হবে। এর দৃষ্টান্ত-বিজ্ঞ চিকিৎসক যেরূপ ব্যবস্থাপত্র দেখেই লোকটি কি রোগে আক্রান্ত বলে দিতে পারে, তদ্রূপ প্রত্যেক সূরার অন্তর থেকেই তার শানেনুযূল খুঁজে নেয়া কঠিন কিছু নয়। অতএব আলোচ্য বিষয় থেকে তোমরা সংশ্লিষ্ট সূরার শানেনুযূল তালাশ করে নাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—দেহের সাথে পোশাক এবং চামড়ার সাথে দেহের যে সম্পর্ক, কালাম তার বিষয়বস্তু তদ্রূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্য বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে—অমুক আয়াত অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ হবে—আয়াত নাযিল হওয়ার সমকালীন অবস্থা ও প্রেক্ষাপট এই ছিল। (আয়াতের শিক্ষা কেবল এ ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট নয়। পরবর্তীকালে একই পরিস্থিতি দেখা দিলে আয়াতের মর্ম সেখানেও প্রযোজ্য হবে।-**অনুবাদক**)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী বলেন ঃ "আল্লামা যরকশী তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বুরহানে' লিখেছেন—সাহাবী ও তাবেঈগণ সাধারণত বলে থাকেন—অমুক আয়াত অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এটা তাঁদের পারিভাষিক উক্তি। যার অর্থ—সাময়িক অথবা বিশেষ ঘটনার সাথে এর শিক্ষা নির্দিষ্ট নয়। এর পরিধি বরং কালজয়ী। এ জাতীয় পরিস্থিতি যখনি দেখা দিবে, শিক্ষার পরিধি সেখানেই বিস্তৃত হবে। আসলে আয়াত এখানে শিক্ষার স্বপক্ষ প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃতি করা হয়। এর পিছনের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কার্যকর থাকে না। তাই আমি বলি—ঘটনা যখন ঘটে, আয়াত তখনি নাযিল হবে—এর কোনো ভিত্তি নেই। এমনকি জরুরীও নয়। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এটাও একটা প্রনিধানযোগ্য দিক।

যরকশীর উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সূরা আল আনআমে وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযীর উল্লেখিত জটিলতা অনায়াসে দূর হয়ে যায়। ইমাম রাযী বলেন ঃ "সূরা আনআমের সার্বিক ব্যাখ্যা পর্বে আমি দারুণ জটিলতার সম্মুখীন। সেটা হলো—সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে নাযিল হয়েছে মর্মে সকলে একমত। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়—অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে একথা বলা কতটুকু যথার্থ যে, অমুক ঘটনা এর নাযিল হওয়ার অন্যতম কারণ।"

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আমাদের মতে আসল ঘটনা হলো—সমসাময়িক পরিস্থিতি চাহিদা মোতাবেক যখন যে ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া দরকার তার সুষ্ঠু সমাধান হিসেবেই সূরা নাযিল করা হয়েছে। আর পূর্বাপর যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রেখে কালামের বর্ণনাধারা স্বচ্ছ, সাবলীল ও অস্পষ্টতামুক্ত আকারে নাযিল হয়েছে। একজন প্রাজ্ঞ ও প্রাঞ্জলভাষী বক্তা যেমন সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভাষণ দিয়ে থাকেন। হতে পারে বিশেষ কোনো ঘটনার উল্লেখ তিনি এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তার বক্তব্যের সামগ্রিক আওতায় সে জাতীয় ঘটনার ইশারা-ইঙ্গিত অবশ্যই ব্যক্ত হয়। শ্রোতামণ্ডলী যা সহজেই আকর্ষণ করে নিতে পারে। সময়ে এমনও হয় তার ভাষণের মধ্যে ঘটনা কিংবা ব্যক্তি

www.pathagar.com

বিশেষের উল্লেখ থাকে বটে, কিন্তু দেশব্যাপী বৃষ্টিপাতের ন্যায় তার বিষয় বক্তব্য সামগ্রিকতার অর্থে প্রবাহিত হয়। আল-কুরআনের অবতারণ তদ্রূপ সার্বজনীন অর্থে বিবেচনা করাই সঙ্গত।

এতো গেল নীতিগত আলোচনা। এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে বলি—এরপরও মনে অধিক প্রশান্তি যদি আপনার কাম্য হয়, তবে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ পর্যায়ে আমার পরামর্শ হবে-শানেনুযূল তালাশ করতে গিয়ে আয়াতসমূহের পরস্পর যোগসূত্র হাতছাড়া করা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না। অন্যথায় আদিগন্ত মরু প্রান্তরে দিগভ্রান্ত পথিকের ন্যায় আপনার অবস্থা হবে ভয়াবহ ও করুন। এই গভীর তিমিরে কোথায় যাবেন গন্তব্য জানা নেই। বস্তুত শানেনুযূল জানার আগ্রহ যদি আপনার থাকেই, তবে স্বয়ং কুরআনের ভাষ্যে জড়ানো মর্ম থেকেই আপনাকে আহরণ করে নিতে হবে। এ পর্যায়ে হাদীস ও সাহাবীগণের উক্তির সাহায্য নেয়াতে বাধা নেই। তবে তার পরিধি হবে সীমীত আকারে। কেবল নযমে কুরআন তথা যোগসূত্রের সহায়ক উপাদান থেকে। এমন ঢালাওভাবে নয় যা নযমের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে দেয়।

শানেনুযূলের ব্যাপারে আমি উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করেছি। যে কারণে ঘটনা বর্ণনা করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া আমি জরুরী মনে করিনি। তবে যে সমস্ত আয়াতে এর প্রতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে, সেখানে তো ঘটনার বিবরণ জানতেই হয়। সেসব আয়াতের তাফসীরেই কেবল ঘটনার উদ্ধৃতি এনেছি। তাও আবার অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বাদ দিয়ে, প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্ন আকারে কুরআনে যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

তাফসীর গ্রন্থ

তাফসীর গ্রন্থরাজির মধ্য হতে তাফসীর ইবনে জারীর, তাফসীরে রাযী ও তাফসীর যমখ্শরী, এই তিনটি গ্রন্থ আমি সবসময় অধ্যয়ন করে থাকি। এর প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। ইবনে জারীর মূলত সফল তথা পূর্ববর্তী আলেমগণের উক্তির এক অপূর্ব সমষ্টি। এদিকে মুতাকাল্লিমগণের প্রশ্নোত্তর, যুক্তিতর্ক ইত্যাদির সমারোহে সমৃদ্ধ রয়েছে। ইমাম রাযীর সুপ্রসিদ্ধ 'আল-কবীর' নামক তাফসীর গ্রন্থটি। আর আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-নীতিমালায় সমৃদ্ধ আল্লামা যমখশরীর বিরচিত তাফসীরে "আল-কাশ্শাফ" অধ্যয়নযোগ্য একটি উন্নতমানের গ্রন্থ। সে কারণে জীবনের শুরু থেকেই তাফসীর বিষয়ক এ তিনটি অনন্য গ্রন্থ আমার অধ্যয়নে ছিল এবং এখনো আছে। লিখার সময় এ তিনটির প্রতি অবশ্যই আমি গভীর দৃষ্টি দিয়ে থাকি, এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতেও ভুল করি না। এছাড়াও তাফসীর বিষয়ক আরো বহু গ্রন্থ রয়েছে। যেগুলো আমার অধ্যয়নের সহায়ক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিংবা জটিল সমস্যা দেখা দিলে সে সমস্যা থেকে উপাদান সংগ্রহ করি, যদি সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে। তবে সে সাহায্য নেই কেবল তাঁরা লিখেছেন এই সুবাদে নয়। বরং আমার উপরোক্ত নীতিমালার আওতায় পতিত বিধায়। তাঁদের কেনো আমি গ্রহণ করে থাকি। আগেই

www.pathagar.com

বলেছি—এ ব্যাপারে আমার নীতি হলো—প্রত্যেক সূরা এবং আয়াতে বর্ণিত শব্দ পূর্বাপর যোগসূত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি আর কুরআনোক্ত আদেশ-উপদেশের ভিত্তিতে আমি চিন্তা-গবেষণার আশ্রয় নিয়ে থাকি। তাফসীর গ্রন্থের বর্ণনা আমার গবেষণা প্রসূত ফলাফলের অনুকূল সাড়া দিলে তো অধিক সান্ত্বনার বিষয়—তা সানন্দে গ্রহণ করি। অন্যথায় চিন্তা-গবেষণার ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে দলীল দ্বারা হয় আমার ভুল স্পষ্ট হয়, অথবা তাফসীরের উক্তি কেন দুর্বল, কি কারণে সেটি গ্রহণযোগ্য নয় এর প্রমাণ সামনে উপস্থিত হয়। আমার মতে তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নেয়ার কার্যকর পন্থা এটাই। পাঠক মনের সান্ত্বনা এবং বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষেই কেবল উদ্ধৃতি এনেছি বিধায় আমার কিতাবে অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি অতি অল্পই পাওয়া যাবে। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উদ্ধৃতি আনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, সেখানে আমি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে অধিক পরিমাণে দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেছি। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আশা করি পাঠক মনের সান্ত্বনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

পূর্বতন আসমানী কিতাব

কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে—একাধিক বর্ণনায় তাওরাত, যবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি প্রাচীন আসমানী গ্রন্থের আলোচনা-উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। বহু জায়গায় ইসরাঈলী নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের আগমন, দাওয়াতী তৎপরতা ইত্যাদি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কোনো স্থানে ইহুদী নাসারাদের দীন বিকৃতির অশুভ কর্মকাণ্ড বাতিল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোনোখানে তাদের বর্ণিত ইতিহাসের যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনা জোরালো ভাষায় বর্ণিত দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থরাজির উপস্থাপিত বর্ণনা আমি গ্রহণযোগ্য মনে করিনি। এ সমস্ত বিবরণ অধিকাংশই মুখনিসৃত শোনা কথার উপর ভিত্তিশীল। যে কারণে তা আহলে কিতাবদের বিপক্ষে দলীল হিসেবে দাঁড় করানোর যোগ্যতা রাখে না। দ্বিতীয়ত, এ সমস্ত বিবরণ বিশুদ্ধ কি না, অথবা কতটুকু প্রমাণসিদ্ধ, সে ব্যাপারে আপন মনে প্রশান্তির আওয়াজ খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই এ জাতীয় জটিল বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে মূলসূত্র তাওরাত-ইঞ্জিল কেন্দ্রিক পর্যালোচনা ও গবেষণাই আমি ফলপ্রসূ পন্থা মনে করেছি। সে হিসেবে কুরআন ও প্রাচীন গ্রন্থ যে বিষয়ে একমত, সেটা আমি তুলে ধরেছি। আর পার্থক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের জোরালো বক্তব্য এবং অকাট্য প্রমাণ আমি স্পষ্ট করেছি। আমার লিখিত তাফসীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীর পাঠকালে এমন কতকগুলো বিতর্কিত বিষয় সামনে উপস্থিত হবে, যদ্বারা পাঠকবর্গের পক্ষে আন্দাজ করা কষ্টকর হবে না—কুরআনের বক্তব্য কত যে শক্তিশালী, তার দলীল যে কি পরিমাণ অকাট্য। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব কুরআনের বক্তব্য যদি তাওরাত-ইঞ্জীলের সামনে রেখে তুলনামূলক বিচার করা হয়। তবে তুলনাকালে এটাও স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়—কুরআন যেমন আল্লাহর প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ তাওরাত-ইঞ্জিলও তদ্রূপ আল্লাহর পাঠানো কিতাব। হতভাগা বহনকারী গোষ্ঠী কর্তৃক বিকৃতির ছুরি দ্বারা বিক্ষত করা না হলে কুরআনের ন্যায় এ দুটিও আমাদের জন্য রহমত-বরকতময়

প্রস্রবণই ছিল—কথাটা বাড়িয়ে বলা নয়। তবে এহেন অবাঞ্ছিত ও বিকৃতি সত্ত্বেও এ দুটি গ্রন্থ এখনো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হেকমতের অন্যতম উৎস বলা যায়। নিবিষ্ট মনে অধ্যয়নের আশ্রয় নেয়া হলে সত্যের কিরণ উদ্ভাসিত না হয়েই পারে না—আল-কুরআনের বারিধারা যে উৎস থেকে নির্গত, তাওরাত-ইঞ্জিলও একই উৎস থেকে নির্গত প্রবাহ। বারংবার অধ্যয়নের পর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, কুরআনের হেকমত ও গুপ্ত রহস্য বুঝার ক্ষেত্রে যে সাহায্য তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে পাওয়া যায়—অন্য কোনো সূত্র থেকে সে আশা না করাই ভাল। বিশেষতঃ যবুর, আমছাল, ইঞ্জিলের কথাই বলি—নিবিড় ও গভীর মনে এগুলো পাঠ করুন। অবশ্যই আপনি লক্ষ্য করবেন—ঈমানের যে খোরাক এগুলোর অন্তর থেকে আহরণ করা যায়, কুরআন-হাদীস ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে সে উপাদান তালাশ করা অর্থহীন প্রয়াস। ভাবতে অবাক লাগে, সে জাতি এহেন আসমানী গ্রন্থের বাহক, যাদের অতীত সোনালী ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, কুরআনের মর্মবাণী আকর্ষণ এবং আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বজনীন আহবানে সাড়া দেয়ার কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত কেন রয়ে গেল?

ঐতিহ্যবাহী আরব ইতিহাস

কুরআন কারীমে আদ, সামূদ, মাদইয়ান, কওমে লূত ইত্যাদি প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীর ধ্বংস বিবরণ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত রয়েছে। বহু জায়গায় ইসরাঈলী নবীগণের দাওয়াতী মিশন এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অর্থবহ ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া হযরত ইবরাহীম-ইসমাঈল (আ)-এর আরব ভূ-খণ্ডে আগমন, তাঁদের দাওয়াত ও কুরবানী এবং বাইতুল্লাহ নির্মাণের কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। মহান এ দুই নবীর আগমন কল্যাণে আরব সমাজের নৈতিক, চারিত্রিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে যে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, আল কুরআনের ভাষায় তার একটা বাস্তবচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে দৃশ্যের মোড় ঘুরে গেল। কুরাইশরা দীনে ইবরাহীমের বিকৃতি ঘটিয়ে তাতে বেদআত নামের মনগড়া ছাপ লাগাতে শুরু করে দিল। পূত-পবিত্র কা'বাঘর এখন তাওহীদের কেন্দ্রভূমি নয়—তিন শ ষাট মূর্তির আখড়ায় পরিণত হল। ফলে শিরক-বেদআতের অশুভ বন্যায় দীনে ইবরাহীমের নিরাপদ প্রাসাদ প্রায় তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম, সে কথাও আল কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় ব্যক্ত হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ে অবগতি লাভের প্রেরণায় যার মন উষ্ণ হয়ে আছে, তার জন্য প্রয়োজন—সমকালীন ইতিহাসের সবটুকু পাঠ করা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে—সে যুগের সার্বিক তথ্য যোগান দিতে পারে, নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ এমন কোনো ইতিহাস হাতে পাওয়া আজ কল্পনার বিষয়। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর জীবন কথার অংশ তাঁদের আরবে আগমন, কা'বাগৃহ নির্মাণ, কুরবানী ইত্যাদির প্রয়োজনীয় তথ্যে সমৃদ্ধ ছিল, দূরাচার ইহুদী চক্র সেটিকে বিকৃতির অতলে ডুবিয়েছে। সূরা আল বাকারার তাফসীরে এর প্রমাণ দেখা যেতে পারে। গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানের পর বিভিন্ন গ্রন্থসূত্র থেকে এ ব্যাপারে কল্যাণকর কিছু তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটুকু যথেষ্ট নয়। আবার আরব কবিদের কাব্য-কবিতা, খতীবদের ভাষণ

বক্তৃতায়ও এ জাতীয় তথ্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এগুলো কেবলই ইঙ্গিত, সরল ভাষ্যের মর্যাদা রাখে না। এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা-সাধনার সুফল হিসেবে বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব আহরণে আমি সফল হয়েছি। কুরআনের আপাত জটিল প্রশ্ন সমাধানে সেগুলো ফলপ্রসূ সহায়তা দিয়েছে। আমার সে প্রচেষ্টা ছিল বলতে গেলে একান্ত কুরআন ভিত্তিক। অবশ্য ঐতিহাসিক সূত্র থেকে আমি মুক্তা কুড়াইনি তা নয়, কুড়িয়েছি এবং প্রয়োগও করেছি। তবে সীমিত আকারে এবং সহায়ক হিসেবে। কুরআন যতটুকু সমর্থন দিয়েছে কেবল সে পরিমাণ। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব কিংবা ভূমিকা দাবী করা অবান্তর কথা। খেদমত যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে সেটা মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহের ফলশ্রুতি বলাই সঙ্গত।

৪. কুরআন শিক্ষার্থীদের জন্য কতিপয় নির্দেশনা

কুরআন বুঝার ভিতর ও বাহিরের শর্তাবলী ছিল উপরোক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু। সে আলোচনা আসলে এলমী ও রচনাশৈলী জাতীয় তাফসীর লিখতে গিয়ে আমি নিজে সে নীতি অনুসরণ করেছি। এর সঠিক অনুসরণ ছাড়া কুরআনের মর্ম আহরণ করা কারো পক্ষে সম্ভব বলে আমি মনে করি না। তবে এটাও ঠিক—গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর মর্যাদা উপায়-উসীলার বেশী কিছু নয়। যুদ্ধের জন্য যেমন হাতিয়ার বিকল্পহীন, কুরআন বুঝতে হলেও তদ্রূপ এ উসীলার সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু শুধু হাতিয়ারই যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে না, যদি না তাকে সাহসী অন্তর ও বলিষ্ঠ হাতে ব্যবহার করা হয়। বুকে সাহসী অন্তর না থাকলে সৈনিকের হাতে মূল্যবান হাতিয়ার তুলে দিলেই সে বিজয়ের লড়াই লড়তে পারে না। কবির ভাষায় ঃ

بر مخنث سلاح جنگ چه سود!

"ভীরু লোকের হাতে যুদ্ধের অস্ত্র ধরিয়ে দেয়া কোন্ কাজের ?"

তদ্রূপ কুরআন বুঝতে হলে উপরোক্ত শর্তাবলী আমলে আনার বিকল্প নেই বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে অন্তরের পবিত্রতা ও মনের একাগ্রতার প্রবল আকর্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে। যার অবর্তমানে সকল চেষ্টা, তাবৎ হাতিয়ার ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখন আমি মনের গতি সঠিক পথে চালনার উপায় বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

নিয়তের পবিত্রতা

এর জন্য সর্বাগ্রে নিয়তের পবিত্রতা অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র হেদায়াতলাভের আন্তরিক বাসনায় কুরআন পাঠে মনোযোগী হওয়া। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে কেউ যদি কুরআন অধ্যয়নে লেগে যায়, তাহলে শুধু এর অবারিত কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিতই নয়, বরং তার অবস্থান এখন যে পরিমাণ দূরে—তার পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে অধিক দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাও ষোলআনা প্রবল। পার্থিব স্বার্থ আর ব্যক্তিগত সুনাম লাভের উদ্দেশ্যে কেউ যদি তাফসীর লিখে অতপর

www.pathagar.com

মুফাস্সির হিসেবে তার খ্যাতি চরমে পৌঁছে যায়, তাহলে বাহ্য দৃষ্টিতে সাফল্য তার দুয়ারে উপস্থিত বলা যায়। কিন্তু পরিণামের ক্ষেত্রে কুরআনী জ্ঞান থেকে নিজেকে সে বঞ্চিতই করে নিল। একইভাবে স্বতন্ত্র কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়ে তার সমর্থনে কুরআন থেকে দলীল পেতে চাইলে মনগড়া বিকৃত প্রমাণ হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তবে এ দ্বারা নিজের উপর সে যে কুরআনের বরকত প্রবাহ বন্ধ কর নিল, সে কথাও তাকে বুঝতে হবে।

কুরআনকে আল্লাহ পথের দিশারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আবার প্রত্যেক লোকের অন্তরে হেদায়াত লাভের আকর্ষণী চুম্বক নিহিত রেখেছেন। অন্তর্নিহিত সে প্রেরণার দাবী পূরণার্থে কেউ যদি কুরআনের দিকে আকৃষ্ট হয় আর হেদায়াত লাভের চেষ্টা করে, তাহলে আপন সাধনা ও আল্লাহর তাওফীক অনুপাতে সে তার কল্যাণ সাগর থেকে মানিক আহরণে ধন্য হতে পারে—সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে জন্মগত সে প্রেরণার দাবী এড়িয়ে ভিন্ন মত লাভের টানে কেউ যদি কুরআনের শাশ্বত আবেদন কাজে লাগাতে চায়, তাহলে لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى হাদীসের মর্মবাহী নীতি অনুযায়ী সে ব্যক্তি তাই পাবে—যেটা তার উদ্দেশ্য ছিল। এটাই আল-কুরআনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ কুরআনের সে পরিচয় ব্যক্ত করে ইরশাদ করেন ঃ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا (এর মাধ্যমে বহু মানুষকে আল্লাহ পথহারা করেন, বহু মানুষকে আবার পথ দেখান—সেটাও এরি আলোকে।) অতপর কুরআনের মাধ্যমে কোন্ প্রকৃতির মানুষকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার একটা নীতি আয়াতের শেষাংশ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট তিনি করেন বটে, তবে কেবল নাফরমান গোষ্ঠীকে। অনুগত মুমিনদের নয়।)। এর অন্তরালে ব্যক্ত করেছেন। অন্য কথায় হেদায়াতের দিশারী হওয়া সত্ত্বেও এর শাশ্বত সরল আবেদন থেকে যারা গোমরাহী ও বাঁকা পথ বেছে নেয়, আল্লাহ তাদের সে চাহিদাই পূরণ করেন—যার জন্য তারা সদা লালায়িত। কা'বাঘরে উপস্থিত হয়ে কেউ মূর্তির ঘরে আকুতি দিলে, তদ্রূপ ফুল থেকে শুধু কাঁটার বোঝা তুলে নিলে সে ব্যক্তি তাওহীদের স্বাদ পাওয়ার এবং ফুলের গন্ধে মোহিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এটা যুক্তি বিরোধী কথা। বিকৃত স্বভাবের কারণে চিকিৎসাকে রোগ বানিয়ে নিলে নিরাময়ের পরিবর্তে রোগ শয্যায় কাতর হয়ে পড়ে থাকাই তার জন্য সঙ্গত ব্যবস্থা। নিম্নোক্ত আয়াতে এহেন লোকের প্রকৃতি প্রণিধানযোগ্য। যথা—

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ - البقرة : ١٦

"এরাই সে সকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহীকে বেছে নিয়েছে। বস্তুত তাদের এ ব্যবসা লাভজনক দাঁড়ায়নি। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬

কুরআনকে উচ্চতর কালাম স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করতে হলে অন্তরে তার গুরুত্ব ও বড়ত্বের চেতনা বদ্ধমূল করা জরুরী। একে যদি সর্বোচ্চ কালাম স্বীকার করা না

www.pathagar.com

হয়, উচ্চতর মর্যাদায় আসীনরূপে মেনে নিতে কারো মন যদি দ্বিধান্বিত হয়। তাহলে এর পিছনে তার শ্রম দেয়ার প্রেরণা সজীব হতে পারে না। উপকার লাভে ধন্য হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না এর একটা দৃষ্টান্ত মনে করুন—কোনো এক এলাকা সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গেল এখানে মাটির নীচে স্বর্ণের খনি রয়েছে। এককালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলন করাও হয়েছে। কিন্তু কিছু দিন যাবত উত্তোলন বন্ধ থাকার ফলে তার সুড়ঙ্গ পথ মাটির আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। এখন নতুনভাবে খনন করা হলে উঠে আসবে কেবল স্বর্ণই স্বর্ণ। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট জনবলের পরিশ্রম হবে সোনামুখী আর যন্ত্রপাতি যোগাড়, আয়োজন ইত্যাদি। করা হবে স্বর্ণ আহরণের উপযোগী। অপর পক্ষে যদি তথ্য আসে এটা কয়লা কিংবা চুনাপাথরের খনি, এমতাবস্থায় স্বর্ণের আশায় এতে কেউ শ্রম দিতে রাজি হবে না। আর আগ্রহী কেউ যদি হয়ও, তবে তার চেষ্টা-সাধনা ও আয়োজন হবে আহরণযোগ্য পদার্থের ধরণ ও প্রকার অনুযায়ী।

দৃশ্যত কারো নিকট বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, মর্ম ও আলোচ্য বিষয়বস্তু জানার আগেই কোনো কিতাব সম্পর্কে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ মানের গ্রন্থ বলে সুধারণা পোষণ করা কতটুকু সঙ্গত ? কিন্তু ঐতিহ্যবাহী আসমানী গ্রন্থ সুবাদে কুরআন কারীম সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা পোষণ করা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা কুরআনের প্রতি কারো বিশ্বাস থাকুক চাই না থাকুক, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই—মহান এ গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যে ঢেউ মেলিয়েছে অন্য কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে সেটা কল্পনাও করা যায় না। গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করা হলে দেখা যাবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের বাসিন্দা হোক মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-কুরআনের প্রভাবে জড়িয়ে রয়েছে। চিন্তার যুগ-যুগান্তর চলে আসা চিন্তার ধরন, অনুসৃত চিন্তাধারা ও মতবাদ, কৃষ্টি সভ্যতা, আইন-কানুন, দীন-ধর্ম ইত্যাদির চলমান গতি পথের মোড় ঘুরিয়ে পবিত্র কুরআন একে নিজস্ব খাতে প্রবাহিত করেছে। যে গ্রন্থ বিশ্ব সভ্যতাকে এহেন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম, যার আলোকে মিথ্যার অমানিশা পালিয়ে যায়, সে কিতাব কেউ পসন্দ করুক, চাই না করুক, কারো নযরে সেটি গুরুত্বহীন হবে—একথা কল্পনা করা যায় না। জীবন সমস্যায় চিন্তা করতে আগ্রহী আর উপেক্ষীয় অভ্যস্ত নয়, এমন কোনো লোকের পক্ষে কুরআনের বিপ্লবী বাণী অস্বীকার করা কিংবা মূল্যহীন সাব্যস্ত করা অচিন্তনীয় ব্যাপার। সে বরং সাগ্রহে জানতে চাইবে কুরআনের অন্তরালে এমন কোন্ শক্তি লুকিয়ে আছে, যা গোটা বিশ্বের চলমান গতি, তার আজীবন লালিত চিত্র বদলিয়ে নতুন রং-এ রাঙিয়ে দিতে পারে। সে আরো বুঝার চেষ্টা করবে—কুরআনের ভাব সাগরে এমন কোন্ যাদুকরী তরঙ্গ বিরাজ করে, যার পরশে উটের রাখাল মরুচারী আরব জনগোষ্ঠী আজ পশু তাড়ানো লাঠি ছেড়ে নিখিল বিশ্বের শাসনদণ্ড আপন হাতে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে। উষ্ট্রের রাখালীর পরিবর্তে মরুর বেদুইনরা আজ সহসা জগৎপতির আসনে অধিষ্ঠিত। জানার আগ্রহ তার এখানেই বিরতি রেখা টানতে নারাজ। সে উঁকি দেবে—দেখি তো এর অন্তরে এমন কোন্ জ্ঞান ভাণ্ডার মাটি চাপা পড়ে আছে, যার কল্যাণ পরশে আজ রাশি রাশি আবু বকর—ওমর জন্ম নেয়। এ যে অবাক কাণ্ড!

www.pathagar.com

অথচ এরা সেই জাতি যার গর্ভে কেবল হাতে গণা দু-একজন এমরাউল কায়েস ও যুহাইরই জন্ম নিয়েছে। এর চাইতে উচ্চমানের ব্যক্তিত্ব প্রসব করতে পারেনি।

উপরন্তু লক্ষণীয়—নিখিল বিশ্ব গণপরিসংখ্যানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের আকীদা-বিশ্বাসে এটি কেবল সাধারণ একটি গ্রন্থই নয়, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনায় বরং এটি কালামে রব্বানী, লাওহে মাহফুয থেকে নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিরাজমান। এর অতীত-বর্তমান সম্পর্কে এ অনুভূতি বিদ্যমান যে, এহেন গুরুত্ববাহী কালামের মর্মকথা মানুষ তখনই উপলব্ধি করতে পারে—এর উপরোক্ত মাহাত্ম্য সামনে রেখে যদি চিন্তার অভ্যাস গড়ে তোলে। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে সম্ভবত এর যথাযথ গুরুত্ব তার নযরে নাও থাকতে পারে। ফলে এর কল্যাণে ধন্য হওয়ার যে সুযোগ ছিল, তা থেকে সে বঞ্চিতই থেকে যাবে।

আজকাল কুরআন যারা স্বীকার করে আর যারা করে না, উভয় পক্ষের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে এমন কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যা থাকলে কুরআন থেকে যথার্থ উপকার লাভ করার জন্য তাকে যতটা গুরুত্ববহ মনে করা দরকার তা করা সম্ভব হয় না। মূলত সেদিক লক্ষ্য করেই আমার উপরোক্ত সতর্কবাণীর অবতারণা।

কুরআন যারা মানে না তারাও স্বীকার করে যে, সমসাময়িক পরিবেশে কুরআনের আবেদন কার্যকর ও উপযোগী ছিল। এর মাধমে ঘুণে ধরা সমাজের সার্বিক অঙ্গনে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে। তদুপরি বেদুইন-যাযাবর জনগোষ্ঠীর সাদামাটা ও সেকেলে সমস্যার একটা আপত সমাধান অথবা সংস্কার কুরআনে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং আধুনিক যন্ত্রযুগের অগ্রগামী অবস্থার পেক্ষাপটে। কাজেই মধ্যযুগীয় আন্তরবিহীন সাদাসিধা সমস্যার পরিবর্তে আজকের এই যান্ত্রিক যুগের রকমারি সমস্যা আর পালিশ ও মালিশ করা প্রশ্নের উত্তর কুরআনে তালাশ করার কোনো যুক্তি নেই। তাদের মতে আধুনিকতার ছোঁয়া বর্জিত কুরআন এর উপযোগীও নয়।

অপরপক্ষে ঈমান-আকীদায় কুরআনের অনুসারী ও বিশ্বাসী জনসমষ্টির অধিকাংশের আচরণ অত্যন্ত দুঃখজনক। তাদের মতে কুরআন আসমানী কিতাব সন্দেহ নেই। তবে এর কাজ হলো—কেবল হালাল-হারাম ইত্যাদি ফিকাহ শাস্ত্রীয় কিছু বিধি-বিধান শুনিয়ে দেয়া। অতপর ফিকার মাসআলা-মাসায়েল, হুকুম-আহকাম পৃথকভাবে সংকলিত ও বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। এখন তাদের নযরে কুরআনের গুরুত্ব বাকী রইল কেবল বরকত হাসিলের মাধ্যম হিসেবে। তাই বহুলোক একে বরকতময় কিতাব এবং কতিপয় দোয়া-দরূদের সমষ্টি মনে করে। সকাল-সন্ধ্যা এর ওযীফা পাঠেও ত্রুটি করে না। কিন্তু চিন্তা-গবেষণার উপাদনও যে এর অন্তরালে নিহিত সে কথা মানতেই চায় না। কিছু লোক আবার মৃত্যু যাতনা লাঘব এবং ইসালে সওয়াবের কিতাব হিসেবে এর মর্যাদা দানে বেজায় উৎসাহী। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা এর মূল্যায়ন করে থাকে। এ জাতীয় লোক আরো আছে। একদল আছে, যারা মনে করে—কুরআন মূলত একটি তাবীযের কিতাব।

www.pathagar.com

যার আয়াত পড়ে পানি পড়া, ঝাড় ফুঁক দেয়া এমনকি তাবীয লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার ফায়দা অনেক। রোগ-বালাই দূর হয়, আপদ-বিপদ কেটে যায়। কুরআনের প্রতি তাদের আকর্ষণ অতি চমৎকার। তবে কেবলই তাবীযের ভাণ্ডার আর বিপদ খেদানোর ওযীফা হিসবে। এ জাতীয় ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ মুসলমান প্রবিত্র কুরআন দ্বারা সে কল্যাণ লাভে ধন্য হতে পারে না। বাস্তবে যে উদ্দেশ্যে এর অবতারণ। এর দৃষ্টান্ত হলো ঃ তাদেরকে ট্যাংক দেয়া হয়েছে শয়তানের ঘাটি চূর্ণ করার জন্য, কিন্তু একে তারা মশা মারার যন্ত্র মনে করে নিয়েছে।

কুরআনের দাবী অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তনের সংকল্প

কুরআনে হাকীম থেকে কল্যাণলাভের তৃতীয় জরুরী বিষয় হলো—এর দাবী অনুযায়ী নিজের যাহির-বাতিন তথা সার্বিক চরিত্র সংশোধনের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা। কেউ যখন একনিষ্ঠ মনে কুরআন অধ্যয়ন করে, তখন পদে পদে সে অনুভব করবে কুরআনের দাবী তার ইচ্ছা ও কামনা বাসনা সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত। বাস্তবের আলোকে সে দেখতে পায়—তার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, জীবনের মূল্যবোধ ও সামাজিক বাঁধন সবই কুরআনের আলো থেকে দূরে এবং এর নির্ধারিত সীমার বাইরে অবস্থিত। এমনকি নিজের যাহির-বাতিন পর্যন্ত তার আলোক বঞ্চিত অবস্থায় দুর্গতির শিকার হয়ে আছে। এ শোচনীয় পার্থক্য অনুধাবনের পর হকপন্থী লোকের ফায়সালা এই হয়—কুরআনের দাবী অনুযায়ী নিজের চরিত্র ও জীবন গঠনে আমাকে আত্মনিয়োগ করতেই হবে। পরিণতি যা হবার হোক। এতে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার, যত বিপদের মোকাবিলা করতে হয়, প্রয়োজনে জেল-যুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হয়, বুক পেতে সহ্য করে নেব। তবু কুরআনী জীবন গঠনে এগিয়ে যেতেই হবে। আপোষ কিংবা দুর্বলতার প্রশ্ন অবান্তর। মন-মানসিকতা এভাবে প্রস্তুত করত কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরই কেবল তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। আল্লাহর দরবারে তাওফীক লাভের যোগ্য পাত্র হিসেবে সে বিবেচিত হয়, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এহেন দৃঢ়তার পরিচয় দিতে অক্ষম, দুর্বলতার কারণে যার মন দোদুল্যমান, তার চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি এ রকম হয় যে, এতদিনের লালিত আকীদা, যুগ যুগের ধ্যান-ধারণা কুরআনের ছকে রূপ দিতে যাওয়ার অর্থ—অপরিচিত এক নতুন জীবনে পদার্পন করা। আপন ঘরানা নিজস্ব পরিবেশ থেকে ছিন্ন হয়ে আমাকে নিঃসঙ্গ জীবনে ফিরে যেতে হবে। মনে সংশয়ের ঝাঁকুনি অনুভব করে কুরআনের দাবী পূরণে উদ্যোগী হওয়ার পরিণামে ইতিপূর্বের ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ তো গেলই, উল্টো জেল-জরিমানা এমনকি ফাঁসির দড়িতে ঝুলাও বিচিত্র নয়। সে দেখতে পায়—কুরআনের যে বিধিবিধান, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের যে সীমাবদ্ধ হুকুম, এর সাথে নিজের আয়-উপার্জন, কামাই-রোজগার যাচাই করতে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিলাস-ব্যাসন তো দূরের কথা দু-বেলা ভাত জুটে কি না তারই বা খবর কি ? এ সময় ভয়-শংকার দেয়াল চূর্ণ করে হকের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া সকলের কাজ নয়। এর জন্য চাই শক্ত পরাণের লোক। যার বুকের খাঁচায় শিলাবৎ কলিজা বিদ্যমান। দুর্বলচিত্ত লোকেরা

www.pathagar.com

এ ফাঁদে পা রাখতেই হোঁচট খায়। উদ্দেশ্যের গতি পরিবর্তন করে আর রকমারি ব্যাখ্যার আশ্রয় খোঁজে। এ জাতীয় লোক দুই ধারায় বিভক্ত ঃ (ক) আপন খায়েশের উপর কালো কাপড়ের মোটা পর্দা চড়াতে যারা উৎসাহ বোধ করে না, এর পিছনে যাওয়ার অনুকূলে স্বীকৃতিমূলক একটা ব্যাখ্যা তারা অবশ্যই দাঁড় করায়। তাদের মতে—কুরআনের পথ সত্য-সঠিক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের ন্যায় দুর্বলের পক্ষে সে পথে চলা কি সহজ কথা ? তাই আমাদের জন্য যেমনি আছি তেমনি চলাই সুবিধাজনক। (খ) নিজের দুর্বলতাকে দৃঢ়তা আর কপটতাকে ঈমানের রূপে উপস্থিত করতে যারা উদগ্রীব, অবৈধ শখের পক্ষে তারা হরেক রকম কৌশল খুঁজে বেড়ায়। কেউ কেউ কষ্টকর ও প্রতিকূল অবস্থাকে বাহানা বানিয়ে হারামকে হালাল, নাজায়েযকে জায়েযে রূপান্তরের চেষ্টায় লেগে যায়। মনগড়া বানোয়াট ব্যাখ্যার প্রলেপ দ্বারা কেউ হকের উপর বাতিলের রং চড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ আবার যুগের চাহিদা ও পরিস্থিতির শিকার হওয়ার আড়াল খোঁজে। এদের অপকৌশল আরো আছে। ইহুদী নাসারাদের অনুকরণে আল্লাহর কালামে বিকৃতি ঘটিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। ঈমান ও কুফরের মাঝখানে নতুন পথ আবিষ্কারের উদ্যোগ নিতে কেউ কেউ খুবই তৎপর। আরেক দল আছে—কুরআনের যে অংশ নিজ মতের পক্ষে বুঝা যায়, সেটুকু গ্রহণ করতে বড় আগ্রহী। কিন্তু বিপক্ষে গেলে সে অংশ উপেক্ষা কিংবা বর্জন করতে মনের কাঁপন আদৌ দেখা যায় না।

উপরোক্ত পথ-প্রান্তর মূলত শয়তানের আবিষ্কার। এর সমর্থনে শরীআত কিংবা কুরআন-হাদীস সম্মত ভিত্তি বলতে কিছুই পাওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় এর যে কোনো পথ গ্রহণ করা হোক ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। এ ক্ষেত্রে সাফল্য ও কল্যাণ পেতে চাইলে কুরআনে বর্ণিত পথে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য। আর কোনো বিকল্প চিন্তা করা যায় না। এরজন্য দুর্জয় সাহসে ভর করে যে কোনো ত্যাগ ও জান-মাল সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এটা সত্য এ পথে চলন্ত পথিকের উপর বিপদ আসবে। আল্লাহর দেয়া পরীক্ষার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু দৃঢ় মনোবলে বলিয়ান হয়ে বান্দা যদি পরীক্ষায় উত্তরণের লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়, তখনই কেবল তার সামনে সাফল্য ও কামিয়াবীর দ্বার খোলা শুরু হয়। এক দরজা বন্ধ হলে ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহ তাঁর সামনে অন্য দরজা খুলে দেন। আপন সমাজ থেকে বিতাড়িত হলে ভিন্ন সমাজ তাকে স্বাগতম জানায়। এক দেশ তাকে আশ্রয় দানে অস্বীকৃতি জানালে নৈরাশ্যের কারণ নেই। তাকে কোলে নেয়ার জন্য অপর দেশ উন্মুখ হয়ে থাকে। কুরআনের ভাষ্যে এরি প্রতি ঈঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ - العنكبوت : ٦٩

"আমার পথে সাধনায় যারা আত্মনিয়োগ করে, তাদেরকে অবশ্যই আমি আপন পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে আছেন, এটা নিশ্চিত কথা।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯

www.pathagar.com

তাদাব্বুর (নিবিড় চিন্তা করা)

কুরআনে কারীমের কল্যাণে ধন্য হতে চাইলে চার নম্বর শর্ত তাদাব্বুরের চাহিদা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কুরআন কারীমে একাধিকবার আলোচনা দ্বারা এর গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। যথা—

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا○ ـ محمد : ٢٤

"তারা কি নিবিষ্ট মনে কুরআন সম্পর্কে চিন্ত' করে না, না কি তাদের অন্তরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ?"–সূরা মুহাম্মাদ : ২৪

সর্বপ্রথম সম্বোধিত সাহাবীগণ (রা) কুরআন পাঠ করতেন চিন্তা করে করে এবং ধীরে ধীরে। তাঁদের মধ্যে যার চিন্তা যত গভীর ছিল, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তিনি সে পরিমাণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হতেন। এ ব্যাপারে জনৈক সাহাবীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ সূরা আল বাকারা অধ্যয়নে আমার দীর্ঘ আট বছর ব্যয় হয়েছে। কুরআন অধ্যয়ন উপলক্ষে সাহাবীগণের মধ্যে সময় সময় পাঠচক্র অনুষ্ঠানের রীতি ছিল। যাতে একত্রে বসে তাঁরা কুরআন অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। এ সম্মিলিত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল—একের চিন্তা-গবেষণার আলোকে অন্যজনের উপকৃত হওয়া। কুরআন শিক্ষার এ জাতীয় সামষ্টিক পাঠের আসরের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াত সূত্রে প্রমাণিত—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকিরের আসর অপেক্ষা ফিকিরের আসরকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। পরবর্তীকালে এ ধরনের গবেষণাধর্মী আসর এবং কুরআন বিশেষজ্ঞ মনীষী বৃন্দের প্রতি আগ্রহ পোষণ আর তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া খোলাফায়ে রাশেদা বিশেষত হযরত ওমর (রা)-এর কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দ্বারা কুরআন গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা কষ্টকর নয়। অধিকন্তু এ ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস (রা)-কে হযরত ওমর (রা) যে কি কি ধরনের সহযোগিতা এবং কত প্রকারের উৎসাহ যুগিয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আয়াতের মর্ম চিন্তা উপেক্ষা করে বরকতের নিয়তে কেবল শব্দ উচ্চারণ করে যাওয়া সাহাবা কেরামগণের (রা) অনুসৃত নিয়ম ছিল না। উত্তরকালে হেদায়াতের দিশারী বিবেচনা করার পরিবর্তে কুরআন কারীমকে কেবলমাত্র বরকত হাসিলের পবিত্র কিতাব ধারণা করার প্রথা যখন থেকে চালু হলো, উপরোক্ত অবাঞ্ছিত নিয়ম কেবল সে যুগেরই উদ্ভাবন।

এখন প্রশ্ন—কি কারণে এবং কোন্ প্রেক্ষাপটে সে আবিষ্কার জন্ম নিয়েছিল ? সমকালীন পরিবেশ এবং তৎকালীন পরিবেশের আলোকে সেগুলোর চিত্র নিম্নরূপ ঃ

১. সূত্র জানতে আগ্রহীবৃন্দ আমার রচিত "মাবাদীউ তাদাব্বুরে কুরআন" দেখে নিতে পারেন। এ ছাড়াও 'মীছাক' সাময়িকীর ২য় খণ্ড, ২৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত "আহদে সাহাবা (রা) কে সবছে কমসিন মুফাস্সিরে কুরআন" শীর্ষক আমার প্রবন্ধ দেখা যেতে পারে। তাতে আমি প্রমাণ করেছি তাদাব্বুর তথা চিন্তা-গবেষণা বিষয়ে হযরত ওমর (রা) যে, ইবনে আব্বাস (রা)-কে কিভাবে উৎসাহিত করেছেন।

www.pathagar.com

ক. জীবন সমস্যার সকল বাঁধন ছিন্ন হয়ে কুরআনের সম্পর্ক যখন রয়ে গেল কেবল মরণ যাতনা লাঘবের উদ্দেশ্যে পানি পড়া আর ফুঁ-দেয়া, কবরে সওয়াব রেছানী করা।

খ. জীবন সমস্যার সমাধানে পথনির্দেশের পরিবর্তে কুরআনের ভূমিকা যখন গোমরাহী ও পাপাচারের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হল। অর্থাৎ চিরন্তন কালামে রব্বানী মানুষকে এখন হেদায়াতের পথে নিয়ে যাবে না, দেখাবেও না। এর কাজ হবে—আমরা যত পাপাচারেই লিপ্ত হই না কেন, কুরআনের মাধ্যমে তার উদ্বোধন করা, এর বরকতে সকল গোমরাহী ও পাপাচার যেন হেদায়াতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

গ. তাবীয বানিয়ে লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে দিল, যেন বালা-মুসীবত দূর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য তথা পার্থিব উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে আল্লাহর কালাম যেন পথের বিপদ ঠেকিয়ে রাখে আর লাভের অংকসহ নিরাপদে ঘরে ফিরে যায়।

পরিশেষে সত্যিকার কল্যাণ পেতে হলে একনিষ্ঠ ও নিবিড় মনে অধ্যয়নের উপর কুরআন যে পরিমাণ জোর দিয়েছে, বিশ্বের অন্য কোনো গ্রন্থ ততটুকু তাকীদের সাথে মানব গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছে—এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অথচ বাস্তবে দেখা যায় মহান আল্লাহর কালাম এহেন কুরআনই না বুঝে কেবল চোখ বন্ধ করে পড়া হয়। বস্তুত পাঠের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ও একটি তুচ্ছ পুস্তকও যদি খোলা হয়, এর পূর্বে মনের আকর্ষণ তার প্রতি নিবিড়ভাবে যুক্ত করে নিতে কেউ অনীহা দেখায় না। কিন্তু বিবেকের দুয়ারে খিল এটে, চিন্তার পথে পর্দা ঝুলিয়ে পড়তে বসা দুঃখজনক ও সর্বনাশা আচরণ একমাত্র কুরআনের পথেই লক্ষ্য করা যায়। বিস্ময় ও আক্ষেপের ব্যাপার ছাড়া একে আর কি বলা যায়?

আল্লাহর নিকট হেদায়াতের প্রার্থনা

কুরআন মজীদের কল্যাণে ধন্য হওয়ার পঞ্চম শর্ত—ভাব ও মর্ম উদ্ধারে কোথাও জটিলতা দেখা দিলে নিরাশ, মনক্ষুণ্ন, বিরূপ মনোভাব কিংবা মনে প্রতিবাদের ঢেউ তোলা সযত্নে পরিহার করত আপন সমস্যা দয়াময় আল্লাহর দরবারে পেশ করা এবং তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করাই কার্যকর উপায়। কেননা কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো কোনো সময় কুরআন গবেষণাকারীর মনে হয় এমন বোঝার তলে সে চাপা পড়ে আছে, যা বহন করা কিংবা উদ্ধার পাওয়া তার সাধ্যের অতীত। একইভাবে কোনো সময় সে অনুভব করে এমন এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, এর ব্যাখ্যা কি হবে—কিছুই বুঝে আসে না। অথবা মনের আকাশে সমাধানের রেখা উদয় হয় বটে, কিন্তু তাতে মনে সান্ত্বনা আসে না। কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমস্যা ও জটিলতার ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়ার সঠিক ও পরীক্ষিত উপায় হলো, সাধনার ধারা অব্যাহত রাখা। সাথে সাথে সমাধানের পথ চেয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকা। শেষ রাতের কুরআন তেলাওয়াত এর জন্য বিশেষ উপকারী আমল। বলতে কি কুরআনী হেকমত ও জ্ঞান ভাণ্ডারের রুদ্ধ কপাট তো নিশিরাতের দোয়া তার নির্জন মিনতির চাবি ছাড়া খোলার কোনো উপায়ই নেই। এ উদ্দেশ্যে সময় সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা ফলপ্রসূ আমল ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِىْ حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِىْ قَضَاءِ كَ
اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ
خَلْقِكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ دبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ وَغَمِّىْ -

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম। তোমার গোলাম ও বাঁদীর পুত্র। তোমার হাতে আমার প্রাণ। আমার উপর তোমারই হুকুম প্রবর্তিত। আমার ব্যাপারে তোমার ফায়সালা সত্য ও চূড়ান্ত। তোমার যে সমস্ত নামে নিজেকে তুমি সম্বোধন করেছ, আপন কিতাবে নাযিল করেছ অথবা কোনো বান্দাকে তুমি শিখিয়েছ সে নামের উসীলায় তোমার দরবারে আমার সবিনয় আবেদন—কুরআনকে তুমি আমার মনের বসন্ত, অন্তরের নূর, দুশ্চিন্তার প্রতিকার এবং দুর্ভাবনার নিরাময় বানিয়ে দাও।"

৫. তাফসীর প্রসঙ্গে কতিপয় বিশেষ বক্তব্য

পরিশেষে আমার বিরচিত তাফসীর বিষয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গ কথা তুলে ধরতে চাই। এ ব্যাপারে আত্মগর্বের সামান্যতম ছোঁয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করত একমাত্র বাস্তবের ঘটনা হিসেবে বলি—আলোচ্য তাফসীর গ্রন্থটি আমার চল্লিশ বছর ব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতি। এর পিছনে আমার সমগ্র যৌবন ভাটির স্রোতে গড়িয়েছে। এখন এই বার্ধক্যেও এর সংস্কার-সংশোধনে জীবন প্রবাহ এগিয়ে চলেছে। সুদীর্ঘ এ সময়ে মানবজীবনের বহু উত্থান-পতন দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রিয় অপ্রিয় নানা ঘটনার বিচিত্র রং একেবারে কম দেখা হয়নি। কিন্তু মহান আল্লাহর লাখো শুকরিয়া যে, এ গ্রন্থের সাথে জড়ানো সম্পর্ক কোনো কালে-কোনো অবস্থায়ই ছিন্ন হয়নি। আমার মন-মানসিকতা, অন্তরের আকর্ষণ একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অধ্যয়ন ও চিন্তার ধারা এরি প্রতি প্রবাহিত হয়েছে। পরোক্ষ মাধ্যম কিংবা সরাসরি সবার গতি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। কুরআন কারীমের সূরা-আয়াত কিংবা শব্দ এর প্রতিটির গভীরে উঁকি দেয়ার লক্ষে আমাকে প্রতিটি শীলাবদ্ধ কপাট উল্টাতে হয়েছে, যেখান থেকে কোনো তথ্য পাওয়ার আলোক দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে আমি জোর গলায় বলতে পারি—এতে ক্লান্তির আঘাতে কখনো কাতর হইনি। একাজে মনের ভুবনে সর্বদা বরং আনন্দের ঢেউ অনুভব করেছি। সাগর তলে যাওয়ার কষ্টের তুলনায় মানিক পাওয়ার আশাই আমাকে উদ্বেলিত করেছে। কবির ভাষায় ঃ

هر زماں از غیب جانے دیگر است -

"আল্লাহর প্রেমে আমি এমনি মত্ত-বেহাল, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় গায়েব থেকে আমি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হই।"

যাহোক আলোচ্য তাফসীর গ্রন্থ আমার চল্লিশ বছর অবিরাম সাধনার সোনালী ফসল। এর সাথে আমার প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ মরহুম হামীদুদ্দীন ফরাহীর ৩০/৩৫ বছরের চেষ্টা সাধনার সিদ্ধ সুফল যুক্ত করা হলে দুই পর্বে একে ৭৫ বছরের শুভ পরিণাম বলাই সঙ্গত। আলোচ্য গ্রন্থটি মরহুম ওস্তাদেরই একচ্ছত্র চিন্তার বাস্তব রূপায়ণ দাবী করার সুযোগ থাকলে আমার জন্য গর্বের বিষয় হতো। কিন্তু আমার কোনো ভুল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় কিনা, এ আশংকায় আমাকে সে দাবী থেকে সযত্নে বিরত থাকতে হল। বলাবাহুল্য—ওস্তাদ মরহুমের শিক্ষাধন্য হওয়ার অর্থ এই নয়—প্রত্যেক আয়াত সর্ম্পকে তাঁর অভিমত আমার গোচরে উদ্ভাসিত। উদ্দেশ্য বরং তাঁর সাহচর্যে আমি কুরআন অধ্যয়নের ফলপ্রসূ নিয়ম শিখেছি এবং তাঁরই নির্দেশনায় সে নিয়মের বাস্তব অনুশীলনে পাঁচ বছরের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেছি। আজো পর্যন্ত আমার সার্বিক ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা উক্ত নিয়মের অধীনে পরিচালিত। সে হিসেবে "আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ড মরহুম ওস্তাদেরই ফয়েজ ধন্য" বলাটা যদিও অসত্য ভাষণ নয়, কিন্তু যেহেতু মাধ্যম ও সরাসরি উভয় প্রকারে তাঁর শিক্ষা আমি পেয়েছি, কাজেই এর মধ্যে নির্ভুল ও প্রমাণসিদ্ধ যা কিছু আছে, তাঁরই কল্যাণ। আর ভুল-ভ্রান্তি সব আমার দুর্বলতা এবং জ্ঞান স্বল্পতার ফলশ্রুতি মনে করতে হবে।

বক্তব্য সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আনুষাঙ্গিক কথাবার্তা পরিহার করে প্রত্যেক আয়াতের শেষে আলোচনা কেবল ততটুকুই করা হয়েছে, যে পরিমাণ কথায় মর্ম চাহিদা পূরণ হয়। কেননা আয়াতের মূল বক্তব্য বুঝে নেয়ার পর আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যায় না গেলেও চলে। বুদ্ধিমান পাঠকবৃন্দ সহজেই উপলব্ধি করে নিতে পারে, আসল মর্মের সাথে আরো কি কি বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। কারণ কালামের স্থানকাল অনির্দিষ্ট থাকাবস্থায় মতপার্থক্যের অবকাশ থাকতেই পারে। বাক্যের একেক অংশের একাধিক ব্যাখ্যা দেয়া যায়। সে কারণে ইজতিহাদ ও উদ্ভাবন প্রক্রিয়া কঠিন, এমনকি সময়ে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু এ দুটো নির্ধারণের পর কুরআন বুঝার পথ অতি সহজ ও সংক্ষেপে রূপ নেয়। এমতাবস্থায় প্রথম দৃষ্টিতে প্রতিটি আয়াত তার মূল বক্তব্য প্রকাশ তো করেই, সাথে সাথে এর সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোও স্পষ্টত নির্দেশ করে দেয়। তবে এর অনিবার্য শর্ত হলো—পাঠক মনের সচেতন জাগৃতি। আর এটা এমন এক শর্ত শুধু তাফসীর কেন, জ্ঞানগর্ভ যে কোনো গ্রন্থ থেকে মর্ম উদ্ধারের পক্ষে অপরিহার্য অবলম্বন।

আলোচ্য কিতাবে অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি সামান্যই পাওয়া যাবে। কথাটা আমি আগেও বলেছি। কারণ পূর্বতন গ্রন্থ সূত্রের বরাত দিয়ে তাফসীর লিখাই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু আমি সে নিয়ম পরিহার করে কুরআন বুঝার আসল মাধ্যমগুলো সরাসরি অনুসরণ করেছি। সেগুলোই আমার তাফসীরের মৌলিক ভিত্তি। তবে সমর্থন পাওয়া গেলে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো আলোচনায় অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারগণের বরাতও দিয়েছি। এ পর্যায়ে আমার উদ্দেশ্য হলো—যে কোনো বিষয় লোকেরা প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করুক। এরি ভিত্তিতে গ্রহণ কিংবা বর্জনের অভ্যাস

www.pathagar.com

গড়ে উঠুক। নতুবা কিতাবী হাওয়ালা দেয়া কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। ইচ্ছা করলে যথেষ্ট পরিমাণে দেয়া যায়।

একইভাবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আরবী প্রবাদ বাক্যের উদ্ধৃতিও আমি কম টেনেছি। কারণ একেতো কিতাবের কলেবর বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত এর পাঠকবর্গ আরবী নাজানা উর্দুভাষী। এ জাতীয় লোকের সামনে আরবী ছন্দের উদ্ধৃতি যেমন দুর্বোদ্ধ, তদ্রূপ অর্থহীনও। এক্ষেত্রে কুরআন ভিত্তিক প্রমাণ ও উপমা দ্বারা সে অভাব পূরণ করাটাই আমি সঙ্গত মনে করেছি। কেননা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করাই যে সর্বজন স্বীকৃত কথা এবং সর্বাধিক নিশ্চিত উপায় সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। তা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে আরবী প্রবাদের হাওয়ালা আমি উদ্ধৃত করেছি, একেবারে উপেক্ষা করে যাইনি। সাহিত্য ও ব্যাকরণগত জটিলতা দেখা দিলে আরবী প্রবাদ-ছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে আমি সমাধানের চেষ্টা করেছি। এসবের হাওয়ালা দিতে কুণ্ঠিত হইনি।

আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলি—আলোচ্য গ্রন্থে এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না, সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মনে আমি যার তাফসীর করেছি। কোথাও মনে সন্দেহ থাকলে স্পষ্টত আমি সেটা ব্যক্ত করে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত একথাও আমার স্পষ্ট ভাষণ—মূল বক্তব্য থেকে সরিয়ে কোনো একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি ব্যক্তিগত রায় ঢুকিয়েছি অথবা নিজ মতের সমর্থনে তাকে ব্যবহার করেছি, এর কোনো দৃষ্টান্ত যেমন আদৌ পাওয়া যাবে না। তদ্রূপ কুরআন বহির্ভূত কোনো বিষয়ের প্রতিও মনের আকর্ষণ আমি অনুভব করি না। চিন্তা-চেতনার সংশ্লিষ্টতা তো নাইই। আকর্ষণ যদি কিছু থাকে, তবে সেটা একমাত্র কুরআন কেন্দ্রিক এবং তারই অধীনে। কথাটা আমার সত্যাশ্রয়ী কি-না, পাঠকবর্গ সেটা বাস্তবের নিরীখে যাচাই করে নিতে পারেন। এভাবে যে, কোনো বিষয়ে আমার ওস্তাদের সাথেও যদি মতবিরোধ লাগে, সেটাও আমি বিনাদ্বিধায় ব্যক্ত করেছি।

পরিশেষে কালামে এলাহীর তাফসীর কেন্দ্রিক এটা আমার নগণ্য প্রয়াস। যা সুবিজ্ঞ ও সচেতন পাঠকবর্গের সদনে উপস্থিত। এর শুকরিয়া হিসেবে এ মুহূর্তে আমার মনে আবেগের কি যে উচ্ছ্বাস, আনন্দের কত যে তোড় সে কথা প্রকাশ করতে আমার কলম রীতিমত অপারগ। দোয়া করি—ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে আল্লাহ আমার এ নগণ্য খেদমত কবুল করুন। একে জনকল্যাণের উপায় এবং আখেরাতে আমার নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলোচ্য আয়াতের ঐতিহাসিক মর্যাদা

কুরআন কারীম অধ্যয়নের আলোকে জানা যায়—এ আয়াতের বিষয়বস্তু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। প্রাচীন ধর্মীয় মহলে এবং সাধারণ ব্যবহারে এর প্রয়োগ প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যথারীতি চালু ছিল। অবশ্য অলংকারপূর্ণ শব্দে পবিত্র কুরআনেই সম্ভবত প্রথম নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর ধরন ও উপযোগিতার ইঙ্গিতে বুঝা যায় কোনো কাজের প্রারম্ভে এর মাধ্যমে শুরু করার শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ আদিকালেই দিয়েছেন। সুতরাং হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায় নিজের সঙ্গী-সাথী এবং ঈমানদার লোকদেরকে নৌকায় আরোহণ করানোর সময় এ জাতীয় শব্দই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। যথা ঃ

قَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ - هود : ٤١

"তিনি বললেন—এতে তোমরা আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–সূরা হূদ ঃ ৪১

একইভাবে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবার রাণী বিলকিস বরাবর যে পত্র দিয়েছিলেন তার সূচনাও এরি মাধ্যমে লক্ষ করা যায়। যথা ঃ

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ - نمل : ٣٠

"এ পত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং সেটাও পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করা হয়েছে।"–সূরা আন নমল ঃ ৩০

২. এ আয়াত দোয়ার অর্থবোধক

আলোচ্য আয়াত সংবাদবাহী বাক্য নয়। সূরা ফাতিহার ন্যায় এটি মূলত দোয়ার অর্থবোধক। অন্যথায় সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের অন্তরের আওয়াজ এটাই হওয়া চাই যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাজ এ বরকতময় দোয়া উচ্চারণের মাধ্যমে শুরু করবে। অতপর ওহী এলাহী এ আওয়াজকেই সুন্দর ও উচ্চাঙ্গ শব্দাবরণে প্রকাশ করেছে। কোনো কাজ শুরু করার প্রারম্ভে স্বেচ্ছা-সচেতন মনে এর উচ্চারণ স্বভাবতই বান্দাকে সতর্কমূলক স্মরণ করিয়ে দেয়—তোমার করণীয় কর্মটি আর যাই হোক খোদাদ্রোহী কিংবা নাফরমানীর

www.pathagar.com

আবর্জনায় যেন কলুষিত না হয়। সেটি বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর হুকুমের অধীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত এ দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহর 'রহমান-রাহীম' দুটি গুণবাচক নামের আশ্রয় ও ছত্রছায়া সে হাসিল করে নেয়। নাম দুটি সকল কাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভের জামানত এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতি থেকে হেফাজতের সনদ স্বরূপ। কর্ম সমাপ্তির শক্তি, শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ, পার্থিব ও পরকাল উভয় জগতে কল্যাণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উসীলা, এ দু নাম উচ্চারণে শুরু করার অন্তরালে নিহিত। পক্ষান্তরে এ দোয়া ছাড়া শুরু করা কাজ উপরোক্ত সকল বরকতের পরশ থেকে শূন্য হওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ "বিসমিল্লাহ ছাড়া আরম্ভ করা কাজ অসম্পূর্ণ ও বরকতহীন হয়ে থাকে।" জীবনের প্রতিটি কাজে এর বরকত প্রকাশ তো পায়ই, কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের প্রারম্ভে এ দোয়ার আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে ঃ

(ক) ওহীর সূচনা লগ্নে আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে আদেশ দান করেছিলেন, বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করে কার্যত বান্দা সে হুকুমটাই পালন করে নিল। যথা- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - العلق : ١ "আপনার প্রভুর নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন।"-সূরা আল আলাক ঃ ১

(খ) বরকতময় এ কালেমা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এক চিরন্তন সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়—বাকশক্তি দান করে মানব জাতিকে আল্লাহ পরম অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন। যার কল্যাণে সে আল কুরআনের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহর গুণবাচক 'রহমান' নামের মর্মান্তরে সে সত্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে। আলোচ্য আয়াতে যার উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যত্র আরো স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—মানব সৃষ্টি, কথা বলার যোগ্যতা এবং কুরআন শিক্ষার যোগ্য পাত্র হিসেবে চয়ন করা, তাঁর 'রহমানিয়াত' নামের কল্যাণে বলা যায়। আল কুরআনের ভাষায় ঃ اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ - الرحمن : ١-٤ "পরম করুণাময় রহমান কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করে তাকে বর্ণনা শিখিয়েছেন।"

–সূরা আর রহমান ১-৪

(গ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব সত্যায়নও এ আয়াতের মর্মে স্পষ্টত পাওয়া যায় যে, বিশ্ব মানবকে দেয়া শিক্ষা তিনি আল্লাহর নামে শুরু করবেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের ১৮ পরিচ্ছেদে আলোচিত ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। যথা ঃ আল্লাহ বলেন, "আমি তোমার অনুরূপ তাদেরই সমজাতীয় একজন নবী পাঠাব। যার ভাষায় আমার কালাম উচ্চারিত হবে। আমি যা আদেশ করব তাই-ই সে তাদেরকে বলবে। তাদের কাছে আমার নাম নিয়ে সে কালাম পৌঁছাবে। অতপর যারা তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আমার বাণীসমূহ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাবে, সে নবীর কাছ থেকে আমি তাদের হিসাব নেব।"

www.pathagar.com

(ঘ) কুরআন কারীম কার্যত মহান আল্লাহর 'রহমানিয়াত' গুণের বাহ্যিক প্রকাশ। অনুরূপ একই 'রহমানিয়াত' গুণের চাবি দ্বারা কুরআনী জ্ঞান ভাণ্ডারের বদ্ধ কপাট খুলতে হবে। এরি কল্যাণে বান্দার সকল বিপদাপদ বালা মুসীবত দূরীভূত হবে। এ গুণের উৎস থেকেই পাঠকের অন্তরে ভাবের প্রকাশ ও মর্মের কিরণ বিচ্ছুরিত হবে। উপরন্তু এরি আশ্রয়ে সে পথভ্রষ্টতা ও শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি পেতে পারে।

৩. আয়াতে বর্ণিত আসমাউল হুসনা

আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহ্, রহমান, রাহীম,' এ তিনটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে এগুলোর মর্ম নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ (اللّٰه)

الٰه (ইলাহ) শব্দের প্রথমে আলিফ-লাম (الف - لام) যুক্ত করে اللّٰه (আল্লাহ) শব্দ গঠিত হয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকে এ নাম কেবলমাত্র আসমান যমীনসহ সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু কিংবা ব্যক্তির নামকরণ এ শব্দ দ্বারা করা হয়নি। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে জাহেলী আরবদের মধ্যেও এ অর্থই প্রচলিত ছিল। মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপাস্য দেব-দেবীর কাউকে তারা আল্লাহর সমকক্ষরূপে বিশ্বাস কিংবা তাঁর মর্যাদায় স্থান দিত না। তারা স্বীকার করত নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলসহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক ও খালিক একমাত্র আল্লাহ। চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করত এদেরকে তিনিই সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মেঘের কোল থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং সৃষ্টিকুলের রুজি-রোজগার, পানাহারসহ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ তাঁরই দায়িত্বে এবং তিনি এ সবের একক যিম্মাদার। অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা ও আরাধনা-উপাসনা ছিল নিছক তাদের মিথ্যা আকীদার ফলশ্রুতি। তারা মনে করত এরা মহান আল্লাহর নৈকট্যশীল। আল্লাহর দরবারে এরাই তাদের পক্ষে সুপারিশের আরযী দেবে। পবিত্র কুরআনে তাদের এহেন মিথ্যা আকীদার বিবরণ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র ২/৩টি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হলো। যথা ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط - الزمر : ٣

"আমরা তো এদের উপাসনা শুধু এজন্যই করে থাকি যে, ওরা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌছে দেবে।"–সূরা আয যুমার ঃ ৩

অন্যত্র ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

www.pathagar.com

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

ـ العنكبوت : ٦١ـ٦٣

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে সেবায় নিয়োজিত কে করেছে ? তখন তারা অবশ্যই বলবে— 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়ায় ? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন আর যার জন্য ইচ্ছা কমিয়ে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন—কে আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে, অতপর সে পানি দ্বারা মৃত হওয়ার পর যমীনকে সঞ্জীবিত করে ? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে—'আল্লাহ'।"-সূরা আনকাবূত ঃ ৬১-৬৩

একইভাবে সকল শক্তির যোগ্যতা, জীবন-মরণ, বিশ্ব পরিচালনা—ব্যবস্থাপনা, হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদির মূলকেন্দ্র এবং আসল উৎসরূপে আল্লাহকে স্বীকার করে নিতেও তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। যেমন আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

يونس : ٣١

"আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান-যমীন থেকে কে রুযী দান করেন, অথবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে, অনুরূপ কেইবা মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করেন ? আর কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাই বা কার হাতে ? তারা তখন বলে উঠবে 'আল্লাহ'। তাহলে আপনি বলুন—এরপরও কি তোমরা তাঁকে ভয় কর না ?"-সূরা ইউনুস ঃ ৩১

রহমান ও রহীম

'রহমান' শব্দটি 'গাযবান' ও সাকরান' (غضبان ও سكران) -এর ওযনে আধিক্যবোধক শব্দ। রহীম শব্দ 'আলীম' ও 'কারীম' (كَرِيْم ও عَلِيْم)-এর ওযনে গুণবাচক (صفت) শব্দ বিশেষ। কারো কারো মতে রহীমের তুলনায় রহমানের মধ্যে অলংকারিক অর্থের পরিমাণ বেশি। যে কারণে রহমানের পর রহীমের উল্লেখ তাদের ধারণায় অতিরিক্ত প্রয়োগ। কেবল রহমানের ভাবার্থে জোর দেয়ার জন্য তাকীদ হিসবে এর ব্যবহার। নতুবা কালাম সিদ্ধ কিংবা ভাবের আধিক্য প্রকাশের জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। রহমান দ্বারাই সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মতে তাদের ধারণা ভুল। কারণ আরবী প্রয়োগ ও ব্যবহারিক বিধি অনুসারে 'ফা'লান' (فَعْلَان) ওযনে যত শব্দ ব্যবহার হবে, তার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আবেগের ভাব

প্রবল থাকবে। আর 'ফাঈল' (فعيل) ওযনে ব্যবহৃত শব্দে স্থিতি-যথার্থ ও চিরন্তনের অর্থ নিহিত থাকে। কাজেই উল্লেখিত সিফাতী (গুণবাচক) শব্দ দুটির একটি যথার্থ অপরটি অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত এমন নয়। বরং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়ের প্রথমটি আল্লাহর রহমতের জোশ ও আধিক্য প্রকাশ করে, দ্বিতীয়টি তার স্থিতি ও ধারাবাহিকতা। গভীর চিন্তার আশ্রয় নিলে দেখা যাবে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এ ধরনেরই তাঁর অসীম রহমতের সীমাহীন প্রকাশে কেবল জোশ আর উদ্দীপনা—আধিক্যেরই সমাবেশ ঘটে না তার মধ্যে স্থিতি ও চিরন্তনের ভাবও বিরাজমান থাকে। আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলকে এ অর্থে চিন্তা করার অবকাশ আদৌ পাওয়া যাবে না যে, আবেগের প্রাবল্যে 'নাই' জগতকে তিনি অস্তিত্বের আকারে নিয়ে তো এলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার পরিচালনা ও সংরক্ষণে উদাসীন ও নীরব-নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেন। সৃষ্টির পর বরং পূর্ণ 'রহীমিয়ত' তথা মমতা ও দয়াদ্রতা সহকারে সৃষ্টিকুলের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনায়ও তিনি সদা তৎপর। বান্দা যখনি তাঁর সদনে ফরিয়াদ জানায়, সবিনয় প্রার্থনা করে, কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করতে তাঁর শাহী দরবারে কার্পণ্য করা হয় না। অতপর তাঁর অনুগ্রহ কেবল পার্থিব জীবন পরিমণ্ডলেই সীমীত ভাবার কারণ নেই। বরং তাঁর নির্দেশিত ও সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপনকারী বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পরকালের চিরন্তন জীবনেও অবিরাম চলতে থাকবে। উপরোক্ত কথাগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন। সহজেই বুঝা যাবে—আলোচ্য রহমান-রহীম শব্দদ্বয়ের সমন্বিত প্রকাশ ছাড়া উপরে বর্ণিত তত্ত্ব ও রহস্যের ভাব পরিস্ফুট হতে পারে না।

৪. কুরআন কারীমে উক্ত আয়াতের মর্যাদা

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এখন সঙ্গত প্রশ্ন দাঁড়ায়—কুরআন কারীমে এর আসল স্থান কোথায় ? এ প্রশ্নের কারণ হলো—সূরা আত তাওবা ছাড়া প্রত্যেক সূরার প্রথমে স্বতন্ত্র আয়াত হিসেবে এটি লিখিত পাওয়া যায়। অথচ সূরা নামল ছাড়া কোনোখানেই সূরার অংশ হিসেবে প্রকাশ্য বর্ণনায় লিপিবদ্ধ নয়। যে কারণে পরবর্তীতে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়—এটি কি বিশেষ কোনো সূরার অংশ, নাকি প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে কেবল বরকত ও পার্থক্যের আলামত হিসাবে লিখা হয়। মদীনা, বসরা ও সিরিয়ার আলেম-ফকীহগণের মতে এটি কোনো সূরারই অংশ নয়। এমনকি সূরা ফাতিহারও নয়। বরং প্রত্যেক সূরার শুরুতে কেবল বরকত ও পার্থক্যকারী আলামত হিসেবে শামিল করা হয়েছে। এদ্বারা সূরাসমূহের মধ্যে পরস্পর স্বাতন্ত্র সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, তেলাওয়াতকারী কোনো সূরা আরম্ভ করার সময় এর মাধ্যমে বরকতও লাভ করতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) এ মতের সমর্থক।

পক্ষান্তরে মক্কা ও কূফার আলেম-ফকীহগণের মতে এটি সূরা ফাতিহার যেমন আয়াত, অনুরূপ প্রতিটি সূরারও অন্তর্ভুক্ত আয়াত। ইমাম শাফেঈ (র) এবং তাঁর শাগরিদগণ এমত পোষণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সাম্প্রতিক যুগের আলেমগণের মধ্যে ওস্তাদ মাওলানা হামীদুদ্দীন ফরাহী (র) একে সূরা ফাতিহার সংশ্লিষ্ট আয়াত আর অন্যান্য সূরার জন্য প্রারম্ভিক বাক্যের স্থলাভিষিক্ত বলে মত পোষণ করেন। আমার মতে মদীনার আলেমগণের অভিমত তুলনামূলক শক্তিশালী ও প্রমাণসিদ্ধ, কারণ কুরআন কারীমের বর্তমান বিন্যাসধারা ওহীর ইঙ্গিত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সম্পাদিত। আর সেই ক্রমধারা অনুসারেই বিসমিল্লাহ লিখিত হয়েছে। এ তারতীবে (ক্রমধারায়) সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লিখার ধরনে কোনো প্রকার পার্থক্য রাখা হয়নি। প্রত্যেক সূরার শুরুতে বরং একই পদ্ধতি তথা অভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। তাই আমি মনে করি—এটি কোনো সূরারই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং স্বতন্ত্র আয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

❐

www.pathagar.com

১

আল ফাতিহা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ক. সূরার আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রারম্ভে কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়ার সেই আবেগ ও চেতনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ; যা আল্লাহর প্রভুত্ব, অফুরন্ত অনুগ্রহ এবং জগত পরিচালনায় তাঁর ন্যায়-ইনসাফের বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করার পর সুস্থ বিবেক সম্পন্ন একজন মানুষের মনে জেগে উঠে এবং জেগে উঠা উচিত। অতপর বর্ণিত হয়েছে—কৃতজ্ঞতামূলক সে প্রেরণার দাবী অনুযায়ী ইবাদাত-বন্দেগী এককভাবে তাঁরই বরাবর নিবেদিত হওয়া উচিত। প্রার্থনা ও সাহায্যের হাত প্রসার করতে হলে তিনিই এর যোগ্যতম সত্তা। যার বরাবর আবেদনের হাত বাড়ানো যায়। এরপর সে প্রেরণার ফলে মনে হেদায়াত লাভের যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় বা হওয়া উচিত, সে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

খ. সূরার বর্ণনাভঙ্গি

এর ধরন মূলত প্রার্থনাধর্মী আবেদন। কিন্তু এর বাচনভঙ্গি এক অভিনব ও স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। এতে বান্দাকে সরাসরি শিক্ষা দেয়া হয়নি যে, তুমি এ নিয়ম এ ভাষায় আল্লাহর দরবারে দোয়া কর। দোয়ার ভাষা বরং আমাদের মুখ দিয়ে বের করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে—সুস্থ বিবেকের অধিকারী হলে আমাদের অন্তরে প্রশংসার যে সুর ধ্বনিত হয়, মুখে প্রকাশ করতে হলে তাকে এ সমস্ত শব্দের পোশাকেই যাহির করা চাই। সে ব্যাখ্যা সে অভিব্যক্তি যেহেতু ফিতরাত তথা স্বভাব সৃষ্টিকারী আল্লাহরই দেয়া অনুগ্রহের ফলশ্রুতি, কাজেই এর চাইতে উত্তম ও সত্যরূপ কল্পনার অতীত। নির্মল ও কলুষমুক্ত স্বভাবের অধিকারী প্রতিটি মানুষ একে অন্তরের আওয়াজ বলে মেনে নেবে। কিন্তু পাপের আতিশয্যে যাদের ফিতরাত বিকৃতির ডোবায় নিমজ্জিত, সে আওয়াজ কেবল তাদের কাছেই অপরিচিত—পর মনে হতে পারে।

❐

www.pathagar.com

১. সূরা আল ফাতিহা-মাক্কী

রুকূ' ১ আয়াত ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

১. কৃতজ্ঞতার প্রকৃত যোগ্য পাত্র আল্লাহ, তিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়াশীল। ৩. যিনি বিচার দিবসের মালিক। ৪. আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. যারা গযবেও পতিত হয়নি এবং পথভ্রষ্টও হয়নি।

১. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা

'হামদ' শব্দের বিশ্লেষণ

حَمْدٌ ঃ মুফাস্সিরগণ সাধারণ প্রশংসা শব্দ দ্বারা 'হাম্দ' এর অনুবাদ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত শব্দ পরিহার করে এ স্থলে আমি 'কৃতজ্ঞতা' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ কুরআনের যত জায়গায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়, সবখানে এ অর্থ প্রকাশের জন্যই প্রয়োগ হয়েছে। আমরা যাকে শোকর বা কৃতজ্ঞ বলে থাকি। যেমন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا ـ الاعراف : ٤٣

"তারা বলবে ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৪৩

অন্যত্র ঃ وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

"আর তাদের শেষ ঘোষণা হবে ঃ সকল কৃতজ্ঞতা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য।"
–সূরা ইউনুস ঃ ১০

অন্য জায়গায় ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ - ابراهيم : ٣٩

"সকল কৃজ্ঞতা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে এ বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৯

ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে شكر (কৃতজ্ঞতা) এর তুলনায় حمد (প্রশংসা) শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। বস্তুত সর্বগুণে গুণান্বিত এবং শিল্পশোভায় চরম উৎকর্ষের অধিকারী সত্তার পক্ষ থেকে স্বয়ং সরাসরি কল্যাণ লাভের স্বীকৃতি ক্ষেত্রে, شكر বা কৃতজ্ঞতা শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর উপরোক্ত সর্ব গুণমণ্ডিত সত্তার কল্যাণে নিজে ধন্য হোক চাই না হোক, কারো প্রতি তাঁর রহমতের বারি বর্ষিত হোক চাই না হোক, সত্তার পরিপূর্ণ গুণ সমষ্টি এবং সৌন্দর্য মধুর কামালাতের স্বীকৃতিমূলক প্রশংসার বেলায় হাম্‌দ (حمد) শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। সংক্ষেপে শোকর তুলনামূলক সীমিত অর্থ আর হাম্‌দ শব্দ ব্যাপক অর্থের বাহক। যাহোক শোকরের মর্ম তুলনামূলক সীমিত হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে তার দিকটাই প্রবল। এ কারণে আয়াতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্য হয় হামদের সাথে শোকরকেও একত্রে মিলিয়ে তরজমা করতে হবে, না হয় শুধু শোকর দ্বারা এর মর্ম ব্যাখ্যা করাই সমীচীন। ফলে কৃতজ্ঞতার যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলা সূরার উদ্দেশ্য, তা যেন পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে পারে। শুধু প্রশংসা দ্বারা এ অর্থ আদায় হতে পারে না। কেননা নিজের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক যদি নাও থাকে, তথাপী প্রশংসা করাতে বাধা বা আপত্তির কিছু থাকে না। কিন্তু এ সূরা আমাদের স্বভাব ধর্মের যে জোশ ও প্রেরণার প্রতিফলন ঘটায় আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও রাহমানিয়াত গুণের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকেই তার উৎপত্তি। আর জন্মসূত্রেই সে জোশ আমাদের সত্তায় মিশে আছে। এ কথাটা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সূরার মর্ম অনুধাবন করা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। আর শোকর শব্দ প্রয়োগেই কেবল সে অর্থ আদায় হতে পারে।

اَللّٰه ঃ বিসমিল্লাহর বর্ণনায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

'রব' শব্দের বিশ্লেষণ

رب ঃ এর অর্থ পালনকর্তা, মালিক, প্রভু। এখানে দ্বিতীয় অর্থটি প্রথম অর্থেরই ফলশ্রুতি কেননা যে সত্তা লালন-পালন করে, আসলে সে-ই মালিক, প্রভুত্বের হক তাঁরই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অধিক প্রচলনের ফলে দ্বিতীয় অর্থ বাদ দিয়ে শুধু পালনকর্তা অর্থে রব শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

বিসমিল্লাহর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—কুরআন অবতরণ যুগের সমসাময়িক লোকদের আকীদা-বিশ্বাস মতে সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। এ ব্যাপারে তাদের আকীদায় কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু 'রব' তারা বহু সত্ত্বাকে বানিয়ে নিয়েছিল। তারা বিশ্বাস করতো

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তা একক আল্লাহ্ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে জগত ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তিনি অন্যদেরকেও শরীক বানিয়ে নিয়েছেন। যে কারণে তারাও ইবাদাত আনুগত্যের হকদার। এখানে আল্লাহর পরেই রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণবাচক সিফাতী নাম বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার পালনকর্তা এবং মালিকও।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ ঃ বিসমিল্লাহর তাফসীরে আলোচিত হয়েছে।

'দীন' শব্দের বিশ্লেষণ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ঃ কুরআন কারীমে দীন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে ঃ

১. ধর্ম ও শরীআত অর্থে ঃ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ - ال عمران : ٨٣

"আল্লাহর দীনের পরিবর্তে তারা কি অন্য দীন তালাশ করে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

২. রাষ্ট্রীয় আইন অর্থে ঃ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ - يوسف : ٧٦

বাদশাহর আইনের দৃষ্টিতে আপন ভাইকে আটক করার অধিকার তার ছিল না।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬

৩. আনুগত্য অর্থে ঃ وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا - نحل : ٥٢

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু আছে সব তাঁরই মালিকানা ভুক্ত এবং তাঁরই আনুগত্য করা সকলের শাশ্বত কর্তব্য।"–সূরা আন নহল ঃ ৫২

৪. পরিণাম অর্থে ঃ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝- ذاريات : ٥-٦

"তোমাদের প্রতি কৃত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। আর সাজা ও পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।"

–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫-৬

পরিণতি দ্বারা সৎকর্মের প্রতিদান—অসৎকাজের শাস্তি, উভয় দিক বুঝানো হয়েছে। এ কারণে অনুবাদ পরিণামের সাথে আমি সাজার কথাও উল্লেখ করেছি।

সাজা ও প্রতিদান দিবসের একক মালিক হওয়ার অর্থ সর্বময় ক্ষমতা সেদিন তাঁরই আয়ত্বে কেন্দ্রিভূত হবে। তাঁর সামনে সবাই সেদিন অক্ষম। তাঁর অনুমতি ছাড়া মুখখোলা কারো সাধ্যে কুলাবেন না। সকল বিষয়ে তাঁর ফায়সালাই চূড়ান্ত কথা। যাকে ইচ্ছা সাজা দেবেন, যাকে ইচ্ছা পুরস্কারে ভূষিত করবেন। এতে কারো কিছু বলার অধিকার পুরোপুরি নিষিদ্ধ হবে। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط - حج : ٥٦

"প্রভুত্ব সেদিন আল্লারই অধিকারে, তিনিই তাদের বিচার করবেন।"–সূরা হজ্জ ঃ ৫৬

www.pathagar.com

অন্যত্র ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ○ - مؤمن : ١٦

"রাজত্ব আজ কার ? প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর।"–সূরা মুমিন ঃ ১৬

আলোচ্য আয়াতের তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব বিন্যাস দেয়া হলে অর্থ হবে—সাজা ও প্রতিদানের নির্দিষ্ট একটি দিনের আগমন সুনিশ্চিত। যেদিন সর্বময় ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তাঁর সামনে মুখ খোলে সাধ্য কার ? কিন্তু কালামের প্রার্থনামূলক ধরনের অন্তরালে এমন ভাব লুকিয়ে রাখা হয়েছে, যেন দোয়াকারী উপরোক্ত কথাগুলোকে নীরবে প্রামাণ্য সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিল। এমতাবস্থায় দুনিয়া জুড়ে ছড়ানো মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, ন্যায়-ইনসাফ ও রহমত অস্বীকারের ধৃষ্টতা কোনো দুর্ভাগা ছাড়া আর কে দেখাতে পারে ? এহেন সত্য আর প্রমাণ সিদ্ধ বিষয় মূল্যহীন মনে করা কি অমার্জনীয় অপরাধের আওতায় ধরা হবে না ?

'ইবাদাত' শব্দের বিশ্লেষণ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ—মিনতির চরম প্রকাশকে আরবী অভিধানে ইবাদাত বলা হয়। কিন্তু একথাটাই কুরআনের পরিভাষায় তুলনামূলক সীমীত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনে চরম অক্ষমতা ও মিনতি প্রকাশ করাকে ইবাদাত বলা হয়। অতপর এর সাথে আনুগত্যের অর্থ যুক্ত করা হয়েছে। কেননা সে সত্তার সদনে চরম মিনতি প্রকাশ করে আর্জি দেয়া হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমাজ, রাষ্ট্রীয় তথা জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করার কোনো যুক্তি থাকে না। কুরআনের বক্তব্যেও ইবাদাতের একই অর্থ পাওয়া যায় ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ○ - الزمر : ٢

"এ কিতাব আপনার প্রতি আমি যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি একনিষ্ট আনুগত্য সহকারে আল্লহরই ইবাদাত করুন।"–সূরা আয যুমার ঃ ২

ইবাদাতের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক অতি গভীর। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিষয়টা স্পষ্টত ব্যক্ত হয়েছে। যেমন ঃ

اَنْ لَّاتَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ○ - يس : ٦٠

"তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"
–সূরা ইয়াসীন ঃ ৬০

আলোচ্য আয়াতে বান্দার উপর আল্লাহর হক বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ বান্দার যে হক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন, সেটাও এতে বর্ণিত হয়েছে। বান্দার উপর আল্লাহর হক হল—এককভাবে তাঁরই ইবাদাত করা। শিরক ও অংশীবাদী ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় পূত-পবিত্র মনে তাঁর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করা। যাবতীয় বাসনা, মনের সকল চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাঁরই দরবারে আরয করা।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে বান্দার যে হক তিনি নিজ দায়িত্বে তুলে নিয়েছেন সেটা হল—বান্দার প্রতি তিনি রহমতের বারি বর্ষণ করবেন। সকল কাজে তাকে সাহায্য করবেন। আয়াতের প্রথমাংশে বান্দাহ আল্লাহর পাওনা হকের স্বীকৃতি জানায়। আর দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ কর্তৃক গ্রহণ করা দায়িত্ব পূরণের ফরিয়াদ জানায়। কিন্তু সে আবেদনের ভাষা ও ধরন অতি শালীন ও উচ্চাঙ্গের অলংকারে ভূষিত। এ পর্যায়ে বান্দা আপন হকের প্রতি কোনো প্রকার ইঙ্গিত-ইশারা ছাড়া শুধু নিজের প্রয়োজন ও বাসনাটুকু ব্যক্ত করে। কেননা বান্দার কোনো অধিকার নেই আল্লাহর নিকট নিজের হক দাবী করতে পারে। সে কেবল আশ্রয় কিংবা সাহায্যের আবেদন জানাতে পারে। চাওয়া ছাড়াই বান্দাকে তিনি প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়েছেন। এটা তাঁর অনুগ্রহের প্রকাশ মাত্র। যাকে তিনি বান্দার হক রূপে অভিহিত করেছেন। এ সূরা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য। "বান্দা যখন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ পাঠ করে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ এ অংশটুকু আমি ও বান্দার মধ্যে শরীকানা করলাম। আমি তাই দিয়েছি, বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—আয়াতোক্ত "আমি তোমারই সাহায্য কামনা করি।" কথাটা ব্যাপক অর্থের পরিচয় বহন করে। 'সাহায্য চাওয়া' বলতে ইবাদাত-বন্দেগী, কিংবা জীবনের যে কোনো সমস্যার সমাধান কামনা হতে পারে। কারণ ইবাদাত বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। সম্পাদন করার ক্ষেত্রে এমন এমন সমস্যা দেখা দেয়, মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া যার সমাধান মানব সাধ্যের অতীত। পদে পদে পথ হারানোর সম্ভাবনা। পা পিছলে পড়ে যাওয়ার আশংকা তো লেগেই আছে। এখানে অটল ও স্থির থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্যই একমাত্র অপরিহার্য উপায়। সুবিখ্যাত ও মহামনীষীর ইস্পাত কঠিন পদযুগল পর্যন্ত এখানে টলে যাওয়া বিচিত্র নয়। অতএব মহান আল্লাহর দস্তে রহমতের গায়েবী সাহায্য ছাড়া হেদায়াতের পথে কারো চলা কিংবা অটল থাকা সম্ভব নয়।

আলোচ্য আয়াতে 'মফউল' (কর্মবাচক পদ) প্রথমে উল্লেখ দ্বারা সীমীতকরণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইবাদাত হোক চাই সাহায্য—সব আল্লাহরই জন্য এবং সে উৎস থেকেই আসতে হবে। এ সীমীতকরণ দ্বারা শিরকের মূল সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা হয়েছে। কারণ এহেন স্বীকৃতির পর গাইরুল্লাহর নিকট চাওয়া বা পাওয়ার কিছুই থাকে না। এরপর গাইরুল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ততটুকুই বহাল থাকতে পারে বা রাখা যায়, যে পরিমাণ স্বয়ং আল্লাহ বৈধ করে দিয়েছেন।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ঃ শুধু সরল পথ দেখানোর মধ্যেই اِهْدِنَا এর অর্থ সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রয়োগ বরং আরো ব্যাপক অর্থে। যেমন—পথের বিশুদ্ধতা বিষয়ে আমাদের মনে প্রশান্তি দান কর। এ পথে চলার আগ্রহ সৃষ্ট করে দাও। চলার পথে সকল বাধা দূর করে নিরাপদ বানিয়ে দাও। চলার শক্তি দানের পর পথহারা অবস্থায় বিনাশ পতনের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর। আয়াতের বিন্যাস ধারা থেকে 'সিলা' (صلة) তথা যুক্ত বাচক পদ বিলোপ করার ফলে উপরোক্ত ভাবসমষ্টির উৎপত্তি।

www.pathagar.com

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। আস্‌সিরাতের প্রথমে যুক্ত আলিফ-লাম' (الف لام) বর্ণ দুটি নির্দিষ্টকরণ অর্থবোধক। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়—এমন পথপ্রদর্শনের আবেদন-বান্দার জন্য যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা দীন-দুনিয়া উভয় জগতে কল্যাণের যামিনদার। নবী-রাসূলগণ যে পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। যা সরল-সহজ, অদূরবর্তী এবং নেক বান্দাগণের চিরায়ত গমন পথ। যে পথের পাশ থেকে পাথহারা কুজনেরা বিভিন্ন বাঁকা ও শাখা পথ বের করে নিয়েছে, চলমান পথিকজনদের ধোঁকায় ফেলে সর্বনাশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ধোঁকাবাজেরা যত ফন্দী আটুক আল্লাহর দেয়া সে পথ আপন গতিতে অধিষ্ঠিত। যার মধ্যে বক্রতা এক বিন্দুও নেই। আর আল্লাহ মুখী পথিকজনেরা সে পথ অনুসরণে আপন লক্ষে উপনীত হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাটিতে দীর্ঘ সরল রেখা টেনে তার দুপাশে ভিন্নমুখী কয়েকটি ছোট রেখা আঁকেন। অতপর এরশাদ করলেন ঃ এ সরল রেখাটা আল্লাহর পথ। আর পার্শ্ব নির্গত রেখাগুলো সরু-সংকীর্ণ ও ভিন্নমুখী পথ। এর প্রত্যেকটার মুখে একজন শয়তান বসা রয়েছে এবং সরল পথচারীকে বিপথের আহ্বান জানায়।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ঃ যে বা যার সাথে মানুষের যত ঘনিষ্ঠতা, তাকে সে পরিমাণ স্পষ্ট করে বুঝতে ও বুঝাতে চাওয়া মানুষের স্বভাব। তাই শুধু সরল পথ প্রদর্শনের আবেদন যথেষ্ট মনে না করে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটাকে ইতি ও নেতি উভয় দিক থেকে জোরালো করা হয়েছে। অর্থাৎ পথ আমাকে দেখাবেন বটে, তবে যে পথ আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকেরা অনুসরণ করেছেন। আর নেতিবাচক দিক হলো—সে পথ নয়—যে পথে গমনকারী লোকেরা অভিশপ্ত ও পথহারা সাব্যস্ত হয়েছে। এহেন সুস্পষ্ট আবেদনের পর প্রার্থিত বিষয়ে এবং বান্দা কি চায় সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আদৌ থাকতে পারে না।

বান্দার প্রার্থিত রিষয়টি আল্লাহর পক্ষে না বুঝার কিংবা ভুল বুঝার সম্ভাবনা দূর করার জন্য উপরোক্ত তফসীলী আরযী দেয়া হয়নি। উদ্দেশ্য বরং অভিশপ্ত ও গোমরাহ লোকদের প্রতি প্রার্থী মনের অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করা এবং পথ পাওয়ার পর যেন তাতে স্থির-অটল থাকার ভাগ্য নসীব হয়। পথ পাওয়া সত্ত্বেও যারা সজ্ঞানে বিমুখ হয়েছে কিংবা মনগড়া বানোয়াট পথ অনুসরণের পরিণামে পথহারা অবস্থায় অভিশাপের শিকার হয়েছে, তাদের অবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে যেন নিরাপদ থাকা যায়। মোটকথা এ সমস্ত ধারণার জীবন্ত ছবি বুকে নিয়ে বান্দা তার প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করতে চায়।

তিন জাতীয় লোকের আলোচনা উপরোক্ত আয়াতের মূখ্য বিষয় ঃ (ক) অনুগ্রহ প্রাপ্ত (খ) অভিশপ্ত ও (গ) পাথহারা গোমরাহ। সংক্ষেপে এদের পরিচয় আলোচনা করা অসঙ্গত মনে করি না।

www.pathagar.com

অনুগ্রহপ্রাপ্ত কারা ?

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ। আয়াতাংশে নেয়ামত দ্বারা হেদায়াত ও শরীআত বুঝানো হয়েছে। যদ্বারা মানুষ দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে কল্যাণের পথ অবগত হতে পারে। এনআম (انعام) শব্দ মূল থেকে নির্গত 'আনআমতা' (أَنْعَمْتَ) ক্রিয়াপদ এখানে তার হাকীকী ও কামেল তথা মূল ও পরিপূর্ণ অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ শরীআত জ্ঞানে ভূষিত করেছেন। অতপর একে তারা একনিষ্ঠ মনে গ্রহণ করত এর জন্য সহায়-সম্পদ কুরবান করেছেন। এ নেয়ামতের যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করেননি। নিজেরা নেয়ামতের মূল্য দিয়েছেন, অপরকে এর মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রয়োজনে প্রাণ দিয়েছেন, মাল ব্যয় করতে পিছ পা হননি। এর সংরক্ষণে যা যা দরকার সবই করেছেন। এখানে আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, যে কারণে স্পষ্টত বুঝা যায় না। নেয়ামতপ্রাপ্ত সে লোকগুলো কারা। ইশারা কোন্ দলের প্রতি। কিন্তু অপর এক আয়াতের ভাষ্যে তাদের পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ـ

"আর যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৯

أَنْعَمْتَ। ক্রিয়া পদ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বাক্যে তদ্রূপ সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা বিবিধ কারণ থাকতে পারে ঃ (ক) অপ্রিয় কাজ ও কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার বেআদবী পরিহার করা। (খ) বান্দার প্রতি নেয়ামতের বর্ষণ সদা সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যা তাঁর সন্তুষ্টির পরিচয় বহন করে। কিন্তু গযব তো আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্থ জানান দেয় না। এটা বরং বান্দার কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি। কাজেই এর সম্পৃক্তি সরাসরি আল্লাহর সাথে বিবেকসম্মত হতে পারে না।

গযবে পতিত কারা ?

مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ -এর অর্থ ঃ এ দ্বারা দু ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে—

(ক) যাদেরকে আল্লাহ শরীআতের নেয়ামতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু এর যথাযথ মূল্যায়নের পরিবর্তে তারা নাফরমানী আর অবাধ্যতায় মেতে উঠে। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত শুধু অগ্রাহ্য করেই তারা ক্ষান্ত রইল না। বরং পদে পদে এর বিরোধিতা করাটাই তারা জাতীয় কর্মনীতি বানিয়ে নিল। এমন কি শরীআতের বাহক ও ধারক নবী-রাসূলগণের নির্মূল অভিযানে তাদের সক্রিয় ভূমিকা, অন্যায়ভাবে হত্যা, খুন-খারাবী আর যুলুম-নির্যাতনে সমাপ্ত হলো। পরিণামে তাদের উপর ইলাহী গযবের ঢল নেমে এলো। শেষ পর্যায়ে গযবের কষাঘাতে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব সর্বনাশের অতলে তলিয়ে গেল।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার লোক—যারা আল্লাহর দেয়া শরীআত লৌকিক ও মৌখিক অর্থে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু একনিষ্ঠ ও আন্তরিক মনে গ্রহণ করার পথ সযত্নে এড়িয়ে চলতে থাকে। লৌকিক আবরণে ঢাকা হলেও শরীআতের উপর আমলী অনুশীলন ভাসা ভাসা অবয়বে কিছুদিন বাস্তবের ভাষা পায়। অল্প দিন পর দেখা গেল লৌকিকতার সে আবরণের অস্তিত্ব এখন শূন্যের খাতায়। প্রবৃত্তির দাসত্বে নিমজ্জমান অবস্থায় শরীআতের কিছু অংশ তারা বিনষ্ট করে দিল। যা কিছু বাকী ছিল ছাঁটাইয়ের ছুরি চালিয়ে তাকে নফসানী খাহেশের চাহিদা মত বানিয়ে নিল। বিপথের অতল থেকে হাত ধরে যারা তাদেরকে সরল পথে আনার প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে এলো, সে সকল নবী-রাসূলের এক জামাতকে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে অবশিষ্টদের হত্যা করে দিল। পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে ইহুদীরা হলো এর উজ্জ্বল প্রমাণ। পরিণামে তারা অভিশপ্তের কাতারে নেমে আসে। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা উপরোক্ত কথার প্রামাণ্য দলীল। যথা ঃ

مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ - المائدة : ٦٠

"যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতক মানুষকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬০

অপর আয়াতে ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط - البقرة : ٦١

"তাদের উপর আরোপ করা হলো অপমান-লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা। তদুপরি আল্লাহর রোষানলে পতিত হলো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৬১

পথভ্রষ্ট কারা ?

ضَالِّيْنَ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে ঃ এ দ্বারা সে সকল লোকদের বুঝানো হয়েছে দীনের ব্যাপারে যাদের বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি ভক্তির আতিশয্যে নবীকে তারা আল্লাহর আসনে বসিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর দেয়া ইবাদাত বন্দেগীর নিয়ম পরিমাণ এবং নিজেদের নবীর তরীকা উপেক্ষা করে তারা গোমরাহী ও বৈরাগ্যের অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে নয়। এভাবে আল্লাহ নির্ধারিত সরল পথ পরিহার করে তারা গোমরাহী ও বিচ্যুতির ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত হয়। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে খৃস্টান জাতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপরোক্ত কারণে কুরআন এদেরকে পথহারা এবং পথভ্রষ্টকারী বলে আখ্যায়িত করেছে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝ - المائدة : ٧٧

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! নিজ ধর্মের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। আর সে সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যারা পূর্বেই পথহারা হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। ফলে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৭

২. সূরার যৌক্তিক দিক

তাওহীদ ও আখেরাতের দলীল

আলোচ্য সূরাটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে নাযিল হয়েছে। সে কারণে এর যৌক্তিক দিক ততটা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট বলে মনে হয় না। তবে বান্দার স্বীকৃতি ও আবেদন মর্মে যেসব বিষয় বর্ণিত, সেগুলো যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ স্বভাবসুলভ যুক্তি ও বিবেকসম্মত দলিলের উপর ভিত্তিশীল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনটি ভাবার উপায় নেই যে, দোয়ার ছলে আমাদের মুখ থেকে একটি কথা বলানো হলো এবং তাতে জোরালো স্বীকৃতিও পাওয়া গেল, অথচ এ সবের সমর্থনে দলিল-প্রমাণের উপস্থিতি একেবারে শূন্যের কোঠায়। আমাদের এ দোয়ার অন্তরালে দলিল-প্রমাণের কত কত দিক যে লুকিয়ে আছে, নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাই ঃ

প্রথমত, বান্দা এ মর্মে স্বীকৃতি দেয়—প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। এ স্বীকারোক্তির মূলে রয়েছে মহান আল্লাহর আদল-ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক প্রতিপালনের বাস্তব নিদর্শন। যা আমাদের অস্তিত্বসহ সৃষ্টিজগতের প্রতি বিন্দু বিসর্গে বিরাজমান দেখতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত সংক্ষেপ কথার বিস্তারিত বিবরণ হলো—মানবসন্তান হোক চাই তুচ্ছ প্রাণীর বাচ্চা, জন্মের পূর্বেই তার যাবতীয় পানাহার সামগ্রী এবং জীবন ধারণের সকল উপকরণ মওজুদ লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়াতে পা রাখার আগেই সৃষ্টিকুলের জীবন সামগ্রীর এ সার্বিক সরবরাহ এবং চাহিদা মোতাবেক উপকরণের এ পূর্ব উপস্থিতি সহজেই প্রমাণ করে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘমালার সঞ্চালন, বায়ুর প্রবাহ ইত্যাদি সৃষ্টিগত যাবতীয় উপাদান এসবের উৎপাদন এবং যথাসময় সরবরাহ কাজে সদা তৎপর ও অনুক্ষণ নিয়োজিত রয়েছে।

প্রতিপালনের এ ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবন ধারার কেবল একটি ক্ষেত্রেই নয়, বরং চিন্তা করা হলে দেখা যাবে সৃষ্ট জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি বিরাজমান। আমাদের যাহির-বাতিন, দেহ-প্রাণ, বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু সে ব্যবস্থাপনার অধীনেই প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। আমাদের দৈহিক শক্তি ও যোগ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটে। একই ব্যবস্থার আওতাধীন আমাদের আত্মীক যোগ্যতা পরিমার্জিত এবং উন্নতির পথে ধাবিত হয়। মোটকথা মানবজীবনের কোনো একটা দিক সে কুদরতী ব্যবস্থাপনায় উপেক্ষিত হয়েছে কিংবা বাদ পড়েছে বলা যাবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হতে পারে—কি উদ্দেশ্যে কোন্ স্বার্থে তিনি এহেন সযত্ন ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হলেন ? মুক্ত হস্তে ও দয়ালু প্রাণে ব্যয় করার মাধ্যমে তিনি কি আপন রাজত্ব টিকিয়ে রাখার প্রবল প্রয়াসী ? অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে মেষপালের মালিক যেমন ঘাস পানি খাইয়ে মোটা তাজা বানায় ; তদ্রূপ আমাদের প্রতিপালনের আড়ালে আল্লাহর কি কোনো স্বার্থ নিহিত ? সৃষ্ট প্রতিপালনের অন্তরালে তাঁর কি কোনো স্বার্থান্বেষী চিন্তা কার্যকর ? কেউ যদি ভাসা নযরে চিন্তা করে তাতেও স্পষ্ট বুঝা যাবে মহান আল্লাহর ব্যাপারে এ জাতীয় চিন্তা অবান্তর প্রয়াস। উপরোক্ত প্রশ্নের যৌক্তিকতা এখানে কল্পনার অতীত। এগুলো বরং কতিপয় শব্দের যোজনা মাত্র, যার অন্তরে অর্থের কোনো ছোঁয়া নেই। ভাসা চোখেই যদি এতটুকু ধরা পড়ে তাহলে গভীর চিন্তার মন লাগানোর প্রয়োজন কি ?

সে অনুপম সত্তার অনুগ্রহ বিন্দুর বিদ্যুৎ পরশে এ মহাবিশ্ব মহাকাশ 'নাই' থেকে 'আছি'র তালীকায় অন্তর্ভুক্ত, অস্তিত্বের ঘরে বিরাজমান। আমাদের মতো নশ্বর ক্ষুদ্র জীবের মুখাপেক্ষী হবেন তিনি কোন্ যুক্তিতে ? আচ্ছা, একথা বাদ দিয়ে অন্য কথায় আসি। তাহলে কি উভয় জাহানের খালিক ও মালিকের উপর আমাদের কোনো পূর্ব অধিকার পাওনা রয়েছে, যার চাপে তিনি আমাদের জন্য এত কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য ? উত্তর পরিষ্কার—এ জাতীয় কোনো কিছু কল্পনাই করা যায় না, বস্তুত যে মহাসত্তার নিছক অনুগ্রহে আমাদের জীবন, তাঁর নিকট পাওনা হকের দাবী কি করে উচ্চারিত হয়? এর কোনোটাই যদি সত্য না হয় আর বাস্তবের ভাষাও তাই, তাহলে মানতেই হবে প্রতিপালনের এ ব্যবস্থাপনার মূলীভূতকরণ তিনি রহমান তিনি দয়ালু। তাঁর দয়ার সাগরে উত্থিত ঢেউয়ের পরিণামে আমাদের অস্তিত্ব সৃষ্টিকুলের জীবন আর সৃষ্টির লালন পালনে এত যে আয়োজন, বিরামহীন এত যে সমারোহ সেটাও তাঁর অসীম দয়ার একমাত্র অবদান।

মহান আল্লাহর প্রতিপালন পদ্ধতির গভীরে নযর দিলে জ্ঞান ও মা'রিফাতের অপর একটি দ্বার স্বাভাবিকভাবেই উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেটি হলো—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মূল্যায়ন সাপেক্ষে সাজা ও প্রতিদান দিবসের আগমনী দ্বার। সর্বক্ষমতার একক ও নিরংকুশ অধিকার নিয়ে যেদিন তিনি ন্যায়ের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, সেদিন নাফরমান-পাপাচারীদের শাস্তির হুকুম জারি হবে বটে, কিন্তু ন্যায়-ইনসাফের মানদণ্ডে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীল অনুগত বান্দার প্রতিদান ঘোষিত হবে অসীম রহমতের অবারিত বর্ষণের নিরীখে।

আল্লাহর প্রতিপালন ধারা এবং তাঁর রাহমান-রাহীম গুণবাচক নামের গতিশীল প্রবাহ বিচার দিবস কিরূপে অনিবার্য করে আর কেন করে ? সঙ্গত এ প্রশ্নের উত্তর কিঞ্চিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

"আল্লাহর প্রতিপালন পদ্ধতিই বিচার দিবস অনুষ্ঠানের প্রমাণ" কথাটা আল কুরআনের একাধিক ভাষ্যে আলোচিত হয়েছে। সেটা এভাবে—যমীনকে যে আল্লাহ

www.pathagar.com

তোমাদের জীবন ক্ষেত্র বানিয়ে দিলেন, আকাশমণ্ডলকে তার শামিয়ানা বানিয়ে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক মালায় তাকে সুশোভিত করে সাজিয়ে দিলেন, মেঘমালা আর বায়ুর প্রবাহকে তোমাদের সেথায় নিয়োজিত করলেন, তোমাদের যাহেরী-বাতেনী, রূহানী-বৈষয়িক ইত্যাদির সকল চাহিদা মনোরম সামগ্রী দ্বারা পূরণ করতে কার্পণ্য দেখাননি, তোমাদেরকে তিনি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করবেন আর লাগামহীন ছেড়ে দিবেন—এটা কি বিবেকসিদ্ধ কল্পনা ? সৃষ্টির এই যে বিচিত্র ও শৈল্পিক কারখানা, সেটা কি উদ্দেশ্যবিহীন খেলার পুতুল—যার কোনো লক্ষ্য নেই যে, খেলা শেষ লাথি মেরে ভেঙে দাও। তোমরা কি লাগাম ছাড়া উটের পাল যাকে সবুজ ঘাসে ছেড়ে দেয়া হয়েছে—যা ইচ্ছা তা খাও ? তোমাদের কি কোনো দায় দায়িত্বের বালাই নেই, জবাবদিহিতার ডাক আসবে না ? যার মনে এ জাতীয় কল্পনার ছায়া রেখাপাত করে আছে, সে যে ভ্রান্তির সাগরে নিমজ্জমান বস্তু, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রতিপালনের এ বিশাল আয়োজন প্রতি মুহূর্তে সাক্ষ দেয়—তোমাদের মনের ঘোরে এ চিন্তার কোনো ভিত্তি নেই। এ আয়োজনের পিছনে অবশ্যই বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রী ভোগের আড়ালে বান্দার কোনো হক বর্তায় না। তাঁর কাছে কেউ কিছু পাওনা থাকার দাবী করতে পারে না। তা সত্ত্বেও বান্দার প্রতি রহমতের দ্বার খুলে দেয়ার অন্তরালে কার্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এ দ্বারা বান্দার উপর বিরাট দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে। আর সে হিসেবের দিনটা হবে বড় কঠিন অতি ভয়াবহ। এ জীবনে দায়িত্ব পালনের প্রমাণ হাতে উপস্থিত বান্দাকে বিচার দিবসে আনন্দের পেয়ালা পানে মত্ত দেখা যাবে। কিন্তু দায়িত্বের অবহেলা আর উপেক্ষায় গা ভাসিয়ে শূন্য হাতে যারা কাঠগড়ায় হাজির হবে, অপমান-লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কি আশা করা যায় ? কুরআনিক ভাষ্যে বিষয়টা একাধিক আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেয়া হলো। যথা ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ مِهٰدًا ○ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ○ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا ○ وَّهَّاجًا ○ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً ثَجَّاجًا ○ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ○ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ○ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ○ - نبا : ٦-١٧

"আমি কি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানাইনি ? পর্বতমালাকে পেরেক হিসাবে গেড়ে দেইনি ? তোমাদেরকে আমি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। রাতকে করেছি আবরণ। দিবসকে করেছি জীবিকা উপার্জনের সময়কাল। তোমাদের মাথার উপর নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ। (তাতে) একটি প্রদীপ সৃষ্টি করেছি উজ্জল দীপ্তিময়। মেঘমালা থেকে আমি মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করে থাকি। এর দ্বারা শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এবং তরুঘন

www.pathagar.com

উদ্যানও (এ দ্বারা উৎপন্ন করি)। নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে।"

–সূরা আন নাবা ঃ ৬-১৭

"বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে" তাতে সন্দেহের অবকাশ আদৌ থাকতে পারে না। অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ একথার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, যিনি মানুষের জন্য এত সমস্ত আয়োজন উপস্থিত করে রেখেছেন, মানুষকে তিনি লাগামহীন উটের ন্যায় ছেড়ে দেবেন—কল্পনা করা যায় না। বরং আয়াতের ঘোষণা মতে ভাল-মন্দ ফায়সালার জন্য বিচার দিবসের অনুষ্ঠান নির্ধারিত বিষয়। যার ব্যত্যয় কিংবা পরিবর্তন কল্পনার অতীত।

বলা বাহুল্য ভাল-মন্দের বিচার, সৎলোকের প্রতিদান আর অসৎলোকের সাজা দেয়ার জন্য বিচার মঞ্চ বসানোর অনিবার্যতা অস্বীকার করা যুক্তিহীন কথা। সে হিসেবে বিচারের একটা দিন ধার্য করাও জরুরী। বিচার দিবসের এই নির্ধারণ মহান আল্লাহর রহমান-রাহীম নামেরই ফলশ্রুতি। কেননা যালেম-মযলুম, সৎ-অসৎ, বিদ্রোহী-অনুগত উভয়ের সাথে অভিন্ন আচরণ করা, উভয় দলকে একই মানদণ্ডে বিচার করা রাহমান-রাহীম গুণমণ্ডিত সত্ত্বার জন্য শোভন ও মর্যাদার বিষয় হতে পারে না। একইভাবে যুলুমের পরিণামে সাজা না পেয়ে যালিম ব্যক্তির উতরে যাওয়া, চরম ত্যাগ স্বীকার করে সৎকর্ম সম্পাদন আর শত নির্যাতন ভোগ করার পর যদি সৎকর্মপরায়ণ ও নেক লোকেরা এর প্রতিদান বঞ্চিত থাকে, তবে তাঁর রহমান-রহীম নামের স্বার্থকতা কোথায় ? পার্থিব জীবনের শেষে সাজা-প্রতিদান পাওয়ার দিন যদি ধার্য না থাকে, বিচারকার্য অনুষ্ঠিতই না হয়, জীবনের কর্মশালা এমনিতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় জগৎস্রষ্টা আল্লাহর নযরে মু'মিন-কাফের, মুত্তাকী-পরহেযগার, ফাসেক-ফাজের, অপরাধী-নিরাপরাধ সব একই তুলাদণ্ডে বিচার্য—ভাল-মন্দের কোনো পার্থক্য নেই। বলতে গেলে সন্ত্রাসী-ফাসেকরাই বরং খোশহালে দিন কাটায়। স্বাধীন চিত্তে খুন খারাবী লুটপাট সবই করা গেল, আবার জবাব কিংবা বিচারের দায় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে কাঠগড়ায় হাজিরা দেয়ার বালাই থাকল না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং তাঁর রহমান-রাহীম নামের পরিপন্থী। অথচ আমরা দেখতে পাই, পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় উপরোক্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ঃ

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ○ مَا لَكُمْ ﷺ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ○ ـ قلم : ٣٥ـ٣٦

"আমি কি অনুগত মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সমতুল্য গণ্য করব ? তোমাদের কি হলো—এটা তোমাদের কোন্ ধরনের সিদ্ধান্ত।"–সূরা কলম ঃ ৩৫-৩৬

অপর আয়াতে তাঁর রহমান-রাহীম নামের অনিবার্য ফলশ্রুতি ব্যক্ত করে এরশাদ করেছেন—একদিন সকলকে তিনি সমবেত করবেন। প্রতিটি মানুষ তখন আপন কৃতকর্মের যথাযথ বিনিময় পেয়ে যাবে।

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ط ـ الانعام : ١٢

www.pathagar.com

"অনুগ্রহ প্রদর্শনকে তিনি নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তিনি অবশ্যই একত্রিত করবেন। যার আগমনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।"–সূরা আল আনআম ঃ ১২

আলোচ্য আয়াত মর্মে স্পষ্টত প্রমাণ পাওয়া যায়—কিয়ামতের বিচারানুষ্ঠান মূলত আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ। সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনকে আল্লাহ্ নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া এই—বিচার ফায়সালার একটা দিন তিনি অবশ্যই কায়েম করবেন। সেদিন সকলকে একত্রিত করে ন্যায় ভিত্তিক ফায়সালা শুনিয়ে দেবেন। যাতে কারো কিছু বলার সাহস হবে না। আপন সুপারিশ বলে কেউ সত্যকে মিথ্যা কিংবা মিথ্যাকে সত্যে পরিবর্তন করতে পারবেন না। যেহেতু সেদিন অন্যায় আর বে-ইনসাফীর মূল চূর্ণ করে ন্যায়ের অর্থ বাস্তবে প্রকাশ করা হবে এবং সেটা তাঁর অনুসৃত ইনসাফেরই চাহিদা অনুযায়ী, কাজেই সেখানে কিছু বলার—অন্যায় সুপারিশ করার অযথা সুপারিশ দ্বারা খোদায়ী ফায়সালা টলিয়ে দেয়ার প্রশ্ন অবান্তর কথা। এদ্বারা অপর তাত্ত্বিক রহস্য এটাও জানা গেল—ইনসাফ ও রহমতের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ-বৈপরীত্য বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দুটি বরং একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

কৃতজ্ঞতার প্রেরণা দীনের ভিত্তিস্বরূপ

প্রতিপালন, পরিচালন ও দয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, রহমত ও ইনসাফের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ফলে সৃষ্টের মনে কৃতজ্ঞতার প্রেরণা উদ্বেলিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রেরণার এ উচ্ছল গতিই মূলত আল্লাহর ইবাদাত এবং সকল বিপদে তাঁরই সদনে ফরিয়াদের হাত উঠাতে বান্দার প্রাণে উৎসাহ জোগায়—উদ্বুদ্ধ করে। চিন্তা করুন, তাহলে পরিষ্কার বুঝা যাবে—এ প্রেরণা একদিকে যেমন রহমত ও রুবূবিয়্যাতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ফলশ্রুতি, একইভাবে এই প্রেরণায় আপ্লুত হয়েই বান্দা আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ হয়। তখন এটা তার স্বাভাবিক চাহিদার ফলশ্রুতি হিসেবে গতি লাভ করে। বলাবাহুল্য মানব মনের জাগ্রত প্রতিটি প্রেরণার মূলে একটা সহজাত প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। যা তাকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সরল পথে আকর্ষণ করে। ফলে তার মনে আকীদা জমাট বাধে এবং বদ্ধমূল ধারণা জীবন্ত হয়ে উঠে যে, ইবাদাত-আনুগত্য করতে হলে আল্লাহরই করা চাই। সাহায্য চাওয়ার থাকে তো কেবল তাঁর দরবারে হাত প্রসার করাই সঙ্গত বিধান। যে আল্লাহ্ আপন স্বার্থে নয়, শুধু আমাদেরই কল্যাণে, তদুপরি পার্থিব জীবনের সীমা ছাড়িয়ে পরজীবন পর্যন্ত যার অনুগ্রহ প্রসারিত, ইবাদাত ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য আর কে হতে পারে? উপরন্তু মহান সত্তা এত আয়োজন এত সমস্ত উপাদান-সমারোহে কুল মাখলুখের প্রতিপালনে সদা যত্নবান, যাঁর নযরে সৃষ্টের কোনো অবস্থা অদৃশ্য থাকতে পারে না। কৃতজ্ঞতা ও ইবাদাত-বন্দেগী তাঁর অনুকূলে নিবেদিত হবে না তো কার প্রতি হবে?

কৃতজ্ঞতার এহেন প্রেরণাই সাহায্য কামনা এবং ইবাদাতে উদ্বুদ্ধ করে বান্দাকে প্রকৃত রবের দরবারে উপস্থিত করে। অন্য কথায় অপর ব্যাখ্যা এই হতে পারে—শোকরের

www.pathagar.com

প্রেরণাই বান্দার মনে ইবাদাতের চাহিদা জাগিয়ে তোলে। পরবর্তী পর্যায়ে সে প্রেরণা এবং তার সহজাত প্রতিক্রিয়াই মানব মনে দীন-ইসলামের ভিত্তি রচনা করে।

এ বিশ্বজগত এবং স্বয়ং নিজ অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর অসীম রহমত ও প্রতিপালনের বিশাল আয়োজন প্রত্যক্ষ করে মানব মনে তাঁর ইবাদাতে আত্মনিবেদনের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া সহজাত ব্যাপার। এর সত্যতা অস্বীকার করা কোনো বিবেকবানের কাজ আদৌ হতে পারে না।

ভয়ের অনুভূতিকে দীনের বুনিয়াদ সাব্যস্ত করা চলে না

কিন্তু ধর্মের উৎস কোথায় এবং কোন্ ভিত্তির উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে ? এ প্রশ্নের সমাধানে ধর্মদ্রোহিতার আবেগ জড়ানো আধুনিক দার্শনিকরা বাস্তবতা বর্জিত এক বিপরীতমুখী ও অভিনব মতবাদ উপস্থিত করে থাকেন। তারা বলেন ঃ মনে ভয়ের অনুভূতি বহন করেই মানব জীবনের যাত্রা শুরু। এখন প্রশ্ন আসে এ ভয় আসলো কোত্থেকে ? জবাবে তাদের কথা হল—অতীত যুগে সময় সময় বিশ্ব কাঁপানো ভূমিকম্প, তুফান, মহামারি ইত্যাদির ভয়াবহ চিত্র দর্শনে তাদের মনে আতংকের সৃষ্টি হয়। ভয়ের সে অনুভূতিই মানুষকে এক অদৃশ্য শক্তির পূজা-অর্চনায় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করে। আর সেই শক্তিই মূলত এ সকল দুর্ঘটনার নেপথ্য নায়ক। এক পর্যায়ে এ ধারণা মানব মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এমনিভাবে শিরকী কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষ ধর্মীয় মতবাদের জন্ম দেয়।

আমার লিখিত "হাকীকতে শিরক ও তাওহীদ" শীর্ষক পুস্তকে তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ আমি বিস্তারিতভাবে খণ্ডনের আহ্বান করেছি। এখানে আমার শুধু এটুকুই বলার—ধর্মের সূচনা সম্পর্কে কুরআন যে তথ্য উপস্থিত করে, সেটা কি বিবেকসম্মত ও গ্রহণযোগ্য, নাকি দার্শনিকদের মতবাদ ? চিন্তা ও গবেষণার আলোকে আমাদের ফায়সালা করা দরকার কোন্টা সত্য কোন্ কথা গ্রহণের অযোগ্য মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করতে চাই—দার্শনিকদের কথা মতে দুনিয়াতে কি শুধু ঝড়-তুফান, বৃষ্টি-বন্যা আর ভূমিকম্পেরই তাণ্ডব চলে ? বসন্তের আগমন, চাঁদের সিগ্ধ আয়না, ভোরের সমীরণ, প্রতি রাতে আকাশ ভরা তারার মেলা, মাঠভরা শ্যামলের সমারোহ, আঙিনায় পাকা শস্যের রাশি রাশি স্তুপের বাহার, কাননে ফুলকলিদের ফুটন্ত হাসি, শাওন রাতে ফোটা ফোটা বারি বিন্দুর নিঃশব্দ পতন, বাগানে পাখিদের কূজন ধ্বনি আর কোকিলের চিত্তজয়ী কণ্ঠ ইত্যাদির আগমনী বার্তায় মনের বনে আনন্দের ঢেউ কি ছুটায়না ? বাস্তবের নযরে শুধুই কি তুফান আর ভূমিকম্পের ভয়াবহ ছবি ভেসে বেড়ায় ? প্রতিপালনের চিত্র কি মনকে আলোড়িত করে না ? জিজ্ঞাসা আরো আছে। সৃষ্টির সুবিশাল পরিমণ্ডল এমনকি আপন দেহ-স্বভাবের অঙ্গনজুড়ে নিপুণ শিল্প শৈলীর বিস্ময়কর আয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিলে কি শুধু অদৃশ্য শক্তির ভয়াবহ দৃশ্যই ভেসে উঠবে, নাকি দয়ালু আল্লাহ—চিরন্তন মা'বূদের অনুগ্রহরাজি দর্শনে সৃষ্টের দেহমন কানায় কানায় ভরে উঠবে ? গোঁড়ামির ছলনা পরিহার করে, একচোখা নীতির রঙিন চশমা নীচে নামিয়ে মুক্ত ও স্থির মনে চিন্তার

www.pathagar.com

সুযোগ পাওয়া গেলে দার্শনিকদের মিথ্যা জালের ঘোর ছিন্ন করে মানব স্বভাব আর বিবেকের গতি কুরআনের দেয়া তথ্যের প্রতি ধাবিত হবে—কথাটা জোর গলায় এবং উচ্চ কণ্ঠে বলতে বাধা নেই।

আনন্দ-উল্লাস কিংবা অন্যান্য অনুভূতির তুলনায় ভয়ের অনুভূতি প্রবল, একথাও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। কারণ উপস্থিত প্রিয়বস্তু ছিনিয়ে নেয়া, হারিয়ে যাওয়া কিংবা হাতছাড়া হওয়ার আতংক বা আশংকাকে 'ভয়' নামে অভিহিত করা হয়। আর ছিনতাই হওয়ার জন্য প্রিয় বস্তু বা পুর্ব থেকে নিজ দখলে অবশ্যই মওজুদ থাকতে হবে। তা নাহলে হারাবেটা কি ? এবার আরেকটু ব্যাখ্যায় এগিয়ে চলুন। আপনার হাতের প্রিয় বস্তুটা আপনি পেলেন কোথায় ? নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছে। আর যে দান করে সে দাতা। তাহলে দান ও অনুগ্রহের জন্য একজন অনুগ্রহকারী বিদ্যমান থাকা অনিবার্য বিষয়। অতপর তাঁর দান-অনুদান পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অনুভূতি জাগ্রত হওয়া ফিতরাত বা স্বভাবের একান্ত দাবী। এক পর্যায়ে সে দাবীর তোড়েই বান্দা তার নেয়ামত দাতার ইবাদাত-আনুগত্যে অগ্রসর হয়। প্রশ্ন হতে পারে—বেশ, বান্দা একবার হেদায়াতের সরল পথে চলা শুরু করে অতপর চল্‌তি পথ ছেড়ে সে ভ্রান্ত পথে মোড় কিরূপে নিল ? উত্তরে একথা বলা ঠিক হবে না যে, তার স্বভাব-প্রকৃতিতে বক্রতার সুপ্ত উপাদান তাকে সুপথ থেকে বিপথে তাড়িয়ে নিয়েছে এবং এটাই তার পথভ্রান্তির মূলীভূত কারণ। বরং ইচ্ছা শক্তির ভুল ব্যবহার অথবা বিবেক দূষণকে এর কারণ চিহ্নিত করাটাই সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

–"হাকীকতে শিরক ও তাওহীদ" দ্রষ্টব্য।

ইবাদাতের স্বীকৃতি এবং আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভরশীলতার পর আমাদের সামনে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়ার পর্যায়ে উপস্থিত হয়। প্রাথমিক ভূমিকার পরে এ দোয়ার উপরই মূলত সূরার মূল বক্তব্য শেষ হয়েছে। অতপর অভিশপ্ত ইহুদী ও পথহারা নাসারাদের অনুসৃত নীতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। দোয়ার তফসীল হিসেবে নেতিবাচক ভঙিতে আবেদন শেষ করাই এখানে মুখ্য বিষয়।

৩. রেসালাতের প্রয়োজনীয়তার দলীল

উপরোক্ত ভূমিকায় বর্ণিত স্বীকৃতি এবং اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়ার মধ্যে বিশেষ তত্ত্বকথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এতে আলোচিত আল্লাহ তাআলার রহমত ও প্রতিপালনের নিদর্শন, এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করার ফলে কৃতজ্ঞতার আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া এবং সে প্রেরণার আকর্ষণে আল্লাহর ইবাদাতে অগ্রসর হওয়া—তাঁর সাহায্য কামনা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো পবিত্র অন্তর থাকা সাপেক্ষে প্রতিটি মানুষ পরিষ্কার অনুভব করতে পারে। এ পর্যায়ে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা আর সহজাত বৃত্তি যদি আপন গতি পথে চলার বাধাহীন সুযোগ পায়, তাহলে উপরোক্ত কথাগুলো স্বীকার করে নিতে অদৌ সে কার্পণ্য দেখাবে না। এমনকি বিচার দিবসের আগমনে বিশ্বাস স্থাপন করতেও সে কুণ্ঠিত হবে

www.pathagar.com

না। তবে হ্যাঁ, এক জায়গায় এসে তাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। সেটা হলো—যে আল্লাহর বন্দেগীতে সে আগ্রহী, বিপদে যাঁর সাহায্য কামনায় সে দৃঢ় প্রত্যয়ী, সে মহান সত্তার দরবারে পৌঁছার তাঁর ইবাদাতে আত্মনিবেদনের নিয়ম কি, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি জানা এবং জীবন সমস্যার সমাধান চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি কোনটি ? সে সরল পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই বান্দা সকাতরে দোয়ার হাত উঠায়- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ।

অন্তরের কাম্য বিষয়টি এখানে খাঁটি দোয়ার ভঙ্গিতে পেশ করার অর্থ—-সরল পথের দিশা দেয়া একমাত্র আল্লাহর কাজ। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এখানে অচল। পথ পাওয়ার পর তার উপর অটল থাকাও আল্লাহর অনুগ্রহ নির্ভর বিষয়। এ দ্বারা বুঝা গেল মানব প্রকৃতির জ্ঞান স্তরে একটা শূন্যতা রয়েছে। নবুওয়াতের পথ প্রদর্শন ব্যতীত যা পূরণ করা সাধ্যের অতীত। অর্থাৎ জীবন চলার পথ পাওয়ার জন্য রেসালাতের দিক নির্দেশনা একান্ত জরুরী। চিন্তা ও আকীদাগত বক্রতা পরিহার করে মানুষ যদি বিবেকের সদ্ব্যবহার করে, তাহলে আকাশ মণ্ডল এবং তার দেহাবয়বে বিদ্যমান নিদর্শনের আলোকে সে আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়, পালনকর্তা-দয়ালু তিনি, সাজা ও পুরস্কার তিনি অবশ্যই দেবেন ইত্যাদি বিষয়গুলো জেনে নিতে পারে। কিন্তু তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-পদ্ধতি উদ্ভাবন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানব জাতিকে সে পথ দেখাবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

৪. দোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

ঈমানের পর শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত নামাযের বিশুদ্ধতা আলোচ্য সূরা পাঠের উপর নির্ভরশীল। এ দ্বারা সহজেই আন্দাজ করা যায় সূরার গুরুত্ব কত যে অপরিসীম। বুখারী-মুসলিমের রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায বিশুদ্ধ নয়।

সূরার প্রতিক্রিয়া

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে কুদসী সূত্রে অত্র সূরার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং সে হিসেবে এর মর্যাদা অনুধাবন করা যায়। বর্ণিত আছে, একনিষ্ঠ মনে-পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নামাযের মধ্যে বান্দা যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সাথে সাথে এর প্রতিটি শব্দ আল্লাহর দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে। হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ قَالَ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِ

وَاِذَا قَالَ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا الْعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ۔

"আবু হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ নামাযকে আমি বান্দা ও আমার মধ্যে দুই অংশে ভাগ করে নিয়েছি। এক অংশ আমার জন্য অপর অংশ বান্দার অনুকূলে বিভক্ত। আর বান্দাকে আমি তাই দান করেছি যা সে কামনা করেছে। বান্দা যখন পাঠ করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন ঃ বান্দা আমার শোকর আদায় করেছে। যখন বান্দা বলে— اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহ বলেন—বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ বলেন—বান্দা আমার বড়ত্ব বর্ণনা করেছে। যখন বান্দা বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আল্লাহ বলেন—এ অংশটুকু আমার ও বান্দার মধ্যে শরীকানা বিষয়। আর বান্দা যা চেয়েছে আমি তাকে তাই দান করেছি। অতপর বান্দা যখন বলে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ আল্লাহ বলেন—এ অংশটুকু আমার ও বান্দার জন্য নির্ধারিত। আর বান্দাকে আমি তাই দান করেছি, যা সে কামনা করেছে।"

উক্ত হাদীসে বর্ণিত সূরা ফাতিহার মর্যাদা, হাকীকত, বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য এতই সুস্পষ্ট যে, অতপর এর ব্যাখ্যা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে পাঠ করার সাথে প্রতিটি শব্দ আল্লাহর দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার তাৎপর্য ও রহস্য বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি মনে করি না। কেননা যে তত্ত্বের আকর্ষণে বান্দার মুখে উচ্চারণ মাত্রই কবুল হয়ে গেল, সেটি চিন্তা-গবেষণার উপাদানই বটে। বলতে গেলে তাৎপর্যপূর্ণ আরো বহু দোয়া রয়েছে। কিন্তু এত শীঘ্র কবুল হওয়া সম্পর্কে এহেন বিস্তারিত বর্ণনা কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। তাহলে বুঝা গেল এর মর্মান্তরে অবশ্যই কোনো তত্ত্বকথা, কোনো জ্ঞানভাণ্ডার লুকিয়ে আছে, কবুলিয়তের এ মর্যাদা যার প্রভাব সৃষ্ট ফলশ্রুতি।

দোয়ার মাহাত্ম্য

আলোচ্য দোয়ার বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রেক্ষাপটে এর এক-দশমাংশ বরং এক শ ভাগের এক ভাগও বর্ণনায় আনা সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও এর মাহাত্ম্য বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা সঙ্গত বলেই মনে করি।

এ দোয়ায় যে বিষয় কামনা করা হয়েছে, এর চাইতে মহৎ-তদপেক্ষা উচ্চতর কোনো বিষয় আছে বলে কল্পনাই করা যায় না। কেননা এর মধ্যে বান্দা আল্লাহরই নৈকট্যে পৌঁছার উপায় হিসেবে সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের আবেদন জানায়। এ দোয়া একেতো

www.pathagar.com

ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মগর্বের দূষণমুক্ত। দ্বিতীয়ত, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করেছিলেন, হুবহু সে বিষয়টিই এতে প্রার্থনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত মানব সাধ্যের অতীত এমনিক তার বিবেক বলে হাসিল করা অসম্ভব, তেমনি প্রয়োজনীয় বিষয় লাভের দিক নির্দেশনা এতে চাওয়া হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর পথ প্রদর্শন বলে সে বিষয় হাসিল হতে পারে। তদুপরি পথ যদি পেয়েও যায় তথাপি মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তাতে অটল থাকা মানব ক্ষমতার উর্ধে। এ সমস্ত কারণে বলা যায় মহান আল্লাহর দরবারে যে বিষয়টি চাওয়া হয়, সেটি কামনার যোগ্যতাই বটে এবং একমাত্র তাঁরই নিকট চাওয়া যেতে পারে। অন্য কোথাও নয়।

দ্বিতীয় বিষয় উক্ত দোয়ার প্রারম্ভে এমন ভূমিকার অবতারণা করা হয়েছে, যার চেয়ে উচ্চমানের ভূমিকা কল্পনাই করা যায় না। আসল কথা হলো—এখানে এমন দয়ালু প্রভুর দরবারে আবেদন, যেখানে সবকিছু পাওয়া যায়—সেখানে ব্যর্থতার প্রশ্ন অবান্তর। তবে আবেদন হতে হবে নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতে। পরিশেষে ভূমিকায় উল্লেখিত কয়েকটি দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(ক) প্রথমত কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে এর সূচনা। যার যোগ্যপাত্র একমাত্র আল্লাহ। তদুপরি এ কৃতজ্ঞতার ভিত্তিতে বান্দা নেয়ামতের যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে এবং সে হিসেবেই এর পরিমাণ বেড়ে যায়। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ـ القمر : ٣٥

"যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, এভাবেই আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"
–সূরা আল কামার ঃ ৩৫

অন্যত্র ঃ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ـ ابراهيم : ٧

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তাহলে আমি (নেয়ামত) আরও বাড়িয়ে দেব।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৭

(খ) দ্বিতীয়ত, মহান আল্লাহর এমন কতকগুলো গুণবাচক নামের উসীলা দিয়ে এ দোয়া শুরু করা হয়েছে, সেগুলো অন্য সমস্ত গুণের বুনিয়াদ হিসেবে পরিচিত। ফলে এর মাধ্যমে সমস্ত গুণবাচক নামের উসীলাই যেন গ্রহণ করা হলো।

(গ) তৃতীয়ত, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াত পাঠ দ্বারা বান্দা নিজেকে যেন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর হাওয়ালা করার ঘোষণা দিল। অধিকন্তু এর মাধ্যমে এমন এক প্রভুর দ্বারে বান্দা নিজেকে দাঁড় করাল, যার কোনো বিকল্প নেই, যা অদ্বিতীয়, এখন তার দরবার একটাই, যেখানে চাওয়া যায়, পূরণের আশা এখানেই সফল হতে পারে। সারা জাহানের সম্পর্ক ছিন্ন করে আপন রবের দরবারে বান্দা যখন এমনি আত্মনিবেদনে লুটিয়ে পড়ে, নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, এমতাবস্থায় দোয়ার প্রতিটি অক্ষর কবুলিয়তের মর্যাদা না পাওয়ার কারণ থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

দোয়া সম্বলিত সূরাটির শেষাংশ চিন্তা করুন, তাহলে সহজেই বুঝা যাবে—কবুল হওয়ার জন্য এটি একটি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশের অর্থ বহন করে। দোয়ার ভাষ্যে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' তথা সরল পথ প্রদর্শনের আবেদনে বর্ণনার যে ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই প্রার্থিত বিষয়টি লাভের জন্য বান্দার আগ্রহ উদ্দীপনা পুরোপুরি প্রকাশ পায়। কেননা 'ইহ্দিনা' (اهْدِنَا)-এর মর্ম কেবল সরল পথ দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর অন্তরে বরং ব্যাপক ভাবার্থের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—সে পথের দিকে আমাদের দৃষ্টি খুলে দাও। আমাদের মনে সে পথে চলার আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও। আমাদের অন্তরে সে পথের ভালবাসা জাগিয়ে তোল। এ পথেই জীবন এখানেই মরণের তাওফীক দান কর ইত্যাদি যা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ পথে যারা অবিচল জীবন কাটিয়ে গত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি ভালবাসা আর যে সকল দুষ্টমতি লোক সরল পথ ছেড়ে গোমরাহীর অতলে নিমজ্জিত হয়েছে, তাদের প্রতি ঘৃণা ও চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশের অর্থও এ ভঙ্গির অন্তরালে নিহিত রয়েছে।

আলোচ্য দোয়ার ভাবার্থে শোভিত অলংকার শৈলীর প্রতি ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত ইশারা দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা প্রতি নামাযে একে অত্যাবশ্যকীয় করার কারণ স্পষ্টত বুঝা যায়। উপরন্তু উচ্চারণ মাত্রই প্রতিটি শব্দ আল্লাহর দরবারে কেন কবুল হয়, সে কারণও স্পষ্ট হয়ে যায়। পরিশেষে এক দিকে দোয়ার শব্দ সমষ্টি সামনে রাখুন, অপরদিকে নামাযের নির্দিষ্ট আদব ও নির্দিষ্ট আকৃতি সামনে রেখে চিন্তা করুন, এ দোয়া যে কি পরিমাণ অর্থবহ আর আল্লাহ কি চমৎকার পন্থা আমাদের শিখিয়েছেন।

৫. এক নযরে কুরআনের ভূমিকার মর্যাদা লাভের কারণসমূহ

তিনটি মৌলিক শিরোনাম

কুরআনিক সূরার ক্রমিক ধারা বিন্যাসেও সূরা ফাতিহাকে ভূমিকার স্থানে রাখা হয়েছে। হাদীসেও এর একাধিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যা এর গুরুত্বের পরিচয় বহন করে। যথা—'ফাতিহাতুল কিতাব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যার অর্থ কিতাব তথা কুরআনের ভূমিকা। উম্মুল কিতাব অর্থ কিতাবের মস্তিষ্ক। অন্য কথায়—সারসংক্ষেপ তা মূল বিষয়বস্তু। আর ভূমিকাতে সাধারণত মূল বিষয়বস্তুর প্রতি সংক্ষিপ্ত ও ইশারাপূর্ণ বিবরণ ব্যক্ত হয়। এ নামের উল্লেখ দ্বারা ভূমিকাধর্মী ফাতিহার গুরুত্ব অধিক স্পষ্ট হয়ে যায়। এর 'কাফিয়া' ও 'মুওয়াফ্যিয়া' মর্মে আরো দুটি নাম উল্লেখ্যের দাবীদার। কুরআনের সমস্ত বিষয়ের সার সংক্ষেপ যে সূরা ফাতিহায় কেন্দ্রিভূত শেষোক্ত নাম দুটি তার উজ্জল প্রমাণ। সূরা ফাতিহা যে সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

আমাদের মতে সূরা ফাতিহা মোটামোটি তিন কারণে কুরআনিক ভূমিকার মর্যাদা পেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

(ক) প্রথমত, দীন ও শরীআতের সূচনা কিরূপে হলো, এ সূরার মর্ম দিগন্তে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ সূরা নির্দেশ করে আল্লাহর ইবাদাতে সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে আর এ উৎসাহের পিছনে কিসের ভূমিকা ছিল মুখ্য ও প্রবল ? অতপর বাস্তব ক্ষেত্রে বান্দা প্রথম কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করত আল্লাহর ইবাদাতে অগ্রসর হয় ? আর কোন্ জিনিস পাওয়ার লক্ষ্যে সে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে ? যে সূরার ভাব গভীরে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর নিহিত, তাই যে কুরআনের ভূমিকা সাব্যস্ত হওয়ার উপযোগী উপাদান, বিবেকবান লোকদেরকে সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

এবার উপরোক্ত ইঙ্গিতের আলোকে আসুন, দেখা যাক সূরার দেয়া উত্তর কোন্ খাতে প্রবাহিত হয় এবং প্রশ্নের সমাধান কোন্ ধারায় এগিয়ে চলে ?

উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান পর্বে সূরার নির্দেশনা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ মহাবিশ্বের পরিচালনা এবং সৃষ্টের প্রতিপালন ধারায় ছড়ানো আল্লাহর অসীম দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের আলামত নিদর্শন মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। অতপর সে আগ্রহই প্রবল হয়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং তাঁরই নিকট সাহায্য কামনায় মানব সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার সরল পথের সন্ধানে তার মন উদগ্রীব হয়ে উঠে। তাদের সে সন্ধানী অভিলাষ পূরণ করার জন্যই আল্লাহ শরীআত ও হেদায়াতের দিশারী বানিয়ে যুগে যুগে নবী-রাসূল আলাইহিমুসালাম পাঠানোর নিয়ম চালু করেন। যার প্রভাবে মানব মনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং মানব গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান ডিঙ্গাতে থাকে। আলোচ্য সূরায় অতি সংক্ষেপে অথচ আলংকারিক নৈপুণ্যে সে রহস্য বিবৃত হয়েছে বিধায় একে কুরআনের ভূমিকা আখ্যায়িত করা যায়।

(খ) দ্বিতীয় কারণ, কুরআনের আলোচ্য বিষয় তাওহীদ, রেসালাত ও কিয়ামত মোটামোটি এ তিন শিরোনামে বিন্যস্ত। এ সূরা সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়টি তিনটি মৌলিক অর্থে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে একে কুরআনের সার সংক্ষেপ বলা অসংগত নয়। এর প্রথম দু আয়াতে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সৃষ্টজগতের নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকারী তিনিই—মর্মে ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে বিচার দিবসের অনিবার্য আগমন বিষয়ের ইঙ্গিত, সাথে তাওহীদের বর্ণনা এভাবে যে, সেদিন একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া সকল রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। কারো অধিকার সেদিন স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। চতুর্থ আয়াতের বর্ণনায় সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর সামনে বান্দার আপন সত্তা বিলিয়ে দেয়া বিষয়ক আলোচনা। যা তাওহীদের মূল কথা। পঞ্চম আয়াতে বান্দার মূল প্রার্থনা তুলে ধরা হয়েছে। এ দোয়া দ্বারাই প্রমাণ হয় সরল পথ অবগতির জন্য বান্দা নবুওয়াত, রেসালাত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হেদায়াত ও শরীআতের মুখাপেক্ষী এ দ্বারা আরো স্পষ্ট হয়—শরীআত প্রাপ্তির পর মানুষের উপর কি কি দায়িত্ব বর্তায় এবং

www.pathagar.com

সে দায়িত্ব যথাযথ মূল্যায়ন ও পালনকারী জনসমষ্টির সাথে আল্লাহর আচরণ কি ধরনের হয়ে থাকে। একইভাবে অবমূল্যায়নকারী অবাধ্য সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কৃত আচরণ বিধি কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়, সেটাও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মোটকথা আলোচ্য সূরায় দীন-ইসলামের মৌলিক উপাদানসমূহের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। অন্য কথায় ইসলামের সামগ্রিক বিধান এবং দীনের সুসংহত নীতিমালার একটা তফসীলী রূপ এ সূরার ভাব গভীরে নিহিত রয়েছে। এটা যেন মুষ্টিমেয় আয়াতের ক্ষুদ্র পরিসরে গোটা কুরআন আবদ্ধ করা। আর কুরআনের ত্রিশ পারায় ছড়ানো অর্থ ও তত্ত্বের মহাবিশ্বকে আংটির ক্ষুদ্র মর্মরে দেখানোর অর্থবোধক।

(গ) তৃতীয় কারণ, আলোচ্য সূরায় বর্ণিত আমাদের মনের সে পিপাসাই মূলত কুরআন নাযিল হওয়ার অন্যতম কারণ। উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্বে ইহুদী নাসারাকে আল্লাহ সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল পথ দেখিয়েছেন। উদ্দেশ্য—সে পথের অনুসরণে তারা নিজেরা এগিয়ে যাবে, তদ্রূপ অপরকে আহবান জানাবে। কিন্তু বাস্তবে তারা সে পথে কায়েম তো রইলই না, অপরকেও থাকতে দিল না। এমনকি পথের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দিল। এক পর্যায়ে তারা নিজেরা সত্যপথ হারিয়ে ফেলল, শুধু তাই নয়, গোটা দুনিয়াকে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল। এ সূরা মূলত সে অন্ধকার থেকে উদ্ধার পাওয়ারই বিনীত ফরিয়াদ, অন্তরের তলদেশ থেকে নির্গত আর্তনাদ। এ দোয়ার বরকতেই গোটা বিশ্ব আজ কুরআনের আলোকে ধন্য, মূর্খতার তিমির ছেদন করে আলোর জগতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি মননশীল আগ্রহ থাকলে এ দোয়ার কল্যাণেই আমরা কুরআন গবেষণার তাওফিক এবং জীবন সমস্যার সমাধানে সরল পথের সন্ধান পেতে পারি। তবে সন্ধান পাওয়াটাই শেষ কথা নয়, অটল প্রাণে তার উপর স্থিরও থাকতে হবে। আর সে স্থিরতা কেবল এ দোয়ার বরকতেই হাসিল হতে পারে। অতএব সে দৃষ্টিকোণ্ থেকে বিচার করা হলেও সূরাটি কুরআনের ভূমিকা হিসেবে স্থান পাওয়ার একান্ত উপযোগী।

৬. পরবর্তী সূরার সাথে এর যোগসূত্র

সমগ্র কুরআনের সাথে সূরা ফাতিহার কি সম্পর্ক, পারস্পরিক যোগসূত্রের ঘনিষ্ঠতা কতটুকু অটল কি পরিমাণ গভীর ? উপরোক্ত আলোচনায় এ প্রশ্নের সমাধান স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা পরবর্তী সূরা আল বাকারার সাথে এর সম্পর্ক আলোচনা করতে চাই।

এ পর্যায়ে সূরা ফাতিহার শেষাংশ আর সূরা আল বাকারার প্রথম আয়াত নিয়ে চিন্তা করা হলে স্পষ্টত বুঝা যায়—এ দুয়ের মধ্যে দোয়া আর উত্তর কিংবা দোয়ার সাথে মঞ্জুরীর ন্যায় ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান। যথা—সূরা আল ফাতিহা শেষ হয়েছে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে সকল লোকের পথ

যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।) দোয়ার মাধ্যমে। তার পরক্ষণেই সূরা আল বাকারা আরম্ভ হয়েছে—الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (আলিফ-লাম-মীম, এটি আল্লাহর কিতাব। যার মধ্যে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আল্লাহ ভীরুদের জন্য এটি হেদায়াত স্বরূপ নাযিল হয়েছে।) আয়াতের অবতারণা দ্বারা। অর্থাৎ সূরা ফাতিহার মধ্যে যে আসমানি হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের দোয়া করা হয়েছিল, সূরা আল বাকারার প্রারম্ভেই প্রার্থিত সে হেদায়াত যেন সামনে হাজির। দোয়ার পর মুহূর্তেই তার সুফল উপস্থিত দেখতে পাওয়া কার্যত মহা আনন্দের বিষয় বৈকি। রুচিশীল জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে তখন খুশীর বান ডেকে যায়। মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় তার মনপ্রাণ, শিরা উপশিরা উল্লাসে ফেটে পড়ে।

এছাড়া আরো একটা দিক এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটা হলো—সূরা ফাতিহার মধ্যে নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের পথ প্রদর্শনের সাথে সাথে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের পথ অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখার দোয়াও বর্ণিত হয়েছে। দোয়ার এ চিত্র সামনে রেখে পাঠক যখন সূরা আল বাকারার তেলাওয়াত আরম্ভ করে, তখন সে দেখতে পায়—একদিকে এতে যুগ পরিক্রমার দুষ্ট প্রভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের মধ্যে ঢুকে পড়া অবাঞ্ছিত ও প্রক্ষিপ্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাঁটাই করত একে পরিমার্জিত করা হচ্ছে। অপরদিকে নবী-রাসূল ইলাহী শরীআতের খেলাপ কৃত ইহুদী সম্প্রদায়ের পাপাচার ও অপরাধের তালিকাও বর্ণিত হয়েছে। যে অপরাধের কারণে তারা আল্লাহর গযব ও অভিশাপের যোগ্য পাত্রে পরিণত হয়। এমনকি সমকালীন জনগোষ্ঠীর ইমামত ও নেতৃত্বের আসন থেকে তাদেরকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়। বস্তুত সূরা ফাতিহায় নেয়ামত প্রাপ্ত ও তাদের বিপরীত অভিশপ্ত যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইশারা ব্যক্ত হয়েছিল, সে উভয় জাতি সম্পর্কে সূরা আল বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা ব্যক্ত হয়েছে। এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল কোন্ পথের অনুসরণ আর কোন্ পথ পরিহার করে চলা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পসন্দনীয়।

এর পরবর্তী সূরা আলে ইমরানের অবস্থাও একই। সূরা আল বাকারাতে ইহুদী সম্প্রদায়ের যেমন বিশদ আলোচনা, সূরা আলে ইমরানে তদ্রূপ নাসারা জাতির গোমরাহী ও বেদাতী কার্যকলাপ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। পরক্ষণেই হযরত ইবরাহীমসহ সকল আম্বিয়া কেরাম বিশেষত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক পেশকৃত নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল ফাতিহার পর কুরআনের ধারাবাহিকতায় এহেন বৃহত্তর সূরা দুটি স্থান পাওয়া দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয়, এ দুটি সূরা ফাতিহায় আলোচিত দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন এবং তার শেষাংশের উল্লেখিত সার সংক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২
আল বাকারা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ক. সূরার বিষয়বস্তু

ঈমানের দাওয়াত এ সূরার মুখ্য বিষয়

আল্লাহ তাআলার রুবূবিয়্যাত ও রহমতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ফলে বান্দার মনে কৃতজ্ঞতার অনাবিল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তারই সজোর আকর্ষণে মানুষ ঈমান বিল্লাহর পানে ধাবিত হয়। সে ঈমানই মূলত যাবতীয় আলাপ-আলোচনার গোড়ার কথা। যা সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে অতি সংক্ষেপে কেবল ইশারা-ইঙ্গিতে। আর সূরা আল বাকারার বিশাল আয়াত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তারই বিস্তারিত বিবরণ। অতএব ধরে নেয়া যায় 'ঈমানী দাওয়াতই' হল সূরা আল বাকারার মূল আলোচ্য বিষয়। তবে আল্লাহর প্রতি ঈমান যেরূপ এ সূরার আলোচ্য বিষয়, একইভাবে কুরআন কারীম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাসস্থাপন করাও এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আবার ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে সূরা আল ফাতিহার আলোচনায় রয়েছে ঈমান বিল্লাহর প্রাধান্য আর সূরা আল বাকারাতে ঈমান বির্‌রিসালাত তথা রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বানই প্রধান।

ঈমান বির্ রেসালাতের গুরুত্ব

ঈমানের হাকীকত তথা গোড়ার কথা মূলত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। কিন্তু জাহেলিয়াতের কবলে পড়ে তা শিরকের আবর্জনায় কলুষিত হয়ে পড়ে। আদি পিতা আদম (আ)-এর যুগে তা ছিল শিরকের আবর্জনামুক্ত। পুরোপুরি নির্ভেজাল। অতপর ধীরে ধীরে তাতে শিরকের ছোঁয়া আর কুফরীর ধোঁয়া জমতে থাকে। এ দিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো নবী-রাসূল আলাইহিস সালামগণের প্রচেষ্টায় সর্ব আবর্জনা মুক্ত হয়ে ঈমান তার পরিশুদ্ধ নির্মলরূপে ফিরে আসে। কলুষতা আর পরিমার্জনার এ টানাপোড়েন চলতে থাকে আবহমানকাল থেকে। যুগ যুগ ধরে আলো-আঁধারির এ উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে সময়ের গতি আখেরী নবী (স)-এর যুগ পর্যন্ত গড়িয়ে চলে। দুনিয়া তখন ঈমান হারিয়ে কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। শুরু হয় ঈমান বির্ রেসালাতের অস্ত্র হাতে কুফরীর আবর্জনা পরিষ্কারের সংগ্রামী অভিযান। অতএব বলতে বাধা নেই। রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া ঈমান বিল্লাহর দোর গোড়ায় পৌঁছা এবং আমাদের জীবন আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত হওয়ার আশা করা অর্থহীন প্রয়াস। মোটকথা ঈমান বিল্লাহর সাথে রেসালাতে বিশ্বাস যুক্ত হওয়ার পরই কেবল খোদায়ী রং-এ রঞ্জিত জীবন আশা করা যায়।

অপরপক্ষে রেসালাত বিশ্বাস ঈমান বিল্লাহর সূত্র থেকেই উৎসারিত। গভীর দৃষ্টিতে উপরোক্ত কথার যথার্থতা সহজেই আন্দায করা যায়। কেননা ঈমান বিল্লাহর ফলে বান্দার মনে হেদায়াতের আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠে। সূরা আল ফাতিহার اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ। আয়াত সে আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ—যা দোয়ার আকারে বর্ণিত হয়েছে। সে দোয়ার জবাবেই আলোচ্য সূরা আল বাকারা কুরআন এবং নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। এ যেন বান্দাকে জানিয়ে দেয়া—মহান আল্লাহর ইবাদাত আনুগত্যের অপরিহার্যতা স্বীকার করার পর সে পথের সন্ধান পেতে হলে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং এর বাহক রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনা তোমার একান্ত জরুরী।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে স্পষ্ট বুঝে আসা স্বাভাবিক সূরা আল ফাতিহা সূরাটি আকারে ছোট হলেও মর্যাদায় প্রকাণ্ড, কেননা এর কাণ্ড থেকে বিকশিত প্রথম এবং একটি মাত্র শাখাই আমাদের গোটা জীবন বেষ্টন করার জন্য যথেষ্ট। অবশিষ্ট শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবের কথা তো বলাই বাহুল্য। এ দ্বারা "আল কুরআনের ত্রিশ পারা জুড়ে ছড়ানো বিষয়-বক্তব্য, ব্যাখ্যা-বিবরণ সমস্তটাই সূরা আল ফাতিহার মূল থেকে অংকুরিত বৃক্ষ এবং সে পবিত্র গাছেরই শাখা প্রশাখা, পত্র-পল্লব" মর্মে আমাদের মন্তব্যের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। যা সূরা আল ফাতিহার তাফসীরে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খ. সূরায় সম্বোধিত সম্প্রদায়

এ সূরার মূল সম্বোধন ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি

ইহুদী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই এ সূরার মূল বক্তব্য। তবে আনুষঙ্গিক হিসেবে স্থানে স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলিম জাতি এবং বনী ইসমাঈল গোত্রের উদ্দেশ্যেও বক্তব্য রাখা হয়েছে। এতে ইহুদী সম্প্রদায়ের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। যার কারণে নিজেদেরকে তারা ইমামত ও প্রভুত্বের জন্মগত এবং একচ্ছত্র অধিকারী সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। ফলে তারা মনে করত আপন সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হননি এমন ভিন্ন গোত্রীয় নবীর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা অপমানের ব্যাপার—লজ্জার কথা। জাহেলী আরব গোত্রীয় নবীর প্রতি ঈমান আনার তো প্রশ্নই আসে না।

স্থানে স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপদেশ দেয়া হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় আরো বলা হয়েছে—কা'বাগৃহ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করেছিলেন, তিনি তারই ফলশ্রুতি। অদিকন্তু তাঁকে একথাও জানানো হয়েছে—বিরোধী গোষ্ঠীর হিংসামূলক অপতৎপরতা নস্যাৎ হয়ে তাঁর দাওয়াত অচিরেই কামিয়াব এবং তাঁর দীনকেই আল্লাহ বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—বিশ্বমানব সমাজে আল্লাহর দীন পৌঁছানো অতপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদেরকে উত্তম অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতির মর্যাদায় ভূষিত করে

www.pathagar.com

তাদের উপর শরীআত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এখন সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করা এবং সে ভার বহনে সর্বশক্তি নিয়োগ করা তাদের ঈমানী কর্তব্য। ফলে একদিকে তারা হবে মানব জাতির পথ প্রদর্শক। অপর দিকে ভবিষ্যত মানবগোষ্ঠীর আদর্শ ও অনুসরণীয় জীবন চরিত রেখে যাওয়াও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। তখনই কেবল আল্লাহর নির্দেশের যথার্থ মূল্যায়ন করেছে মর্মে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের বীজ ঢুকানো, তাদেরকে উস্কানি দিয়ে আল্লাহ বিরোধী অসৎকর্মে জড়িয়ে ফেলা, শ্রেষ্ঠ ও শেষ উম্মতের মর্যাদার আসন থেকে তাদেরকে উৎখাত করা ইত্যাদি ইহুদী চক্রান্ত ও হিংসামূলক আচরণ সম্পর্কেও আলোচ্য সূরার বিভিন্ন স্থানে সতর্ক করা হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় চতুর্থ পর্যায়ে বনী ইসমাঈল গোত্রকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে ইহুদী মুশরিক চক্রপ্রসূত মনগড়া বেদআত ও বানোয়াট আকীদার কলুষতা পরিষ্কার করে নির্ভেজাল মিল্লাতে ইবরাহীম পেশ করে। তারপর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে—তোমাদের মধ্য থেকে আখেরী নবীর আবির্ভাব আল্লাহর বিরাট বড় অবদান। তদুপরি উম্মতে মুসলিমা হিসেবে তোমাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাছাই করা তাঁর মহা অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইহুদী চক্রের ভ্রান্তিজালে আটকা পড়ে আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। অন্যথায় যিল্লতী আর লাঞ্ছনার শিকার হওয়া ছাড়া তোমাদের উপায় থাকবে না।

গ. সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

বিষয়বস্তু পর্যালোচনার উপযোগী স্থান এটা নয়। তবে যেখানে আয়াতের তাফসীর করা হবে, সেখানে অবশ্য আলোচ্য বিষয়ের পর্যালোচনা আসতে পারে এবং সেটাই তার উপযুক্ত স্থান। এর আগে ভাসা ভাসা একটু আলোকপাত করে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না। এ দ্বারা বিষয়বস্তুর সাথে সূরার অংশগুলোর পরস্পর সম্পর্ক জ্ঞাত হওয়া সহজ হবে, অপর দিকে সূরা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণাও পাওয়া যাবে।

আমার মতে বিষয়বস্তু হিসেবে সূরা আল বাকারার ভূমিকা, চারটি পরিচ্ছেদ ও সমাপ্তি—এই ছয় ভাগে বিভক্ত, এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ভূমিকা

১-৩৯ আয়াত পর্যন্ত সূরার ভূমিকা বলা যায়। এতে প্রথমত কুরআনের প্রতি ঈমান কারা আনবে আর কারা আনবে না, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতপর কুরআন নাযিল হওয়ার পরও যে দল ঈমান আনতে নারাজ, কিসে তাদের বাধা দিল, কোন্ জটিলতার কারণে তাদের মনে সর্বনাশা এই অনীহা ? সে বিষয়ে বর্ণনা এতে স্পষ্ট

www.pathagar.com

ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তদুপরি "ঈমান না আনার কোনো সুযোগ নেই" মর্মে বনী ইসমাঈলদের সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে কুরআনের আগমন সত্ত্বেও ফিতনাবাজ ইহুদীদের চক্রজালে আটকা পড়ে ঈমানের ন্যায় মহিমাময় নেয়ামত লাভে বঞ্চিত হওয়া তাদের জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। ভূমিকার এ অংশ আদি মানব ও আবুল বাশার হযরত আদম আলাইহিস সালাম খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়া আর চির শত্রু শয়তানের হিংসামূলক বিরোধিতার বর্ণনায় শেষ হয়েছে। আদম ও শয়তানের এ ঘটনা মূলত দর্পণ স্বরূপ। যার মধ্যে নবী করীম (স)-এর আবির্ভাব এবং কুরআনী দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় পক্ষ-বিপক্ষ যাবতীয় বিরোধিতা কিংবা সহযোগিতার চিত্র ভেসে উঠে। আদমের খেলাফত বিষয়ে ফেরেশতাদের আপত্তি কিন্তু তার উত্তর পাওয়ার পর তাদের নীরব নিশ্চিন্ত হওয়া কার্যত সে সকল লোকদের বিরোধিতার দৃষ্টান্ত, প্রথম প্রথম মহানবী (স)-এর দাওয়াতের কোনো কোনো দিক না বুঝার কারণে যারা সন্দিহান কিংবা বিরোধী ছিল। কিন্তু যেহেতু তারা ছিলেন বিদ্বেষ প্রবণতার উর্ধে, সরল প্রাণের সত্যপন্থী লোক, তাই সত্য বুঝে আসার সাথে সাথে তারা মহানবী (স)-এর প্রতি বিশ্বাসীর ভূমিকা গ্রহণ করত আত্মনিবেদনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে আত্মগৌরব, বংশ মর্যাদা, হিংসা আর ক্ষমতার মোহে অন্ধ ইহুদী ও কুরাইশী নেতারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণে ভূমিকা গ্রহণ করে। যা শয়তানের বিরোধিতার সাথে তুলনীয়। সত্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় বিরোধিতা দূরীভূত না হয়ে ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বাস্তবে দেখা যায় মহানবী (স)-এর দাওয়াতের সত্যতা যতই উজ্জ্বল হতে থাকে, তাদের শত্রুতা ততই উর্ধমুখে ধাবিত হয়।

এ অংশে ইহুদী এবং তাদের সমমনা গোষ্ঠীর সামনে সে সত্যের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে যে, আদম আলাইহিস সালামের খেলাফতের বিপক্ষে দুষ্টমতি ইবলীসের মনে যে ক্রোধ ও হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল, আখেরী নবী (স)-এর বিরুদ্ধে তোমাদের অন্তরও সে একই অনলে বিদগ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত। দ্বিতীয়ত আরো প্রকাশ করা হয়েছে— ইবলীসের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত লেলিহান শিখা সত্ত্বেও আদম আলাইহিস সালামকে খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। একইভাবে তোমাদের অন্তর ক্রোধ আর হিংসার অনলে যতই বিদগ্ধ হোক, আখেরী নবী (স)-এর রেসালাত শেষ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।

ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান

৩৯-১২১ আয়াতে বিস্তৃত পরিমণ্ডলে ইহুদী জাতিকে এ মর্মে স্পষ্ট ভাষায় আহ্বান জানানো হয়েছে, নবী উম্মীর প্রতি তোমরা ঈমান আন। যার ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং তোমাদের আসমানি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। অতপর সতর্কতার সূরে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে দীনে হকের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তাদের থেকে তাওরাতে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে, পার্থিব মোহ আর হিংসার কবলে পড়ে তারা যেন বিরোধী ভূমিকায় তলিয়ে না যায়। উপরন্তু তাদেরকে সত্য ছেড়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আর হকের উপর কায়েম থাকার জন্য তারা যেন ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য গ্রহণ করে।—৪০-৪৬ আয়াত

অতপর একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে—বংশ মর্যাদা কিংবা আভিজাত্যের বাহার নয়, ঈমান এবং সৎকর্মই মূলত মান-মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়। ইহুদীরা ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিল—তাদের মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ)-এর বংশজাত সুবাদে প্রাপ্ত। যে কারণে তাদের বিশ্বাস ঈমান-আমলের পরিবর্তে কুল গৌরব আর আভিজাত্যের আদলে গড়ে উঠে। এহেন অন্যায় অভিজাত্যরোধের তাড়নাই মহানবী (স)-এর রেসালাতে ঈমান গ্রহণে তাদের জন্য বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। এখানে তাদেরকে স্পষ্টত বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যাবতীয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তোমাদের উপর কৃত অনুগ্রহ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং অস্বীকৃতির পরিণামে তোমাদেরকে সাজাও দেয়া হয়েছে। অতএব আত্মগর্ব আর বংশগৌরব নস্যাৎ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস। মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্য বিমুখ হওয়া তোমাদের জন্য আদৌ কল্যাণকর হবে না।—৪৭-৬৩ আয়াত

ইহুদীদের প্রতি সতর্কবাণী

অতপর জাতীয় পর্যায়ে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ইহুদীরা কোথায় এবং কিরূপে ভঙ্গ করেছে। তাদের গাদ্দারী ও অপরাধ প্রবণতার বিবরণও ব্যক্ত হয়েছে, যা ছিল তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। পরিশেষে আল্লাহ, শরীআত ও কুরআন সম্পর্কে তাদের অবমূল্যায়ন ধর্মী মনোভাব, কল্পনাজাত মনোবৃত্তি এবং বিদ্রোহপূর্ণ মানসিকতা উল্লেখ করে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। যার পরিণামে ভয়াবহ দুরাবস্থার শিকার হওয়া তাদের জন্য অবধারিত।

উপরে বর্ণিত বিশদ আলোচনা ইহুদীদের জাতীয় চরিত্র এবং দীন-ইসলাম, নবী-রাসূল, আসমানি গ্রন্থ ইত্যাদির সাথে তাদের আচরণের একটা দৃশ্য মাত্র। শরীআতের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গে তারা যে কুৎসিত পারদর্শিতা দেখিয়েছে, তার একটা নমুনা এতে দেখানো হয়েছে। তাই ইমামতের মর্যাদা থেকে তাদের বহিষ্কার করে যোগ্য লোকদের সে দায়িত্বে বসানো অযৌক্তিক বলা যায় না। বাস্তবে তাই হয়েছে। চরিত্র দোষে তারা বহিষ্কৃত হয়েছে এবং শরীআতের সে আমানত অন্য জাতির কাছে অর্পণ করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ৬৪ থেকে ১২১ আয়াত পর্যন্ত সে বিষয়েরই সুস্পষ্ট আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা

আলোচ্য সূরার ১২২ থেকে ১৬২ পর্যন্ত আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর জীবনধারা কা'বাঘর নির্মাণ, মুসলিম জাতির উত্থান এবং নবী করীম (স)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত দোয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। যা তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। সূরার এ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে ইহুদী কিংবা নাসরানী নয় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম ছিল

www.pathagar.com

ইসলাম। আর ইসলামের দাওয়াতের জন্যই উম্মতে মুসলিমা তথা মধ্যপন্থী একটি জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বরকতেই মসজিদে আকসার পরিবর্তে মসজিদে হারামকে মুসলিম জাতির কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। বস্তুত মসজিদে আকসা মুখী নামায আদায়ের বিধান ছিল অবস্থার প্রেক্ষাপটে একটা সাময়িক ব্যাপার, যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়।

ভয়ের প্রাবল্যকে দীনের ভিত্তি সাব্যস্ত করার অসারতা ঃ অতপর একই অংশে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বলা হয়েছে—নব নির্ধারিত কেবলা এখনো যেহেতু মুশরিকদের কবলে তাই এর উদ্ধারে মু'মিনদেরকে জান-মাল কুরবান করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহর সাহায্যে পরিণামে বিজয় মু'মিনদেরই পদতলে লুটিয়ে পড়বে। তবে এর জন্য শর্ত হলো—ধৈর্য ও নামাযের আশ্রয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর খণ্ডিত এ জীবন কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য—যে নবী আর যে উম্মতের জন্য তিনি দোয়া করেছিলেন মুসলমানরাই সে উম্মত, মুহাম্মদ (স)-ই সে পয়গম্বর। কাজেই তাঁর দাওয়াত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত, তাঁর কেবলা আসলে ইবরাহীমেরই কেবলা। এর দ্বারা খানায়ে কা'বা এবং মারওয়ার কুরবানগাহ সম্পর্কে ইহুদীরা তাদের গ্রন্থে যে মিথ্যা রটনা ও বানোয়াট তথ্য সন্নিবেশ করেছিল, সে সমস্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। কার্যত এ দুটি ঐতিহাসিক স্থান বিজড়িত ইবরাহীম (আ)-এর যাবতীয় নিদর্শন—সকল সম্পর্ক বিলোপ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কুরআনের বর্ণনা তাদের সে ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছে।

হুকুম আহকাম

১৬৩-২৪২ আয়াতের পরিমণ্ডল মূলত বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের অধ্যায়। এ অংশে উম্মতে মুসলিমাকে দেয়া শরীআতের মৌলিক বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানে ইহুদী-মুশরিকরা যে বিকৃতি ঘটিয়েছিল, এখানে বিকৃতির সে বানোয়াট পর্দা ছিন্ন করে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য বিধি-বিধান বর্ণনাকালে ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় ধারাবাহিকতা রক্ষার পরিবর্তে পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিন্যাস দেয়া হয়েছে। মোটকথা বাস্তবমুখী শিক্ষা এবং কল্যাণধর্মী তরবিয়তের প্রেক্ষাপটে এখানে ক্রমধারা বিবেচনা করা হয়েছে। বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোর ক্রমধারা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ তাওহীদ সম্পর্কিত বিধান ১৬৩-১৭৬ আয়াতে। নামায-রোযা ১৭৭ আয়াতে। খুনের বদলে খুন এবং রক্তপণ (دِيَتْ) বিষয়ক বিধান ১৭৮-১৭৯ আয়াতে। অসিয়তের হুকুম ১৮০ থেকে ১৮২ আয়াতে। রোযা ১৮৩-১৮৭ আয়াতে। হারামখোরী ও ঘুষের নিষিদ্ধতা ১৮৮ আয়াত। হজ্জ-জিহাদ, আল্লাহর পথে ব্যয়, ১৮৯-২১৮ আয়াতে।[১] (অবশ্য কা'বাগৃহ তখনো মুশরিকদের কবজায় ছিল।) জুয়া, মদপান, কল্যাণ বিবেচনায় এতিমের মাল নিজ মালের সাথে মিশ্রণের অনুমতি, মুশরিক নারী বিয়ের নিষিদ্ধতা

১. আল্লাহর পথে ব্যয়ের হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে বিষয় তিনটির উদ্ভব। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

২১৯-২২১ আয়াতে। বিবাহ, তালাক, ঈলা, খোলা রেযাআত, বিধবার খোরপোষ, দেন মোহর এবং দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য হুকুম ২২২-২৪২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর পথে জিহাদ

অতপর ২৪৩-২৮৩ আয়াতের বক্তব্য বিষয় আলোচনায় আনা যায়। এ অধ্যায়ে কাফেরদের অধিকার থেকে মিল্লাতে ইবরাহীমের প্রাণকেন্দ্র খানায়ে কা'বা উদ্ধারকল্পে মুসলমানদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল গোত্র নিজেদের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য ফিলিস্তিনীদের সাথে যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল বিভিন্ন দিক থেকে সেটি আমাদের বদর যুদ্ধের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সংশ্লিষ্ট আয়াতে তার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। অতপর আনুষঙ্গিক হিসাবে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' তথা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপমা দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কোন্ ধরনের মানুষকে আল্লাহ অন্ধকার থেকে আলোর পথে টেনে আনেন আর কোন্ শ্রেণীর লোকদেরকে তিনি অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেন। এরপর আল্লাহর পথে ব্যয় করার বরকত-বৈশিষ্ট্য, তার শর্ত এবং কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় খাতের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্ণিত হয়েছে। সাথে এর বিপরীত সুদের অবৈধতা এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদান ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

সর্বশেষে ২৮৪-২৮৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহ আলোচ্য সূরার পরিশিষ্ট পর্যায়ের বর্ণনায় বিধৃত। এখানে চিরন্তন সত্যকে ভাষার আবরণে ভূষিত করে বলা হয়েছে—নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর প্রভুত্ব বলয়ের আওতাধীন, নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র তাঁরই। গুপ্ত কিংবা ব্যক্ত সবকিছুর হিসাব অবধারিত। অতপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। যাকে ইচ্ছা সাজা দেবেন—এতে কারো বলার কিছু নেই। অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এ কিতাব কেউ মানুক চাই নামানুক আল্লাহর রাসূল এবং মু'মিনগণ মেনে নিয়েছেন। পরিশেষে মু'মিনদের দোয়ার মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত হয়েছে। কিতাবে ইলাহী সম্পর্কে এ দোয়ার প্রতিটি শব্দ বিরাট দায়িত্বের অনুভূতি প্রকাশ করে। ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠী যে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সে দায়িত্বভার এখন উম্মতে মুসলিমার উপর অর্পণ করা হলো।

❐

www.pathagar.com

রুকূ' ৪০ | ২. সূরা আল বাকারা-মাদানী | আয়াত ২৮৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ① ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ②
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤

১. আলিফ-লাম-মীম ২. এটি আল্লাহর কিতাব। যাতে আদৌ কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহকে ভয়কারীদের জন্য পথপ্রদর্শনকারী। ৩. যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে ৪. এবং যারা বিশ্বাস করে সে সমস্ত বিষয় যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এবং সে সমস্ত বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা সুনিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। ৫. তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত আর তারাই মূলত সফলকাম।

১. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা

'হুরূফে মুকাত্তাআত' সংশ্লিষ্ট সূরার নাম

الم ঃ এটি একটি পূর্ণ বাক্য। আরবী ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এখানে 'মুবতাদা' (উদ্দেশ্য) উহ্য রয়েছে। একে প্রকাশ করা হলে বাক্যের আকার হবে— هذه الم। (এটি আলিফ-লাম-মীম নামে অভিহিত)। উহ্য বিষয়টিকে অনুবাদে আমি প্রকাশ করে দিয়েছি।

বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে এটি এবং এ জাতীয় বর্ণগুলোকে হরফে মুকাত্তাআত বলে এবং এগুলোকে পৃথক পৃথক উচ্চারণে পড়া হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের যেরূপ নাম-শিরোনাম থাকে, সূরার প্রারম্ভে হরফে মুকাত্তাআতগুলোও তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট সূরার নাম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে মর্মে সহজেই প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'যালিকা' (ذٰلِكَ) 'তিলকা' (تِلْكَ) দ্বারা ইশারার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সূরার নামে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত হরফগুলো যে সংশ্লিষ্ট সূরারই নাম। এ মত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

যে সমস্ত সূরার শুরুতে এই হরফগুলো বর্ণিত হয়েছে, সে সকল সূরা দু-ধরনের। (ক) কিছু সূরা হরফের নামে নামকরণকৃত। যেমন—ত্বা-হা, ইয়াসীন, ক্বাফ, নূন ইত্যাদি (খ) কতিপয় সূরা ভিন্ন নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

'মুকাত্তাআত'-এর অর্থ

হরফগুলোর অর্থ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। যে কারণে কারো মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কুরআন একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। যার ভাষ্য বচন আর শব্দ সম্ভারে জটিলতা কিংবা অস্পষ্টতার কোনো ছাপ নেই। যা সবাই জানে এবং কুরআনের দাবীও তাই। এমতাবস্থায় এর কোনো কোনো সূরার নাম এত অস্পষ্ট কেন যার অর্থ কারো জানা নেই?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়—আরবদের বাগধারায় এ জাতীয় হরফের ব্যবহার অপরিচিত ছিল না। এর মর্ম বরং উত্তমরূপে তাদের জানা ছিল। কাজেই এ জাতীয় হরফ দ্বারা সূরার নামকরণে কুরআনের স্পষ্টতায় কোনো প্রকার প্রশ্ন কিংবা জটিলতা সৃষ্টি হয় না। তবে সঙ্গত প্রশ্ন এটা হতে পারে—এ সমস্ত হরফ দ্বারা সূরার নামকরণ আরব রুচিবোধের অনুকূল ছিল কি-না? আমরা বলতে চাই—অবশ্যই ছিল। কুরআন নাম রেখেছেন এটাই তার প্রমাণ। এ নিয়ম আরব সমাজে অপরিচিত থাকলে এ ব্যাপারে নাক সিটকিয়ে কথা বলা তাদের জন্য বিচিত্র ছিল না, যে কিতাব বোধগম্য অর্থে সূরার নাম রাখতে জানে না, সেটি কিতাবে মবীন তথা সুস্পষ্ট বাচনধর্মী গ্রন্থ হওয়ার দাবী হাস্যকর। এ দাবী মেনে নেয়ার যুক্তি খুঁজতে যাওয়া অবান্তর প্রয়াস।

সমসাময়িক আরবরা কুরআনের বিশুদ্ধতা, বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে নাম ধরনের প্রশ্ন তুলেছে। কুরআনে সে সবের উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু এ জাতীয় কোনো প্রশ্ন তারা উত্থাপন করেছে মর্মে কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। এ দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয়—হরফ সমৃদ্ধ নামকরণ আরব সমাজে অপরিচিত কিংবা দুর্বোধ্য ছিল না।

এ ছাড়া আরব ঐতিহ্য এবং আরব সাহিত্য সম্পর্কে অবগতি যাদের পরিচ্ছন্ন ও শানিত, তারা জানে এ জাতীয় নামকরণে তারা অপরিচিত থাকা তো দূরের কথা, তারা নিজেরাই বরং ব্যক্তি, বস্তু, ঘোড়া, পতাকা, তরবারি এমনকি ভাষণ-কবিতা পর্যন্ত তারা এ জাতীয় নামে নামকরণে অভ্যস্থ ছিল। সে নাম কখনো একক কখনো যুক্ত শব্দে রাখা হতো। এতে নামের সাথে নামকৃতের মর্মগত কোনো সম্পর্ক থাকাও জরুরী ছিল না। বরং নামই বলে দিত এটি অমুকের জন্য গঠন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত নামের অর্থ তালাশ করাও রীতি বিরোধী কথা। যখন জানা গেল এটি কারো নাম, তখন তার অর্থ জানতে চাওয়ার কোনো মানে হয় না এবং জানতে কেউ চায়ও না। কেননা নাম দ্বারা যার নাম তাকে জানাই উদ্দেশ্য, অর্থ বুঝা নয়। তাই কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নামের অর্থ তালাশ করার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তবে এটা সত্য, নাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার কারণে শ্রোতা কিংবা পাঠক মনে অবশ্যই আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এর পিছনে হেতু কি, সম্পর্কই বা কোন্ পর্যায়ের ? সে আগ্রহই তাকে রহস্যের সন্ধানে ধাবিত করবে। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের অনেকেই এ জাতীয় কুরআনিক নামের রহস্য উদ্ধারে প্রাণপাত চেষ্টা-সাধনায়, মেধা ও মনন ব্যয় করেছেন। যদিও সাফল্যের নাগাল বড় একটা পাওয়া যায়নি। তবে আমাদের মতে তাঁদের এ সাধনা ভুলও ছিল না। তদ্রূপ আমরাও যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেই, সেটাকেও ভুল বলা যাবে না। প্রচেষ্টা সফল হলে জ্ঞানের পরিধি প্রসার হলো। ব্যর্থ হলে আমাদের জ্ঞানের ত্রুটি আর কুরআনের অসীমতা প্রমাণ হয়ে গেল। তবু আমরা একথা কিছুতেই বলতে পারি না যে, এ সমস্ত নাম অর্থহীন শব্দের সমাহার মাত্র।

বলা বাহুল্য নিজ জ্ঞানের ত্রুটি আর মহাগ্রন্থ আল কুরআন এক সীমাহীন জ্ঞান ভাণ্ডার হওয়ার অনুভূতি থাকাটাও বিরাট জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ। যে অনুভূতির কল্যাণে ইল্‌ম ও মারিফতের অসংখ্য পথ খুলে যাওয়া বিচিত্র নয়। বস্তুত কুরআনের প্রথম বর্ণটিই চাবিরূপে মারিফতের দ্বার খুলে দেয়া তার অন্যতম মু'জিযার পরিচয় বহন করে। কেননা একটি মাত্র হরফের রহস্য উদ্ধার করা যেখানে কারো পক্ষে সম্ভব হল না, সেক্ষেত্রে, কেবল মু'জিযার পরশে শত সহস্র রুদ্ধ পথ খুলে যাওয়া আল কুরআনের কৃতিত্বই বলা যায়।

হুরূফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে মাওলানা ফরাহীর দৃষ্টিভঙ্গি

হুরূফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের ব্যক্ত করা অভিমত প্রমাণ সিদ্ধ বুনিয়াদের উপর ভিত্তিশীল নয় বিধায় এখানে সে সবের উল্লেখ অর্থবহ হবে বলে মনে করি না। তবে এ প্রসঙ্গে আমার ওস্তাদ মরহুম মাওলানা হামীদুদ্দীন ফরাহীর অভিমত সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। এ দ্বারা আসল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না বটে, তবে এর আলোকে সমাধানের একটা কিরণরশ্মি আমার নযরে ভেসে বেড়ায়। তাঁর দেয়া তথ্য অবলম্বনে অন্যরা পথের দিশা পেয়ে যাওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়। ক্রমান্বয়ে এমনিভাবে গবেষণার পথ এগিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি।

আরবী লিখন পদ্ধতি বিষয়ে অবগত লোকদের জানা আছে আরবী বর্ণমালা ইবরানী ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর ইবরানী বর্ণমালা প্রাচীন আরবী ভাষায় প্রচলিত বর্ণমালা থেকে। প্রাচীন আরবী লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা ফরাহীর গবেষণাধর্মী অভিমত হলো—ইংরেজী-হিন্দী বর্ণমালার ন্যায় এটা শুধু ধ্বনির প্রকাশ ঘটায় না, বরং চীন দেশীয় বর্ণমালার অনুরূপে অর্থ ও বস্তুরও প্রতীকরূপে প্রচলিত ছিল। আর যে অর্থ ও বস্তুর প্রতীক চিহ্নিত হত সাধারণত সে সকল বস্তুর আকৃতিতে বর্ণ গঠন করার নিয়ম

www.pathagar.com

প্রচলিত ছিল। মাওলানার গবেষণা মতে প্রাচীন মিসরীয়রাও একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। অতপর নিজেদের কল্পিত সংস্কারের মাধ্যমে বর্ণমালাকে তারা প্রতিমার আকারে রূপ দেয়। প্রাচীন মিসরে এমনিভাবে 'খণ্ডে তিমছালী' তথা 'প্রতিমা পদ্ধতির' প্রচলন ঘটে। পিরামিডের শিলালিপিতে এখনো এর কিছু কিছু নমুনা লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণমালার অর্থ বর্তমানে বিলোপ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কোনো কোনোটার অর্থ এখনো পরিচিত। সেগুলোর লিখন পদ্ধতির মধ্যে প্রাচীন ধারার কিছুটা ঝলক এখনো লক্ষ্য করা যায়। যথা—প্রাচীন নিয়মে আলিফ (ا) বর্ণের অর্থ গাভী ছিল বলে জানা যায়। আর গাভীর মাথার আকৃতি কল্পনা করেই এটি গঠন করা হয় এবং সে হিসাবেই লিখা হত। 'বা' (ب)-এর অর্থ ইবরানী ভাষায় 'বাইত' যার অর্থ ঘর। জীম (ج) বর্ণটি ইবরানী ভাষায় 'জীমাল' جيمل অর্থবোধক। আরবীতে জামাল (جمل) তথা 'উট' বলা হতো। ত্ব (ط) বর্ণ দ্বারা সাপের অর্থ বুঝানো হতো। লিখাও হতো সাপের আকৃতি কল্পনা করেই। 'মীম' (م) দ্বারা জল তরঙ্গ বুঝানো হত। লিখাও হত ঢেউয়ের আকৃতিতে।

নিজ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে মাওলানা ফরাহী সূরা 'নূন' (ن) -এর দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। তাঁর মতে নূন (ن) বর্ণটি এখনো প্রাচীন 'মাছ' অর্থেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে সূরা নূনের কথা আলোচনা করা যায়। এতে صاحب الحوت অর্থাৎ 'মাছ ওয়ালা' বলে হযরত ইউনুস (আ)-এর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মাওলানা ফরাহী সূরাটিকে নূন নামে অভিহিত করার কারণ উল্লেখ করে বলেন ঃ এতে যেহেতু হযরত ইউনুস (আ)-এর মাছের পেটে যাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তাই চিন্তার প্রবাহ স্বভাবতই ধাবিত হয় যে, সে ঘটনার প্রেক্ষিতেই সূরাটির এ নামকরণ করা হয়েছে। কাজেই ধরে নেয়া যায়—হরূফে মুকাত্তাআত যুক্ত অন্যান্য সূরাসমূহের আলোচ্য বিষয়ের সাথে হরফগুলোর প্রাচীন অর্থের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কুরআন শরীফের এ জাতীয় অন্যান্য সূরার নামকরণ দ্বারাও মাওলানা ফরাহীর আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায়। যথা-ط বর্ণটি প্রাচীনকালে সাপ অর্থে প্রচলিত ছিল, এর লিখন কাঠামোও সাপের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। ط বর্ণে শুরু করা সূরা طه-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। এতে সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরপরই হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে طسم-طس ইত্যাদি সূরাগুলোও ط বর্ণ দ্বারা শুরু হয়েছে এবং এগুলোও তাঁর হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে।

"আলিফ" সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি—প্রাগৈতিহাসিক বাগধারায় এর অর্থ ছিল গাভী। লিখাও হত গাভীর মস্তক সদৃশ আকারে। দ্বিতীয়ত 'এক আল্লাহ' অর্থেও তৎকালে এর প্রচলন ছিল। কুরআন শরীফ লক্ষ্য করুন, আলিফ দ্বারা নাম শুরু হওয়া সূরা বাকারাতে গাভী যবাই করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তার নামের প্রথম অক্ষরটিও আলিফ। অন্যান্য যে সকল সূরার নাম আলিফ দ্বারা শুরু হয়েছে সেগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় প্রায় একই ধরনের। অর্থাৎ তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদই

www.pathagar.com

সবগুলোর মূল বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, সমস্ত সূরায় নামের মিল রয়েছে, সেগুলোর আলোচ্য বিষয় এবং বর্ণনা ভঙ্গিও প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির।

বস্তুত হরূফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে জ্ঞান-গবেষণার নতুন একটা দিক খুলে যাওয়ার আশা নিয়েই এখানে মাওলানা ফরাহীর উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা। আমার মতে—তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি এখনো কেবল গবেষণার উপাদানরূপে চিহ্নিত হওয়ার উপযোগী, বাস্তব প্রয়োগের সময় আসেনি। সবগুলো হরফের সঠিক তথ্য উদ্ধার করে নামকরণকৃত সূরার সাথে এর সম্পর্ক চিহ্নিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ মতকে নির্ভরযোগ্য মনে করা ঠিক হবে না। কার্যত কুরআনের মূল্যবোধ সম্পর্কে যাদের অবগতি আছে, সে সকল আলেম-গবেষকদের জন্য এটা একটা ইশারা মাত্র। অধিক তত্ত্ব লাভে আগ্রহী ব্যক্তি বর্গ এ পথে সাধনা করে দেখতে পারেন। সম্ভবত আল্লাহ পথের জটিলতা দূর করে দিতে পারেন।

আয়াত ঃ ২

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

'যালিকা' ও 'হাযা' শব্দের তাৎপর্য

ذٰلِكَ ঃ নাহুবী তথা আরবী ব্যাকরণ বিদগণের মতে ذٰلِكَ দ্বারা দূরের আর هٰذَا দ্বারা নিকটের বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, এ দ্বারা লোকেরা সাধারণত ভ্রান্তির শিকার হয়। তারা মনে করে দূরের বস্তু বুঝাতে হলে ذٰلِكَ আর নিকট বস্তু বুঝাতে হলে هٰذَا ব্যবহার করাই নিয়মসিদ্ধ। অথচ তাঁদের উদ্দেশ্য এটা নয়। বরং তাঁদের মূলকথা হল—শ্রোতার জানা আছে অথবা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, এমন জিনিস বুঝাতে হলে ذٰلِكَ ব্যবহার করা বিধেয়। 'আর যে বিষয় এখনো বলা হয়নি পরে বলা হবে, সেক্ষেত্রে هٰذَا ব্যবহার করাই বিধানসম্মত। আরবী ভাষী লোকেরা ذٰلِكَ ও هٰذَا ইঙ্গিতবাচক শব্দ দুটিকে উপরোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করে থাকে। কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হলে অলংকার শাস্ত্রের (بلاغت) নিয়ম অবলম্বন করা হয়। যেমন পূর্ব আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ইশারার ক্ষেত্রে ذٰلِكَ এর পরিবর্তে هٰذَا ব্যবহার করা হলে উদ্দেশ্য থাকে বক্তব্য বিষয়কে শ্রোতার সামনে উপস্থিত করে দেয়া। অনুরূপ هٰذَا এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহার করা হলে উদ্দেশ্য হবে বক্তব্য বিষয়কে শ্রোতার সামনে উপস্থিত করে দেয়া। অনুরূপ هٰذَا এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহার করা হলে উদ্দেশ্য হবে—ইশারাকৃত বিষয় বা বস্তুটি এতই সম্মানের এতই মর্যাদাবান—যাকে সামনে উপস্থিত করা মূলত বেআদবীর শামিল।

ذٰلِكَ[১] দ্বারা এখানে সূরার আলোচ্য নামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য এ الم কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল অংশ। পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় ইঙ্গিতের বহু উপমা লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

১. এ জাতীয় ইশারার ক্ষেত্রে লিঙ্গ (مؤنث - مذكر) ভেদের পার্থক্য অলংকার শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সূচিত হয়। তাই এখানে শব্দ বিশ্লেষণে নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া আমরা সমীচিন মনে করি না। কেননা অন্যান্য কিতাবে এ সমস্ত বিষয় সহজেই পাওয়া যায় এবং বহুল পরিমাণে। তবে এ ব্যপারে এতটুকু স্মরণ রাখা দরকার—ইঙ্গিত বাচক শব্দ দ্বারা কখনো কিতাব, কখনো কুরআন আবার কোনো কোনো সময় সূরা বুঝানো হয়ে থাকে, যে কারণে কোথাও ذٰلِكَ কোথাও تلك দ্বারা ইশারা হয়।

www.pathagar.com

حٰمٓ - عٓسٓقٓ - كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - شورى : ١-٣

"এটি হা-মীম-আইন-সীন-ক্বাফ। এমনিভাবে পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের প্রতি ওহী নাযিল করেন।"-সূরা শূরা ঃ ১-৩

অন্যত্র طٰسٓ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ

"এটা ত্বা-সীন, এগুলো আল-কুরআন এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।"
–সূরা আন নমল ঃ ১

কিতাবের অর্থ

الْكِتٰبُ ঃ কুরআন শরীফে 'কিতাব' শব্দটি পাঁচটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. তাকদীরের লিখন। যথা ঃ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - الانفال : ٦٨ "পূর্ব থেকেই এটি যদি আল্লাহর লিখিত বিষয় না হত, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে কারণে ভয়াবহ আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করত।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬৮

২. আল্লাহর লিখিত রেকর্ড বুক। যথা ঃ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ - ق : ٤ "আর আমার কাছে রয়েছে সংরক্ষিত কিতাব।"–সূরা ক্বাফ ঃ ৪

৩. সংবাদবাহী পত্র যথা ঃ اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ - نمل : ٢٩ "আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।"–সূরা আন নমল ঃ ২৯

৪. বিধি-বিধান। যথা ঃ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ - الجمعة : ٢ "এবং তাদেরকে তিনি শরীআত ও হেকমত শিক্ষা দেন।"–সূরা জুমুআ ঃ ২

৫. আল্লাহর নাযিলকৃত কালাম। কালাম দ্বারা সম্পূর্ণ কিতাব কিংবা তার বিশেষ কোনো অংশ উভয়টি বুঝানো হতে পারে।

সম্পূর্ণ কিতাবের দৃষ্টান্ত সূরা আল আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াত। وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ - الاعراف : ١٧٠ "আর আল্লাহর কিতাবকে যারা শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭০

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বিতীয় অর্থের উপমা। اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ - ال عمران : ٢٢ "আপনি কি তাদের দেখতে পান না, যারা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছে, (অথচ) আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—একাধিক অর্থবিশিষ্ট কোনো শব্দ মি'রাজ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনো একটি উচ্চতর অর্থের অনুকূলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, কিতাব শব্দটিও তদ্রূপ 'কিতাবে ইলাহী' অর্থে প্রয়োগ হতে থাকে। এ জাতীয় প্রয়োগরীতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

www.pathagar.com

ইহুদীরা নবীগণের প্রতি নাযিলকৃত 'সহীফা' তথা প্রতিটি আসমানী কিতাবকে 'সফর' নামে অভিহিত করতো, যার অর্থ 'কিতাব'। পরবর্তীকালে খৃস্টান অনুবাদকারীরা সফরগুলোকে সমষ্টিগতভাবে 'বাইবেল' নামে আখ্যায়িত করতে থাকে। গ্রীক ভাষায়ও যার অর্থ কিতাব। একইভাবে এগুলোর জন্য (Scripture) শব্দ ব্যবহার হতে থাকে। লেটিন ভাষায় যার অর্থ–কিতাব। মোটকথা কিতাব শব্দটির কিতাবুল্লাহ' অর্থে ব্যবহার নতুন নয়, বরং প্রাচীনকাল থেকেই এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অতপর কুরআনে 'কিতাব' শব্দটি এত ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয় যে, এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অর্থ বুঝে নিতে আদৌ বেগ পেতে হয় না। অনায়াসে তারা ধরে নিতে পারে এ দ্বারা কি অর্থ বুঝানো হয়েছে।

لَارَيْبَ فِيْهِ বাক্যের সঠিক মর্ম

لَارَيْبَ فِيْهِ ঃ আরবীতে رَيْبَ অর্থ সন্দেহ, সে মতে "এতে কোনো সন্দেহ নেই" বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে—এটি আল্লাহর কিতাব অথবা নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচ্য বাক্যটি মূলত পূর্ববর্তী ذَالِكَ الْكِتَابُ বাক্যে জোর দেয়ার জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ এটি যে আল্লাহরই কিতাব, এ ব্যপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আলোচ্য অর্থ মেনে নেয়া না হলে এ বাক্য প্রয়োগের মহলই এখানে বাকী থাকে না। কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের একথার জোর সমর্থন পাওয়া যায়। কয়েক আয়াত পরে এ সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ البقرة : ٢٣

"আমার বান্দার প্রতি যা আমি নাযিল করেছি, এ সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো দেখি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩

অন্যত্র ঃ

الٓمّٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ السجدة : ١

"এটি আলিফ-লাম-মীম, বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কিতাবের অবতরণ, সেটি আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"–সূরা সাজদাহ ঃ ১

আরো বলা হয়েছে ঃ

حٰمٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ مؤمن : ١-٢

"হা-মীম, পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাবের অবতরণ।"

–সূরা মু'মিন ঃ ১-২

www.pathagar.com

সাধারণত লোকেরা এ জাতীয় আয়াতের অর্থ মনে করে, এটি এমন কিতাব যার মধ্যে সন্দেহ করার মত কিছু নেই। কথাটা সত্য বটে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে নিম্নোক্ত কারণের ভিত্তিতে আমরা এ অর্থ সঠিক মনে করি না ঃ

প্রথমত, কুরআনের দৃষ্টান্তমূলক আয়াতসমূহ এ মর্ম সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, সন্দেহ কিতাব সংশ্লিষ্ট গুণ নয়, বরং মনের আকীদা-বিশ্বাসগত বিষয়। তাই দেখা যায়—বক্র দেমাগের মানুষ সোজা কথা ঘুরিয়ে বাঁকা অর্থে প্রয়োগ করে থাকে। যা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কাজেই আলোচ্য অর্থে উক্ত আয়াতের প্রয়োগ যথার্থ বলা যায় না। তদুপরি এর বিশেষ উপকারিতাও এখানে পরিলক্ষিত হয় না। তৃতীয়ত, এখানে দাবী হলো—এটি আল্লাহর কিতাব। সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে দাবীর উপর হতে পারে যে, কিতাব মূলত কার, আল্লাহর না অন্য কারো ? কাজেই সন্দেহ নিরসনের প্রয়োজন দেখা দিলে তার সম্পর্ক হবে দাবীর সাথে—কিতাবের সাথে নয়। কেননা কিতাব তো নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান আছেই, তাতে আবার সন্দেহের প্রশ্ন কি ? প্রশ্ন বড়জোর হতে পারে এর সম্পর্ক কার সাথে যুক্ত হবে ? আল্লাহর সাথে না অন্য কারো সাথে ? উত্তরে দাবী করা হয়েছে—না, অন্য কারো নয়, কিতাব একমাত্র আল্লাহর। অতএব বুঝা গেল—'লা-রাইবা ফীহি' বাক্য দ্বারা আল্লাহর সাথে কিতাবের সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল, এখানে সেটাই নির্মূল করা হয়েছে। চতুর্থত, কিতাবের অস্তিত্ব কিংবা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ নিরসন দ্বারা কিতাবের মর্যাদা আদৌ পায় না। কুরআনের বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠে না। কারণ উকলীদাস কিংবা গণিত শাস্ত্রীয় কোনো গ্রন্থ সম্পর্কেও এ জাতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা যেতে পারে। পঞ্চমত, সমকালীন লোকদের মধ্যে মনে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে সন্দেহ ছিল না যে, এটা তার বক্তব্য কিনা। বরং তাদের আসল দ্বিধা ছিল—কুরআনকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ বলে যে দাবী করা হয়, সে দাবী সঠিক কি না ? এবং প্রকৃতই আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে কি-না ? বস্তুত এ প্রেরণ বিষয়টাই হলো তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মূল কথা। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণের দাবী মেনে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। ষষ্ঠত, পাঠানোর কথা বাদ দিয়ে কিতাব সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন যদি করাও হয়, তথাপি এ দ্বারা বিশেষ কোনো উপকার সাধিত হয় না। কেননা এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব কি-না ? সে সন্দেহ থেকেই যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর থেকে পাঠানোর বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেলে, আপনা থেকে এটি সন্দেহের আবর্জনা মুক্ত বলে প্রমাণ হয়ে যায়।

هُدًى -এর অর্থ

هدى ঃ "হুদান' শব্দ আরবী ভাষা এবং কুরআন শরীফে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহে এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

১. অন্তরের নূর অর্থে। যেমন ঃ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى - محمد : ١٧ "যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের অন্তরের নূর বাড়িয়ে দেন।"
—সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৭

www.pathagar.com

২. (ক) দলীল প্রমাণ ও পথের নিদর্শন। যথা ঃ ১০ : أَوْ أَجِـدُ عَلَى النَّارِ هُدًى - طه "অথবা আগুনের নিকট পৌঁছে পথের সন্ধান পাব।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ১০

(খ) ৮ : بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتَابٍ مُّنِيْرٍ - حج "কিছু মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।"–সূরা হজ্জ ঃ ৮

৩. (ক) সরল-সহজ পথ। যথা ঃ ৬৮ : إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ - حج "নিশ্চিত আপনি সরল পথেই কায়েম আছেন।"–সূরা হজ্জ ঃ ৬৮

শব্দটি এখানে নিয়ম, তরীকা ও শরীআত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কুরআনে এর দৃষ্টান্ত যথা ঃ (খ) ৯০ : فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ - الانعام "অতএব আপনিও তাদের পন্থা অনুসরণ করুন।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯০। (গ) : إِنَّ الْهُدَى اللّٰهِ - ال عمران ৭২ "আপনি বলে দিন, হেদায়াত সেটাই যে হেদায়াত আল্লাহ করেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৭২

৪. পথপ্রদর্শন করা। যথা ঃ : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ - البقرة ২৭২ "তাদেরকে সৎ পথে নিয়ে আসার দায়দায়িত্ব আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২

মুত্তাকীর অর্থ

لِلْمُتَّقِيْنَ ঃ শব্দের প্রথমে লাম (لام) বর্ণটি উপকার ও কল্যাণ অর্থবোধক। অর্থাৎ এ কিতাব দ্বারা উপকার ও কল্যাণ কেবল মুত্তাকী-পরহেযগার লোকরাই লাভ করতে পারে। যেরূপ সূর্য কিরণ ছড়ায় দুনিয়াবাসী সকলের জন্য। কিন্তু এ দ্বারা উপকার সেই লাভ করতে পারে, যার চোখ আছে আর দেখার জন্য চোখ দুটি সে মেলেও ধরে। অনুরূপ এ কিতাব নাযিল হয়েছে বিশ্বমানবের হেদায়াতের জন্য। কিন্তু হেদায়াত লাভে ধন্য সে-ই হবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ভয় ও ভীতি। তাই বলা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই এটি হেদায়াত, গায়ের মুত্তাকীদের জন্য নয়।

মুত্তাকী শব্দটি 'ইত্তিকা' (اتقاء) ধাতু থেকে নির্গত যার অর্থ—ভয় করা। আর ইত্তিকা শব্দটি কুরআন শরীফে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যেতে পারে।

১. ক্ষতির জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। যথা ঃ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا - مزمل : ১৭ "অতএব যেদিন বালককে বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে, সেদিনকে যদি অস্বীকার কর, তাহলে তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে।"–সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৭

২. বিপদের আশংকায় আতংকিত থাকা। যথা ঃ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً - الانفال : ২৫ "আর তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাক যা কেবল তাদের উপরই পতিত হবে না তোমাদের মধ্যে যারা যালিম।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২৫

www.pathagar.com

৩. কৃতজ্ঞ বান্দার প্রতি দয়াশীল, কুফরী ও গুনাহ পসন্দ করেন না এবং গোপন হোক চাই প্রকাশ্য, সকল বিষয়ে অবগত এমন আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকা। যথা ঃ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - زمر : ٧٣ "নিজেদের পালনকর্তাকে যারা ভয় করত দলে দলে তাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"-সূরা আয যুমার ঃ ৭৩

৪. চতুর্থ প্রকারকে উপরোক্ত তিন প্রকারের সমষ্টি বলা যায় অর্থাৎ গুনাহ, এর মন্দ পরিণাম ও আল্লাহর গযব থেকে বেঁচে থাকা। তাকওয়া শব্দটি কর্ম ছাড়া ব্যবহার হলে সাধারণত উপরোক্ত অর্থ বুঝানো হয়ে থাকে। এবং একেই তাকওয়া নামে অভিহিত করা হয়। যথা ঃ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ - ال عمران : ١٧٩ "যদি তোমরা ঈমান আন আর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯

উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে বুঝা যায়, যার অন্তরে আল্লাহর মাহত্ম্য, তাঁর আযাবের ভয় এবং গুনার পরিণাম চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত, সে-ই হলো প্রকৃত মুত্তাকী ও পরহেযগার বান্দা।

তাকওয়ার পরিচয় কি ও কাকে বলে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—এতে আমলের তুলনায় কাইফিয়ত বা মনের অবস্থা এবং কর্মের তুলনায় বর্জনের দিকটাই মুখ্য বিষয়। অন্য কথায় ইতিবাচক কাজের তুলনায় নেতিবাচকের প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ নেক আমল বেশী বেশী করার চাইতে গুনাহ বর্জনের দিক প্রবল থাকে এবং লক্ষ রাখা হয়—নেক আমল যাই করি না কেন কোনো অবস্থায় গুনার কাজে যেন জড়িয়ে না পড়ি। এটা আসলে পরিশুদ্ধ অন্তরের প্রমাণ। আর অন্তর পরিমার্জিত হলে আচার-আচরণ, আমল আখলাক সবই যে পরিশুদ্ধ গতিতে প্রবাহিত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কথাটা জোর দিয়ে বলা হলে অতিশয়োক্তি হবে না যে, অন্তর বিশুদ্ধ হওয়ার কল্যাণে এলেম, আমল উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতির ধারা প্রবল ও বেগবান হতে থাকে।

আয়াত ঃ ৩

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

ঈমানের অর্থ

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ঃ ঈমান (اِيْمَانٌ) শব্দটি 'আমনুন' (اَمْنٌ) ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ নিরাপত্তা দান করা। তবে ক্ষেত্র ভেদে এর অর্থ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যথা এ ধাতু থেকে নির্গত ক্রিয়াপদের পরে 'লাম' (لام) সংযোগ বর্ণ (صله) যুক্ত হলে অর্থ হবে 'তাসদীক' (تصديق) করা বা স্বীকৃতি দেয়া। আর 'বা' (ب) যুক্ত হলে ইয়াকীন ও বিশ্বাস করার অর্থ বুঝায়। তাই আকীদা-বিশ্বাস যেহেতু ঈমানের মূল কথা, কাজেই ভয়-ভরসা ও আকীদার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইয়াকীনকেই 'ঈমান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সে হিসেবে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর, তাঁর আয়াত ও বিধি-বিধানের উপর বিশ্বাস পোষণ

www.pathagar.com

করত নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর ফায়সালা একনিষ্ঠ মনে ও খাঁটি অন্তরে স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়, তাকেই 'মু'মিন' বলা হয়।

ঈমান শব্দের পরে যে কর্ম তথা বিষয়ের উল্লেখ থাকে, বিশেষত তার প্রতি বিশ্বাস করাই উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু ঈমানের খাস কোনো বিষয় কিংবা বস্তুর উল্লেখ না থাকা অবস্থায় তার অর্থ সে সমূদয় বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা ধরে নিতে হবে যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কিংবা দলিল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়।

গায়েব শব্দের বিশ্লেষণ

'গায়েব' শব্দ আল কুরআনে নিম্নলিখিত অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। (ক) যা দৃষ্টির আড়ালে গোপন থাকে। এর বিপরীতে শাহাদাত (شَـهَـادَتْ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে আলেমুল গায়বি ওয়াশ্‌শাহাদাতি (عَـالِـمُ الْـغَـيْـبِ وَالـشَّـهَـادَةِ) আল্লাহর দুটি গুণবাচক শব্দ। অর্থাৎ আমাদের আড়ালে হোক চাই সামনে সবই তাঁর জানা। (খ) মানুষের হাতে যে বিষয় জানার কোনো মাধ্যম নেই। যথা—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْـغَـيْـبَ لَاسْـتَـكْـثَـرْتُ مِنَ الْـخَـيْـرِ - الاعراف : ١٨٨ "আর গায়েবের খবর জানা থাকলে আমি বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম।"-সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৮

(গ) অনির্দিষ্ট দিক অথবা অজ্ঞাত স্থান। যথা ঃ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَـدَيْـهِمْ اِذْ اَجْـمَـعُـوْا اَمْـرَهُـمْ - يوسف : ١٠٢ "এগুলো অদৃশ্য সংবাদ যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন নিজেদের কাজ তারা সাব্যস্ত করে নিয়েছিল।"-সূরা ইউসুফ ঃ ১০২

ভেদ রহস্য অর্থেও গায়েব শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নেককার স্ত্রীর প্রশংসায় যেমন বলা হয়েছে- حٰـفِظٰتٌ لِّلْغَـيْـبِ অর্থাৎ গোপন ও ভেদের কথাও তারা সংরক্ষণ করে।

بِالْغَيْبِ-এর (بِ) 'বা' স্থানবাচক বর্ণ

'বিল গায়েব' (بِالْـغَـيْـبِ) এর প্রথম 'বা' (بِ) বর্ণ দু প্রকার হতে পারে। (ক) স্থানবাচক অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিষয়টি অদৃশ্য স্থানে থাকা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে। আল কুরআনে এ অর্থের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা ঃ اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ - الانبياء : ٤٩ "যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কেয়ামতের ভয়ে ভীত থাকে।"-সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৪৯

অপর জায়গায় ঃ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْـغَيْبِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ - فاطر : ١٨ "আপনি তো তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।"-সূরা আল ফাতির ঃ ১৮

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতে يُؤْمِنُوْنَ ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ ঈমানের জন্য জরুরী বিষয়গুলো সবই এর আওতাধীন সাব্যস্ত হবে। অতএব আয়াতের মর্ম হবে ঈমান আনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় না থেকে তারা বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, স্বভাবগত সাক্ষী এবং নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের দাওয়াতের ভিত্তিতে সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে, যেসবের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে রবী বিন আনাস কর্তৃক এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের তরজমায় আমি সে মতেরই প্রাধান্য দিয়েছি।

দ্বিতীয় প্রকার এই হতে পারে بِالْغَيْبِ এর بِ কে 'সিলা' তথা সম্পূরক অর্থবোধক সাব্যস্ত করত আয়াতোক্ত بِالْغَيْبِ-কে يُؤْمِنُوْنَ এর মাফউল তথা কর্ম গণ্য করা। এ মত যদিও অধিকাংশ আলেমের এবং ব্যাকরণগত কোনো ত্রুটিও এতে পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে আমরা একে শক্তিশালী রায় বলে মনে করি না।

ক. ঈমান শুধু অদৃশ্য বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এর বাইরে যে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান আনা অনিবার্য, সেগুলো এর গণ্ডি বহির্ভূত সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে প্রথম প্রকারে অনিবার্য বিষয়সমূহ ঈমানের আওতায় ব্যাপকহারে শামিল থাকে। যা কুরআনে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

খ. ঈমানের জন্য অনিবার্য বিষয়াদির উপর গায়েব শব্দের প্রয়োগ বিশুদ্ধ যদি হয়ও, তথাপি নবী ও কিতাবের উপর এর প্রয়োগ আদৌ শুদ্ধ হতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন আসে আল্লাহ ছাড়া যে বিষয় দুটির প্রতি ঈমান আনা আনিবার্য, সে দুটোকে ঈমানের গণ্ডি থেকে খারিজ করার কি কারণ থাকতে পারে?

গ. 'গায়েব' শব্দ স্বয়ং আল্লাহর জন্য প্রয়োগ হয়নি। এমনকি এটা তাঁর নামও নয়। এর অর্থ স্বয়ং আল্লাহও ঈমানের অংশরূপে শামিল না থাকা সাব্যস্ত হয়। আর আল্লাহই যদি ঈমান আনা জরুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তাহলে কেবল আখেরাত ও ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা অনিবার্য হয়। অথবা বড়জোর আগত দিনের ঘটনাবলীর প্রতি বিশ্বাস করার মধ্যে ঈমানের অর্থ সীমীত হয়ে পড়ে। তাই প্রশ্ন আসে ঈমানের পরিধি এত সীমীত ও সংকীর্ণ করার কি কারণ?

ঘ. দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সমর্থক আলেমগণের মতে গায়েব দ্বারা আখেরাতের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। এতে প্রশ্ন জাগে وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (তদুপরি আখেরাতের প্রতিও তারা বিশ্বাস করে) আয়াতে পরক্ষণেই আখেরাতের কথা স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় একই কথা বার বার উচ্চারণ দ্বারা কুরআনের উপর অর্থহীন আলোচনার দোষ আরোপিত হয় না কি?

চ. প্রথম ব্যাখ্যা দ্বারা পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়, যা দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় অনুপস্থিত। অর্থাৎ ভয়-ভীতি ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে সৃষ্ট ঈমানই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। আর যে ভীতি গুনাহর পরিণাম দেখার পর সৃষ্টি হয় এবং মনে বিশ্বাস জন্মে যে, এটা আমার

কৃত অপরাধের অবধারিত শাস্তি, সে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। আযাব দেখার পর যারা ঈমান আনে, তাদের সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে ঃ

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْاٰنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○ - يونس : ٥١

"তাহলে কি আযাব পতিত হওয়ার পর তোমরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে ? তোমরা এখন স্বীকার করলে ? অথচ ইতিপূর্বে এর জন্য তোমরা কতই না তাগাদা দিচ্ছিলে।"–সূরা ইউনুস ঃ ৫১

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—'বা' (بِ) বর্ণটি 'যরফ' (ظرف) তথা স্থান অর্থবোধক সাব্যস্ত করা হলে প্রশ্ন হতে পারে ঈমানের সাথে 'বা' (بِ) যুক্ত হলে কুরআনের কোথাও 'যরফ' (ظرف) অর্থে প্রয়োগ হয়নি। কথাটা যদিও সত্য, তবে খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। কেননা এর উত্তরে ঠিক একই কথা বলা যায় যে, কুরআনের যেখানেই 'বিল গায়েব' (بِالْغَيْبِ) শব্দ বর্ণিত হয়েছে, সবখানে যরফ অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে। 'মাফউল' (مَفْعُوْلٌ) তথা কর্মবাচক অর্থে ব্যবহার হয়নি। সুতরাং স্পষ্টত বলা যায় কুরআনের দৃষ্টান্তগুলো সব যরফ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

ইকামতে সালাতের অর্থ

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ঃ ইকামাত অর্থ কোনো জিনিসকে যথাযথভাবে দাঁড় করানো। অথবা এমনভাবে দাঁড় করানো যাতে কোনো প্রকার বক্রতা না থাকে। আয়াতে তারা 'নামায পড়ে' না বলে 'নামায কায়েম করে' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নামায কায়েম করে উক্তি দ্বারা এক সাথে একাধিক তত্ত্ব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমত এ দ্বারা ইখলাস বা নামাযে একনিষ্ঠতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ গায়রুল্লার শরীকানা নসাৎ করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নামায আদায় করতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতার সাথে এবং খাস আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আদায় না করা পর্যন্ত ইকামত তথা সোজা করার দাবী পূরণ হতে পারে না। অন্যত্র স্পষ্ট ভাষায় কথাটা ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - الاعراف : ২৭ "আর প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় চেহারা সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৯

এ আয়াত দ্বারাই কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ার ফরযিয়ত প্রমাণ হয়। কেননা কেবলাই হলো তাওহীদ ও ইখলাসের প্রাণকেন্দ্র।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় নামাযের মকসুদ খুশূ-খুযূ, ভয়-ভীতির আবেগ মনে জমিয়ে নামায পড়াই এর মূলকথা। এ থেকে উদাসীন হয়ে নামায পড়া হলে ইকামতের অর্থ বাস্তবায়িত হয় না। সেটাকে বরং দুর্নাম ঘুচানোর অপচেষ্টা বলা যায়। কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। যথা ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ - طه : ١٤ "এবং আমার স্মরণার্থে আপনি নামায কায়েম করুন।" অন্য আয়াতে

www.pathagar.com

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - مؤمنون : ١-٢ "মু'মিনগণ কামিয়াব হয়ে গেছে। নিজেদের নামাযে যারা বিনয়-নম্র (এবং একাগ্রচিত্তে আদায় করে)।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ১-২

তৃতীয়ত, কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যথানিয়মে নামায আদায় করা। যথা এরশাদ হয়েছে ঃ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ - البقرة ٢٣٩ : "অতপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর—যেভাবে তোমাদেরকে তিনি শিখিয়েছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯

বলা বাহুল্য নামাযের কাতার সোজা করা এবং আরকানগুলো যথাযথ আদায় করাও আল্লাহর শিখানো নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ কাতার সোজা করাও নামায কায়েম করার অংশ বিশেষ।

চতুর্থ বিষয় হলো—ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা এবং ওয়াক্তের পাবন্দী করা। কুরআনের ভাষায় ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ - بنى اسرائيل : ٧٨ "সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠও (জারি রাখুন)।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮

একথাটাই অন্যত্র حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوةِ - البقرة : ٢٣٨ "সকল নামাযে তোমরা যত্নবান হও" মর্মে ব্যক্ত করা হয়েছে।

পঞ্চম বিষয়—নিয়মিত নামায আদায় করা। কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ - معارج : ٢٣ "নামাযে যারা সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।"–সূরা মাআরিজ ঃ ২৩

ষষ্ঠ বিষয় হল—জুমআর নামায—জামাত সযত্নে কায়েম করা। বিশেষত উম্মত ও ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অবস্থায় জুমআ ও জামায়াতের অর্থ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া বুঝায়। যথা ঃ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - الحج : ٤١ "তারা এমন লোক, তাদেরকে যদি পৃথিবীতে আমি শক্তি-সামর্থ দান করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে আর সৎ কর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে নিষেধ করবে।"–সূরা হজ্জ ঃ ৪১

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াও উল্লেখযোগ্য যা তিনি অনাগত সন্তানদের জন্য করেছিলেন। কুরআনের ভাষায় ঃ رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ - ابرهيم : ٣٧ "হে আমাদের পালনকর্তা। নিজের এক সন্তানকে আমি তোমার ঘরের সন্নিকটে অনাবাদী উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! যেন তারা নামায কায়েম রাখে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭

সালাত শব্দের অর্থ

আভিধানিক অর্থে কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ঝুঁকে পড়া, মনোযোগ দেয়াকে 'সালাত' (صلوة) বলা হয়। অতপর রুকূ' তা'যীম, বিনয়াবনত ও দোয়া করা অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। মরহুম মাওলানা ফরাহীর গবেষণালব্ধ অভিমত—কলদানী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ—দোয়া ও কান্না, ইবরানী ভাষায় নামায রুকূ' অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অতপর কুরআন-হাদীসে একে পারিভাষিক রূপ দেয়া হয়। এছাড়া উম্মাতে মুসলিমার কথা ও বাস্তব কর্মের ধারাবাহিকতায় এর আকার-আকৃতি, নিয়ম-পদ্ধতি ও সময়ের গণ্ডি নির্ধারণ করত পারিভাষিক সে অর্থ পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অতএব অতি প্রাচীনকাল থেকে কুরআনের সমকাল পর্যন্ত সালাত শব্দের ব্যবহারিক অর্থ পর্যালোচনা করা হলে দেখা যায় এক কথায় ইবাদাত-বন্দেগী অর্থেই এর প্রচলন ছিল এবং এখনো আছে। অবশ্য এর কোনো কোনো অংশে ইমামগণের মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে সেটা কেবল খুঁটিনাটি সংক্রান্ত মতবিরোধ যা বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। এ দ্বারা সালাতের সার্বিক ও মৌলিক অর্থে কোনো প্রভাব পড়েনি।

আয়াত ঃ ৪

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

ঈমান ও ঈকানের পার্থক্য

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ঃ আখেরাত বলে আখেরাতের বাড়ী অথবা আখেরাতের জীবন বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান শব্দমূল নির্গত يُؤْمِنُوْنَ-এর স্থলে 'ঈকান' ধাতু নির্গত يُوْقِنُوْنَ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থগত দিক থেকে ঈমান ও ঈকানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। অন্তরের সত্যায়ন মূলক স্বীকৃতিকে 'ঈমান' বলা হয়। কুফর, এনকার ও তাকযীব এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আর ঈকান অর্থ মনের ধারণাপ্রসূত বিশ্বাস। যার বিপরীতে আসে গুমান ও শক (ধারণা ও সন্দেহ)। যেমন কোনো বিষয়ের প্রতি ইয়াকীন রাখার জন্য বিশ্বাস করা জরুরী নয়।[১] তদ্রূপ ঈমানের জন্য ইয়াকীন থাকা শর্ত নয়। ঈমান কখনো কেবল ধারণার ভিত্তিতে হতে পারে। ধীরে ধীরে ধারণার পর্যায় অতিক্রম করে তা ইয়াকীনের স্তরে পৌঁছে এবং অবশেষে ঈমানে পরিপূর্ণতা হাসিল হয়। এখানে ঈমানের কয়েকটি পরিচিতি আমল উল্লেখ করার পর ইয়াকীনের কথা বলা হয়েছে। এ দ্বারা স্পষ্টত ইঙ্গিত পাওয়া যায় গায়েবের প্রতি ঈমান, নামায কায়েম, যাকাত আদায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়, পূর্বাপর ওহীর প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি গুণের অধিকারী ব্যক্তিরাই মূলত আখেরাতে ইয়াকীন করে থাকে।

১. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মুজিযা দেখানোর পর ফেরাউনের ইয়াকীন ছিল যে, এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন। তা সত্ত্বেও সে ঈমান গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৫

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

হুদা শব্দের অর্থ

عَلَىٰ هُدًى ঃ উপরে হুদার একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে। সে সবের মধ্য থেকে নূর ও বাসীরতের অর্থ এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। একইভাবে সিরাতে মুস্তাকীম অর্থ নেয়াও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ দু অর্থের যেটাই নেয়া হোক আয়াতের অর্থ যথাযথ বহাল থাকে। কুরআনের ভাষ্য ও অভিধানে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

الْمُفْلِحُونَ ঃ মুফলিহুন 'এফলাহুন' (افلاح) শব্দ মূল থেকে নির্গত কর্তাবাচক ক্রিয়া পদ। আভিধানিক অর্থে কোনো কিছু উন্মোচন ও বিশ্লেষণকে 'এফলাহ' বলা হয়। অতপর এ অর্থ কেন্দ্র করেই পারিভাষিক অর্থের প্রচলন ঘটে। সে মতে প্রাণপাত প্রচেষ্টা ও কঠোর সাধ্য সাধনার পর অর্জিত সফলতাকে পারিভাষিক অর্থে 'এফলাহ' বলা হয়। এ সফলতার পর পরিশ্রমকারী প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠে এবং আশা পূরণের আনন্দে তার মন এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠে, যা ভাষার আবরণে প্রকাশ করা যায় না।

২. এক নযরে ১-৫ আয়াতের সমষ্টিগত আলোচনা

প্রথমত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা আলোচনা করতে চাই—উপরোক্ত পাঁচ আয়াতের সারসংক্ষেপ কি এবং কোন্ ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হয়েছে ? অতপর এর গভীর তত্ত্ববিষয় এবং অন্যান্য দিক আলোচিত হবে। পরিশেষে এ প্রসঙ্গে উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

সূরার নাম উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম এর মূল ও কেন্দ্রীয় দাবীর বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাত ও কুরআনের প্রতি ঈমানের দাওয়াতই হলো—এ সূরার মূল প্রধান আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এখানে প্রথম কথাই হলো—এটি কিতাবে ইলাহী। এর জন্য বাইরের কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা এটি যে ইলাহী গ্রন্থ তার অকাট্য প্রমাণ সে নিজেই। তাই বলে সবাই একে বিশ্বাস করে নিবে বলে আশা না করাই ভাল। আর সকলের জন্য সেটা সহজও নয়। অতপর বলা হয়েছে—কোন্ শ্রেণীর লোক এর প্রতি বিশ্বাস করবে আর কি ধরনের লোকেরা এহেন অমূল্য সম্পদ লাভে বঞ্চিত থাকবে। এ পর্যায়ে অন্তরের স্বচ্ছতা ও উর্বরতাকেই ঈমান আনার মৌলিক উপাদানরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দ্বারা অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে যায় অনুর্বর দেমাগ ও যোগ্যতাহীন অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি এ কিতাব থেকে কোনো প্রকার উপকার লাভে সক্ষম হতে পারে না। আর সে যোগ্যতা ও মনের উর্বরতা সৃষ্টি হয়, তাকওয়া, পরহেযগারী ও আল্লাহ ভীতির পরিণামে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

অতপর তাকওয়ার ফলে এলেম আমলে বরকতের যে প্রবাহ শুরু হয়, তার বিবরণ দিয়ে ঈমান বিল গায়েবকে তার প্রথম সুফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বারা যার অন্তরে উর্বর যোগ্যতা বিদ্যমান, তার আকল, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় নিশ্চিত রূপ নেয়। পশুর ন্যায় তখন সে কেবল খাওয়া-পরা, ভোগ বিলাস ইত্যাদি বস্তু চিন্তায় ডুবে থাকে না। বরং বিবেক সিদ্ধ অদেখা জিনিস—অদৃশ্য বিষয়গুলোও সে অনায়াসে মেনে নেয়। এমমনকি সময়ে চোখে দেখা, কানে শোনা কথা মেনে নিতে তার মনে দ্বিধা থাকে। কিন্তু নিশ্চিত সংবাদ আর বিবেকসম্মত কথার সত্যতা স্বীকার করতে তার সামান্য সন্দেহও থাকে না। সে মনে করে আমার চোখের দেখা, কানের শোনা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু না দেখা সংবাদটা মিথ্যা কিংবা ভুল হওয়া অকল্পনীয়।

এরপর সে সকল আমল-আকীদার কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে, যা ঈমান বিল গায়েবের অনিবার্য ফলশ্রুতি। বস্তুত খাঁটি ঈমান কল্পনাপ্রসূত কাহিনী কিংবা শ্রুতি মধুর গল্প নয়, এটা বরং চিরন্তন সত্যকে অন্তরের গভীর থেকে স্বীকৃতি দেয়ার নাম—যা মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে আন্দোলিত করে। অতপর সে ইচ্ছা শক্তিই তাকে কতিপয় কাজ করার, কোনো কোনোটি না করার পথে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে। করণীয় অসংখ্য কাজের মধ্য থেকে এখানে নামায কায়েম, আল্লাহর পথে ব্যয় মাত্র এ দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটিই জানা যায় যে, এ দুটাই যাবতীয় সৎকাজের মূল এবং কল্যাণের ভিত্তি। পরবর্তীতে আরো স্পষ্ট করা হবে—মূলত এ দুটি সৎকাজের ওপরই দীন ইসলামের ঈমানী প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ (তাদেরকে আমি যা দান করেছি তা থেকে) বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(ক) ব্যয়যোগ্য মাল-সম্পদ যা বান্দার সৃষ্ট নয়, বরং আল্লাহরই দেয়া অনুদান মাত্র—একথার স্বীকৃতি প্রকাশ করে।

(খ) আল্লাহর দেয়া মালের কিছু অংশ তাঁরই পথে ব্যয় করা কার্যত কৃতজ্ঞতার হক আদায় করা।

(গ) এদ্বারা কঠিনকে সহজ করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের সবটুকুই ব্যয় করবে না, বরং আল্লাহর পথে কিছু অংশ ব্যয়ের দাবী করা হয়েছে। বাকী সব তারই থেকে যাবে। অতএব একে 'সহজীকরণ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। প্রণিধানযোগ্য—'যাকাত' না বলে এখানে 'ইনফাক' (ব্যয় করা) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা যাকাত নির্দিষ্ট একটি খাত বিশেষ। অন্যান্য খাতের ব্যয় যাকাতের আওতায় আসে না। তাই এখানে ব্যাপকার্থবোধক 'ইনফাক' শব্দ আনা হয়েছে। যাতে অন্যান্য দান-খয়রাত ইত্যাদি কল্যাণমূলক যাবতীয় কাজ এর অধীনে শামিল থাকতে পারে।

অতপর মুত্তাকীদের একটি বিশেষ গুণের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সেটি হলো—মুত্তাকী লোকেরা যাবতীয় গোঁড়ামি, স্বজনপ্রীতি, গোত্র প্রীতি এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্বের আবর্জনা পরিহার করে সম্পূর্ণ মুক্ত মনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তারা

www.pathagar.com

আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থরাজি ও রাসূলগণের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য কিংবা পার্থক্য সৃষ্টি না করে আল্লাহ প্রদত্ত হিসেবে সকলের প্রতি সমভাবে বিশ্বাস করে। গ্রন্থ চাই আপন রাসূলের প্রতি, চাই ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাসূলের প্রতি নাযিল হয়ে থাকুক, তাদের আকীদায় আল্লাহ প্রদত্ত হিসেবে সবই বিশ্বাসযোগ্য এবং সবই মর্যাদার ভূষণ সমৃদ্ধ। বস্তুত এ প্রসঙ্গে তাদের বিচার্য যদি কিছু থাকে, তবে সেটা শুধু এই—গ্রন্থটি ঠিকই আল্লাহর প্রেরিত কিনা। যদি আল্লাহর পাঠানো গ্রন্থ বলে প্রমাণ হয়, তবে তাদের দেখার বিষয় হলো—গ্রন্থটি এখানো অবিকৃত অবস্থায় আছে না কি মিথ্যা বানোয়াটের মিশ্রণ দিয়ে তাকে বিকৃতির কলংকে জড়ানো হয়েছে ?

পরিশেষে বলা হয়েছে এ জাতীয় লোকরাই মূলত আখেরাত তথা পরকালে বিশ্বাসী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্ব আয়াতে ঈমান বিল গায়েবের আলোচনায় প্রচ্ছন্নভাবে আখেরাত শামিল বিধায় পৃথকভাবে তাকে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে পৃথকভাবে তার আলোচনা দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, অনেকেই আখেরাত বিশ্বাসের দাবীদার হতে পারে, তবে যারা নামায কায়েম করে, আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাসী প্রকৃতপক্ষে তারাই পরকালে বিশ্বাস করে থাকে।

অতপর পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে আলোচ্য গুণের অধিকারী লোকরাই আল্লাহর হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যতে এ পথ তাদের সামনে আরো প্রশস্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। পরিণামে আখেরাতের অনন্ত জীবনে তারাই হবে অফুরন্ত কল্যাণের স্বীকৃত হকদার।

৩. কতিপয় ইশারা-ইঙ্গিত

আল-কুরআন পথপ্রদর্শক বটে, তবে সে হেদায়াত সীমাবদ্ধ কেবল মুত্তাকী তথা আল্লাহ ভীরুদের মধ্যে, এ মর্মে ঘোষণা দেয়ার পর সমকালীন সে সকল লোকদের সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে, যারা এর পাত্র বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিল। এ পর্যায়ে তাদের কিছু উজ্জ্বল গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দ্বারা সে ইশারা সম্পন্ন করা হয়েছে। চিন্তার আশ্রয় নেয়া হলে অনায়াসে বুঝা যাবে—নবী করীম (স)-এর ওপর বিশ্বাসী মুসলমানরাই সে গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এ দ্বারা ইশারা এই পাওয়া যায়- তাঁদের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি ছিল বিধায় কুরআন তাঁদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে গ্রাম্য-শহুরে সব ধরনের লোকই ছিলেন। কালের সাধারণ বিপর্যয়, চারিত্রিক ধস, নৈতিক অধপতন সত্ত্বেও তাঁরা বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। সে কারণে কুরআনের আলোক বিচ্ছুরণের সাথে সাথে পল্লীবাসী একজন অশিক্ষিত-মূর্খ আরবের অন্তরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এটা তার আদিম ও স্বভাবগত আকর্ষণেরই ফলশ্রুতি। এমনিভাবে জন্মসূত্রে পাওয়া গুণবলে কুরআনের হেদায়াতে আকর্ষণ ও সংরক্ষণে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। আহলে কিতাবদের অবস্থাও তাই ছিল। সে সকল আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাসারা স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমানদের দলভুক্ত হয়েছিলেন, আপন শরীআতের উপর খাঁটি দিলে আমলকারী ছিলেন বলেই তাদের পক্ষে এটা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়েছিল। বুঝা গেল কুরআনিক হেদায়াতের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক, তাতে কোনো লাভ নেই—বাস্তব জীবনে ও চরিত্রে যদি উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ছাপ না থাকে। মোটকথা কুরআনের হেদায়াত লাভের যোগ্য পাত্র সে-ই যার জীবন, যার চরিত্রময় অন্তর্জগত আলোচ্য গুণের প্রবাহে একাকার হয়ে আছে।

ইহুদী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধি

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মুসলিম জীবনের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তার আলোকে চিন্তা করা হলে সহজেই বুঝা যায়—মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কি এবং কি হওয়া উচিত। অপরদিকে ঈমান আনবে না—এমন সব লোকদের চিত্রও একই দর্পণে ভেসে ওঠে। অতপর তারা কেন ঈমান আনবে না ? ইঙ্গিতের পর্দায় সে কারণও নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে। আপনি এবার ইঙ্গিতের সে পর্দা সরিয়ে ফেলুন, ভিতর থেকে ইহুদীদের বেরিয়ে আসার ছবি দেখতে পাবেন। যাদের আলোচনাই এ সূরার মুখ্য বিষয়। যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে মুসলমানদের আমল ও আকীদাগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে এবং অলংকারিক বর্ণনা ভঙ্গিতে ইহুদীদের আত্মিক ও চারিত্রিক ব্যধিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। যার অশুভ প্রতিক্রিয়ায় কুরআনের ন্যায় অনুপম নেয়ামতের পরশ থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যায়। এ ব্যাধিগুলোই মূলত সত্য গ্রহণে এমন বাধার সৃষ্টি করে রেখেছিল, যার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, স্বভাব-চরিত্রে যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছিল এবং যার কল্যাণে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান গ্রহণে ধন্য হয়, ইহুদীরা সম্পূর্ণ এর বিপরীত গুণাবলী আপন চরিত্রে জমা করে রেখেছিল।

কুরআনের প্রতি ঈমান না আনার কারণ

এ ব্যাপারে কুরআনোক্ত কয়েকটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ব্যাখা করা আমি জরুরী মনে করি। যাতে কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসের কারণসমূহ জেনে নেয়া যায়।

প্রথমত, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বাক্যের শব্দ বিষয়ে চিন্তা করা যাক। "এ কিতাব মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শনকারী" উক্তির আড়ালে ইহুদীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর এক গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গো-বৎস পূজার পাপ মোচনার্থে হযরত মূসা (আ) তাদেরকে তাওবার নির্দেশ দেন। এ পর্যায়ে পবিত্র ও আত্মশুদ্ধির লক্ষে তারা যখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন, তখন ভবিষ্যতে তারা যেন সর্বদা আল্লাহর গযব থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং তাঁর রহমত থেকে কখনো বঞ্চিত না হয়—মর্মে তিনি দোয়াও করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর সে দোয়া কবুল করেছিলেন। তবে এ শর্তে আখেরী শরীআতের আকারে আল্লাহর যে রহমত নাযিল হবে, তার কল্যাণে কেবল সে সকল ইহুদী ধন্য হবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, যাকাত আদায়ে তৎপর থাকবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়াবলীতে বিশ্বাসী হবে। সূরা আল আরাফে হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াতী ইতিহাস বর্ণনা সুবাদে নিম্নোক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য। পূর্বাপর মিলিয়ে আয়াতের মর্ম চিন্তা করা হলে উপরোক্ত কথার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। যথা ঃ

www.pathagar.com

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ - الاعراف : ١٥٦-١٥٧

"আমার রহমত সকল জিনিসের ওপর পরিব্যপ্ত। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা ভয় করে, যাকাত আদায় করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে। সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬-১৫৭

আয়াতের আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায়—হযরত মূসা (আ)-এর জাতির কেবল সে সকল লোকই কুরআন ও ইসলামের ন্যায় খোদায়ী নেয়ামত লাভের যোগ্য বিবেচিত ছিল, যারা তাকওয়ার উপর কায়েম, যাকাত আদায়ে তৎপর এবং আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাসস্থাপনকারী ছিল। অতপর আয়াতের উদ্দেশ্য যে, উম্মী নবীর আনুগত্য অবলম্বনকারী লোক সকল, সে কথা শেষাংশের আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায়।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতের শব্দগুলো হুবহু একই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই দেখা যায় সে সকল ইহুদী নাসারাই ঈমানের আলোকে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, যারা উপরোক্ত শর্ত পূরণে সক্ষম ছিল। অপর পক্ষে ঈমানের অনিবার্য শর্ত তথা তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি-গুণ বঞ্চিত লোকরাই ঈমান গ্রহণ না করে বেঈমানীর পথে অগ্রসর হয়। আয়াতের মর্ম থেকে একথা স্পষ্টত আন্দায করা যায়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে একই কথা ইবরাহীম (আ) সম্পর্কেও বলা হয়েছিল। বিভিন্ন পরীক্ষা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় উত্তরণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে যখন ইমামতের মর্যাদায় ভূষিত করার ওয়াদা শুনানো হল, তখন মহান আল্লাহর দরবারে তিনি সবিনয়ে জানতে চান তাঁর সন্তানদের কেউ এ মর্যাদায় ভূষিত হবে কি না ? উত্তরে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ - البقرة : ١٢٤ "তোমার সন্তানদের যালিমরা আমার এ ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪

আয়াতে বর্ণিত 'যালিম' দ্বারা উদ্দেশ্য—তাওহীদ ও ইখলাস এবং তাকওয়া ও ভয় শূন্য অন্তর বিশিষ্ট লোক। তাদের বংশধারা চাই ইসমাঈল (আ) থেকে প্রবাহিত হোক, চাই ইসহাক (আ) সূত্রে। কার্যত আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্পষ্ট ভাষায় পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন—যে সকল পয়গাম্বর ও উম্মত দুনিয়াবাসীর ইমামত প্রাপ্ত হবে, যালিম-নাফরমানরা সে সকল নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। ফলে সে মর্যাদার অংশীদার বিবেচিত হতে পারে না। বিধায় তারা বঞ্চিতের কাতারে নিক্ষিপ্ত হবে।

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ আয়াতের এ অংশে ইহুদী সম্প্রদায়ের বস্তুবাদী চিন্তাধারার আভাস পাওয়া যায়, যাতে তারা পূর্ব থেকে নিমজ্জিত ছিল। ফলে এহেন সর্বনাশা জড়ো ব্যাধির ফলে সমকালীন পয়গাম্বরের উপস্থিতিই তারা গো-বৎসকে পূজনীয় মাবূদ বানাতে কুণ্ঠিত হয়নি। এর অন্তর্নিহিত কারণ তালাশ করা হলে দেখা যায়—মিশরের দাসত্ব জীবনে তারা যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল, তা থেকে উদ্ধার

www.pathagar.com

পাওয়া শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জোটেনি। এমনকি হযরত মূসা (আ) অসংখ্য মুজিযা দেখানো সত্ত্বেও বারংবার তাদের একই দাবী—স্বয়ং আল্লাহকে আমরা আপন চোখে দেখতে চাই। তখনই কেবল আমরা বিশ্বাস করতে রাজি—তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সত্য সত্যই কালাম করে থাকেন আল কুরআনের ভাষায় لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً - البقرة : ٥٥ "(হে মূসা!) তোমার কথা আমরা কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকাশ্য নযরে আল্লাহকে আমরা দেখতে পাই।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৫৫)। এ জাতীয় কথা মক্কার মুশরিকরাও বলে বেড়াত। নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি ছিল—আল্লাহ যদি তাঁর সাথে কথা বলতে পারেন, তাহলে আমাদের সাথে না বলার কি কারণ ? কুরআন তাদের এ অন্যায় আবদার বাতিল করে দিয়ে বলেছে—আল্লাহকে যারা চোখে দেখে হাতে ছুঁইয়ে বিশ্বাস করতে চায়, কুরআন তাদেরকে পথ দেখায় না। এর কল্যাণ ও বরকত তাদের ভাগ্যে জুটতে পারে না—আপন চোখে সকল ভেদ রহস্য দেখার পর যারা ঈমান আনতে আগ্রহী। এর কল্যাণ ও বরকত কেবল তারাই পাওয়ার যোগ্য। পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের তুলনায় যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হয়, সিদ্ধান্ত নেয়। মোটকথা—না দেখে যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী, কুরআনের প্রতি ঈমান কেবল তাদের পক্ষেই আনা সম্ভব।

এখানে মু'মিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে—'তারা নামায কায়েম করে।' অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য শর্ত। অন্য কথায় নামায প্রতিষ্ঠায় যার একনিষ্ঠতা নেই, তার ভাগ্য ঈমানের পরশে ধন্য হতে পারে না। এর অন্তরালে মু'মিনের পরিচয় তো আছেই, তদুপরি এদ্বারা ইহুদী এবং তাদের সমমনা দোসর চক্রের অবস্থাও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে।[১] ইহুদীদের অবস্থা এখানে আছে ইঙ্গিতে অন্য আয়াতে এসেছে স্পষ্ট ভাষায়। যথা ঃ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - مريم : ٥٩ "অতপর এলো তাদের স্থলাভিষিক্ত—পরবর্তীরা। তারা নামায বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লেগে গেল। সুতরাং অচিরেই তারা পথভ্রষ্টতার পরিণতি দেখতে পাবে।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে উল্লেখ রয়েছে, তাতে ইহুদী এবং তাদের সমমনা দোসরদের কার্পণ্য ও বস্তুবাদী মানসিকতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের সংকোচনধর্মী এ চিন্তাধারা নতুন ছিল না। বরং সর্বকালের এবং সর্বজনবিদিত চরিত্রের প্রকাশ এবং প্রবাদ বাক্যরূপে পরিচিত ছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে কুরআন অবতরণের সমকালীন ইহুদী পণ্ডিত, আলেম, সূফীদের চরিত্রগত যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাদের বস্তুবাদী চিন্তাধারা বুঝার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। জাতির প্রতীক আলেম-সূফীদের যদি এ অবস্থা হয়, এমতাবস্থায় সাধারণ লোকের তো প্রশ্নই আসে না। যথা ঃ

১. সূরা আল বাকারার ৮৩ আয়াতে ইহুদী জাতি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—তাদের কাছ থেকে নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের যে ওয়াদা নেয়া হয়েছিল, সে অঙ্গীকার তারা ভঙ্গ করে ফেলে।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ - التوبة : ٣٤

"হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে অন্যায় পথে লোকদের মালামাল আত্মসাৎ করে থাকে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত রাখে। আর যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে, অথচ আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশে ইহুদীদের অন্যায় গোত্র-প্রীতি বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যা কুরআন বিশ্বাস করার পথে তাদের জন্য বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইহুদীদেরকে আল্লাহর প্রেরিত শেষ গ্রন্থ আল কুরআনে বিশ্বাসস্থাপনের আহ্বান জানানো হলে উত্তরে তারা বলতো—আমাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, আমরা তাতেই বিশ্বাস রাখি এবং আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। এ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ কিংবা কুরআনে বিশ্বাস করা প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهُ -

"তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে—আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তাতেই বিশ্বাসী। সেটি ছাড়া অন্য সবগুলো তারা অস্বীকার করে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৯১

মু'মিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে—তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করে। এ দ্বারা ইহুদীরা যে পরকালে বিশ্বাস করে না তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বিশ্বাস যে তারা আসলেই করে না, তাদের আচার-আচরণ, কার্যকলাপই তার প্রমাণ। অবশ্য মুখে তারা আখেরাতে বিশ্বাসী বলে দাবী করত, বুলিও কম আওড়াত না। শুধু কি তাই, দাবী তাদের আরো ছিল—আখেরাতের সুখ শান্তি, আরাম-আয়েশতো কেবল আমাদের নামেই বরাদ্দ। অন্য কেউ নয়—আমরাই তার একমাত্র অংশীদার। এক দিকে তাদের এহেন বচন-বুলি, অপরদিকে পার্থিব জীবন প্রীতি ও জীবন সামগ্রী সঞ্চয়-সংগ্রহে তাদের নিমগ্নতা মুশরিকদের পর্যন্ত হার মানায়। পরকাল বিষয়ে মুশরিকরা একে তো বিশ্বাসই করত না, দ্বিতীয়ত কারো মনে থাকলেও সেটা ছিল অস্পষ্ট এবং আবছা আবছা ধূঁয়া জাতীয়। তদ্রূপ ইহুদীরাও মুশরিকদের ন্যায় পরকালে শাফাআত বিষয়ে কল্পনা প্রসূত বিশ্বাসের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে নিয়েছিল যে, প্রথমত জাহান্নামে তারা যাবেই না, কপাল দোষে যাওয়া যদি লাগেই, তবে তার স্থায়িত্ব হবে মাত্র কয়েক দিনের। বলা বাহুল্য আখেরাত সম্পর্কে এ জাতীয় ঈমান মূলত ঈমানই নয় বরং অর্থহীন বুলি মাত্র।

www.pathagar.com

সুতরাং পরকাল বিষয়ে তাদের ঈমান যে এতটুকু মূল্য বহন করে না, পবিত্র কুরআন সে ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় আলোকপাত করেছে ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ـ البقرة : ٩٤ـ٩٦

"বলুন, অন্য লোকদের বাদ দিয়ে আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর নিকট যদি কেবল তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা মরণ কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম চিন্তায় কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করতে পারে না। আল্লাহ্ গুনাহ্গারদের ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন। তাদেরকে আপনি সবার চাইতে এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী (দেখতে) পাবেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৯৪-৯৬

আয়াতের আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায়—মুত্তাকীদের পরিচয় ব্যক্ত করে কুরআন যাদের কথা উল্লেখ করেছে তাঁরা হলেন সমকালীন ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ। যাদের প্রকৃতিতে তাকওয়া-পরহেযগারীর সৃষ্টিগত যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। যে কারণে কুরআনের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের ভাগ্য তাদের অনুকূলে সায় দিয়েছে। এটা হলো এক দিকের কথা। অপরদিকে একই দৃশ্যপটে ইহুদীচক্র এবং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ দোসরদের নৈতিক ও চারিত্রিক ছবি ভেসে উঠে যে, এরা সেই লোক যাদের অন্তর আল্লাহ্ ভীতি এবং এর বরকত লাভে ধন্য হওয়ার পরিবর্তে শূন্যের কোঠায় পড়ে আছে। কাজেই তাদের থেকে কুরআনের দাওয়াত গ্রহণের আশা করা অর্থহীন প্রয়াস। উপরোক্ত শব্দ কয়টির আবরণে এত সমস্ত ভাবের সমুদ্র লুকিয়ে রাখা এবং নামোল্লেখ ছাড়াই ইহুদী গোষ্ঠীর সার্বিক চরিত্র ফুটিয়ে তোলা একমাত্র কুরআনী অলংকার শৈলীর অলৌকিক কৃতিত্বই বটে।

৪. কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর

উপরোক্ত আয়াতগুলোর গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর মনে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন দেখা দেয়া স্বাভাবিক। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা করা হল। যা নিম্নরূপ ঃ

ক. কুরআন 'ইলাহী কিতাব' হিসেবে শুধু দাবী করা হয়েছে। এর সমর্থনে কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা হয়নি। অথচ দাবীর সপক্ষে দলিলের অবতারণা সর্বজন বিদিত কথা। কেননা কুরআন 'ইলাহী গ্রন্থ' হওয়াটাই যখন সূরার আলোচ্য বিষয়, এমতাবস্থায় কথাটা শুধু দাবীর পর্যায়ে না রেখে এর সমর্থনে শক্তিশালী দলিল উপস্থিত করা দরকার ছিল।

খ. কুরআনের পরিচয়ে বলা হয়েছে—এটি কেবল মুত্তাকী-পরহেযগার লোকদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ। এখন প্রশ্ন হলো—যদি তাই হয়, অর্থাৎ কুরআন কেবল মুত্তাকীদেরকেই হেদায়াত করবে—পথ দেখাবে, তাহলে এ কিতাব নাযিল হওয়া দ্বারা লাভ কি হলো ? অথচ প্রয়োজন ছিল এর বরকতে গুনাহগার বান্দা নেককার-পরহেযগার হয়ে যাওয়ার। অন্য কথায় যে ঔষধ রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে কেবল স্বাস্থ্যবানের দেহ সবল করে, তার দ্বারা রুগীর কি লাভ ? অতএব বলা যায় আল কুরআন পাপী লোকের উপাকারার্থে আসেনি, এসেছে ভাল মানুষের ঘরে কল্যাণ পৌঁছাতে।

গ. মুত্তাকীদের পরিচয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী। আর গায়েবের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে সাধারণত ধারণা করা হয়—তা অন্ধ অনুকরণ অথবা সু-ধারণা কিংবা কল্পনা প্রসূত ধারণার ফলশ্রুতি। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, আল কুরআন তার প্রভাবে কেবল কল্পনা বিলাসী মূর্খদেরকেই প্রভাবিত করতে পারে, চিন্তাশীল-জ্ঞানী লোকদের মন-মনসিকতায় কিরণ ছড়াতে কুরআনের যুক্তিপূর্ণ দলিল ও বক্তব্য তেমন কার্যকর নয়।

ঘ. আলোচ্য আয়াতে "তারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে, আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত কিতাব সত্যরূপে বিশ্বাস করে, এমনকি পরকালেও তারা অটল বিশ্বাসী" ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মাধ্যমে মু'মিনদের পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো—এ সমস্ত কাজ সম্পাদনে তারা যদি নিয়োজিত থাকেই, তাহলে তাদের এমন কোন্ হেদায়াতের প্রয়োজন অবশিষ্ট রয়ে গেল, যা কুরআন তাদেরকে সরবরাহ করবে ? দ্বিতীয়ত হেদায়াত কি তবে এ সমস্ত কাজের ঊর্ধে কোনো বিষয় কিংবা বস্তুর নাম, এসব করার পরও মানুষকে যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ?

ঙ. ঈমানের পর নামায ও ব্যয়ের উল্লেখ করে এখানে দুটি মাত্র আমলের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে ঐ দুটির কাজের এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, অন্য সব আমলের কথা বাদ দিয়ে শুধু এ দুটি আমল বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ? এক্ষেত্রে প্রশ্ন আরো জাগতে পারে। কিন্তু সামান্য চিন্তা করা দ্বারাই সকলের পক্ষেই যেহেতু সে সবের উত্তর বুঝে নেয়া সহজ, কাজেই সেগুলো এড়িয়ে যাওয়াই আমি সমীচীন মনে করেছি। কিন্তু উপরোক্ত প্রশ্নসমূহ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী বিধায় সে সবের ধারাবাহিক জবাব দেয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই ব্যাপারটা এমন নয় যে, পবিত্র কুরআন 'কিতাবে ইলাহী' হওয়ার বিষয়টি বিরোধী পক্ষের নিকট অস্পষ্ট ছিল বিধায় একে তারা অস্বীকার করেছিল। অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হলে একথা বলার কোনো যুক্তি কিংবা দলীল খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষত হিজরতের প্রথম দিকে সূরা আল বাকারা নাযিল হওয়াকালীন সময়ে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের সামনে বিষয়টা যে আয়নার মত সুস্পষ্ট ছিল, তা অতিশয়োক্তি নয়। তাহলে এহেন উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত সত্য গ্রহণে কোন্ জিনিস তাদেরকে বাধা দিল, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে বহু কথা বলা যেতে

www.pathagar.com

পারে, কিন্তু আসল কথা একটাই—সত্য গ্রহণ করার জন্য যে আকর্ষণীয় শক্তি দরকার তাদের মন-মানসিকতা, জন্মগত স্বভাব চরিত্রে সে উপাদান, সে যোগ্যতাই বিদ্যমান ছিল না। এমতাবস্থায় প্রমাণের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না যে, এটি 'কিতাবে ইলাহী' এবং তার সমর্থনে এই এই প্রমাণ রয়েছে। এখানে বলার কথা বরং বিনা দলীলে একটাই—এটি আল্লাহর কিতাব। আর এটিই যে ইলাহী গ্রন্থ তাতে বিন্দুসম সন্দেহের অবকাশ নেই, থাকতে পারে না। তবে এ দ্বারা উপকার পেতে হলে প্রকৃতিগত যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। কুরআনের বক্তব্যেও সে কথাই প্রমাণ করে। সুতরাং هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ আয়াতাংশে সে শর্তের কথাটাই স্পষ্টত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের হেদায়াতে ধন্য কেবল তারাই হবে যাদের চরিত্রে তাকওয়া পরহেযগারী বিদ্যমান। এ দ্বারা যেন নবী করীম (স)-এর প্রতি সান্ত্বনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে—আপনার চিন্তার কারণ নেই। কুরআন 'কিতাবে ইলাহী' এবং আপনি আল্লাহর রাসূল হওয়ার ব্যাপার এতই স্পষ্ট যে, দলিল দ্বারা বুঝানোর প্রয়োজনই পড়ে না। কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, দৃষ্টিতে অন্ধত্বের পট্টি বাঁধা, নাফরমানীর ঝাড়ু মেরে যারা অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দিয়েছে, গোড়ামির আবর্জনায় যাদের মন-মস্তিষ্ক অন্ধ ও বধির হয়ে আছে—এহেন লোকদেরকে এ কিতাব হেদায়াতের পথ দেখায় না। কল্যাণই বা তাদের ঘরে পৌঁছাতে যাবে কোন্ কারণে?

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি এ সূরার সম্বোধন মূলত ইহুদীদের প্রতি। এ তত্ত্ব কথার আলোকে চিন্তা করা হলে সহজেই বুঝা যায়, ইহুদী সম্প্রদায় শেষ কিতাব ও আখেরী রাসূল সম্পর্কে আদৌ অজ্ঞ ছিল না। তাওরাতের তাছনিয়া অধ্যায়ে বর্ণিত। আল্লাহ ইহুদীদের সাথে এই মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, আল্লাহ তাদের জ্ঞাতি ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী পাঠাবেন। তাঁর ভাষায় নিজের কালাম পৌঁছাবেন। সে নবীর মাধ্যমে শরীআতের পূর্ণতা বিধান করবেন। তাঁরই মাধ্যমে শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। নবীর কথা অমান্যকারীদের তিনি সাজা দেবেন। সে নবী কথা বলবেন আল্লাহর নামে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সবই সূত্রে পরিণত হবে। আল্লাহর কালেমা বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। ইহুদীরা তাওরাতেই উপরোক্ত কথাগুলো সম্যক অবগত ছিল। আখেরী নবীর বাস্তব জীবন, আচার-আচরণ, লেন-দেন, সমাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদির অন্তরালে তাওরাতের প্রতিটি কথার প্রমাণ বাস্তব নমুনা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত নবী করীম (স)-এর মদীনা হিজরতের পর যাবতীয় আলামত তাদের সামনে উপস্থিত ছিল। যে কারণে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল—নবী করীম (স)-ই তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র। সে ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতেই তারা কিতাব ও নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন কাটাত। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে ذٰلِكَ الْكِتٰبُ (এটি সেই কিতাব) এর দাবী কেবল মৌখিক বুলি নয়, বরং এর প্রতিটি শব্দ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এটি সেই পূর্ব ওয়াদাকৃত কিতাব তোমরা যার অপেক্ষায় রয়েছ। আর এ কিতাব ইতিপূর্বে নাযিলকৃত সকল গ্রন্থ সত্যায়ন করে। সে সম্পর্কে পূর্বেই তোমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের আলোকে চিন্তা করা হলে স্পষ্টত বুঝা যায়—এখানে দলিল দ্বারা বুঝিয়ে বলার আদৌ প্রয়োজন পড়ে না যে, দাবী সত্য এবং তার প্রমাণ এই। এখানে বলার কথা বরং এটাই যে, হিংসা ও গোঁড়ামি পরিহার করে ইহুদীরা ওয়াদাকৃত এবং প্রতীক্ষিত সে কিতাব মেনে নিক এবং এর বরকত ও কল্যাণময় বাস্তবতা পরীক্ষা করে দেখুক।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অন্তরালে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর মোটামোটি প্রায় এসেই গেছে। তবু আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি দিক আলোচনা দ্বারা বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে সামনে তুলে ধরা আমরা সমীচীন মনে করি।

মানব মনে কারো প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার জন্য বস্তু কিংবা ব্যক্তির প্রভাবশালী হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, বরং মনের অঙ্গনে প্রভাব আকর্ষণের যোগ্যতাও বিদ্যমান থাকতে হবে। সূর্যকিরণে তেজীভাব যতই থাকুক তাতে অন্ধজনের কি লাভ ? বুলবুলির সুর লহরী ফুল বাগানের গোটা আঙ্গিনা মাতিয়ে তুলুক, তাতে কানে না শোনা বধিরের কি যায় আসে। একইভাবে পথের দিশারী, আলোর আঁধার, যথাস্থানে ঠিক। কিন্তু নাফরমানীর ছোবলে যার যোগ্যতা ও আকর্ষণী শক্তি লোপ পেয়ে গেছে, শত আলোকবর্তিকা সত্ত্বেও কুরআন তার কোন্ কল্যাণের উপাদান হতে পারে ? কথাটা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। যথা ঃ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى - نازعات : ٢٦ "যে ভয় করে তার জন্য এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয়।"–সূরা আন নাযিআত ঃ ২৬

অন্যত্র ঃ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ - ق : ٣٧ "এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা যে একনিষ্ঠ মনে শ্রবণ করে তার জন্য।"–সূরা ক্বাফ ঃ ৩৭

আলোচ্য আয়াত দুটিতে عبرة ও ذكرى তথা শিক্ষণীয় ও উপদেশ দ্বারা মানুষের জন্মগত সে যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কুরআন দ্বারা ফায়দা হাসিলের জন্য যার বিদ্যমান তা অপরিহার্য। এ যোগ্যতাকেই আলোচ্য আয়াতে তাকওয়া শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর

অর্থ ও মর্মগত দিক থেকে তাকওয়া বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। এক প্রকার তাকওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত স্বভাবে নিহিত রয়েছে। কুরআন যাকে فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا (অতপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন) আয়াতে উল্লেখ করেছে। কল্যাণধর্মী দাওয়াত ও সৎকর্ম দ্বারা উপকার লাভ করতে হলে এ তাকওয়া বর্তমান থাকা জরুরী শর্ত হিসেবে বিবেচিত। যার অন্তর এ তাকওয়া থেকে শূন্য, সে যেন সৎকর্মের উৎসাহদানকারী উপাদান এবং কল্যাণের প্রতি আকর্ষণীয় শক্তি হারিয়ে বসল। মানবতা ও শিষ্টাচারধর্মী সকল কাজে আকর্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য মন-

www.pathagar.com

মানসিকতায় এ তাকওয়া বিদ্যমান থাকা একান্ত জরুরী। অনুরূপ কুরআনের দাওয়াত গ্রহণে মনকে ঝুঁকিয়ে দেয়ার জন্যও এটা বর্তমান থাকা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন মূলত এমনি পূত-পবিত্র জিনিস, যার প্রতি উদাসীন লোকের মন ধাবিত হওয়া প্রকৃতি ও নিয়ম বিরোধী কথা। কার্যত সে সকল ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কই কুরআনের আলোকপানে ছুটে যায়, যাদের মন-মানসিকতায় সৎকর্ম ও শিষ্টাচারের উপাদান প্রাণবন্ত ও তৎপর থাকে। সুতরাং ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়—আরব জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কুরআনের দাওয়াত কেবল সে সকল লোকরাই গ্রহণ করেছিল, যারা ছিল নির্মল জ্ঞান ও সক্ষম বুদ্ধিবৃত্তের অধিকারী। একইভাবে সমকালীন আহলে কিতাব অর্থাৎ আসমানী গ্রন্থের তথাকথিত দাবীদারদের মধ্য থেকে আকর্ষণ কেবল তাদেরকেই করেছে, যাদের অন্তরে তাকওয়া পরহেযগারীর বীজ মওজুদ ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার তাকওয়া হল—কুরআনের হুকুম আহকাম, বিধি-বিধান অনুসরণের ফলে যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। এরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। সংক্ষিপ্ত কথায়—কুরআন থেকে উপকার লাভের অনিবার্য শর্ত হিসেবে যে তাকওয়া বর্তমান থাকা জরুরী هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অংশে তারই প্রতি ইঙ্গিত। কিন্তু এরপর اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ থেকে وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ পর্যন্ত সে সকল মুত্তাকীদের গুণ ব্যক্ত হয়েছে, কুরআন অনুসরণের ফলে অন্তরে যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। (অতএব প্রথম তাকওয়া শর্ত হিসেবে দ্বিতীয়টি অনুসরণ প্রসূত গুণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যদ্বারা দুয়ের পার্থক্য ও মর্যাদাগত ব্যবধান সহজেই অনুমান করা যায়।—অনুবাদক)

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর, ঈমান বিল গায়েব দুর্বল আকীদা কিংবা কল্পকথার দলীল উপস্থিত করে না। এটা বরং মানুষের জ্ঞান ও প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কুরআনে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। কেননা মানব প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করা হলে দেখা যায় এক প্রকার লোক আছে যাদের চিন্তা-চেতনা কেবল বস্তুবাদী ধারায় প্রবাহিত। এমনকি এরি মধ্যে সীমাবদ্ধ। বস্তু চিন্তার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে বাইরে নযর দিতে আদৌ তারা রাজি থাকে না। মনের মধ্যে এমন আকর্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না কিংবা চেষ্টাও করে না যে, দেখি তো বস্তু জগতের বাইরে থাকার মত কিছু আছে কি না? বস্তুগত তো আছেই এর ঊর্ধে আরো যে অসীম জগত রয়েছে এবং সে জগতে বিচরণের জন্য তাকে যে বিবেক যে যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, সে শক্তি যথাযথ ব্যবহার না করে একে শুধু বস্তুর ঘেরে সীমিত রাখার মধ্যেই তারা আনন্দ পায়। তাদের চেষ্টা-সাধনা কেবল বস্তুজগতকে কেন্দ্র করেই আবর্তন করে। অথচ তাদেরকে বিবেকের অধিকারী বানানোই হয়েছে বস্তুজগতের পরিধি অতিক্রম করে ঊর্ধ ও অদৃশ্য এক মহাজগতে বিচারণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সৃষ্টির এ মহান উদ্দেশ্য নস্যাৎ করে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের সকল শক্তি তারা অবাঞ্ছিত বস্তুজগতের পংকিল আবর্তে সীমিত রাখতে বেজায় তৎপর এর ওপরে উঠে চিন্তা করাটা তাদের মতে কার্যত বায়ুমাপা আর ঢেউ গণার অর্থবোধক।

দ্বিতীয় আরেক শ্রেণীর লোক আছে যাদের নযরে বস্তু কিংবা দৃশ্যজগত মূল্যহীন। তারা মূলত বিবেকের দৃষ্টিতে বিচার করেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে মানবীয় বৈশিষ্ট্যরূপে

গণ্য করেন। তারা মনে করেন আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক শক্তিই মানুষকে পশুর স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে মর্যাদার আসনে স্থান দেয় এবং এটাই মানুষ আর পশুর মধ্যে গুণগত পার্থক্যের মাপকাঠি। বস্তুগত ভোগ বিলাসের অন্তরালে তাদের মনের পুলক আবর্তন করে না। কেননা তারা জানে এ আনন্দ ক্ষণিকের, যার কোনো স্থিতি নেই। বরং সৎকর্ম সম্পাদনের ফলে মনের বনে যে আনন্দের লহরী ছুটে বেড়ায়, তাদের নযরে সেটাই মূলত খুশীর উপাদান হওয়ার যোগ্য বিষয়। আল-কুরআনে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ বাক্য দ্বারা এ জাতীয় লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে এ পর্যায়ের লোকরাই তার উচ্চাঙ্গভাবের মূল্যায়নে সক্ষম এবং তার চাহিদা পূরণের যোগ্যতম পাত্র। পক্ষান্তরে প্রথম প্রকারের দ্বিপদ বিশিষ্ট জীবেরা আকারে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিতে পশুর সমতুল্য, বরং তার চাইতেও নিকৃষ্টতম জীবরূপে কুরআন ঘোষণা দেয়। যথা ঃ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً - الفرقان : ٤٤ "আপনি কি মনে করেন—তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে ? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট।"–সূরা ফুরকান ঃ ৪৪

অর্থাৎ বিবেকের ন্যায় উচ্চতর নেয়ামতকে বস্তুবাদী ভোগ বিলাসে নিয়োজিত করার পর তাদের এ বাহ্যিক শ্রবণ ও স্থূল বুঝার কোনো মূল্য থাকতে পারে না। তারা বরং এমনি বিবেকহারা বোকার দল কাঁচির পরিবর্তে শানিত তরবারি যারা ঘাস কাটার কাজে ব্যবহার করে। মোটকথা অদৃশ্য জিনিস বিশ্বাস করার অর্থ হলো কেবল বাহ্যিক ও বস্তু পূজায় নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে বিবেকের অনুসরণে পথ চলা। বাস্তব সাক্ষী ও বিবেক দ্বারা যে বিষয় প্রমাণ হয়, তাকে নিঃশর্ত মেনে নেয়া। আর প্রমাণ সিদ্ধ বিষয় বাস্তবায়ন কল্পে প্রয়োজনে নিজের সুখ শান্তি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া বিবেকের চাহিদা পূরণে জান-মাল তথা সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া।। এ চরিত্রের লোকেরাই আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে বিশ্লেষণধর্মী অতিরিক্ত ও আনুষঙ্গিক কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি মনে করি না।

প্রণিধানযোগ্য আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের ধারাবাহিক যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, সেটা তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা জাতীয় বর্ণনা। অর্থাৎ নাযিল হওয়ার সময় যে সকল ব্যক্তি চরিত্র উপরোক্ত গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল, তাঁদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে কুরআন যেন বলতে চায়—হে লোক সকল! এদের প্রতি তাকাও। এরাই হলো উল্লেখিত তাকওয়ার ধারক ও বাহক এবং এরাই আমার বরকত ও কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছে। এ সমস্ত গুণের অধিকারী লোকদেরকে আল কুরআন অনাগত উত্তরসুরীদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করেছে। বলা বাহুল্য উপরোক্ত গুণাবলী কুরআনের আলোকে হেদায়াত লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য না করে বরং এর অনুসরণের বরকত ও ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করাই সমীচীন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই—কুরআন যে বিষয়টিকে 'হেদায়াত' নামে আখ্যায়িত করেছে সেটি যাহেরী আমল-আকীদার উর্ধের এক ভিন্নতর বিষয়। ইতিপূর্বে যার বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে। আমল আকীদা হয় উক্ত হেদায়াতের বরকত কিংবা ফলশ্রুতি অথবা এ দুটি হাসিল করার মাধ্যম বটে, মূল হেদায়াত নয়। তবে আমল-আকীদার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে মানুষ যতবেশী যত্নবান ও একনিষ্ঠ হবে, তার হেদায়াতের মাত্রার গভীরতাও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى - محمد : ١٧ "যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হেদায়াত আরো বাড়িয়ে দেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৭

ইসলামসম্মত মৌলিক সৎকর্ম

সর্বশেষ প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই—কুরআনের সঠিক চর্চা-গবেষণার ফলে স্পষ্টত বুঝা যায়—নামায-রোযাই হল ইসলামের মৌলিক সৎকর্ম। অন্য সমস্ত নেক আমল হয় এ দুটির অনুষঙ্গ অথবা এ দুটি থেকে নির্গত। সুতরাং কুরআনের বহু স্থানে নামায-রোযার বিষয় এমন এক মুখ্য ও আলংকারিকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, এ দুইয়ের অন্তরালে অন্য সবের আলোচনা যেন হয়েই গেছে। যথা ঃ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ - التوبة : ١١ "অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই হিসাবে গণ্য হবে"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রশংসায় বলা হয়েছে ঃ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا - مريم : ٥٥ "আপন পরিবারবর্গকে তিনি নামায ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন এবং পালনকর্তার নিকট তিনি ছিলেন পসন্দনীয় বান্দা"–সূরা মারইয়াম ঃ ৫৫। একই সূরার ৩১ আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - مريم : ٣١ "আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায কায়েম এবং যাকাত আদায় করতে।"–সূরা মারয়াম ঃ ৩১

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যদিও দৃশ্যত আলোচনা কেবল নামায-রোযা কেন্দ্রিক, কিন্তু কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, শুধু এ দুটি বলাই এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং অন্যান্য নেক আমলও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নামায রোযাই যেহেতু সমস্ত নেক আমলের মূল বিষয়, কাজেই মূলের সাথে শাখার আলোচনা এমনিতেই এসে গেছে। স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিষয় দুটির গভীরে মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করুন, সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন, ইসলামী পরিমণ্ডলে আসলে এ দুটির মর্যাদা এ রকমই হওয়া উচিত। কোনো কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সত্যিকার বান্দা হওয়ার জন্য তার কোন্ গুণের অধিকারী হওয়া দরকার ? প্রশ্নের জবাব তো এটাই যে, একদিকে সঠিক অর্থে তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত

www.pathagar.com

করতে হবে, অপরদিকে মানুষের সাথে তার পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক ভিত্তির উপর কায়েম থাকতে হবে। এ পর্যায়ে নামায আল্লাহর সাথে আর যাকাত আদায় সুবাদে অর্থ ব্যয় বান্দার সাথে তার যোগসূত্র অটুট করে দেয়। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ এবং মাখলুক উভয়ের হক যথাযথ আদায় করে, তাহলে বলতে হবে যাবতীয় সৎকর্মের চাবি যেন তার হাতের মুঠোয় ধরা দিল। অতপর এ দুটির সাহায্যে অন্য সব সৎকর্মের দরজা খোলা তার জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। কাজেই অন্য যে কোনো সৎকর্ম সম্পাদনে তার সামনে বাধা কিংবা বিপত্তির প্রশ্ন অবান্তর এ জাতীয় কথা হযরত ঈসা (আ) সূত্রেও বর্ণিত পাওয়া যায়। ইঞ্জিল মথির ২২ ঃ ৩৫-৪০ শ্লোকে বর্ণিত আছে ঃ

"আর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, একজন ব্যবস্থাবেত্তা, পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা মহৎ ? তিনি তাহাকে কহিলেন,

"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ইশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে,"

এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য ;

'তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে।'

এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদিগ্রন্থও ঝুলিতেছ।"

হযরত ঈসা (আ)-এর বাণী দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়—দীন ও ইসলামী শরীআত মূলত এ দুটি আমলের উপর ভিত্তিশীল। শুধু কুরআনই নয়, বরং তাওরাত, ইঞ্জিলসহ নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত সমস্ত কিতাব ও সহীফার বর্ণনা মতে এ দুটি আমল তথা নামায ও যাকাতই যাবতীয় সৎকর্মের কেন্দ্রবিন্দু।

৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬-৭ আয়াত

উপরোক্ত আয়াতসমূহে সে সকল মু'মিনদের পরিচয় ও গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে যারা নবী করীম (স) এবং পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী ৬-৭ আয়াতে সে সকল লোকদের পরিচয়ধর্মী আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহর এ নেয়ামত থেকে যারা বঞ্চিত রয়ে গেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

৬. নিশ্চিতই যারা কুফরী করে তাদেরকে আপনি ভয় দেখান অথবা না দেখান তাতে কিছু যায় আসে না, তারা ঈমান আনবে না। ৭. আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং কানসমূহে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের চোখগুলো পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন (পরিণামে) তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

৬. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৬

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ○

কুফরীর হাকীকত

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ঃ এ পর্যায়ে আয়াতের প্রথমাংশ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। আভিধানিক অর্থে ঢেকে ফেলা, গোপন করাকে কুফর বলা হয়। কুরআনে শোকর তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত অর্থেও এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অনুরূপ ঈমানের বিপরীত অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে—নেয়ামতের নাশোকরী ও অবমূল্যায়ন করা। দ্বিতীয় অবস্থায় অস্বীকার করে দেয়া। চিন্তা করা হলে বুঝা যাবে—শব্দের আসল মর্ম উভয় অর্থেই বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআন কারীমের বর্ণনায় কোথাও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুক বিষয়ে কুফরী করা হয়েছে, কোথাও বিষয় উল্লেখ না করে অনির্দিষ্টভাবে ব্যাপকার্থে বলা হয়েছে। প্রথমাবস্থায় নির্দিষ্ট সে বিষয়টি অস্বীকারের অর্থ বুঝাবে। দ্বিতীয়াবস্থায় কুফরী শব্দের ব্যাপকার্থে সে সমস্ত বিষয়ের অস্বীকার ধরে নিতে হবে, সেগুলোর ওপর ঈমান আনা অনিবার্য ছিল। এটা হল শব্দের নীতিগত প্রয়োগ বিধি। তবে পূর্বাপর ইশারা-ইঙ্গিত ও লক্ষণ ভেদে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমী প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ প্রাপ্ত নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা অর্থেও শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে ?

বর্ণনা ভঙ্গির চাহিদা অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা এখানে বিশেষ কোনো দল নির্দেশ করা অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। যেহেতু তাঁদের বিশেষ কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও এখানে বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ (ক) তাদেরকে ভয় দেখানো অথবা না দেখোনো সমান কথা। (খ) আদৌ তারা ঈমান আনবে না। (গ) আল্লাহ তাদের অন্তরে সীল মেরে দিয়েছেন এবং কান বন্ধ করে দিয়েছেন। (ঘ) চোখে তাদের পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। তবে এটা সত্য এ অবস্থা সকল কাফেরের নয়। বহুলোক এমনও ছিল সত্যকে চিনতে পারেনি বিধায় প্রথম অবস্থায় তারা ঈমান গ্রহণে বিরত ছিল। অতপর যখন বুঝে এসে গেল তাওবা করে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যান। তাহলে এ আয়াতের মর্ম তাঁদের

www.pathagar.com

উপর প্রযোজ্য হওয়ার কোনো যুক্তি থাকে না। অতএব ধরে নিতে হবে এ আয়াতে বিশেষ কোনো দল বা গ্রুপের কথাই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে মেনে নিলাম, একটি নির্দিষ্ট দলই উদ্দেশ্য। তাহলে তারা কারা ?

এ ব্যাপারে পূর্বাপর পরিস্থিতির আলোকে আমাদের প্রবল ধারণা—এ দ্বারা কুরাইশী নেতা, আহলে কিতাব এবং মুনাফিক সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদের সামনে কুরআন এবং নবী করীম (স)-এর সত্যতা উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও তারা শুধু হিংসা, গোঁড়ামি ও অহংকারের দাপটে বিরোধিতায় কোমর বাঁধে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কি কারণে তাদেরকে নির্দিষ্ট করা হলো ? বিভিন্ন দিক থেকে এর উত্তর দেয়া যায়। যথা ঃ (ক) প্রথমত এর পূর্ব আয়াতে বলা হয়েছে মু'মিনদের কথা, যারা কুরআন ও নবী (স)-এর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। সেখানে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি এ দ্বারা আহলে কিতাব এবং আল্লাহ ভীরু, পরিশুদ্ধ অন্তরের বনী ইসমাঈলের সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। যাদের মন ছিল পরিষ্কার, সজীব সতেজ, অন্তর ছিল প্রাণবন্ত আর সত্য গ্রহণে সদাজাগ্রত। এহেন যোগ্যতার অধিকারী, প্রাণোচ্ছল আল্লাহভীরু মু'মিনদের মুকাবিলায় অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ভাগ্যাহত বেঈমানদের কথা বিপরীতমুখী এ আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয়—আয়াতের উদ্দেশ্য কুরাইশী মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সে সকল নেতা ও সাধারণ লোক পার্থিব লোভ-লালসা ও আত্মগর্ব একেবারে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। যাদের প্রকৃতিগত স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা বিকৃতি ও ধসের শিকারে পরিণত হয়েছিল। উপরন্তু সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে যারা বঞ্চিতের কাতারে শামিল হয়েছিল।

(খ) দ্বিতীয়ত এখানে নামোল্লেখ ছাড়া একটি বিশেষ দলের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, অন্যত্র সে একই চরিত্র অভিন্ন পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে সরাসরি নামসহ। অথবা নামোল্লেখ ছাড়াই ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য কোনো দলের নামোল্লেখ না করা অবস্থায় এমন কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন ব্যক্ত হয়েছে, যার আলোকে সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে। সে স্থানগুলো সামনে রেখে আলোচ্য আয়াতের সংক্ষিপ্ত কথা ব্যাখ্যা করা হলে কেউ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে কথা ইতিপূর্বে আমরা বলেছি। অর্থাৎ অত্র আয়াতে মক্কার মুশরিক, ইহুদী-নাসারা এবং মুনাফিক নেতৃবর্গের কথাই বলা হয়েছে। কুরআনের সত্যতা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও যারা বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমাদের মতের সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ

بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوْا

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ لا وَاَنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ

اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○ـ نحل : ١٠٦ـ١٠٨

"অন্তরে আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণে যাকে বাধ্য করা হয়, এমন লোক ছাড়া যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরী কর্মে মন খুলে দেয় তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহর গযব আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। এটা এজন্য যে, পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনকে তারা অধিক ভালবাসে। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। এরাই সে সকল মানুষ আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন আর এরাই মূলত বেখবর ও উদাসীন প্রকৃতির লোক।"

–সূরা আন নাহল ঃ ১০৬–১০৮

এ আয়াত মর্মে স্পষ্টত বুঝা গেল যে, ঈমান আনয়ন অথবা সত্য প্রকাশ পাওয়ার পর কেবল পার্থিব মোহ এবং দুনিয়াবী লোভ-লালসাবশে কুফরী-বেঈমানীর পথ অনুসরণ করে, তার চোখ, কান, অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। তাদের জন্য ঈমানের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। পরিণামে আল্লাহর আযাব-গযবে পতিত হওয়া ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনো উপায় থাকে না। অতএব এ দ্বারা আসল উদ্দেশ্য যে ইহুদী পণ্ডিত, মুনাফিক ও কুরাইশী নেতারাই তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অথবা এদের পথ অনুসরণে যারা এগিয়ে যাবে।

নবী-রাসূলগণের শত্রুতা যাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ج وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانُوْا

لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ط كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○ ـ الاعراف : ١٠١

"কার্যত এগুলো সে সমস্ত লোকালয়ের বিবরণ যার কিছু কথা আপনাকে আমি অবহিত করছি। যাদের কাছে রাসূলগণ পৌছেছিলেন নিদর্শনসহকারে। কিন্তু প্রথম থেকেই সেগুলোকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে কস্মিনকালেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। কাফেরদের অন্তরে আল্লাহ এমনিভাবে মোহর মেরে দেন।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১০১

অন্য আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○ ـ النساء : ١٥٥

www.pathagar.com

"অতএব, তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, সেটা মূলত তাদেরই ওয়াদা ভঙ্গ, অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করা এবং তাদের 'আমাদের হৃদয় তো আচ্ছন্ন' (জাতীয়) উক্তির কারণে। কথা সেটা নয়, আল্লাহ বরং কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তাদের অধিকাংশই ঈমান আনবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৫৫

আর মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○– منافقون : ٣

"এটা এ কারণে যে, ঈমান আনার পর পুনরায় তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে গেছে। যে কারণে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা বুঝতেই পারে না।"–সূরা মুনাফিকূন ঃ ৩

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায় اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা বিশেষ একটি দল বুঝানো হয়েছে। কিন্তু মুশরিক অথবা আহলে কিতাবদের কোনো একটিকে এককভাবে বুঝানো হয়নি। বরং উভয় দলের মধ্য থেকে কেবল সে সকল লোকদের প্রতি ঈঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে, সত্য উদ্ভাসিত হওয়া এবং উত্তমরূপে চিনে নেয়া সত্ত্বেও যারা হকের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

পূর্ববর্তীগণ সূত্রে উক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তা আমাদের এ মতই সমর্থন করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এ দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃস্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়াপন্থী লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা নবী করীম (স) সম্পর্কে তাদের আসমানি কিতাবে বর্ণিত সকল ভবিষ্যদ্বাণী যাবতীয় পরিচয় মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল। এমনিভাবে আখেরী নবীর ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কৃত সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার তারা নস্যাৎ করে দিয়েছিল। রবী বিন আনাসের মতে উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের শীর্ষ নেতা ও গোত্র প্রধান, ইসলাম বিরোধিতায় যারা মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যায় উভয় মত প্রায় সমার্থবোধক। যাতে পরস্পর সমর্থনের অর্থ পাওয়া যায়। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, প্রথমোক্ত মত সংক্ষিপ্ত আকারের আর রবী বিন আনাসের ব্যাখ্যা ব্যাপক অর্থের বাহক। কুরআনের দৃষ্টান্ত বলেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যে কারণে এ মতই আমরা গ্রহণ করেছি।

ءَ اَنْذَرْتَهُمْ ঃ আভিধানিক অর্থে—ভয় দেখানো, সাবধান-সতর্ক করাকে ইনযার (انذار) বলা হয়। বলাবাহুল্য নবী ও রাসূলগণের দাওয়াত ও তাবলীগ একদিকে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ ভিত্তিক হয়ে থাকে। সে প্রমাণ চাই ভূমণ্ডলীয় বিষয় কেন্দ্রিক হোক চাই নভোমণ্ডলীয়। অর্থাৎ তাঁদের দাওয়াত এমনি বাস্তব প্রমাণে সমৃদ্ধ থাকে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। অপরদিকে তার অন্তরালে ভীতি প্রদর্শন এবং সুসংবাদের উপাদানও নিহিত থাকে। সুসংবাদ এই অর্থে যে, নবীর আহবান ও দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তাঁর দেখানো সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল পথ অনুসরণের ফলে ইহকাল ও পরকাল উভয়

www.pathagar.com

জগতে সফলতার অমিয় বাণী শুনানো হয়। পক্ষান্তরে নবীর বাণী অমান্য করার পরিণামে উভয় জীবনে যে অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে, সে বিষয়ে আগাম জানিয়ে দেয়াই ইনযারের (اِنْذَار) সারকথা। স্বাভাবিক অবস্থায় নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামগণ উভয় দায়িত্ব সমভাবে পালন করে থাকেন। কিন্তু দীন না বুঝা কিংবা দাওয়াতের মর্ম না জানার কারণে অথবা ভুল বুঝাবুঝির দরুন বিরোধিতা নয়, বরং সত্যকে সত্য জানার পরও যারা কেবল হিংসা, অহংকার ও আমিত্ব বজায় রাখার মোহে নবুওয়াতী আহ্বানের মোকাবিলায় নেমে পড়ে, নবীর দাওয়াতে প্রকৃতিগতভাবেই সে ক্ষেত্রে 'ইনযার' তথা ভীতি প্রদর্শনের দিক প্রবল থাকে। কারণ ভীতির এ প্রাবল্যই তখন পরিস্থিতির দাবী। সে সুবাদে নবীর দাওয়াতী কর্মতৎপরতাকে এখানে ইনযার প্রসূত শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে—চরমপন্থী গোঁড়াদের পক্ষ থেকে নবী করীম (স)-এর বিরোধিতা অজ্ঞতা কিংবা না বুঝার কারণে ছিল না, বরং "কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং বিশ্বনবী (স) যথার্থই আল্লাহ প্রেরিত রাসূল" কথাটা জানার পরও তাদের এ বিরোধিতা ছিল নিছক হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রভুত্বের তাড়না প্রসূত ছলনার মহড়া বিশেষ। মোটকথা ঈমান কিংবা কুফরীর অন্তরালে যে প্রতিদান আর পরিণতি নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে সতর্ক এবং অনুপ্রাণিত করাটাই এখানে সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের মূলকথা। চিকিৎসক যেরূপ রুগী ব্যক্তিকে ঔষধ-পথ্য ব্যবহারের উপকারিতা আর কুপথ্য ও উদাসীনতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, নবী-রাসূলগণও তদ্রূপ দাওয়াত মানা-না মানার ফলাফল জানিয়ে দেন এবং এটাই তাঁদের মূল দায়িত্ব।

ভীতি প্রদর্শনের হাকীকত

ভীতি প্রদর্শনের এ তত্ত্বকথা না জানার কারণে ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে এটি কাল্পনিক আযাব-গযবের কথা শুনিয়ে মানব মনকে ভীত করার একটা অর্থহীন প্রয়াস মাত্র। নতুবা বিবেকের দুয়ারে তার আবেদন নেই কেন ? প্রশ্নকর্তা এখানে দুটি বিষয়ে অজ্ঞতার শিকার। (ক) কুরআনের দাওয়াত কেবল মাত্র সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ দুটি বরং তার কল্যাণধর্মী দাওয়াতের একটা দিক মাত্র। অন্যথায় এর গভীরে আরো কত বিবেকসম্মত ও সৃষ্টজাত শক্তিশালী দলীল যে রয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। (খ) প্রশ্নকর্তার অজানা দ্বিতীয় বিষয়টি হলো—ঈমান-আকীদা ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। বিষপানে প্রাণহানি ঘটা অনিবার্য কথাটা তাদের জানা বটে, কিন্তু একইভাবে কুফর, মুনাফেকী ও মিথ্যার বিষাক্ত ছোবলেও যে জীবন বিনাশ হতে পারে বরং হওয়াই নিশ্চিত, সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকার কোনো প্রমাণ নেই। পয়গাম্বরগণ যেহেতু চারিত্রিক মূল্যবোধ ও ঈমান-কুফরের পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত, কাজেই সেসব কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়াটা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পয়গম্বরগণ নিজেদের জ্ঞান-ইয়াকীনের মানোপযোগী ভাষা প্রয়োগে এ প্রচার কার্য সমাধা করেছেন। আল কুরআন সেটাকেই ইনযার (اِنْذَار) শব্দে ব্যাখ্যা করেছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৭

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

খাতামার অর্থ

خَتَمَ اللّٰهُ ঃ মোম, মাটি কিংবা এ জাতীয় কোনো কিছুর ওপর ছাপ মারাকে আরবী ভাষায় 'খাত্‌মুন' বলা হয়। এ থেকেই চিঠির উপর মোহর মারা অথবা কোনো কিছুর মুখ এমনভাবে বন্ধ করা যেন, তাতে বাহিরের কিছু ঢুকতে না পারে আবার ভিতরের জিনিস যেন বের হয়ে না যায়, অর্থে এর প্রচলন শুরু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নিজের সাথে ক্রিয়াপদ সম্পৃক্ত করে বর্ণনা দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, কাজটা আল্লাহ নিজ হাতে সম্পন্ন করে দেন, বান্দা যেরূপ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য বরং এই যে, তিনি নীতি নির্ধারণ করে দেন। যে নীতি ও ধারাবাহিকতার অধীনে তার আওতাভুক্ত কার্যাবলী আপন গতিতে সুসম্পন্ন হতে থাকে। বিধান যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক রচিত ও নির্ধারিত, কাজেই সে নিয়ম প্রসূত কার্যাদি সময় সময় বিধানদাতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। যা কমবেশী পৃথিবীর সকল ভাষায় প্রচলিত লক্ষ করা যায়। তালাশ করা হলে আরবী ভাষা হোক, চাই কুরআন শরীফ, সবখানেই এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আপনি খুঁজে পাবেন। আলোচ্য আয়াতে প্রচলিত সে নিয়মের ধারা অনুযায়ী অন্তরে মোহর এঁটে দেয়ার কাজকে যদিও আল্লাহ নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো—হেদায়াত ও গোমরাহীর যে পথ তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে পথ অনুসরণের ফলে অন্তরের মোহর অংকিত হয়, সে পথ চিহ্নিত করে দেয়া। বাস্তবে নিজ হাতে আল্লাহ মোহর মেরে দেন, একথা বলা আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। এখন প্রশ্ন থাকে সেটা কোন্ পথ কোন্ নীতি ? এর ব্যাখ্যা এখানে নয় পরবর্তীতে যথাস্থানে করা হবে।

সামউন (سَمْعٌ) এক বচনে উল্লেখের কারণ

عَلٰى سَمْعِهِمْ ঃ আলোচ্য আয়াতে (عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ) বহুবচনে আর সামঈহিম (سَمْعِهِمْ) এ 'সামউন'-শব্দ এক বচনে বলার কারণ কি ? এ মর্মে কারো মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। অথচ কালামের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধানের দাবী অনুযায়ী এটাকেও বহু বচনে ব্যক্ত করাই সমীচিন ছিল। এর জবাব আমার মতে বিষয়টা আরবী ভাষী লোকদের বাগধারা ও প্রয়োগবিধির সাথে সম্পর্কিত। শব্দটা কুরআনের প্রায় ২০/২২ স্থানে ব্যবহার হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কুলূব, আবসার, আফইদাহ্ (قُلُوْبُ - ابصار - افئدہ) ইত্যাদি বহুবচনের সাথে এবং সামউন শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর বহু বাচনিক ব্যবহার কোথাও পাওয়া যায় না। সর্বজন স্বীকৃত কথা যে,

www.pathagar.com

অলংকার শৈলীর মানদণ্ডে কুরআন কারীম এক অতুলনীয় ও শীর্ষ পর্যায়ের গ্রন্থ। এহেন গ্রন্থে যেহেতু 'সামউন' শব্দটা একবচনে সর্বত্র প্রয়োগ হয়েছে, কাজেই স্বীকার করতেই হবে যে, আরবী ভাষী পণ্ডিতবর্গ ও ভাষাবিদগণের চিরাচরিত বাগধারায় এভাবেই এর প্রয়োগ চলে আসছে এবং এটাই তার বিশুদ্ধ ব্যবহার

৭. অন্তরে মোহর মারার তত্ত্বকথা এবং এ সম্পর্কিত ইলাহী বিধান

অন্তরে মোহর মারা সম্পর্কে দুটি বিষয় এখানে জেনে নেয়া ভাল। প্রথমত মোহর আঁটার বাহ্যিক অর্থ এখানে অবান্তর। বরং কি উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হয়েছে মর্মগত সে অর্থ নেয়াই এখানে মূল বিষয়। কেননা বাহ্যিক অর্থে নেয়া হলে কুরআনীভাব ও উদ্দেশ্য নস্যাৎ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। উপরন্তু প্রশ্নের আচরণে জটিলতা উপস্থিত হয়ে যায়। সেটা এভাবে কুরআনের ভাষ্য তাদের চোখ-কান ও অন্তর সীলগালা করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ তাদের শ্রবণ-দর্শন ও অনুভূতি ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে তারা কোনো কিছু দেখেও না, শোনেও না, বুঝার তো প্রশ্নই আসে না। এক কথায় তারা এখন অন্ধ-বধির, অনুভূতি হারা দেহ সর্বস্ব। অথচ বাস্তবের ভাষা সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত। যদ্বারা কালামে ইলাহী রদ হয়, কুরআনের সত্যতায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অতএব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে ভাবের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে একথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না—যাহেরী অর্থে এরা দেখে শোনে ঠিকই কিন্তু আপন বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিকে এরা কেবল যাহেরী ও অনুভূতির ছোট্ট খাঁচায় বন্দী রাখার পক্ষপাতি। বাহ্যিকের গভীরে ভাবের কত যে মানিক ছড়িয়ে আছে সে সমস্ত আহরণে নিজেরা তো আকৃষ্ট হয়ই না অন্য কোনো কল্যাণকামীর আহবানে সাড়া দেয়াও জরুরী মনে করে না। নিজের চিন্তা-চেতনা, মেধা ও কর্মশক্তিকে এরা পার্থিব লোভ-লালসা এবং দুনিয়াবী সহায় সম্পদ অর্জনে এমনভাবে নিয়োগ করে যে, পরকাল তথা চিরস্থায়ী কল্যাণ চিন্তায় মনোযোগ দেয়ার সময়ই তাদের হয়ে উঠে না। ফলে আকাশ-পাতালের পরিধি আর ভূ-প্রকৃতি নির্ণয়ে তাদের মেধা বেজায় সরল বটে, কিন্তু রূহানী মূল্যবোধ এবং সৃষ্টি তত্ত্বের গুণমান অনুধাবনে তাদের একই ধী-শক্তি অচলের ঘরে বসে অক্ষমতার বাঁশী বাজায়। অবস্থার এ প্রেক্ষাপট তাদের রুচিবোধ আর বিবেক শক্তিকে বিকৃতির অন্ধ কোঠায় এমনভাবে বন্দী করে যে, এখন তারা কেবল সে কথাই শুনতে রাজি যা তাদের বিকৃত অভিরুচির খোরাক দিতে পারে। কথা যতই কল্যাণকর কিংবা বিবেকসম্মত হোক সে দিকে মনোযোগ দেয়া তারা ভীতির অনুশীলন মনে করে। তাদের এহেন বিকৃত রুচি আর দূষিত মানসিক অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে 'খতমে কুলূব' তথা অন্তরে মোহর আঁটা শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত মোহর মারার অর্থ এটা নয়—মায়ের পেটে থাকাবস্থায় হৃদয়ে ছাপ মেরে মেরে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এর সঠিক অর্থ বরং নিজেদের কৃত পাপাচারের অবাঞ্ছিত ফলশ্রুতি বিবেচনা শক্তির গায়ে এতই পচন ধরিয়েছে যে, নবীর বাণী শোনা ও বুঝার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

বলা বাহুল্য ভাল-মন্দ বিবেচনা শক্তি দান করেই আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সাথে ভালকে পসন্দ এবং মন্দকে ঘৃণা করার অনুভূতি তার প্রকৃতিতে নিহিত রাখার পরই তাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। অতপর সৃষ্টিগত এহেন যোগ্যতা বলে বলিয়ান অবস্থায় দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে পরীক্ষামূলক সাময়িক স্বাধীনতা দান করত ছেড়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য—তার কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, আমল-আখলাক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিবেচনা শক্তি সে কোন্ পথে ব্যবহার করে। তার চলার গতি যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী হেদায়াতের পথে প্রবাহিত হয়, তাহলে তার সৃষ্টিগত যোগ্যতা বিকাশ লাভ করে এবং সৎকর্মে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অধিক বাড়িয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর শাশ্বত বিধান লংঘন করে এবং নফসানী খাহেশের অনুসরণে সে যদি নাফরমানীর পথে অগ্রসর হয়, তাহলে তার আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা কমতির দিকে রওয়ানা হয়। যদি ফিরে আসে ও তাওবা করে, তবে তো উত্তম, যোগ্যতার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না বশে যদি নারফরমানীর পথে অগ্রসর হতেই থাকে, তাহলে ক্রমান্বয়ে তার অন্তর কৃষ্ণ বর্ণে কলুষিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যায়ে সৎকর্মের যোগ্যতা হারিয়ে সে পাপের পংকিল ডোবায় নিমজ্জিত হয়। যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন তো দূরের কথা ভাল কথা শুনতে গেলেও তার মন বিষিয়ে উঠে, ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়ে।

অন্তরে মোহর লাগে পাপের পরিণামে, কথাটা পবিত্র কুরআনে বহুবার বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত লক্ষণীয় ঃ

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ ۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○ - الاعراف : ١٠٠

"পূর্ববর্তীদের ধ্বংস হওয়ার পর যারা যমীনের উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তাদের কি এ বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে গুনাহর দরুন তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলতাম। আর তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিতাম। যেন তারা শুনতেই না পায়।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১০০

আয়াতের ভাষ্যে স্পষ্টত প্রমাণ হয় অন্তরে মোহর মূলত গুনাহর কারণে লেগে থাকে। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○ - الاعراف : ١٠١-١٠٢

"আর রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে তাদের নিকট পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পূর্ব থেকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে আদৌ তারা ঈমান গ্রহণকারী ছিল না। আল্লাহ

www.pathagar.com

কাফেরদের অন্তরে এমনিভাবে মোহর মেরে দেন। তাদের অধিকাংশ মানুষকে আমি ওয়াদা পূরণকারী পাইনি। বরং তাদের অধিকাশংকে পেয়েছি নাফরমানরূপে।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১০১-১০২

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করার প্রবণতা তাদের চরিত্রে প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। যে কারণে রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এবং বাস্তব নিদর্শন নিয়ে আসা সত্ত্বেও তারা এর কোনো গুরুত্বই দেয়নি। তাই চিরন্তন সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে দিতে যারা দুঃসাহস দেখায়, বিবেক বিনাশী মোহর লাগিয়ে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলে তা অসঙ্গত হতে পারে না।

নিম্নোক্ত আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে এর চেয়েও স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যথা ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ـ النساء : ١٥٥

"কাজেই তারা যে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেটা ছিল তাদেরই ওয়াদা ভঙ্গের পরিণামে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার দরুন, অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যার কারণে এবং তাদের এ উক্তির দরুন যে, "আমাদের অন্তর তো আচ্ছন্ন হয়ে আছে।' (আসলে ব্যাপার সেটা নয়) বরং কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। যে কারণে এদের মুষ্টিমেয় লোকই মাত্র ঈমান গ্রহণ করে থাকে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৫৫

আলোচ্য আয়াতসমূহের আলোকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় ঃ (ক) মায়ের পেটে মোহর মেরে আল্লাহ কাউকে দুনিয়ায় পাঠান না। অগত্যা মোহর যদি কারো অন্তরে লেগেই যায়, তবে সেটা তার কৃত নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপই লাগে। (খ) দ্বিতীয়ত গুনাহ হওয়া মাত্র কিংবা যে কোনো স্তরের নাফরমানীর কারণে মোহর লাগে না। বরং মোহর লাগার প্রকৃত কারণ হলো—সত্যকে সত্য জানা ও বুঝা সত্ত্বেও যদি কেবল অহংকার, গোঁড়ামি আমিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে হকের বিরোধিতায় অটল থাকে, এমতাবস্থায় এর প্রতিক্রিয়ায় অন্তরের সত্যানুভূতি শক্তি বিলোপ হয়ে বিবেকের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে বিশুদ্ধ মনে ন্যায়-নীতি ও হকের মূল্যায়ন ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। কুরআনের ভাষায় একেই 'খতম' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মর্ম থেকে তৃতীয় যে তথ্য পাওয়া যায় সেটা হলো—অন্তর মোহরযুক্ত এবং দর্শন ও শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা মূলত আল্লাহর শাস্তি বিশেষ। যা তাঁর দেয়া নেয়ামতরাজির অকৃতজ্ঞতার পরিণামে দুনিয়াতেই কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর উপর পতিত হয়। আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত 'আযাবে আযীম' তথা ভয়াবহ আযাব পার্থিব সে আযাবেরই অপর নাম। যা এ জাতীয় লোকদের উপর পরজীবনে পতিত হবে।

www.pathagar.com

খতমে কুলূব তথা অন্তরে মোহর আঁটার যে তত্ত্বকথা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি বহু হাদীসে তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি পরিহার করে এখানে একটিমাত্র হাদীস উদ্ধৃত করাই আমি যথেষ্ট মনে করি। যথা—নবী করীম (স) এরশাদ ফরমান ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِي قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - ابن كثير بحو اله ترمذى

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোনো গুনাহ করে বসে, তখন সে কারণে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। অবশ্য পরে সে যদি তাওবা করে, গুনহ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু পাপের মাত্রা যদি তার বাড়তেই থাকে, তাহলে এক পর্যায়ে কাল দাগ তার অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলে। এটাই সেই 'মরিচা' যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ কখনো না, এটা বরং আমলের কারণে তাদের অন্তর মরিচায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।"–তিরমিযী সূত্রে ইবনে কাছীর

শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম মনীষীগণও খতমে কুলূবের এ অর্থই সমর্থন করেন। আ'মাশ সূত্রে এ সম্পর্কে ইবনে কাছীরের বর্ণনা প্রণিধান যোগ্য। ইবনে কাছীর বলেন—আ'মাশ বলেছেন ঃ বিষয়টা ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে মুজাহিদ একদিন আমাদের বললেন ঃ সলফ তথা সহাবীগণ অন্তরকে হাতের তালু সদৃশ মনে করতেন। মানুষ যখন পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তখন (নিজের একটি আঙ্গুল তালুতে গুটিয়ে এনে বললেন) তার অন্তর এভাবে সংকীর্ণ হয়। আবার যখন পাপাচারে লিপ্ত হয় (দ্বিতীয় আঙ্গুল গুটিয়ে তার ডগা তালুর প্রান্তে ঠেকিয়ে বললেন) তার অন্তর এভাবে সংকীর্ণ হয়। একইভাবে তৃতীয় আঙ্গুল গুটিয়ে বুঝিয়ে দেন। শেষ পর্যায়ে এমনকি পরপর সবগুলো আঙ্গুল গুটিয়ে এনে বললেন ঃ পাপের কারণে অন্তর যখন এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তাতে মোহর এঁটে দেয়া হয়। অতপর মুজাহিদ বললেন ঃ সাহাবীগণ এ অবস্থাকেই 'রাইন' (رين) নামে অভিহিত করতেন। যা كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

জবর ও এখতিয়ারের ব্যাখ্যা

খতমে কুলূব তথা অন্তরে মোহর আঁটার মর্মকথা জানার পর মুতাযিলা ও আশাঈরা ফের্কাদ্বয়ের মধ্যে বিতর্কিত 'জবর ও এখতিয়ার' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। উভয় ফের্কা আপন মতের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত উদ্ধৃত করে থাকে। অথচ এ উদ্ধৃতির আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। কারণ আশাঈরাদের দাবী অনুযায়ী কুরআন কারীম জবরের পক্ষেও নয়, মুতাযিলাদের কথা মতে এখতিয়ারও সমর্থন করে না। হক বরং এ দুইয়ের মাঝখানে বিরাজমান। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার মহল এটা নয় বিধায় আমরা কেবল নীতিগত কয়েকটি বিষয় এখানে

www.pathagar.com

আলোচনায় আনতে চাই। গোঁড়ামি ও পক্ষপাত বিহীন মুক্ত মনের সন্ধানী লোকদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে আমাদের ধারণা। সে নীতিগত বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ 'ফিতরাত' তথা উত্তম স্বভাবজাত গুণে মণ্ডিত অবস্থায় আল্লাহ মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তার প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক পার্থক্যের উপাদান প্রথম থেকেই রাখা হয়েছে। এর মধ্য থেকে যেটাই সে গ্রহণ করুক সে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে। এরপর উত্তম কিংবা অধম হওয়া নির্ভর করে তার চলমান গতি ও আল্লাহর তাওফীকের উপর। সৎপথে চলার প্রয়াস নিলে আল্লাহ তাকে সে ক্ষমতাই দান করেন। অসৎ পথে রওয়ানা দিলে বাধা না দিয়ে আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেন। যথা ইচ্ছা সে যেতে পারে। তবে সবই আল্লাহর ইচ্ছা সাপেক্ষ ব্যাপার।

দুই ঃ যেসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন অথবা বিনিময় দিবেন, সে সমস্ত করা না করার ব্যাপারে মানুষকে তিনি ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা দান করেছেন। কিন্তু এ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ এবং স্বাধীন অধিকার ব্যবহার করতে যারা অক্ষম, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের ঊর্ধে রাখা হয়েছে। জবাবদিহিতাও তাদের করতে হবে না। মানুষের এ অধিকার মৌলিক অর্থে প্রাপ্ত নয়। বরং আল্লাহর দেয়া স্বাধীনতা, যার ব্যবহারও আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তাঁর নিজের ইচ্ছা এবং কাল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের যে কোনো ইচ্ছা-ইরাদা পূরণের ক্ষমতা নাও দিতে পারেন। এতে কারো বলার কিছু নেই। তবে কোনো হেকমত বা কল্যাণের চাহিদা অনুযায়ী কারো সৎ উদ্দেশ্য যদি রহিত করে দেয়া হয়, তাহলে এর সওয়াব ও প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর নীতি নয়। সওয়াব সে পাবেই। অনুরূপ কারো অসৎ পরিকল্পনা আল্লাহর ইচ্ছায় যদি বানচাল হয়ে যায় তাহলে পরকালীন শাস্তি থেকেও রেহাই সে অবশ্যই পেয়ে যাবে, এ জাতীয় অর্থ নেয়া কিংবা ধারণা করা ঠিক হবে না। এখানে বরং আমল করেও শুধু নেক নিয়তের কারণে আখেরাতে সে সওয়াবের অধিকারী সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ বাস্তবায়ন করতে না পারলেও বদ নিয়তের পরিণামে সাজা তাকে পেতেই হবে।

তিন ঃ কুরআনের যেসব স্থানে আল্লাহর ইচ্ছার কথা শর্তহীন বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ—আল্লাহর ইচ্ছাকে বাধা দেয়া কিংবা বদলে দেয়ার শক্তি কারো নেই—থাকা অসম্ভব। তবে এ অর্থ নেয়া আদৌ ঠিক হবে না—তাঁর ইচ্ছাশক্তি লাগামহীন ব্যবহার হয়, ন্যায়-নীতি, আদল-ইনসাফ কিংবা কল্যাণের ধার ধারে না। স্মরণ রাখা দরকার তিনি আদেল হাকীম—ন্যায়ের প্রতীক এবং পরম কল্যাণময়। তাঁর কোনো কাজ কল্যাণ ও ইনসাফ শূন্য হতে পারে না। কাজেই যেখানেই আল্লাহর মাশিয়ত তথা ইচ্ছার কথা বর্ণিত হয়েছে, ধরে নিতে হবে কল্যাণ ও ন্যায়-নীতির কথাই বলা হয়েছে। যে কল্যাণ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সৃষ্টজগতের পরিচালনা তাঁর পসন্দনীয়। স্বয়ং আল্লাহ যে কল্যাণ ও ন্যায়নীতি জারি করেন ইচ্ছাশক্তির জোরে কোথাও সে নীতির বরখেলাফ হতে পারে না। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো। আল্লাহ বলেছেন—যাকে ইচ্ছা তিনি হেদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এর অর্থ এটা নয়—হেদায়াত ও গোমরাহ করার নির্ধারিত

www.pathagar.com

কোনো নীতি নেই। এর অর্থ বরং এই হবে—হেদায়াত অথবা পথভ্রষ্টতা যেটাই হোক নির্ধারিত নীতির মাধ্যমে হতে হবে। যার ব্যতিক্রম নেই। সে নীতির পরিবর্তন কিংবা ভঙ্গ করা অথবা বাধা দেয়া কারো সাধ্যে কুলাবে না।

চার ঃ কুরআনের এবারত ও বক্তব্যে দেখা যায় কোনো কোনো ক্রিয়া পদের আল্লাহ নিজেই কর্তা হয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, এ কাজ আল্লাহ নিজ হাতে সমাধান করেছেন। অর্থ বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যার অধীনে কার্য সমাধা হতে থাকে। নীতির স্রষ্টা যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তআলা, তাই সে নীতি প্রসূত কাজ কর্মকে তাঁর নিজের কৃত কাজ বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ (তারা যখন বক্র হল আল্লাহও তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলেন।) অন্যত্র وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ (আর আমি তাদের অন্তর ও চোখ পরিবর্তন করে দেই।) যাহোক এসব ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে সাধারণত নীতিগত সেই মূলনীতিগুলো তুলে ধরা হয় যার অধীনে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন—বলা হয়েছে ঃ কেবল ফাসেক লোকদেরকেই আল্লাহ পাথহারা বানিয়ে দেন। এ সমস্ত ইশারা-ইঙ্গিত ও বিবরণের উদ্দেশ্য হলো—শব্দের মারপ্যাঁচ আর যাহেরী বাক্যের ধোঁকাজাল ছিন্ন করে পাঠকের মন আসল হাকীকত এবং মূল তথ্যের দিকে আকর্ষণ করা।

পাঁচ ঃ মহান আল্লাহ্ অসীম জ্ঞানের অধিকারী—একথা সর্বজন বিদিত। তাঁর জ্ঞানের অগোচরে কোনো কিছু থাকতে পারে একথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু এ সীমাহীন জ্ঞান তাঁর নির্ধারিত নিয়মের পরিপন্থী নয়। প্রত্যেক মানুষ সম্পর্কে সৃষ্টি লগ্ন থেকেই তিনি জানেন সে কোন্ পথ অবলম্বন করবে—হেদায়াত না পথভ্রষ্টতার ? সাথে সাথে তিনি এটাও জানেন, হেদায়াত কিংবা গোমরাহী যে যেই পন্থাই গ্রহণ করুক সেটাও তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-নীতির অধীনেই অনুসৃত হবে। ব্যতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

উপরোক্ত নীতিগত আলোচনা সামনে রেখে চিন্তা করা হলে জবর ও এখতিয়ার সৃষ্ট জটিলতার অন্ধকার থেকে অনায়াসে মুক্তির উপায় হতে পারে। এ জটিলতা পবিত্র কুরআনের বিবরণ প্রসূত নয়, বরং পরবর্তী যুগের মুতাযিলা, আশাঈরা ইত্যাদি মুতাকাল্লিমগণের উদ্ভাবন। যার সাথে কুরআন-হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই।

৮. ৬-৭ আয়াত দুটির মূল বক্তব্য

গভীর দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত দুটির ভাষ্য পর্যালোচনা করা হলে স্পষ্টত বুঝা যায়—"আপনি ভয় দেখান অথবা না দেখান অমুক অমুক চরিত্রের লোকরা আদৌ ঈমান আনবে না"—মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিছক সংবাদ দেয়া আয়াতের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তত্ত্ব ও রহস্যের আবরণ উন্মোচন করাই এর মূল কথা। এর কয়েকটি বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই। যেন আয়াতের মূল শিক্ষণীয় বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এক ঃ প্রথমত আয়াতের বক্তব্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—এতে নবী করীম (স)-এর প্রতি সান্ত্বনা এবং বিরোধী কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারী ও ধমকের সুর উচ্চারিত হয়েছে। সান্ত্বনাবাণী ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—আপনার তাবলীগ কিংবা ভীতি প্রদর্শনে কোনো ত্রুটি আছে অথবা যে কালাম আপনি তাদেরকে শুনিয়ে থাকেন সেগুলো অর্থহীন—অবাস্তব কথা, আপনার মনে এ জাতীয় দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং দোষ-ত্রুটি-আবিলতা যা কিছু আছে সব তাদেরই মনের দূষিত আবর্জনা। কেননা হকের বিরোধিতা সত্যকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার অপকর্মে সদা নিমজ্জিত থাকায় তারা আল্লাহর শাশ্বত বিধানের আওতায় গিয়েছিল। ফলে সত্য গ্রহণ, হক কথা শ্রবণ এবং সত্য দর্শনের যোগ্যতা তাদের অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন তার জন্য বাকী যদি কিছু থাকে তবে আছে শুধু খোদাই গযব আর জাহান্নামের আযাব, যা তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

দুই ঃ আয়াতের আলোকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় সেটা হলো—অন্তর, বিবেক, চোখ, কান এ চারটি মূলত মানুষের মধ্যে ঈমান ও হেদায়াত ঢুকার প্রবেশ পথ। মানুষ যদি এ পথগুলো খোলা রাখে, জীবন-জগতে সদা ঘটিত বিষয়াবলী ও ঘটনা প্রবাহের প্রতি শিক্ষার নযরে তাকায়, মনোযোগ সহকারে আল্লাহর কালাম এবং নবীর দাওয়াত শ্রবণ করে, অতপর চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তত্ত্বকথার ওপর ন্যায় নিষ্ঠা অন্তরে জমে থাকে, তাহলেই কেবল তার পক্ষে হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু আল্লাহর দেয়া এ সমস্ত উপাদান প্রসূত যোগ্যতা সঠিক অর্থে ব্যবহার না করে যদি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে সে হাজারো মাথা কুটে মরুক কিন্তু ঈমান ও হেদায়াতের আলো তার সামনে উদ্ভাসিত হতে পারে না—হওয়া অসম্ভব।

তিন ঃ তৃতীয়ত আল্লাহর দেয়া চোখ, কান ও অন্তর শক্তির মাধ্যমে মানুষকে যে মহামূল্য যোগ্যতার অধিকারী বানানো হয়েছে, সে যোগ্যতা যথাযথ ব্যবহার করার মধ্যেই তার আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং জ্ঞানশক্তির পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল। কিন্তু সে যদি তাকে ব্যবহারই না করে, কিংবা ব্যবহার তো করে বটে, কিন্তু যে মহান উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে এগুলোকে আল্লাহ তার জন্য বিপদের কারণ বানিয়ে দেবেন। সঠিক অর্থে ব্যবহার না করা অবস্থায় তা বিপদের কারণ এভাবে হয়। যে, আর্থিক, মানসিক, কায়িক, পারিপার্শিক সর্বদিক দিয়ে শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও চিন্তা ও আমলী ময়দানে সে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। সর্বক্ষেত্রে তাকে বরং ব্যর্থতার জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর ভ্রান্ত পথে ব্যবহারের ফলে আসা বিপদের আকৃতি সাধারণত এই হয়—আজীবন সর্বক্ষেত্রে সে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়। এমনকি কর্মজগতের অর্থে দিগন্তে সে অবিরাম চক্কর খায় বটে, কিন্তু কল্যাণ ও সাফল্যের দুয়ারে করাঘাত করা তার কপালে কোনো দিন জোটে না।

www.pathagar.com

৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৮-১৬ আয়াত

এখান থেকে ঈমান অস্বীকারকারী অপর একদল লোকের পরিচয়। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তা-চেতনা ও মানসিক হাল-অবস্থার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যা উপরে বর্ণিত কাফের মুশরিকদের চাইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধরনের। যে কারণে সামষ্টিকের সাথে না জড়িয়ে তাদের ইতিবৃত্ত পৃথক ও স্বতন্ত্র ধারায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং ৮-১৬ আয়াতের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ
قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا
يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ
اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ
اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠
فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

৮. আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবী করে, অথচ বাস্তবে তারা ঈমানদার নয়। ৯. তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এ দ্বারা নিজেদেরকেই তারা প্রতারিত করে, যা তারা অনুভবই

www.pathagar.com

করতে পারে না। ১০. তাদের অন্তকরণ আসলে ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের সে ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। ১১. তাদেরকে যখন বলা হয়—যমীনের বুকে তোমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা জবাব দেয়—আমরা তো কল্যাণের পথ অবলম্বন করি। ১২. স্মরণ রেখো, এরাই মূলত হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা সেটা অনুভব করে না। ১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়—অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আন। তখন তারা বলে আমরাও কি বোকা লোকদের মতই ঈমান আনব! মনে রেখো, আসলে বোকা তো তারাই, কিন্তু তারা সেটা জানে না। ১৪. আর তারা যখন মু'মিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে—আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা তো তাদের সাথে বিদ্রূপ করি মাত্র। ১৫. বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেন নিজেদের অহংকার ও নাফরমানীতে নিমজ্জিত হতে থাকে। ১৬. এরাই সে সকল লোক হেদায়াতের বিনিময়ে যারা গোমরাহী খরিদ করে। ফলে তাদের এ কারবার লাভজনক হয়নি এবং তারা হেদায়াতও লাভ করতে পারেনি।

১০. শব্দ বিশ্লেষণ

আয়াত ঃ ৮-৯

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

النَّاسُ-এর অর্থ

مِنَ النَّاس ঃ 'আন্নাস' শব্দটি ব্যাপকার্থে যদিও বিশ্বমানব গোষ্ঠীকে বুঝিয়ে থাকে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এ দ্বারা বিশেষ একদল মানুষ তথা ইহুদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। পূর্বাপর আলামত একথাই প্রমাণ করে। কেননা আয়াতে যে সকল লোকদের চরিত্র ও পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে, তাদ্বারা ইহুদী সম্প্রদ্রায়ের একটি উপদলই যে উদ্দেশ্য, সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। পরবর্তীতে স্বতন্ত্র শিরোনামে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হবে।

مخادعت ও خدع-এর অর্থ

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ ঃ ইউখাদিউনা' ক্রিয়াপদটি 'মুখাদা'আতুন' (مخادعة) শব্দমূল থেকে নির্গত। যার অর্থ-ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা। সে ধোঁকা সফল হোক চাই না হোক।

আলোচ্য আয়াতে مخادعة এবং خدع উভয় শব্দমূল প্রসূত ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এর মধ্যে মর্মগত পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। শব্দের সম্পর্ক যেখানে আল্লাহর সাথে সেখানে 'মুখাদাআত' (مخادعت) ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ কোনো নির্বোধ আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে পারে, কিন্তু তাঁকে ধোঁকায় ফেলা মানব সাধ্যের অতীত। পক্ষান্তরে প্রতারণার সম্পর্ক যেখানে তার নিজের সাথে সে ক্ষেত্রে خدع (খেদাউন) ধাতু নির্গত ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা আল্লাহকে প্রতারণার জালে আটকানো তো কল্পনার অতীত, তবে হ্যাঁ, এহেন চেষ্টাকারী নিজের ফাঁদা জালে নিজেই আটকা পড়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ঃ শুউর ধাতু থেকে 'ইয়াশউরুন' (يَشْعُرُوْنَ) ক্রিয়া পদটি নির্গত হয়েছে। যার অর্থ অনুভব যোগ্য কোনো বস্তু বা বিষয় উপলব্ধি করা। এ ক্রিয়া পদের প্রয়োগ দ্বারা একটি রহস্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা কার্যত নিজেই ধোঁকার জালে আটকে পড়ার নামান্তর। কথাটা এতই স্পষ্ট—যা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও এ নির্বোধেরা বিষয়টা অনুভব করতে অক্ষম। যেহেতু তাদের এ অমূলক প্রচেষ্টার পরিণতি তারা উপস্থিত দেখতে পায় না। অথচ নিজে দেরকে তারা বুদ্ধিমান ও অতিশয় জ্ঞানী মনে করে থাকে।

আয়াত ঃ ১০

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ۔

মারাদুন (مَرَضٌ) শব্দের অর্থ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত ঃ আয়াতে 'মারাদুন' (مَرَضٌ) শব্দটি কুরআন কারীমে হিংসা ও কপটতা এ দু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মারাদুন শব্দটি যে সকল স্থানে 'নিফাক' (نفاق)-এর সাথে যুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে হিংসা অর্থ সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ করবে। কিন্তু যেখানে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে ধরে নিতে হবে হয় উভয় অর্থে প্রয়োগ হয়েছে অথবা পূর্বাপর আলামত দ্বারা দু অর্থের যে কোনো একটি নির্দিষ্ট হবে। সে মতে এখানে হিংসা অর্থে নেয়ার স্পষ্ট আলামত বিদ্যমান লক্ষ্য করা যায়। কেননা আয়াতে যে চরিত্রের লোকের কথা বলা হয়েছে এরা যে ইহুদী সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত উপদল সে প্রমাণ তো এতেই বিদ্যমান—যা একটু পরেই জানা যাবে। দ্বিতীয়ত, কুরআনের একাধিক স্থানের বরাতে স্পষ্টত দেখা যায় ইহুদীরাই ছিল নবী ও মুসলমানদের কট্টর দুশমন। তাদের এ দুশমনীর মূলে ছিল তাদের জন্মগত হিংসা ও বিদ্বেষ।

مَرَضٌ তথা রোগ বৃদ্ধির আলোচনা

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ঃ উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল আয়াতে বর্ণিত 'মারাদুন' এর অর্থ হিংসা। আর এ হিংসা বৃদ্ধির ক্রিয়াটির কর্তা স্বয়ং আল্লাহ। এর অর্থ এটা নয়

www.pathagar.com

যে, আল্লাহ নিজ হাতে তাদের মনে হিংসার মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এখানে উদ্দেশ্য বরং নির্ধারিত নীতি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা যে নীতির প্রতিক্রিয়ায় তাদের পূর্ব থেকে বিরাজমান হিংসা মাত্রাগুণ আপনি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সে নীতি হলো—নিজের অন্তরকে ঈমান-ইসলামের পরিবর্তে কেউ যদি হিংসা-বিদ্বেষের লালন ক্ষেত্র বানিয়ে নেয়, তাহলে তার সামনে ঘটনা প্রবাহ এবং পরিস্থিতি এমন ধরনের সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে হিংসার বনে বারি সিঞ্চনের ধারা চলতে থাকে। বস্তুত ইসলামের ন্যায় এত বড় নেয়ামতে মুসলমানের ভূষিত কেন করা হলো, এ জ্বালায় ইহুদীদের মন-প্রাণ প্রথম থেকেই বিদগ্ধ ছিল। অতপর ইসলামের কল্যাণে মুসলমানদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য অর্জন করতে দেখে ইহুদী গোষ্ঠীর অন্তরে হিংসার অনল দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এক পর্যায়ে সে আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে সর্বনাশের গভীরে নিক্ষেপ করে।

আয়াত ঃ ১১-১২

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

فَسَادَ فِى الْاَرْضِ-এর হাকীকত

لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ঃ 'ফাসাদ ফিল আরদ' কথাটা কুরআন কারীমের বহুল প্রচলিত ও নিজস্ব পরিভাষা। যার অর্থ—মহান আল্লাহর শাশ্বত বিধানের বিকৃতি ঘটানো অথবা পরিবর্তনের চেষ্টা করা, যে বিধান প্রণীত হয়েছে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত-আনুগত্যের চাহিদা পূরণের লক্ষে। উপরন্তু আল্লাহর ইবাদাত কিভাবে করতে হবে, বিধান অনুযায়ী বাস্তব আমলের রূপরেখা কোন্ ধরনের হওয়া উদ্দেশ্য, কর্মের মাধ্যমে তার বাস্তব নমুনা প্রদর্শনের লক্ষ্যে আম্বিয়া (আ) গণের আগমন। আল্লাহর দেয়া শাশ্বত সে আইন-কানুন এবং নবীগণের দেখানো বাস্তব নমুনার মোড় ঘুরিয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা অথবা প্রবাহের চেষ্টা করাটাই ফাসাদের সারকথা। এ পর্যায়ে কুরআনের দাবী সর্বশক্তিমান আল্লাহর একক ইচ্ছায় ও কর্তৃত্বে সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা টিকে আছে। তাঁরই নিয়ন্ত্রণ বিধির অধীনে সৃষ্টিকুলের গতি ও স্থিতি নির্ভরশীল। এতে যদি অন্য কারো কর্তৃত্ব চলতো তবে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা সৃষ্টিজগত ধ্বংস হয়ে যেত। একইভাবে আল্লাহর নির্ধারিত শরীআতী বিধানের আওতায় ইবাদাত আনুগত্যের বৈধতা স্বীকার করার পর অন্য কারো অনধিকার চর্চা, অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা হুকুম জারির অধিকার মেনে নেয়ার অর্থ তার মর্মমূলে আঘাত করা এবং খোদায়ী বিধানের মূল্যবোধ নস্যাৎ করে দেয়া। যে কারণে দৃশ্যত সৎ নিয়তে হওয়া সত্ত্বেও বিপর্যয়ধর্মী এহেন যে কোনো প্রচেষ্টা, নেতিবাচক যে কোনো ভূমিকা ও আচার-অনুষ্ঠান কুরআনের দৃষ্টিতে 'ফাসাদ ফিল আরদ' তথা সমাজ পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কেননা ফাসাদ সৃষ্টিকারী এ সমস্ত কার্যকলাপ কুরআন প্রতিষ্ঠিত নেযামে তামাদ্দুন,

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির চলমান গতিপ্রবাহ বানচাল করত সমূলে উৎখাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আয়াত ঃ ১৩

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

আলোচ্য আয়াতে كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ অংশে বর্ণিত 'আন্নাস' দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৪

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ঃ আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুযায়ী خَلَوْا ক্রিয়াপদের পর সম্পূরক শব্দ اِلٰى বর্ণিত হলে তার মর্মোপযোগী অপর একটি ক্রিয়াপদ 'উহ্য আছে' ধরে নেয়াটাই ভাব প্রকাশের চাহিদা। সেদিকে লক্ষ করেই অনুবাদে আমরা 'পৌছে' 'মিলিত হয়' জাতীয় শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছি।

শয়তান শব্দের বিশ্লেষণ

শয়তান শব্দটি 'শাইতুন' شَيْطٌ শব্দমূল থেকে নির্গত ফা'লানুন (فَعْلَانٌ)-এর ওযনে আধিক্য বোধক শব্দ। অর্থ—তরিত প্রবণ, রুক্ষ ও বদমেযাজী, কঠোর প্রাণ, দুষ্টমতী, নাফরমান ও বিদ্রোহী। জিন ও মানব উভয় জাতি এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও বাহক হতে পারে। সে মতে শব্দটি দ্বারা এখানে ইহুদী সম্প্রদায়ের সে সকল নেতাদের বুঝানো হয়েছে, যারা ছিল সমকালীন পরিবেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিপর্যয়ের নেপথ্য নায়ক—অন্য কথায় নাটের গুরু।

আয়াত ঃ ১৫

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

আল্লাহর বিদ্রূপ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ ঃ এ আয়াতে 'ইয়ামুদ্দু' (يَمُدُّ) ক্রিয়াপদের শব্দমূল 'মাদ্দুন' (مَدٌّ) অর্থ লম্বা করা, ঢিলা দেয়া, অবকাশ ও সুযোগ দেয়া। অর্থাৎ নাফরমানী ও অবাধ্যতায় এরা যতই অগ্রসর কিংবা নিমজ্জিত হয় হোক, আল্লাহ

তাতে বাধা দিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা করেন না। এদের প্রতিকূলে অবাধ্যতার প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ বরং তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন। উদ্দেশ্য পাকড়াও করার সময় তাদের পক্ষ থেকে ওজর-আপত্তির আদৌ কোনো সুযোগ যেন না থাকে।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাদের সাথে যে বিদ্রূপের কথা উল্লেখ করেছেন يَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ (নাফরমানী কর্মে আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন) অংশে তাঁরই ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ এবং মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম হয়েছে ভেবে তারা আনন্দে আত্মহারা। অথচ প্রতারণার সেই একই জাল যে, তাদেরকেই ঘেরাবন্ধ করার জন্য দিগন্ত বিস্তৃত মুখ ব্যাধান করে ধেয়ে আসছে, সে খবর তাদের নেই। বস্তুত কল্যাণের দিশারী নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারী মু'মিনদেরকে প্রতারণাকারীর পরিণতি এমনি হয়ে থাকে যে, নিজেদের বিছানো ধোঁকাজালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। অতএব নিজেই প্রতারণার শিকার হয়ে অপরকে ধোঁকায় ফেলেছি মর্মে কল্পনা করা যে চরম ধৃষ্টতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর তা বলাই বাহুল্য।

আয়াত ঃ ১৬

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَـٰلَةَ بِالْهُدَىٰ صـ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

ইশতিরাউন (اِشْتِرَاءٌ) শব্দের অর্থ

اشْتَرَوُا الضَّلَـٰلَةَ ঃ ইশতিরাউন (اِشْتِرَاءٌ) শব্দমূলের অর্থ–খরিদ করা। অর্থাৎ ধার্যকৃত বিনিময় প্রদান করত কোনো কিছু অর্জন করা, সত্ত্বাধিকারী হওয়া বা মালিক হওয়াকে ইশতিরাউন তথা খরিদ করা বলা হয়। বলাবাহুল্য বেচাকেনার মধ্যে ক্রেতার নিকট খরিদ করা বস্তুটাই প্রধান ও উদ্দেশ্য। সে হিসেবে তারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করে নিয়েছে। অর্থাৎ হেদায়াতের তুলনায় গোমরাহীকেই তারা বড় মনে করেছে এবং প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং এই যাদের অবস্থা কল্যাণ ও মুক্তির আশা তাদের কতটুকু সঙ্গত, সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

১১. এ ইঙ্গিত কাদের প্রতি ?

ইহুদীদের একটি বিশেষ দল

সূরা বাকারার গোড়ার দিকে মু'মিন-কাফের দু দলের বিষয় আলোচনার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে তৃতীয় একদল লোকের চারিত্রিক ও ঈমানী পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। চাল-চলন, কথাবার্তা, ঈমান-আমানে তাদের সম্পর্ক যদিও কাফেরদেরই সাথে, কিন্তু কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা প্রচলিত কাফেরদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন এক পরিচয় বহন করে থাকে। এদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ভিন্ন। এখন প্রশ্ন আসে এরা তাহলে কোন্ দলের লোক ? জবাবে সাধারণত কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরকেই চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এতে তো সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। সমাধানের কোনো পথ পাওয়া যায়

www.pathagar.com

না। কারণ, তখনকার সময় সমাজে মুনাফিক রূপে যারা পরিচিত ছিল, বাহ্যত সর্বদিক থেকেই নিজেদেরকে তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত রাখার প্রয়াস চালাত। নামায-রোযা ইত্যাদি দৃশ্যমান ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে নিজেদেরকে মুসলিমরূপে যাহির করে বেড়াত। তবে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যে শত্রুতা—সেটা ছিল তাদের একান্ত গোপন বিষয়। সাধারণ চলাফেরায় তার প্রকাশ না ঘটিয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ছিল তাদের ব্যবহারিক চরিত্র। অবশ্য প্রকাশ একেবারে পেতই না তা নয়, বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোপন শত্রুতার বিষাক্ত ছোবলে দংশনের সুযোগ কাজে লাগাতেও কুণ্ঠিত ছিল না। এই ছিল তৎকালীন মুনাফিক চক্রের চরিত্রগত অবস্থা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে কুরআনে যে দলের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তার আলোকে বুঝা যায় এরা অন্তর কিংবা কথায় কোনোভাবেই মুসলমানদের সাথে একাত্মতার পরিচয় দিত না। যেমন—আল্লাহ এবং আখেরাত বিশ্বাসের দাবী তাদের ছিল বটে, কিন্তু কুরআন ও নবীর প্রতি বিশ্বাসের উচ্চারণ তাদের মুখে কখনো শুনা যায়নি। এছাড়াও তাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের তুলনায় আমরা উচ্চমর্যাদায় আসীন। সুতরাং যখন তাদেরকে বলা হত যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে মুসলমানদের ন্যায় ঈমান নিয়ে আস। তখন মুসলমানদেরকে তারা প্রকাশ্যে-স্পষ্ট ভাষায় নির্বোধ বলে উপহাস করত। কাজেই আমাদের মতে এদেরকে মুনাফিকদের দলভুক্ত সাব্যস্ত করা সঠিক হতে পারে না। মুনাফিক যদি না হয়, তাহলে এরা কারা, কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত এবং কাদের সাথে সম্পর্ক রাখে ? সঙ্গত এ প্রশ্ন আসতেই পারে। যা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না।

জবাবে আমরা বলতে চাই—এরা মূলত ইহুদী সম্প্রদায়েরই একটি উপদল। কিন্তু ইসলাম বিরোধিতায় এদের ভূমিকা ওপরে বর্ণিত দলের ভূমিকার চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। যেমন—উপরোল্লিখিত দলের লোকেরা নবী করীম (স)-এর কল্যাণময় দাওয়াতী বাণী শ্রবণ কিংবা বুঝার চেষ্টা না করেই অন্ধ বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু শেষোক্ত দলের লোকরা বিরোধী ভূমিকায় অংশ নিতে পিছপা ছিল না বটে, তবে তার ধরন ছিল অপেক্ষাকৃত মার্জিত ও শালীন।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের ভাবগভীরে মনোযোগ দিলে শেষোক্ত উপদলের মানসিক ও চারিত্রিক যে রূপরেখা, শত্রুতার যে ধরন ও পটভূমিকা দৃষ্টির আকাশে ভেসে উঠে তা হলো—ইসলামের শত্রুতায় পূর্বোক্ত দল অপেক্ষা এরা কোনো অংশে কম ছিল না। ইহুদী মন-মানসিকতায় অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করা এদের মধ্যেও পুরো মাত্রায় ছিল। বনী ইসমাঈল বংশে আখেরী নবী আবির্ভূত হওয়ার দরুন ইহুদী মন-মানসে হিংসার যে অনল ধিকি ধিকি প্রজ্জ্বলিত ছিল, সে দহন জ্বালা থেকে এরাও মুক্ত ছিল না। ইহুদীদের আসমানী কিতাবে শেষ নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রকাশ ইসলামের ক্রমোন্নতি এবং গোটা আরব সমাজে মহানবী (স)-এর অকল্পনীয় গ্রহণযোগ্যতা তাদের মনে হিংসার আগুন বরং শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। এ সমস্ত ব্যাপারে সমজাতীয় লোকদের চিন্তা-চেতনা যে বেদনায় বিদগ্ধ ছিল, এরাও তাতে পুরোপুরি একাত্মতা পোষণ করত। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধারণ ইহুদীরা ইসলামের জাগরণী জোয়ার

www.pathagar.com

প্রতিরোধকল্পে শুধুমাত্র হঠকারিতা ও অস্বীকারের যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, এরা সেটাকে সঠিক ও অর্থবহ ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না। উক্ত পলিসির সাথে দ্বিমত পোষণ করত এরা ইসলাম ও ইহুদীবাদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়িয়ে আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল। এদের আপোষ নীতির প্রতিপাদ্য ছিল—ইসলাম যেহেতু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কাজেই ইসলাম স্বস্থানে বহাল থাকুক। অপরদিকে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে তাদের যে মান-মর্যাদা গড়ে উঠেছে সেটাও যেন ক্ষুণ্ন না হয়। এখন তাদের পরিকল্পিত সে আপোষের রূপরেখা কি হবে এবং কার্যকর করার উপায়ই বা কি ? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের সে ধারণার প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। সুতরাং আয়াতের আলোকে বুঝা যায়—তারা চেয়েছিল মুসলমানরা যেমন মু'মিন তাদেরকেও তদ্রূপ মু'মিন—আল্লাহভক্ত হিসেবে স্বীকার করে নিক। যেহেতু মুসলমানদের অনুরূপ তারাও এক আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। এ পর্যায়ে তাদের অভিমত ছিল—মুসলমানরা মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে মানতে চায়—মানুক। তাঁর আনীত কিতাবকে আসমানী গ্রন্থরূপে স্বীকার করতে চায়—করুক। কিন্তু এসব মানার জন্য আমাদেরকে যেন পীড়াপীড়ি না করে। তারা যদি মনে করে আমরা ইহুদীরাসহ অন্যান্যদের পরকালীন মুক্তি ও নাযাত কুরআন ও মুহাম্মাদ (স)-কে স্বীকার করার অন্তরালে নিহিত এবং এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ আর যারা অমান্য করবে তারা আল্লাহ-রাসূলে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে এতদঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ ও হানাহানির পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। ফলে সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা এবং ঐতিহ্যগত ধর্মীয় পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটবে। আপোষধর্মী এ মনোভাবসূত্রে নিজেদেরকে তারা সংস্কারবাদী দলরূপে আখ্যায়িত করতো। অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিল—মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআন অবিশ্বাস করাটা সামাজিক সম্প্রীতি এবং শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের কারণ হতে পারে না। এটা বরং আমাদের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ বিশেষ। যাতে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকি। কেননা নতুন নবুওয়াত এবং নতুন দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান সমাজে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে আমাদের এ কর্মসূচী তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে রচিত।

১২. ৮-১৬ আয়াতের সামষ্টিক পর্যালোচনা

আলোচ্য দলের পরিচয় এবং তাদের চিন্তাধারা অবগত হওয়ার পর আয়াতের মর্ম ও ভাব সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা হলে তার প্রতিটি শব্দের যথার্থ প্রয়োগ বাক্যের আলংকারিক বর্ণনাশৈলী এবং ভাব বিন্যাসের অপূর্ব ধারা সহজেই আন্দাজ করা যায়। তদুপরি ইসলামের এ সুচতুর দুশমনচক্রের উদ্দেশ্য ও মনোভাব কি ছিল, কুরআন সেগুলো কিভাবে আবার প্রতিপন্ন করেছে, কত কঠোর ভাষায় এর জবাব দিয়েছে, এসবই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে পারে।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম তাদের ঈমান বিল্লাহ ও ঈমান বিল-আখেরাত তথা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাবীর বিষয়টি আলোচনায় আনা যাক। তাদের এ দাবী মূলত আত্মরক্ষামূলক। অর্থাৎ এ দ্বারা তারা বুঝাতে চায়—"আমাদের ঈমান-আমল বিষয়ে কুরআনের সমালোচনা বড় কঠোর-কঠিন। অথচ আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস একেবারে দুর্বল নয়, বরং অন্যদের তুলনায় সমান। কাজেই সমালোচনা অর্থহীন। যেহেতু কুরআন-পরকালে আমরাও বিশ্বাসী—আমাদের অন্তরেও ঈমানের ঝলক কারো চেয়ে কম নয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহভীতি আর দীনদারী মুসলমানদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় যে, অন্যদের মধ্যে পাওয়া অবাস্তব হবে।" আসলে মুসলমানদের মুখ বন্ধ করাই ছিল তাদের এ জাতীয় বাকচাতুরীর উদ্দেশ্য। কারণ কুরআন যে ঈমান-ইসলামের দাবী করে আর এদের দেমাগে যে ঈমান বিরাজমান। দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রকার মিল যে খুঁজে পাওয়া যাবে না—কথাটা ভাল করেই তাদের জানা ছিল। বস্তুত কুরআন তাদের কাছ থেকে চেয়েছিল—নবী মুহাম্মাদ (স) এবং পরকাল বিষয়ে মুসলমানরা যে ধরনের ঈমান পোষণ করে, তোমরাও সে ধরনের ঈমানে বিশ্বাসী হও। কেবল এ জাতীয় ঈমান গ্রহণের মাধ্যমেই কুরআনের দাবী পূরণ হতে পারে। কুরআন কোন্ ধরনের ঈমান চায় তাদের উত্তমরূপে জানা থাকা সত্ত্বেও তারা ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার প্রয়াস চালিয়েছিল বিধায় কুরআন একে ধোঁকা হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। সাথে সাথে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের এ প্রতারণা কেবল মুসলমানের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝার পরও তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা মূলত আল্লাহর সাথে প্রতারণা ও চালবাজির শামিল।

অতপর আয়াতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে—তারা আল্লাহ ও মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলেও আসলে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকায় ফেলেছে। কারণ যে ব্যক্তি চালবাজির মাধ্যমে আপন কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষির সদুপদেশ অবহেলায় উড়িয়ে দেয়, প্রকারান্তরে অপরকে নয় নিজেকেই সে ক্ষতির ভেতরে নিক্ষেপ করে। এর দৃষ্টান্ত যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসক কাউকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিল। কিন্তু রুগী সে অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার না করে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ডাক্তারকে বুঝাতে চায় আমি এর চেয়ে ভাল ঔষধ পেয়ে গেছি এবং অন্যদের তুলনায় ভালই আছি—তার কথা শুনে চিকিৎসক সম্ভবত চুপ হয়ে গেল। কিন্তু এ অবাঞ্ছিত ছলনার পরিণতি ভোগ কে করবে, চিকিৎসক নাকি রুগী? উত্তর সহজেই অনুমেয়। এখন এহেন আত্মঘাতি পরিণামের অনুভূতিই যদি তার না থাকে, তাহলে কাণ্ডজ্ঞানহীন বোকামি ছাড়া একে আর কি বলা যায়?

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্যে অপর যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে সেটা হল বনী ইসমাঈলের প্রতি ঐতিহ্যগত হিংসার বশবর্তী হয়েই সাহসের সাথে বাস্তব অবস্থা মেনে নেয়ার পরিবর্তে তারা মিথ্যা, প্রতারণা ও কৌটিল্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কেননা অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা দেখতে পায়—শেষ নবী (স)-এর আবির্ভাব বনী ইসমাঈল গোত্রে, আসমানী গ্রন্থের অবতরণ তাঁরই উপর। নবী করীম (স) কর্তৃক প্রচারিত দাওয়াত এখন দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে কালজয়ী ও সার্বজনীন ব্যাপ্তি লাভের পর্যায়ে উপনীত।

www.pathagar.com

পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্টত দেখা যায় বিশ্বজনীন ধর্মীয় নেতৃত্ব এখন বনী ইসরাঈলের হাত থেকে ছিন্ন হয়ে বনী ইসমাঈলের কবজায় ন্যস্ত হওয়ার উপক্রম। কাজেই তারা সহজাত হিংসার তোড়ে ঠোঁট কামড়াতে থাকে—যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমরাই ছিলাম প্রকৃত হকদার। তা সত্ত্বেও মহান এ নেয়ামতের ভূষণে বনী ইসমাঈলকে ধন্য ও ভূষিত কেন করা হলো ? এমনিভাবে বনী ইসমাঈলের প্রতি খোদায়ী নেয়ামতের ধারা পর্যায়ক্রমে যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের হিংসার মাত্রাও সে অনুপাতে ঊর্ধগামী হয়ে ওঠে।

বস্তুত এদের মন-মানসিকতায় চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং সত্য আকর্ষণের জন্মগত উপাদান মওজুদ থাকলে নিসন্দেহে বলা যায়—হকের সমর্থন ও সহযোগিতা সুবাদে খোদায়ী নেয়ামতের শরীকদার সাব্যস্ত হওয়া তাদের পক্ষেও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্বের মীরাসী দাবী পরিত্যাগে তাদের মন আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বনী ইসমাঈল গোত্রে আবির্ভূত নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণের যৌক্তিকতাও তারা খুঁজে পায়নি কেবল জন্মগত হিংসার প্রবল পেষণে। এদিকে ইসলামের ক্রমবর্ধমান গতিরোধকল্পে অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়াবে, সে সাহসও মনের ভূবনে তারা খুঁজে পায়নি। এসব দিক থেকে নিরাশ হয়ে অগত্যা মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও কূটনীতির আশ্রয়ে পরিত্রাণের পথ খোঁজাটাই তারা বুদ্ধিমানের কাজ সাব্যস্ত করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়—এটা তাদের জন্য আত্মঘাতি ভ্রান্তপথ। এ পথেই যদি তারা আশ্রয় নিতে চায়, তাহলে তাদের মুক্তি সুদূর পরাহত—পরিত্রাণের আশা না করাই ভাল। কেননা এমতাবস্থায় দুনিয়াতে হিংসার অনলে দগ্ধ হয়ে তাদের জীবন মাটি হবে, অপরদিকে আখেরাতের চিরস্থায়ী ভয়াবহ আযাব তো আছেই।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় দ্বিতীয় বিষয় হলো—নবীর দাওয়াতের বিরোধিতাকে কুরআনে যমীনের বুকে 'ফাসাদ সৃষ্টি' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা মূলত কোনো কাজের চূড়ান্ত ফলাফল ব্যক্ত করার একটা প্রচলিত নিয়ম। যা কুরআনের বহু জায়গায় প্রয়োগ হয়েছে। এ জাতীয় প্রয়োগের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তির সামনে তার কৃতকর্মের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি সামনে হাযির হওয়াটাই এর উপকারী দিক। আর ফলাফলের উপস্থিতি অসৎকর্ম থেকে বিরত এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখানে তাদেরকে বলার কথা একটাই—দীনের কাজে, হকের দাওয়াতে বিরোধিতা করো না কিংবা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িও না। কিন্তু "বিরোধী ভূমিকা দ্বারা সমাজে তোমরা বিপর্যয় ডেকে আনতে চাও" মর্মে উপদেশবাণী শুনিয়ে দেয়াটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই তাদের সামনে চূড়ান্ত পরিণতিটাই তুলে ধরা হয়েছে যে, সফল কিংবা ব্যর্থ যাই হও আযাবের সম্মুখীন হওয়া তোমাদের জন্য অবধারিত।

ওপরে আমরা বলে এসেছি—প্রভুত্ব কার, হুকুম কে দিবে ? লা-শরীক আল্লাহ নাকি শরীকদার মাবুদ নামের খোদাগোষ্ঠী ? আসলে স্বচ্ছ-অনাবিল কিংবা আবিলতায় ভরা ফাসাদময় পরিবেশ নির্ভর করে উপরোক্ত প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার উপর। যদি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়, অনুশীলনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে

www.pathagar.com

বিশ্বময় ন্যায়-ইনসাফের রাজত্ব কায়েম হবে, শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে এবং কল্যাণ ও বরকতের বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু অবস্থা যদি বিপরীত হয়, তবে কৃষ্টি-সভ্যতা ইত্যাদি যতই সুন্দর-শ্রুতি মধুর নামে চিত্রিত করা হোক বিপর্যয়ের কাল ছায়ায় সমাজ পরিবেশ আচ্ছন্ন হবেই হবে। নবী-রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের সার্বিক প্রচেষ্টা যেহেতু খোদায়ী বিধান জারি করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কাজেই এর ফলে সমাজে কল্যাণ ও সংস্কারের ধারা প্রবাহিত না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীত পন্থা পদে পদে বিপর্যয়ের ঢেউ সমাজ কাঠামোর দুর্বল, সবল যাবতীয় ভিত্তিমূল ধ্বসিয়ে দেবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। দৃশ্যত এর পিছনে সদুদ্দেশ্য আর কল্যাণের আশা যতই প্রবল থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। এ পর্যায়ে ইসলামের বিরোধী পক্ষ চটকদার ভাষায় এবং অভিনব কায়দায় নিজেদের এ বিরোধিতার সপক্ষে যুক্তিসঙ্গত অজুহাত খাড়া করে বয়ান দেয়ার চেষ্টা করতো—"নব্য নবুওয়াতের আহ্বানে সাড়া দেয়ার আর্থ-সমাজে বিশৃংখলা ডেকে আনা এবং শান্তি সুখের গতিময় প্রবাহ রুখে দেয়া। যে কারণে এর সহযোগিতায় কোনো প্রকার ইতিবাচক ভূমিকা রাখা আমরা সঙ্গত মনে করি না। কাজেই একে বিপর্যয়ের অনুশীলন মনে করা আর কল্যাণের পরিপন্থী আচরণ সাব্যস্ত করা যুক্তির বিচারে যথার্থ হতে পারে না। আমাদের এ কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা বরং দাঙ্গা-ফাসাদের পরিবর্তে কল্যাণের বাহক এমন কি শান্তির আগমনী বার্তা আখ্যা দেয়াই বিবেকের দাবী।" উপরন্তু তাদের ধারণা মতে—আমরা নয় বিপর্যয়ের বীণা তো আসলে তারাই বাজায় এ নতুন আহ্বানের কেতন উড়িয়ে যারা বাজার-বন্দর, মাঠে-ময়দানে সদা সোচ্চার। এদের জবাবে কুরআনের ভাষ্য-যুক্তির মাকড়সা জাল যতই লম্বা করুক বিপর্যয়-বিশৃংখলার নেপথ্য নায়ক আসলে এরাই। অবশ্য এদের অনুভূতির চঞ্চল পাখী বহু আগেই শূন্যে মহাশূন্যে লীন হয়ে গেছে। কার্যত ব্যক্তি স্বার্থ আর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আবরণে আচ্ছন্নতার কবলে পড়ে এরা বুঝতেই পারে না সত্য মিথ্যা আর ইসলাম-কুফর একছত্রে মিলিয়ে একাকার করার মাধ্যমে কল্যাণ আসতে পারে না। সমাজ সংস্কারের তো প্রশ্নই আসে না। কল্যাণ ও মুক্তির উপায় বরং একটাই—আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের পথ অনুসরণে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আল্লাহর দেয়া পথ হারিয়ে বিপথে রওয়ানা হওয়াটাই ছিল এদের প্রথম অপরাধ। অতপর দীর্ঘ বিরতির পর একান্ত অনুগ্রহ বশত তিনি যখন সে পথ পুনরায় খুলে দিলেন, এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল হারানো সে নেয়ামত সানন্দে বরণ করে নেয়া। কিন্তু বিবেকহারা সে ফাসাদীরা মানিক রতন পায়ে মাড়িয়ে চিরাচরিত নিয়মে আবার সেই গোমরাহীর পথই আপন করে নিল। এ যেন হাতে পাওয়া মুক্তার ঝুড়ি নিক্ষেপ করে অনলকুণ্ড মাথায় তোলা। বিবেকের দৈন্য দশা আর বলে কাকে ?

আলোচ্য আয়াতসমূহের তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো—তাদের ঈমানের দাবী এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের আড়ালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও তাচ্ছিলের মনোভাব লুকানো ছিল কুরআন স্পষ্ট ভাষায় তার উপর থেকে মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কোনো মুসলমান যেন ধোঁকাজালে আটকা না পড়ে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে এরা তুলনামূলক উদার ভাবাপন্ন। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলেছে—মুখে এদের ঈমানের খৈ ফুটা দাবী। কিন্তু যখন বলা হয়—বেশ, তাহলে মুসলমানদের ন্যায় ঈমান গ্রহণে, নবী-কুরআন বিশ্বাসে তোমাদের এ অনীহা এহেন গড়িমসির হেতু কি ? আর তোমাদের এহেন পলায়নী মনোভাবই বা কোন্ কারণে ? প্রশ্নের ধরন শুনে তাদের চেহারা তো টকটকে লাল যেন আগুনের লেলিহান শিখা। মুখে তাচ্ছিল্যের সুর—হুঁ-মূর্খদের ন্যায় যাকে তাকে নবী মেনে আমরা কি তার পিছনে লাইন দেব ? আমরা কি এতই বোকা ?

জবাবে কুরআন বলেছে ঃ হ্যাঁ, আসলে এরাই জ্ঞানহারা—মূর্খ। কিন্তু এ বোকামির বিষাক্ত পরিণাম যেহেতু সামনে উপস্থিত নেই, কাজেই অবকাশ রয়েছে বিবেকের বেচাকেনা আরো কিছু দিন তারা চালিয়ে যাক।

কুরআন তাদের অপর এক চরিত্রের ওপর থেকেও পর্দা সরিয়েছে—লেনদেন, চলা ফেরায় মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ যদি হয়েই যায়, তখন তারা বুলি আওড়াত—মু'মিন কি একা শুধু তোমরা, আমাদের অন্তরেও তো ঈমানের দীপ্তি জ্বলজ্বলে। সেই সূত্রে আমি-তুমি সমানে সমান, যেন কুটুম্বিতায় একাকার। কিন্তু যখন স্বগোত্রীয় নেতা সরদারের মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন তাদের সামনে মনের কথা প্রকাশ করে বলে—আরে হুজুর! মুসলমানদের কথা বলেন, সে তো একটা তামাশা মাত্র। না হয় তাদের সাথে ঈমান-আমানের যে কথা, এগুলো তো শুধু মৌখিক জমা খরচ নতুবা মনে প্রাণে আছি তো আমরা আপনাদেরই সাথে। একেবারে একাত্ম হয়ে।

তাদের এ জাতীয় কূট কৌশলের জবাবে কুরআনের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হয়েছে ঃ এ সকল হতভাগাদের ধারণা—বিদ্রূপের উপদ্রবে মু'মিনদেরকে বেকুব ঠাওরিয়ে খানিকটা কৌতুকের রস আস্বাদন করে থাকি। অথচ তাদের জানা নেই—মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ হুকুম অমান্য করার ন্যায় অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও না করে চূড়ান্ত টানের অপেক্ষায় তাদের জীবন সূত্রে আপাত ঢিলের আন্তরালে কত যে ভয়াবহ কৌতুকের খোরাক নিহিত রয়েছে। প্রতারণা আর জালিয়াতির এ খেলায় নিজেকে তারা সার্থক ও সফল মনে করে। সে হিসেবে আপন গতিতে তারা অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এ 'অগ্রসর' যে ধ্বংসমুখী আকর্ষণ, সে কথা তারা বুঝতেই পারে না। যে ধ্বংস এ জাতীয় লোকদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের নযরে সেটা ধরাই পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে সবশেষে এরশাদ হয়েছে—বিবেক-বুদ্ধির জোরালো দাবী সত্ত্বেও লাভজনক মনে করে হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এরা অচল সদাই নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে। তাদের ক্রয় করা এ মাল দুনিয়ার বাজারেই কোথাও বিকায় না। আখেরাতের তো প্রশ্নই আসে না। অবশ্য দুনিয়ার বাজারে কোনোকালে চাহিদা ছিল বলে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবে শেষ নবীর আগমনে সে চাহিদাও শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুনিয়া

www.pathagar.com

আখেরাত উভয় জগতে তারা এখন ক্ষতির সম্মুখীন অথচ এটাকেই তারা লাভজনক ব্যবসা মনে করেছিল। পরিশেষে গোমরাহীর এ বিপথ বেছে নেয়াটাই পরিণামে তাদের জন্য ইসলাম ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার মূলীভূত কারণ বলা হলে কথাটা আদৌ অমূলক হবে না।

১৩. একটি সন্দেহের নিরসন

আলোচ্য আয়াতসমূহে কুরআন ও পয়গাম্বর (আ) বিরোধী লোকদের সম্পর্কে দৃশ্যত কঠোর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা দাওয়াত পর্যায়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত যে শালীন ও মার্জিত বাকরীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তার পরিপন্থী বলে কারো মনে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। তদুপরি এ ক্ষেত্রে শালীন ভাষা ব্যবহার করার আদেশও কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে। স্বয়ং কুরআনের শিক্ষাই হলো আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও হেকমতের সাথে, শালীন ভঙ্গিতে। বিশেষত আহলে কিতাবদের সাথে দাওয়াতী আলোচনাকালে মার্জিত ভাষা প্রয়োগের উপদেশ খোদ কুরআনেরই। এমতাবস্থায় সঙ্গত প্রশ্ন দেখা দেয়—তাহলে আহলে কিতাবদের একটি উপদলের লোকদেরকে মূর্খ ফাসাদী এবং তাদের নেতাদেরকে শয়তান বলে অভিহিত করার কি কারণ থাকতে পারে ?

উত্তরে বলা যায়—তাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত শব্দগুলো দাওয়াতী যুগের প্রয়োগ নয়। বরং ইসলামের বিরামহীন শত্রুতা, কুটিল ষড়যন্ত্র এবং ইসলাম ও মুসলিম দলের অবিরাম চক্রান্তের পরিণামে যখন প্রমাণ করে দিল যে, মোহরের ছাপ তাদের অন্তরে অংকিত হয়ে গেছে। ঈমান আনা তাদের ভাগ্যে এখন নেই বলাটাই যথার্থ বিবেচনা। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গড়ানোর পরই কেবল তাদেরকে এ সমস্ত নামের কদর্থের আওতায় আনা হয়েছে। নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তকরণে সীলমোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ঈমানের কল্যাণে ভূষিত হওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে আসার পরই তাদেরকে এ সমস্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ব্যবহার দ্বারা কেবল ঘৃণা ও রাগের প্রকাশ ঘটানোই উদ্দেশ্য নয়। এ দ্বারা বরং বাস্তবের ঘটনাবাহী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দীন ঈমানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা যাদের কাম্য, তারা যেন বাস্তব ঘটনার আলোকে শিক্ষা নিতে পারে—আসমানী হেদায়াতের প্রাচীন ওয়ারিসরা অধঃপতনের কত নীচে নেমে গেছে। আর যাদেরকে আল্লাহ ঘুণে ধরা মানব সভ্যতার সংস্কার কর্মে নিয়োজিত করেছিলেন, সেই তারাই এখন যমীনের বুকে নানা প্রকার দাঙ্গা-ফাসাদ এবং বিশৃংখলার তাণ্ডবে সমাজ পরিবেশ কলুষিত করার অপকর্মে কত উল্লাসে মেতে আছে।

এ সূরা আল বাকারার প্রারম্ভে আলোচ্য শব্দগুলো ব্যক্ত হয়েছে, সেটি কেবল বনী ইসরাঈলদের দাওয়াতী সূরা নয়, এতে বরং তাদের প্রতি তিরস্কারও বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু আল্লাহর দেয়া শরীআত এবং নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণে তারা যে সমস্ত অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল, সে সবের তফসীলী বিবরণও এতে ব্যক্ত হয়েছে। অতপর এ অপরাধ প্রবণ চরিত্রের কারণেই মানব জাতির ধর্মীয় নেতৃত্বের আসন থেকে আল্লাহ

www.pathagar.com

তাদেরকে অপসারণ যোগ্য সম্প্রদায় ঘোষণা দিয়ে অপর জাতিকে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহর এ ফায়সালা হঠাতের ফলশ্রুতি নয়। বরং তাদেরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বুঝানো সত্ত্বেও হেদায়াতের পথে ফিরে আসার পরিবর্তে তারা যখন বিপথগামিতায় অটল, তখনি কেবল তাদের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কি কারণে তাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত সেটা এ সূরারই পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। কাজেই তার আগে বনী ইসরাঈলের বানোয়াট চেহারা থেকে কপটতার মিথ্যা পর্দা উন্মোচন করে দেয়া এ সূরার ভাব ও মর্মের সাথে একান্ত সামঞ্জস্যশীল। যাতে নিজেদের ধর্মীয় পবিত্রতায় বিশ্বাসীদের উপর তাদের প্রভাব বিরাজমান ছিল এবং দীন-ইসলামের বিরোধিতায় তারা ভক্ত-অনুরক্তদের উপর বিরাজিত সে প্রভাব দ্বারা যে অন্যায় স্বার্থ লাভের সন্ধানে নিয়োজিত ছিল, সে সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। একইভাবে হযরত ঈসা (আ) ইহুদী আলেম ও নেতা সরদারদের বিরুদ্ধে যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলোও তাদেরকে বুঝানোর মাধ্যমে ওযর আপত্তি সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলেছিলেন। কেননা এখন একথা বলার সুযোগ নেই যে, আমরা জানিনি অথবা বুঝিনি। তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলী ইনজিলে বর্তমান রয়েছে। তাদেরকে তিনি 'সাপের বাচ্চা'—"পূরাতন কবরের বাসিন্দা" ইত্যাদি কঠোর শব্দে সম্বোধন করেছেন। অতএব আসমানী দুই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ পরস্পর তুলনা করা হলে দেখা যায়—কুরআনের ভাষা অপেক্ষাকৃত নরম এবং শালীন উপাদানে অধিক সমৃদ্ধ।

১৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭-২০ আয়াত

অতপর বাস্তব উপমার আলোকে ইসলামের দুশমন উপরোক্ত দল দুটির নৈতিক চরিত্র এবং আমলী পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একদল তো ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতায় চরম ভূমিকা নিয়েছিল। যার ফলে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। এখন তাদের পক্ষে ঈমান গ্রহণ করা অসম্ভব। চিরদিনের জন্য এ পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টান্তে বিকৃত হৃদয় সে দলটির কথাই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় উপমায় বলা হয়েছে এমন সব লোকদের কথা যারা প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ পরিহার করে গোপন শত্রুতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এদের সামনে ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট ও প্রমাণসিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের অগ্রযাত্রা নস্যাতের লক্ষ্যে এরা গোপন চক্রান্ত ও অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের মাত্রা যোগ করতে সদা তৎপর ছিল। এ পর্যায়ে ইসলামের মূল্যবোধ ও মুসলমানদের ঈমানী সৌধে ধ্বস নামানোর লক্ষে তারা প্রতিনিয়ত কি কি চক্রান্তে মেতেছিল এবং অভিনব কত রকমের কৌশলের আশ্রয় তারা নিয়েছিল, তদুপরি তাদের আমলী চরিত্র কি ছিল, দ্বিতীয় উপমায় সে সবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমে আল কুরআনের প্রজ্ঞা ও আলংকরিক ভাষায় উপমা দুটির বিবরণ লক্ষ করুন। অতপর নিজ ভাষায় আমরা সেগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আওতায় আনতে চাই। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ
اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿১৭﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ
لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿১৮﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ
يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ
مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿১৯﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَاءَ لَهُمْ
مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿২০﴾

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে ব্যক্তি কোথাও আগুন জ্বালালো। অতপর আগুন যখন তার চারপাশের সবকিছুকে আলোকিত করে তুললো, আল্লাহ তখন তার উজ্জ্বল আলো ছিনিয়ে নিলেন আর তাদেরকে এমন অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন যে, কিছুই তারা দেখতে পায় না। ১৮. আসলে এরা বধির, মুক ও অন্ধ। (যে কারণে) এখন তারা ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা তাদের উদাহরণ যেমন আকাশ থেকে বারি বর্ষিত হয় সাথে ঘন অন্ধকার এবং বজ্র ধ্বনি আবার থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়। এমতাবস্থায় মৃত্যু ভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে তারা তা থেকে রক্ষা পেতে চায় অথচ সকল কাফেরকে আল্লাহ বেষ্টন করে আছেন। ২০. সে বিদ্যুতের চমক তাদের চোখ যেন ছিনিয়ে নিতে চায়। বিদ্যুতের আলোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছু দূর অগ্রসর হয়। আবার যখন অন্ধকার নেমে আসে, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। কার্যত আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তির একচ্ছত্র অধিকারী।

১৫. শব্দ বিশ্লেষণ

صَيِّبٌ —শব্দের অর্থ

সাইয়েব (صَيِّبٌ) শব্দটি সাধারণত দুই অর্থে ব্যবহার হয়। (ক) মুষলধারে বৃষ্টিপাত, (খ) প্রবল বৃষ্টি বর্ষণকারী বাদল বা মেঘমালা। অনুবাদে আমরা প্রথম অর্থ গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছি। কারণ এ শব্দ দ্বারা মূলত কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। কথাটা এর ব্যাখ্যায় যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

سَمَاءٌ শব্দের অর্থ

سَمَاءٌ শূন্যালোকের নীলাকাশকে সাধারণত আরবীতে 'সামাউন' (سَمَاءٌ) বলা হয়। এর আরেক অর্থ মেঘমালা। আদিগন্ত বিস্তৃত মহাশূন্যকেও সামাউন বলা হয়। বৃষ্টি যদিও আকাশ থেকেই বর্ষিত হয়। যে কারণে এর সাথে সামাউন যুক্ত করা দৃশ্যত অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু আয়াতে 'সামা' শব্দ বৃদ্ধি করা দ্বারা একেতো বৃষ্টির একটা বাস্তব ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, উপমার ক্ষেত্রে যার অবতারণা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। দ্বিতীয়ত এ দ্বারা কুরআন কারীম আসমানী গ্রন্থ হওয়ার প্রতি পরোক্ষ ও সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'বৃষ্টি' দ্বারা কুরআন কারীম বুঝানো হয়েছে। কাজেই সামাউনের (سَمَاءٌ) উল্লেখ এখানে যথার্থই বলা যায়।

صَوَاعِق শব্দের অর্থ

صَوَاعِق শব্দটি صَاعِقَةٌ এর বহুবচন।' যার অর্থ—গর্জনে বজ্র ও বজ্রবিশিষ্ট বিদ্যুৎ।

১৬. উপমাদ্বয়ের ব্যাখ্যা

উপমা সম্পর্কে নীতিগত আলোচনা

ব্যাখ্যার পূর্বে উপমা সম্পর্কে নীতিগত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি না।

বলা বাহুল্য দৃষ্টান্ত ও তুলনা (تَمْثِيلٌ وَتَشْبِيهٌ) যদিও অভিন্ন প্রকার ভুক্ত বিষয়। কিন্তু প্রয়োগ ও ব্যবহারিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। তুলনার মধ্যে সাধারণত যাকে তুলনা করা হয় এবং যার সাথে করা হয়, এ দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রত্যেকটির অংশগুলো পৃথক করত বিবেচনা করা হয় যে, এদের মধ্যে পরস্পর কতটুকু সামঞ্জস্য ও মিল রয়েছে। অতপর উক্ত সামঞ্জস্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ণয় করা হয়—তুলনার মান কোন্ পর্যায়ের ? অলংকার বিচারে তুলনা কি মান সম্মত ও যথার্থ হয়েছে। নাকি নিম্নমানে গড়িয়েছে। কিন্তু দৃষ্টান্তের বেলায় অংশের তেমন গুরুত্ব থাকে না। বরং একটি বাস্তব ঘটনাকে অপর বাস্তব ঘটনার সাথে তুলনা করা হয়। যদি দেখা যায় দুটি অবস্থার মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য সূচিত হয়েছে এবং বাস্তব দৃশ্য নযরে উপস্থিত, তাহলে দৃষ্টান্ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে বলা যাবে। ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ তুলনার জন্য যে বিধি-বিধান নির্ধারিত করেছেন সেগুলো যদি

www.pathagar.com

পুরোপুরি রক্ষিত নাও হয়, তথাপি দৃষ্টান্তের বেলায় একে মানসম্মত ও পরিপূর্ণই বলা যায়।

এ ভূমিকাটুকু স্মরণে রাখার পর আয়াতে বর্ণিত প্রথম দৃষ্টান্তের আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম দৃষ্টান্তে উল্লেখিত পাত্র কে ?

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত (تَمْثِيْلُ) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যক্ত হয়েছে। যে লোক মানুষকে পথ দেখাবার জন্য আলোক প্রজ্জ্বলিত করে। এ কাজটি সে গুরুত্ব সহকারে এবং কঠোর পরিশ্রমে সম্পন্ন করেছে। ফলে তার চারপাশে এখন উজ্জল আলোকে ঝলমল। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে তার এত সাধ্য-সাধনা, এত পরিশ্রম, তারা এর সামান্য মূল্যায়ন করতে নারাজ। অন্ধকারে থাকাটাই যেন তাদের বেশী পসন্দ। পরিণামে আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন। অবস্থা এই হল যে, এখন তারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সে অন্ধকার এত গভীর যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। তদুপরি তখন তারা হবে বধির-বোবা ও অন্ধত্বের শিকার।[১] ফলে তারা কারো আহবান শুনতে পায় না, কারো ডাকে সাড়াও দিতে পারে না। এমনকি আলামত ইশারা দ্বারা পথের দিশা লাভেরও তারা যোগ্য থাকে না। যে কারণে যে পথে তারা রওয়ানা দিয়েছে, সেখান থেকে ফিরে ভিন্ন দিকে মোড় নিবে তাদের পক্ষে সেটাও সম্ভব হয় না। তাদের এ অবস্থা মূলত খোদাই গযবের করুণ পরিণতি, যা তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করা দ্বারা নিজ হাতে কামাই করে নিয়েছে।

চিন্তার গভীরে প্রবেশ করুন—দেখতে পাবেন, আলোচ্য দৃষ্টান্ত ইহুদী সম্প্রদায়ের সে উপদলের ওপর সঠিক বর্তে যায়, যাদের কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। যাদের সম্পর্কে অন্তরে-কানে মোহর এবং চোখে পট্টি লাগানো হয়েছে মর্মে আল্লাহ সংবাদ শুনিয়েছেন। ফলে তাদের পক্ষে ঈমান গ্রহণ করত আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার কথা চিন্তাই করা যায় না।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে আগুন প্রজ্জ্বলনকারী দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা স্বীয় উম্মতের জন্য তিনি হেদায়াতের আলো জ্বালিয়েছিলেন এবং সে আলো গোটা জাতিকে আলোকিতও করেছিল। কিন্তু অতি অল্প দিনে বনী ইসরাঈল গোত্রের অধিকাংশ লোক সে আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। যার শাস্তিস্বরূপ তারা খোদায়ী অভিশাপের কবলে পতিত হয়। পরিণামে হেদায়াতের বাণী শ্রবণ করা এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে তারা এখন পুরোপুরি বঞ্চিতের কাতারে শামিল।

বনী ইসরাঈলের এ বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের বিশদ বিবরণ তাওরাত-ইঞ্জীলে এবং কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তাদের সে অবস্থা এখানে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে

১. উস্তাদ ফরাহীর মতে صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দগুলো হরফে আতফ (সংযুক্ত বর্ণ) ছাড়া একত্রে বর্ণিত হওয়া দ্বারা সবগুলো একই সাথে ব্যক্তির মধ্যে মওজুদ থাকার প্রমাণ।

www.pathagar.com

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপমাটা এমন একটি পথচারী কাফেলার যাদের প্রতিটি লোক একে তো অন্ধ, বধির ও বাকশক্তিহীন, অপরদিকে ঘোর আঁধার রাতে তারা দিশেহারা দিক ভ্রান্ত। অবস্থা এমনি বেগতিক যে, তারা কাউকে কিছু বলতে পারে না—বিপদকালে কাউকে ডাক দিবে কিংবা কারো ডাকে সাড়া দিবে সেটাও সম্ভব নয়। তদুপরি মরার উপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ অন্ধত্বের অভিশাপে পূর্ব থেকেই বেগতিক দশা। আলোর পরশে পথ বেছে নিবে অথবা ইঙ্গিত-আলামত অনুসরণে সঠিক পথে এগিয়ে যাবে, সে ভাগ্য থেকেও ষোলআনা বঞ্চিত। আলোচ্য দৃষ্টান্তে এহেন অভিশপ্ত এক ভাগ্যহারা অনুদলের করুণ চিত্র আর দৈন্যদশার আলেখ্য ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কাদের বুঝানো হয়েছে ?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এমন এক পথচারী কাফেলার বেহাল অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে তমসাচ্ছন্ন-তিমির রাতে যারা লক্ষ্যহীন পথে চলমান। একে তো ঘোর অন্ধকার দ্বিতীয়ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত। সাথে বিদ্যুতের চমক আর কান ফাটা বজ্রধ্বনিতো আছেই। এহেন দুর্যোগের কষাঘাতে তাদের অবস্থা হলো—বিকট বজ্রধ্বনিকালে এরা কানে আঙ্গুল ঠাসে, বিদ্যুতের চমক দেখা দিলে সামান্য আগে বাড়ে, থেমে গেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এ দৃষ্টান্ত ইহুদী সম্প্রদায়ের সে উপদলের বাস্তব চিত্র বিশেষ وَمِنَ النَّاسِ আয়াতে যাদের বর্ণনা শুরু হয়েছে। এতে বৃষ্টি দ্বারা কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যুলুমাত তথা অন্ধকার দ্বারা কুরআনের দাওয়াত গ্রহণকারী মু'মিনরা ঈমানের পথে চলতে যে বাধা-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও বজ্র (رَعْدٌ وَبَرْقٌ) দ্বারা কুরআনের ধমকি বুঝানো হয়েছে। এ ধমকি ও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে মূলত কুরআন অমান্য ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বিশেষত ইহুদী গোষ্ঠীর প্রতি। কুরআনের সত্যতায় এদের পূর্ণ আস্থা ও অনুভূতি ছিল বিধায় এ ধমকি তাদের প্রাণে কঠিন সুরে বাজে। অথচ কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়াটাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল। কিন্তু বিপরীত চিন্তায় ধাবিত হয়ে এরা কুরআনের বাণী শুনতেই যেন রাজি ছিল না। আলোচ্য দৃষ্টান্তে তাদের এ পলায়নী মনোভাবের চিত্র সামনে উপস্থিত করে বলা হয়েছে—শোনা তো দূরের কথা মরণ ভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে এরা বরং সে পথই বন্ধ করে দিয়েছে। এটা যে অর্থহীন বোকামি কাণ্ড সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ আকাশ থেকে বজ্রপতন যদি ঘটেই যায়, তাহলে কানে আঙ্গুল ঠেসে তাকে রোধ করতে যাওয়া হাস্যকর—অপকৌশল ছাড়া আর কি হতে পারে ? যেমন আক্রমণোদ্যত বাঘ দেখে কেউ চোখ বন্ধ করে নিল। তাতে কি বাঘের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ? বাঘ কি শিকার ধরা থেকে সবর করে নিবৃত হয়ে যাবে ? তবে হ্যাঁ, এটা হতে পারে চোখ বন্ধ থাকার কারণে বাঘের আক্রমণ দৃশ্য তার নযরে ধরা দিবে না।

একইভাবে শ্রবণ না করে কুরআনের ধমকি ও সতর্কবাণী থেকে আত্ম রক্ষার চেষ্টা করা বোকামির নামান্তর। এ দ্বারা ঘটনার প্রতিফলনে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না, যা হবার তা হয়েই যায়। সবার অজান্তেই বাস্তবের আবর্তন চলতে থাকে। গল্প আছে—ঝড়ের

www.pathagar.com

আগমন টের পেলে উট পাখী তার মাথা বালুতে লুকায়। কিন্তু এতে তার শেষ রক্ষা সুদূর পরাহত। বস্তুত বাস্তব সত্যের কবল থেকে ইহুদী গোষ্ঠীর এ উপদলের আত্মরক্ষামূলক প্রবণতা আর উট পাখীর রক্ষা কৌশল একই সূত্রে গাঁথা, পার্থক্যের কোনো আলাতম নেই।

কুরআন নাযিল হওয়ার পর তাদের মানসিক বিচলিত ভাবকে "বিদ্যুতের চমকিত আলোকে তারা কিছু দূর অগ্রসর হয়, থেমে গেলে দাঁড়িয়ে যায়"—উপমা দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কোনো বিদ্যুতের চমক তথা কুরআনের অন্তর্ভেদী জ্যোতি বিচ্ছুরণের মুকাবিলায় তারা কোন্ কৌশলের আশ্রয় নিবে—তাদের বুদ্ধির নাগাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যে কোনো উপায়ে বিপদ কাটিয়ে উঠা এবং উদ্ধারের পথ খোঁজাই ছিল তাদের মুখ্য বিষয়। কিন্তু বানোয়াট কথার অস্ত্রবলে সত্যের প্রতিরোধ যে স্থায়ী হয় না, একথা তাদের জানা ছিল না। বাস্তবে তাদের এ জালিয়াতী কৌশল যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন দিশেহারা অবস্থায় মাথা নীচু করে ভাবতে থাকে—হায় কি হলো, কি করা দরকার। সুতরাং উপরে বর্ণিত হয়েছে—মুসলমানদেরকে ধোঁকার ফাঁদে আটকানোর উদ্দেশ্যে তারা বলে বেড়াত—আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসে তোমাদের যে দাবী, আমাদের বিশ্বাস কম কিসে ? আমরাও তো আল্লাহ আখেরাতে ঈমান রাখি। কিন্তু যখন যুক্তির বাঁধন কষানো হয়—বেশ, যদি তাই হয়, তাহলে মুসলমানদের ন্যায় খাঁটি ঈমান গ্রহণে তোমাদের বাধা কোথায় ? এহেন গাত্রদাহেরই বা কারণ কি ? উপায়ান্তর না দেখে তখন তারা মুসলমানদেরকে কথার বিষাক্ত বাণে আহত করা গালি-গালাযের চর্চায় মেতে উঠে।

১৭. দুই দলের তুলনামূলক পার্থক্য

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা গেল বর্ণিত উপমা দুটি দ্বারা ইহুদী সম্প্রদায়ের দুটি উপদলের কথা বুঝানো হয়েছে বটে। কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কতটুকু এবং এর ধরন কি ? সে ব্যাখ্যা এখনো বাকী রয়ে গেছে। আমরা ওপরে বলেছি—সাধারণত মনে করা হয় এ দ্বারা কট্টর কাফের ও মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে।

প্রথমোক্ত দলটি নিসন্দেহে ইসলামের পরম শত্রু কট্টর কাফের গোষ্ঠী। কিন্তু সার্বজনীন ধারণা মতে দ্বিতীয় দল মুনাফিকদের এ ধারণা বিশুদ্ধ ও প্রমাণসিদ্ধ বলে আমরা মনে করি না। কারণ মুনাফিকরা অন্তত প্রকাশ্যে ইসলামের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলত এবং নিজেরা মুসলমান বলে দাবী করত। যদিও সে দাবীর অন্তরালে কপটতার মাত্রা ছিল শতকরা একশ ভাগ এবং আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র পরশ ছিল না। তথাপি মৌখিক বুলি আর লোক দেখানো যাহেরী ইসলামের একটা প্রলেপ তো ছিল কিন্তু কুরআনী ভাষ্যে উপরোক্ত দ্বিতীয় দলের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায় এরা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসের বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু নবী করীম (স)-এর প্রতি বিশ্বাস তাদের কাজে কিংবা কথায় কোনোভাবেই প্রমাণ তো মিলেই না। এমনকি

www.pathagar.com

তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মু'মিনদেরকে প্রকাশ্য ভাষায় মূর্খ-নির্বোধ ইত্যাদি বিদ্বেষবাণে আহত করতে আদৌ পিছপা ছিল না। আচার-আচরণে এই যাদের অবস্থা, সাধারণ অর্থে তাদেরকে কপট বিশ্বাসী মুনাফিক দলের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করা সঙ্গত হওয়ার কি কারণ?

আমাদের মতে উভয় দল ইহুদী সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলাম ও কুরআনের নিসন্দেহে শত্রু। কিন্তু তাদের দুশমনী প্রকাশের ধরন ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন আকারের। কেননা ইসলাম বিরোধিতায় প্রথম দলের ভূমিকা ছিল নিরেট অন্ধ গোঁড়ামি প্রসূত। আপন মতের বিপরীত কোনো কথা শোনা কিংবা বুঝার প্রবণতাই তাদের মন-মানসিকতায় বিদ্যমান ছিল না। যে কারণে ইসলাম বিরোধিতায় তাদের ভূমিকা ছিল চরম খাতে প্রবাহিত। আপোস রফার কোনো চিন্তা-চেতনা তাদের দেমাগে ঢুকতো না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলের বিরোধিতা ছিল হিংসার আদলে গঠিত এবং বিদ্বেষের আবরণে আচ্ছন্ন। প্রথম দলের ন্যায় নবীর বিরোধিতা ও কুরআন প্রত্যাখ্যানে এদের মনেও চরমভাবের কমতি ছিল না। তবে তারা মনে করত মুসলমানদের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না জড়িয়ে সুদূরপ্রসারী কৌশলগত নীতি অবলম্বন করাই এখন সময়ের দাবী। ইসলামের এ নবজাগরণ ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের অস্তিত্বের জন্য কত যে ভয়াবহ এবং সত্যের প্রবল তোড়ে এদের ভিত নড়ে ওঠা যে সময়ের ব্যাপার, সে চিন্তা তাদের মনে-প্রাণে কেবল ঝাঁকুনি দিত। তাই এর প্রতিকার প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে তারা তৎপর হয়ে উঠে। দলের পক্ষ থেকে কৌশল নেয়া হলো—নিজেদের পৈত্রিক ধর্মের উপর অটল থাকার পর মুসলমানদের সাথে সাধ্যমত সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা। এ পর্যায়ে দাবী উঠানো—মুসলমানরাও যেন তাদেরকে সমপর্যায়ের দীনদার হিসেবে মেনে নেয় এবং সমমর্যাদায় বরণ করে নিতে তারা যেন কুণ্ঠিত না হয়। কিন্তু আল কুরআন স্পষ্ট ভাষায় তাদের এ অযৌক্তিক দাবী নস্যাৎ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য—দীনে হক এ জাতীয় বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বাজারে উপস্থিত হয়নি। ঈমান গ্রহণে কারো আগ্রহ থাকে তো সরাসরি মুসলমানদের ন্যায় ঈমান আনতে হবে। অন্যথায় সাজা ভোগের প্রস্তুতি নিয়ে যার যে পথে ইচ্ছা রওয়ানা দিক। যার যে মতবাদ ইচ্ছা মেনে চলুক। তাতে আল্লাহর কিছুই যায় আসে না। তবে অনিবার্য পরিণতির জন্য অবশ্যই তাকে তৈরী থাকতে হবে।

প্রথম দলের চরম শত্রুতা ও গোঁড়ামির ন্যায় দ্বিতীয় দলের কৌশলগত চালবাজি আল্লাহর নিকট যদিও একই পর্যায়ের অপ্রিয় অপসন্দনীয়। কিন্তু "গোঁড়ামি ও আক্রোশ বলে কুরআনের মুকাবিলা বাস্তবের ভাষা নয়। বরং এর জন্য চাই সূক্ষ্ম চিন্তা ও দূরদর্শী পরিকল্পনা" মর্মে দ্বিতীয় পক্ষের জাগ্রত ও মার্জিত অনুভূতি প্রমাণ করে—প্রথমোক্তদের ন্যায় সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও মানিসকতা এদের একেবারে হারিয়ে যায়নি। বরং যোগ্যতার একটা খণ্ডিত চিত্র আজো তাদের মধ্যে অবশিষ্ট লক্ষ করা যায়। তবে এটা সত্য—তারাও যদি এর যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা উপকার লাভে এগিয়ে না আসে বরং ন্যায় ও হকের পরিপন্থী ভূমিকায় আগের মতই তৎপর থাকে তাহলে মহান আল্লাহর চিরন্তন

www.pathagar.com

বিধান অনুযায়ী তাদের বাদবাকী যোগ্যতাটুকুও ছিনিয়ে নেয়া হবে। وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাদের কান-চোখ ছিনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সবাইকে অবকাশ দেয়ার লক্ষ্যে তিনি তা আপাতত স্থগিত রাখেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান।)

১৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২১-২৯ আয়াত

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অবতারণার পর আলোচনার আপাত মোড় ঘুরিয়ে বনী ইসমাঈল তথা সাধারণ আরবদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে—নবী করীম (স) ও কুরআনের প্রতি ঈমান গ্রহণ সুবাদে তারা যেন এ অমূল্য নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করে। আলোচনার পটপরিবর্তন করে মাঝপথে এ দাওয়াতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এ কারণে যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাসারা সম্প্রদায় কর্তৃক ইসলামে দুশমনীর মূলে ছিল বনী ইসমাঈলের প্রতি ঐতিহ্যগত বিদ্বেষ প্রবণতা। কেননা আখেরী নবী বনী ইসমাঈল গোত্রে আবির্ভূত হবেন—মর্মে আহলে কিতাবদের আসমানী গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। অবশেষে কুরআনের অবতারণা এবং ইসলামের প্রকাশ দ্বারা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যখন বাস্তবে রূপ নিল আর তার সত্যতা ইহুদীদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল, তখন তাদের মনের ভুবনে এতদিনের লালিত ও সুপ্ত বিদ্বেষ আবরণ মুক্ত হওয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল। তারা সিদ্ধান্ত নিল—যে কোনো উপায়ে হোক ইসলামের এ সার্বজনীন দাওয়াতকে নস্যাৎ করতেই হবে। তদুপরি যুগযুগ ধরে ধর্মীয় নেতৃত্বের যে উচ্চমর্যাদায় তারা অধিষ্ঠিত এবং প্রভুত্বের যে নিরংকুশ অধিকার তাদের অনুকূলে সংরক্ষিত, যে কোনো মূল্যে তার প্রবাহ আরবমুখী হওয়ার কবল থেকে রক্ষা করতেই হবে। সুতরাং উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষে একদিকে আপন ও স্বগোত্রীয় লোকদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে রাখার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। অপরদিকে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সন্দেহ জাল ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেয়। ফলে আরবরা যেন আল্লাহর দেয়া কুরআনী নেয়ামতের পরশ থেকে বঞ্চিতের কাতারে নেমে আসে। উপরন্তু যে নেয়ামতের কল্যাণে অদূর ভবিষ্যতে আরবরা বিশ্ব নেতৃত্ব ও প্রভুত্বের আসনে বরিত হওয়ার যে নিশ্চিত সম্ভাবনা, সেটাও বানচাল হয়ে যায়। এ জাতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলে ইহুদীরা ছিল সিদ্ধ হস্ত এবং উস্তাদ তুল্য। যে কারণে সরল প্রাণের আরবরা তাদের চক্রান্ত জালে আটকা পড়ে নিজেদের অজান্তে ও না বুঝে সময় সময় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে বসত। যা ছিল ভিত্তিহীন—অমূলক ও ইহুদী চক্রের মিথ্যা অভিযোগ। তাই কুরআন এখানে কিছুক্ষণের জন্য আলোচনার ধারা ছিন্ন করে বনী ইসমাঈলের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে ঃ তোমাদের সামনে প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। ওযর-আপত্তির সুযোগ আশা করা বৃথা। কাজেই ঈমান নিয়ে আস। ইহুদী চক্রের ধোঁকায় পড়ে এ মহান অনুগ্রহ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখতে চাইলে কঠিন আযাবের জন্য প্রস্তুত করে নাও। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا
نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا
مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ
يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

www.pathagar.com

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

২১. হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকতে পার। ২২. সে পবিত্র সত্তার ইবাদাত, তোমাদের জন্য ভূমিকে যিনি বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের খাদ্য হিসেবে ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে তোমরা সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। তোমরা তো এসব জান।

২৩. আমার বান্দার প্রতি আমি যা কিছু নাযিল করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আর (এ কাজে) আল্লাহ ছাড়া অন্যসব সাহায্যকারীদেরকেও ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ২৪. আর যদি তোমরা সেটা না পার—অবশ্য কখনো তোমরা পারবে না, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যে জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। ২৫. আর (হে নবী!) যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে আপনি এমন জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। খাবার হিসাবে যখনই তারা তার কোনো ফলপ্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলে উঠবে, এটা তো হুবহু সে একই ফল যা ইতিপূর্বেও আমরা লাভ করেছিলাম। কার্যত তাদেরকে অভিন্ন জাতের ফলই প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্য তৈরী থাকবে পূতপবিত্রা রমণীকুল। সেখানে তারা অবস্থান করবে অনন্তকাল।

২৬. আল্লাহ তাআলা মশা বা তৎক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা দৃষ্টান্ত পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। যারা ঈমানদার তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, তাদের রবের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল সঠিক। কিন্তু যারা কাফের তারা বলে—এ জাতীয় উপমা উপস্থিত করা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? বস্তুত এ দ্বারা আল্লাহ বহু লোককে বিপদগামী করেন, অনেককে আবার সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তবে অনুরূপ উপমা দ্বারা ফাসেক লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে তিনি বিপথগামী করেন না। ২৭. বস্তুত

www.pathagar.com

বিপথগামী তারাই যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে আর আল্লাহ যা অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, তদুপরি পৃথিবী জুড়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। এরাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. কেমন করে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী অবলম্বন করতে পার ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত-প্রাণহীন। অতপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণময় করেছেন। পুনরায় তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন। অতপর তাঁরই প্রতি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ২৯. তিনিই সে (মহান) সত্তা যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি আকাশের প্রতি মনোসংযোগ করেছেন আর সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত আল্লাহর তো সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৯. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ক আলোচনা

আয়াত ঃ ২১

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

يَآيُّهَا النَّاسُ ঃ দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত يَآيُّهَا النَّاسُ দ্বারা সাধারণত ব্যাপকার্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে বিশেষ অর্থে আরবের মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। কেননা পরবর্তী আয়াতসমূহের বিষয় বক্তব্য, প্রমাণ উপস্থাপনার ধরন, সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের নিকট কৃত দাবী ইত্যাদির প্রতিটি বিষয় সাক্ষ্য দেয় যে, আরবের মুশরিকরাই এখানে সম্বোধনের মূল পাত্র। পূর্ব থেকে আলোচনা চলে আসছে ইহুদীদের সম্পর্কে। পূর্বধারা ছিন্ন করে মাঝ পথে মুশরিকদের আলোচনা শুরু করা মূলত প্রসঙ্গান্তরের ব্যাপার। যা অপ্রচলিত কিংবা অলংকার বর্জিত প্রয়োগ বলা যায় না।

اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ঃ ইবাদাত শব্দের ব্যাখ্যা সূরা ফাতেহার আলোচনায় করা হয়েছে। اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ দ্বারা মুশরিকদের শুধু ইবাদাতের দাওয়াত দেয়া হয়নি। কারণ ইবাদাত তারা আগে পরে করে আসছে। কিন্তু সেটা যেহেতু আল্লাহর মনোনীত তরীকা অনুযায়ী ছিল না আর নবীর তরীকাই হল আল্লাহর পসন্দনীয়। সুতরাং উক্ত আয়াতে তাদের প্রতি নির্দেশ মনগড়া কিংবা অন্য কোনো নিয়মে নয়, তোমাদের ইবাদাত বরং নবীর তরীকা এবং একমাত্র নবীর তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে। দ্বিতীয় কোনো নিয়মে সম্পাদিত ইবাদাত আমার দরবারে গ্রহণীয় ও কবুলযোগ্য বিবেচিত হবে না। কালামের মূল দর্শন এরি অন্তরালে নিহিত। وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আয়াত সে দর্শনের সাথেই সম্পৃক্ত বলা যায়। কেননা এতে বলা হয়েছে—আমার পাঠানো রাসূল যে নিয়মে যে ইবাদাত সম্পাদনের নমুনা প্রদর্শন করেন, তোমাদের কর্তব্য একমাত্র সে নিয়মানুযায়ী

www.pathagar.com

ইবাদাত-বন্দেগী আমলে আনা। তোমাদের মনে যদি সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে যে, এটি আল্লাহর প্রেরিত কিতাব নয়; মনগড়া-বানোয়াট কিংবা মানব রচিত কোনো গ্রন্থ, তাহলে এর অনুরূপ অন্তত একটি সূরা বানিয়ে আন দেখি—পার কি না ? অধিকন্তু আয়াতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অপর ইঙ্গিত হলো—তোমাদের মুখে যে ইবাদাতের দাবী উচ্চারিত হয়, সেটা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ইবাদাত নয়। আল্লাহর পসন্দনীয় ও কবুলযোগ্য ইবাদত একমাত্র সেটাই এ কিতাব যার দাওয়াত দেয় এবং আহবান জানায়।

خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ঃ خَلَقَكُمْ এর সাথে وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ যুক্ত করার কারণ আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তারূপে বিশ্বাস করত বটে, তবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ কাউকে খোদায়ী গুণে আল্লাহর শরীকদার সাব্যস্ত করে তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের মূর্তি বানিয়ে তার সামনে নতশিরে পূজা অর্চনায় লেগে যেত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সে মিথ্যা আকীদা বাতিল করে জানিয়ে দেয়া শরীকানা মাবূদ তো দূরের কথা অন্যান্যদের ন্যায় নিজেরাই তারা মাখলুক বা সৃষ্টজাত। এ দ্বারা স্পষ্টত বুঝানো হয়েছে—আল্লাহর ইবাদাত করতে চাও তো সর্বাগ্রে নিজেকে মাখলূকের পর্যায়ে শামিল কর। একইভাবে তোমাদের মনগড়া সকল মাবুদকে খালেকের আসন থেকে নামিয়ে মাখলুকের কাতারে শামিল করতে হবে। এমনিভাবে নিজেদের প্রথমে ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ কর। অতপর নবী করীম (স)-এর তরীকা অবলম্বনে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করার পরই কেবল বিবেচনার পর্যায়ে আসতে পারে আল্লাহর দরবারে তোমাদের ঈমান-আমল কবুল হওয়ার যোগ্য কি না।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ঃ لَعَلَّكُمْ একাধিক অর্থে প্রচলিত একটি আরবী অব্যয়। তন্মধ্যে সম্ভব, হয়তো, আশানুরূপ সুফল বা কুফল ইত্যাদি অর্থে অধিক প্রচলিত। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এখানে উপরোক্ত অর্থে এর সঙ্গত ও অর্থবহ প্রয়োগ বলে আমরা মনে করি।

تَتَّقُوْنَ ক্রিয়াপদের এখানে দুই অর্থ হতে পারে। (ক) তোমরা তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন কর। (খ) আল্লাহর আযাব-গযব থেকে বেঁচে থাক। এখানে উভয় অর্থ বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছি। এমতাবস্থায় এর 'কর্ম' পদ (مَفْعُوْل) প্রচ্ছন্ন ধরে নিতে হবে। পরবর্তী আয়াতে সেটি স্পষ্ট করা হয়েছে। যথা ঃ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ - البقرة : ٢٤ (অর্থাৎ সে আগুন থেকে তোমরা বেঁচে থাক, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪)

আয়াত ঃ ২২

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ঃ আয়াতে বর্ণিত اَنْدَادًا শব্দটি এর বহুবচন। যার অর্থ—সমকক্ষ, সমতুল্য, সমপর্যায়, অভিন্ন স্তর ও সমমর্যাদা বিশিষ্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৌলিক অর্থে আল্লাহর যে সকল গুণাবলী যাহেরীভাবে তাওহীদ প্রমাণ করে সমকালীন আরবরা সে সবে বিশ্বাসী ছিল। তা সত্ত্বেও লা-শরীক আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা তাদের প্রথাগত বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। কাজেই বলা হয়েছে—তোমরা যখন নিজেরাই জান যে, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তাঁরই সৃষ্ট বান্দা, তোমাদের জন্য যমীনকে তিনি বিছানা, উর্ধ মণ্ডলীয় আকাশকে শামিয়ানা বানিয়েছেন। আসমান থেকে বারি বর্ষণ তাঁরই অবদান। তোমাদের খাদ্য হিসেবে নানাজাতের ফল-ফলারি তিনিই উৎপন্ন করেছেন। তাহলে এমন বিষয়বস্তুকে তোমাদের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার হেতু কি ? যাদের দ্বারা এসবের কোনো একটি কাজও সম্পন্ন হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এখানে জানার অর্থ মানা ও স্বীকার করা।

আয়াত ঃ ২৩

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

শহীদের অর্থ

وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ ঃ জাতীয় নেতা, মুখপাত্র ও প্রতিনিধিকে ‘শহীদ’ (شَهِيْدٌ) বলা হয়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জাতির পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধিত্ব ও মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করে এবং ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ হতে কথা বলে। সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এ সাহায্যকারী মানুষ হতে পারে। আবার আরবদের ধারণা মতে জিনদের মধ্য থেকেও হতে পারে। জাহেলী আরব সমাজে কবি-সাহিত্যিক, বক্তা-বাগ্মীরা বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার প্রচলন ছিল। কারণ একটাই, জাতীয় দুর্দিনে কিংবা কওমী সংকটকালে মান-ঐতিহ্য রক্ষায় তারা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে যেত। আরবের পৌত্তলিকদের বিশ্বাস ছিল—প্রত্যেক কবির সাথে সাহায্যকারী একটি জিন অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকে, যে কবির স্মৃতিপটে প্রয়োজনীয় ছন্দ ও ভাবের জোগান দেয়। কাজেই স্বাভাবিক অর্থেই তাদের প্রচলিত ধারণা ছিল ‘কুরআন আল্লাহর কিতাব’ এ দাবী মৌখিক বুলি মাত্র। আসলে এটি অদৃশ্য জিনের জোগান দেয়া কেরামতী। তাদের এ ভিত্তিহীন ধারণার প্রেক্ষাপটে তাদের কাছে দাবী করা হয়েছে বেশ, কুরআনকে যদি তোমরা মানব রচিত গ্রন্থ মনে করে থাক, তাহলে তোমাদের পৈত্রিক ধর্ম এবং তৎসহ উর্ধতনদের খোদাগিরীর এই মহাদুর্যোগে সে সকল অদৃশ্য মদদগারদের সাহায্য নিয়ে সম্পূর্ণ কুরআন না হোক অন্তত এর অনুরূপ একটি সূরাই না হয় বানিয়ে নিয়ে এসো দেখি। তোমাদের কল্পিত মদদগারেরা এহেন মহাসংকটেও যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে বুঝে নাও কুরআন

www.pathagar.com

নিসন্দেহে আল্লাহর কালাম। আর তোমাদের এ সমস্ত দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা অসার-ভিত্তিহীন কল্পিত ফানুস মাত্র। কুরআনের অন্যত্র এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই। যথা ঃ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا - بنى اسرائيل : ٨٨ "বলুন, যদি মানব ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার উদ্দেশ্যে জড়ো হয় আর তারা পরস্পর সাহায্যকারী হয়, তা সত্ত্বেও তারা এর অনুরূপ রচনা করে আনতে সক্ষম হবে না।"-বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮। অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট ভাষায় ঃ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ - هود : ١٣-١٤ "যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও। অতপর তারা যদি তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে জেনে রাখ, এটি আল্লাহর এলেম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে।"-সূরা হূদ, ১৩-১৪

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ঃ **(যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।)** ঃ এর দুই অর্থ হতে পারে ঃ (ক) কুরআন সম্পর্কে তোমরা যে ধারণা পোষণ কর, তাতে যদি সত্যবাদী হও। (খ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী আছে মর্মে ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। বাস্তবে এমন কেউ থাকে যদি, তাহলে সাহায্যের জন্য তাকে ডেকে নাও। তোমাদের সাহায্যের জন্য এর চেয়ে বড় সুযোগ আর অধিক প্রয়োজন আর কি হতে পারে।

আমার মতে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ এর পরিধি ব্যাপক এবং প্রথম অর্থও এর মধ্যে এসে যায়।

আয়াত ঃ ২৪

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

মূর্তি প্রতিমার শাস্তি হওয়ার কারণ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ঃ এ দ্বারা আসলে আগুনের প্রকৃতি বুঝানো উদ্দেশ্য। কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে যার ভয় দেখানো হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায়—কুফর ও শিরকের উপাদানে দুষ্ট ব্যক্তিরাই সে আগুনের প্রথম পর্যারে পসন্দনীয় জ্বালানী। তাদের দেহের মাধ্যমেই সে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে আপন মূর্তি ধারণ করবে। এরপর মাবুদ হিসেবে দুনিয়াতে পূজিত হয়েছে, এখনো হয় এবং পরবর্তীকালে হবে সে সমস্ত পাথর হবে সে আগুনের দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্বালানী। কারণ নিষিদ্ধ পূজার দরুন সে পাথরের মধ্যে অনলধর্মী উপাদান সৃষ্টি হয়ে জাহান্নামের আগুনের সাথে একটা সহজাতিক ধারা সূচিত হয়। সমজাতীয় সে ধারার আকর্ষণে পূজিত পাথরের দেহ জড়িয়ে জাহান্নামের আগুন তার লেলিহান মূর্তি ধারণ করতে প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠে। এবং জ্বলে জ্বলে

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ ঘটায়। আলোচ্য আয়াতে 'আল হিজারাহ' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে উপরোক্ত তত্ত্ব কথাটাই বুঝানো হয়েছে।

اَلْحِجَارَةُ শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। বিশ্বের সমগ্র পাথর এর আওতায় এসে যায়। কিন্তু কালামের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট বিবেচনার আলোকে স্পষ্টত বুঝা যায়—এখানে নির্দিষ্ট পাথরই বুঝানো হয়েছে। খুদাই করে যেগুলোকে দেব-দেবীর আকার মূর্তিমান করা হয়েছে। অতপর খোদার আসনে বসিয়ে ভক্তরা যাদের সামনে আত্মনিবেদন করে আর অনুরাগ তাড়িত মনে সবিনয়ে লুটিয়ে পড়ে। এ সমস্ত পাথর খণ্ড জাহান্নামে নিক্ষেপ করার অর্থ এদেরকে শাস্তি নয়। বরং এদের অনুরক্ত পূজারীদের আযাবের মাত্রা যোগ করা যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুধ-কলা আর ফুল চন্দনের প্রসাদ সাজিয়ে যে মিথ্যা বানোয়াট খোদার সামনে তোমরা সকাল-সন্ধ্যা নমঃ দিতে তাদের পরিণাম দেখে নাও। বলাবাহুল্য প্রতীকের অবমাননা আসল জিনিসের অপমানতুল্য। কুফরীর বেলায়ও কথাটা সমার্থবোধক যে তার আলামতের অপমান আসলে কুফরীর তুচ্ছতাই প্রকাশ করে। যথা আল কুরআনের ভাষায় ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ   لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّاوَرَدُوْهَا ط وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ـ الانبياء : ٩٨ـ٩٩

"তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেসবই জাহান্নামের জ্বালানী হবে। তোমাদের সবাইকে তাতে প্রবেশ করতে হবে। এ মূর্তি-প্রতিমারা যদি মাবূদ হত, তবে এরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানে চিরস্থায়ী অবস্থায় পড়ে থাকবে।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৮-৯৯

আয়াত ঃ ২৫

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

জান্নাত প্রসঙ্গে আলোচনা

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ঃ উচ্চ ভূমিতে অবস্থান আর পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণা—এ দুটি গুণ উদ্যানের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। উচ্চতর অবস্থান একদিকে তার দৃশ্যকে নয়নাভিরাম করে তোলে। অপরদিকে বান-বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে। আর তলদেশে প্রবাহিত ঝর্ণা প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করে বাগ-বাগিচাকে সবুজ-শ্যামল ভরা দৃষ্টিনন্দন কাননে রূপান্তরিত করে। উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত নয়নসুখ উদ্যানের উপমা অত্র সূরার ২৬৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ كَمَثَلِ جَنَّةٍ

www.pathagar.com

تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ অংশ দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায় জান্নাতী বাগান হবে উচ্চ ভূমির উপরে। بِرَبْوَةٍ অর্থাৎ উচ্চ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত ....। আলোচ্য আয়াতের

قَوْلٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ

قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ঃ আয়াতে বর্ণিত قَالُوْا ক্রিয়া পদের ধাতু قَوْلٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—(ক) শ্রবণযোগ্য (খ) গোপনে। যেমন—سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ - الرعد : ١٠ "তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক অথবা সশব্দে প্রকাশ করুক তাঁর কাছে সবই সমান।"–সূরা রাদ ঃ ১০

(গ) শুধু ইঙ্গিত বুঝাবার জন্যও এ শব্দ প্রয়োগ হয়। যথা ঃ فَقُوْلِىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ـ مريم : ٢٦ "তুমি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিও—আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি রোযা মানত করেছি। তাই কোনো মানুষের সাথে আজ আমি কিছুতেই কথা বলব না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ২৬

(ঘ) অবস্থা জ্ঞাপক ইঙ্গিতও قَوْلٌ এর একটি প্রকার। (ঙ) একইভাবে মানুষ মনে মনে যে কথা আওড়ায় তাকেও قَوْلٌ বলা হয়। আরবী ভাষা ও কুরআন কারীম এ জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সূরা মায়েদায় মুনাফিকদের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। যথাঃ

يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ـ المائدة : ٥٢

"তারা বলে ঃ আমরা আশংকা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অথচ সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন আল্লাহ বিজয় দান করলেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো হুকুম দেবেন—যার ফলে নিজেদের গোপন মনোভাবের দরুন তারা অনুতপ্ত হবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫২

এ আয়াতে মুনাফিকরদের মনের কল্পনাকে قَوْلٌ (কথা) আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরে স্পষ্ট করা হয়েছে—এটি তাদের অন্তরের গোপন কথা। একইভাবে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত قَالُوْا ক্রিয়াপদের অর্থ—সেদিন মু'মিনরা মনে মনে ধারণা করবে। ইহ জীবনে কুরআন ও পয়গম্বর আলাইহিমুসাল্লাম সুসংবাদের মাধ্যমে আমাদেরকে যে নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলেন, উক্ত নেয়ামতই আজ আমাদের সামনে স্বরূপে এবং আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত। এ কল্পনার ফলে তাদের মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস, সাফল্যের অনাবিল অনুভূতি এবং কৃতজ্ঞতার প্লাবন সৃষ্টি হবে। তাদের মনে তখন আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যাবে। তারা খুশীর জোয়ারে ভেসে বেড়াবে আর বলতে থাকবে ঃ আলহামদুলিল্লাহ—সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর। তাঁর যে সমস্ত ওয়াদার উপর ভিত্তি করে আমরা জীবন কাটিয়েছি, প্রাণ কুরবান করেছি, সে সবই আজ সত্যে প্রমাণিত। সেদিন

www.pathagar.com

তাদের স্মৃতিপটে জীবন্ত ছবির আকারে ধরা দিবে—জান্নাতের যে সকল নেয়ামতের বন্যায় আজকে আমরা ভেসে বেড়াই—কুরআনী উপমার কল্যাণে পার্থিব জীবনে আমরা তার কাল্পনিক স্বাদ উপভোগ করে তবেই আমরা পরকালের পথে রওয়ানা দিয়েছি।

রিযিক দুই প্রকার

এ অংশে বর্ণিত রিযিক শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। আরবী বাগধারা ও কুরআনের ভাষ্যে বস্তুগত ও রূহানী উভয় অর্থে রিযিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। শুধু খাওয়া পরার বস্তু সামগ্রীকে রিযিক সাব্যস্ত করা সঙ্গত হতে পারে না। বরং কুরআন এবং নবী করীম (স) সূত্রে যে এলেম ও তত্ত্বজ্ঞান হাসিল হয়, সেটাই হলো আসল রিযিক। যে কারণে ওহীর জ্ঞানকে কুরআন 'রিযিক' নামে অভিহিত করেছে। হযরত ঈসা (আ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে—তিনি বলেছেন ঃ মানুষ কেবল খাদ্য সামগ্রীর জোরেই বেঁচে থাকে না, সে বরং বেঁচে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কালেমার শক্তি বলে।

مِنْ قَبْلُ ঃ আলেমগণ 'ইতিপূর্বে' (مِنْ قَبْلُ) কথাটার দু ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন এর অর্থ দুনিয়াতে। অর্থাৎ দুনিয়াতেও আমরা এ জাতীয় ফল ভোগ করেছি। কারো মতে এর অর্থ—এ জাতীয় ফল তো ইতিপূর্বে আমরা এ জান্নাতেও ভোগ করেছি। উস্তাদ মাওলানা হামীদুদ্দীন ফরাহী অবশ্য দুই মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তবে আমার মতে এখানে প্রথম পক্ষের মত তথা 'দুনিয়া' অর্থ নেয়াই যুক্তিসঙ্গত। এর কারণ পরবর্তীতে আমি যথাস্থানে ব্যক্ত করবো।

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ শব্দের অর্থ

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ঃ 'আযওয়াজুন' (ازواج) 'যাওজুন' (زوج)-এর বহু বচন। যার অর্থ জোড়া বা যুগল। পুরুষের জন্য নারী, নারীর জন্য পুরুষ হলো জোড়া। সৃষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতিতে একটা শূন্যতা রাখা হয়েছে। অনুকূল সমজাতীয় জোড়া ছাড়া যা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। যে কারণে মানুষ যত নেয়ামত, ভোগের যত উপকরণ—আনন্দ উল্লাসের যত সামগ্রী তার সামনে উপস্থিত থাকুক সমজাতীয় জোড়া তথা পুরুষের জন্য নারী আর নারীর জন্য পুরুষ জোড়া ছাড়া সবই অর্থহীন। সুতরাং জান্নাতের আলোচনায় অফুরন্ত ভোগ সামগ্রী আর যত নেয়ামতের বর্ণনা পাওয়া যায়—তার মধ্যে নারী অন্যতম। যার অবর্তমানে সুখের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না। এর সাথে مُطَهَّرَةٌ (পূত পবিত্রা) গুণবাচক শব্দের উল্লেখ সযত্নে লালন এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রতিপালনের অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ এখানে হুর বালাদেরকে জান্নাতী পুরুষদের উপযোগী মানে পবিত্র করা হয়েছে। যাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, আদব লেহায এবং অঙ্গ সৌষ্ঠবে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা অপূর্ণতার ছোঁয়া কল্পনার অতীত। مُطَهَّرَةٌ শব্দের ভিতর উপরোক্ত মর্ম নিহিত রয়েছে। কোনো বিশেষ প্রক্রিয়া ও সযত্ন প্রয়াসে কোনো কিছু পূত-পবিত্র ও অনাবিল আঙ্গিকে স্বচ্ছ-পবিত্রকরণ করাকে 'তাতহীর' (تَطْهِيرٌ) বলা হয়। সূরা আহযাবে

www.pathagar.com

'আহলে বাইত' তথা নবী পরিবারকে প্রয়োজনীয় আচার-ব্যবহার, আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়ার পর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○ - احزاب : ٣٣

"হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল তোমাদের থেকে কলুষতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে চান।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩

আয়াত ঃ ২৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ج وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا م يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا لا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○

তামছীল (تَمْثِيل)-এর মূল্যায়ন

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ঃ উপমার মাধ্যমে কোনো বিষয়-বক্তব্য ও ঘটনা বুঝিয়ে দেয়াকে 'আরবী ভাষায় 'তামছীল' বলা হয়। উচ্চতর তত্ত্বকথা ও রূহানী সূক্ষ্ম বিষয়াদি তামছীল তথা উপমার পোশাকে উপস্থিত করা ছাড়া সাধারণ জ্ঞানের আওতায় ধরা পড়ে না। যে কারণে সূক্ষ্মতর রূহানী তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে তামছীলের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং নবী-রাসূল, জ্ঞানী গুণী, পণ্ডিত-প্রাজ্ঞজনদের বাণী-বাক্যে এর বহুল প্রচলন লক্ষ করা যায়। তাওরাত-ইঞ্জিল, হাদীস-কুরআনে তামছীলের ব্যবহার প্রচুর। হযরত ঈসা (আ)-এর কালাম এবং নবী করীম (স)-এর হাদীসেও বহুল পরিমাণে তামছীল ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতের মর্ম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ নীতিকথা হোক—চাই বিধি-বিধান অথবা অতীতের ইতিকথা কিংবা বর্তমানের ঘটনা প্রবাহ—দৃষ্টান্তের ব্যবহার সর্বত্র এবং ব্যাপক আকারে পাওয়া যায়। আর কুরআন কারীমের অলংকার সমৃদ্ধ উপমা-উৎপ্রেক্ষা তো সর্বজন বিদিত। বলা দরকার—বাক্যাংশের পরস্পর সম্পর্ক, শব্দের গাঁথুনি, রচনাশৈলী ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের—কি নিম্নমানের উপমায় এ সমস্ত গৌণ বিষয়, আলংকারিক নযরে দেখা হয় না। ঘটনার সাথে উপমাটা মিল খেল কিনা, শ্রোতার সামনে এর উপস্থাপনা সুন্দর-সাবলীল হলো কিনা সেটাই এখানে বড় কথা। যে ভাষা আর যে ভঙ্গিতে ঘটনার চিত্র ভাসিয়ে তোলা যায় সেটাই উপমার প্রতিপাদ্য ও সারকথা। চাই সেটা মশা হোক, মাছি হোক অথবা মাকড়সা জাতীয় ক্ষুদ্রবস্তু হোক, তাতে উপমার মান ক্ষুণ্ন হয় না। যেমন কুরআনের কথাই ধরুন—মুশরিকদের উপাস্য দেব-দেবীর অসহায় অবস্থার চিত্র উপমার সাহায্যে কি চমৎকার ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে—এদের উপাস্য দেবতারা এতই দুর্বল, এমনি শক্তির কাঙ্গাল যে, একটা মাছিও

www.pathagar.com

যদি এদের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তাহলে মাছির হাত থেকে সেটি ছাড়িয়ে রাখার ক্ষমতাটুকুও এরা ধারণ করে না। অনুরূপ আল্লাহর শরীক—সুপরিশকারী আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো। মাকড়সার জালের উপমা দ্বারা তাদের সে ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইহুদীরা দীনের মূলনীতি উপেক্ষা করে খুঁটিনাটি চর্চায় মত্ত ছিল। হযরত ঈসা (আ) তাদের সে চর্চাকে মশার খাদ্য ঘাঁটা আর উটের গলধঃকরণের সাথে তুলনা করেছেন।

যাহোক এ সমস্ত উপমা আর তুলনার সাহায্যে মূলবিষয়টিকে বাস্তবদর্শনে এমনভাবে ভাসিয়ে তোলা হয়েছে—যার ফলে একজন সাধারণ লোক সহজেই বুঝে নিতে পারে, বক্তা কি বলতে চায়, কথার উদ্দেশ্য কি ? যে কারণে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে উপমার যথার্থ মূল্যায়নে আদৌ দ্বিধা করতেন না। কিন্তু যারা জ্ঞানপাপী ; তত্ত্ব জ্ঞানের দুশমন এবং নফসের গোলামীতে অভ্যস্ত, এ সমস্ত উপমার নামে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। কেননা বাস্তবধর্মী এ সমস্ত দৃষ্টান্তের আঘাতে তাদের দুষ্ট মনের কালো পর্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং শয়তানী খায়েশের লাগাম টেনে ধরে। তাই তাদের মনে বড় জ্বালা—হায়রে কাটা ঘায়ে কেন এ উপমার ছিটা। আর উপমিত সত্যগুলোও এতই স্পষ্ট যে, কথা বলে বাস্তবের ভাষায়। যার বিরুদ্ধে বলতে যাওয়া আর সুর্যের গায়ে থুথু নিক্ষেপ করা একই কথা। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় তারা কূট-কৌশলের আশ্রয় খোঁজে। বাস্তব সত্যের বিরোধিতা পরিহার করে তারা উপমার কোনো একটি অংশের সমালোচনায় বাক্যবাণ ছুঁড়তে থাকে। যথা—উপমায় উল্লেখিত মশা-মাছির কথা শুনে বলতে থাকে—কি রকম বাজে কথা, এটাকি কোনো উপমা হলো ? মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ প্রাণীর তুলনা টানা আল্লাহর কালামের জন্য কি মানায় ? উপমা দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট এদের চেয়ে বড়-মানানসই অন্য কিছু কি ছিল না ? ইত্যাদি রকম রকমের প্যাঁচাল। এমনিভাবে নিজের অন্তরচোখে ধূলো দিতে যেমন সচেষ্ট, পরের চোখ ঝাপসা করতেও এরা বেজায় তৎপর।

ফিস্‌কের অর্থ

وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلاَّ الْفٰسِقِيْنَ ঃ ফিস্‌ক (فِسْقٌ) শব্দের মূল অর্থ বের হয়ে যাওয়া। এখান থেকেই সৎকর্ম থেকে অসৎকর্মে এবং আনুগত্য ছেড়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া অর্থে এর ব্যবহার দেখা যায়। ইবলীস সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ - كهف : ٥٠ অর্থাৎ "সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার হুকুম অমান্য করল।"–সূরা কাহাফ ঃ ৫০

সৎকর্ম ছেড়ে অসৎকর্মে লিপ্ত হওয়া এবং আনুগত্য বাদ দিয়ে অবাধ্যতায় ধাবিত হওয়া বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট হতে পারে। যেমন অস্বীকারকারী ছোট বড়, গুরু-লঘু উভয় প্রকার হয়ে থাকে। তদ্রূপ নাফরমানী হালকা ধরনের হওয়া যেমন স্বাভাবিক আবার একই অবাধ্যতা বিদ্রোহীর পর্যায়েও গড়াতে পারে। সুতরাং 'ফিসক' শব্দটি কুরআন কারীমে সাধারণ অবাধ্যতা এবং কুফরীর ন্যায় বিদ্রোহধর্মী অবাধ্যতা অর্থেও ব্যবহার

www.pathagar.com

হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমানহীন অস্বীকৃতি তথা কুফরীর ন্যায় গুরুতর অবাধ্যতা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যে কারণে কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের আলেম-ফকীহ ও মুতাকাল্লিমগণের অনুরূপ সর্বক্ষেত্রে ফিস্‌ক শব্দটিকে লঘু অর্থে গ্রহণ করা আমি সমীচীন মনে করি না।

আয়াত ঃ ২৭

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার গুরুত্ব

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ ঃ (আল্লাহ যা কায়েম রাখার হুকুম দিয়েছেন, তারা সে বাঁধন ছিন্ন করে।) আয়াতে যদিও স্পষ্টত উল্লেখ নেই তারা কার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, যা অটুট রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে পূর্বাপর সম্পর্ক এবং নবী করীম (স) বর্ণিত হাদীসের আলোকে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এমনকি প্রমাণসিদ্ধ আকীদায় ভর করে আমরা বলতে পারি, এখানে আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করার কথাই বলা হয়েছে। যা বজায় রাখতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সকল নাফরমানদের প্রকৃতি হলো—আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গের পর আরেক পা অগ্রসর হয়ে এরা আত্মীয়তার সৃষ্টিগত বাঁধন ছিন্ন করতে উদ্যত হয়। এ ছেদন ক্রিয়া তারা সম্পন্ন করে বিভিন্ন পর্যায়ে। আত্মীয়-স্বজনকে হয় অবহেলা করে, আচার-অনুষ্ঠানে তাদের যথাযথ মূল্য না দিয়ে উপেক্ষা করে যায়। অথবা তাদের পাওনা হক আত্মসাৎ করে। কিংবা অন্যায় আচরণ দ্বারা নিকট আত্মীয়কে দূরে ঠেলে দেয়। আবার দূরের আত্মীয়কে কাছে টানার আগ্রহ দেখায় না। মোটকথা কি আচার-আচরণ, কি পাওনা হক আদায়—সর্বক্ষেত্রে অনীহা-অবহেলা এমনকি বিষয় সম্পত্তি অন্যায়—আত্মসাতের মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট করে দেয়। বলা বাহুল্য ইসলাম ব্যক্তিগত ও জাতীয় কল্যাণ, তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি সভ্যতার বুনিয়াদ একমাত্র আল্লাহর ভয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে নিহিত রেখেছে। কাজেই এ দুটি বিষয়ের যে কোনো ধরনের অবহেলা-অবমূল্যায়ন, আত্মকেন্দ্রিক যে কোনো পদক্ষেপ কুরআনের ভাষায় وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ তথা সমাজ পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে 'ফাসাদ ফিল আরদ' আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও বিষয় দুটিকে পরস্পর অনিবার্যতার আঙ্গিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ○- محمد : ٢٢ "সুতরাং বিমুখ

অবস্থায় ফিরে গেলে সম্ভবত পৃথিবীর বুকে তোমরা অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দিবে।"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২

এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক এ অনিবার্যতার কারণে হযরত কাতাদা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অর্থে আলোচ্য আয়াতের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনে জারীর, তাবারীও এমতের প্রাধান্য ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ ব্যাপক অর্থে এর প্রয়োগ সাব্যস্ত করে বলেছেন—আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন সেটা ছিন্ন করাই আয়াতের উদ্দেশ্য। সম্পর্ক চাই আত্মপ্রসূত হোক চাই অন্য যে কোনো ধরনের। সবই আয়াতের মর্মভুক্ত। যাহেরী দৃষ্টিকোণ থেকে শাব্দিক বিবেচনায় এ মত ভিত্তিহীন কিংবা অমূলক বলা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন তো এখানে কেবল বাহ্যিক অর্থ অর শব্দ মূল্যায়নে আবর্তন করে না। শব্দের সাথে বরং আয়াতের মর্ম-ভাবও বর্ণনাভঙ্গির দিকটাও খতিয়ে দেখতে হয়। অন্যথায় কুরআনী বক্তব্যের মূল দর্শন, মর্মগত ভাবের আবেদন, গভীরতায় তলিয়ে যাওয়া তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ইত্যাদির নাগাল পাওয়া আদৌ কল্পনা করা যায় না। তাই কুরআন যেখানেই এ জাতীয় বর্ণনাভঙ্গির আশ্রয়ে বক্তব্য রেখেছে, স্থান-কাল মওকা-মহল দৃষ্টে স্পষ্টত প্রমাণ হয় সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার কথাই বুঝানো হয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গিতে অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতার যে ছাপ পরিলক্ষিত হয়, এদ্বারা আত্মবন্ধনের গুরুত্ব শতগুণে বেড়ে যায়। কারণ আত্মবাঁধন বিষয়টি এতই স্পষ্ট-পরিচিত ও সর্বজন প্রজ্জ্বলিত যে, বুঝিয়ে বলা কিংবা ইশারায় দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে ন্য এটি যে কি জিনিস। আল্লাহ যাকে ছিন্ন করতে নয়, বরং সর্বগুণে বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। তদুপরি সমাজ-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-তামাদ্দুনের কল্যাণ বিবেচনায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ-সমাজ জীবনের মূলে কুঠারাঘাতের নামান্তর।

আয়াত ঃ ২৮

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

বিশেষ দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় কুফরীর মর্মকথা

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে কুফর শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতি আলোকপাত করাই এখানকার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বটে, তবে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে বহু খোদায় বিশ্বাস করে, আয়াতে এমন লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আর কিয়ামত সম্পর্কে হয় তারা অবিশ্বাসী ছিল, অথবা সরাসরি অস্বীকার না করলেও বিবেক বিরোধী কিংবা কল্পনার অতীত বলে ধারণা করতো। এ জাতীয় লোকদের সম্বোধন করে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এই হলেন আল্লাহ। এহেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে তোমরা অস্বীকার কিরূপে করতে পার ? এ দ্বারা বুঝা গেল কুরআনে 'কুফর' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ

www.pathagar.com

হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করা যেরূপ কুফর, একইভাবে তাঁর ওয়াহ্‌দানিয়াত, কুদরত, ইলম ইত্যাদি মৌলিক সিফাতে শরীক সাব্যস্ত করাও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত ঃ ২৯

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

اِسْتَوٰى - تَسْوِيَةٌ - سَمَاءٌ -এর অর্থ

اِسْتَوٰى ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ শব্দসমূহের শাব্দিক অর্থ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এর পর اِلٰى যুক্ত হলে অর্থ হবে—মনোযোগ দেয়া, মনোনিবেশ করা। অথবা এর সমজাতীয় কোনো অর্থ প্রকাশ করবে। এখানে আসলে যমীন সৃষ্টির পর আল্লাহ আকাশমণ্ডলী তৈরি করেছেন, এটুকু প্রকাশ করাই মূল উদ্দেশ্য। এ বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। নতুবা 'দাঁড়ানো' 'মনোযোগ দেয়া' ইত্যাদি ক্রিয়া-কর্ম কেবল সৃষ্টের সাথে যুক্ত হতে পারে। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা তাঁর শানে ইলাহীর বিপরীত কথা। এখানে বান্দার সাথে তুলনা পরিহার করে বরং "আল্লাহ তাঁর শান অনুযায়ী আপন ইচ্ছা কার্যকর করেছেন" অর্থ নেয়াই সঙ্গত।

تَسْوِيَةٌ কোনো কিছু সমান করা, বরাবর কায়েম করা, সামঞ্জস্য বিধান করা— ইত্যাদি অর্থে تَسْوِيَةٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। সে মতে এ আকাশমণ্ডলী এমনি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে, খালি চোখে হোক চাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে তাকানো হোক—ত্রুটি-বিচ্যুতির নামগন্ধও তাতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যথা—কুরআনের ভাষায় ঃ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○ - الملك : ٣-٤

"দয়াময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোনো ব্যবধান আপনি দেখতে পাবেন না। পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিন ; কোনো ফাঁটল দেখতে পান কি ? অতপর আপনি বার বার তাকিয়ে দেখুন, আপনার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে আপনার প্রতি ফিরে আসবে। (কিন্তু কোনো ত্রুটি আপনি দেখতে পাবেন না)।"–সূরা মুল্‌ক ঃ ৩-৪

سَمَاءٌ (সামাউন) শব্দটি سُمُوٌّ ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ সুউচ্চ, সমুন্নত, উর্ধমণ্ডল। আমাদের ওপরে আদিগন্ত বিস্তৃত শামিয়ানা সদৃশ যে নীল নভোমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়, পবিত্র কুরআন এর বিস্ময়কর সৃষ্টি পুঞ্জ এবং দৃষ্টি নন্দন রচনা শৈলীর দিকে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। অতপর এর ফলে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য

www.pathagar.com

আমাদেরকে আহ্বান জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—সৃষ্টিজগতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কুরআনের অনুসৃত নীতি হলো—যে সমস্ত জিনিস সাধারণত আমাদের দৃষ্টির আওতায় আসে না, বরং অদৃশ্য থাকে, অথবা শুধু কল্পনা ও ধারণার উপর ভিত্তিশীল কিংবা শুধু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, কুরআন সেসব নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালায় না। কারণ দৃষ্টির আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকার দরুন এতে নানা প্রকার মত অভিমত, বাদানুবাদ ও জটিলতার অবকাশ বিদ্যমান থাকে। কাজেই কুরআন কেবল সে সকল বাস্তব সত্য মেনে নেয়ার এবং চিন্তার আহ্বান জানায়, জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকদের নযরে যেখানে মতপার্থক্যের কোনো অবকাশ থাকে না।

আকাশের বাস্তবতার প্রতি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানাতেও কুরআনপাক এ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে। এভাবে কুরআন সে সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যেগুলোতে মনোযোগ প্রদান করাই যথেষ্ট। অবশ্য সেই সাথে এ দিকেও ইঙ্গিত প্রদান করেছে যে, আকাশের মোট সংখ্যা সাত সম্পর্কে যেন কেউ এ বিভ্রান্তিতে না থাকে যে, দৃশ্যমান এ আকাশ এবং তাতে বিরাজমান তারকারাজি পর্যন্তই খোদার খোদায়ী ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ; বরং তিনি একথার দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন, মানুষের পক্ষে গবেষণার দ্বারা এ আকাশ ও তারকারাজি অতিক্রম করে আরো দূরে বহু দূরে চলে যাওয়ার সুযোগ ও অবকাশ রয়েছে।

২০. ২১-২৯ আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার পর যে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন সেগুলো আলোচনা করা হবে।

প্রথম আয়াতে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের নবী করীম (স)-এর দাওয়াত কবুল করে কুরআন শরীফের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগী করতে ইচ্ছুক তার জন্য একটিই মাত্র পন্থা তা হচ্ছে বন্দেগীর এ দাওয়াতকে সে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নিবে। এভাবে প্রকারান্তরে একথা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যেভাবে তারা আল্লাহর ইবাদাত করছে তা যথাযথ নয়। কেননা, তারা তাতে অন্যদেরকে শরীক করছে, অথচ আল্লাহর কোনো শরীক নেই। এরপর আল্লাহ তাআলার গুণাবলী এবং বিশ্বজাহানে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ এ বিষয়টি এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাতে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, তোমরা রাসূলের এ দাওয়াত কবুল করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছো কুরআনের প্রতি তোমাদের সন্দেহ থাকার দরুন। তোমরা ধারণা করছো যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয় ; বরং মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ থেকে অথবা তার কোনো সাহায্যকারী কর্তৃক রচিত পুস্তক। এ বিষয়টির ফায়সালা তাই এভাবে কর,

www.pathagar.com

তোমরাও কুরআনের সূরার ন্যায় কোনো সূরা প্রণয়ন করে উপস্থাপন কর ; তাহলে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার যে দাবী কুরআন করছে তা আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে। এ বিষয়ে তোমরা তোমাদের কবিকুল, সাহিত্যিক বক্তা, গণক, জিন এবং দেবদেবী—যারই সাহায্য নিতে চাও নিতে পার। এরপর যারা কুরআনের মুকাবিলা করতে অক্ষম হলেও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একথা মেনে নিতে সম্মত নয় তাদের জন্য যে ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি রয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সাথে সাথেই যারা কুরআনের দাওয়াত কবুল করে ঈমান ও আমলে সালেহ-এর পক্ষ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে এখানে যে বিশেষ বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে, তাহলে এই যখন জান্নাতের নেয়ামতরাশি জান্নাত-বাসীদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে তখন তারা এজন্য উৎফুল্ল ও প্রফুল্ল হবে যে, তাদেরকে এখানে যে নেয়ামত দেয়া হচ্ছে তা তাদের পূর্ব থেকেই পরিচিত। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বর্তমানে যারা কুরআনকে অস্বীকার করছে তারা তো একে মনগড়া কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যেদিন সকল পর্দার উন্মোচন ঘটবে এবং কুরআনের প্রতিটি কথার সত্যতা প্রকাশিত হবে। ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ প্রতিটি নেয়ামত প্রাপ্তির মুহূর্তে খুশীতে আত্মহারা হয়ে যাবে এবং ভাববে, আলহামদুলিল্লাহ! কুরআনের বদৌলতে আমাদেরকে জান্নাতের এ নেয়ামত-সমূহের পরিচিতি মরজগতেই অর্জন করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

এরপর আলোচনার ধারাবাহিকতার সতর্ক করার উপযোগী ক্ষেত্র বিবেচনা করে বাহ্যতঃ পূর্বাপর সম্পর্কহীন মনে হয় এমন একটি বাক্য নিয়ে আসা হয়েছে। তাহলো, আল্লাহ তাআলা বনী ইসমাঈলকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এখানে জান্নাত ও তার যে সকল নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে সে সবই নমুনা হিসেবে। কেননা, এ জগতে অবস্থানকালে তোমাদেরকে জান্নাত জাহান্নামের যে বিষয়ই বুঝানো হবে তা নমুনা ও উদাহরণের দ্বারাই বুঝানো সম্ভব বাস্তব দ্বারা নয়। আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদেরকে বুঝানো এতটাই প্রিয় যে, তিনি এজন্য যে কোনো উদাহরণ প্রদান করতেই আগ্রহী, তা মাছিই হোক আর মশাই হোক, বিষয়টি তোমাদের অন্তরে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। যারা সত্যিকার জ্ঞানান্বেষী এবং সত্যের পিয়াসী তারা এ সকল উদাহরণের গুরুত্ব প্রদান করে থাকে, তার দ্বারা নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিবৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু যারা বিভ্রান্তির শিকার তারা এগুলো নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে, এভাবে তারা আরো বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

এরপর কতকগুলো শব্দের দ্বারা ইশারায় একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে রয়েছে তারা এ উদাহরণগুলোর দ্বারা জ্ঞান ও সত্যের পরিবর্তে বিভ্রান্তি অর্জন করে থাকে। এ সকল বৈশিষ্ট্য ইহুদীদের মধ্যে বিরাজমান, এভাবে বনী ইসমাঈলকে একথা বলে দেয়া হলো যে, তোমরাও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো, নিজেদের

মধ্যে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য লালন করে রেখো না, ইহুদীদের সংস্পর্শে থেকে ফেতনা অন্বেষণ করতে যেও না, নতুবা তোমরাও তাদের মত নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

এ সম্পর্কহীন বাক্যের পর كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ আয়াতাংশের দ্বারা পুনরায় সে দাওয়াত প্রদান করা হচ্ছে যা, اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ। দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। এরপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার স্বপক্ষে দুটি দলিল প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যিনি তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন, তিনি কেন তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না ? দ্বিতীয়টি আল্লাহ্ তাআলার রব হওয়া সম্পর্কে, যার বিস্তারিত আলোচনা ভিন্নভাবে করা হচ্ছে।

এ বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, পূর্ববর্তী কথার সাথেও এ কথাগুলোর সংযোগ রয়েছে এবং আয়াতগুলোর পরস্পরের মাঝেও সামঞ্জস্য ও সাযুজ্য রয়েছে। প্রথমে আল্লাহর ইবাদাত করার প্রতি আহ্বান, তার সাথেই করা হয়েছে তাওহীদের বর্ণনা। কেননা, তাওহীদ ছাড়া আল্লাহর ইবাদাত হবে অর্থহীন। এরপর রেসালাতে ঈমান আনার আহ্বান, এর সাথে দলিল হিসেবে কুরআনের মু'জিযা হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর অস্বীকৃতির শাস্তি এবং ঈমান আনার উপকার ও প্রাপ্তির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এরপর সতর্কতা হিসেবে বলা হয়েছে, শাস্তি ও উপকারের যে বিবরণ প্রদান করা হয়েছে তা নমুনা ও উদাহরণ হিসেবে, বাস্তব হিসেবে নয়। সেই সাথে ইহুদীদের পদাংক অনুসরণ করে সেগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ দাওয়াতের সূচনাতেই একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে তারা বাস্তবিকপক্ষে মু'মিন নয়, আল্লাহকে অস্বীকার করাই বটে।

২১. কতক দলিলের ব্যাখ্যা

এ আয়াতগুলোতে ইসলামের মূল বুনিয়াদী তিনটি আকীদা—তাওহীদ, রেসালাত ও কিয়ামতের কিছু দলীল প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

তাওহীদের প্রমাণ

প্রথম দলিলটি তাওহীদের। ইরশাদ হয়েছে ঃ

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ٢٢

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।" -সূরা আল বাকারা ঃ ২২

www.pathagar.com

তাওহীদের এ দলিলটিতে বিশ্বের সকল বৈপরিত্যের মাঝেই যে সাযুজ্য নিহিত রয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সৃষ্টিজগতে পৃথিবীর বিপরীতে রয়েছে আকাশ, রাতের বিপরীতে দিন, আলোর বিপরীতে অন্ধকার, ঠাণ্ডার বিপরীতে গরম এবং নারীর বিপরীতে নরের অস্তিত্ব। ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে, বিশ্ব জুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপরীত শক্তির সমাহার, তারা একে অপরের বিপরীতে সংঘর্ষে লিপ্ত। অনেক জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এ ধোঁকায় নিপতিত হয়ে আলো ও অন্ধকার এবং ভালো ও মন্দের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নির্ধারণ করেছে। আরববাসীরাও এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মাটি ও আসমানের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা থাকার বিশ্বাস পোষণ করত। কুরআন শরীফ এ আয়াতটিতে এ বিভ্রান্তির অপনোদন করে বলে দিয়েছে, বিশ্বে যত বৈপরিত্য বিদ্যমান তা শুধুই বাহ্যিক ও প্রকাশ্য। নতুবা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের সকল বৈপরিত্যের মাঝেই খুবই সাযুজ্য ও সামঞ্জস্যতা বিরাজ করছে। মাটিকে বিছানার ন্যায় বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে শামিয়ানার ন্যায় উপরে টানিয়ে দিয়েছেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়, আর তার দ্বারা মাটিতে নানা ধরনের ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। এ ফল-ফসল সকলের খাদ্য ও খোরাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাটি ও আকাশের মধ্যে এ ধরনের সাযুজ্য ও সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একথা যুক্তিযুক্ত হয় যে, মাটির দেবতা ভিন্ন এবং আকাশের দেবতা ভিন্ন ? ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও ক্ষমতার মানে কি এ ধরনের সাযুজ্য হওয়া সম্ভব যে, আকাশ ও মাটি একত্রে একটি দোলনা হয়ে মানবজাতিকে লালন করছে যেভাবে মা তার শিশুকে দোলনায় চড়িয়ে লালন পালন করে ? যদি ভিন্ন ভিন্ন বিধাতা থাকত তাহলে তো এ আকাশ ও পৃথিবীই তাদের ইচ্ছা ও কার্যের বৈপরীত্য ও বিরোধিতার দরুন বিলীন হয়ে যেত, মধ্যবর্তী অন্য সকল সৃষ্টি তো এ দুটোর মাঝে থেকেই ধ্বংস হয়ে যেত

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করো না। অথচ তোমরা জান।' তোমরা জান কথাটির মর্ম—তোমাদের একথা জানা যে, আসমান-যমীনের এ আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্ট হওয়া কেবল আল্লাহর ক্ষমতাবলে হয়েছে। এগুলোর কোনো একটিকেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেনি। এ স্বীকৃতি প্রদানের পরও পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনায় অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা এতটাই অসংলগ্ন বক্তব্য যে, তার অসংলগ্নতা একেবারেই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। কুরআন শরীফ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য, আরবের মুশরিকরা কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। তারা আল্লাহকে স্বীকার করতো কিন্তু তাঁর সাথে আরো অনেক অংশ সাব্যস্ত করত। তাই সে সময় আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার কোনো আবশ্যকতা ছিল না, ছিল অংশী সাব্যস্ত করার ধারণা খণ্ডন করার আবশ্যকতা। তাই এখানে যে দলীল প্রদান করা হয়েছে তা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নয়, বরং আল্লাহর একত্ব প্রমাণের জন্য। কিন্তু দলীলটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বও স্বতঃই প্রমাণিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এখানে এ দলীলটির এ পরিমাণই বিশ্লেষণ করা হলো। ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে এ বিষয়ের দলিল বারবার আসবে এবং প্রত্যেক স্থানে সে স্থানের উপযোগী বিশ্লেষণ প্রদান করা হবে। আমি 'তাওহীদের হাকীকত' নামক গ্রন্থে এ সমুদয় দলীল নিয়ে আলোচনা করেছি। বিস্তারিত জানার জন্য তা দেখা যেতে পারে।

রেসালাতের প্রমাণ

দ্বিতীল দলিল ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রমাণ ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○ - البقرة : ٢٣

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি যদি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আস এবং যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে তোমরা সাহায্যের জন্য আহ্বান কর। যদি তোমরা নিয়ে না আস আর কখনোই তোমরা আনতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩–২৪

কুরআন শরীফ সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর দাবী ছিল—এটি আল্লাহর কিতাব, তিনি তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) মারফত অহীর মাধ্যমে তা নাযিল করেছেন। হযরত রাসূলে মাকবুল (স) এ কিতাবটিকে তার রাসূল হওয়ার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। আরবের মুশরিকরা তাঁর এ দাবী প্রত্যাখ্যান করত। ইহুদীরাও ছিল এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত। কিন্তু ইহুদীরা যে কেবল বিরোধী ছিল তাই নয়, বরং তারা এ বিরোধিতা চাঙ্গা করে রাখতে নানা ধরনের অপপ্রচার চালাত, তারাই ছিল বিরোধিতার মূল চালিকাশক্তি। তারা বিরোধিতা করতে গিয়ে নানা ধরনের কথাই বলতো। কখনো বলতো কুরআন হচ্ছে স্বয়ং মুহাম্মাদের রচিত গ্রন্থ তার নবী হওয়ার দাবীটাকে টেকসই করার লক্ষ্যে সে এটিকে আল্লাহর কালাম বলে মিথ্যা দাবী করছে। কখনো বলতো, কিছু লোক তার ষড়যন্ত্রের সাথী, তারা এ কিতাব প্রণয়নে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আবার কখনো বলে, কবি ও গণকদের কাছে যেমন জিনেরা নানা কথা পৌঁছায়, তেমনি মুহাম্মাদের কাছেও কোনো জিন এ সকল কথা শুনিয়ে শিখিয়ে যায়। আবার কখনো বলে, এ কিতাবে অলৌকিক ও অসাধ্য কোনো কথা নেই, এমন কথা আমরাও অনায়াসে বলতে পারি। এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য, কুরআনকে আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবীটি অস্বীকার করা। তাতে মুহাম্মাদ (স)-এর

দাবীটিও প্রত্যাখ্যাত হবে ফলে তা আর তার নবুওয়াত ও রেসালাতের দলিল হতে পারবে না।

এ সকল মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার জবাবে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, তোমাদের যদি সত্যিই এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে খুব সহজেই তোমরা এর ফায়সালা ও বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার। তাহলো, তোমরাও মুহাম্মাদের ন্যায় একটি সূরা প্রণয়ন করে সকলের সম্মুখে তা উপস্থাপন কর। যদি তোমরা কেবল একটি সূরাও এভাবে জগতের সামনে হাজির করতে পার, তাহলে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তোমাদের ধারণাই সঠিক এবং কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার দাবীটি মিথ্যা।

কুরআন এ চ্যালেঞ্জটিকে পরিপূর্ণরূপ প্রদানের জন্য তাতে তিনটি বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেছে ঃ

এক ঃ প্রথমে বলা হয়েছে, তোমরা এ কুরআনের সূরাগুলোর ন্যায় একটি সূরাই রচনা কর। স্মর্তব্য, তাদেরকে প্রথমে কুরআনের ন্যায় একটি পুস্তক রচনা করতে, পরবর্তীতে দশটি সূরা রচনা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু যখন বিরোধী সমাজ এ দুটি দাবির কোনোটিই পূরণ করতে পারেনি, তখন সর্বশেষ তাদেরকে বলা হলো, তাহলে অন্তত একটি সূরা তৈরি করে দেখাও।

দুই ঃ সেই সাথে বলা হয়েছে, যদি তোমাদের একার পক্ষে রচনা করা সম্ভব না হয়, তাহলে তোমাদের নিকট তো রয়েছে খ্যাতিমান সাহিত্যিক, রয়েছে অনলবর্ষী বক্তা, গণক ও যাদুকররাও রয়েছে, জিন শয়তানও রয়েছে। আরো রয়েছে তোমাদের কত দেব-দেবী। তোমরা কুরআনের মোকাবেলা করার স্বার্থে তাদের সাহায্য সহায়তা গ্রহণ করতে পার। যদি তাদের সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা তোমাদের কোনোই উপকার সাধন করতে না পারে, তাহলে তোমাদের জন্য এছাড়া আর কোনো পথ নেই যে, তোমরা কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে নিবে এবং এর বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানের অসফল প্রয়াস চালানো থেকে বিরত থাকবে।

তিন ঃ পরিশেষে একথা বলা হয়েছে যে, তোমরা কুরআনের মোকাবেলা এবং সে উদ্দেশ্যে সহায়তা অর্জন কোনোটিই বর্তমানেও করতে পারবে না, ভবিষ্যতেও পারবে না। তাই এ পণ্ডশ্রম করে দুনিয়া আখেরাত বরবাদ করার চাইতে ঐ আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা কর যা এ কিতাবের বিরোধিতা করলে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

কুরআনের ভাষা আরবী হওয়ার দরুন মূলত এ চ্যালেঞ্জ আরবী ভাষাভাষী লোকদের প্রতি—অনারব লোকের জন্য এ চ্যালেঞ্জ কার্যকর নয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ চ্যালেঞ্জ শুধু তাদের প্রতি নয় ; বরং যারাই কুরআনের ঐশী বাণী হওয়া বা নবী করীম (স)-এর নবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের প্রতিই এ চ্যালেঞ্জ। তাই সে সময় থেকেই তা কার্যকর এবং কিয়ামত পর্যন্তই তা কার্যকর থাকবে। সব যুগের সব লোকের প্রতিই কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বলবত ও বহাল রয়েছে।

www.pathagar.com

যে কারো মুকাবিলা করার সাধ জাগে সে তার যোগ্যতার পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। তাহলেই তার জানা হয়ে যাবে যে, সে কুরআনের ক্ষুদ্রতম কোনো সূরার সমকক্ষ কোনো সূরা তৈরি করতে আদৌ সক্ষম কি-না।

কিয়ামত সম্পর্কে প্রমাণ

তৃতীয় দলিলটি কিয়ামত সম্পর্কে, তাতে বলা হয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ - البقرة : ٢٨-٢٩

"তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে অস্তিত্বহীন, তিনি তোমাদের অস্তিত্ব ও প্রাণ দান করেছেন। এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এরপর তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন, এরপর তার দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার সবই, এরপর তিনি মনোনিবেশ করেন উর্ধাকাশের প্রতি, তিনি তা সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে জ্ঞানের একক অধিকারী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮-২৯

এ আয়াতে 'কুফর' অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়, বরং কিয়ামত অস্বীকার করা, যা পূর্বেও বলা হয়েছে। কেননা, কিয়ামতে অস্বীকৃতি মূলত আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা, রব হওয়া, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্ববহ গুণাবলীরই অস্বীকৃতি। এ সকল গুণ ব্যতিরেকে নিছক আল্লাহকে স্বীকার করা ও না করা এক বরাবর বটে। এ আলোচনার পর কিয়ামতের স্বপক্ষে এখানে কি দলিল প্রদান করা হয়েছে তা লক্ষণীয় ঃ

প্রথমে পুনরুত্থানেরও সম্ভাব্যতার দলিল দেয়া হয়েছে ঐ বাস্তবসম্মত ও স্বভাবজাত দলিল যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। দলিলটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই—তোমরা যখন একথা স্বীকার করছ যে, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন আর এ বিষয়টিও সদা সর্বদা প্রত্যক্ষ করছ যে, জগতের সকলকে তিনিই মৃত্যু দান করে থাকেন, তাহলে একথা কেন অসম্ভব বলে মনে করছ যে, তিনি তোমাদেরকে পুনরায় কবর থেকে উঠাবেন ? যিনি প্রথম দফা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কেনই বা অসম্ভব হবে ?

তবে কোনো বিষয় সম্ভব হলেই তা হওয়াটা জরুরী হয়ে যায় না। তাই, কিয়ামত হওয়া সম্ভব হলেই তা সংঘটনের প্রয়োজনটা কি ? এ প্রশ্নের উত্তরও আয়াতে দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে, যিনি তোমাদের প্রতিপালনের জন্য এ বিশ্বজগত সৃজন করেছেন তাঁর প্রতিপালনের বিভিন্ন পর্যায় প্রকাশ করেছেন, জগতের প্রতিটি বস্তুতে যার অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, প্রতিটি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে যার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিবেন, পূর্ণ ও পাপের কোনোই হিসেব নেবেন না, তা কি করে হয় ? যদি বেহিসেব ছেড়ে দিয়েই রাখেন তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুতে আল্লাহর যে রব হওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তা অর্থহীন হয়ে যায়, বিশাল আকাশ যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বীকৃতি জানাচ্ছে তাও উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায় এবং সর্বব্যাপী তাঁর যে ইলম তা নিষ্ফল হয়ে যায়। অথচ আসমান-যমীনের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার উল্লেখিত গুণগুলো থাকা জরুরী এবং তিনি এ সমূদয় গুণে গুণান্বিতও।

কিয়ামতের এ দলিল কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে, তাই এখানে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে ইশারা প্রদান করা হলো।

এ বিস্তারিত আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদিও বনী ইসরাঈলকে সরাসরি সম্বোধন করা হয় নাই, কিন্তু তাদের সামনে দাওয়াতের তিনটি মূল বস্তু—তাওহীদ, রেসালাত এবং কিয়ামত মৌলিক দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে—অতিব সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে।

২২. কুরআন শরীফের মাহাত্ম্যের দুটি দিক

সমগ্র জিন ও ইনসান কুরআনের নমুনা পেশ করতে অপারক

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে গিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্বের দুটি দিক উন্মোচন করেছেন। তার মধ্যে একটি যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে—সমগ্র জিন ও ইনসান এর নমুনা উপস্থাপনে অসমর্থ ও অপারক। কুরআনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের এ বিষয়টি যখন তা অবতীর্ণ হয় তখনও ছিল প্রকাশ্য। কেননা তখনকার লোকেরা এটি কোনো মানুষ বা জিনের কথা বলে মনে করত। কিন্তু তারা এর বিরোধিতা করার মানসে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও এর নমুনা উপস্থিত করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানেও কুরআনের মর্যাদাপূর্ণ এ বৈশিষ্ট্য যথাযথ বহাল রয়েছে ; কুরআন নাযিলের পর এত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো কট্টর ও চরম বিরোধীও এর মুকাবেলায় এমন কিছুই উপস্থাপন করতে পারেনি যা তার একক মর্যাদার হানী ঘটাবে।

কুরআনের মাহাত্ম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

এখানে কুরআনের অপর যে মাহাত্ম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তাহলো, যদিও কুরআনকে তার বিরোধিরা মনগড়া বলে উড়িয়ে দিতে চায় এবং তাতে যে উদাহরণগুলো রয়েছে সেগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিয়ে একে অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু এমন দিনও আসবে যেদিন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে অবস্থান করে একটি একটি করে জান্নাতী

www.pathagar.com

নেয়ামত ভোগ করবে এবং উৎফুল্ল হয়ে বলবে, আল্লাহর তরে সকল প্রশংসা, এ স্বাদ সম্পর্কে কুরআনে আমাদেরকে ইতিপূর্বেই অবহিত করে দিয়েছে, এখন আমরা তার প্রকৃত স্বাদটি উপলব্ধি করার তাওফীক পাচ্ছি।

এ আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টিও প্রতিভাত হয় যে, যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি সত্যিকার ঈমান রাখে, কুরআনের প্রতিটি কথার অভ্যন্তরে যে দীপ্তি ও নূর তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, সে প্রকৃতপক্ষে এ মরজগতে অবস্থানকালেই জান্নাতের একটি ঝলক দেখতে পায়, জাহান্নামের শাস্তির নমুনাও তার সম্মুখে ফুটে উঠে। এ আলোচনায় এ ইঙ্গিতও মিলে যে, কুরআন যে নেককাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছে সে নেককাজ গুলোরই স্বাদ সে জান্নাতে উপভোগ করবে। তেমনিভাব যে সকল মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে জাহান্নামে সেগুলোরই তিক্ততা প্রকৃত রূপ ধরে অপরাধীদের সম্মুখে উন্মোচিত হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটি হচ্ছে নমুনা এবং অপরটি মৌলিক। দুনিয়াতে মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে তা জান্নাত-জাহান্নামের নমুনা। কেননা, আখেরাতের মৌলিক বস্তু দুনিয়াতে যাথাযথভাবে বুঝা বা বুঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু পরকালে মূল শাস্তি বা প্রতিদান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনোই বাধা থাকবে না, তাই সেখানে মূল বস্তুই প্রকাশিত হবে।

জান্নাতবাসী জান্নাতে যে কোনো নেয়ামত ভোগ করবে, সে বলবে এটি তো ঐটিই যা আমরা ইহজগতে প্রত্যক্ষ করেছি, উপভোগ করেছি—একথাটি এই ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, নেককার ব্যক্তি নিজ অবস্থান ও মর্যাদা অনুসারে এ দুনিয়াতেও নেকীর স্বাদ আস্বাদন করে। কিন্তু এ জগতে উপলব্ধির পর্দা থাকায় তার মৌলিক ও প্রকৃত স্বাদটি তার নিকট উন্মুক্ত হয় না। নবী ও বিশিষ্ট অনেক আল্লাহওয়ালা বান্দার পক্ষ থেকে এমন অনেক কথা বর্ণিত রয়েছে, যার মধ্যে এ সাক্ষ্য প্রমাণ বিধৃত রয়েছে যে, ঈমান-ইসলাম-নামায ইত্যাদি নেক কাজে যে স্বাদ নিহিত রয়েছে তা সে দুনিয়াতে পায়। নবী করীম (স) বলেছেন, আমার চোখের শীতলতা নিহিত নামাযে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, যদি লোকেরা জানতো যে ইশার নামাযে কি মাহাত্ম্য রয়েছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে হাজির হতো। এ ধরনের কথা সাহাবায়ে কেরামের এবং অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। যারা এ স্বাদ আস্বাদন এ ইহজগতেই করতে পেরেছে, যখন পরকালে এ স্বাদ তার প্রকৃত রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হবে তখন তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এর নমুনা অল্প-বিস্তর তারা এ দুনিয়াতেই ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। এ সুযোগ তাদেরকে করে দিয়েছে একমাত্র কুরআন। কিন্তু যে কুরআন এত সম্পদ নিয়ে নাযিল হয়েছে, যা এক উজ্জ্বল দর্পণ সদৃশ, যার আয়াত ও সূরাগুলোতে জান্নাতের স্বাদ লুকিয়ে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এর মূল্যায়ন করে এতটুকু যে, তার মূল উদ্ভাবক নমুনাগুলোকে সে বাহানা করে এবং তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। অথচ যদি এর একটি ঝলকও সে প্রত্যক্ষ করতো তাহলে তাতে অবগাহন করে করে তার তৃপ্তি হতো না।

www.pathagar.com

২৩. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৩০-৩৯ আয়াত

ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের উল্লেখিত দাওয়াত প্রদান এবং ইহুদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করার পর পরবর্তী ১০টি আয়াতে আদম (আ)-এর খেলাফত এবং শয়তানের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিবরণের আওতায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো অচিরেই যথাস্থানে আলোচিত হবে। তবে এখানে ভূমিকা স্বরূপ সে কথাগুলো আলোচনা করা আবশ্যক যে কথাগুলো পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে আগত বক্তব্যের যোগসূত্র স্থাপন করে দিবে।

এ সম্পূর্ণ বিবরণটি হচ্ছে একটি দর্পণ। নবী করীম (স)-কে নবুওয়াত প্রদান এবং কুরআন নাযিল হওয়ায় সে যুগের সকল জাতিগোষ্ঠী বিশেষত ইহুদীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ইহুদীরা গর্ব ও অহংকার এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শত্রুতে পরিণত হয় এবং যথারীতি শত্রুতায় লেগে থাকে। অপর দিকে যারা হিংসুক বা অহংকারী নয় ইসলামের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি না করতে পারার দরুন তাদের অন্তরে নানা ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নের উদয় হতে থাকে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তাদের সন্দেহ দূর হতে থাকে এবং তারা একের পর এক ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। কুরআন কারীম এ পর্যায়ে আদম (আ)-এর খেলাফতের আলোচনা করে প্রমাণিত করে দিয়েছে যে, ইসলামের দাওয়াত ব্যাপ্তি লাভ করার বিষয়টি আদম (আ)-এর খেলাফত সদৃশ। আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আ)-কে খলীফা বানানোর ফায়সালা করে তা ফেরেশতাদের জানালেন তখন প্রথম পর্যায়ে তাদের অন্তরে সন্দেহের উদয় হয় এবং আল্লাহ তাআলার সমীপে তারা সে সন্দেহ প্রকাশও করে। কিন্তু তাদের অন্তরে এ সন্দেহের উদয় হয়েছিল তারা মহান আল্লাহর পূর্ণ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনবহিত থাকার দরুন, তাদের অন্তরে গর্ব বা অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। তাই যখনই তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পূর্ণ স্কীমটি উদ্ভাসিত হয়ে যায় অমনি তাদের সকল দ্বিধা ও সন্দেহ দূর হয়ে যায় ; তারা হযরত আদম (আ)-এর খেলাফত দ্বিধাহীন চিত্তে অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে কবুল করে নেয়। পক্ষান্তরে ইবলীস শয়তানের পক্ষ থেকে এ খেলাফতে যে আপত্তি ছিল তা ছিল হিংসা ও অহংবোধের ভিত্তিতে। তার অন্তরে ছিল—সে আগুন দ্বারা সৃষ্ট এবং আদম (আ) হলেন মাটির তৈরি। সুতরাং তাকে খেলাফত না দিয়ে আদমকে কেন দেয়া হবে এবং নিজের বংশীয় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আদমকে সে কেন শ্রেষ্ঠ মেনে সেজদা করবে ?

কুরআন এ স্থানে আলোচনা করে দেখিয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনাতেও হযরত আদম (আ)-এর খেলাফত প্রাপ্তির সদৃশ ঘটনায় ঘটেছে। যারা সত্যের সন্ধানী ও মুক্ত মনের অধিকারী তাদের যদি রাসূলের বা কুরআনের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে পরবর্তীতে সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের সে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে বা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ইহুদীদের নবীর বিরুদ্ধাচরণ করা হল হিংসা ও অহংবোধের ফসল, তারা নিজেদেরকে বংশগতভাবেও নবী-বংশীয়দের তুলনায় উত্তম

www.pathagar.com

বিবেচনা করতো এবং প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও নেতৃত্বের দরুন ও 'উম্মী আরবী' নবী থেকে নিজেদেরকে অধিক মর্যাদাশীল বলে ধারণা করতো। তাই তারা উম্মী নবীকে স্বীকার করে তাঁর নেতৃত্ব বরণ করে নিবে, নিজেদের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব বিসর্জন দিবে তা তাদের কাছে ছিল অসহনীয় ও কষ্টকর।

কুরআনের দর্পণ এ অবস্থায় ইহুদীদের অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, আদম (আ)-এর খেলাফত প্রাপ্তিতে ইবলীসের যে ভূমিকা, নবী করীম (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তিতে ইহুদীদেরও সেই একই ভূমিকা বিদ্যমান। এ উভয় ক্ষেত্রে বিরোধিতার কার্যকারণও একই। সেই সাথে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে ইহুদীদের জন্যও সেই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। সেই সাথে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তাহলো, ইবলীসের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও আদমের খেলাফত যেমন বহাল রয়েছে, তেমনি ইহুদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নবীজীর নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্তই টেকসই হয়ে থাকবে।

সেই সাথে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সত্যিকারভাবে কারো অন্তরে কোনো প্রশ্নের বা কোনো সন্দেহের উদয় হওয়া মোটেই দূষণীয় নয়। এমনটা হতেই পারে এবং হয়ও। সহজ সরল লোকের অন্তরেও এ ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে তারা অপত্তি করেও বসতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তাদের এ সন্দেহ বা প্রশ্ন হিংসা বা অহংকারের ভিত্তিতে করা হয় না তাই তাদের সে সন্দেহ দূর হওয়া মাত্র তারা প্রকৃত সত্য বিষয়টি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নেয়। যারা হিংসা বা অহংকারের শিকার নয়, বরং রাসূলে মাকবুল (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট না হওয়ায় তা তাদের বোধগম্য হয়নি এবং তাতে সন্দেহ ও প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর খেলাফতের ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা অত্যন্ত মনোহর ভঙ্গিতে ঈমান কবুল করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তাদের অন্তরের সন্দেহ তাহলে দূর হয়ে যাবে এবং তার সঠিক উত্তর তারা পাবে যেমন ফেরেশতারা আপত্তির জবাব পেয়েছে।

একথাগুলো সামনে রেখে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ
الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ
إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ

www.pathagar.com

أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا
الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ
رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا
مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

৩০. আবার সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করো যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা–প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই।" তারা বললো, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে চান যে সেখানকার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত করবে এবং রক্তপাত করবে? আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি।" আল্লাহ বললেন, "আমি জানি যা তোমরা জানো না।" ৩১. অতপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, "যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (অর্থাৎ কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত

করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে একটু বলতো দেখি এ জিনিসগুলোর নাম ? ৩২. তারা বললো ঃ "ত্রুটিমুক্ত তো একমাত্র আপনারই সত্তা, আমরা তো মাত্র ততটুকু জ্ঞান রাখি যতটুকু আপনি আমাদের দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া আর এমন কোনো সত্তা নেই যিনি সবকিছু জানেন ও সবকিছু বুঝেন।" ৩৩. তখন আল্লাহ আদমকে বললেন, "তুমি ওদেরকে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।" যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম জানিয়ে দিলো তখন আল্লাহ বললেন ঃ "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আকাশ ও পৃথিবীর এমন সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমাদের অগোচরে রয়ে গেছে ? যাকিছু তোমরা প্রকাশ করে থাকো তা আমি জানি এবং যাকিছু তোমরা গোপন করো তাও আমি জানি।

৩৪. তারপর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম, আদমের সামনে নত হও, তখন সবাই অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করলো। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তরভুক্ত হলো। ৩৫. তখন আমরা আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছেমতো খেতে থাকো, তবে এ গাছটির কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা দুজন যালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।" ৩৬. শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হুকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, "এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে হবে। ৩৭. তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তাওবা করলো। তার রব তার এ তাওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। ৩৮. আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌছবে তখন যারা আমার সেই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোনো ভয় দুঃখ বেদনা। ৩৯. আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগুনের মধ্যে প্রবেশকারী ; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।"

২৪. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৩০

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ○

اِذْ শব্দের বিশ্লেষণ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ ঃ কোনো আরবী বাক্যের শুরুতে اِذْ এলে বাক্যটির পূর্বে স্মরণ কর, লক্ষ কর, মনে কর, ধারণা কর ইত্যাকার কোনো একটি অনুজ্ঞা প্রকাশক ক্রিয়া উহ্যভাবে মেনে নেয়া হয় এবং সাধারণত اِذْ এরপর এমন কোনো ঘটনা বা বিবরণ প্রদান করা হয় যে সম্পর্কে সম্বোধিত ব্যক্তি পূর্ব থেকেই জ্ঞাত থাকেন অথবা কথকের সে ঘটনা সম্পর্কে এতটাই দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রতীতি থাকে যে তা তার দৃষ্টিতে সর্বজনজ্ঞাত বিষয়তুল্য প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। হযরত আদম (আ) এবং ফেরেশতাদের মধ্যকার ঘটনাটি যদিও অদৃশ্য জগতের, কিন্তু প্রথমত তাতে সম্বোধিত ব্যক্তি হচ্ছেন হুযুর আকরাম (স), তাঁর নিকট অহীর প্রতিটি কথা, বাক্য ও শব্দ বাস্তব, যথার্থ ও সঠিক। তাছাড়া, পূর্বের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ইহুদীদেরকে সর্তক করা, তাই তারাই এক্ষেত্রে সম্বোধিত। আর তারা তাওরাত মারফত আদম (আ) সম্পর্কিত ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত, যদিও তাদের হাতে তাওরাত বহু পরিবর্তনের শিকার হয়েছে।

مَلٰئِكَة শব্দের বিশ্লেষণ

مَلٰئِكَة ঃ مَلٰئِكَة শব্দটি একবচন مَلَكٌ যা মূলত مَلْئَكٌ ছিল। اَلُوْكَةٌ শব্দের অর্থ পয়গাম বা সংবাদ, তাই مَلَكٌ-এর অর্থ হচ্ছে সংবাদ বাহক —এ শব্দ দ্বারা ঐ সংবাদ বাহককে বুঝানো হয়ে থাকে যারা অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জীব হওয়ার দরুন লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তরালে অবস্থান করে, যাদের আমরা ফেরেশতা বলে থাকি। তারা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর অন্য সৃষ্টিকূলের মাঝে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিরাজ করে। আধ্যাত্মিক জীব হওয়ার কারণে তারা আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত নৈকট্যলাভে যেমন সক্ষম হয়, তেমনি মাখলুক হওয়ার সুবাদে অন্য সকল মাখলুকের সাথে সমতা ও সাম স্য রক্ষা করতেও তারা সামর্থ হয়ে থাকে। তারা কোনো মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত ঐশী নূর ও আলোকচ্ছটা যেমন আত্মস্থ করতে পারে, তেমনি আল্লাহর অপর বান্দার নিকট তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতাও তারা রাখেন। তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলদের নিকট অহী ও প্রত্যাদেশ নিয়ে আসেন, মাখলুকাতের ভেতরে আল্লাহর হুকুম কার্যকর ও বাস্তবায়নও করে থাকেন। কুরআন মজীদে ফেরেশতাদের যে সকল গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা হচ্ছে জ্ঞানবান, বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী, উপলব্ধি ও অনুভবের ধারক। তাই যারা বলে, ফেরেশতারা ভিন্ন কোনো মাখলুক নয়, বরং আল্লাহর বিশেষ এক ক্ষমতার প্রকাশ, তাদের সে মত মোটেই গ্রহণ উপযোগী নয়।

www.pathagar.com

خَلِيْفَةً শব্দের বিশ্লেষণ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ঃ খলীফা বলা হয় কারো অবর্তমানে তার প্রতিনিধিকে, যে মূল ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কার্য সম্পাদন করে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে খলীফা বানাবেন—এ আলোচনায় তাই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, মানুষ কার খলীফা হবে ? কার অর্পিত অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করবে ? আল্লাহর—না এ ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী পূর্বতন কোনো মাখলুকের ? এ সম্পর্কে দুটি মত ব্যক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পৃথিবী পৃষ্ঠে মানব আগমনের পূর্বে জিন জাতির বাস ছিল, তারা বিবিধ বিশৃংখলা সৃষ্টি করার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে নানা দুর্গম স্থানে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং মানবজাতিকে তাদের খলীফা তথা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, মানবজাতিকে মহান আল্লাহ স্বয়ং নিজের খলীফা নিয়োগের ইচ্ছা করেছেন। প্রথম মতটি যদিও একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু কুরআন, তাওরাত বা নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসে এর সমর্থনে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা ইশারা-ইঙ্গিতের চেয়ে অধিক কিছু নয় এবং ইশারা-ইঙ্গিতের উপর কোনো বক্তব্যের ভিত্তিস্থাপন করা মোটেই যথাযথ নয়।

দ্বিতীয় মতটি বিভিন্নভাবে শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে বিভিন্নভাবে মর্যাদার অধিকারী করেছেন, কুরআন শরীফে সে সবের উল্লেখও করা হয়েছে। যেমন, মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার বিশ্বের সকল কিছু সৃজন করা, ফেরেশতাদেরকে আদম (আ)-কে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান, যে আমানত ও দায়িত্বভার গ্রহণে সকল মাখলুক অপারগতা প্রকাশ করেছে মানুষ সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেছে—মানবজাতি সম্পর্কে আল্লাহর এ ঘোষণা প্রদান—এ সকল কিছুর দ্বারাই এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁরই খলীফা নিয়োগ করেছেন।

বিভিন্নভাবে এ মতটি প্রাধান্য লাভ করার পরও তাতে একটি আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হচ্ছে, খলীফা তো নিয়োগ করতে হয় অনুপস্থিত কারো, যার উপস্থিতি সম্ভব নয় তার। কিন্তু আল্লাহ তো সদা সর্বত্র বিরাজ করেন, সর্বত্রই তাঁর হুকুমত কার্যকর, তবে তাঁর খলীফা নিয়োগের কি হেতু ? প্রশ্নটি কেউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারে, কিন্তু মূলত মোটেই তা নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুপস্থিতির দরুন প্রতিনিধি নিয়োগ করছেন, বিষয়টি তা নয়। বরং এ ক্ষেত্রে খলীফা নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবজাতিকে কিছু কাজে ক্ষমতা প্রয়োগের স্বাধীনতা প্রদান করে পর্যবেক্ষণ করা, এ ক্ষমতা প্রাপ্তির পর সে কিভাবে তা প্রয়োগ করে ? সে কি আল্লাহর সন্তোষ অন্বেষণ করে। না স্বেচ্ছাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যা খুশি তাই করে বেড়ায় ? অতএব, তা অনুপস্থিত কারো প্রতিনিধিত্ব নয় ; বরং মূল শাসনকর্তার পক্ষ থেকে কাউকে আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা প্রদান, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর পরীক্ষা গ্রহণ।

www.pathagar.com

فَسَادَ فِي الْاَرْضِ ঃ (বিশৃংখলা সৃষ্টি)-এর অর্থ

قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ঃ কুরআন মজীদের পরিভাষায় 'ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি'—এর মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নিয়ামনীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা না করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত তা পরিচালনা করা, আল্লাহ প্রদত্ত শরয়ী বিধান অমান্য করে নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে যাওয়া। পৃথিবীর প্রকৃত আইনদাতার আইন অমান্য করে নিজেদের খেয়ালখুশিকেই আইন বলে চালিয়ে দেয়া। বিষয়টি স্বয়ং বিশৃংখলা হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহও বটে। এ অবাধ্যতা ও বিশৃংখলা স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কোনো দর্শন ও চিন্তার ভিত্তিতেও তা হতে পারে। মানুষ কখনোই এ পৃথিবীর মূল শাসনকর্তা নয়, মূল শাসক তো কেবল আল্লাহ তাআলা। আর তাই এ বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে তাঁরই বিধান কার্যকর ও প্রয়োগ-উপযোগী। আর ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা একমাত্র তাতেই নিহিত। তাই, কোথাও যদি আল্লাহর বিধান কার্যকর না থাকে, তবে সেখানে প্রকাশিত হয় বিদ্রোহ, সৃষ্টি হয় বিশৃংখলা, শুরু হয় অন্যায়-অনাচার, আর তাই তা সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

রক্তপাত হচ্ছে বিশৃংখলার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কেননা, যখন কোথাও আল্লাহর আইন বলবত থাকবে না তখন সেখানে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারও থাকবে না, মানুষ আপন মর্জিমত শাসন পরিচালনা করবে, যার ফলশ্রুতিতে হবে অন্যায়-অত্যাচার, কারো জানমালের নিরাপত্তা থাকবে না মোটেই, আর এর ফলাফল হচ্ছে অন্যায় রক্তপাত। ধরে নেয়া যাক, তারা নিজেদের জান মালের হেফাজতের জন্য কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করে তা মেনে চলবে, তাহলে তা হবে কেবল নিজেদের জন্য কার্যকর ; কিন্তু অন্যদের পূর্ববত নিরাপত্তাহীনতায়ই বাস করতে হবে। ফলে তাদের এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হবে ডাকাত দলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যায়, যা শুধু ডাকাতদের নিরপত্তাবিধানের জন্যই নির্ধারণ করা হয় এবং তারাই শুধু এর দ্বারা লাভবান হয়, অন্য কারো তাতে মোটেই নিরাপত্তা হয় না। সমগ্র জগতবাসীর একক নিরাপত্তা-কবচ হচ্ছে আল্লাহর আইন, যা সকলকে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তাদানে সক্ষম এবং সকলের জন্য সমভাবে কার্যকর, অন্য কোনো মতবাদ বা নিয়মনীতি এমন নয়।

ফেরেশতারা মানবসৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ও সন্দেহ ব্যক্ত করেছিল তা মূলত তাদের খলীফা হওয়ার বিষয়ে ছিল, মূল মানবসৃষ্টিতে তাদের কোনোই আপত্তি ছিল না। যেহেতু খলীফা শব্দের মধ্যে স্বাধীনতা প্রদানের অর্থ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই হয়তো ফেরেশতারা বুঝতে পেরেছিল তাকে এক নির্ধারিত পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। তারা একথাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, স্বাধীনতা পাওয়ার প্রেক্ষিতে নিজেদের সংবরণ করা মানুষের জন্য বড়ই দুরূহ ও কষ্টকর হবে। হয়তো সে এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করবে, ফলে পৃথিবীতে নিরাপত্তাহীনতা ও রক্তপাত ছড়িয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

تَسْبِيْحٌ শব্দের অর্থ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ঃ 'তাসবীহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ, কারো সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করা, নম্রতায় মাটিতে মিশে যাওয়া। এ বিনয় ও নম্রতা যেমন কথার মাধ্যমে হতে পারে, তেমনি কাজ ও আমল দ্বারাও তা হতে পারে। কাজের দ্বারা তাসবীহ আদায়ের অর্থ, সদা সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালনে নিয়োজিত থাকা। এ ধরনের তাসবীহ সে সকল মাখলুকও করে যাচ্ছে যেগুলোর প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, কোনো ইচ্ছাশক্তিও নেই। মানুষের যে আমলকে কুরআনে কারীমে বিশেষভাবে তাসবীহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তা হচ্ছে নামায। কেননা, একমাত্র নামাযেই বিনয় ও নম্রতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, অন্য কোনোটিতে এমনটা হয় না। মৌখিক তাসবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ ইলাহ-এর মর্যাদা পরিপন্থী যাবতীয় অমূলক দোষ-ত্রুটি ও বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি পূত-পবিত্র—এ ঘোষণা দেয়া। তাই তাসবীহ শব্দটিতে নেতিবাচক দিকটি প্রবল। তবে যদি এর সাথে 'হামদ'-এর সংযুক্তি থাকে, যেমনটি এ আয়াতে হয়েছে তবে তাতে ইতিবাচক বক্তব্যও বিরাজ করে। তখন অর্থ হয়, আল্লাহ তাআলা ইলাহ-এর মর্যাদা পরিপন্থী যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে পাক পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে তিনি সকল গুণ ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। আর তাই তিনি হামদ ও শোকর-এর একমাত্র অধিকারী—এ ঘোষণা প্রদান করা।

نُقَدِّسُ لَكَ-এর বিশ্লেষণ

نُقَدِّسُ لَكَ ঃ এ আয়াতাংশের অর্থ ঃ আমরা আপনার পবিত্রতা, আপনার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং আপনার পূত-পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। তাসবীহে নেতিবাচক দিকটি প্রবল হলেও 'তাকদীসে' আল্লাহ তাআলার পূত-পবিত্র হওয়া এবং মর্যাদা-মাহাত্ম্যের অধিকারী হওয়ার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। তাই, তাসবীহের পাশাপাশি তাকদীস এসে একথাই বুঝিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে বিমুক্ত থাকার সাথে সাথে সকল গুণের অধিকারীও। আর এভাবে ত্রুটির অস্বীকৃতির পাশাপাশি গুণাবলীর স্বীকৃতি প্রদান ছাড়া আল্লাহ তাআলার পরিচয় যথাযথ প্রদান করা সম্ভব নয়।

ফেরেশতাদের অন্তরে মানবজাতি সম্পর্কে যে সন্দেহের উদয় হয়, তা প্রকাশ করার পর তাদের তাসবীহ ও তাকদীস-এর উল্লেখ করে তারাই বরং খেলাফতের উপযুক্ত—একথা বুঝানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না মোটেই। বরং আল্লাহ তাআলার মানবজাতিকে খলীফা বানানোর কারণ ও নিগূঢ় রহস্য কি তা উঘাটন করতে চাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে তাদের অন্তরে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তারা তার উল্লেখ করেছে, এরপর একথাও প্রকাশ করেছে যে, মানুষকে স্রেফ তাসবীহ ও তাকদীসের জন্য নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা, তা তো আমরা করেই যাচ্ছি।

قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ঃ মহান আল্লাহ তাআলা তাদের এ জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছেন, তোমরা যেহেতু আমার পরিকল্পনার সর্বদিক সম্পর্কে অবগত নও, তাই তোমাদের মনে এ জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে। যখন পরিকল্পনাটি পুরোপুরিভাবে তোমাদের

www.pathagar.com

অবগতিতে আসবে, তখন তোমরা দেখতে পারবে, তোমরা যে আশংকা করছ তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৩১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ق فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

আদম (আ)-কে কিসের নাম শেখানো হয়েছে

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ঃ আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে কিসের নাম শিখিয়েছেন, এ প্রশ্নের তিনটি উত্তর প্রদান করা হয় ঃ ১. জগতের সকল বস্তুর নাম, ২. সকল ফেরেশতার নাম এবং ৩. আদম (আ)-এর সকল বংশধরের নাম। তন্মধ্যে দ্বিতীয় উত্তরটির পক্ষে পবিত্র কুরআনে কোনোই দলীল নেই বিধায় তা নিয়ে আলোচনার কোনো আবশ্যকতা নেই। অবশিষ্ট দুটি মতের মধ্যে তৃতীয়টির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ থাকার দরুন সেটিই (আমার নিকট) অধিক যুক্তিযুক্ত। যুক্তি প্রমাণগুলো হচ্ছে ঃ

১. ইশারা ইঙ্গিতে বুঝা যায়, الاسماء শব্দের শুরুতে যে ال রয়েছে তা عهد -এর, আর তাহলে اسماء শব্দটি কতগুলো বিশেষ নামই বুঝাবে।

২. اَسْمَآءَ শব্দের পরিবর্তে যে শব্দগুলো পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সাধারণ বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয় না বরং মানবজাতির জন্য সেগুলোর ব্যবহার স্বীকৃত। যাদের জ্ঞানবুদ্ধি, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান তাদের জন্য সেগুলার ব্যবহার স্বীকৃত। যেমন ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ (অতপর তাদেরকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন।) اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ (তোমরা এদের নাম বলো।) يٰاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ (হে আদম ! তুমি তাদেরকে এদের নাম বলে দাও।) فَلَمَّا اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ (সে যখন ফেরেশতাদেরকে এদের নাম বলে দিল) ইত্যাদি।

৩. ফেরেশতাদের স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে এ পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য। ফেরেশতারা হযরত আদম (আ)-এর বংশধর সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেছিল যে, তারা পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর নানা বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে, রক্তপাত ঘটাবে। তাদের এ ধারণা অপনোদনের পদ্ধতি এটিই যে, তাদের সামনে আদম (আ)-এর সকল বংশধরকে উপস্থিত করা হবে, তাদের মধ্যে যারা নবী-রাসূল, মুজাদ্দেদ-সংস্কারক, শহীদ ও সিদ্দীক হিসেবে সৃষ্টি হবেন তাদেরকে ফেরেশতারা দেখতে পাবে এবং তাদের সম্পর্কে ফেরেশতারা অবহিত হতে পারবে। আর তাহলে তাদের ধারণার পরিবর্তন সূচিত হবে। তারা দেখতে পাবে যে, যেমন মানবজাতির মধ্যে এমন লোক থাকবে যারা ক্ষমতা ও যোগ্যতার অপব্যবহার করে নানা অন্যায়-অনাচার করবে, তেমনি এমন

www.pathagar.com

লোকও থাকবে যারা নিজেরা খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথ পালনের পাশাপাশি অন্যকেও তা পালনে উদ্বুদ্ধ করে যাবে এবং এজন্য প্রাণপাত চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

উল্লেখিত তিনটি বিষয়ই বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার, যদিও এগুলোর বিপরীতে কমবেশি আপত্তিও উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু সেগুলো নেহায়েতই দুর্বল। এ তিনটি দলিল একত্রে বড়ই মযবুতির সাথে একথা প্রকাশ করে যে, اَسْمَآءَ শব্দের দ্বারা সকল আদম সন্তান বিশেষত যারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা দূর করে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন তাদের নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠতে পারে আদমের এ সন্তানেরা তখন ছিল কোথায় ? তাদের তো তখন কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তাহলে তাদের প্রত্যক্ষ করানো এবং নাম বাতলে দেয়া এগুলো কিভাবে ঘটেছিল ? এর জবাব কুরআন মজীদেই রয়েছে, আল্লাহ তাআলা সকল আদম সন্তানকে সৃষ্টি করে তাদের থেকে 'আল্লাহ তাআলা রব ও প্রতিপালক' এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করেছেন। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج - الاعراف : ١٧٢

"সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম-এর (পিঠ থেকে এবং এরপর তাঁর) বংশধরের পিঠ থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরকে নিগর্ত করেছেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? 'তারা বলেছে, নিশ্চয়ই, আমরা (একথায়) সাক্ষী রইলাম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২

এ আয়াতের দ্বারা একথা প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অদৃশ্য জগতে সকল আদমসন্তানকে একদফা একত্র করে তাদের থেকে তাঁর রব ও প্রতিপালক হওয়ার স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন। হতে পারে, সে সমাবেশেই তিনি আদম (আ)-কে তাঁর বংশধরদের নাম বলে দিয়েছেন এবং সে সমাবেশেই আদম (আ) ফেরেশতাদের সম্মুখে তাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাধা করেছেন।

اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ঃ এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমাদের এ ধারণাই সঠিক হয়ে থাকে যে, আদম সন্তানরা খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর পৃথিবীতে নানা বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে তাহলে তাদের নাম বলো, তারা কারা ? তারা কি পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না ন্যায়বিচার এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে ? এক্ষেত্রে ফেরেশতাদের ধারণা অপনোদনের যে পদ্ধতি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তাহলো, আদম সন্তান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাইলে তার পূর্বে তাদের সকলের সম্পর্কে তোমাদের অবগতি থাকতে হবে ; নইলে তোমরা তাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে

www.pathagar.com

পার না। কিন্তু যেহেতু মানবজাতির সকলের সম্পর্কে তোমাদের সম্যক অবগতি নেই, তাই তোমাদের এ ধারণারও কোনো ভিত্তি নেই।

আয়াত ঃ ৩২

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ○

سُبْحٰنَكَ শব্দের বিবিধ ব্যবহার

سُبْحَانَكَ ঃ শব্দটি কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১. আল্লাহ তাআলা যাবতীয় অসঙ্গত ও মর্যাদাহানীকর বিষয় থেকে পাক-পবিত্র এ অর্থের প্রকাশ ঃ যেমন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ "আল্লাহ পবিত্র ও মহান এবং তারা তাঁর সাথে যা কিছু শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি ঊর্ধে।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৬৮

২. দোয়ার স্থলে ঃ যেমন, دَعْوٰهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ - يونس : ١٠ "সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০

৩. আদেশ জ্ঞাপন ঃ যেমন فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ - الروم : ١٧ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।"–সূরা আর রূম ঃ ১৭

৪. আশ্চার্যান্বিত অবস্থায় কোনো বক্তব্যের অস্বীকার ঃ যেমন, سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ "আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এতো এক গুরুতর অপবাদ।"–সূরা আন নূর ঃ ১৬

এখানে শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতারা একথাই বুঝিয়েছে যে, আপনার সকল কাজে প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা বিদ্যমান। এমন কোনো কাজ নেই যা বিজ্ঞতার বিপরীত। তাই, আমরা যে সন্দেহের প্রকাশ ঘটিয়েছি তা হচ্ছে অজ্ঞানতার ফসল। আমাদের তো ততটুকুই জ্ঞান রয়েছে যতটুকু আপনি দান করেছেন। জ্ঞানের প্রকৃত ভাণ্ডার তো কেবল আপনারই নিকট রয়েছে।

আয়াত ঃ ৩৩

قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ○

আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট অদৃশ্যের পূর্ণ জ্ঞান নেই

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ الاية ঃ আল্লাহ তাআলা পূর্বতন বাক্য ৩০ আয়াত اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ (আমি জানি যা তোমরা জান না)—এ উদ্ধৃতি দিয়ে

একথাটি বলেছেন। প্রথমে কথাটি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল, কিন্তু যখন ফেরেশতাদের নিকট মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হল এবং তারা মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনেও নিল। তখন পূর্বতন বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা একথাটি ব্যক্ত করলেন। তাতে উদ্দেশ্য ছিল, ফেরেশতাদের নিকট যেন একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এ সৃষ্টিজগতে যা কিছু হচ্ছে তাতে নিহিত নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য কেবল তাঁরই পরিজ্ঞাত যিনি এ বিশ্বসৃষ্টির মহান স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। আল্লাহ তাআলার এত নৈকট্যের পাত্র যে ফেরেশতারা তারাও এ সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং আল্লাহ তাআলা অবগত না করালে তারাও অবগত হওয়ার সাধ্য রাখে না। তাই, কোনো কথা, কাজ বা ঘটনা যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাৎপর্যহীন নিরর্থক বোধ হয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাজে আপত্তি করা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ পোষণ করার পরিবর্তে মানুষের জন্য করণীয়, সে নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন তা বুঝতে অক্ষম বলে নিজেকে ধারণা করবে এবং ফেরেশতাদের ন্যায় سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ বলে নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা স্বীকার করে নিবে। কেননা, মহামহিম আল্লাহ তাআলার কোনো কাজ বা কোনো বিধানই তাৎপর্যহীন বা নিরর্থক নয় ; বরং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রয়েছে নিগূঢ় রহস্য ও গভীর তাৎপর্য, তবে তা বুঝতে ফেরেশতারাও সক্ষম নয়, জিনরাও নয়, এমনকি আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জন্যও তা সাধ্যের অতীত।

এরপর আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (আর তোমরা যা প্রকাশ কর তা যেমন জানি, তোমরা যা গোপন করছ তাও তেমনি জানি।)-এর অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের প্রশ্নও বুঝেছি এবং এ প্রশ্নের উৎস কি সে সম্পর্কেও আমি সম্যক অবগত। তোমাদের প্রশ্নের উৎস তো ছিল, তোমরা আদমের খেলাফতের নিগুঢ় রহস্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলে। তাই তোমরা চেয়েছিলে, তোমাদের নিকট তা প্রকাশ করা হোক, এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তোমরা খেলাফতের মন্দ দিকটি তুলে ধরেছিলে, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ্য ছিল এবং তোমরা তা প্রশ্নের আকারে তুলে ধরেছিলে। তোমাদের তাতে উদ্দেশ্য ছিল যেন তোমাদের নিকট এর মঙ্গলের দিকটি তুলে ধরা হয়। আদমের সকল বংশধর প্রত্যক্ষ করানো এবং তাদের নাম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করে আমি তোমাদের এ আগ্রহ পূরণের ব্যবস্থা করেছি। এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা বর্তমান আয়াতটি উল্লেখ করে তাদের প্রতি নিজের মেহেরবানী প্রকাশ করছেন যে, তোমাদের প্রশ্নের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের জবাব প্রদান করা হলো, তোমাদের নিকট পূর্ণ পরিকল্পনাটি পরিস্ফুট করে দেয়া হল। তাই, এতে ফেরেশতাদের তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করা হয়নি, তারা তিরস্কারেরও পাত্র ছিলেন না।

আয়াত ঃ ৩৪

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ط أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ز وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

سـجـدة শব্দের অর্থ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ঃ سـجـدة শব্দটির অর্থ ঝোঁকা। তবে ঝোঁকার বিভিন্ন স্তর রয়েছে ঃ কারো সম্মুখে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশার্থে নত হওয়া, কপাল ও নাক মাটিতে রাখা প্রভৃতি।

সম্মান প্রকাশক সাজদা প্রদানের বিধান

পূর্ববর্তী নবীদের শরীআতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যেও সম্মান প্রকাশক সাজদা প্রদানের অনুমতি ছিল, তবে তাতে নামাযের রুকূ' পরিমাণ ঝোঁকা হতো, এর অধিক নয়। বনী ইসরাঈলে এ ধরনের সাজদার ব্যাপক প্রচলন ছিল, তাওরাতে এ সম্পর্কে যে নির্ধারিত ভঙ্গি আলোচিত হয়েছে তা রুকূ'রই সাদৃশ। ইসলাম এসে এ ধরনের সম্মান প্রকাশক সাজদা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ দীন ও বিধান, তাই এটি পরিপূর্ণ তাতে কোনো ত্রুটি বা আপত্তির অবকাশ নেই। ইসলাম তাই তাওহীদের পরিচিতি সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য সম্মানের এ সাজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সম্মান প্রকাশক বিভিন্ন ভঙ্গিও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, উদ্দেশ্য যেন এর ফাঁক দিয়েও শিরকের অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ না থাকে।

ফেরেশতাদের আদমকে সাজদা করা ঃ বাস্তবতা ও কার্যকারণ

ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলা আদমকে সাজদা করার নির্দেশ প্রদানের মধ্যে শিরকের লেশমাত্র নেই। কেননা, এ সাজদা করার দ্বারা মূলত আল্লাহর আদেশ পালন করা হয়েছে। তাই আদমকে সাজদা করার দ্বারা প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলাকেই সাজদা করা হয়েছে। তাছাড়া সাজদাকে শিরকের নিদর্শন ঘোষণা করেছে ইসলাম, ইসলামপূর্ব সকল ধর্মে তা নিছক সম্মান প্রকাশের একটি রীতি বৈ আর কিছু ছিল না। তাই, আদমকে সাজদা কর কথাটির অর্ত দাঁড়াবে—আদমকে সম্মান কর।

ফেরেশতাদেরকে আদমকে সাজদা করার নির্দেশ কেন প্রদান করা হলো ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, এ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের আনুগত্যের এক পরীক্ষা। পরীক্ষা তো ঐ বিষয়েই নেয়া হয় যা পরীক্ষার্থীর নিকট কষ্টকর বা বিরক্তিকর। যেহেতু ফেরেশতাদের আলো দ্বারা সৃজন করা হয়েছে, আর তাদেরকে কেবল আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মাটির তৈরী আদমকে সাজদা করার নির্দেশ তাদের জন্য এক বড় পরীক্ষা বটে। কিন্তু ফেরেশতারা এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আলো আর আগুন এগুলো সম্মান ও মর্যাদার কোনো মাপকাঠি নয়, বরং সৃষ্টিকর্তার যে কোনো আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়াই হচ্ছে মর্যাদাপ্রাপ্তির মূল চাবিকাঠি। ফলে তারা এ কঠিন পরীক্ষায় পুরোপুরি উৎরে যায়।

www.pathagar.com

যদিও ফেরেশতাদের সাজদা আদায় করার মাধ্যমে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, কিন্তু মূলত এ আদেশ প্রদান আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের নিমিত্তে ছিল না, বরং ফেরেশতাদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর বহিঃপ্রকাশ ছিল এর মূল প্রতিপাদ্য। এর দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়াই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমাবরদার সে কখনো জাত্যাভিমানের শিকার হয়ে শয়তানের ন্যায় অহংকার করে না, বরং সকল কিছু ও সকল পরিস্থিতিই সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে গণ্য করে আল্লাহর সমীপে নত হয়, তার এ উপলব্ধি প্রতারণা ও অহংকারের পরিবর্তে তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে দেয়।

বনী ইসরাঈলের জন্য এক অমোঘ শিক্ষা

এ আলোচনা বনী ইসরাঈলের জন্য এক মহামূল্যবান অমোঘ শিক্ষা। ফেরেশতারা হযরত আদম (আ)-কে সাজদা করার নির্দেশ যেরূপ বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছে, বনী ইসরাঈলেরও তেমনি উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে শেষ নবী হিসেবে আপত্তিহীনভাবে মেনে নেয়া উচিত। তা না করে তারা শয়তানের অনুসরণ করে বংশীয় মর্যাদার বড়াই ও মিথ্যা অহমিকায় পড়ে আছে।

আদমকে সেজদা করার নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্য

যারা বলেন, আদম (আ)-কে সাজদা করার ফেরেশতাদের প্রতি যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা তাঁর জ্ঞানের মর্যাদা দানের জন্য। আমার ধারণায় তাদের এ বক্তব্যের পিছনে তেমন জোরালো কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই। নিজের বংশধরের নাম আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেয়ায় তিনি যেমন জানতে পেরেছেন, তাঁর জানানোর দ্বারা ফেরেশতারাও তেমনি অবগত হতে পেরেছেন। তাতে এমন কি শ্রেষ্ঠত্বের দিক রয়েছে যে কারণে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হবে আদমকে সাজদা করার জন্য ? তা ছাড়া, একথারও কোনো মযবুত দলিল নেই যে, ফেরেশতাদেরকে এ নির্দেশ নাম শেখানোর পরই প্রদান করা হয়েছে। যদিও এখানে নাম শেখানোর আলোচনার পর সাজদা প্রদানের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু এতটুকু কথাই একথার দলিল হিসেবে যথেষ্ট নয় যে, প্রথমটির ফলশ্রুতি হচ্ছে দ্বিতীয়টি। কেননা, সাজদার আলোচনার সূচনা করা হয়েছে اِذْ শব্দের দ্বারা, যা এ বিষয়টির স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়ার পক্ষে মযবুত এক দলিল। তা ছাড়া কুরআনে কারীমের অন্যত্র এ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই কেবল নয়, বরং আদমের সৃষ্টিরও পূর্বে এ সাজদার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

www.pathagar.com

"এবং স্মরণ কর সেই সময়, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করছি, যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদায় অবনত হবে। তখন ফেরেশতাগণ সকলে একত্রে সাজদা করল। কিন্তু ইবলিস করল না, সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।"

–সূরা আল হিজর ঃ ২৮-৩১

আরো অনেক আয়াতে এ বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফেরেশতাদের সাজদা করার নির্দেশ আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বে দেয়া হয়েছে। এবং সেই সাথে একথাও বুঝে আসে যে, ফেরেশতাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। এ উদ্দেশ্যেই এখানে ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটির দ্বারা আদমকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যেন ফেরেশতাদের নিকট পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যে, পরীক্ষা যে বিষয়ের নেয়া হয় তা সাধারণভাবেই কষ্টকর অনুভূত হয়। ফেরেশতাদের জন্য এটা বড়ই কষ্টদায়ক। বিষয় যে, তারা নূরের তৈরি হওয়া সত্ত্বেও ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটির তৈরি আদমকে তারা সাজদা করবে। কিন্তু তারা বেশ ভালোভাবেই জানত যে, ইয্‌যত ও সম্মান আগুন আর মাটিতে নয়, বরং আল্লাহর হুকুম পালন করার মধ্যেই তা নিহিত। তাই পরীক্ষা যতই কঠিন হোক না কেন, তারা তাতে উত্তীর্ণ হয়ে গেল, শয়তান মিথ্যা অহমিকার শিকার হয়ে অকৃতকার্য রয়ে গেল।

কারো অন্তরে এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, আদম (আ)-কে সাজদা করার নির্দেশ তো তাঁর সৃষ্টির আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। তার উত্তরে বলা হবে, যদিও কোথাও কোথাও এ ধারাতে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তাতেই এ ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে গভীর মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, এখানে আল্লাহ মানুষকে যে সকল নেয়ামত প্রদান করেছেন তার বর্ণনা উদ্দেশ্য। একটি অপরটির পরে সংঘটিত হয়েছে—একথা বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়।

اِبْلِيْس শব্দের বিশ্লেষণ

اِلاَّ اِبْلِيْسَ ঃ اِبْلِيْسَ শব্দটি اَبْلَسَ থেকে اِفْعِيْل ওজনে গঠিত হয়েছে اِبْلِيْسْ -এর অর্থ চিন্তামগ্ন হওয়া অস্বীকার করা এবং নিরাশ ও হতাশ হওয়া। اِبْلِيْس মূলত একটি জিনের নাম। যে আদম (আ)-কে সাজদা করতে অস্বীকার করেছিল। কুরআন মজীদে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ "এবং সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সাজদা কর তখন তারা সকলেই সাজদা করল ইবলীস ছাড়া, সে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল।"–সূরা কাহাফ ঃ ৫০

www.pathagar.com

কুরআন শরীফে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন তিন ধরনের সৃষ্টির কথা আলোচনা করা হয়েছে ঃ ১. ফেরেশতা, ২. জিন ও ৩. মানুষ। শয়তান স্বতন্ত্র কোনো সৃষ্টি নয়। বরং মানুষ ও জিন জাতির মধ্য থেকে যারাই আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা ও নাফরমানী করে, তাদেরকেই শয়তানের শিষ্য, চেলা বা বংশধর বলা হয়। এরা জন্মগতভাবে অবাধ্য নয় ; অবাধ্যতার স্বভাব দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং সমগ্র মানবজাতি ও জিনদেরকে যে স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যসহ সৃষ্টি করা হয়েছে এরাও সেই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা জিন ও মানুষকে স্বাধীনতার নেয়ামত দান করেছেন তাই তারা ভালো-মন্দ যে কোনো পথ বেছে নিতে পারে। এ অধিকার কাজে লাগিয়ে যারা মন্দ ও গোমরাহীকে নিজের জন্য বেছে নেয়, আল্লাহও তাকে সে পথেই চলার সুযোগ ও অবকাশ দান করেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যথাস্থানে তা আলোচনা করা হবে।

এক আপত্তির জবাব

এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। তা হল, আদমকে সাজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, জিন জাতিকে তো এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর ইবলিস যেহেতু জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই সে তো এ নির্দেশের আওতায়ই আসেনি। তাহলে সে সাজদা না করায় অভিশাপের পাত্রই বা হবে কেন ? এর উত্তর হচ্ছে, জিন ও ফেরশতাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কেবল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর, সৃষ্টিগতভাবে এ দুটিতে কোনোই দূরত্ব নেই, বরং অত্যধিক নৈকট্য বিদ্যমান। ফেরেশতারা আলো থেকে এবং জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্ট। তাই, এ আদেশের আওতায় ফেরশেতার সাথে জিনও অন্তর্ভুক্ত ছিল তবে তাদের বিভ্রান্ত সদস্য ইবলিস সাজদা করতে অস্বীকার করলো। পূর্বতন অনেক আলেমই এ মতটি ব্যক্ত করেছেন এবং আমার নিকট এ মতটিই তুলনামূলকভাবে অধিক মযবুত ও দৃঢ় বলে প্রতীয়মান হয়।[১]

আয়াত ঃ ৩৫

وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১. আল্লামা কাযী বায়জাভী (র) এ সম্পর্কে লিখেছেন অথবা জিনরাও আদম (আ)-কে সাজদা করার নির্দেশে ফেরেশতাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ফেরেশতার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করায় আর ইবলিসের উল্লেখ করার আবশ্যকতা বোধ করা হয়নি। কেননা, যারা মর্যাদাবান তাদেরকে যদি কোনো নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাহলে মর্যাদায় তার চেয়ে যে ছোট সে তো অবশ্যই এ নির্দেশের আওতায় আসবে। তাই ।سجدو শব্দটিতে তারা বলে ফেরেশতা ও জিন উভয় সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

اَلشَّجَرَةَ বলে কি বুঝানো হয়েছে

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ঃ যেহেতু শব্দটির পূর্বে ال এসেছে (ال এলে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়) তাই اَلشَّجَرَةَ শব্দটির অর্থ হবে 'নির্দিষ্ট একটি গাছ'। তাই, একথা প্রতীয়মান হয় যে, হযর আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে নির্দিষ্টভাবে সে গাছটি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয় 'এটা কি গাছ ছিল ?' এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন মজীদের কোথাও বলা হয়নি, হাদীসেও এর কোনো বর্ণনা নেই। তাই এ প্রশ্নের জবাব জানতে চাওয়া নিরর্থক প্রয়াশ বৈ আর কিছু নয়। তাই আমাদের মতে এ সম্পর্কে সহীহ্ মত হচ্ছে ইবনে জারীর (র) যা বলেছেন—"আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারি না কেননা, এটি কি গাছ ছিল ? সে সম্পর্কে আমাদের নিকট কোনো দলিল প্রমাণ নেই। কুরআনেও নেই, হাদীসেও নেই তথাপি যারা এ সম্পর্কে কিছু বলে তারা কিসের ভিত্তিতে তা বলে ?"

আমাদের মতে, এটি কি গাছ তা জানার কোনো প্রয়োজনও নেই, এখানে কুরআন মূল যে বিষয়টি বিবৃত করেছে তা হল, আদমকে সাজদা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা যেমন ফেরেশতা ও জিন জাতির আনুগত্যের পরীক্ষা নিয়েছেন, তেমনিভাবে আদম ও হাওয়া (আ)-কে সুনির্দিষ্ট একটি গাছ দেখিয়ে তা হারাম ঘোষণা করে তাঁদের পরীক্ষা নিয়েছেন। হাজারো গাছ-গাছালিতে ভরপুর জান্নাতের কেবল একটি গাছ থেকে উপকৃত হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু মানব চরিত্র এতটাই অদ্ভূত, যা তাকে নিষেধ করা হয় সেদিকেই সে অধিক আকৃষ্ট হয়। ইবলিস মানুষের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বুঝাতে শুরু করে যে, চিরস্থায়ী এবং অন্তহীন জীবনলাভের একমাত্র উপকরণ হচ্ছে এ বৃক্ষজাত ফল। অথচ তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। আদম (আ) শয়তানের এ প্ররোচনায় আটকা পড়ে গেলেন এবং ঐ গাছের ফল খেয়ে বসলেন। কিন্তু তিনি এ অন্যায় করে ফেলার পর তাতে হটকারিতার পরিচয় দেননি, বরং লজ্জিত হয়ে তিনি তাওবা করেন।

আমাদের পার্থিব জীবনেও এ একই অবস্থা বিরাজ করছে। অল্প কিছু জিনিস ছাড়া এ পৃথিবীর সকল কিছুই আমাদের জন্য বৈধ। কিন্তু আমাদের অনেকেরই অবস্থা হল এই যে, শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ঐ নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকেই মনে করে সব ধরনের উন্নতি ও সফলতার মূল চাবিকাঠি, আরো আশ্চর্যজনক অবস্থা, তারা অবাধ্যতার পর আদিপুরুষ আদম (আ)-এর ন্যায় তাওবা করার পরিবর্তে ঐ অন্যায় কাজেই লেগে থাকে।

তাওরাতে এ গাছটিকে ভালো ও মন্দের পরিচয়বৃক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কথাটি আকষর্ণীয় হলেও আমাদের মতে তা সঠিক নয়। হয়তো তাওরাতের অনুসারীরা প্রথমে একথাটি ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লেখ করেছে, যেহেতু এ গাছের ফল খাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েন। তাই তারা কথাটি প্রথমে ব্যাখ্যা হিসাবে বলার পর আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ার সুবাদে তা রদবদলের চোরাগুপ্তা পথে মূল বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। কুরআন মজীদে যদিও একথার উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ

www.pathagar.com

গাছের ফল খাওয়ার পর তাদের পরিধানের পোশাক খুলে পড়ে যায়, কিন্তু কোথাও একথার কোনো ইঙ্গিত প্রদান করেনি যে, পোশাকহীন অবস্থা হতেই তাদের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে আসে। বরং একথা বুঝিয়েছে যে, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিজেদের প্রতি যে যুলুম করেছে তার ফলশ্রুতিতেই তাঁরা জান্নাতী পোশাক থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

যদি আদম (আ) জান্নাতের ঐ গাছটির ফল খাওয়ার পূর্বে এতই বোধহীন থাকেন যে, তাঁর লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য যেটুকু অনুভূতি ও উপলব্ধি থাকা আবশ্যক ততটুকুও ছিল না, তাহলে সে সময়ে তার কিভাবে পরীক্ষা নেয়া হবে ? বিশেষত ইবলিসের ন্যায় এত চতুর শত্রুর দ্বারা পরীক্ষা নেয়া তো একেবারেই বিবেক বিরুদ্ধ কথা। তাই শয়তানের প্ররোচনাকালে ভালোমন্দ পার্থক্য করতে পারেন, এ পরীক্ষা গ্রহণকালে তাঁর অন্তত এতটুক জ্ঞান বুদ্ধি থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদি সে সময় তাঁর এতটুকু জ্ঞানবুদ্ধিও না থাকে, তাহলে এহেন আবস্থায় তাঁর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অথচ এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে শয়তানের মোকাবেলা করতে বলা এবং তা না করে ভুল করার দরুন তাঁকে পাকড়াও করা খোদায়ী ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

আয়াত ঃ ৩৬

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

اهْبِطُوْا সম্বোধনটি কাদের প্রতি ?

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ঃ اهْبِطُوْا তোমরা নিচে নেমে যাও। এ সম্বোধন কাদের উদ্দেশ্যে, সে সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যা। ১. ইবনে আব্বাস (রা) ও আরো কতক তাফসীরবিদের মতে, আদম ও হাওয়া (আ) এবং ইবলিসের উদ্দেশ্যে এবং ২. ইবনে যায়েদের মতে, আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের বংশধর। আমাদের নিকট ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতটি সঠিক নিম্নোক্ত কারণে ঃ ১. এখানে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা একে অপরের শত্রু', আর স্বাভাবিকভাবে আদম ও ইবলিসের মধ্যেই শত্রুতা বিদ্যমান, আদম ও হাওয়ার মাঝে নয়। আদম ও হাওয়ার মাঝে তো স্বাভাবিকভাবে যে সম্পর্ক বিরাজমান তা প্রেমপ্রীতি ও ভালভাসার। এমনিভাবে আদমের বংশধরের মধ্যেও শত্রুতা নয়, বরং সহজাত ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিরাজ করছে। যদি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও দুশমনি কখনো পরিদৃষ্ট হয় তবে তা শয়তানেরই প্রচেষ্টায় এবং তা শয়তানের দ্বারাই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। নতুবা মানুষের নিজেদের মাঝে দুশমনি জিইয়ে রাখার তেমন কোনো যোগ্যতা নেই বললেই চলে।

www.pathagar.com

শয়তান ও আদমের মাঝে যে সহজাত শত্রুতা বিদ্যমান, তা কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃতও হয়েছে ঃ

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ - طه : ١١٧

"আমি বললাম, নিশ্চয় শয়তান তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু। তাই সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৭

অপর আয়াতে রয়েছে ঃ

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ - الكهف : ٥٠

"তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলে ? অথচ সে তোমাদের শত্রু।"–সূরা কাহাফ ঃ ৫০

মানবজাতি ও শয়তানের মাঝে স্বাভাবিক সম্পর্ক

১. যদিও দৃশ্যত বহু মানবসন্তান শয়তানের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু তার কারণ এটি নয় যে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক বন্ধুত্বেও আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বরং তাদের মধ্যে সম্পর্ক তো শত্রুতারই, এবং শত্রুতার সম্পর্কই থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেকেই মূর্খতা ও অপরিণামদর্শিতার দরুন শত্রুকেই বন্ধু মনে করে তাকে আত্মিকভাবে গ্রহণ করে এবং তার নির্দেশে পরিচালিত হয়ে নিজের চরম ক্ষতিসাধন করে।

২. কুরআন মজীদের অন্যত্র বিভিন্ন সূরায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে ইবলিসকেও হুবহু এই ভাষাতেই এ নির্দেশ প্রদান করা হয়। যেমন ঃ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ "আল্লাহ তাআলা বললেন, তুই বের হয়ে যা, তোর কোনোই অধিকার নেই যে, তুই এখানে অহংকার প্রকাশ করবি, তুই বেরো নিশ্চয়ই তুই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবি।"
–সূরা আল আরাফ ঃ ১৩

৩. কুরআনের কোনো কোনো স্থানে এ শব্দের সাথে جَمِيْعًا (সকলে) শব্দটি তাকীদ হিসেবে এসেছে। যেমন قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا "তোমরা দুজন একই সাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ১২৩ যদি এ সম্বোধন আদম ও হাওয়া (আ)-এর প্রতি করা হয় তাহলে جَمِيْعًا শব্দটি তেমন আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয় না। আর যদি শব্দটির কার্যকারিতা ও আবশ্যকতা প্রকাশ করার জন্য সেই সাথে তাদের বংশধরকেও গণ্য করা হয় তাহলে তা অর্থহীন বাগাড়ম্বর বৈ আর কিছু নয়। কেননা, তাঁদের বংশধর সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে কথাটি আলোচিত হয়েছে তাহলো, তাদের থেকে মহান আল্লাহ তাআলার প্রতিপালক ও রব হওয়ার স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা আদম (আ) ও ফেরেশতাদের সামনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একথা মোটেই কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণ

www.pathagar.com

করা যাবে না যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর সাথে জান্নাতে তাঁদের বংশধররাও বসবাস করত এবং পিতার অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকেও জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

এ পর্যায়ে যে কথাটি উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে, কুরআন শরীফে এ আলোচনাকালে দ্বিবচনের শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে, যদ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিচে নেমে যাওয়ার নির্দেশ কেবল আদম ও হাওয়া (আ)-এর প্রতি আরোপিত, তাতে ইবলিস অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এ দলিলটি আমাদের দৃষ্টিতে মজবুত কোনো দলিল নয়। যদিও কুরআন শরীফে দ্বিবচনের শব্দ এসেছে। যেমন ঃ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝ - طه : ١٢٣ "তোমরা উভয়ে একই সাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। পরে তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে পথহারা হবে না এবং দুঃখ কষ্টও পাবে না।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ১২৩

কিন্তু এ দ্বিবচন হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং পূর্বাপর লক্ষ করলে বুঝা যায় যে, এখানে আদম ও ইবলিসকে দুই দল অভিধায় দ্বিবচনের সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ এলে তা পালন করার যে উপকারিতা বর্ণনা হয়েছে তা মানুষের জন্য যেমন উপকারী জিন জাতির জন্যও তা সেইরূপ উপকারই বটে।

আয়াত ঃ ৩৭

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

تَوْبَه শব্দের অর্থ

تَوْبَه শব্দের অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন। যখন এরপর عَلٰى শব্দটি আসে তখন অর্থের মাঝে বৃদ্ধি সাধিত হয়ে অর্থ হয়, করুণাসহ প্রত্যাবর্তন।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ : تَلَقّٰى শব্দের দ্বারা একথা প্রতিভাত হয় যে, তাওবার শব্দমালা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়। কুরআনের অন্যত্র সে শব্দমালার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سكة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ : الاعراف : ٢٣ "তারা উভয়েই দোয়া করল, হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম ও অবিচার করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৩

www.pathagar.com

তাওবা সম্পর্কে আল্লাহর রীতি

তাওবা করার জন্য আদম (আ)-এর অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে তাওবার শব্দমালা ঢুকিয়ে দেয়ার দ্বারা তাওবা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার মহান রীতির সন্ধান দেয়। তা হচ্ছে, যখন বান্দা কোনো গোনাহ করে বসে, তখন লজ্জা, সংকোচ ও আল্লাহর দরবারে ফিরে আসার জন্য তার অন্তরে এক অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়, তার এ অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা তার স্বভাবেরই একটি বৈশিষ্ট্য, বার বার গোনাহ করে সে অস্থিরভাব এবং লজ্জা-সংকোচ বিলীন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে এ অস্থিরতা বহাল থাকে। এ অস্থিরতা সৃষ্টির দরুন আল্লাহর দরবারে ফিরে আসার জন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন নফসে লাওয়ামাহ—অনুশোচনাকারী ও তিরস্কারকারী অন্তর। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আয়াত ঃ ৩৮

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ঃ একথাটি দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। একবার আদম (আ) ভুল করে ফেলার পর, দ্বিতীয়বার তাঁর তাওবা কবুল হওয়ার পর। ভুল করার পর বলা হয়েছে তার ফল ও পরিণাম হিসেবে। দ্বিতীয়বার তাওবার পর বলা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে। তাই এ দফা বলার অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলা এখন তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাচ্ছেন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তাহলে তোমাদের ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য-সূচিত হবে। যে এ পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হবে সে হবে জান্নাতের অধিকারী, কিন্তু যে অকৃতকার্য হবে সে হবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

নবুওয়াতের ধারা প্রবর্তনের প্রথম অঙ্গীকার

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ঃ আদম (আ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নবুওয়াতের ধারা প্রবর্তন করার প্রথম অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হল। আদম (আ)-এর ভুলের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মানবীয় চরিত্রে ও জ্ঞানবুদ্ধিতে যে দুর্বলতা ও অপরিপক্কতা রয়েছে তার প্রতিবিধান হিসেবে আল্লাহ তাআলার অহী এবং নবী-রাসূলদের সাহায্য-সহায়তা অত্যাবশ্যক। তাই মানবীয় দুর্বলতার প্রতি লক্ষ করে মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে সান্ত্বনা ও প্রবোধদানের জন্য এ ওয়াদা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি এক আলো পাঠাবেন, যে এ আলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং তা মূল্যায়ণ করবে তার কোনো ভয়ভীতি বা দুশ্চিন্তা কিছুই থাকবে না।

'তার কোনো ভয় থাকবে না এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'—একথার দ্বারা কুরআন শরীফ জান্নাত বুঝিয়েছে। একথাটুকুর প্রতি মনোনিবেশ করলে দেখা যায়, কথাটি খুবই ব্যাপক। কেননা, আগত কোনো ক্ষতির আশংকায় অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং অতীত

www.pathagar.com

বা বর্তমান কোনো সমস্যার দরুন অন্তরে দুশ্চিন্তা জাগে। একথা বলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জানিয়ে দিলেন জান্নাতেই কেবল এমন স্থান যেখানে ভবিষ্যতের কোনো বিপদের ভয় থাকবে না এবং অতীত বর্তমানের কোনো সমস্যায় পীড়িত হতে হবে না।

আয়াত ঃ ৩৯

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে।"–আয়াত ৩৯

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ঃ এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের বিপরীত বক্তব্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী আয়াতে যারা নাযিলকৃত হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের প্রতিদান আলোচনা করা হয়েছে এবং এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের শাস্তি সম্পর্কে।

اية শব্দের বিশ্লেষণ

ايات ঃ শব্দটি اية-এর বহুবচন। اية শব্দের মূল অর্থ নিদর্শন, চিহ্ন ইত্যাদি। কুরআন শরীফে শব্দটি দলিল প্রমাণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আকাশ, পৃথিবী, নভোমণ্ডল ও মানবজাতি এ সবই আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন ও দলিল। এগুলো আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা, তার তাওহীদ ও একত্ব, তাঁর শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের বিধি-বিধান ইত্যাদি সকল কিছুর সাক্ষ্য প্রদান করে। তাই এগুলোকে কুরআনে اية বলা হয়েছে।

নবী-রাসূলগণ যে সকল মু'জিযা প্রদর্শন করেছেন তাদের কাছে কাফেররা দাবী জানানোর প্রেক্ষিতে অথবা এমনিতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকেও اية বলে অভিহিত করা হয়।

আয়াত শব্দটি কুরআনে কারিমের ঐ অংশগুলোকেও বলা হয় যা দ্বারা সূরা গঠিত হয়। কুরআনের আয়াতের জন্য শব্দটির ব্যবহার এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, কুরআনের কোনো একটি কথাও দলিলহীন, ভিত্তিহীন নয়, বরং প্রত্যেকটি আয়াত হচ্ছে দলিল ও প্রমাণ, তা আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলী ও বিভিন্ন ক্ষমতা প্রকাশ করে।

২৫. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা (৩০-৩৯)

এ আয়াতগুলোতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে অধিকাংশই পূর্ববর্তী বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি। সে আলোচনাই পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সেই সাথে এ আয়াতগুলোতে এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে যা ইসলামী সমাজ দর্শন ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

এ জগতে মানুষের সত্যিকার মর্যাদা ও অবস্থান কি ? সে কি স্বাধীন স্বেচ্ছাচার না কারো অধীন ? তার কি কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে ? সে কি নিজের ইচ্ছামাফিক যখন যা মনে চায় তাই করতে পারে, না সে অপারগ-অক্ষম ? তাকে কি এখানে কেউ পাঠিয়েছে না সে স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়ে গেছে ? সে কি একক সত্তার অধিকারী না তার কোনো সামাজিক অবস্থান ও কর্তব্য রয়েছে ? সঠিক পথে চলার জন্য কি তার জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট না এর অধিক কোনো উর্ধতন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজনও রয়েছে ? এ বিশ্বের অন্য সকল বস্তুর সাথেই বা তার কি সম্পর্ক ? সে কি সৃষ্টিগতভাবে ভালো না মন্দ ? তার মাঝে যে দোষ-ত্রুটি পাওয়া যায় সেগুলোরই বা উৎস কি ? এ ধরনের বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর এ আয়াতগুলোতে নিহিত রয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

খেলাফত ও তার দায়-দায়িত্ব

প্রথমেই যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো, মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। 'খেলাফত' শব্দটির প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, তার কিছু আনুসঙ্গিক দায়িত্ব রয়েছে যেগুলো পূর্ণ করা ছাড়া খেলাফত পরিপূর্ণ হয় না। সে দায়িত্বগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষকে নির্দিষ্ট একটি সীমারেখার আওতায় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এর কারণ, যে মহান সত্তা স্বয়ং সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন, যিনি সব ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগে সদা সর্বদা সক্ষম, যিনি কারো সাহায্য সহযোগিতা লাভের মুখাপেক্ষী নন, আপন রাজত্ব থেকে যার ক্ষণকালের জন্যও অনুপস্থিত থাকা বা অবসর গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না, তাঁর পক্ষ থেকে কাউকে খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগের অর্থ তো এটিই যে, তিনি তাঁর খলীফাকে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে এ পরীক্ষা নেন যে, সে এ ক্ষমতা পাওয়ার পর তা কিভাবে ব্যবহার করে ? সে কি তার মূল মনিবের মর্জির প্রতি লক্ষ্য রেখে চলে না নিজের খুশিমত চলে ?

২. মানুষ যেহেতু খলীফা ও প্রতিনিধি, তাই তার খলীফা হওয়ার দাবী ও চাহিদা এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে যে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করা হবে তার নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকবে এবং তাকে একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হবে যে, তাকে কোন্ কোন্ বিষয়ে মূল সত্তার মর্জি মেনে চলতে হবে এবং কোনো বিষয়ে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে সে চলবে। অন্যভাবে কথাটি এভাবে বলা যায়, খেলাফত ও নায়েব বানানোর চাহিদাই হচ্ছে এই যে, মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীআত নাযিল করা হবে।

৩. যেহেতু মানুষ আল্লাহর খলীফা, তাই সে সেচ্ছাচারী এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে না, এরূপ ধারণা অমূলক ও ভ্রান্ত। যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী, জ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা তিনি অবশ্যই তাঁর খলীফাকে লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় ছেড়ে দিবেন না। তিনি

নিশ্চয়ই তাঁর খলীফা ভুল-ত্রুটি করলে তার প্রত্যেকটি ভুল যেমন ধরবেন, তেমনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে তার পরিপূর্ণ প্রতিদানও তাকে দিবেন।

৪. খেলাফতের মৌলিক চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য এই যে, যে খলীফা হবে তাকে কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। যদিও সৃষ্টিগতভাবে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এই দায়িত্ব বিস্তৃত, কিন্তু মূলত যারা খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে তারাই কেবল খলীফা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে বা যারা এর বিপরীত আচরণ করবে তাদেরকে খলীফা বলা হবে না, বরং তারা বিদ্রোহী গাদ্দার বলে চিহ্নিত হবে।

৫. এ দায়িত্বভার তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও বটে। সমগ্র মানবসমাজ বা অন্ততপক্ষে যে সকল লোক খেলাফতের দায়িত্বভার স্বীকার করে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্বও পালন করতে হবে, সেই সাথে সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য এক সুশৃংখল নিয়মনীতি ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করবে। কেননা, নিয়মনীতি ও শৃংখলা ছাড়া খেলাফতের সকল দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না।

৬. খেলাফত মঙ্গল ও কল্যাণবাহী হবে যদি তা খলীফা নিয়োগকারী মহান স্রষ্টার নির্দেশ মত পরিচলিত হয়। কিন্তু তা না করে যদি নিজেদের মর্জি মোতাবেক সকলে চলতে ও চালাতে শুরু করে তবে তার পরিণতিতে নেমে আসবে বিপর্যয় ও ধ্বংস, বিশৃংখলা ও রক্তপাত।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এখানে প্রতিভাত হয়ে উঠে তা হল, মানুষকে যখন আল্লাহ তাআলা এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যে, ফেরেশতারা তাকে সাজদা করেছে এবং ইবলিস তাকে সাজদা না করার দরুন অভিশপ্ত হয়েছে, তখন তার জন্য এটি মোটেই যথাযথ নয় যে, সে কোনো ফেরেশতা বা জিনকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করবে এবং তার পূজা-অর্চনা করবে। মানুষ যেরূপ আল্লাহর সমীপে অক্ষম ও অপারগ তেমনি জিন ও ফেরেশতাও অপারগ-অক্ষম। তাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তাদের নিজেদের ক্ষমতাবলে অর্জিত নয় ; বরং আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত। যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন তাহলে মানুষ ফেরেশতা ও জিনের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। তাই ইবাদাতের একমাত্র হকদার হলেন আল্লাহ তাআলা। যদি মানুষ তাঁর সাথে জিন বা ফেরেশতারও ইবাদাত করে তবে কেবল আল্লাহর সম্মানহানি করা হয় না, বরং নিজের মানহানি করা হয়ে থাকে।

গোনাহ ও অন্যায়ের উৎস

তৃতীয় যে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠে তাহলো, মানুষ তার জন্মগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কোনো অন্যায়কারী বা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে অত্যন্ত যোগ্য করে উত্তম গুণাবলীর ধারক বাহক করে সৃষ্টি করেছেন। সে যদি গোনাহ

www.pathagar.com

করে তবে তা এজন্য নয় যে, সে জন্মগতভাবে গোনাহগার, অন্যায় আচরণকারী বরং তার গোনাহ করার কারণ হচ্ছে, সে স্বাধীনতার নেয়ামতটিকে ভ্রান্ত পদ্ধতিতে কাজে লাগিয়ে সমূহ বিপদ ও ঝামেলায় নিপতিত হয় এবং ঝামেলায় তাকে ফেলে দেয় শয়তান। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে ব্যাপক অধিকার প্রদান করেছেন তার সাথে কিছু বিধিনিষেধও জারী করেছেন। শয়তান সে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি প্ররোচিত করতে থাকে এবং বলতে থাকে, এগুলোই তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-ফূর্তির উপকরণ। তাই যদি সে হিম্মত করে এ খোদায়ী নিষেধ অমান্য করতে পারে তাহলেই যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ-ফূর্তি ও আরাম আয়েশ তার হাতের মুঠিতে এসে পড়বে। যেহেতু মানুষ শয়তানের এই কুপরামর্শের নগদ ফল দেখতে পায় তাই তার প্ররোচনায় পড়ে উত্তম গুণাবলী ও কার্যাদি পরিত্যাগ করে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এ গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাওবা ও সংশোধনের দরোজা খুলে দিয়েছেন। আদম (আ)-এরও ভুল হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাওবা করেন। আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এরপর তিনি যে আদম (আ)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা শাস্তি স্বরূপ নয় ; বরং তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য যে, শয়তানের মুকাবিলায় সে তার গুণাবলীর উত্তম পরিচয় দেবে এবং যে জান্নাত থেকে তাঁকে বিদায় দেয়া হয়েছে তাতে পুনরায় সে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

কুরআনের এ বর্ণনার দ্বারা খৃস্টানদের মানুষ সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারা বলে, মানুষ জন্মগতভাবে গোনাহগার আর তাই সবাই যে গোনাহ করে হযরত ঈসা (আ) তার কাফ্ফারা আদায় করে গেছেন। কুরআন তাদের এ সমূদয় আকীদাকে ভ্রান্তি আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আল্লাহ তাআলার প্রতিটি কাজে নিগূঢ় রহস্য নিহিত

চতুর্থ যে বিষয়টি বুঝে আসে তাহলো, আল্লাহর প্রতিটি বিধান ও কর্মে অনেক গুপ্ত জ্ঞান ও রহস্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং যে পর্যন্ত তা কাউকে অবহিত না করেন সে পর্যন্ত তা কারো গতির আওতায় আসে না। এ অবস্থায় মানুষের জন্য করণীয়, সে আল্লাহর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় তত্ত্ব তালাশ ও অন্বেষণে যথাসাধ্য প্রয়াস চালাবে। কিন্তু যদি তা তার বুঝে না আসে তাহলে তাতে আপত্তি করে বসবে না। বরং সে বিষয়ে সে এ সুধারণা পোষণ করবে যে, নিশ্চয় তাতে কোনো না কোনো উপকার ও কল্যাণ নিহিত আছে, কিন্তু আমার জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন তা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছি না। এ দৃষ্টিভঙ্গী রাখলেই তার পক্ষে ঈমান ও ইসলাম বহাল রাখা সম্ভবপর হবে। এ ধারা হচ্ছে ফেরেশতাদের ধারা। আর যারা নিজেদের অতি সীমিত জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর অসীম জ্ঞান মাপতে বসে যায় তারা এমন অহংবোধ ও ঔদ্ধত্যের শিকার হয়ে যায় যেমনটা হয়েছিল ইবলিস। এ ধরনের লোকের জন্য ঈমান ও ইসলামের পথ তো খুলেই না বরং খোলা পথ বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আদম ও ইবলিসের গোনাহে পার্থক্য

পঞ্চম যে বিষয়টি আমাদের বুঝে আসে তা হলো, দৃঢ়তার অভাবে যে গোনাহ সংঘটিত হয়ে যায় আর হিংসা ও অহংকারের ভিত্তিতে যে গোনাহ হয় এ দুটোর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। আন্তরিক দৃঢ়তার অভাবে গোনাহ হলে তারপর তাওবা ও সংশোধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, এ ধরনের লোক যদি গোনাহে গা ভাসিয়ে না দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ রক্ষা করেন, তাকে সরল পথের দিশা দান করেন। এর বিপরীতে যারা হিংসা ও আহংবোধের দরুন গোনাহে রত হয় তাদের এ রোগ বড় দূরারোগ্য ও কঠিন, এ ধরনের লোক সংশোধনের পরিবর্তে তাদের নেতা ইবলিসের পথ ধরে চলতে থাকে এবং সে পথেই তার মৃত্যু হয়। আদম (আ) ছিলেন প্রথম পর্যায়ের, তাই তাঁর তাওবা ও সংশোধনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, আর ইবলিস ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাই তার ভাগ্যে জুটেছে অভিশাপ ও লানত।

নবুওয়াত ও রেসালাতের প্রয়োজনীয়তা

ষষ্ঠ যে বিষয়টি বুঝে আসে তাহলো, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে সুযোগ দিয়েছেন, সে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এভাবে মানুষকে তিনি কঠিন এক পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন। তাই তিনি তার বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন, মানুষকে তাঁর হেদায়াত ও সংশোধনের বিষয়ে স্রেফ তার জ্ঞান-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেননি। বরং তার স্বভাবকে জাগ্রত রাখা এবং তার জ্ঞানবুদ্ধিকে বক্রতা থেকে হেফাজত করার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। ফলে যে হেদায়াতের পথে চলতে আগ্রহী সে সম্যক অবগতির সাথে তা গ্রহণ করতে পারে, আর যে এরপরও বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকতে চায় তার বিপক্ষে দলিল প্রদান পূর্ণ হয়ে যায়। নবুওয়াত ও রেসলাতের মূল উদ্দেশ্য এটিই এবং দুনিয়ার এ পরীক্ষা কেন্দ্রে মানুষের জন্য সান্ত্বনা ও প্রবোধ মূলত নবীর শিক্ষা। যদি তার নিকট থেকে এ শিক্ষা ছিনিয়ে নেয়া যায় তাহলে তাকে অনায়াসে গোনাহে লিপ্ত করা সম্ভব। কারণ তার স্বভাবে যে অপূর্ণতা রয়েছে তা কেবল নবীর শিক্ষা দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে, আর তা না থাকলে শয়তানের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হয়ে উঠে না।

২৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৪০-৪৬ আয়াত

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যতটুকু ইরশাদ হয়েছে তা একটি ভূমিকা স্বরূপ। এ ভূমিকাতে যদিও অধিকাংশ কথা নবী করীম (স)-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ইহুদীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে একটি কথাও বলা হয়নি, কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত বিশ্লেষণ ও বিবরণে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এর মধ্য দিয়েই ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের সম্পর্কে বহু কিছু বলা হয়ে গেছে।

এখন ভূমিকার পালা শেষ হওয়ার পর সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন করে প্রথমে বলা হচ্ছে তাওরাত মারফত রাসূলে মাকবুল (আ)-এর সাথে সম্পর্কিত তাদের দায়িত্ব ও

www.pathagar.com

কর্তব্য সম্পর্কে এরপর বিস্তারিতভাবে তাদের অপরাধের আলোচনা করা হয়েছে যেগুলোর কারণে তারা এ শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে যে, নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্যকে তিনি হেদায়াত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ সূরার প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে এ আলোচনা বিস্তৃত। তাতে তাদেরকে দাওয়াত ও তিরস্কার করার পর নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত, ব্যাপক ও সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অংশের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا
بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ؗ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ
الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ
تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا
لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ
وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪০. "হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অংগীকার ছিল, তা পূর্ণ করো, তাহলে তোমাদের সাথে আমার যে অংগীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় কর। ৪১. আর আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার ওপর ঈমান আনো। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব ছিল এটি সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরা এর অস্বীকারকারী হয়ো না। সামান্য দামে আমার আয়াত বিক্রি করো না। আমার গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। ৪২. মিথ্যার

www.pathagar.com

রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না। ৪৩. নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও। ৪৪. তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞানবুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? ৪৫. সবর ও নামায সহকারে সাহায্য নাও। নিসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, ৪৬. কিন্তু সেইসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়, যারা মনে করে, সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

২৭. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৪০

يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ج وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ○

'ইসরাঈল' শব্দের ব্যাখ্যা

يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ ঃ ইসরাঈল শব্দটি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি। ইহুদী পণ্ডিতগণ শব্দটির অর্থ বর্ণনা করেন, আল্লাহর সাথে মোকাবেলাকারী। ইয়াকুব (আ) আল্লাহ তাআলার সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এ ধরনের মনগড়া কাহিনী ইহুদীরা তাওরাতে প্রবিষ্ট করেছে। সম্ভবত সেই কথিত বর্ণনার ভিত্তিতেই তারা 'ইসরাঈল' শব্দের এ অদ্ভূত অর্থ বর্ণনা করে থাকেন।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (র) তাওরাতের মূল ভাষা ইবরানী (হিব্রু) ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গবেষণামতে শব্দটি দুটি অংশের সমাহার ঃ ইসরা ও ঈল। তাঁর গবেষণা অনুসারে ইসরা শব্দের অর্থ বান্দা এবং হিব্রু ভাষায় আল্লাহ অর্থে ঈল শব্দের বেশ প্রচলন রয়েছে। এভাবে ইসরাঈল শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহর বান্দা'।

ইহুদী পণ্ডিতবর্গ ইসরাঈল শব্দের অর্থ বর্ণনায় যে ধরনের মেধার পরিচয় দিয়েছেন, 'ইয়াকুব' শব্দের গবেষণায়ও তারা এ নমুনারই উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তাদের গবেষণা অনুসারে ইয়াকুব (আ) তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ঈসু-এর পা আঁকড়ে ধরে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। আমার উস্তাদ মরহুমের অনুসন্ধান হিসেবে শব্দটির বিশ্লেষণ ইহুদীদের বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ধরনের। তিনি শব্দের মূল অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে পবিত্র কুরআনের ইশারা-ইঙ্গিতের আলোকে ইয়াকুব নামকরণের কারণ বর্ণনা করে বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর পুত্র ইসহাকের পর

www.pathagar.com

পরবর্তী বংশধর ইয়াকুব (আ)-এর আগমনী বার্তাও শুনিয়েছিলেন। তাই তাঁকে ইয়াকুব নামে ভূষিত করা হয়েছে যার অর্থ পশ্চাতে আগমনকারী।

اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ঃ আয়াতে বর্ণিত اذكروا ক্রিয়াপদের অর্থ তোমরা স্মরণ করো। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের সকলের প্রতি দাওয়াতের বাণী ব্যক্ত হয়েছে তবে তা করা হয়েছে তিরস্কারের ভঙ্গিতে। অর্থাৎ তোমরা স্মরণ করো। কেননা, তোমরা তো একেবারে ভুলে বসে আছ। তোমাদের প্রতি আমি যে মেহেরবানী ও করুণা বর্ষণ করেছি তা তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও বংশগত যোগ্যতার কামাই বলে ধরে নিয়েছ।

'নেয়ামত' শব্দের ব্যাখ্যা

নেয়ামত শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে মেহেরবানী ও বদান্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ জাতীয় কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা হলো, যার মাধ্যমে বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। এ সূরারই পরবর্তী রুকূ'র ৪৭ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ البقرة :٤٧

"হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা তোমাদের প্রতি আমি নাযিল করেছি এবং তোমাদেরকে আমি জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৭

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐ নেয়ামতের আলোচনা করেছেন যা বনী ইসরাঈলকে দুনিয়াবাসীর উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদানের আকারে দান করেছিলেন। একই মর্মে সূরা আল মায়েদায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ - المائدة : ٧

"আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নেয়ামত এবং তোমাদের সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন সে সকল বিষয়।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৭

এ আয়াতে সে নেয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে যা বনী ইসরাঈলের প্রতি শরীআত নাযিল করার মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত শরীআত (দীনের অবশ্য পালনীয় আদেশ-নিষেধ) হচ্ছে আল্লাহ তাআলা এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে সম্পাদিত এক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। কেননা, শরীআত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে মেনে চলার অঙ্গীকার নিয়েছেন, বিনিময়ে নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে শুনিয়েছেন দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সফলতা ও কামিয়াবী প্রদানে নিশ্চিত আশ্বাসবাণী।

অতপর সূরা আল মায়েদার অপর এক আয়াতে নেয়ামতের বর্ণনা আরো স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ق وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ - المائدة : ٢٠

"সে সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ যে নেয়ামত দান করেছেন তা তোমরা স্মরণ কর, স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে কাউকে নবী করেছেন এবং কাউকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদের এমন নেয়ামত দান করেছেন যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২০

আমাদের মূল আলোচ্য আয়াতে যে নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে এ আয়াতগুলোতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আলোচিত আয়াতটিতে অপর যে বিষয়টি প্রণিধান যোগ্য তা হচ্ছে, আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে আমার নেয়ামত, এরপর আবার বলা হয়েছে 'যা আমি তোমাদের নেয়ামত হিসেবে দিয়েছি।' এভাবে কথাটিতে জোর প্রদান করার উদ্দেশ্য হল, বনী ইসরাঈলের সকল গোমরাহীর মূল কারণ, তাদেরকে মহান আল্লাহ নিতান্তই মেহেরবানী স্বরূপ যে মর্যাদা-মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন, তারা তা নিজেদের যোগ্যতা ও অধিকার বলে পেয়েছে মনে করেছে এবং নিছক বংশীয় প্রাধান্য বলে ধারণা করেছে। এখানে তাই نِعْمَتِىَ এবং اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ -এর দ্বারা এ বিভ্রান্তি অপনোদন এবং এ ভুল ধারণার প্রতিকার করাই উদ্দেশ্য। পরবর্তী এ বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

عَهْد -এর অর্থ–নবী করীম (স) সম্পর্কে عَهْد (অঙ্গীকার)

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ঃ عَهْدٌ (আহদ) শব্দের মূল অর্থ অঙ্গীকার সাধারণভাবে শব্দটির দ্বারা গোটা শরীআত বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা, শরীআত প্রকৃতপক্ষে বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্র। এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত ও মেহেরবানী। কেননা, মহান আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত আসমান-জমিনের মালিক, সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। কারো এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে, সে যোগ্যতার কারণে আসমান জমিনের মালিক তার সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকার করবেন। তা সত্ত্বেও যদি মহামহিম আল্লাহ তাআলা কারো সাথে চুক্তি করেন তবে তার অর্থ তো এই যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কাউকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু এখানে এই সাধারণ চুক্তিনামার সাথে সাথে রাসূল মাকবুল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পাদিত চুক্তিও বুঝানো হয়েছে। তাওরাতেও এর উল্লেখ রয়েছে এবং তাওরাতে উল্লেখ থাকার বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অধ্যায়ের ১৫-১৯ বাক্যাবলীতে রয়েছে ঃ

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত

www.pathagar.com

করিবে। .... আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি তাহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।"

কুরআন মজীদে এ চুক্তি ও অঙ্গীকারের বর্ণনা রয়েছে। মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করে যে দোয়া করেন তার জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ - الاعراف : ١٥٦-١٥٧

"আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুতে ছড়ানো রয়েছে। আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার সকল আয়াত ও নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে ঐ অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তির—যিনি নবী ও রাসূল, যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে তারা (একথাও) লিপিবদ্ধ পায় যে, তিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দিবেন এবং অসৎকাজে বাধা দিবেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ ও হালাল করবেন এবং অপবিত্র ও নোংরা বস্তু হারাম করবেন। সেই সাথে তারা যে গুরুভার ও শৃংখলে আবদ্ধ ছিল তিনি তাদেরকে সে সকল বস্তু থেকে রেহাই দিবেন। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তাকে সাহায্য করবে এবং তার সাথে যে আলোক অবতীর্ণ হয়েছে তারা তার অনুসরণ করবে তারাই হবে সফলকাম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬-১৫৭

নবী করীম (স) সম্পর্কে বনী ইসরাঈল থেকে যে ওয়াদা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বনী ইসরাঈলের প্রতি কি কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং সে সকল জিম্মাদারী আদায় করার প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কি ওয়াদা করা হয়েছে সে সবই এ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

رَهْبَتْ-এর অর্থ

وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ঃ কারো মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের ধারণায় অন্তরে যে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়, তাকে رَهْبَت বলে। পূর্বে اِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর তাফসীর করাকালে বলা হয়েছে, যদি কোনো ক্রিয়ার কর্ম বা অন্য কোনো সম্পর্কিত শব্দ ক্রিয়াটির পরে উল্লেখ না করে ক্রিয়ার পূর্বে নিয়ে আসা হয়, তাহলে তা সীমাবদ্ধ হওয়া এবং দৃঢ়তার অর্থ প্রকাশ করে। তা ছাড়া যদি বাক্যের শুরুতে فَاءْ আসে, তাহলেও তাতে অতিরিক্ত দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়। আর যদি ক্রিয়ার পর পুনরায় কর্মের উল্লেখ হিসেবে সর্বনাম নিয়ে আসা হয়, তাহলে তা আরো অধিক দৃঢ়তা ও তাকিদ প্রকাশ করে। এ আয়াতাংশে এ সবগুলো বিদ্যমান বিধায় বাক্যটির অর্থ হবে, 'কেবল আমাকেই তোমরা ভয় করো'।

'শুধু আমাকেই ভয় করো' কথাটির এখানে অর্থ হচ্ছে, আমার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বিভিন্ন উপকার প্রাপ্তি এবং নানাবিধ ক্ষতির আশংকার উর্ধে রাখতে হবে আল্লাহর মাহাত্ম্যের ধারণা এবং সে বিষয়টিকেই এখানে প্রাধান্য দিতে হবে। তোমরা আশংকা করছ যে, শেষ নবীর আনুগত্য স্বীকার করে নিলে তোমাদের এতদিনকার নেতৃত্বের বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। তোমাদের চেয়ে অক্ষর জ্ঞানহীনদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অধিক—তা স্বীকার করে নিতে হবে, যারা সাধারণ শ্রেণী হিসেবে তোমাদের আনুগত্য করতো তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং এতদিন তোমরা তাদের থেকে যে নানাবিধ ফায়দা হাসিল করতে তার দরোজা বন্ধ হয়ে যাবে। তথাপি তোমাদের জন্য করণীয়, তোমরা এ সকল কিছুকেই ভয় করো না ; এগুলো ভয় পাওয়ার বিষয় নয়। বরং ভয় তো কেবল আমাকেই করা বাঞ্ছনীয় যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সকল কিছু এবং যিনি তোমাদের থেকে ওয়াদা নিতে তোমাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরেছিলেন।

আয়াত ঃ ৪১

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ-এর প্রকৃত অর্থ

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ঃ সে কিতাবের সত্যায়ণকারী যা তোমাদের নিকট রয়েছে, অর্থাৎ কুরআন শরীফ তোমাদের ঐশীগ্রন্থ তাওরাতে শেষ নবীর আগমন এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণের বিশেষত্ব সম্পর্কে যা নাযিল করা হয়েছে তার সত্যায়ন করছে। এ আয়াতাংশের নিগূঢ় মর্ম হচ্ছে, কুরআন শরীফ এবং শেষ নবীকে তোমাদের পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপের পাত্র বানানো যথাযথ নয়। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, এ নবী ও কিতাব মাথার ওপর উঠিয়ে রাখার যোগ্য। কেননা, এ নবীর আগমনে তোমাদেরই মাথা উঁচু হয়েছে বেশি। কারণ তাঁর

www.pathagar.com

আগমনবার্তা তোমাদের ঐশীগ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছিল এবং তা যথাযথ প্রয়োগ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এখন এ নবী ও কিতাব এসে তার যথার্থ প্রয়োগস্থল উদঘাটন করে দিল, ফলে তোমাদের কিতাবের সত্যায়ণ করে দিল এ কুরআন। তাই, তোমাদেরই সর্বপ্রথম এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য।

এ সত্যায়ণের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, কুরআন শরীফ সুস্পষ্টভাবে তাওরাত ও ইনজীলের ঐশীগ্রন্থ হওয়ার বিষয়টি সত্যায়ণ করে। সেই সাথে এ কিতাব দুটি যাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাদের নবী ও রাসূল হওয়ার ও প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সেই কিতাব দুটির মৌলিক শিক্ষারও নীতিগতভাবে সমর্থন জানায়। তাহলে, কুরআন কি তাওরাত ও ইনজীলকে প্রত্যাখ্যন করে না ? এর জবাব হচ্ছে, কুরআন এ দুই কিতাবের সে অংশ প্রত্যাখ্যান করে যা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে ঐ দুই কিতাবে সংযোজন করা হয়েছে অথবা যেখানে রদবদল ও হেরফের করে বাক্যের মূল আকৃতিই বদলে ফেলা হয়েছে। এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ বিষয়টি প্রতিভাত হবে যে, কুরআন মজীদ মূলত ঐ দুই গ্রন্থের সত্যায়ণ ও স্বীকৃতি প্রদান করে সত্য, কিন্তু যে সকল অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য কিতাবগুলোতে সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে তা অস্বীকার করে।

اَوَّلَ كَافِرٍ -একটি কথার কথা

افعل ؛ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ ۢبِهٖ শব্দটির মুযাফ ইলাইহ্ (পরবর্তী সম্বন্ধীয় পদটি) যদি নাকেরা মুফরাদ (অনির্দিষ্ট একক শব্দ) হয়, তাহলে মুযাফ ইলাইহ্‌টি অর্থ হয় তামীয-এর, যেমনটা এখানে হয়েছে। আর যদি মুযাফ ইলাইহ্‌টি মা'রেফা (নির্দিষ্ট পদ) হয়, তাহলে তা বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন- قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ - الزخرف : ٨١ "(হে নবী!) আপনি বলুন, দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে আমি তার উপাসনাকারীদের অগ্রণী হতাম।"-সূরা যুখরুফ ঃ ৮১

اَوَّلَ كَافِرٍ এবং اَوَّلَ الْكَافِرِيْنَ এ দুটোর ব্যবহারিক ক্ষেত্র সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ হামীদুদ্দীন ফারাহী (র) বড় সুন্দর এক পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন اَوَّلَ كَافِرٍ বলা হবে, তখন সে ছাড়া আরো কেউ কাফের রয়েছে কি-না তা লক্ষ করা হবে না। কিন্তু যখন اَوَّلَ الْكَافِرِيْنَ বলা হবে তখন অর্থ হবে, কাফের অনেকেই রয়েছে, তবে তাদের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম।

كُفْرٌ শব্দের অর্থ

كُفْرٌ শব্দের যেমন সত্য প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করার অর্থ হয়ে থাকে, তেমনি নেয়ামতের নাশোকরি বা অকৃতজ্ঞতাও অর্থ হয়। এখানে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতে শব্দটির উভয় অর্থই ধর্তব্য হবে। কেননা, তাদের থেকে ওয়াদা নেয়া হয়েছিল যে, তারা কুরআন নাযিল হলে তা স্বীকার করে নিবে। তাই, কিতাবটি যে সত্য

কিতাব তা তাদের নিকট সুস্পষ্টও হয়েছিল। আর তাই, এ কিতাব অস্বীকার করার দ্বারা এক বিশাল সত্যকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া, তাদের নিকট কুরআনের আগমন হয়েছে এক মহান নেয়ামত হিসেবে, এ কিতাবটিতে ঈমান নিয়ে এলে তারা চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভের উপযুক্ত হবে—এ মর্মে খোদায়ী ওয়াদাও রয়েছে, তাই কুরআনের অস্বীকৃতির দ্বারা বৃহৎ এক নেয়ামতকে অস্বীকার করা হবে।

'সর্বপ্রথমেই তার অস্বীকারকারী হয়ো না'—একথার অর্থ মোটেই এ নয় যে, যখন আরো কেউ কুফর করে তখন তোমার কুফর করার অনুমতি ও সুযোগ মিলবে। বরং এ কথার অর্থ, যেহেতু এ কুরআন তোমাদের ঐশীগ্রন্থের সত্যায়ণ করে এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই তোমাদের নিকট থেকে এর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাই এ কিতাবটির স্বীকৃতি প্রদানে এবং তাতে ঈমান আনার বিষয়ে তোমরাই অগ্রবর্তী হবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য, অন্যদের এ সম্পর্কে কোনোরূপ পূর্ব ধারণা না থাকা সত্ত্বেও এর প্রতি ঈমান আনয়নে তারা এগিয়ে গেছে এবং তোমরা এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তার বিরোধিতায় এগিয়ে রয়েছ।

نَهِى (নিষেধ)-এর সাথে قَيْد (শর্ত) যুক্ত করার মর্ম

যে সকল স্থানে নিষেধ-এর সাথে শর্ত যুক্ত থাকে, যেমন এখানে বলা হয়েছে اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ সেগুলো সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বিষয়টির ভয়াবহতা উন্মোচন করা। নিষেধের মূল সম্পর্ক থাকে ক্রিয়াটির সাথে, শর্তের সাথে নয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত বাড়ানো হয় কেবল বিষয়টির ভয়াবহতা প্রকাশ করার জন্য। যেমন ঃ

لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً - ال عمران : ١٣٠

"তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০

এ আয়াতের মর্ম একথা নয় যে, চক্রবৃদ্ধি হারে হলে সুদ নিষিদ্ধ তা না হলে বৈধ। মোটেই তা নয় বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, মূল কাজটির প্রকৃত ঘৃণ্য রূপ তুলে ধরা এবং এর মারাত্মক পরিণতির প্রতি দিক নির্দেশ করা।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا "তোমরা স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে আয়াত বিক্রি করে দিও না।"—এ আয়াতটিরও অর্থ এটি নয় যে, বেশ চড়া মূল্য পেলে বিক্রি করতে পার, নতুবা করো না। বরং এখানেও নিষেধ—এর সম্পর্ক মূল ক্রিয়ার সাথে অতএব, এখানে অর্থ হচ্ছে, দীন বিক্রি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ثَمَنًا قَلِيْلًا (স্বল্প মূল্য) এ শর্তটি এখানে বাড়ানো হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, বড়ই নিকৃষ্ট পন্থায় দীন বিক্রি করার রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। কেননা, সমগ্র পৃথিবীও যদি একটি আয়াতের পরিবর্তে প্রদান করা হয় তবুও তা স্বল্প ও নিকৃষ্টই।

www.pathagar.com

একটি সন্দেহের অপনোদন

যেহেতু নবী করীম (স) প্রথমে মক্কায় এবং পরবর্তীতে মদীনায় দীনের প্রচার করেছেন, তাই কুরাইশরা মক্কায় এবং ইহুদীরা মদীনায় নবী ও কুরআনকে অস্বীকারের ঘটনা ঘটিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে কারো মনে এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, ইহুদীরা সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হবে কি করে ? তার আগে তো কুরাইশরাই অস্বীকার করেছে। এর উত্তরে বলা হয়, ইহুদীদেরকে একথা বলা হচ্ছে গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ করে। মক্কার কুরাইশরা সামগ্রিক সম্প্রদায় হিসেবে তাদের বিপরীতেই রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আদনানী ও কাহতানী—আরবীয়দের এ দুই শাখার ভেদাভেদ ধর্তব্য নয়। এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কুরাইশরা সকলের পূর্বে অস্বীকার করেছে তা সত্য, কিন্তু তাদেরই স্বগোত্র মদীনার আনসারী সাহাবীগণ রাসূলে মাকবুল (স) মদীনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করে। তা ছাড়া কুরাইশ সম্প্রদায়ের সকলেই তো রাসূলুল্লাহ (স)-কে একযোগে অস্বীকার করেনি, বরং তাদের মধ্যে অস্বীকারকারীর পাশাপাশি এমন লোকও রয়েছে যারা শুধু ঈমানই এনেছেন তা-ই নয়, বরং নবী ও কুরআনের জন্য প্রাণ উৎসর্গও করতে সদা প্রস্তুত থেকেছেন। অপরদিকে ইহুদীদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা দলবদ্ধভাবে অস্বীকার আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ অস্বীকৃতিতে রয়েছে অনড় অটল। অথচ ঐশী ধর্মের বাহক হিসেবে শেষ নবী সম্পর্কে তাদেরই কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে বিধায় তাদের أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ। 'সর্বপ্রথম ঈমান কবুলকারী' হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ঃ তোমরা স্বল্প মূল্যে আমার আয়াতগুলোকে বিক্রি করে দিও না। অর্থাৎ নিজেদের পার্থিব সুযোগ-সুবিধার বিপরীতে তাওরাতের বিধি-বিধান ও হেদায়াতকে বিসর্জন দিও না। এটি এক ব্যাপক বর্ণনাভঙ্গি যার দ্বারা ইহুদীদের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ এ সূরাতেই প্রদান করা হবে। আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন তাতে তিনটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ ১. তারা তাওরাতে নির্দেশিত শরীআত আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং দৃঢ়ভাবে মেনে চলবে। ২. তারা কুরআনের প্রতিও ঈমান আনবে যা তাওরাতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন করেছে। এবং ৩. তাদের নিকট কিতাব মারফত যে সকল নির্দেশ জারী করা হয়েছে তার কোনো একটিও তারা গোপন করবে না।

এ উল্লিখিত আয়াতে যে বলা হল, আমার আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না এর অর্থ হচ্ছে নিজেদের পার্থিব হীন স্বার্থের বিনিময়ে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ ভংগ করো না।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মর্ম প্রকাশের একক পদ্ধতি

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এ মর্ম প্রকাশের জন্য কুরআন শরীফের অন্যত্রও এ ভঙ্গিটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ج فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ ـ المائدة : ٤٤

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে ছিল হেদায়াত, পথনির্দেশ এবং আলো। নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল, তারা ইহুদীদেরকে সে অনুসারে বিধান ও ফায়সালা দিত, সেই সাথে বিধান দিত রাব্বানীগণ (আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নকারী) এবং ধর্মীয় পণ্ডিতগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এ কিতাবের সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিও না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই হচ্ছে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

এ আয়াতেও যে لَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا বলা হয়েছে তার প্রয়োগক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এর অর্থ এটিই যে, আল্লাহ তাআলা তাওরাত মারফত তোমাদের থেকে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়েছেন তা তোমরা পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য ভেঙ্গে দিও না। তোমাদের এ স্বার্থ-সুবিধা তোমাদের দৃষ্টিতে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিপরীতে নিতান্তই তুচ্ছ বটে।

এ অংশে সম্বোধনের পাত্র সাধারণ ইহুদী সমাজও হতে পারে, তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও হতে পারে। সাধারণ সমাজ এ জন্য যে, তারা যদিও বাহ্যিকভাবে তাওরাত মেনে চলার দাবী করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় প্রথা ও রসম মেনে চলাই হচ্ছে তাদের দীনদারীর চূড়ান্ত রূপ। শরীআতের প্রকৃত বিধানাবলীর তারা কোনোই পরোয়া করে না। তারা শয়ীআতকে প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। আর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এজন্য যে, তাওরাতে মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে তারা নিজেদের মর্জিমাফিক ব্যাখ্যার আচরণ বাড়িয়েছে অথবা রদবদলের কাঁচি চালিয়েছে। এ কাজটি তারা করেছে হয়তো ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষবশত অথবা এ আশংকায় যে, প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হলে সাধারণ জনগণ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং তারা জনরোষের শিকার হবে। ফলে তারা এতদিন পর্যন্ত যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছে তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

رهبت، تقوى এবং خشوع একই মর্মে বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গি

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতের তাফসীরে করা হয়েছে। পূর্বতন আয়াতে বলা হয়েছে وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ এবং বর্তমান — শব্দের বিশদ আলোচনা تقوى এবং اتقاء ঃ وَإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

আয়াতটিতে বলা হলো وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنَ আগত এক আয়াতে خشوع শব্দটিও এসেছে। মূলত رهبت ،تقوى এবং خشوع একই অর্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কারো মাহাত্ম্য ও মর্যাদার ধারণায় অন্তরে যে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার উদয় হয় তাকে বলে رهبت ; এ ভীতির দরুন ঐ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে যে বিনয় ও নম্রতা এবং দীনতা হীনতার সৃষ্টি হয় এবং অন্তরে বেপরোয়া ভাবের পরিবর্তে নির্ভরশীলতা এবং অহংকারের পরিবর্তে বিনীত হওয়ার যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকে বলে خشوع ; এ ব্যক্তিত্বের ক্রোধ ও রাগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য, তার নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য, তার হুকুম আহকাম মেনে চলার জন্য অন্তরে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতেই তাকে এ অনুভূতি সতর্ক ও সজাগ করে রাখে তাকে বলে تقوى।

'আমাকেই ভয় কর'—কথাটির একই সাথে দুটি অর্থ ঃ ১. আমাকে অত্যধিক নমনীয় মনে করে আমার ক্রোধ এবং আমার পাকড়াও থেকে গাফেল হয়ে যেও না। যে কেউ আমার নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করবে, আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিনষ্ট করবে, আমার আয়াতের সাথে ব্যবসায়িক পণ্য সুলভ আচরণ করবে তার প্রতি আমি যখন ক্রোধের প্রকাশ ঘটাবো, তখন আর তার বাঁচার কোনো পথ থাকবে না, তার কোমর ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন আমার শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দিবে এমন সাধ্য কারো থাকবে না।

فَاتَّقُوْنَ ক্রিয়ার কর্ম اِيَّايَ -টি ক্রিয়ার পূর্বে নিয়ে আসার দরুন দ্বিতীয় যে অর্থটি প্রকাশ পাচ্ছে তা হল, তোমরা আশংকা করছ যে, তোমরা তোমাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিলে তোমাদের অনুসারী জনসাধারণ বিগড়ে যাবে, তোমাদের নেতৃত্ব টালমাটাল অবস্থায় চলে যাবে, তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বনী ইসমাঈলের লোকদের মাথা উঁচু হয়ে যাবে এবং তোমাদের পার্থিব স্বার্থের হানি ও ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই ভয় পাওয়ার এবং গুরুত্ব দেয়ার মত নয়, বরং তোমাদের এককভাবে গুরুত্ব ও ভয় পাওয়ার যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে আমার ক্রোধকে পরোয়া করা। কারণ তা থেকে রেহাই দেয়ার কেউ নেই, কিন্তু এর বিপরীতে যারা আমার ক্রোধের পরোয়া করে চলে তাদেরকে আমি নানা বিপদ থেকে রেহাই দিয়ে থাকি।

আয়াত ঃ ৪২

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

لبس حق بالباطل **-এর অর্থ**

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِل ঃ لبس الثوب -এর অর্থ সে কাপড় পরিধান করেছে لبس الامر عليه -এর অর্থ হচ্ছে সে বিষয়টি গড়বড় করে দিয়েছে। لَبَسَهُمْ -এর অর্থ তাদের একের সাথে অপরকে সে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছে। অথবা একের সাথে অন্যকে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করেছে। কুরআনের অন্যত্র রয়েছে ঃ اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا -এর অর্থ 'অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পরস্পরে লড়াইয়ে জড়িয়ে দিয়েছেন।' لبس الشيئ

بِالشَّيْءِ-এর অর্থ এক বিষয়কে অপর এক বিষয়ের সাথে প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়া। আলোচিত আয়াতটি এ ভঙ্গিতে অবতীর্ণ হয়েছে, এখানে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্যাঁচ লাগানোর অর্থ ছাড়া সত্যের ওপর মিথ্যার প্রলেপ লাগানোর অর্থও হতে পারে। لبس শব্দটির মধ্যে এ দুটি অর্থই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে, আর দুটো অর্থই এখানে কার্যকর হতে পারে। কুরআন শরীফের অন্যত্রও শব্দটি এভাবে উভয় অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমনঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ الانعام : ٨٢

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁদের ঈমানকে যুলুম (এখানে এর অর্থ শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৮২

তাই, আলোচিত আয়াতটিতে অর্থ হবে, তারা তাওরাতে নিজস্ব রায়, মত এবং নানাবিধ কুপ্রথা অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহর সত্যবাণী ও নিজেদের মনগড়া কথা এক সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছে এবং সত্যের ওপর মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে।

কুরআন কারীমে অন্যত্রও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ

ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ البقرة : ٧٩

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্যপ্রাপ্তির জন্য বলে, 'এটি আল্লাহর নিকট হতে আগত।' তাদের হাত যা রচনা করেছে এজন্য তাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তারা যা উপার্জন করে সেজন্যও রয়েছে দুর্ভোগ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৭৯

ইহুদীরা সত্যের উপর মিথ্যার পর্দা ফেলতে সব ধরনের পন্থাই অবলম্বন করেছিল। তারা তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু কথা বৃদ্ধি করেছে, তাওরাতের কিছু কথা বর্জন করেছে, এবং কিছু কিছু স্থানে রদবদল করেছে। তাদের এসব ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল—ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানী, কুরবানীস্থল এবং তাঁর কিবলা ইত্যাকার বিষয়ে তাওরাতে যা বর্ণিত হয়েছে এবং যে বিষয়গুলো হুযুর আকরাম (স)-এর জন্য আগমনী বার্তা হয়ে রয়েছে—এ সকল কিছুকে পর্দার আড়াল করে দেয়া। তাওরাতে রাসূলের নিদর্শন পাওয়ার বিষয়টি যেহেতু ইহুদীদের খুবই অপসন্দনীয় ছিল, তাই তারা এ সবকিছুই গোপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

وَتَكْتُمُوْا-এর اعراب।বাক্য বিশ্লেষণ

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ঃ আয়াতের এ অংশে শাব্দিক কোনো আপত্তি বা আলোচনার কিছু নেই। তবে تَكْتُمُوْا এর বাক্য বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা

রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে اَنْ শব্দটি উহ্য রয়েছে, তাই তাদের মতে تَكْتُمُوْا -তে نصب হয়েছে। কারো মতে তা পূর্ববর্তী শব্দের সাথে তা عطف (সংযুক্ত) হয়েছে তাই পূর্ববর্তী শব্দের ন্যায় তা مـجـزوم (জযমযুক্ত) হয়েছে। আমার উস্তাদ হামীদুদ্দীন ফারাহী জযম ও আতফের পদ্ধতিটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, تَكْتُمُوْا শব্দটির পূর্বে لا না আসার দরুন অর্থ হবে, উভয় বাক্য একই বিষয় বুঝাচ্ছে, দ্বিতীয় تَكْتُمُوْا -টি এসেছে প্রথম تَكْتُمُوْا কে আরো সুস্পষ্ট বা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য। ইহুদীরা যে সত্যের সাথে মিথ্যার প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছে তার উদ্দেশ্যই হল সত্য গোপন করা। তাওরাতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তারা যেন সত্য গোপন না করে। তাই তারা ভিন্নপথ অবলম্বন করে—সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিষয়টি গড়বড় করে দেয়া—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্য গোপন করা। তাই কুরআন তাদেরকে প্রথমে নিষেধ করল সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো থেকে, এরপর এ গড়বড় করার মূল যে উদ্দেশ্য সেই সত্য গোপন করা থেকে নিষেধ করা হল।

পবিত্র কুরআনের আয়াত وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْبِهَا اِلَى الْحُكَّامِ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির এক অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮ এবং অপর এক আয়াত- لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ "তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের কারো গচ্ছিত সম্পদ আমানত থাকলে তাতেও খেয়ানত করো না।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২৭

উল্লিখিত দুটি আয়াতেই আমার উস্তাদ এ মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। যথাস্থানে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

حَقٌّ ঃ হক শব্দটির মূল অর্থ এবং শব্দটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ সূরারই অন্যত্র করা হবে। এখানে বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা যা প্রকাশ্য তাহলো, হক শব্দ দ্বারা ঐ সকল সত্য যা তাওরাতে বিধৃত হয়েছে কুরআন তার সত্যায়ণ করে তাকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল শেষ নবীর বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কিত যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, ইহুদীদের এগুলো গোপন করার প্রতি আন্তরিক আসক্তি ছিল।

আয়াত ঃ ৪৩

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ ঃ اِقَامَتُ الصَّلٰوةَ -এর মর্মার্থ এ তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে করা হয়েছে, তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

www.pathagar.com

زكوة -শব্দের তাৎপর্য

زكوة ঃ যাকাত শব্দটি زكا - يزكوا এর মূল ধাতু। শব্দটির অর্থ পবিত্রতা। যেমন نفس زكية বলা হয় ঐ অন্তরকে যা গোনাহ থেকে পবিত্র। শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ বৃদ্ধি ও প্রতিপালন। যেমন- زكا الزرع -এর অর্থ ফসল বেড়েছে এবং উঁচু হয়েছে। زكوة শব্দের মধ্যে এ উভয় অর্থ নিহিত রয়েছে। কেননা, যাকাত অন্তর ও সম্পদ উভয়কে পূত-পবিত্র করে দেয় এবং তাতে সম্পদে বৃদ্ধি ও বরকত হয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ অর্থ প্রতিভাত হয়েছে। যেমন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا - التوبة : ١٠٣

"তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ কর, এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে।"-সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩

অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○ - الروم : ٣٩

"মানুষের ধন-সম্পদে বৃদ্ধি ঘটবে। এ ধারণায় তোমরা সুদের ভিত্তিতে যা দিয়ে থাক আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়। তাই এরাই সমৃদ্ধিশালী।"

-সূরা আর রূম ঃ ৩৯

যাকাত শব্দটি প্রথমে আল্লাহর পথে ব্যয়ের যাবতীয় পন্থায় ব্যবহৃত হত, ফলে তা ছিল সদকা ও দানের সমার্থক। পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীসে শব্দটির ব্যবহার ব্যয়ের ঐ নির্ধারিত পন্থার সাথে নির্দিষ্ট করে দেয় যা প্রত্যেক সম্পদ থেকে আদায় করে দেয়া ফরয।

ركوع -শব্দের বিশ্লেষণ

رُكُوْعٌ ঃ রুকূ' শব্দের অর্থ সামনে ঝুঁকে পড়া, বিনয়-নম্রতার প্রকাশ এবং দরিদ্রতায় ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি। কুরআন মজীদে এর দ্বারা নামায বুঝানো হয়ে থাকে, যেহেতু তা নামাযের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ। শব্দটির সাথে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -এর সংযুক্তি জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে। যদিও জামায়াতের অর্থ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -এর দ্বারাও প্রকাশিত হচ্ছে, তথাপি সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ আন্তরিক অবস্থার দরুন একথাটি ভিন্ন আঙ্গিকে নিয়ে আসা হয়েছে।

নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং রুকূ' আদায়কারীর সাথে একত্রে রুকূ' করার এ নির্দেশ প্রদান করা হয় ইহুদীদেরকে এবং তাতে সকল ইহুদীই অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে

যে ঐশী অঙ্গিকারের কথা বলা হয়েছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে এ কাজগুলো সম্পাদন করা। অথচ ইহুদীরা এগুলো পুরোপুরি পরিত্যাগ করে বসেছিল। এখানে ইহুদীদেরকে সে সকল বিষয় পুনরায় যথাযথভাবে পালনে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির এ বুনিয়াদী বিষয়গুলো তারা একেবারেই বাদ দিয়ে ফেলেছিল, তবে তা শুধু ইশারার পর্যায়েই রাখা হয়েছে, বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। নতুবা তারা এর প্রতিবাদ ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে পড়বে।

নামায ও যাকাতের ব্যাপারে ইহুদীদের বিরোধিতা

ইহুদীদের সম্পর্কে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, তারা নামায এবং যাকাত ইত্যাদির বিধান বর্জনের উপক্রম করে রেখেছিল। তাদের পুস্তক-পুস্তিকাগুলোর কোথাও নামাযের উল্লেখই নেই, ফলে তাদের একদলের তো ধারণা এই যে, নামাযের বিধান মূসা (আ) তাদেরকে কখনোই দেননি, পরবর্তীতে পণ্ডিতবর্গ এটা বেদআত হিসেবে বৃদ্ধি করেছে। যাকাতের বিধান অস্বীকার না করলেও তারা এ সম্পর্কে এক আশ্চর্য বিধান জারী করে। তাদের গণক ও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ গরীব মিসকীনের পরিবর্তে নিজেদেরকেই যাকাত প্রদানের খাত নির্ধারণ করে। তাই কিতাবুল আহবারে গণক ও পণ্ডিতদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার ও প্রাপ্য এবং মানত ও কুরবানী ইত্যাদির বর্ণনা করা হলেও সেখানে গরীব-নিঃস্বের কোনো উল্লেখ নেই। ফসলের এক-দশমাংশ বা ফলের একাংশ প্রদান এবং সব ধরনের মানত ইত্যাদি প্রদানের একক খাত গণক ও পণ্ডিতদের নির্ধারণ করে প্রকৃত হকদার গরীব নিঃস্বকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখে।

কুরআন মজীদ নামায এবং যাকাত উভয়টি সম্পর্কে শরীআতের বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে এবং ইহুদীদেরকে সীমালঙ্ঘনের দরুন খুব কঠোরভাবে তিরস্কার করেছে। নামায সম্পর্কে কুরআন বলেছে, ইহুদীদের ওপর সর্বপ্রথম যা ফরয করা হয়েছে তাহলো নামায। তাই, মূসা (আ) সর্বপ্রথম নামাযের আদেশই প্রদান করেন। কুরআনের ইরশাদ ঃ

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝ - طه : ١٤

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই। তাই তুমি আমারই ইবাদাত উপাসনা কর এবং আমার স্মরণার্থে তুমি নামায কায়েম কর।"-সূরা ত্বা-হা ঃ ১৪

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط - يونس : ٨٧

"আমি মূসা ও তার ভাইকে অহী পাঠালাম, 'মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য ঘর নির্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদাতগৃহ করে নাও এবং নামায কায়েম করো।"-সূরা ইউনুস ঃ ৮৭

www.pathagar.com

এ আয়াতগুলো দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীরা জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম দলবদ্ধ হয়েছে,' অথচ পরবর্তীতে তারা এ নামাযকে একেবারেই পরিত্যাগ করেছে।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ আয়াতাংশের ভিত্তিতে আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন ঃ

১. ইহুদীদেরকে এখানে রুকূ' করতে বলা হয়েছে। কারণ তারা নামাযে রুকূ' করা একেবারেই বর্জন করেছিল।[১]

২. জামায়াতের সাথে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নেতাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন গরীব জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে। কেননা, নামায পরিত্যাগের প্রথম অবতরণিকা হচ্ছে জামায়াত বর্জন। ধনীরা গরীবের সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকে মর্যাদাহানী বলে মনে করে। ফলে মসজিদের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকে। ফলে মসজিদে শুধু থাকে গরীব সাধারণ লোকেরা, আর এভাবে নামাযেরই মর্যাদাহানী করা হয়। এর বিপরীতে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার দ্বারা নামাযের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। তাই আল্লাহ তাআলা মারয়াম (আ)-কেও জামায়াতের সাথে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ ال عمران : ٤٣

"হে মারয়াম ! তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগত থাক এবং রুকূ' আদায়কারীদের সাথে তুমিও রুকূ'-সেজদা আদায় কর।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৩

আয়াত ঃ ৪৪

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

بِرّ-এর বিশ্লেষণ

بِرّ ঃ بِرّ শব্দটির অর্থ ওয়াদা পূরণ, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ব পালন এবং অধিকার ও দাবীদাওয়া পূরণ করা। অধিকারের তালিকায় সব ধরনের অধিকার অন্তর্ভুক্ত—মৌলিক এবং প্রকৃত অধিকারও। যেমন আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা, পিতামাতার আনুগত্য এবং সকলের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ। পরবর্তীতে ঐ সকল অধিকারও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয় যেগুলো ওয়াদা-অঙ্গীকার এবং চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই, এ শব্দটি দান ও বদান্যতা এবং সকল ধরনের নেক কাজও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তার এক অর্থ ইনসাফ ও ন্যায়বিচারও। শব্দটি اثم (গোনাহ অধিকার বিনষ্ট করা) عـقـوق

১. আমার উস্তাদ বলেন, ইহুদীরা বছরে একবার একটি সাজদা করাই যথেষ্ট বলে ধারণা করতো, এমনকি কোনো দেয়াল বা খুঁটিতে কপাল লাগালেই পণ্ডিতরা সাজদা আদায় হওয়ার রায় দিত। আমি জানি না, তাঁর একথার সূত্র কি ? তবে তাওরাতে তাদেরকে বার বার যে উদ্ধত বলা হয়েছে তা তাদের ইবাদাতের ধরন দ্বারা স্পষ্টতই বুঝে আসে।

www.pathagar.com

(পিতামাতার অবাধ্যতা), غـــدر (বিরোধিতা করা) এবং ظلم (যুলুম-অত্যাচার)-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। بَارٌّ بَرٌّ এবং হচ্ছে এ শব্দ থেকে নির্গত সত্তা প্রকাশক বিশেষ্য শব্দ। যেমন ঃ بر بوالده-এর অর্থ হচ্ছে পিতার অনুগত। بر بالقسم-এর অর্থ সে তার কসম পূর্ণ করেছে। কুরআন শরীফে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ تَقِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا "সে ছিল খোদাভীরু এবং পিতামাতার অনুগত, আর সে উদ্ধত ও নাফরমান ছিল না।"–সূরা মারয়াম ঃ ১৪। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ - ال عمران : ٩٢ "কখনোও তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের পসন্দনীয় বস্তু ব্যয় করবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২। মহান আল্লাহর প্রশংসায় বলা হয়েছে ঃ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ "নিশ্চয় তিনি সৌজন্যশীল পরম দয়ালু।"–সূরা আততূর ঃ ২৮। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - المائدة : ٢ "তোমরা কল্যাণ ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা কর, গোনাহ ও আল্লাহদ্রোহীমূলক কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২

এ বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা একথা প্রতিভাত হয়ে গেল যে, শব্দটি কখনো নেক কাজ ও কল্যাণকর সকল কাজের জন্য যেমন ব্যবহৃত হয়, কখনো তেমনি অধিকার ও দাবী আদায় এবং ওয়াদা পালন করার অর্থও বুঝিয়ে থাকে।

এ আয়াতে ইহুদী পণ্ডিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। আয়াতের শেষাংশ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ -এ অবস্থায় যে, তোমরা আসমানী কিতাব তেলাওয়াত কর।—আমাদের এ ধারণার সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সমর্থন করছে। এ সকল পণ্ডিত ও নেতাদেরকে সম্বোধন করে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরা তো সাধারণ লোকদেরকে খুব তাকীদের সাথে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষার নির্দেশ প্রদান কর, কিন্তু এ নির্দেশ প্রদানকালে নিজেদের কথা একেবারেই ভুলে যাও। মানুষকে তো নসীহত কর, তারা যেন তাদের সম্পদ তোমাদের হাতে সমর্পণ করে দেয়, কিন্তু তোমাদের সম্পদে যে আল্লাহর ও গরীবের হক রয়েছে তা তোমরা একেবারেই মনে কর না, অন্যের সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চিন্তে বসে থাক। তোমাদের আনুগত্য করার জন্য তোমরা খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠে নির্দেশ প্রদান কর, এভাবে তোমরাই তাদের প্রভু বনে বসে আছ, কিন্তু আল্লাহর ফরমাবরদারী ও আনুগত্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন মনে করে নামায ও যাকাতের বিধান অমান্য ও উপেক্ষা করছো, ফলে দীন ও শরীআতটাই ধ্বংস করে দিচ্ছ। ইহুদী পণ্ডিতদের এহেন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ঈসা (আ)।

"তিনি কহিলেন, হা ব্যবস্থাবেত্তরা, ধিক্ তোমাদিগকেও, কেননা তোমরা মুনষ্যদের উপরে দুর্ব্বহ বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাক, কিন্তু আপনারা একটী অঙ্গুলি দিয়া সেই সকল বোঝা স্পর্শ কর না।"–লূক ১১ ঃ ৪৬

লক্ষণীয় ইনজীলের এ উক্তি এবং কুরআনের এ আয়াতে কতই সামঞ্জস্য রয়েছে।

www.pathagar.com

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ 'অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর।' অর্থাৎ তোমরা তো দীন ও শরীআতের জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শী ও গভীর পণ্ডিত্যের অধিকারী। তাই দলিল ও যুক্তির নিরিখে অন্য সকলের চেয়ে তোমাদের ওপর শরয়ী দায়িত্ব ও কর্তব্যও অনেক বেশি।

আয়াত ঃ ৪৫

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

صَبْر শব্দের তাৎপর্য

صلوة শব্দ নিয়ে সূরা বাকারার ৩য় আয়াতের তাফসীরকালে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাই শুধু صبر শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

صبر -এর মূল অর্থ বাধা দেয়া, ফেরানো। অর্থাৎ অন্তরকে ঘাবড়ে যাওয়া, হতাশ ও নিরাশ হওয়া এবং বিষণ্ন থেকে বাঁচিয়ে রেখে নিজের অবস্থানে জমে থাকা। কুরআনে এ অর্থটি এক পবিত্র আকার ধারণ করেছে। তাতে সাধারণভাবে যে অর্থ গৃহীত হয়েছে তাহলো, বান্দা পুরোপুরি প্রশান্তির সাথে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার বহাল থাকা, তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওয়াদায় দৃঢ়বিশ্বাস রাখা এবং এ পথে চলতে যত বাধাই আসুক তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে তা উপেক্ষা করে যাওয়া।

সাধারণভাবে মানুষ صَبْر-এর অর্থ করে থাকে অক্ষমতা ও দীনতা, হীনতা। কিন্তু আরবী ভাষায় এবং কুরআনের ব্যবহারে صبر -এর অর্থ গৃহীত হয়নি। আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ সূরা আসর-এর তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাকালে আরবী ভাষার আলোকে সাধারণভাবে প্রচলিত এ ধারণা প্রতিহত করেছেন। তিনি বলেছেন, একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সবর শব্দটি আরবী ভাষায় দীনতা ও অক্ষমতার অর্থ প্রকাশ করে না যা অসহায় অক্ষম লোকের একমাত্র করণীয়, বরং তা হচ্ছে শক্তি সামর্থ ও দৃঢ়তার মূল ভিত্তি। আরবী ভাষায় এ শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং সকল ক্ষেত্রে এ অর্থই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যেমন হাতেম তাই বলেন ঃ

وغمرة موت ليس فيها هوادة يكون صدور المشر في جسورها

صبرنا له في نهكها ومصابها باسيافنا حتى يبوخ سعيرها

"মৃত্যু ও ধ্বংসের কত ভয়ানক দরিয়া রয়েছে যেখানে তরবারী পুল হয়ে তা থেকে উতরে দেয়। আমরা তাই সকল ধরনের বিপদ ও আক্রমণের বিপরীতে তরবারী দ্বারাই থেকেছি মযবুত ও দৃঢ় পদ। শেষ পর্যন্ত সে প্রতিপক্ষ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

'আসবাগ'-এর কবিতায় রয়েছে ঃ

يا ابن الجحاجحة المداره والصابرين على المكاره

"সম্ভ্রান্ত নেতা ও বিপদে ধৈর্যধারণকারীদের বংশধর।"

www.pathagar.com

যুহায়ের ইবনে আবু সালমার বক্তব্য ঃ

قود الجياد واصهار الملوك وصبر فى مواطن لو كانوابها سئموا

"হে উত্তম ঘোড়ার সওয়ারীবৃন্দ! বাদশাহর জামাতাবৃন্দ, এবং এমন দুর্গম ঘাঁটিতে দৃঢ় পদ যেখানে অন্য সকলেই সাহসহারা হয়ে পিছিয়ে যায়।"

صَبْرٌ -এর মূল অর্থ কুরআন মজীদেও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ - البقرة : ١٧٧

"যারা অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করে।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

এ আয়াতে সবরের তিনটি ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ ১. দারিদ্র ও অর্থসংকট, ২. রোগ পীড়া ও দুঃখ কষ্ট এবং ৩. সংগ্রাম ও যুদ্ধ। মূলত এ তিনটি ক্ষেত্রই সবরের উৎস।–মাওলানা ফারাহী কৃত তাফসীর সূরা আসর, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পূর্বে উল্লেখিত ঐশী চুক্তি নবায়নের জন্য বনী ইসরাঈলকে যে সকল কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে সে সকল কাজে অগ্রসর হওয়া বা যে সকল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকা খুবই কষ্টকর। তাই আয়াতে সে ব্যবস্থাপত্র উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যা এ কঠিনকে সহজ করে দেয়। সে ব্যবস্থাপত্রে রয়েছে দুটি বিষয় ঃ সবর ও নামায। এ দুটো বিষয় গ্রহণ করলে প্রবৃত্তির জন্য উল্লিখিত বিষয়াদি গ্রহণ ও বর্জন সহজ হয়ে যায়। সবরের সম্পর্ক স্বভাব চরিত্রের সাথে এবং নামাযের সম্পর্ক ইবাদাতের সাথে মানুষের মধ্যে যদি বিপদাপদ উপেক্ষা করে সত্যের উপর মযবুত হয়ে টিকে থাকার গুণ না থাকে তাহলে পৃথিবীতে সে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ ও কীর্তি সম্পন্ন করতে পারবে না। কিন্তু বিপদাপদ সহ্য করে সঠিক অবস্থানে মযবুত হয়ে জমে থাকার গুণ অনায়াসে কারো অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় মেহনত ও পরিশ্রম করা। আর এ ক্ষেত্রে মেহনতের পদ্ধতি হচ্ছে নামায। মানুষ যদি সঠিক পথে চলার দৃঢ়সংকল্প করে নেয় এবং সে পথে চলতে শুরু করে, সেই সাথে সে তার রব আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকে এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে, সাহায্য প্রার্থনার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে নামায, সে নিয়মিত নামায পড়তে থাকে, তাহলে তার সংকল্পের শক্তি ও মযবুতী শতগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, কঠিন থেকে কঠিনতর কোনো সমস্যাতেও সে ঘাবড়ে যায় না। যদি এমন কোনো পরিস্থিতির উদয় হয় যা মানুষকে অস্থির ও উদ্ভ্রান্ত করে ফেলে তখনও আল্লাহর সাথে তার যে সম্পর্ক নামাযের মাধ্যমে গড়ে উঠে, সে সম্পর্কের দরুন আল্লাহ তাআলা তাকে সে নাজুক পরিস্থিতিতেও হেফাজত করেন।

উল্লিখিত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলা সবরের যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা এজন্য যে, ধৈর্যধারণের ন্যায় বিশাল এ গুণ অর্জন করা ছাড়া কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে বহাল থাকতে পারবে না। আর

www.pathagar.com

নামায আদায়ের যে আদেশ দিয়েছেন তা এজন্য যে, নামাযই সবর সৃষ্টি করে তাতে পরিবৃদ্ধি ঘটায়, শেষ পর্যন্ত তা পূর্ণতায় উপনীত হয়। পরবর্তীতে যেহেতু এ বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা করা হবে তাই এখানে এতটুকুই বিবৃত হলো।

এ স্থানে আমার উস্তাদ আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আমরা সর্বান্তকরণে তা গ্রহণ না করলেও বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ ; পরবর্তীতে তা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

وَاِنَّهَا-শব্দের هَا-এর ইঙ্গিত কোন্ দিকে

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ঃ এ আয়াতাংশে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহলো, وَاِنَّهَا শব্দের هَا সর্বনামটি কিসের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মুজাহিদ (র)-এর মতে, তা নামায বুঝাচ্ছে, ইবনে জারীর (র) এ মতটিকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন। অতএব, এ আয়াতাংশের তরজমা হবে, নামায আদায় করা প্রবৃত্তির জন্য বেশ কষ্টকর। কেবল তারাই এ বোঝা বহনের ক্ষমতা রাখে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সদা জাগরূক থাকে এবং আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তি এড়াতে যারা সদা সর্বদা আল্লাহর সমীপে নত হয়ে থাকে।

অপর একটি মত হচ্ছে, সর্বনামটি হেদায়াত ও নসীহতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার উস্তাদ (র) প্রথম মতটিকে সমর্থন প্রদান করে এর স্বপক্ষে বেশ কটি দলিল প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন, এখানে সবরের আলোচনা স্থগিত রেখে শুধু নামাযের আলোচনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত তিনটি কারণে ঃ

১. সবর যে কষ্টকর তা তো প্রকাশ্য বিষয়, তাই তা কষ্টকর বলার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তিনি এ বিষয়ে উদাহরণ প্রদান করে বলেন, সূরা আল বাকারার অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ "তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে রয়েছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৩। এ আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ধৈর্যধারণকারীদের সাথে রয়েছেন, সেখানে তিনি একথা বলেননি যে, তিনি নামাযী ব্যক্তিদের সাথে রয়েছেন। এর কারণ এই যে, নামাযের দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তি এতটাই প্রকাশ্য যে, তার উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। তেমনিভাবে আলোচিত আয়াতটিতে শুধু নামাযের উল্লেখ করেছেন, সবরের উল্লেখ করেননি, কারণ সবর যে কষ্টসাধ্য তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

২. নামায আদায়ের জন্য সবর করা জরুরী, কেবল তারাই নামায আদায় করতে পারে যাদের মধ্যে সবরের গুণ বিদ্যমান। নামাযের এ বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ রেখে সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই এ বিষয়টি প্রণিধান করা সম্ভব হয় যে, যখন নামাযকে কষ্টকর ও ভারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তখন স্বতঃই ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, এটি

www.pathagar.com

এ কারণে ভারী যে তাতে সবরের প্রয়োজন পড়ে। তাই এখানে সবরের ভিন্নভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

৩. সবর যেহেতু কষ্টকর, তাই তার এ বিশেষত্বের উল্লেখ করা হলে সম্বোধিত সকলের জন্য তা আরো বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে, তাই এ ক্ষেত্রে সবরের উল্লেখ না করে কেবল নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হালকা ও সহজ বলে বোধ হয়।

যদিও এ উল্লিখিত বক্তব্য খুবই চিত্তাকর্ষক এবং এ আলোচনার দ্বারা আলোচিত আয়াতটির অনেক বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমার নিকট দ্বিতীয় মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সবর ও নামাযের দ্বারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে একবচনের সর্বনাম একাধিক বিষয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ○ - القصص : ٨٠

"এবং যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বলে, ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া তা (অর্থাৎ ঈমান আনা এবং সৎকর্ম সম্পাদান করা) কেউ পাবে না।"
–সূরা আল কাসাস ঃ ৮০

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ○ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ○ حم السجدة : ٣٤-٣٥

"ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর ভালোর দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায়। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্য্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।"–সূরা হা-মীম সেজদা ঃ ৩৪-৩৫

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন, এ হেদায়াত কেবল দান করা হয় অথবা এ গুণের ইলহাম করা হয় কেবল তাদের প্রতি—

এ দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করা হলে সবর ও নামায উভয়টির সাথে এ সর্বনামটির সম্পর্ক প্রকাশিত হয় আর তা আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী হওয়ার সাথে সাথে মূল বক্তব্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, প্রবৃত্তির নিকট এ উভয়টিই কষ্টকর। সবর যে কষ্টকর তাতে তো কারো দ্বিমতের অবকাশই নেই, আর নামাযও যথানিয়মে

www.pathagar.com

নিয়মিতভাবে পড়ে যাওয়া এতটাই কষ্টর অনুভূত হয় যে, কেবল ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই তা নিয়মিত করে যেতে পারে।

لَكَبِيْرَةٌ : كَبِيْرَةٌ শব্দের এখানে অর্থ ভারী, কঠিন ও কষ্টকর। কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন : وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ - البقرة : ١٤٣ "(কেবলার পরিবর্তন) যদিও অনেক ভারী। কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভবপর যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন।"–সূরা আল বাকারা : ১৪৩। অপর এক আয়াতে এসেছে : وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ - الانعام : ٣٥ "যদিও তাদের উপেক্ষা করা তোমার নিকট কষ্টকর বোধ হয়।"–সূরা আল আনআম : ৩২

خُشُوْعٌ - এর বিশ্লেষণ

اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ : خشوع শব্দের অর্থ দীনতা-হীনতা, কাকুতি-মিনতি করা। নিম্নস্বরে কথা বলাও এর একটি অর্থ। দৃষ্টি আনত হওয়াও অপর এক অর্থ। তা ছাড়া, উটের কুঁজ দুর্বলতার দরুন দেবে গেলেও خشوع শব্দের দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়।

পূর্বে আল্লাহর ওয়াদায় দৃঢ়পদ থাকার জন্য সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার যে নসীহত প্রদান করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গেই এখানে বলা হচ্ছে যে, এ পথটি সহজসাধ্য কেবল তাদের জন্য যারা আল্লাহর ভয়ে সদা ভীত থাকে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সদা জাগরুক থাকে, যাদের অন্তরে অহংকার ও ঔদ্ধত্য থাকে না মোটেই এবং আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার ভয়ে যারা সর্বদাই থাকে সন্ত্রস্ত ও সতর্ক সজাগ। যারা আল্লাহর ভয়মুক্ত তারা এ পথের পথিক হতে পারে না, যারা বংশীয় ও গোত্রীয় বড়াই করে বেড়ায় এবং যারা আল্লাহর ও আখেরাতের ভয়-ভীতির তুলনায় নিজেদের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকে তারা কখনো এ পন্থার উপকার লাভে সক্ষম হতে পারে না।

আল্লাহর ভয় হচ্ছে সবর ও নামাযের ভিত্তি বুনিয়াদ। সবরের অর্থ তো যাবতীয় বিপদাপদ উপেক্ষা করে আল্লাহর ওয়াদা অঙ্গীকারে মযবুতভাবে জমে থাকা। এটি কেবল সে-ই করতে পারে যার নিকট আখেরাতের শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ্য, ফলে সবরের কষ্ট তার নিকট অতি তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়। তেমনিভাবে যারা দীন ও শরীআতের জ্ঞানে জ্ঞানী তারা প্রত্যেকেই জানেন যে, নামাযেরও মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর ভয়। কুরআনের একাধিক জায়গায় তা বর্ণনাও করা হয়েছে। যেমন :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ○ - مؤمنون : ١

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সফলকাম, যারা তাদের নামায আদায়ে ভীত সতর্ক থাকে।"
–সূরা মু'মিনূন : ১-২

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ○ - الانبياء : ٩٠

"আমাকে আগ্রহ ও ভয় সহকারে ডাকতো এবং আমাদের নিকট ছিল ভীত অবনত।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯০

আয়াত ঃ ৪৬

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

'যুন্ন' (ظَنٌّ) শব্দের তাৎপর্য

কোনো জিনিস না দেখে তার সম্পর্কে মানুষ মনে যে ধারণা পোষণ করে তাকে 'যন' বলা হয়। এ জাতীয় 'ধারণা' নিশ্চিত অর্থ প্রকাশ করে না বিধায় সন্দেহের সাথে তার কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। উভয়টি বরং একই অর্থবোধক মনে হয়। সুতরাং আরবী ভাষা ও পবিত্র কুরআনে সন্দেহ অর্থে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। জাহেলী কবি তুরফার কবিতা এ ব্যাপারে লক্ষণীয়। যথা ঃ

واعلم علما ليس بالظن انه　　اذا ذل مولي المرء فهو ذليل

"আমি একটি বিষয় জানি যা কেবল ধারণা প্রসূত নয় বরং প্রায় নিশ্চিত যে, কারো চাচাত ভাই লাঞ্ছিত হওয়া কার্যত তার নিজেরই অপমান।"

অনুরূপ পবিত্র কুরআনে ঃ

اِنْ نَّظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ○ ـ الجاثية : ٣٢

"আমরা জানি না কেয়ামত কি। আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই।"–সূরা আল জাছিয়া ঃ ৩২

কিন্তু ধারণাকৃত না দেখা বিষয়টি সন্দেহ যুক্ত হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। সময় বিশেষ সেটা নিশ্চিতও হতে পারে। তাতে কোনো বাধা নেই। ظن (যন্ন) শব্দটি এহেন নিশ্চিত অর্থেও ব্যবহার হয়। তখন সন্দেহের অর্থ পরিহার করে তাকে সাধারণ অর্থেই ধরে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আওস বিন হজরের কবিতা লক্ষণীয় ঃ যথা ঃ

الا لمعي الذى يظن بك الظن　　كان قد راى وقد سمعا

"সে জ্ঞানী ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে যদি কোনো ধারণা করে, তাহলে দেখে শুনে নিশ্চিত হয়েই করে।"

দুরাইদ বিন সালমা বলেন ঃ

فقلت لهم ظنوا بالفى مدجج　　سراتهم فى الفارسى المسرد

"আমি তাদেরকে বললাম—সুতীক্ষ্ণ আংটাওয়ালা লৌহবর্ম পরিহিত সেনাপতির নেতৃত্বে দুই হাজার অশ্বারোহীর এক সুসজ্জিত বাহিনীর নিশ্চিত সমাবেশ তোমরা মনে করে নাও।"

www.pathagar.com

এটা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত خاشعين শব্দের অতিরিক্ত পরিচয় যে, তারা আখেরাত বিষয়ে লা-পারোয়া নয়। তারা বরং পুনরুত্থান এবং আল্লাহর সাক্ষাতে বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে তাদের স্বচ্ছ-সম্যক ধারণাও রয়েছে।

অধিকন্তু শব্দটি তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, মনের গতি প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করে। কেননা এ দ্বারা স্পষ্ট হয়। আখেরাতের ভয় এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চিন্তা তাদের অন্তরে বিনয়-নম্রতা ও নিজেদের অক্ষমতার ভাব জাগিয়ে তোলে।

ظن শব্দ দ্বারা 'খাশেঈন' (خاشعين) তথা ভয়কারীদের বাতেনী অবস্থার ব্যাখ্যা করার অন্তরালে সন্দেহ ও প্রবল ধারণার মর্ম তো আছেই ইয়াকীন ও নিশ্চিত অর্থও তাতে নিহিত রয়েছে। আখেরাতের ব্যাপার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, পুরোপুরি ইয়াকীন হওয়ার পরই কেবল এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এটা জরুরী নয়, বরং এর প্রস্তুতির জন্য মনের সন্দেহ এবং ধারণা সৃষ্টি হওয়াটাই যথেষ্ট। যেমন নগর রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার তোড়ে ঘর-বাড়ী তলিয়ে গেলেই কেবল তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে, এমন কথা বুদ্ধিমান লোক বলতে পারে না। বরং সর্বনাশা এ বিপর্যয়ের হাত থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা তখনও নেয়া যায় এবং নেয়া কর্তব্য যখন দৃশ্যত একে সুরক্ষিত মনে হয়।

ক্ষণস্থায়ী ও সামান্যতম বিপদের কবল থেকে বাঁচার জন্য যদি এত প্রয়াস-প্রতিকার ও এহেন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়। অথচ সেটি এখনো অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান, তাহলে পরকালের চিরস্থায়ী বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়টি এত উপেক্ষিত এত অবহেলিত থাকার কি কারণ? যে ঘাড়ের উপর বিপদ পতিত হয়ে পূর্ণ ইয়াকীন না হওয়া পর্যন্ত এ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করা হবে না অথচ বিপদ তার আলামত নামের অগ্রসেনা পাঠিয়ে আগাম জানিয়ে দিয়েছে—আমার আগমন নিশ্চিত। বাঁচতে চাইলে সাবধান হয়ে যাও।

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ : অর্থাৎ "তাঁরই প্রতি তাদেরকে ফিরে যেতে হবে" শব্দে তাওহীদ ও তাফবীযের (একত্ববাদ ও সমর্পণ) তত্ত্বকথা বা হাকীকত একই সাথে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাওহীদের কথা এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, তারা বিশ্বাস রাখে—আখেরাতে সকল বিষয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড একক ও লা-শরীক আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। সাজা কিংবা প্রতিদান যাকে যা কিছু দেয়ার এককভাবে তিনিই দেয়ার একচ্ছত্র মালিক এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে দেয়া হবে। তাঁর ফায়সালাই চূড়ান্ত মীমাংসা হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে কারো কিছু বলার বা আপত্তির অবকাশ অকল্পনীয়। তাঁর গযব থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা কারো নেই। إِلَيْهِ শব্দটি رَاجِعُونَ -এর পূর্বে উল্লেখ দ্বারা উপরোক্ত অর্থ প্রকাশ পায়। আর তাওহীদ প্রসঙ্গ আনা এখানে প্রয়োজন এজন্য যে অন্তরে শিরকের গন্ধ মাত্র থাকাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকীদা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা মুশরিক ব্যক্তি মনে করে শরীকদের কল্যাণে প্রথমত আল্লাহ তাকে পাকড়াওই করবেন না।

www.pathagar.com

অগত্যা যদি ধরেই ফেলেন, তবে তদবীর ও সুপারিশ বলে শরীকরা তাকে ছাড়ানোর বিহিত ব্যবস্থা করেই দিবে।

দ্বিতীয়ত, তাফবীয তথা সমর্পণের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এতে নিহিত রয়েছে। সেটা এভাবে, আল্লাহর বন্দেগীতে অটল-অবিচল থাকার ফলে যে কষ্ট-যাতনা, বিপদ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়, সেটা তারা হাসি মুখে বরণ করে নেয়। কারণ তাদের একান্ত বিশ্বাস—যাঁর পথে চলতে গিয়ে তারা এহেন বিপদের সম্মুখীন, সে সত্ত্বার কাছেই তো তাদের গমন। কদমে কদমে তাঁরই সান্নিধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সামনে যেহেতু কাম্য সত্ত্বা প্রেমাস্পদ রয়েছেন, তাই পিছনের হৈ হুল্লোড় আর চেঁচামেচিতে কান দেয়ার কোনো মানে হয় না। যথা কবির ভাষায় ঃ

کیا غم ھے اگر ساری خائی ھو مخالف

کافی ھے اگر ایك خدا کیوے لیے ھے -

"এক আল্লাহ যদি আমার সহায় থাকেন, তবে মিথ্যা খোদার গোষ্ঠী বিরোধী হয়—হোক, তাতে পরোয়া নেই। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।"

২৮. ৪০-৪৬ আয়াত সমষ্টির মর্ম বিন্যাস

শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যার পর সংক্ষেপে এখন উপরোক্ত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক মর্ম বিন্যাসের উপর আলোকপাত করতে চাই। যাতে আয়াত সমষ্টির পারস্পরিক যোগসূত্র এবং প্রতি বিষয়ের প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে যায়। উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে তিনটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

(ক) যে নেয়ামতরাজি আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন, তারা যেন সে সমস্ত স্মরণ রাখে—ভুলে না যায়। যোগ্যতার ভিত্তিতে পাওনা হিসেবে এসব নেয়ামত দেয়া হয়নি। তাই পৈতৃক মীরাস হিসেবে এ সমস্ত ভোগ দখলের অধিকার তাদের স্বীকৃত নয়।

(খ) মহান আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার তারা পূরণ করুক। তাহলে আল্লাহও তাদের সাথে কৃত ওয়াদা যথাযথ পূরণ করে দেবেন।

(গ) ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে—অপর কাউকে নয়।

কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াতের তিনটি দিক

উপরোক্ত তিনটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তাদেরকে কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ দাওয়াত মূলত উপরোক্ত বিষয় তিনটি কেন্দ্র করেই আবর্তিত। যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের দিক থেকে কুরআনের ওপর ঈমান আনা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল। কারণ যাহেরী বাতেনী যত নেয়ামত তারা লাভ করেছিল কুরআনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সেগুলোর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছিল। তাই বলা যায় তাদের প্রতি সর্বশেষ নেয়ামত কুরআনের আকৃতিতেই এসেছিল আর নাযিল হওয়ার আগেই আল্লাহ তাদেরকে কুরআন নামের সে নেয়ামত সম্পর্কে জানিয়ে খবরদার করেছেন। পূর্ব থেকেই তারা যেন এর আসার অপেক্ষায় থাকে। অতপর যখন এসে যাবে তারা নিজেরা একে সানন্দে গ্রহণ করে নিবে। অপরকেও দাওয়াত দিবে—এটি আল্লাহর কিতাব, অফুরন্ত নেয়ামতের বাহক। এর প্রতি অবহেলা-উদাসীনতা অমার্জনীয় অপরাধ। যার পরিণামে তোমাদের থেকে এ নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়াও বিচিত্র নয়। এক পর্যায়ে সে নেয়ামত যখন নাযিল হলো, তখন এর যথাযথ মূল্যায়নের জন্য তাদরেকে দাওয়াত দেয়া হয়। বলা হলো—তোমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়ামতের সঠিক মূল্য দাও। অন্যথায় নেয়ামত অস্বীকৃতির দায়ে তোমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। পরিণামে তোমাদের সকল আশার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

অঙ্গীকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ দাওয়াত গ্রহণ করা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল। কারণ আখেরী নবী (স) এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনার জন্য ইতিপূর্বে তাওরাতে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। এখন ঈমান বিমুখ হওয়ার অর্থ-পার্থিব লোভ-লালসা ও দুনিয়ার অবাঞ্ছিত মোহে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা।

তৃতীয়ত, ‘খাশিয়াতে ইলাহী’ তথা আল্লাহ ভীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনী দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। এ কারণে যে, এত সমস্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং তাওরাতে বর্ণিত স্পষ্টতর ওয়াদা-অঙ্গীকার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈল গোত্রীয়দের পক্ষ থেকে কুরআনী দাওয়াত মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা এবং বিরোধিতার পথে এগিয়ে যাওয়া কার্যত দুঃসাহসিক ব্যাপার। যা আল্লাহর গযব ডেকে আনার অর্থবহন করে। সুতরাং কুরআন তাদেরকে এ মর্মে হুশিয়ার করে দিতে চায়—কাল্পনিক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দাওয়াত গ্রহণ না করার পরিণামে আল্লাহর নিশ্চিত আযাব থেকে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া কল্যাণের বিষয় নয়। এ মিথ্যা আরচণের কারণে বরং আযাবের সম্মুখীন তাদের হতেই হবে। যার কবল থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই।

ঈমানের দাওয়াত এবং ব্যাপক অর্থে স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর বিশেষ করে ইহুদী আলেম-ওলামা, সমাজপতি, জাতীয় নেতৃবর্গকে সম্বোধন পূর্বক সাবধান করে বলা হয়েছে—আসমানী কিতাব এবং শরীআত জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ আর সত্য গোপনের স্বার্থবাদী যে ব্যবসায় তারা এখন লিপ্ত, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে না। কিতাব ও শরীআতের যে জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়েছে, তার আলোকে আপন গোত্রকে সরল পথে টেনে আনার চেষ্টা করাই তাদের কর্তব্য। কিন্তু সে হক আদায় করার পরিবর্তে জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার মাধ্যমে তারা যদি আপন মর্যাদা নস্যাৎ করে দেয়, আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার আসন তারা মাটিতে মিশিয়ে দেয়, তাহলে বুঝা উচিত—তাদের অধিষ্ঠিত সে আসন ছিনিয়ে নেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। সাধারণ ও বিশেষ উভয় শ্রেণীর লোকদের আমল-আকীদার এহেন বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করার পর নিম্নে এর প্রতিকারের ধারাবাহিক উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমত নামায, যাকাত ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করার নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত অস্বীকৃতি, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও খোদাভীতিহীনতা রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল গোত্রীয় লোকেরা কার্যত যে রোগে আক্রান্ত ছিল।

নামায দ্বারা প্রতিকার এভাবে করা হয়েছে যে, এটি যিকির ও শোকরের সমষ্টি। তদুপরি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পূরণ তার অন্তরালে নিহিত। যত্নসহকারে নিয়মিত নামায আদায় করার কল্যাণে জীবনের সমস্ত পথ খুলে যায়, যে পথের সন্ধান দেয়ার উদ্দেশ্যে শরীআতের আগমন এবং যার উপর এটি কায়েম রয়েছে। এ সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় নামাযের হাকীকত ও তত্ত্বকথার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে বিধায় এখানে এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

দুনিয়ার মোহ, পার্থিব লোভ-লালসা, সম্পদের মায়ার টানে মানুষ যখন জড়িয়ে পড়ে, তখন সে কৃপণতা নামের ব্যধিতে এমনভাবে আক্রান্ত হয়—যাকাতের প্রতিষেধক ছাড়া যার নিরাময় কল্পনা করা যায় না। সমকালীন ইহুদী সম্প্রদায়ের অবস্থা তাই হয়েছিল। যে কারণে তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে এমনকি দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের বিনিময়ে দীন, ঈমান ও শরীআত পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে তারা সামান্যও কুণ্ঠিত হয়নি। ইহুদী সম্প্রদায়ের জাতীয় চরিত্রে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কত মারাত্মক ছিল কুরআনের আলোকে তার কিছুটা নমুনা আন্দাজ করা যায়। যথা ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّايُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ - ال عمران : ٧٥-٧٧

"আবার তাদের (আহলে কিতাবদের) মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যার কাছে তুমি একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফেরত দিবে না—যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে—উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোনো পাপ হবে না। বস্তুত আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই তারা মিথ্যা রটনা করে। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে, তবে অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীকে ভালবাসেন। কিন্তু যারা আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা তুচ্ছ দামে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। (এমন কি) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, (করুণার দৃষ্টিতে) তাদের

www.pathagar.com

প্রতি তাকাবেন না। উপরন্তু তাদেরকে পরিমার্যিত করবেন না। ফলে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৫-৭৭

অতপর রুকূ'কারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ' করার আদেশ দেয়া হয়েছে।[১] কেননা সাধারণ নামাযীদের সাথে শরীক হয়ে নামায আদায় করার আদেশ দ্বারা মূলত অহংকার, আত্মগর্ব ও হামবড়াভাব চূর্ণ করে তাদের মধ্যে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য ঈমানের পথ খুলে দেয়া উদ্দেশ্য। যেহেতু সম্ভ্রান্ত ইসরাঈলী ঘরে জন্ম নেয়ায় বংশ গৌরব তাদেরকে আরবের উম্মী নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণে বাধা দিয়ে রেখেছিল, উপরোক্ত নিয়মে নামায আদায়ের হুকুম দ্বারা তাদের সে উঁচু নাক নীচু আর বড় মুখ ছোট করে দেয়া হয়েছে।

অতপর ইহুদী গোত্রীয় লোকদের জাতীয় ব্যাধির নিরাময় ব্যবস্থা নির্দেশের পর কথার মোড় ইহুদী আলেমদের প্রতি ঘুরানো হয়েছে। বলা হয়েছে—তারা অপরকে তো সৎ কর্মের উৎসাহ আর দীনদারীর ওয়াজ করে বেড়ায়, কিন্তু নিজের বেলায় বিমুখ-উদাসীনতার পরিচয় দেয়। অথচ ইলাহী গ্রন্থের মর্ম ও তত্ত্ব কথা তারাই অধিক বুঝে। যে কারণে সম্বোধনের মাত্রা জনসাধারণ অপেক্ষা স্বয়ং ইহুদী আলেমদের প্রতি তীব্রতর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং জনচরিত্র সংশোধন ও পবিত্র করণে তারা যে পরিমাণ তৎপর, সে অনুপাতে তারা নিজেরা যদি আল্লাহর ভয়ে ভীত, আল্লাহর হক আদায়ে কর্ম চঞ্চল এবং ফরয ওয়াজিবের দাবী ও চাহিদা পূরণে বাস্তবধর্মী অগ্রণী ভূমিকা রাখত। তাহলে মুহূর্তের ব্যবধানে জনগণের ইসলাম গ্রহণের সকল বাধা দূরীভূত হওয়া অসম্ভব ছিল না। কেননা এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও বাধার প্রাচীর অন্য কারো নয় তাদেরই হাতে গড়া হিমালয়। কিন্তু মুশকিল হলো—উপদেশ দানকারী তথাকথিত এ সকল আলেম গোষ্ঠীর নিজেদের কানই যে বদ্ধ-বধির—এ রোগের চিকিৎসা কোথায়?

এ সমস্ত হুশিয়ারী ও হেদায়াত বর্ণনার পর কর্মনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে, যার ওপর আমলগুণে বনী ইসরাঈলের জন্য শেষ নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনার কল্পিত কঠিন কাজ পানির মত সহজ হওয়ার ছিল। সে নীতি হলো—সর্বাবস্থায় ধৈর্যের রশি ধরা এবং নামাযের পাবন্দী করা। তাই সে নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—কু-প্রবৃত্তি মনগড়া বেদাআত ও রেওয়াজ-প্রথা বর্জন, একইভাবে মোহময় নেতৃত্বের ধূর্মজাল ছিন্ন করে কুরআনে বিশ্বাস করা যদি এতই কঠিন-কষ্টকর মনে হয়, তবে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য নাও। বস্তুত কঠিনকে সহজ করার জন্য

১. وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ সম্পর্কে আমার ধারণা এতে ইহুদী সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, বর্তমানে যে সকল লোক দীনের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে তৎপর এবং সম্মিলিত আকারে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত, তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা বন্ধ করে বরং তোমরাও তাদের কাতারে শামিল হয়ে যাও। আমার মতে এ অর্থ নেয়া হলে وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ আয়াতে ইহুদীদেরকে যে মর্মে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, এ অংশটুকু তারই সমার্থবোধক সাব্যস্ত করতে কোনো জটিলতা থাকে না। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতে وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ আয়াতে উল্লেখিত দাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বলা যায়।

www.pathagar.com

এ দুয়ের আশ্রয় বিকল্পহীন কার্যকর উপায়। বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

২৯. ইসলামে নামাযের গুরুত্ব

এখানে চিন্তা করা হলে দেখা যাবে নামাযের কথা পরস্পর দুবার আলোচিত হয়েছে। প্রথমে وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۔ আয়াতে। যার অর্থ—"তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও আর রুকূ'কারী লোকদের সাথে রুকূ' কর।" (৪৩ আয়াত) এর মাত্র এক আয়াত পর। وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ۔ আয়াতে দ্বিতীয়বার "তোমরা ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য এটা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু আল্লাহভীরু বিনয়ী লোকেরা এর ব্যতিক্রম। (তাদের জন্য নামায কঠিন কিছু নয়।"–৪৫ আয়াত

দুই দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযের আলোচনা

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে একই নামাযের আলোচনা হয়েছে বটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যে অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তার প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো—আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাওহীদের স্বীকৃতি। দ্বিতীয় আয়াতে একই নামাযের আলোচনা তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। বলা হয়েছে—যাবতীয় কল্যাণ, মঙ্গলের চাবিকাঠি, সকলের সহায়ক ও অর্জনের উসীলা একমাত্র নামায। অন্য কথায় শরীআতের সূচনা যেরূপ নামাযের মাধ্যমে তার স্থিতিও তদ্রূপ এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম পর্যায়ে যাকাত নামাযের সম্পূরক শর্ত, দ্বিতীয় স্তরে সবর বা ধৈর্য তার অনিবার্য সাথী। আকীদার সীমা ছাড়িয়ে দীন যখন বাস্তবের অঙ্গনে পা রাখে, নামাযের দ্বারাই তার প্রথম আমলের ধারা শুরু হয়। অতপর দীনের স্থায়িত্ব এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়নে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় এ ক্ষেত্রেও নামাযের ভূমিকা সর্বাধিক। নামাযের এ গুরুত্বের কারণে এর উভয় দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং নিম্ন বর্ণিত পরিচ্ছেদে প্রথম দৃষ্টিকোণ আর পরবর্তী পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্র শিরোনামে ২য় দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

নামায ও যাকাত শরীআতী বিধি-বিধানের ভিত্তিমূল

নামায এবং যাকাত শরীআতসম্মত হুকুম আহকামের মূলভিত্তি, কথাটা আমরা ইতিপূর্বে সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করেছি। উল্লেখ্য—শরীআতের বিধি-বিধান হুক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ (আল্লাহর হক ও বান্দার হক), এ দুই ভাগে বিভক্ত। আল্লাহর হক সম্পর্কিত বিধানগুলোর উৎস নামায আর বান্দার হকসমূহ যাকাতের ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত। পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী নিম্নে এমন কতিপয় আয়াত আমরা উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি যদ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কৃত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে সমস্ত বিধান কার্যকর করা অপরিহার্য—তন্মধ্যে ঈমানের পর নামাযের

www.pathagar.com

গুরুত্ব সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈল গোত্রীয় লোকদের কাছ থেকে যে ওয়াদা নেয়া হয়েছিল, কুরআনের আলোকে সেটি বিশেষ নযরে চিন্তার দাবী রাখে। সুতরাং এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۖ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○ - المائدة : ١٢

"(স্মরণ কর, যখন) আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন সরদার নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলে দিলেনঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং উত্তম পন্থায় আল্লাহকে ঋণ দিতে থাক, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপ মোচন করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব যেগুলোর তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এরপরও তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কাফের হয়, নিশ্চিতই সরল পথ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১২

বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন উপরোক্ত আয়াতে তারই উদ্ধৃতি। এতে নামাযের কথাটা আলোচিত হয়েছে সর্বাগ্রে—অন্য বিষয় পরে।

তদ্রূপ বনী ইসরাঈলের পতন যুগের উল্লেখ যে সমস্ত আয়াতে পাওয়া যায়, তাতে এ নামায বর্জনকেই তাদের পতনের অন্যতম কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত নফসানী খাহেশে মত্ত হওয়ার পরিণামে তারা নামায ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। যা তাদের জাতীয় পতন ত্বরান্বিত করে দেয়। কুরআনের ভাষ্যে যার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○

"অতপর এমন অপদার্থ লোকেরা তাদের স্থলবর্তী হয়ে এলো। যারা নামায বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে লেগে গেল। পরিণামে অচিরেই তারা পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯

একইভাবে অন্য আয়াতের আলোকে কথাটা আরো স্পষ্ট হয় যে, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং এর সযত্ন সংরক্ষণ করা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ওপর কায়েম থাকার অন্যতম শর্ত। আর কাম্য বিষয়ও বটে। যথা—

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ○ - الاعراف : ١٧٠

www.pathagar.com

"আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। (কার্যত এরাই সৎকর্মশীল)। আর সৎকর্মীদের সওয়াব আমি আদৌ বিনষ্ট করবো না।"-সূরা আল আরাফ ঃ ১৭০

অত্র আয়াতের আলোকে একদিকে স্পষ্টত বুঝা যায় কিতাবুল্লাহ অন্য কথায় আল্লাহর সাথে সম্পাদিত প্রতিজ্ঞায় সুদৃঢ় থাকা কেবল নামায প্রতিষ্ঠাকারীদের পক্ষেই সম্ভব। অপরদিকে বুঝা যায়—কিতাবুল্লাহর ওপর অটল থাকা এবং অন্যদেরকে অটল রাখার উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করে তারাই মূলত যমীনের বুকে সৎকর্মশীল ব্যক্তিরূপে পরিচিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টার বিনিময় ও প্রতিদান অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

৩০. ধৈর্য ও নামায দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্যের চাবিকাঠি

নামাযের এ গুরুত্ব আল্লাহর সাথে সম্পাদিত প্রতিশ্রুতির দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের স্থান এখানে অনুবর্তী ও তাবে হিসেবে। এবার ইকামাতে দীন তথা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এর ভূমিকা কি এবং গুরুত্ব কতটুকু, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন মনে করি। অবশ্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে ধৈর্য ও সবরের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই নামাযের সাথে এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু ভাব ও মর্ম বিবেচনায় এখানের পরিবর্তে وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করাই সঙ্গত মনে হয়।

দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সফল হওয়া ধৈর্য ও নামাযের ওপর নির্ভরশীল

দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সফল হওয়া ধৈর্য ও নামায—এ দুটি বিষয়ের ওপর আল্লাহ নির্ভরশীল করেছেন, কুরআন গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তি মাত্রই কথাটা জানে। আপন গোত্রে হযরত মূসা (আ) দীন প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেটি কামিয়াব করার লক্ষে এ দুটি বিষয়ের সাহায্য নিতে তাদেরকে তিনি আদেশ ও উপদেশ দিয়েছিলেন। যথা—আল কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج ـ الاعراف : ١٢٨

"মূসা তাঁর কওমকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর।"-সূরা আল আরাফ ঃ ১২৮

আয়াতে নামাযের পরিবর্তে আল্লাহ শব্দ প্রয়োগ হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে যে একমাত্র নামায, একথা কে না জানে? অপর আয়াতে এর উল্লেখ স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে মুসলমানরা যখন দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে অনুরূপ সংগ্রাম শুরু করে দিল এবং এ পথে পরীক্ষার পালা শুরু হলো, তখন তাদেরকেও ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ○ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ○ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ○ ـ البقرة : ١٥٣-١٥٨

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ তো ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। আর আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। তারা বরং জীবিত, কিন্তু তোমরা সেটা বুঝতে পার না। আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব সামান্য ভীতি, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে (হে রাসূল!) সুসংবাদ প্রদান কর ধৈর্যশীলদের (এ মর্মে যে,) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন তারা বলে—নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই নিকট ফিরে যাব। বস্তুত তারাই সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও অফুরন্ত রহমত এবং এসব লোকই হেদায়াত প্রাপ্ত।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৩-১৫৭

মক্কী জীবনের কথা। দীনের দাওয়াত প্রচারের ফলে নবী করীম (স)-কে শত্রু পক্ষ যখন চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে নিল, তখন বার বার তাঁকে একই উপদেশ দেয়া হয়েছে। তাই মক্কী সূরাসমূহের মর্ম লক্ষ করলে দেখা যায়, কাফের-মুশরিকদের বিরোধিতার কথা উল্লেখের পর সাধারণত তাঁকে দৃঢ়পদ থাকার এবং নামাযে দণ্ডায়মান থাকার তাকীদ করা হয়েছে। বহু সূরায় এর প্রমাণ লক্ষ করা যায়। সংক্ষেপ করণ প্রয়াসে এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করি। যথা ঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج ـ طه : ١٣٠

"এরা যা বলে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ও সপ্রশংসা মহিমা ঘোষণা করুন।"

–সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩০

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ـ ق : ٣٩

"সুতরাং তারা যা কিছু বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসামূলক পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"–সূরা ক্বাফ ঃ ৩৯

www.pathagar.com

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ـ الطور : ٤٨

"আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় আপনি সবর করুন। আপনি তো আমার দৃষ্টির সামনেই আছেন আর গাত্রোত্থানকালে আপনি নিজ পালনকর্তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"-সূরা তূর ঃ ৪৮

উপরোক্ত বিশদ আলোচনা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়—সত্য-মিথ্যার সংগ্রামে বাতিলের মুকাবিলার জন্য মু'মিনদেরকে আল্লাহ নামায ও সবর নামের দুটি হাতিয়ারে সজ্জিত করে ময়দানে আসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এ দুটির স্বভাব ও প্রকৃতি বিষয়ে আপনি চিন্তা করুন, দেখতে পাবেন—উভয়ে এরা একে অপরের শক্তির যোগানদার। নামায দ্বারা সবরের শক্তি আসে আবার সবরের বলে নামায বলিয়ান হয়ে উঠে। পূর্বে আমরা ইঙ্গিতে বলেছি—নামায গতানুগতিক ও সহজসাধ্য আমল নয়, এর জন্য চাই মনস্তাত্বিক ধৈর্য এবং চেতনাগত প্রস্তুতি। কারো মধ্যে যতক্ষণ পরিপক্ক ধৈর্য গুণের মাত্রাযোগ না হয়। যথাযথ হক আদায় এবং আত্মার বিশুদ্ধ টানে নামাযে দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবর দ্বারা নামাযের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তার মধ্যে নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। একইভাবে জীবনের প্রতিটি ধাপে আল্লাহকে ভয় করা এবং দীনের পথে চলতে গিয়ে সকল বিপদ-বিড়ম্বনা সহ্য করাই সবরের মূল কথা। কোনো শক্তিশালী মাধ্যমের আশ্রয়-সাহায্য ছাড়া এ ভয় অর্জিত হয় না। আর আল্লাহই হলেন এ শক্তিশালী মাধ্যম। এখন প্রশ্ন আসে আল্লাহ যেহেতু চূড়ান্ত আশ্রয় কেন্দ্র এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সম্পর্ক জোড়ানোর সূত্র কি হবে ? এক কথায় এর উত্তর বলতে গেলে নামাযই সে সূত্র, যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থির করা যায়। وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ـ আয়াতে চূড়ান্ত ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—'সবর কর'।[১] **অর্থাৎ দীনের পথে দৃঢ়পদে জমে থাক। তবে মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এর ওপর জমে থাকা তোমাদের সম্ভব নয়।"-সূরা আন নাহল ঃ ১২৭**

বলা বাহুল্য বিপদে ধৈর্যহারা না হওয়া এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে স্থির থাকা একটি বাস্তবসম্মত গুণ। যার অভাবে ব্যক্তি কিংবা জাতীয় কোনো জীবনই সুন্দর-সুষমাসিক্ত হওয়ার আশা করা যায় না। যে কারণে প্রত্যেক জাতি তার অধীনস্থ লোকদের মধ্যে এ চেতনা সৃষ্টি করার লক্ষে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। বর্তমানের আধুনিক যুগ

১. মরহুম উস্তাদ ফরাহীর মতে اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতের অর্থ—মযবুত ও দৃঢ়ভাবে নামাযে কায়েম থাকা। সবর ছাড়া নামাযে কায়েম থাকা যেহেতু সম্ভব নয়, কাজেই এর সাথে ধৈর্যগুণকে শর্ত ও মাধ্যম হিসেবে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মাওলানার মতে নামায একটি বড় সেতুর মত, যাকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছে। তদুপরি ভিত্তি মযবুত ও পাকা করা ছাড়া যার স্থিতি তো দূরের কথা নির্মাণ করাই সম্ভব নয়। আপন মতের সপক্ষে তাঁর দলীল وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا আয়াত। যার অর্থ—"নিজ পরিবারকে নামাযের হুকুম দাও এবং তুমি নিজেও এর উপর দৃঢ় থাক।"-সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩২। এ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত দ্বারাও তিনি প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করে থাকি।

www.pathagar.com

পরিমণ্ডলে জাতীয় চেতনায় ব্যক্তি স্বত্ত্বাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কখনো সুনাম সুখ্যাতির লোভ দেখানো হয়, আবার কখনো জাতীয় গৌরব রক্ষার গীত গাওয়া হয়। এমনকি এর জন্য রীতিমত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তো মামুলী ব্যাপার। সন্দেহ নেই এ জাতীয় উত্তেজনা ব্যক্তি মনের সুপ্ত অঞ্চলে ঝড়ো বাতাস বইয়ে দেয় এবং শীতল প্রাণে উত্তাপের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সেটা মনের নেশা ও ফুটন্ত বুঁদবুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং অপরিণামদর্শী চিন্তার মনোরম আকর্ষণ মাত্র। পক্ষান্তরে ধর্মীয় মতবাদ প্রসূত নৈতিক চিন্তাধারা আপন বলয়ে নিজস্ব বেষ্টনীর মধ্যে জড়িয়ে ব্যক্তি মনে শক্তি সাহস বৃদ্ধির কার্যকর অথচ স্থিতিশীল প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সে প্রশিক্ষণ এমনি দিক নির্দেশক যে, একদিকে জীবনের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি পর্যায়ের লক্ষ স্থির করে তার ওপর অটল থাকার প্রতি জোর তাকীদ করে। অপর দিকে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করত জীবনের পারলৌকিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়। যার ইঙ্গিত قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - ("আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই জন্য।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬২) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষ করুন, সত্যের উপর কায়েম থাকা এবং বাতিলের মুকাবিলার জন্য আয়াতের এ শিক্ষা দ্বারা যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, পুরস্কারের লোভ আর জাতীয় ভালবাসার গলা ফাটা শ্লোগানে সে উদ্দেশ্য আদৌ হাসিল হতে পারে না।

এখানে একটি তত্ত্ব কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেটি হলো—দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হাতিয়ার হিসেবে যেসব ক্ষেত্রে নামাযের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, প্রথমত পাশাপাশি সবরের আলোচনা সেখানে অবশ্যই বর্ণিত পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত সেসব ক্ষেত্রে ধৈর্যের কথা নামাযের পূর্বে এসেছে। এ দ্বারা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই পাওয়া যায় যে, সত্য প্রতিষ্ঠা আর মিথ্যা অবসানের সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা, ইস্পাত কঠিন সংকল্প এবং পাহাড় তুল্য স্থিরতাই মূল কাম্য বিষয়। নামাযের সযত্ন প্রয়াসের সাথে সাথে মানুষ যদি উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করে নিতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তার অন্যান্য সুপ্ত গুণ উজ্জ্বল হওয়া স্বাভাবিক। যে কোনো জটিল সমস্যার মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে তার অন্তর খুলে যাওয়া নিশ্চিত। তদুপরি ঈমান ইয়াকীনের বারি সিঞ্চনে তার মন-প্রাণ বিধৃত হওয়া অবধারিত বলা যায়। কিন্তু সংকল্প, ইচ্ছা ও চেতনা শক্তিকে স্থবির করে কেউ যদি নির্জন হুজরায় বসে কেবল আল্লাহ আল্লাহ যিকির করাকেই যথেষ্ট মনে করে নেয়, তাহলে তার নামায উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থহীন না হোক উপকারহীন তো বটেই।

৩১. জাতীয় সংশোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে ৪০-৪৬ আয়াত সমষ্টির বিশেষ শিক্ষা

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে হেদায়াত ও শিক্ষার যে ধারা প্রবাহিত হয়, ইতোপূর্বে আমরা তার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি। এখন এ সমস্ত আয়াতের মর্ম

www.pathagar.com

প্রসূত একটি বিশেষ তত্ত্বকথার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না। জাতীয় সংশোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে যা গুরুত্বের দাবী রাখে।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের মধ্যে ঈমানের পর নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক। উপরন্তু এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির নবায়ন প্রচেষ্টায় নামায মূলত দেহের ভিতর প্রাণ সদৃশ এবং সাফল্যের অন্যতম উপায় বিশেষ। এছাড়া সূরা আল আরাফের ১৭০ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ - আয়াতের আলোকে স্পষ্ট করা হয়েছে—কুরআনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কিংবা জাতীয় যে কোনো সংশোধনের কার্যকর নিয়ম হলো, আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরা, তার নির্দেশ অনুসারী বাস্তবে আমল করা। অঙ্গীকারের এটাই মূল উদ্দেশ্য ও সারকথা। এর ওপর নিজে আমল করবে অপরকেও আমলের পথে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে—কোনো অবস্থাতেই, পিছল খেয়ে আল্লাহর এ রশি যেন হাতছাড়া না হয়। উপরন্তু আল্লাহর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রথম শর্ত হিসেবে হোক চাই সাফল্যের বিকল্পহীন উপায় হিসেবে যে কোনো বিবেচনায় নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই নামায কায়েমের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যে বিবেকের দাবী—সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। কুরআনের দৃষ্টিতে এটাই সংশোধনের পথ—একমাত্র উপায়। এ পথে যারা অগ্রসর হয় এবং কার্যত এ পথকেই গ্রহণ করে, তারাই প্রকৃত 'মুসলিম' তথা জাতীয় সংস্কারকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এহেন ব্যক্তিবর্গের প্রতিদান মহান আল্লাহর নিকট বিনষ্ট হতে পারে না।

কুরআনে হাকীমের এ বর্ণনা দীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জাতির সংস্কারের সকল আন্দোলন ও দাওয়াতকে পরখ করার জন্য একটি কষ্টিপাথর। এর দ্বারা এটা অবগত হওয়া যায় যে, ঐ দাওয়াত অথবা আন্দোলনই জাতির সংস্কারের জন্য সঠিক দাওয়াত ও আন্দোলন হিসেবে গণ্য—যার উৎপত্তিস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল, যার শুরু এবং শেষ, যার বিশ্বাস ও কর্ম, যার লক্ষবস্তু এবং কর্মসূচী উভয়ের মধ্যে নামাযকে এবং নামায প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সেই প্রাধান্য ও গুরুত্ব প্রদান করা হয় যা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনায় কুরআনের দৃষ্টিতে তাকে দেয়া হয়ে থাকে যে দাওয়াত ও আন্দোলনে।

নামাযের এ প্রাধান্য এবং গুরুত্ব নেই তা দীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সংশোধনের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি কল্যাণহীন নিরর্থক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা সেটা সেই মেরুদণ্ড থেকেও বঞ্চিত যার ওপর দীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাওয়াতের কাঠামো দণ্ডায়মান এবং সেই আত্মা থেকেও বঞ্চিত যা থেকে ঐ কাঠামো বা দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়।

৩২. পরবর্তী আলোচনা : ৪৭-৬২ আয়াত

পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইহুদীদেরকে সর্বপ্রথম একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার মাধ্যমে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের জীবনে যে মর্যাদা ও বড়ত্ব অর্জিত হয়েছে তা

www.pathagar.com

শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার করুণা এবং দয়ায় অর্জিত হয়েছে। এতে তোমাদের যোগ্যতারও কোনো হাত নেই তোমাদের বংশগত মর্যাদার কারণেও তা হস্তগত হয়নি। এ জাতীয় ধারণা কিংবা অহমিকায় নিমজ্জিত থাকার কারণে সেই সত্য দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না যা তোমাদের সামনে পেশ করা হলো। অন্যথায় তোমরা সেই অত্যাসন্ন দিনের কথা স্মরণ করো যে দিন তোমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহি তোমাদেরকেই করতে হবে। তোমাদের অত্যাবশ্যকীয় কৃতকর্মের ব্যাপারে অন্যদেরকে যেমন প্রশ্ন করা হবে না, তেমনি অন্যদের ব্যাপারেও তোমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।

ইহুদীদের সামনে তিনটি নিগূঢ় বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা

এরপর বনী ইসরাঈলের প্রারম্ভিক ইতিহাসের কতিপয় ঘটনার বরাত দিয়ে তাদের সামনে তিনটি নিগূঢ় বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

এক ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর তোমাদের অকৃজ্ঞতা সত্ত্বেও যেসব নেয়ামত দান করেছেন, তা তাঁর অপরিসীম করুণা ও দয়ার বদৌলতেই দান করেছেন। তোমাদের পুরো ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের নাফরমানী আর অকৃতজ্ঞতার কারণে সর্বদাই আল্লাহ তাআলার সীমাহীন নেয়ামতের অমর্যাদা করেছো। কিন্তু তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর করুণা দ্বারা তোমাদেরকে সিক্ত করেছেন। এ কারণে তোমাদের মধ্যে স্বীয় পবিত্রতা ও নৈকট্যের অধিক অহমিকা থাকা উচিত নয়।

দুই ঃ আল্লাহ তাআলা যে নেয়ামতই তোমাদেরকে দান করেছেন তা দায়িত্ব এবং কর্তব্য সহকারে দান করেছেন ; বংশগত উত্তরাধিকার হিসেবে দান করেননি। তোমাদের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখনই তোমরা কোনো নেয়ামতের হক আদায় করার ক্ষেত্রে এবং তা থেকে সৃষ্ট কোনো দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা করেছো তখনই তোমাদেরকে এর যে শাস্তি ভোগ করানো হয়েছে তাও অত্যধিক কঠিন ছিল।

তিন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে কারো মর্যাদা ও নৈকট্য তার নিজস্ব ও বংশগত অধিকার কিংবা কোনো গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখার ভিত্তিতে অর্জিত হয় না, বরং তা অর্জিত হয়, আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং নেক আমলের ভিত্তিতে।

এ পুরো বিষয়টা ৪৭ আয়াত থেকে শুরু করে ৬২ আয়াতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এবং এ পূর্ণ বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বনী ইসরাঈলের সেই রোগ-ব্যাধিগুলো দূরীভূত করা, যার কারণে কুরআনের দাওয়াত তাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এ প্রারম্ভিক কথাগুলো স্মৃতিতে রেখে এখন সামনের আয়াতগুলো আপনি তেলাওয়াত করুন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ
شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾
وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾
وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾
وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾
وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذْ قَالَ
مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ
نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ

الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ
السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ
خَيْرٌ ۚ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا
يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৪৭. হে বনী ইসরাঈল, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। এবং একথাও স্মরণ করো যে, আমি তোমাদেরকে

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীর ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। ৪৮. আর ঐদিনকে তোমরা ভয় করো, যেদিন কেউ কারো সামান্য উপকারেও আসবে না এবং তার পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না।

৪৯. আর তোমরা সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছিলোম। সে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতো। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে জবাই করতো আর তোমাদের মহিলাদেরকে জীবন্ত রেখে দিতো। এর মধ্যে ছিলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

৫০. তোমরা আরো স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমাদেরকে আমি সমুদ্র বিদীর্ণ করে পার করে দিয়েছি, অতপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি আর ফেরাউনের লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছি আর তোমরা তা দেখছিলে।

৫১. তোমরা স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি মূসার সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম। অতপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গোবৎসকে মাবুদ [উপাস্য] বানিয়ে নিয়েছিলে। বস্তুত তোমরা ছিলে যুলুমকারী। ৫২. তারপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারো।

৫৩. তোমরা সে সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং ফুরকান (সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী) দান করেছি, যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পারো।

৫৪. সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা গো-বৎসকে মাবুদ বানিয়ে তোমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছো। তাই তোমরা নিজের স্রষ্টার প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং অন্যায়কারীদেরকে নিজেদের হাতে হত্যা করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তারপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিসন্দেহে তিনি তাওবা কবুলকারী এবং অত্যন্ত দয়াবান।

৫৫. আরো স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা তোমার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তাআলাকে প্রকাশ্যে দেখতে না পাবো। তখন তোমাদেরকে বিকট আওয়াজ পাকড়াও করে নিলো, আর তোমরা তা দেখছিলে। ৫৬. অতপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হতে

www.pathagar.com

পারো। ৫৭. আর আমি তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য 'মান্না-সালওয়া' পাঠিয়েছি তোমরা সেসব পবিত্র বস্তু খাও, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি এবং তারা নিজেদের ওপরই যুলুম করেছে।

৫৮. তোমরা স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি বললাম, তোমরা এ বসতিপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করো, এবং এর মধ্যে যেখানে খুশী স্বাচ্ছন্দের সাথে বিচরণ করতে থাকো এবং দরজা দিয়ে মস্তক অবনত করে প্রবেশ করো আর দোয়া করতে থাকো, হে আমাদের রব! আমাদের গোনাহ মাফ করে দিন। তাহলে আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিবো আর ভালভাবে [আল্লাহর] হুকুম পালনকারীদের প্রতি আমি অধিক করুণা দান করবো। ৫৯. এরপর যালেমরা তাদেরকে যে কথা বলে দেয়া হয়েছিলো তা পাল্টে দিল অন্য কথা দিয়ে। ফলে যারা যুলুম করেছিলো আমি তাদের নাফরমানীর কারণে আসমান থেকে তাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ করলাম।

৬০. তোমরা আরো স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন মূসা স্বীয়, জাতির জন্য পানি চেয়ে দোয়া করলো, তখন আমি বললাম, স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরের ওপরে আঘাত করো, অতপর তা বিদীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হলো বারটি ঝর্ণা। তাদের সব গোত্রই নিজ নিজ ঘাট ঠিক করে নিলো। আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা পানাহার করো আর দুনিয়াতে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ো না।

৬১. সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যের ওপর কখনো ধৈর্যধারণ করবো না। তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো, যেনো তিনি এমন সব সামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, সব্জী, কাকড়ী, রশুন, মশুরী, পেঁয়াজ প্রভৃতি। তিনি বললেন, তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তোমরা কোনো শহরে উপনীত হও, তাহলে তোমরা যা কামনা করছো তা পেয়ে যাবে। আর তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হলো লাঞ্ছনা আর পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর গযবে পতিত হলো। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো আর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। তার কারণ তারা ছিলো নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী।

৬২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদী নাসারা ও সাবেঈন, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি, আর যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে, তার জন্য তার রবের কাছে রয়েছে সাওয়াব। তাদের কোনোই ভয়-ভীতি নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

www.pathagar.com

৩৩. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের বিষদ ব্যাখ্যা

বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বের ধরন

আয়াত ঃ ৪৭

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

নেয়ামত শব্দের বিষদ বিবরণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে এর [নেয়ামত] ওপর وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-কে [আত্ফ] عطف করা হয়েছে। এখানে عام-[এর পরে خاص -এর উল্লেখ সেই সংক্ষিপ্ত জিনিসের বিষদ বিবরণ দিচ্ছে যা নেয়ামত শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ মর্যাদার অর্থ হচ্ছে জাতির হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের সেই স্থান যার জন্য আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে একটি বিশেষ সময়ে নির্বাচিত করেছিলেন। যে মর্যাদা একটি জিম্মাদারী বা দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সেই মর্যাদা মূলত শর্তসাপেক্ষে হয়ে থাকে। যদি এ মর্যাদা সম্পন্ন জাতি স্বীয় দায়িত্ব পালন করে তাহলেই সে মর্যাদা তার বহাল থাকে। আর যদি সে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, তাহলে সে জাতি যে মর্যাদা তাকে দান করা হয়েছিলো তা থেকে শুধু বঞ্চিতই হয় না বরং নেয়ামতের নাফরমানীর কারণে তাকে অধিকতর অপমানের গ্লানি বইতে হয়। এখানে বনী ইসরাঈলকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছো, সে মর্যাদা আল্লাহ তাআলারই দান। যদি সে মর্যাদা তোমরা টিকিয়ে রাখতে চাও, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং তার হক আদায় করো। আল্লাহর চুক্তি থেকে বের হয়ে গিয়ে তোমরা এ মর্যাদাকে বহাল রাখতে পারবে না।

সমকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য বনী ইসরাঈলকে নির্বাচিত করার উল্লেখ কুরআন মজীদের অন্য স্থানেও এসেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ "এবং আমি তাদেরকে বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য বুঝে-শুনে নির্বাচিত করেছি।" এখানে عَلٰى عِلْمٍ বুঝে-শুনে শব্দাবলীর দ্বারা একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, এ নির্বাচন কোনো অন্ধের নির্বাচন ছিলো না যে, যার ওপর হাত পড়ে গেলো, সে নির্বাচিত হয়ে গেলো। বরং এ কাজটি করেছেন এমন একজন মহাজ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সত্তা, যিনি তার জ্ঞান ও দুরদৃষ্টির মাধ্যমে এটা জেনে নিতে সক্ষম যে, কখন এরা এ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার যোগ্য আর কখন যোগ্য নয়।

আয়াত ঃ ৪৮

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

جَـزَى عَنْهُ -এর অর্থ, তার পক্ষ থেকে আদায় করা হয়েছে অথবা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে لَاتَجْـزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَـيْـئًـا -এর অর্থ হবে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো কাজেই আসবে না। যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত সে দায়িত্ব তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ আদায় করতে পারবে না। এ বিষয়টি কুরআন মজীদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْـرٰي (এবং কোনো ব্যক্তিই অন্য কোনো ব্যক্তির বোঝা উঠাতে সক্ষম হবে না।) وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّايَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَـدِهٖ وَلَا مَـوْلُـوْدٌ هُوَ جَـازٍ عَنْ وَّالِـدِهٖ شَـيْـئًـا "সে দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো বাপ তার সন্তানের কাজে আসবে না, আর কোনো সন্তানই তার বাপের কোনো কাজে আসবে না, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নাফসী-নাফসীর অবস্থা চলে আসবে। لِـكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّـغْـنِيْهِ - عبس : ٣٧

শাফায়াতের অর্থ

শাফায়াত شـفـع থেকে গৃহিত হয়েছে। شَـفَـعَ الـشَّـئَ -এর অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসকে একই ধরনের জিনিসের সাথে মিলিত করে জোড়া দেয়া شـفـع فـلان অথবা شـفـع فـيـه [কারো জন্য সুপারিশ বা কারো ব্যাপারে সুপারিশ করলো]-এর অর্থ হচ্ছে, কোনো কথা বা দরখাস্তের সাথে কোনো ব্যক্তি স্বীয় সমর্থন অথবা সুপারিশ মিলিত করে তাকে সমর্থন করলো।

'আদল' এর অর্থ হচ্ছে "ইনসাফ" করা। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ اَنْ تَحْكُمُـــوْا بِالْعَـــدْلِ (ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো)। অতপর এ শব্দটি সমান বা সমপরিমাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا (অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে) মোটকথা এখানে শব্দটিতে ফিদিয়া বা বিনিময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ফিদিয়া যারই ফিদিয়া হয়ে থাকে তারই সমপরিমাণ বা বিনিময় বুঝানো হয়।

আরবীর একটি পদ্ধতি

لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ - ঃ এ আয়াতে আরবী ভাষার সে পদ্ধতি লক্ষণীয়, যা বাহ্যত একটি لازم [যার কারণে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য। [জিনিসকে নেতিবাচক করে দেয় কিন্তু বাস্তবে তা مـلـزوم [অন্যের জন্য যার অস্তিত্ব অপরিহার্য]কে নেতিবাচক করে দেয়। আরবী ভাষী কবি ইমরাউল কায়েছ নিজের কবিতার মধ্যে মরুভূমির এক রাস্তার প্রশংসা করেছেন যে, لايـهـتـدى بمناره তার আলোর টাওয়ার দিয়ে কেউ রাস্তা জেনে নিতে পারে না। প্রকাশ থাকে যে, অভিব্যক্তির এ নীতির দ্বারা একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, এ মরুভূমিতে পথ দেখানো জন্য পূর্ব থেকে কোনো টাওয়ার বা মিনারের অস্তিত্ব নেই। এখানেও এ ধরনের নীতি দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ঐ দিন না থাকবে তাদের জন্য কোনো শাফায়াতকারী। আর না কোনো

www.pathagar.com

শাফায়াত সেদিন গ্রহণ করা হবে। নিজের পক্ষ থেকে সেদিন কোনো বিনিময় সে দিতেও পরবে না, তার জন্য কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় নিতেও পারবে না। সেদিন সে কারো সাহায্যকারী হতে পারবে না। কারো কোনো সাহায্য তার কোনো কাজে আসবে না। এ মর্মকথাটিই অন্য শব্দে এভাবে বলা হয়েছে فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ (অতএব তাদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোনোই উপকারে আসবে না।) পুনরায় জাহান্নামীদের জবান থেকে এ শব্দগুলো উচ্চারিত হবে فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ না আমাদের কোনো সুপারিশকারী আছে, না আছে অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধু। বনী ইসরাঈলের অন্তরে হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক এবং হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে অহংকার ছিলো এবং যে ভিত্তির ওপর ভর করে তারা এ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো সেটা হচ্ছে এই যে, তাদের নাজাতের জন্য এসব বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের সাথে নিজেদেরকে সম্বন্ধযুক্ত করলে এবং তাদের সুপারিশ পেলেই যথেষ্ট হবে। এ আয়াত তাদের অহমিকাকে মূল থেকে কেটে দিচ্ছে এবং তাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে কাজে আসার মতো মূল বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি বা ওয়াদা সঠিকভাবে পালন, ঈমান ও নেক আমল। এ নীতিকে উপেক্ষা করে শুধু কামনা বাসনার বাতাসের দুর্গের ওপর বাস করো না।

আয়াত ঃ ৪৯

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

آل -এর ধারণা

اٰلِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফেরাউনের জাতি। آل দ্বারা শুধু কোনো ব্যক্তির সন্তানাদি বুঝায় না বরং এ آل আওলাদ শব্দ জাতি, গোত্র, অনুসারী এবং সাহায্যকারী এ সবের জন্যই প্রযোজ্য।

নাবেগা যুবইয়ানীর কবিতায় আছে ঃ

من ال ميه رايح اومغتدى عجل فذازادو غير مزود

"মীহ গোত্রের লোকদের মধ্যে কেউ যাত্রা শুরু করলো সকালে, আবার কেউ বিকেলে কেউ যাত্রা করলো পথের সম্বল নিয়ে আবার যাত্রা করলো পথের সম্বল ফেলে।"

সূরা আল মু'মিনের ৪৫ আয়াতে আছে وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ "এবং ফেরাউনের পরিবারকে কঠিন শাস্তি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।" সূরা আল আরাফে আছে— وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ :١٣٠ –"এবং আমি ফেরাউনের পরিবারকে দুর্ভিক্ষ এবং ফলের স্বল্পতার মধ্যে নিবদ্ধ করে রেখেছি।"

এ আয়াতগুলোতে যেসব শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, এটা সহজেই অনুমেয় যে, শাস্তিগুলো ফেরাউন এবং তার সমগ্র জাতির ওপরই এসেছিলো। শুধু তার সন্তানদের ওপরই ছিলো না। তার সন্তানদের কথা তো কোথাও উল্লেখ নেই। বরং যাকিছু প্রমাণাদি পাওয়া যায়, তা দ্বারা তার নিঃসন্তান হওয়াই প্রমাণিত হয়। তাওরাতের মধ্যে এর উল্লেখ অবশ্যই আছে যে, হযরত মূসা (আ)-কে যে ব্যক্তি শিশু অবস্থায় সাগর [সিন্দুক] থেকে বের করে এনেছিলো সে ফেরাউনের কন্যা ছিলো। কিন্তু কুরআন কারীমে এ ভুলেরও সংশোধন করে দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর উদ্ধারকারী ফেরাউনের মেয়ে নয়, বরং স্ত্রী ছিলো। যেহেতু কুরআন বলেছে ঃ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَاتَقْتُلُوْهُ قَ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ "এবং ফেরাউনের স্ত্রী বললো, এ শিশু আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী, তাকে তোমরা হত্যা করো না, সম্ভবত এ শিশু আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নিবো। অথচ তারা এর ফলাফল কি হতে পারে তা অনুধাবন করতে পারছিলো না।"

سوم-এর অর্থ

سوم-এর অর্থ হচ্ছে কারো ওপর বোঝা অথবা ভার চাপিয়ে দেয়া। বলা হয়, سامه خسفا وسامه ظلما অর্থাৎ তাকে যুলুম অথবা অপমানের স্বাদ উপভোগ করানো হয়েছে। يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاۤءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَ كُمْ (তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদের জীবিত রাখতো) এটা সেই যুলুম ও অপমানের বর্ণনা, যার মধ্যে বনী ইসরাঈল ফেরাউনদের হাতে নিমজ্জিত ছিলো। যদিও মিসরে বনী ইসরাঈলের ওপর বিভিন্ন রকম যুলুম নির্যাতন চালানো হতো এবং তারা অপরিসীম অপমান ও নিপীড়নের শিকার হতো। যার বিস্তারিত বর্ণনা তাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এখানে শুধু দুটি কথাই নমুনা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এ দুটি নমুনা দ্বারাই অনুমান করা যেতে পারে যে, বনী ইসরাঈল সেখানে কত দুঃখ ও নির্যাতনের মধ্যে ছিলো।

بلاغت অর্থাৎ ভাষার লালিত্যের একটি দিক

পুত্র সন্তানদের হত্যার কারণ এবং এর ধরন সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে সুযোগ মতো আসবে। এখানে কেবল بلاغت অর্থাৎ ভাষাগত লালিত্যের একটা দিক লক্ষণীয়। ছেলেদের হত্যা করার উল্লেখ যেটা করা হয়েছে, তা اَبْنَاۤءَ (পুত্রগণ) শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যাতে পিতৃসুলভ মমত্ববোধের জয্‌বা জেগে উঠে। আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখার বিষয়টির উল্লেখ نِسَاۤءَ كُمْ (তোমাদের স্ত্রীগণ) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এটা এজন্য করা হয়েছে যে, আত্মমর্যাদাবোধকে সক্রিয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য এ বর্ণনাভঙ্গিটা খুবই প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিলো।

وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ : "এবং এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা।"এখানে পরীক্ষা কঠিন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত এজন্য করা হয়েছে যে, যে পরিত্রাণ তারা লাভ করেছে, তার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা সৃষ্টি হবে। তারা বুঝতে পারবে যে, কত কঠিন বিপদের মধ্যে তারা নিপতিত ছিলো, আর তা থেকে তাদের রব তাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আর যদি তিনি এ বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার না করতেন, তাহলে এ শাস্তি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার দ্বিতীয় কোনো শক্তি ছিলো না।

আয়াত : ৫০

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

فَرَقْنَابِكُمُ الْبَحْرَ : এর অনুবাদ হবে, "আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করতঃ তোমাদের পার করেছি।" এর অর্থ হচ্ছে, যেভাবে কোনো ব্যক্তি কাউকে কোলে নিয়ে সাগর পার করিয়ে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে পার করেছি।

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : অর্থাৎ নিজেদের পরিত্রাণ লাভের পর ফেরাউন এবং তার ডুবে যাওয়ার ঘটনা সাগরের তীর থেকে তোমরা স্বচক্ষে দেখেছিলে।

ঘটনাসমূহকে উপস্থাপন করার একটি বিশেষ ধরন

এখানে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের যে ঘটনাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে সে ব্যাপারে দুটি কথা লক্ষ্য রাখা চাই।

প্রথমটি হচ্ছে এই যে, এসব ঘটনাগুলো বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসিদ্ধ ঘটনা। যেগুলো ছোট ছোট বাচ্চারাও জানতো। এজন্যই এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। শুধুমাত্র ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিলো।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে বনী ইসরাঈল এসব ঘটনাগুলোকে নিজেদের ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিক থেকে শুধু মানতোই না, বরং এর জন্য তারা গর্ববোধ করতো। এর উপর ভিত্তি করে কুরআনে কারীম এসব ঘটনাকে তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যেনো তাদেরই সঙ্গে এবং তাদেরই সময়ে এগুলো ঘটেছে। এহেন অলংকার সমৃদ্ধ বর্ণনাভংগী যুক্তিকে শাণিত ও অকাট্য করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও উপকারী।

আয়াত : ৫১-৫২

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

এটা সেই ওয়াদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যা মিসর থেকে বের হওয়া এবং সাগর পার হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-কে স্বীয় বিধি-বিধান এবং হেদায়াত দেয়ার জন্য করেছিলেন আর এ উদ্দেশ্যে তাকে তূর পাহাড়ে ডেকে নিয়েছিলেন। চল্লিশ দিনের এ সময়টি নির্ধারিত ছিলো আন্তরিক এবং রূহানী প্রস্তুতির জন্য। যা ঐশী গ্রন্থের বিরাট গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিলো। প্রাথমিকভাবে এ ওয়াদা ত্রিশ দিনের ছিলো। মূসা (আ) সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর এ দ্রুততার জন্য আল্লাহ তাআলার দাবি ছিলো, এ সময় ত্রিশ দিন থেকে বৃদ্ধি করে চল্লিশ দিন করে দেয়া। উল্লেখিত আয়াতে এ পূর্ণ সময়কে একত্রিত করা হয়েছে। সূরা আল আ'রাফে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে– وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً "এবং আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছি, আর এটা পূর্ণ করেছি দশটি রাত্র বৃদ্ধি করে। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়কে চল্লিশ রাত্রে পূর্ণ করে দিয়েছি।"

বাছুর পূজার ঘটনা

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ঃ অর্থাৎ মূসা (আ) পাহাড়ে চলে যাওয়ার পর তোমরা ধাতুর একটি বাছুর বানিয়ে তার পূজা করতে লেগে গিয়েছো। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী হযরত হারুন (আ)-কেও দোষী বানিয়েছে। কুরআন অন্য স্থানে এর প্রতিবাদ করেছে ঃ

"পর্ব্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্ম্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিশর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। .... তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তোমার যে লোকদিগকে তুমি মিশর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে যে পথে চলিবার আজ্ঞা দিয়াছি, তাহারা শীঘ্রই সেই পথ হইতে ফিরিয়াছে ; তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং তাহার উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে ও বলিয়াছে, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিশর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। সদাপ্রভু মোশিকে আরও কহিলেন, আমি সেই লোকদিগকে দেখিলাম ; দেখ, তাহারা শক্তগ্রীব জাতি। এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সংহার করি,"–যাত্রাপুস্তক ৩২ ঃ ১-১০

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ঃ অর্থাৎ এ গোবৎস পূজা করার অপরাধ করে তোমরা নিজেদের জীবনের ওপর অনেক যুলুম করে ফেলেছো। এমনি করে দুটি আয়াতের পরই খোদ

কুরআনই এর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে এই বলে, يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ। –"হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা গোবৎসকে মাবুদ বানিয়ে নিজেদের জীবনের ওপর যুলুম করেছো।" যুলুমের মূলকথা হচ্ছে অধিকার হরণ করা। শিরকের অপরাধ করে মানুষ নিজেকে সাংঘাতিক হীন ও নরাধম বানিয়ে ফেলে। কেননা সে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের সমান অথবা তার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ও হীন সৃষ্টিকে নিজের খোদা বানিয়ে ফেলে। নিজের ব্যক্তিসত্ত্বার এর চেয়ে বড় অধিকার হরণ ও যুলুম আর কি হতে পারে।

আয়াত ঃ ৫৩

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

ফুরকান বলতে কি বুঝায়

ফুরকানের অর্থ হচ্ছে হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী জিনিস। এখানে و ব্যাখ্যা ও তাফসীরের জন্য এসেছে। অর্থাৎ তাওরাত কিতাবকেই ফুরকান শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে এর আরো একটি দিক সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে কুরআন এবং তাওরাত উভয়ের জন্য ফুরকান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ - الانبياء : ٤٨ "আমি মূসা এবং হারুনকে ফুরকান দান করেছি।" একইভাবে কুরআন মজীদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে ঃ تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ - الفرقان : ١ -"সেই সত্তা মহা বরকতপূর্ণ যিনি স্বীয় বান্দার ওপর ফুরকান অবতীর্ণ করছেন।"–সূরা ফুরকান ঃ ১

এসব গ্রন্থকে ফুরকান শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত রয়েছে ঃ

এক ঃ এটি সমস্ত বিধান ও হেদায়াতের বিশদ বিবরণ পেশ করে।

দুই ঃ এটি হক ও বাতিল এবং হারাম ও হালালের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে।

তিন ঃ এটি স্বীয় দাবি ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে খুবই সুস্পষ্ট।

চার ঃ এগুলো দ্বারা মানুষের জীবনে এমন নির্ভুল জ্ঞান অর্জিত হয় যা জীবনের সকল চড়াই উৎরায়ে মঙ্গল-অমঙ্গল চেনার জন্য একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। কুরআন মজিদ বদর যুদ্ধকেও ফুরকান শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। এটা এজন্য যে, বদর যুদ্ধেও হক ও বাতিলকে ভালভাবেই উন্মোচন করে দিয়েছে।

আয়াত ঃ ৫৪

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ ط فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

برء শব্দ দ্বারা কি বুঝায়

برء শব্দের অর্থ خلق (সৃষ্টি) শব্দের অর্থের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন মজীদে একই স্থানে আল্লাহ তাআলার তিনটি গুণের বর্ণনা হয়েছে (هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ) [خلق] দ্বারা কোনো জিনিসের নকশা তৈরী করাকে বুঝায়। برء দ্বারা ঐ জিনিসকে যথাযথভাবে নির্মাণ করা বুঝায়। تصوير -এর অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিসকে পূর্ণতা দান করা। এ বিবেচনায় যদিও خالق এবং بارئ উভয়ের আভিধানিক অর্থের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হয়।

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর উদ্দেশ্য

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ঃ এর অর্থ এই নয় যে, নিজেদের তলোয়ার নিজেদের কাঁধেই চালিয়ে দাও। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক গোত্রের যেসব লোক এ শিরক ফেতনা আর বাছুর পূজা থেকে মুক্ত ছিল, তারা স্ব স্ব গোত্রের সেসব লোকদের গর্দান স্বহস্তে উড়িয়ে দিবে যারা ধর্ম ত্যাগের এ ফেতনার পথ খুলে দিয়েছে। হুকুম দেয়ার মধ্যে কতিপয় কল্যাণ নিহিত ছিলো ঃ

এক ঃ এভাবে এ তাওবা একটি সামষ্টিক ও সামাজিক তাওবার রূপ গ্রহণ করেছিলো। যেনো বনী ইসরাঈলের সামাজিক বিবেক ঐসব লোকদেরকে নিজেদের ভিতর থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো যারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রতিশ্রুতিকে অপমানিত করেছিলো।

দুই ঃ এর দ্বারা তাওহীদের প্রকৃত মহত্ব আর শিরকের প্রকৃত ঘৃণ্যরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলো। শিরক যেনো এমন একটি খারাপ জিনিস যে, মানুষের বাম হাত যদি এ অপরাধটি করে বসে, তাহলে তার ডান হাতের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় স্বীয় বাম হাত কেটে ছুড়ে ফেলে দেয়া। এ ব্যাপারে কোনো আপোষ ও পক্ষপাতিত্বের অবকাশ নেই। এবং আত্মীয়তাও বিবেচনায় আনা যাবে না।

তিন ঃ প্রত্যেক গোত্র এবং বংশের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা যদি নিজ নিজ গোত্রের দুষ্ট লোকদের উপর তলোয়ার উঠায় তাহলে এর দ্বারা বংশীয় এবং গোত্রীয় বিদ্বেষের উদ্ভব হবে না. বরং ফেতনার কোনো আশংকা ছাড়াই বনী ইসরাঈলের সামাজিক শুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাওরাত অধ্যয়ন থেকেও এর কাছাকাছি কথাই বের হয়ে আসে। যেমন ঃ যাত্রাপুস্তকে এসেছে ঃ

"পরে মোশি দেখিলেন, লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, কেননা হারোণ শত্রুদের মধ্যে বিদ্রূপের জন্য তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিয়াছিলেন। তখন মোশি শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর পক্ষ কে ? সে আমার নিকটে আইসুক। তাহাতে লেবির সন্তানেরা সকলে তাঁহার নিকটে একত্র হইল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন

www.pathagar.com

উরুতে খড়্গ বাঁধ, ও শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত যাতায়াত কর, এবং প্রতিজন আপন আপন ভ্রাতা, মিত্র ও প্রতিবাসীকে বধ কর। তাহাতে লেবির সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিল, আর সেই দিন লোকদের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক মারা পড়িল। কেননা মোশি বলিয়াছিলেন, অদ্য তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন পুত্র ও ভ্রাতার বিপক্ষ হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের হস্তপূরণ কর, তাহাতে তিনি এই দিনে তোমাদিগকে আশীর্বাদ করবেন।"

তাওরাতের এ বর্ণনা থেকে যদিও একথা জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ) মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) লোকদেরকে হত্যা করার কাজ সম্পন্ন করার জন্য শুধু বনী লেবিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উল্লেখিত অংশের শেষাংশ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বিষয়টির আসল কথা হচ্ছে ওটাই যার দিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি।

অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্রের তাওহীদবাদী লোকেরাই এ কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলো যে, তারা নিজ নিজ গোত্রের মুরতাদ ব্যক্তিদের গর্দান উড়িয়ে দেবে, যাতে ঈমানদার ব্যক্তিদের অধিক ঈমানের একটা সাক্ষ্য হয়ে যায় আর সাধারণ লোকদের জন্য এ শিক্ষা অর্জিত হয়ে যায় যে, শিরক এমন একটি জঘন্য পাপ, যে ব্যাপারে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে পর্যন্ত ক্ষমা করে না।

স্মরণ থাকতে পারে যে, ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের পরামর্শ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা) দিয়েছিলেন।

এ আদেশ থেকে জানা যায় যে, তাওরাত গ্রহণ যোগ্যতার জন্য পাপের প্রতি সর্বাত্মক অনীহা ও অনাসক্তি সৃষ্টি হওয়া অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ যখন দুষ্কৃতি ও অনাচার সমাজের দায়িত্বশীলদের অসচেতনতা ও গাফিলতির কারণে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার কাফ্ফারা সবাইকে আদায় করতে হয়। এটা ছাড়া আল্লাহর কাছে এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তৃতীয়তঃ মূসা (আ)-এর শরীআতেও মুরতাদ হওয়ার শাস্তি হত্যাই ছিলো।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ঃ "এটা তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে অধিক উত্তম।" অর্থাৎ এটা তো বাহিক্যভাবে তোমাদের কাছে বিরাট যুলুম আর জাতীয় ক্ষতি বলে মনে হতে পারে যে, জাতির এতো বড় একটা অংশকে জাতির দেহ থেকে কেটে ছুড়ে ফেলা হবে, কিন্তু তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে এ অংশকে কেটে ছুড়ে ফেলে দেয়ার মধ্যেই তোমাদের দীন এবং দুনিয়ার কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে। যদি স্বজন প্রীতির আবেগে তোমরা নষ্ট অংশকে জাতীয় অস্তিত্বের সাথে জুড়ে রাখাকেই উত্তম বলে মনে করো, তাহলে মনে রেখো যে, এর অনিষ্টতা তোমাদের গোটা জাতীয় অস্তিত্বকে নষ্ট করে ছাড়বে। আকীদার ও আদর্শের ভিত্তিতে তৈরী একটি জামায়াতের ভেতরে যদি উক্ত আদর্শের পরিপন্থী জিনিস শুধুমাত্র বংশীয় সম্পর্কের কারণ লুকিয়ে থাকে, তাহলে পুরো জামায়াতই ধ্বংস হয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ ইহুদীরা হযরত হারুন (আ)-এর দুর্নাম করার জন্য তাওরাতে এ ধরনের যেসব কথা যুক্ত করেছে, তার জবাব আমরা যথাস্থানে দিবো।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৫৫

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ○

বনী ইসরাঈলের সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা

"আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবো।" বনী ইসরাঈল সন্দেহ প্রবণতার এমন রোগীতে পরিণত হয়েছিলো যে, তারা কোনোভাবেই এ বিশ্বাসে উপনীত হতে পারছিলো না যে, মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথাবার্তাও বলে থাকেন। এ কারণে যখন মূসা (আ) তাদেরকে বলতেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ হুকুম দিচ্ছেন তখন তারা বলতো আল্লাহ যখন তোমার সাথে কথা বলেন, তখন আমাদের সাথেও তিনি কথা বলবেন এবং আমরাও তাঁকে স্বচক্ষে দেখবো, এটা ছাড়া আমরা কিভাবে তোমার কথা সত্য বলে গ্রহণ করবো ?

আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখার আকাঙ্ক্ষা মূলত দূষণীয় ও তিরস্কারযোগ্য ব্যাপার নয়। হযরত মূসা (আ)-ও তো এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দু'টি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একটি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বক্ষের প্রশস্ততা আর অন্তরে প্রশান্তি অর্জনের জন্য। আর অপরটি হচ্ছে তাঁকে অস্বীকার করা এবং মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার একটি বাহানা বা ছলনা মাত্র। হযরত মূসা (আ)-এর এ বাসনাটি ছিলো এমন, যেমনটি হযরত ইবরাহীম (আ) দেখতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা কিভাবে মৃতকে জীবন্ত করেন, যাতে আখেরাতের ব্যাপারে পুরোপুরি বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যায়। হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা তাঁর এ বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার জন্য দোষারোপ করেননি, বরং এতটুকু বলেছেন, এ জাগতিক চোখে আমার সত্তাকে তুমি দেখতে পারবে না। আমার গুণাগুণই শুধু দেখতে পাবে। কুরআন মজীদে এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

وَلَمَّا جَاۤءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ○ـ الاعراف : ١٤٣

"যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে আসলো, এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে বললো ঃ হে রব! তুমি নিজে আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি পাহাড় স্বীয় স্থানে স্থির থাকতে পারে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অতপর যখন তার রব পাহাড়ের ওপর স্বীয় জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন আর ওটাকে বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন এবং মূসাও বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো। অতপর যখন মূসা জ্ঞান ফিরে পেলো, তখন বললো ঃ হে রব! তুমি পবিত্র, আমি তাওবা করেছি, আর আমি ঈমান পোষণকারীদের মধ্যে প্রথম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৪২

পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈলের এ দাবি ছিলো শুধুমাত্র তাদের অবিশ্বাস আর সন্দেহ প্রবণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলার বহু প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দেখার পরও তারা পদে পদে এ দাবি প্রকাশ করতো। এজন্য তাদেরকে দোষারোপ এবং ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

একটি সংশয়ের অবসান

এখানে এ ভর্ৎসনা فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ শব্দাবলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আরাফের ১৫৪ আয়াতে فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। صاعقه শব্দের বিশ্লেষণ আমরা ১৭ অধ্যায়ে করেছি। এর অর্থ বিকট আওয়াজ ও মেঘের গর্জন হয়ে থাকে। বজ্রপাতের শব্দের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ হয়। আর رجفه-এর অর্থ হচ্ছে ভূমিকম্প। একই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত একটি জিনিসকে কুরআন কারীমে দুই স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বলে মনে হয়। এদের মধ্যে মূলত বৈপরিত্য নেই। একই ঘটনার দুটি ভিন্নধর্মী প্রভাব হতে পারে, যা একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় হযরত মূসা (আ)-কে প্রত্যক্ষ করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্যোতির বিকিরণ ঘটিয়ে যেভাবে পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাঁর জ্যোতির বিকিরণ হয়েছিলো তখন তা বজ্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো। যা সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে একটি ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছিলো এবং যার ফলে এদের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলো।

আয়াত ঃ ৫৬

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

'মৃত্যু' শব্দ দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে

উপরোক্ত আয়াতে বজ্র এবং ভূমিকম্পের অবস্থা এ সত্তরজন ব্যক্তির উপর হয়েছিলো যারা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিলো। কুরআন কারীমে এ অবস্থাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করেছে। এ মৃত্যু দ্বারা প্রকৃত মৃত্যুও বুঝানো হতে পারে। আবার রূপক অর্থে অজ্ঞান অবস্থাও বুঝানো হতে পারে। আরবী ভাষায় ঘুম এবং অচেতন অবস্থাকে বুঝানোর জন্য রূপক অর্থে মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন ঘুম থেকে উঠার পর একটি প্রসিদ্ধ দোয়ার কথা হাদীস শরীফে এসেছে। হাদীসের দোয়ায় নিম্নোক্ত শব্দগুলো রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ "প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর দ্বিতীয়বার জীবন দান করেছেন। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" একইভাবে بعثت বা

পুনরুজ্জীবন শব্দটিও আসহাবে কাহাফের ঘটনায় তাদের নিদ্রার পর জাগ্রত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈল তাদের নাফরমানীর কারণে শাস্তিযোগ্য ছিলো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দ্বিতীয়বার জীবনলাভের সুযোগ নাও দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি স্বীয় বিশেষ করুণা বলে তাদেরকে অতিরিক্ত সুযোগ দান করেছেন, এ সুযোগে তাদের নবীও কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন এবং তিনিও সে দোয়া কবুল করেছেন। সূরা আল আরাফে এভাবে এর বর্ণনা এসেছে ঃ

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلاَّ فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۖ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ○

"এবং মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজ জাতি থেকে সত্তরজন লোক নির্বাচিত করেছিলো। যখন তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো তখন মূসা দোয়া করলেন ঃ হে রব! তুমি যদি চাইতে তাহলে তাদেরকে এবং আমাকে ইতিপূর্বে ধ্বংস করে দিতে পারতে। তুমি কি আমাদের মধ্য থেকে কতিপয় নির্বোধ লোকের কৃত নাফরমানীর কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে ? এটাতো ছিলো তোমার পরীক্ষা। এর মাধ্যমে তুমি যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করো, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করো, তুমি আমাদের সাহায্যকারী, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি করুণা করো, তুমি হচ্ছো সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৫

আয়াত ঃ ৫৭

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

এ আয়াতে সেসব নেয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। যেগুলো বনী ইসরাঈলকে সীনা উপত্যকায় তাদেরকে খরা ও অভাবের বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন।

مَنّ -এর বিশ্লেষণ

مَنّ -এর আসল অর্থ হচ্ছে করুণা ও সহানুভূতি কিন্তু এখানে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বিশেষ খাদ্য যা আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের জন্য সীনা উপত্যকায় স্বীয় বিশেষ করুণার বদৌলতে দান করেছিলেন। যার ফলে তাদেরকে হাল চাষ করতে হয়নি, বীজ বপন করা এবং পানি সেচের ঝামেলাও পোহাতে হয়নি। বাইবেলে এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

www.pathagar.com

"পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল। পরে পতিত শিশির উর্দ্ধগত হইলে, দেখ, ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণ পরস্পর কহিল, উহা কি ? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না। তখন মোশি কহিলেন, উহা সেই অন্ন, যাহা সদাপ্রভু তোমাদিগকে আহারার্থে দিয়াছেন। উহারই বিষয়ে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে তাহা কুড়াও ; তোমরা প্রত্যেক আপন আপন তাম্বুতে স্থিত লোকদের সংখ্যানুসারে এক এক জনের নিমিত্তে এক এক ওমর পরিমাণে উহা কুড়াও। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সেইরূপ করিল ; কেহ অধিক, কেহ অল্প কুড়াইল। পরে ওমরে তাহা পরিমাণ করিলে ; যে অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত হইল না, এবং যে অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অভাব হইল না ; তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইয়াছিল। আর মোশি কহিলেন, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্য ইহার কিছু রাখিও না। তথাপি কেহ কেহ মোশির কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে কিছু কিছু রাখিল, তখন তাহাতে কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল ; আর মোশি তাহাদের উপরে ক্রোধ করিলেন। আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত।"

–যাত্রাপুস্তক ১৬ ঃ ১৩-২১

এর দ্বারা এটা জানা যায় যে, শিশিরের মতো এক প্রকার জিনিস মাটিতে পড়ে থাকতো এবং সেগুলো পালের দানার মতো জমে যেতো। সূর্যের তেজ বৃদ্ধি হওয়ার পূর্বেই এগুলোকে একত্রিত করা সম্ভব হতো এবং প্রখরতা বৃদ্ধি হওয়ার পূর্বেই এগুলো গলে যেতো। যেহেতু এ নেয়ামত কোনো কষ্টকর শ্রম ছাড়াই তাদের অর্জিত হয়েছিলো এবং এমন এক পানি বিহীন শুষ্ক ময়দানে আর্জিত হয়েছিলো যেখানে স্বাভাবিক খাদ্যের কোনো উপকরণ ও মাধ্যম উপস্থিত ছিলো না সেহেতু এর নাম مَنّ রাখা হয়েছিলো। (مَنّ অর্থ অনুগ্রহ বা দান) এটা প্রকাশ থাকে যে, আরবী এবং ইবরানী ভাষার মূল খুবই কাছাকাছি।

مَنّ -এর নামকরণ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। কিন্তু বাইবেলের উল্লেখিত উদ্ধৃতি এটাই প্রকাশ করছে যে, বনী ইসরাঈল যখন এ অদ্ভূত ও অচেনা জিনিস দেখতে পেলো তখন তাদের মধ্যে এ প্রশ্নের উদ্ভব হলো مَنْ هُوَ এটা কি ? তাদের এ প্রশ্ন থেকেই এর নাম مَنّ হয়ে গেলো।

আমাদের কাছে এ নামকরণ ইহুদীদের বিকৃত রুচি উদ্ভূত একটি আবিষ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। শব্দও এর সমর্থন করে না আর সুস্থ বিবেকও এটা গ্রহণ করে না।

হযরত মূসা (আ) যে এ জিনিসকে রুটি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা দ্বারা সত্যি সত্যি ওটা রুটি জাতীয় কোনো জিনিস ছিল বুঝানো হয়নি। বরং এখানে রুটি বলতে

www.pathagar.com

খাদ্য বুঝানো হয়েছে। খাদ্য অর্থে এ শব্দ পুরোনা সহীফা [ছোট ছোট ঐশী গ্রন্থ] গুলোতে বহু ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের ভাষায়ও খাদ্য অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

سَلْوٰى -এর বিশ্লেষণ

مَنّ শব্দের মতোই سَلْوٰى শব্দটি আহলে কিতাবের মাধ্যমে আরবী ভাষায় আগমন করেছে। আরববাসী এ শব্দকে তাদের কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছে। এ শব্দটি সেসব পাখি বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা সীনা উপত্যকায় বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। এগুলো বাবুই ধরনের এক প্রকার ছোট ছোট পাখির মত দেখতে। এগুলোকে শিকার করাও বাবুই জাতীয় ছোট ছোট পাখি শিকারে মতই সহজ ছিলো। যাত্রাপুস্তকে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

> "পরে তাহারা এলীম হইতে যাত্রা করিল। আর মিসর দেশ হইতে প্রস্থান করিবার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল, তাহা এলীমের ও সীনয়ের মধ্যবর্ত্তী। তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের বিরুদ্ধে প্রান্তরে বচসা করিল ; আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা তাঁহাদিগকে কহিল, হায়, হায়, আমরা মিসর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই ? তখন মাংসের হাঁড়ীর কাছে বসিতাম, তৃপ্তি পর্য্যন্ত রুটী ভোজন করিতাম; তোমরা ত এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ। .... আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি ইস্রায়েল-সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি ; তুমি তাহাদিগকে বল, সায়ংকালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে, ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে ; তখন জানিতে পারিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল।"
>
> —যাত্রাপুস্তক ১৬ ঃ ১-১৩

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ঃ "তোমরা আহার কর পবিত্র জিনিস থেকে যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।" এ রকমের স্থানগুলোতে আমাদের মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত قُلْنَا (আমি বললাম), শব্দটি উহ্য আছে বলে মনে করে থাকেন। অর্থাৎ আমরা এসব জিনিস তাদেরকে দান করার পর বললাম যে, তোমরা সেসব জিনিস থেকে খাও, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। এ রকম স্থানে "বললাম" শব্দটি উহ্য রাখার মধ্যে আমাদের কাছে একটি বিশেষ বালাগাত [ভাষাগত লালিত্য] রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নেয়ামত নিজের অস্তিত্ব দ্বারা নীরবে এ দাওয়াত পেশ করে যে, এ খোদায়ী নেয়ামত থেকে উপকারিতা লাভ করো আর স্বীয় প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। কুরআন মজীদে কোথাও কোথাও এ ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো স্থানে (যেমন এখানে) গোপন রাখা হয়েছে। যাদের মধ্যে এ মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেয়ামতগুলোর ইঙ্গিত বুঝার মতো বিবেক রয়েছে, তারা এসব ইঙ্গিত ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে।

www.pathagar.com

এখানে কথার বাচনভঙ্গি একটি বিষয়কে সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহর এ বিরাট নেয়ামতের হক আদায় করেনি। তারা এ নেয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তার অবমাননা করেছে এবং আল্লাহর নাফরমানী করেছে। বাচনভঙ্গি দ্বারা যেহেতু একথা সুস্পষ্ট হয়েছে, সেহেতু শাব্দিকভাবে তা প্রকাশ করা হয়নি বরং এ স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি বরং তারা নিজেদের ওপরই যুলুম করে চলছে। এ আলোচনা থেকে বনী ইসরাঈলের এসব নেয়ামতের ব্যাপারে তাদের আচরণ কি তা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো এবং একথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যারা আল্লাহর নেয়ামতের অসম্মান করে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে। এ শেষ কথাটুকু ওপরের কথার মতোই ইহুদীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করার পরিবর্তে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গায়েবের সীগা অর্থাৎ নাম পুরুষ হিসেবে কথা বলা হয়েছে যা দ্বারা তাদের প্রতি বক্তব্য প্রদানকারীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে।

আয়াত ঃ ৫৮

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ط وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

قريه (জনপদ)-এর তাৎপর্য

قَرْيَه -এর আসল অর্থ আভিধানিকভাবে একত্রিত হওয়ার স্থান। আরবীতে বলা হয় قرى الماء فى الحوض (সে হাউজে পানি জমা করেছে) এখান থেকে বুঝা যায় যে, এ শব্দটি বস্তি বা জনপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এজন্য যে তা লোকজনের একত্রিত হওয়ার স্থান। এ শব্দের ব্যবহারের দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে জানা গেলো যে, এটা শুধু ছোট গ্রাম বা জনপদের জন্য ব্যবহার করা হয় না বরং বড় বড় শহর এবং কেন্দ্রীয় আবাস ভূমি বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়।

এ জনপদ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য গোটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের কোনো এক শহর হতে পারে। কেননা এর একটু পরেই فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا -এর শব্দগুলো দ্বারা এর যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা এ ভূখণ্ডের কোনো শহরের ওপরই প্রজোয্য হতে পারে। এর দ্বারা "অরীহা" অথবা "রীহুকে" বুঝানো হতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রা)-এর এটাই অভিমত। ফিলিস্তিনের এ শহরটিই প্রথম বনী ইসরাঈলের দখলে এসেছিলো।

سجده -এর অর্থ

اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ঃ এর আসল অর্থ হচ্ছে মাথা নত করা। এ মস্তক অবনত করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে যমীনের ওপর কপাল রেখে দেয়া

www.pathagar.com

যেমনটি আমরা নামাযের মধ্যে রেখে থাকি। আমর বিন কুলসুম স্বীয় গোত্রীয় গৌরব গাঁথা সম্বলিত প্রখ্যাত কবিতার মধ্যে এর পূর্ণাঙ্গ অর্থই গ্রহণ করেছেন ঃ

اذا بلغ الفطام لنا صبى تخرله الجبابر ساجدينا

"যখন আমাদের গোত্রের কোনো শিশু দুধ ছাড়ানোর সময়ে উন্নীত হয়। তখন বড় বড় প্রতাপশালীরা তার সামনে মস্তক অবনত করে লুটিয়ে পড়ে।"

এখানে উল্লেখিত আয়াতে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাথানত করা। আলোচিত বক্তব্যের স্থানই এর প্রমাণ।

الباب শব্দের ব্যাখ্যা

الباب দ্বারা কেউ কেউ বস্তির দরজা বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুর দরজা বুঝিয়েছেন। আমি দ্বিতীয় অভিমতটাকেই অগ্রাধিকার দেই। বিজিত শহরের দরজা দিয়ে বিনিতভাবে প্রবেশ করার উপদেশ যদিও মূল্যবান উপদেশ তথাপি মনে রাখতে হবে যে, এ উপদেশ এমন এক জাতির জন্য উপযোগী হতে পারে, যাদের মধ্যে রয়েছে বীরত্ব ও শক্তি।

বনী ইসরাঈলের অবস্থা তো এই ছিলো যে, মূসা (আ) যখন ফারানের উন্মুক্ত ময়দানে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তাদের অন্তর স্পন্দনহীন হয়ে গেলো। তারা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলো যে, ঐ রাজ্যে প্রতিপত্তিশালী শক্তিধর লোকেরা রয়েছে আমরা তাদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত নই, তুমি এবং তোমার খোদা উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করো, যখন ঐ শক্তিশালী লোক থেকে এলাকা মুক্ত হবে, তখন আমরা সেখানে প্রবেশ করবো। এসব লোকদের জন্য এ উপদেশ কিছুটা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। শহরের দরজা দিয়ে বীর দর্পে প্রবেশ না করে বরং বিনয়ের সাথে মস্তক অবনত করে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে। এ কারণেই আমরা মনে করি এখানে দরজা বলতে ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুর দরজা বুঝানো হয়েছে। এখানে একথা বলাই হচ্ছে উদ্দেশ্য যে, তাদেরকে এ শহরে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। যাতে এর সজীবতা থেকে স্বাধীনভাবে পূর্ণ উপকারিতা অর্জন করতে থাকে। ইবাদাতখানায় অনুনয়-বিনয়ের সাথে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে। কিন্তু তারা যেভাবে অন্যসব নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করেছে এবং প্রতিবার হেদায়াতেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছে এমনিভাবে এ নেয়ামত ও হেদায়াতের অসম্মান করেছে।

حطة-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

حِطَّةٌ ঃ قُوْلُوْا حِطَّةٌ শব্দটি একটি বাক্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন কুরআনে কারীমে রয়েছে يَقُوْلُوْا طَاعَةٌ - السناء : ٨١ (নিসা ঃ ৮১) এ কারণে এখানে مبتدا (উদ্দেশ্য)টি উহ্য ধরতে হবে। যমখশরী এর বিশ্লেষণ এভাবে করেছেন যে, مسئلتنا (আমাদের

আবেদন হচ্ছে حطة) حطة এর উৎপত্তি হয়েছে حطاً থেকে। যার অর্থ হচ্ছে ঝেড়ে ফেলা। এখানে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহকে ঝেড়ে দেয়া। আরবী ও ইবরানী উভয় ভাষার উৎপত্তি স্থল কাছাকাছি হওয়ার কারণে এটা ধারণা করা হয় যে, এর শব্দমূল ঝেড়ে মুছে দেয়া এবং ক্ষমা করার অর্থে ইবরানী ভাষায়ও ব্যবহার করা হয় এবং এটি তাদের কাছে এসতেগফার এবং তাওবার মত শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো আর সেখান থেকেই এটি আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

احسان-এর ভাবার্থ

مُحْسِنِيْنَ ঃ আরবীতে احسن الى فلان-এর অর্থ হবে অমুকের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে। আর احسن الشي-এর অর্থ হবে জিনিসটিকে খুব সুন্দরভাবে করেছে—এজন্য আরবী محسن শব্দের সদ্ব্যবহারকারীর জন্যও এসে থাকে এবং কোনো কাজকে খুব সুন্দরভাবে সম্পন্নকারীর জন্যও আসে। কথার ধরন থেকে জানা যায় যে, এখানে এ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উর্দুতে এর জন্য খুব সুন্দর কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। এ কারণে অনুবাদে শুধু ভাব আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৫৯

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ০

দোয়া পরিবর্তনের ধরন

অর্থাৎ দোয়ার জন্য যে শব্দ তাদেরকে দীক্ষা দেয়া হয়েছিলো, সে শব্দকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। কেউ কেউ মনে করেন যে, এখানে শব্দ পরিবর্তন নয়, বরং স্বভাব ও আচরণগত পরিবর্তনই বুঝানো হয়েছে। প্রাচীনদের মধ্যে আবু মুসলিম ইসপাহানীর এটাই ধারণা। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা স্বপক্ষে কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। بَدَّلَ শব্দটি যখন স্বীয় দুই مفعول (কর্মের) এর সাথে আসে, যেমন এখানে এসেছে, যদিও একটি مفعول উহ্য রয়েছে, তখন এর অর্থ এই হয় যে, একটি জিনিসের স্থানে অন্য জিনিস রেখে দিয়েছে। অতপর যখন সুস্পষ্ট শব্দাবলীর দ্বারা একথা বলা হয়ে গিয়েছে যে, যালেমরা তাদেরকে শিখানো কথাকে এমন এক কথা দ্বারা পরিবর্তন করেছে যা তাদেরকে আদৌ শিখানো হয়নি, তখন এর দ্বারা শুধু আচরণ ও কর্মের পরিবর্তন মনে করা কুরআনের শব্দ থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের কাছে এখানে শুধু আচার-আচরণ ও কর্মের পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি, বরং কুরআনের শব্দাবলী একথার প্রমাণ পেশ করছে যে, বনী ইসরাঈলের কতিপয় খারাপ, দুর্ভাগা লোক حِطَّةٌ শব্দটিকে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা

www.pathagar.com

পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। প্রশ্ন ওঠে, তারা এটিকে কোন্ শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করেছিলো ? কুরআনে এর কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসেনি। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারীদের বিভিন্ন কথা লিপিবদ্ধ আছে, যেগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটির ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল।

আমার কখনো কখনো এ ধারণা হয় যে, খৃস্টানরা যেভাবে তাদের সূরা ফাতেহার বাক্যগুলোর ভাবধারার পরিবর্তন সাধন করেছিলো, বনী ইসরাঈলও তাদের দোয়ার ভাবধারায় পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। খৃস্টানদের ফাতেহার মধ্যে লূক–এগারতম অধ্যায়ে যেসব শব্দ এসেছে তা হচ্ছে ঃ "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য (রুটি) প্রতিদিন আমাদিগকে দেও।" এখানে এটা সুস্পষ্ট যে প্রকৃত দোয়ার ভাবধারা থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে সরে গিয়েছে। প্রকৃত দোয়া হবে এই যে, আমাদেরকে হেদায়াতের সেই প্রাণ শক্তি দান করুন, যা সরল ও সোজা পথের দিকে দিশা দান করে। [মাওলানা ফারাহী (র)-এর সূরা ফাতেহার তাফসীর দ্রষ্টব্য]। যেহেতু ইবরানী ভাষায় রুটির জন্য যে শব্দ রয়েছে, সে শব্দ আত্মিক খাদ্য আর বস্তুগত রুটি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। সেহেতু হেদায়াতের ভাব প্রকাশের সম্ভবত এ দ্ব্যর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তিতে অনুবাদে এসে হেদায়াতের প্রাণশক্তি কথাটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে রুটির কথাটিই শুধু থেকে গিয়েছে। এ ধরনের কোনো পরিবর্তন বনী ইসরাঈলও দোয়ার শব্দগুলোর মধ্যে সাধন করেছিলো, যার কারণে দোয়ার প্রকৃত প্রাণশক্তি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

رِجْزٌ এবং رِجْسٌ-এর অর্থ

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ؛ رِجْزٌ এবং رِجْسٌ উভয়ই একই শব্দের দুটি রূপ। এর আসল অর্থ হচ্ছে অস্থিরতা ও ঘাবড়ানো। এখান থেকেই এ শব্দকে দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র বা নাপাকীর জন্য ব্যবহার করা হয়। কেননা দুর্গন্ধময় ও নাপাক জিনিস দেখলেই স্বভাব ও প্রকৃতিতে এক ধরণের অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। অতপর এ শব্দ শাস্তির জন্য ব্যবহার করা হয়, কেননা শাস্তিও মানব হৃদয়ে এক ধরনের অস্থিরতা এবং কম্পনের সৃষ্টি করে। এর সাথে مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ "আকাশ থেকে" যোগ করা বিষয়টি একথারই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এ ঘটনার ধরন সাধারণ ঘটনাবলীর ধরন থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ছিলো। এতে কুদরতের ক্রোধের দিকটা সুস্পষ্ট ছিলো। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ধরনের সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে ঃ

"সাধারণ লোকদের মরণের ন্যায় যদি এই মনুষ্যেরা মরে, কিম্বা সাধারণ লোকের শাস্তির ন্যায় যদি ইহাদের শাস্তি হয়, তবে সদাপ্রভু আমাকে পাঠান নাই। কিন্তু সদাপ্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি আপন মুখ বিস্তার করিয়া ইহাদিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, আর ইহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামে, তবে ইহারা যে সদাপ্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবে।"

-গণনাপুস্তক ১৬ ঃ ২৯-৩০

www.pathagar.com

কুরআন কারীমে উল্লিখিত শাস্তির এ বিশেষ ধরনকে مِنَ السَّمَاءِ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে, যেমনিভাবে আমরা কোনো ভয়ঙ্কর বিপদকে আসমানী গর্জব হিসেবে ব্যক্ত করে থাকি। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তা হচ্ছে, এ শাস্তিটা কি ছিলো। বিশেষ করে এ জনপদ যার ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। অবশ্য তাওরাতের অধ্যয়ন থেকে একথা জানা যায় যে, এ সফরের সময় বনী ইসরাঈল কয়েকবারই আল্লাহর নাফরমানী মূলক কাজ করেছে। এবং এ নাফরমানীর অপরাধে তারা বিভিন্ন রকমের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন, যে যমানায় বনী ইসরাঈল শাতীমে [ফিলিস্তিনের খুব কাছেই একটি শহর] ছিলো, তখন তারা মাওআযের মহিলাদের সাথে ব্যভিচার করেছিলো, তাদেরই আহবানে এসব লোক তাদের শিরক মিশ্রিত কুরবানীর সাথে অংশগ্রহণ করতে লাগলো, এভাবে তারা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের بعل فغور নামক দেবতার পূজা করতে আরম্ভ করে দিলো, যার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর এক মহাবিপদ পাঠিয়ে দিলেন। যার ফলে তাদের চব্বিশ হাজার লোক ধ্বংস হয়ে গেল।

গণনা পুস্তকের তেত্রিশ নম্বর অধ্যায়ে একথার বর্ণনা এসেছে যে, হযরত মূসা (আ) মাওআযের ময়দানে বনী ইসরাঈলকে এ হেদায়াতও করেছিলেন যে, তোমরা 'ইয়ারোন' পার হয়ে যখন কেনানে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা সেখানকার মুশরিকদেরকে বের করে দিবে, তাদের ছবি সম্বলিত পাথর এবং তাদের স্থাপনকৃত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলবে আর উঁচু উঁচু স্থানগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে। তোমরা যদি এর ব্যতিক্রম করো তাহলে একথা স্মরণ রেখো, আমি যেভাবে তোমাদেরকে সাথে একত্রিত করার জন্য বলেছি সেভাবেই আমি তোমাদের সাথে আচরণ করবো। একথা জানা যায় যে, বনী ইসরাঈল স্বভাবগতভাবেই নবীর এ নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছে, যার ফল স্বরূপ তাদের ওপর সেরকম বিপদই এসেছিলো, যে রকম বিপদ তাদের ওপর শাতীমে এসেছিলো।

আয়াত ঃ ৬০

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

পানির জন্য মূসা (আ)-এর দোয়া

তাওরাত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ) পানির জন্য এ দোয়া সীনের ময়দানে করেছিলেন।—গণনাপুস্তক ২০ অধ্যায়ে আছে ঃ

"আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী প্রথম মাসে সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল, এবং লোকেরা কাদেশে বাস করিল ; আর সেই স্থানে মরিয়মের মৃত্যু হইল ও

সেই স্থানে তাঁহার কবর হইল। সেই স্থানে মণ্ডলীর জন্য জল ছিল না ; তাহাতে লোকেরা মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইল। আর তাহারা মোশির সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, হায়, আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে মরিয়া গেল, তখন কেন আমাদের মৃত্যু হইল না ? আর তোমারা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যুর জন্য সদাপ্রভুর সমাজকে কেন এই প্রান্তরে আনিলে ? এই কুস্থানে আনিবার জন্য আমাদিগকে মিসর হইতে কেন বাহির করিয়া লইয়া আসিলে ? এই স্থানে চাস কি ডুমুর কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব হয় না, এবং পান করিবার জলও নাই। তখন মোশি ও হারোণ সমাজের সাক্ষাৎ হইতে সমাগম-তাম্বুর দ্বারে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িলেন ; আর সদাপ্রভুর প্রতাপ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যষ্টি লও, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা হারোণ মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে ঐ শৈলকে বল, তাহাতে সে নিজ জল প্রদান করিবে ; এইরূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে শৈল হইতে জল বাহির করিয়া মণ্ডলীকে ও তাহাদের পশুগণকে পান করাইবে। তখন মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার সম্মুখ হইতে ঐ যষ্টি লইলেন। আর মোশি ও হারোণ সেই শৈলের সম্মুখে সমাজকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে বিদ্রোহিগণ, শুন ; আমরা তোমাদের নিমিত্তে কি এই শৈল হইতে জল বাহির করিব ? পরে মোশি আপন হস্ত তুলিয়া ঐ যষ্টি দ্বারা শৈলে দুই বার আঘাত করিলেন, তাহাতে প্রচুর জল বাহির হইল, এবং মণ্ডলী ও তাহাদের পশুগণ পান করিল।"–গণনাপুস্তক ২০ ঃ ১-১১

প্রত্যেক গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘাট

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ঃ قَدْ عَلِمَ অর্থাৎ জেনে নিলো, নির্দিষ্ট করে নিলো। পাহাড় চিরে বারটি ঝর্ণা বের হয়েছিলো। বনী ইসরাঈলেরও বারটি গোত্র ছিলো, তাই প্রত্যেক গোত্রই নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘাট নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলো। অতপর পানির জন্য কোনো প্রকার ঝগড়া হওয়ার আর কোনো অবকাশই অবশিষ্ট থাকলো না। যদি প্রবহমান এ পানির ব্যবস্থা না হতো, তাহলে এ ময়দানে এসব লোকদের মধ্যে পানি পান করা আর পান করানোর জন্য প্রতিদিন তলোয়ার চালাতে হতো। এ কারণেই এ ঘটনা শুধু একটি অলৌকিক ঘটনাই নয়, বরং এটি ছিলো এক বিরাট করুণা।

নেয়ামতের হক বা দায়িত্ব

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا........ ঃ যেভাবে مَنَّ وَالسَّلْوٰى নামক নেয়ামতের উল্লেখ করার পর ৫৭ আয়াতে বলেছেন كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ "সেসব পবিত্র জিনিস থেকে তোমরা খাও যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।" সেভাবে এ পানির ব্যবস্থার বরাত দিয়ে তিনি এরশাদ করেছেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ "আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা খাও, আর যমীনে তোমরা বিশৃংখলা, অশান্তি ছড়িয়ো না।"

www.pathagar.com

এটা হচ্ছে সেই মহা নেয়ামতের হকের বর্ণনা যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নেয়ামত যা আমরা অর্জন করি, নিজের অস্তিত্ব দ্বারাই আমাদেরকে সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ঐ নেয়ামত লাভ করার কারণে আমাদের ওপর বর্তায়। এটা হচ্ছে ঐ দায়িত্বেরই ব্যাখ্যা বা বর্ণনা। মানুষের স্বভাব যদি নেয়ামতের নাশোকরীর কারণে বিকৃত না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ দায়িত্বকে সে অস্বীকার করতে পারে না। এটাতো সেই স্বভাবেরই প্রতিধ্বনি খোদায়ী অহীর মাধ্যমে তার কান যার আওয়াজ শুনতে পায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা এই যে, مَنٌّ এবং سَلْوٰى উল্লেখ করার পর শুধু كُلُوْا (খাও) শব্দ এসেছে এজন্য যে, ঐ সময় পর্যন্ত শুধু প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। যখন প্রচুর পরিমাণে পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে তখন كُلُوْا (খাও) এর সংগে وَاشْرَبُوْا (এবং পান করো) শব্দেরও সংযোগ করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ৬১

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ط اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

بقل، قثاء، فوم এবং ثوم -এর ভাবার্থ

بقل শব্দটি সব ধরনের সবজী, তরি-তরকারীর জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য।

قثاء হচ্ছে শশা এবং খিরা জাতীয় এক ধরনের সবজী।

فوم এবং ثوم একই জিনিস, এর অর্থ হচ্ছে রসুন। আরব দেশের লোকেরা কখনো কখনো ث কে ف দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে। যেমন, عاثور কে عافور এবং اثافى কে اثاثى বানিয়ে ফেলে। আমাদের এখানে تهوم (থুম) শব্দটিও এখান থেকেই চালু হয়েছে বলে মনে হয়। এটি রসুনের জন্য এতটাই প্রসিদ্ধ যে, এর দ্বারা রুটি, গন্দম অথবা মাটি থেকে উৎপন্ন দানা ইত্যাদি মনে করার কোনো অবকাশ নেই। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা সর্বদাই যে অর্থটি ব্যাপক ও প্রসিদ্ধ সেটা অনুসারেই করা উচিত।

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের যে দাবীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার উল্লেখ তাওরাতের গণনাপুস্তক এগারতম অধ্যায়ে এভাবে এসেছে,

"আর লোকেরা বচসাকারীদের মত সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে মন্দ কথা কহিতে লাগিল ; আর সদাপ্রভু তাহা শুনিলেন, ও তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ; তাহাতে

www.pathagar.com

তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া শিবিরের প্রান্তভাগ গ্রাস করিতে লাগিল। তখন লোকেরা মোশির নিকটে ক্রন্দন করিল ; তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তখন তিনি ঐ স্থানের নাম তবেরা [জ্বলন] রাখিলেন, কেননা সদাপ্রভুর অগ্নি তাহাদের মধ্যে জ্বলিয়াছিল। আর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাক্রান্ত হইয়া উঠিল ; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণও পুনর্ব্বার রোদন করিয়া কহিল, কে আমাদিগকে ভক্ষণার্থে মাংস দিবে ?"

–গণনাপুস্তক ১১ ঃ ১-৪

বনী ইসরাঈলের হীন চরিত্রের একটি উদাহরণ

اَدْنٰى ঃ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْنَ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ শব্দটি دناءت থেকে গৃহিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি একটি উন্নতমানের খাদ্যকে একটি নিকৃষ্ট এবং নিম্নমানের খাদ্যের দ্বারা বদলাতে চাও ? এ مَنٌّ এবং سَلْوٰى নামক খাদ্য তোমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। আর এ খাদ্য তোমরা এ ময়দানে এমন এক অবস্থায় পাচ্ছো, যখন তোমরা ফেরাউনের গোলামী, শিরক ও কুফরের আনুগত্য করার লাঞ্ছনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শুষ্ক এবং স্বাদ বিহীন যে খাদ্য স্বাধীন ও মুক্ত অবস্থায় তোমাদের ভাগ্যে জুটছে তা গোলামী আর লাঞ্ছনার হালুয়া থেকে হাজার গুণ বেশী ভাল। কিন্তু তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে এই যে, তোমরা মজাদার খাবারের জন্য এত বেশি লালায়িত যে, তা না পেলে তোমাদের দৃষ্টিতে সেই স্বাধীনতারও কোনো সম্মান ও মূল্য নেই, যেখানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ওপরে কারো শাসন অবশিষ্ট নেই।

বনী ইসরাঈলের এ আচরণের মধ্যে সেসব মুসলিম জাতির জন্য এক বিরাট শিক্ষা নিহিত রয়েছে যারা সাংস্কৃতিক উপকরণ আর বৈচিত্রের পিছনে স্বীয় স্বাধীনতার মতো নেয়ামতকেও হুমকি ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেনি যে, জাগতিক যে সুখ ও স্বাদ তারা অর্জন করেছে তার মধ্যে কত লাঞ্ছনার ঘৃণ্য উপকরণ লুক্কায়িত আছে। কুরআন মজীদের এ স্থান থেকে এ মর্মকথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের অন্তরাত্মা জীবন্ত হলে সে খাদ্যের স্বাদ খাবার টেবিলের বৈচিত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করে না বরং বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতার মাঝে অনুসন্ধান করে। এ জিনিস যদি তার অর্জিত হয় তাহলে শুকনো রুটিও তার জন্য রকমারি নেয়ামতের সুখ এনে দিতে পারে।

مصر বলতে কি বুঝায়

اِهْبِطُوْا مِصْرًا ঃ هبط -এর আসল অর্থ হচ্ছে পতিত হওয়া। কোনো মুসাফিরের কোনো স্থানে অবতরণের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় هبطنا الوادى (আমরা উপত্যকায় প্রবেশ করেছি) এখান থেকেই اهبطوا مصرا কথার প্রচলন হয়েছে এবং هبوط শব্দটি অবতীর্ণ হওয়ার সমর্থক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে। এ ব্যবহারের কারণ খুব সম্ভব এই যে, মুসাফির যখন কোনো স্থানে অবস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সে ওই স্থানে স্বীয় বাহন থেকে অবতরণ করে।

www.pathagar.com

এ বিশেষ স্থানে এ শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, বনী ইসরাঈল যেসব জিনিসের দাবী করেছিলো সেগুলো কোনো সমতল এবং সজীব ও সবুজে ভরা স্থানেই পাওয়া যেতো।

مِصْرًا দ্বারা কোনো শহর বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা মিসর দেশ বুঝানো হতে পারে না। مِصْر কুরআন মজীদে মিসর দেশের জন্য কয়েক স্থানেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সব স্থানেই غير منصرف [كسرة ও تنوين গ্রহণ করে না] হিসেবে এসেছে। শুধু এ আয়াতেই এটি منصرف হিসেবে [كسره এবং تنوين গ্রহণ করে] এসেছে। এ জন্যই শব্দটি অপরিহার্য কারণেই সাধারণভাবে শহরের অর্থ বুঝানোর জন্যই এখানে এসেছে। অবশ্য শহরের জন্য বিশেষভাবে مصر শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে ভাষার লালিত্যের একটি দিক এখানে ফুটে উঠতে পারে আর তা হচ্ছে এই যে, এ শব্দটির মাধ্যমে তাদের সেই লাঞ্ছনা ও মুসীবতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে তারা মিসর দেশে থাকাকালীন সময়ে নিমজ্জিত ছিলো। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, এ স্বাদের বস্তু ছাড়া যদি তোমাদের জীবন না চলে, তাহলে তোমাদেরকে তো এজন্য কোনো না কোনো মিসরের ফাঁদের নিচে গর্দান দিতেই হবে। আর এটা এজন্য যে, যে জাতি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে পারে না। সে জাতি নিজেকে অপমান আর লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারে না।

مَسْكَنَتْ-এর ভাবার্থ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؛ مَسْكَنَتْ-এর অর্থ হচ্ছে অক্ষমতা, আনিচ্ছা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং দুরাবস্থা। 'তাদের ওপর লাঞ্ছনা আর কাপুরুষতা ঢেলে দেয়া হয়েছে' এ বক্তব্য দানের মর্যাদা হচ্ছে এই যে, দেয়ালের ওপর যেমনিভাবে আঠালো মাটির প্রলেপ দেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে তাদের অব্যাহত অকৃতজ্ঞতা আর আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমূল্যায়নের কারণে তাদের ওপর অপমান আর লাঞ্ছনার প্রলেপ দেয়া হয়েছে, যার ফলে স্বীয় দুশমনদের মোকাবেলায় তারা গো-বেচারা হয়ে আছে, বিপদজনক অবস্থায়ও তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের কোনো দৃঢ়তা ও উদ্যম অবশিষ্ট নেই।

وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ (এবং তারা আল্লাহর গযব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে)-এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সফলতা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসব সুযোগ দিয়েছেন স্বীয় ভীরুতা ও অযোগ্যতার কারণে সেখান থেকে তারা আল্লাহর অভিশাপ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।

ইহুদীদের লাঞ্ছনার কারণ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ...... ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এখানে তাদের ওপর অপমান আর লাঞ্ছনার গ্লানির প্রলেপ দেয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ অপমান আর লাঞ্ছনা তাদের একটি মাত্র পাপের ফসল নয় বরং তাদের পুরো ইতিহাস বদমায়েশী আর

www.pathagar.com

নাফরমানীতে পরিপূর্ণ। তারা নিজেদের অপকর্ম এবং সীমালংঘন করার স্বভাবের কারণে সর্বদাই আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো আর তাদের নবীগণকে হত্যা করতো। এজন্যই তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন দম্ভ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর খুব প্রিয় পাত্র। তারা স্বীয় কুকর্মের জন্য আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।

আম্বিয়া কেরামের মধ্য থেকে ইহুদীদের হাতে যেসব নবী নিহত হওয়ার কথা খোদ ইহুদীদের ইতিহাস থেকে জানা যায় তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন হযরত যাকারিয়া (আ) যাকে ইহুদী রাজা ইয়াহুদা ইউআছের নির্দেশে পবিত্র হাইকেল ও কুরবানী স্থলের মাঝখানে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়।

এরপরেই পাওয়া যায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নাম। যাকে ইহুদী শাসক হেরদুয়াইছের নির্দেশে হত্যা করা হয় এবং তাঁর মাথা তৎকালীন বাদশাহ একটি পাত্রের মধ্যে রেখে নিজের প্রেমিকাকে উপহার দেয়।

তারপরই আসে সাইয়্যিদিনা হযরত ঈসা (আ)-এর কথা। তাকে ইহুদীরা শূলিতে চড়িয়েছে বলে দাবী করে থাকে। যদিও আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

এখানে আম্বিয়ায়ে কেরামের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করার সাথে بِغَيْرِ الْحَقِّ (অন্যায়ভাবে) কথাটিও জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে তাদের অপরাধের জঘন্যতার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। এটা এজন্য যে, খোদ হত্যাই মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় অপরাধ। এ অপরাধের জঘন্যতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন এ অপরাধটি আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। অতপর তাদের জঘন্যতার সাথে একথা দ্বারা তীব্রতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে যখন অপরাধটি সংঘটিত বৈধ কোনো কারণ ছাড়াই। এখানে কুরআনে কারীম ইহুদীদের এ অপরাধের সকল জঘন্যতাকে একত্রিত করেছে।

আয়াত ঃ ৬২

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

يَهُوْدُ শব্দের বিশ্লেষণ

هَادَ، يَهُوْدُ এবং هُوْدًا এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাওবা করা। কুরআনে কারীমে হযরত মূসা (আ)-এর দুআ এ শব্দে করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ - الاعراف : ١٥٦ "আমাদের জন্য এ দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ লিখে দিন, আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬) অতপর هَادَ এবং تَهُوْد ইহুদী হওয়ার অর্থে

ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ ব্যবহারটি হয়েছে আরব ভাষার সাধারণ নিয়ম মোতাবেক, ঠিক যেমনিভাবে تَنَصَّرَ নাসারা হয়ে যাওয়ার অর্থে হয়ে থাকে।

এ শব্দের এটাই আসল মর্মার্থ। কিন্তু কিছু সংখ্যক ইসলাম বিরোধী এর বিরোধিতা করে বলে যে, কুরআনে কারীমে এ শব্দের ভুল ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের দাবী হচ্ছে এই যে, يهود শব্দটির ধাতু هود নয়, বরং يهودا যিনি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চতুর্থ পুত্র ছিলেন। এ বিরোধিতার ফলে শব্দটির বিশ্লেষণ খুবই জরুরী। মাওলানা ফারাহী (র) স্বীয় তাঁর مفردات القران নামক কিতাবে এ শব্দের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। মাওলানা এ শব্দের উৎপত্তিস্থল বিষয়ক গবেষণা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"আমি এ শব্দটির উৎপত্তি এবং উৎস নিয়ে আলোচনা করবো যাতে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, যারা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে তারা না বুঝতে পেরেছে কুরআন মজীদ, আর না বুঝতে পেরেছে নিজেদের ঐশী কিতাব। কুরআন মজীদে এ শব্দটি যে ব্যবহার করেছে তা নিজে থেকে উদ্ভাবন করে ব্যবহার করেনি, বরং আরবী ভাষায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দকেই ব্যবহার করেছে। আরবের লোকেরা يهود، هاد ক্রিয়াটি ইহুদী হওয়ার অর্থে ব্যবহার করে আসছে। কুরআন মজীদ যে هُدْنَا শব্দ ব্যবহার করেছে তা يهود শব্দের উৎস বর্ণনা করার জন্য নয়, বরং এ শব্দ তার প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ তাওবা করা এবং প্রত্যাবর্তন করার অর্থে ব্যবহার করেছে অবশ্য এ শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে ভাষাগত লালিত্যের একটি দিক নিহিত আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, ইহুদীদেরকে এমন একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগী করা যা তারা ভুলে বসেছিলো। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।"

"এ আপত্তি দ্বারা তারা নিজেদের সহীফা (ছোট ঐশী কিতাব) সম্পর্কে তারা যে কতখানি অসচেতন তার প্রমাণ দিয়েছে। এর রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আলোচনা সামনে পেশ করা হচ্ছে তার মাধ্যমে।

يهودا হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বারজন ছেলের মধ্যে চতুর্থ ছেলে ছিলেন। যাদের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের বারটি বংশের প্রকাশ ঘটেছিলো। ইয়াশু' এর যমানায় বিজিত অঞ্চলগুলো তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো। এ বন্টনের মধ্যে জেরুজালেম থেকে নিয়ে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল বনী ইয়াহুযার ভাগে পড়েছিলো। হযরত দাউদ (আ) এ বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর যমানায় বনী ইসরাঈলের সমস্ত রাজ্যই তাঁর হস্তগত হয়ে যায়। যার ফলে এ বংশের শান-শওকত ও মান-সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁর পরেই তার ছেলে হযরত সুলাইমান (আ) তাঁর উত্তরাধিকারী হন। যিনি তাঁর রাজধানীতে পবিত্র হাইকেল (মসজিদ) তৈরি করেছিলেন। এর ফলে বনী ইয়াহুযার মান-সম্মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।"

"হযরত সুলাইমান (আ)-এর পরে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং পুরো জাতিই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের একটি অংশ ইয়াহুযা এবং অপর অংশটি বনী

www.pathagar.com

ইসরাঈল নামে পরিচিতি লাভ করে। অবশিষ্ট অন্যান্য বংশগুলো পরবর্তীতে অপরিচিত থেকে যায়। পরবর্তী ইতিহাসে শুধু ইয়াহুযা আর ইসরাঈলেরই নাম পাওয়া যায়। অতপর তারা যখন কলদানীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ হয়ে পড়লো তখন সমস্ত বনী ইসরাঈলের জন্যই ইয়াহুদ (ইহুদী) শব্দটি একক নাম হিসেবে ব্যবহার হতে শুরু করলো। এর দ্বারা একথা জানা যায় যে, তারা 'ইয়াহুযা' এবং 'ইয়াহুদ' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মনে করতো।"

یهوذا শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ইহুদীদের মধ্যে বিরাট সংশয় রয়েছে। তারা মনে করে যে, এ শব্দটি یهود এবং ذا যোগে গঠিত হয়েছে। یهو -এর অর্থ হচ্ছে الله (আল্লাহ) আর ذا অর্থ হচ্ছে এই বা ইহা। এ রকমের یهو শব্দ যোগে যেহেতু তাদের কাছে অনেক নাম আছে, সেহেতু এ নামকরণ নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে یهوذا -এর নামকরণের ব্যাপারে জন্ম গ্রন্থে যেসব কথা রয়েছে সেগুলো তারা বুঝতে সক্ষম হয়নি। سفر تكوين (সফরে তাকওইন) এর কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ

"এবং তিনি [ইয়াকুব (আ)-এর স্ত্রী] পুনরায় গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর ছেলে হলো। তখন তিনি বললেন, এখন আমি আল্লাহর প্রশংসা করবো, গুণকীর্তন করবো। এজন্যই তার নাম রাখা হয়েছে یهوذا ।"-(জন্ম অধ্যায়-১৮)

"এর দ্বারা ইহুদীরা একথা বুঝে নেয় যে, এ শব্দটি উক্ত ঘটনা এবং یهود শব্দের দিকে ইঙ্গিত করছে। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ তাআলার প্রশংসার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। শব্দগুলো এ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এর সমর্থন করছে। এক ঃ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেদের নামগুলোর অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমনি তাদের জন্মের উল্লেখ সংক্রান্ত আলোচনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একইভাবে বিষয়টি সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেছে। যখন হযরত ইয়াকুব (আ) তাদের জন্য বরকতের দোয়া করেছিলেন। যেমন জন্ম সংক্রান্ত আলোচনায় পয়দায়েশ গ্রন্থের ৩০ তম অধ্যায়ে ১৯-২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

"এবং লিয়াহ [ইয়াকুব (আ)-এর স্ত্রী] পুনরায় গর্ভবতী হলেন এবং ইয়াকুব (আ)-এর ষষ্ঠ ছেলের জন্ম দিলেন। তখন 'লিয়াহ' বললেন ঃ আল্লাহ আমার প্রতি বিরাট মেহেরবানী করেছেন। এখন থেকে আমার স্বামী আমার সাথে থাকবেন কেননা আমার গর্ভে তাঁর ছয়জন ছেলের জন্ম লাভ করেছে। তাই তিনি তার নাম যুবুলুন [زبولون] রাখলেন। এ কিতাবেই বরকতের জন্য দোয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এসেছে ঃ যুবুলুন সমুদ্রের কিনারায় বসবাস করবে ১৩/৪৯। খেয়াল করে দেখো, এ দুটি স্থানে বসবাসের অর্থের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এমনিভাবে یهوذا সম্পর্কে এ গ্রন্থে যে দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে তার শব্দগুলো নিম্নরূপ ঃ হে ইহুদা, তোমার ভাইরা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার শত্রুর ওপর তোমার আধিপত্য থাকবে। তোমার পিতার সন্তানরা তোমার সামনে মাথা নত করবে।

www.pathagar.com

এ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, يهوذا -এর নামকরণের মধ্যে মূলত প্রশংসা এবং আনুগত্যের ধারণা লক্ষ করা যায়। আর يهوذا শব্দটি يهو এবং ذا -এর যৌথরূপ নয়, বরং এটি একটি শব্দ, যার ধাতু হচ্ছে يهود।

দুই ঃ কলদানীদের কাছে বন্দী দশার পর তাদের যে যৌথ নাম ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে يهودا এবং يهودى -এর প্রমাণ ইস্রা, নহিমিয়, ইষ্টের, যিশাইয়, যিরমিয়, দানিয়েল এবং ইঞ্জিলের মধ্যে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এ নামই সার্বজনীন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদি আসল নাম তাদের দাবী অনুযায়ী يهوذا হতো, তাহলে তাদের নাম يهوذا -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে يهوذى (ইয়াহুযী) হতো, ইয়াহুদী হতো না।

তিন ঃ এ يهو শব্দের সাথে এমন শব্দকেই শুধু মিলানো যায়, যা মিলানো এর সাথে আক্ষরিক ও উচ্চারণগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ذا শব্দটি এ ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো শব্দ নয় যা কোনো সৃষ্টির নাম রাখার জন্য এর সাথে মিলানো যেতে পারে। কেননা এটিকে মিলানো হলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে 'এটি আল্লাহ'। কোনো সৃষ্টির জন্য এ শব্দ ব্যবহার করা যে নিতান্তই ঘৃণ্য কাজ (এবং শিরকী কাজ) তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কুরআন মজীদে এখানে তার নিজস্ব সাধারণ নীতি মোতাবেক ইহুদীদেরকে তাদের একটি ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে এবং এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা যে يهودا শব্দের দিকে নিজেদের সম্বন্ধযুক্ত করে তার মূল হচ্ছে هود এবং এর মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যার মধ্যে তাদের নামের দাবী নিহিত। আর তা হচ্ছে, তারা যেনো আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। [এসব বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাওলানা ফারাহী (র)-এর مفردات القران এর هدوا শব্দের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।]

نصارى শব্দের বিশ্লেষণ

نصارى শব্দের বিশ্লেষণ উস্তাদ ইমাম (র) স্বীয় গ্রন্থ مفردات القران -এর মধ্যে যেভাবে করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

نصارى হচ্ছে نصران -এর বহুবচন, যেমনিভাবে ندمان ندامى -এর বহুবচন প্রথম প্রথম তাদের নামই نصارى ছিলো এবং তাদের পূর্ব পুরুষেরা এ নামকেই পসন্দ করতো। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং নিজেদের জন্য এ নামটি অপমানজনক মনে করে। এ সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, নাসারাগণ পরবর্তীতে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল সত্যপন্থী খলীফা শামউনের আনুগত্য করতঃ নিজেদেরকে নাসারা হিসেবে নামকরণ করেন। এ সম্প্রদায়ের লোকজনই রাসূল (স)-এর নবুওয়াত লাভের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এটাই সে সম্প্রদায়, কুরআনে কারীম বিভিন্ন স্থানে যার প্রশংসা করেছে। وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّا نَصٰرٰى - المائدة : ٨٢ "তোমরা ঈমানদার

ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে সেসব লোকদেরকে বেশি নিকটবর্তী দেখতে পাবে, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮২

তাদের দ্বিতীয় দলটি বেদআতী বুলুসের (পাল) আনুগত্য করেছে। বর্তমান খৃস্টানরা এ দলটির সাথেই সম্পর্ক রাখে। তাদের কাছে 'নাসারা' শব্দ একটি অপমানজনক নাম। তাদের ধারণা মতে এ শব্দটি একটি গ্রামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত যা নিতান্তই নিকৃষ্ট ধরনের গ্রাম ছিলো। ইউহান্না প্রথম অধ্যায়-৪৫ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ফিলিপস নাতানঈলের সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে বললো ঃ যার উল্লেখ মূসা (আ) তাওরাতে করেছেন এবং অন্যান্য নবীগণ উল্লেখ করেছেন, তা আমরা পেয়ে গেছি। তিনি হচ্ছেন ইউসুফ (আ)-এর ছেলে ইয়াসূনাসেরী। নাতান ঈল তাকে বললো ঃ নাসেরা থেকে 'কি কোনো ভাল জিনিস বের হতে পারে ? একথা ওই সম্প্রদায়ের অহমিকারই একটি প্রমাণ। যদি হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান নাসেরাই হয়ে থাকে, তাহলে সে দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার মধ্যে হীনতার কি আছে ? যখন এটাও তাদের দাবী যে, নাসেরা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান এবং নাসেরী উপাধিতে তাঁকে ডাকা হোক? যেমন মাত্যা অধ্যায় ২-২৪ এ আছে ঃ এবং নাসেরা নামক এক শহরে গেলো, যাতে নবীদের মাধ্যমে যা বলা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। "আর তাকে নাসেরী বলা হবে।" কুরআনের কিছুসংখ্যক বিরোধিতাকারী এ শব্দকেও কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি অযুহাত বানিয়েছে। তাদের অভিযোগ হলো এই যে, যেহেতু এ নামকরণের কারণটি কুরআনের জানা ছিলো না, এজন্য কুরআন 'নাসারা' শব্দটি نصرت (নুসরাত) থেকে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করেছে। এবং সূরা 'সাফ'-এর নিম্নোক্ত আয়াতে এ দিকটারই উল্লেখ করা হয়েছে। وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ "আর স্বরণ করো সে সময়ের কথা যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) হাওয়ারীদের উদ্দেশ্যে বললো ঃ আল্লাহর রাস্তায় কে আমার সাহায্যকারী হবে ? হাওয়ারীগণ বললো ঃ আমরা আল্লাহর সাহাযকারী হবো।" আমাদের মতে এ বিরোধিতাকারীদের অভিযোগ আয়াতের ভাবার্থের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কুরআন মজীদে নাসারাদের নামকরণের বর্ণনা দেয়নি। বরং এখানে একটি বাস্তব বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছে। বড়জোর এ আয়াত থেকে যে কথাটি বের হয়ে আসে তা হচ্ছে এই যে, এতে একটা নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে আর তা হচ্ছে, যারা নাসারা নামে অভিহিত, তাদের উচিত হকের সাহায্যকারী হওয়া। কেননা এর ইঙ্গিত তাদের নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ ধরনের বিনম্র ইঙ্গিত আম্বিয়ায়ে কেরামের কথার মধ্যে অধিক পরিমাণে রয়েছে। হযরত ঈসা (আ) সাফা উপাধির ধারক 'শামউন' এর উদ্দেশ্যে বলেছেন আমিও তোমাকে বলছি যে, তুমি হচ্ছো 'পুতরুছ' এবং আমি এ পাথরের ওপর নিজের গীর্জা তৈরি করবো।

–অধ্যায় ১৬-১৮

(এর বিস্তারিত বর্ণনার জন্য মাওলানা ফারাহীর (র)-এর مفردات القران এ نصارى শব্দের বিশ্লেষণ দেখুন)

www.pathagar.com

صَابِئِيْنَ শব্দের বিশ্লেষণ

صَابِئِيْنَ : صَابِئِيْنَ শব্দের ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারীগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মুজাহিদ এবং হাসানের মতে এসব লোক (অর্থাৎ সাবেয়ীন) কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী ছিলো না। বরং তারা ইহুদী এবং অগ্নি পূজারীদের মাঝা-মাঝি অবস্থায় ছিলো। তাদের মতে এদের জবাই করা পশু খাওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম ছিলো। ইবনে যায়েদের মতে এরা একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারী ছিলো। এবং মূসেল দ্বীপে তাদের বসবাস ছিলো। তাওহীদের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিলো, তবে তারা কোনো নবী এবং কোনো কিতাবের অনুসারী ছিলো না। তাদের কাছে শরয়ী কর্মকাণ্ডের কোনো বিশেষ নীতি ছিলো না। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন যে, তারা ফেরেশতাদের পূজারী ছিলো, কেবলার দিকে ফিরে নামায পড়তো আর যবুর কিতাব তেলাওয়াত করতো। আবুল আলীয়া এবং সুফিয়ানের মতে তারা আহলে কিতাবেরই একটি ফেরকা (দল) ছিলো।

মাওলানা ফারাহী (র) বলেন ঃ এসব মতামত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হলেও প্রকৃত অর্থে এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, প্রথম প্রথম এসব লোক সত্য দীনের ওপরই ছিলো, কিন্তু পরবর্তীতে তারা সত্য দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে ফেরেশতা এবং নক্ষত্রের পূজা-অর্চনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এটা ঠিক সেই আচরণের মতোই, যেমনিভাবে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানরা প্রথম দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তারা শিরক এবং মূর্তী পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের আলোচনা দ্বারা মাওলানা (র) এর চিন্তাধারার সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কুরআন এ সম্প্রদায় সম্পর্কে যে ধরনের কথা উল্লেখ করেছে তাদ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তারা প্রথম দিকে সত্য দীনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো, পরবর্তীতে তারা বেদআত ও পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো। মাওলানা (র)-এর ধারণা হচ্ছে এই যে, এসব লোকদের মধ্যে নামাযের ইবাদাত খুব বেশি ছিলো বলে জানা যায়। তাদের সাথে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাদৃশ্যের কারণেই মুশরিকরা (রাসূল) এবং তাঁর সাহাবীগণকে صابين বলতো।

তাদের নামকরণের ব্যাপারে মাওলানা (র)-এর ধারণা হচ্ছে এই যে, যেহেতু صباء-এর অর্থ উদয় হওয়ার জন্য এসে থাকে। সেহেতু এসব লোক তাদের নক্ষত্র বিদ্যা এবং তারকার পরিচিতিতে তারা দক্ষতা অর্জন করার কারণে হয়তো এ নামেই তাদের নামকরণ করা হয়েছে।

যেহেতু এ ধর্মের অনুসারীদের অস্তিত্ব কোথাও আর অবশিষ্ট নেই, এবং তাদের নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাসও নেই, সেহেতু তাদের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো কথা বলাই মুশকিল। তবে মনে হয় কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হিসেবে তাদের অস্তিত্ব পরিচিত ছিলো।

www.pathagar.com

৩৪. আহলে কিতাবের জন্য কি রাসূল (স)-এর ওপর ঈমান আনয়ন করা অত্যাবশ্যক নয় ?

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, শব্দাবলী ও বাক্যসমূহের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা সেদিকে প্রয়োজন মোতাবেক ইঙ্গিত করে এসেছি। এখন সেগুলোর পুনরুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য আয়াতগুলোর সর্বশেষ আয়াত ٦٢ : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - الاٰية (৬২ আয়াত)-এর ওপর আমরা এখানে কিছু কথা-বার্তা বলবো। আর এটা এজন্য যে, বর্তমানকালের কতিপয় লোক এবং সুন্নাতের অস্বীকারকারী বা একটি ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, আর তা হচ্ছে এই যে, যেসব আহলে কিতাব নিজ নিজ সহীফা (ঐশী ছোট কিতাব) এর শিক্ষানুযায়ী নেক নিয়তের সাথে আমল করছে, তাদের মুক্তির জন্য রাসূল (স)-এর ওপর ঈমান আনয়ন করা তাদের জন্য জরুরী বলে কুরআন মজীদ সিদ্ধান্ত দেয় না, তাদের ধারণা অনুযায়ী এ ধরনের আহলে কিতাবের মুক্তির জন্য নিজ নিজ সহীফা এবং নবীগণের শিক্ষাকে নেক নিয়তের সাথে আমল করাটাই যথেষ্ট। তারা তাদের ধারণার সমর্থনে যেসব প্রমাণাদি পেশ করে, সূরা বাকারার এ আয়াতটি তারই অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই এ আয়াতের বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া অতীব জরুরী বলে আমরা মনে করি যাতে যেসব লোক অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিমজ্জিত নয়, তাদের ভুল বুঝাবুঝি দূরিভূত হয়ে যায়।

এ আয়াতকে তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার সমর্থনে উপস্থাপন করার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, এতে তাদের ধারণামতে মুসলমান, ইহুদী, নাসারা এবং সাবেয়ীনসহ সকল উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়ের নাম নিয়ে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর নেক আমল করবে তার জন্যই তার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার রয়েছে। তার না থাকবে কোনো ভয়, না থাকবে কোনো দুশ্চিন্তা। বাহ্যত যদি এ আয়াতের অর্থ এটাই ধরে নেয়া হয়, তাহলে উল্লেখিত সম্প্রদায়ের লোকদের নাযাত বা মুক্তির জন্য রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করার আবশ্যকতা অবশিষ্ট থাকে না এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া ঈমানের অন্য যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করা কুরআন ও হাদীস আবশ্যক বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনার আবশ্যকতা থাকে না।

এ আয়াতের এ অর্থ শুধুমাত্র ওই অবস্থায় নেয়া যেতে পারে, যখন আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা বাচনভঙ্গি একথার প্রমাণ পেশ করে যে, এ আয়াত ঈমানের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে। আয়াতের স্থান ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বুঝা যায় যে, এখানে এ প্রশ্ন (যেমনটি ওপরের আলোচনায় আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি) আলোচিত হয়নি যে, নাজাতের জন্য কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর ঈমান আনা অত্যাবশ্যক, আর কোন্ জিনিসের ওপর ঈমান আনা আবশ্যক নয়। বরং এখানে আলোচ্য প্রশ্নটি হচ্ছে

এই যে, আল্লাহর কাছে কারো মর্যাদা বা সম্মান অর্জনের বিষয়টি কোনো বিশেষ বংশ বা ফেরকার সাথে সম্পর্ক রাখার ভিত্তিতে নির্ণিত হয়, নাকি ঈমান এবং নেক আমলের ভিত্তিতে নির্ণিত হয় ? এ প্রশ্নের জবাব কুরআন মজীদ এভাবে দিয়েছে যে, প্রতিটি জিনিস অর্জিত হয় কেবলমাত্র ঈমান আর নেক আমলের ভিত্তিতে। এটি কোনো বিশেষ বংশ কিংবা কোনো দলের একচেটিয়া অধিকার নয়। এ বক্তব্যের দ্বারা ইহুদীদের সামনে এ রহস্যকে সুস্পষ্ট করে তোলা যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের বংশের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে নিজেদেরকে একটি মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় বলে তাদের যে উপলব্ধি তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক লাভের জন্য আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং নেক আমল করা।

এ মর্মার্থকে ভালভাবে মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দৃশ্যপটে রাখা চাই ঃ

এক ঃ এ আয়াত এমন সূরায় এসেছে যার স্তম্ভই হচ্ছে রাসূল (স) এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত। একথা শুরুতেই আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং এ দাওয়াত এ সূরায় বিশেষভাবে ইহুদীদের সামনেই পেশ করা হয়েছে। ইশারা-ইংগিতের কথা বাদ দিলেও যে আলোচনার ধারাবাহিকতার শেষ পর্যায়ে আয়াতটি এসেছে তা এভাবে আরম্ভ হয়েছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ج وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ۝ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ص وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ۝ ـ البقرة : ٤٠-٤١

“হে বনী ইসরাঈল, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যে নেয়ামত আমি তোমাদের দান করেছি এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো এবং তোমরা আমাকে ভয় করো। এবং ঈমান আনয়ন করো ওই জিনিসের প্রতি যা আমি তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে নাযিল করেছি। আর তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো।”–সূরা আল বাকারা ঃ ৪০-৪১

এ আয়াতের মধ্যে বনী ইসরাঈলকে সুস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগে সম্বোধন করে কুরআনের ওপর ঈমান আনয়ন করার প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। এ দাওয়াত অস্বীকার করাকে সুস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগে কুফরী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কুরআনের প্রতি ঈমান কিছুতেই সম্ভব নয়। আরো খেয়াল করে দেখুন যখন এ আয়াতে কুরআন এবং রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান না আনাকে কুফরী বলা হয়েছে, তখন একই কথার ধারাবাহিকতায় কয়েকটি আয়াতের পরই এ মর্মে আয়াত কিভাবে আসতে পারে যে, আহলে কিতাবের জন্য কুরআনের প্রতি

www.pathagar.com

এবং রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনা জরুরী নয় এবং এটা ছাড়াও তো তাদের নাজাত হতে পারে ? এ ধরনের কথা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য হবে, যা সাধারণ বই পুস্তকেও সাংঘাতিক দূষণীয় বিষয়, কুরআন তো দূরের কথা।

দুই ঃ এ আয়াতই সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ সূরা মায়েদায় এসেছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ـ المائدة : ٦٩

"নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, ইহুদী হয়েছে, আর যারা সাবিয়ী এবং নাসারা, যে কেউ আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য কোনো ভয়ের কারণ নেই এবং কোনো প্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্তও তারা হবে না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৯

সেখানে এর আগের আয়াতই হচ্ছে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ ـ المائدة : ٦٨

"বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত এবং ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠিত করবে, এবং যতক্ষণ না সেই জিনিস প্রতিষ্ঠিত করবে যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকেরই নাফরমানী এবং কুফরী বৃদ্ধি পাবে। অতএব তুমি এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৮

প্রকাশ থাকে যে, এখানে مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন মজীদ, যা তাওরাত এবং ইঞ্জিলের সাথে কায়েম করার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে এবং যা কায়েম করা ছাড়া তাদেরকে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে তাদের কোনো ভিত্তি নেই, অথচ তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় জাতি বলে মনে করে।

এখানে তাওরাত এবং ইঞ্জিল কায়েম করার যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য এটাই যে, কুরআনের প্রতি ও শেষ যমানার নবীর প্রতি ঈমান আনো। কেননা তাঁর প্রতি ঈমান আনলেই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে যা ওইসব সহীফাগুলোতে আখেরী যমানার নবীর ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিলো।

এ বিষয়ের আরো অধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এর আগের আয়াতগুলো থেকে পাওয়া যায়। এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ - المائدة : ٦٥-٦٧

"যদি আহলে কিতাব ঈমান আনতো আর তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিতাম, তাদেরকে নেয়ামতের বাগানসমূহে প্রবৃষ্ট করতাম। তারা যদি তাওরাত এবং ইঞ্জিল কায়েম করতো, আরো কায়েম করতো ওই জিনিস যা তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে এবং নিচ থেকে আল্লাহর করুণা লাভ করতো। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুসারী কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই খারাপ কাজ করে যাচ্ছে। হে রসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা পৌছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌছালেন না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মানুষের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"–সূরা মায়েদা ঃ ৬৫-৬৭

এ আয়াতের মধ্যেও বলা হয়েছে যে, তাওরাত এবং ইঞ্জিল কায়েম করার উদ্দেশ্য মূলত কুরআনের مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ প্রতি ঈমান আনা এবং তা কায়েম করা। কেননা এর ওপর ঈমান আনার মাধ্যমেই সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে যা শেষ যমানার নবীর ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে তাওরাত এবং ইঞ্জিলে নেয়া হয়েছিলো। সাথে সাথে এতে ইহুদী এবং নাসারাদেরকে এ সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাহলে তারা যেনো এ আশংকা না করে যে, তারা বর্তমানে যে পার্থিব উপকারিতা ও কল্যাণ উপভোগ করছে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। আর যদি আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে গিয়ে বর্তমান সুবিধা উপকারিতা থেকে তারা স্বীয় হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য স্বীয় রহমত ও বরকতের ভিন্ন রকমের বহু দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন।

তিন ঃ কুরআন মজীদে একথার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, রাসূল (স)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করার পর আহলে কিতাবের ওইসব লোকেরাই আল্লাহর রহমতের অংশ পাবে যারা রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনবে। যেমনিভাবে হযরত মূসা (আ) স্বীয় উম্মতের জন্য যখন রহমতের দোয়া করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা দোয়ার জবাবে বলেছিলেন, এ রহমত তাদের জন্যই খাস করা হয়েছে যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে, যাকাত দিতে থাকবে, আমাদের আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, এদের মধ্যে

যারা শেষ যমানার নবীর নবুওয়াত পর্যন্ত বেঁচে থাকার ভাগ্য লাভ করবে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।–সূরা আল আরাফে এসেছে ঃ

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ - الاعراف : ١٥٦-١٥٧

"এবং আমাদের জন্য এ দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণ লিখে দিন। আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি বললেন ঃ আমাদের আযাব তার ওপরই অবতীর্ণ করি, যাকে আমি ইচ্ছা করি। আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। অতএব এটা আমি তাদের জন্যই লিখে রাখবো যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে, যাকাত দিবে, এবং যারা আমার আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান আনবে। অর্থাৎ যারা এ রাসূল ও নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, যিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, আর বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, যিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং হারাম বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন আর বন্দীত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিলো। অতএব যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই (নিজেদের উদ্দেশ্যে) সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬-১৫৭

চার ঃ কুরআন মজীদে একথা সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, রাসূল (স)-এর নবুওয়াত দুনিয়ার সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য। তিনি সাধারণভাবে সকল সৃষ্টিকে এবং আহলে কিতাবকে খাসভাবে স্বীয় নবুওয়াতের প্রতি সুস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগে দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন বিশেষ করে আহলে কিতাবকে খাস্ করে সম্বোধনের মাধ্যমে এসব শব্দে দাওয়াত দিয়েছেন।

www.pathagar.com

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ الاعراف : ١٥٨

"বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসূল হিসেবে আগমন করেছি। যার রাজত্ব সমগ্র আসমান ও যমীনে। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন ও মৃত্যুদান করেন। সুতরাং তোমরা বিশ্বাসস্থাপন করো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত উম্মী (নিরক্ষর) নবীর প্রতি, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত বাণীর ওপর। তোমরা তাঁর আনুগত্য করো যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পারো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮

এ বিস্তারিত বর্ণনা থেকে একথা জানা গেলো যে, নাযাতের জন্য যেমনিভাবে অন্যান্যদের বেলায় রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক, ঠিক তেমনিভাবে আহলে কিতাবের জন্যও বিষয়টি অত্যাবশ্যক। বরং কুরআনের শব্দাবলী থেকে এটা জানা যায় যে, রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি অন্যান্যদের তুলনায় আহলে কিতাবের জন্য আরো বেশি জরুরী। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের সহীফাগুলোতে (ঐশী ছোট ছোট কিতাব) রাসূল (স)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এবং বহু আলামতের কথা উল্লেখ ছিলো। তাদের নবীগণের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, যখনই আখেরী যমানার নবীর আগমন ঘটবে, তখন তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং সর্বাগ্রে তাঁর সাহায্য করবে। তাই এর ওপর ভিত্তি করে কুরআন তাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলেছে যে, তোমাদের পদমর্যাদার অত্যাবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী হয়ো না।

এখানে এ মূল কথাটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ বিষয়ে কুরআন মজীদ ভাল আহলে কিতাব এবং মন্দ আহলে কিতাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। যেখানে নাজাতের সম্পর্ক রয়েছে সেখানে উভয় আহলে কিতাবের নাজাতের জন্য রাসূল (স) এবং কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান আনা জরুরী। যদি নেককার আহলে কিতাবের প্রশংসা কুরআন জায়গায় জায়গায় করে থাকে, তার অর্থ এই নয় যে, তাদের এ নেকী তাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট ছিলো বরং এর কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে সত্যকে পসন্দ করার মন-মানসিকতার কারণে তাদের আচার-আচরণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে ভাল ছিলো। এ ধরনের সমস্ত লোকই পর্যায়ক্রমে ইসলামের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলো। একথা সত্য যে, অন্যান্য আসমানী মাযহাব (পন্থা-নীতি) এবং আসমানী সহীফাগুলো সম্পর্কে কুরআনের ভূমিকা হচ্ছে এই যে, কুরআন এগুলোকে আসমানী বা ঐশী হওয়ার

www.pathagar.com

বিষয়টি সত্য বলে স্বীকার করে, কিন্তু এ সত্যায়নেরও অর্থ এ নয় যে, কুরআন এগুলোকে নিখুঁত ও সংরক্ষিত মনে করে এবং যদি এগুলোর অনুসারীরা নিষ্ঠার সাথে এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে থাকে তবে এ জিনিস তাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। বরঞ্চ কুরআন এগুলোর আসমানী হওয়ার সত্যতা স্বীকারের সাথে সাথে স্পষ্ট ভাষায় একথাও বলে দিচ্ছে যে, এ সহীফাগুলোতে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যার কারণে এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব এখন আল্লাহর দীনের নিরাপদ ও সংরক্ষিত সহীফা বা ঐশী গ্রন্থ হচ্ছে একমাত্র কুরআন। এ কুরআন ছাড়া সীরাতে মুসতাকীম বা সরল সঠিক পথ লাভের আর কোনো উপায় নেই।

রাসূল (স)-এর নবুওয়াত লাভের পর দুনিয়ার জন্য সিরাতে মুস্তাকিম (সহজ সরল পথ) পাওয়া এবং মুক্তি লাভের জন্য যদি একটি মাত্র উপায় কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটি হচ্ছে রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর আনুগত্য করা। এটা ছাড়া নাজাত লাভের আর কোনো উপায় নেই। এ মূলনীতির মধ্যে যদি ব্যতিক্রমের কোনো অবকাশ থাকে তাহলে সেটা হবে ওইসব লোকদের জন্য যাদের কাছে প্রথম থেকেই রাসূল (স)-এর দাওয়াত পৌঁছেনি। কিন্তু এ বিষয়ের মীমাংসা আমরা এবং আপনারা করতে পারবো না। বরং এর ফায়সালা একমাত্র অদৃশ্য জ্ঞানের মালিকই করতে পারবেন, যিনি সকলের ভিতর ও বাহির সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তিনিই জানেন কোন্ ব্যক্তি এর জন্য বেশি হকদার। যারা সত্যের অনুসন্ধানে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু দাওয়াত না পৌঁছার কারণে হক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আশা করা যায় এ ধরনের ওযর আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন এবং তাদেরকে তাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যেই হিসাব নিবেন বা জবাবদিহি করবেন।

৩৫. মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ হুশিয়ারী

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে মুসলমানদের জন্য বিশেষ হুশিয়ারী রয়েছে। যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই জরুরী। এ আয়াতে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا দ্বারা মুসলমানদেরকে একটি সম্প্রদায় এবং একটি জামায়াত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, মুসলমান হোক অথবা ইহুদী অথবা নাসারা কিংবা সাবেয়ীই হোক যে কেউ হোক না কেন আল্লাহর কাছে সম্প্রদায় বা দল হিসেবে সবই সমান। এদের মধ্যে আল্লাহর কাছে কারো কোনো সম্মান ও ইজ্জত, ঈমান এবং নেক আমল ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। একমাত্র ঈমান ও নেক আমলই আল্লাহর দরবারে সম্মান এবং নৈকট্যলাভের মাধ্যম হতে পারে। এ তালিকার মধ্যে মুসলমানদেরকেই শীর্ষে রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি মূল বিষয় প্রকাশ করা আর তা হচ্ছে এই যে, যদি একটি সম্প্রদায় হিসেবে আল্লাহর কাছে কেউ ইজ্জত সম্মান আশা করতে পারে তাহলে

www.pathagar.com

একমাত্র মুসলমানরাই। যাদেরকে দুনিয়ার সংস্কার সাধনের জন্য সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম জাতি হিসেবে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ঈমান ও নেক আমল থেকে পৃথক হলে আল্লাহর কাছে তাঁদেরও কোনো স্থান নেই। পরিশেষে সাবেয়ীনদের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের অবস্থা একটি অপরিচিত ফেরকা (ছোট দল) হিসেবে ছিলো। এটা ওই নিগূঢ় কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, কোনো সম্প্রদায় যতোই নাম পরিচয়হীন আর অপরিচিত থাকুক না কেন যদি তাদের কাছে ঈমান ও নেক আমলের সম্পদ থাকে তাহলে তাদেরকে আল্লাহর কাছে উঁচু থেকে উঁচু স্থান লাভ করার ক্ষেত্রে কেউ বাধা দিতে পারে না।

যেমনিভাবে ইহুদীরা আম্বিয়া কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় জাতি হিসেবে বুঝে নিয়েছিলো এবং এ ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ঈমান ও নেক আমলের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। তারা একথা বুঝতে আরম্ভ করলো যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু অন্যদের জন্য, তাদের জন্য নয় আর যদি তাদের শাস্তি হয়ও তবে তা হবে সাময়িকভাবে কিছু দিনের জন্য। এমনিভাবে মুসলমানরাও আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ এটাই বুঝতে আরম্ভ করলো যে, আমল যাই হোক না কেন, তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সর্বদাই ক্ষমার ঘোষণা রয়েছে। এ আয়াত এ ধরনের সকল সংশয়ের শিকড় কেটে দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করে দিচ্ছে যে, আল্লাহর দরবারে ঈমান ও নেক আমলের কষ্টিপাথরে যাদেরকে সর্বপ্রথম পরীক্ষা করা হবে তাদের তালিকার মধ্যে মুসলমান সবার শীর্ষে।

৩৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৬৩-৮২ আয়াত

পরবর্তী আলোচনায় বনী ইসরাঈলের ওইসব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, আল্লাহর শরীআতের ব্যাপারে প্রথম থেকেই যা ভঙ্গ করতে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়কে সুস্পষ্ট করা যে, কোন্ কারণে আল্লাহর তাআলা তাদেরকে ইমামত অর্থাৎ নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারণ করে তাদের স্থলে অন্য জাতিকে অভিষিক্ত করবেন, যারা তাদের শরীআতকে নতুন করে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করবে এবং তা প্রতিষ্ঠিত করবে। এ ধারাবাহিক আলোচনা কিছুদূর অগ্রসর হবে, যার মাঝখানে নতুন উদীয়মান জাতি অর্থাৎ মুসলমানদেরকে যথোপযুক্ত স্থানে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে এটি মূল সম্বোধন নয়। মূল সম্বোধন ইহুদীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মাধ্যমে কৃত অন্যায়ের যে তালিকা রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ তাদের সামনে তুলে ধরা।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ
اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا
نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى
لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ
قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ
لَّنَا مَا هِىَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ
ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ
قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ
وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ
فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ
وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ
يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ

قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةٗۚ وَإِنَّ مِنَ
ٱلۡحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنۡهُ ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ
ٱلۡمَآءُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا
تَعۡمَلُونَ ৭৪ أَفَتَطۡمَعُونَ أَن يُؤۡمِنُواْ لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ
كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ৭৫ وَإِذَا لَقُواْ
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم
بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ৭৬ أَوَلَا
يَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ৭৭ وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ
لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ৭৮ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ
يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ
ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ৭৯
وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَةٗۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ
عَهۡدٗا فَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ৮০
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ
هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ৮১ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ৮২

www.pathagar.com

৬৩. আর তোমরা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার ওপর তুলে ধরেছিলাম, (এই বলে যে,) তোমাদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে তা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো, এবং এতে যা কিছু আছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা আল্লাহর গযব থেকে নিরাপদে থাকতে পারো। ৬৪. এসবের পরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী না হতো, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে। ৬৫. যারা শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তো তোমাদের জানাই আছে। তাদেরকে আমি ধিক্কার দিয়ে বললাম ঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। ৬৬. এভাবে আমি এ ঘটনাকে তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বানিয়ে দিয়েছি এবং আল্লাহভীরু লোকদের জন্য উপদেশ বানিয়ে দিয়েছি।

৬৭. আরো স্মরণ করো, যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বললো ঃ তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো ? তিনি বললেন ঃ আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহরই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। ৬৮. তারা বললো ঃ তুমি তোমার রবের কাছে দোয়া করো, গরুটি কেমন হবে তার যেনো তিনি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ সেটি হবে এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধাও নয় এবং কুমারীও নয়। যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝা-মাঝি বয়সের। তোমরা তাই করো, যা করার নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। ৬৯. তারা বললো, তোমার রবের কাছে দোয়া করো, তিনি যেনো স্পষ্ট করে বলেন, গাভীর রং কেমন হবে ? তিনি বললেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, তা উজ্জ্বল সোনালী রং-এর গাভী হবে যা দর্শকদের আনন্দিত করবে। ৭০. তারা বললো, তোমার রবের কাছে দোয়া করো, তিনি যেনো স্পষ্ট করে বলে দেন, সেটা (গাভীটা) কেমন হবে ? কেননা গাভী বাছাই করতে খুব ঘাপলা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথের সন্ধান পেয়ে যাবো। ৭১. তিনি বললেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন যে, গাভীটি এমন হবে যে ভাড়ায় কাজ করে না, জমি কর্ষণ করে না, সেচের কাজেও অভ্যস্ত নয়। সম্পূর্ণরূপে এক রং বিশিষ্ট, এতে অন্য কোনো রং-এর মিশ্রণ থাকবে না। তারা বললো, এখন তুমি সুস্পষ্ট তথ্য এনেছো। অতপর তারা জবাই করলো। অথচ তারা জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৭২. আরো স্মরণ করো, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করছিলে অথচ তোমরা যা গোপন করছিলে তা প্রকাশ করতে আল্লাহ বদ্ধপরিকর ছিলেন। ৭৩. অতপর আমি বললাম, তোমরা এর একটি

www.pathagar.com

খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত করো। এভাবেই আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবিত করে থাকেন এবং তোমরা যাতে উপলব্ধি করতে পারো সেজন্য তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন। ৭৪. অতপর এত কিছুর পরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে পাথরের ন্যায় অথবা তার চেয়েও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে, যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, আবার এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয় অতপর তা থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং এমন পাথরও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। তোমরা যা করছো এ ব্যাপারে আল্লাহ বে-খবর নন।

৭৫. তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথা মেনে নিবে ? অবস্থা হলো এই যে, তাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর কালাম শুনে চলেছে। অতপর বুঝে শুনেই তা পরিবর্তন করে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে তারা অবগত আছে। ৭৬. যখন মুসলমানদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তখন তারা বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি, আর যখন তারা পরস্পরের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, তোমরা কি তাদেরকে সেসব কথা বলে দিচ্ছো, যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন? তাহলে যে তারা এ নিয়ে তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে ঝগড়া করবে। তোমরা কি তা বুঝতে পারছো না ? ৭৭. তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে ?

৭৮. তাদের মধ্যে নিরক্ষর লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবের শুধুমাত্র অতটুকুই জানে যা তারা নিজেরা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা করে। বস্তুত তারা শুধুমাত্র অনুমান আর কল্পনাই করতে পারে। ৭৯. অতএব ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব (শরীআত) রচনা করে এবং দাবী করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ অর্জন করতে পারে। অতএব তাদের জন্য ধ্বংস, তাদের হাতের লেখার জন্য, এবং তাদের জন্য ধ্বংস তাদের উপার্জনের কারণে। ৮০. তারা বলে ঃ আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তবে গণনায় মাত্র কয়েকদিন (স্পর্শ করবে) আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছো যে, আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকারের খেলাফ করবেন না ? নাকি আল্লাহর ওপর এমন কোনো অপবাদ তোমরা আরোপ করছো যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই ? ৮১. বরং যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। ৮২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

www.pathagar.com

৩৭. শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৬৩

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

মীছাক (অঙ্গীকার) দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে

موثق এবং ميثاق-এর অর্থ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা। এ শব্দের প্রাণ হচ্ছে দৃঢ়তা ও মযবুতী। এ কারণেই এটি বিশেষভাবে এমন অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি ও উপলব্ধির সাথে বেঁধে দেয়া হয়, এবং যা পালন করার দৃঢ় ইচ্ছার সাথে প্রকাশ করা ও স্বীকার করা হয়। এখানে এর দ্বারা সেই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। যা বনী ইসরাঈল-এর কাছ থেকে তাওরাতের অনুসরণ করার জন্য নেয়া হয়েছে। আল্লাহর শরীআত হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দাগণের মধ্যে একটি অঙ্গীকার। এজন্যই এটাকে ميثاق বা অঙ্গীকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরা আল আ'রাফে এ ميثاق বা অঙ্গীকারের কথা এভাবে এসেছে ঃ

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ط وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ج خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ - الاعراف : ١٦٩-١٧١

"কিতাবের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু আরোপ করবে না ? অথচ তারা সেসবই ভাল করে পাঠ করেছে যা তাতে লিখিত আছে। বস্তুত আখেরাতের গৃহ তাদের জন্যই উত্তম, যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, তোমরা কি তা বুঝ না ? যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে (তারাই হলো সৎকর্মী)। আর আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করবো না। স্মরণ করো, যখন আমি তাদের ওপরে পাহাড়কে এমনভাবে তুলে ধরলাম, মনে হচ্ছিলো যেনো এটি একটি সামিয়ানা। আর তারা ভাবছিলো যে, এটি তাদের ওপর পতিত হচ্ছে, (তখন আমি বললাম) তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধরো, এবং এতে যা কিছু আছে তা সর্বদাই স্মরণ করো, যাতে তোমরা আল্লাহর গযব থেকে নিরাপদ থাকতে পারো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৬৯-১৭১

www.pathagar.com

মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরার ভাবার্থ

কুরআন মজীদ এবং তাওরাত উভয় গ্রন্থেই এ অঙ্গীকারের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, এটি বনী ইসরাঈলের নেতাদের কাছ থেকে পাহাড় সংলগ্ন একটি ময়দানে নেয়া হয়েছে। সে সময় আল্লাহর হুকুমে এক বিরাট ভূমিকম্প পাহাড়কে একদিকে কাত করে ফেলেছিলো। যদি কোনো ব্যক্তি ভূমিকম্পের সময় কোনো উঁচু প্রাচীরের ছায়াতলে কিংবা পাহাড় সংলগ্ন মাঠে বসে থাকে তাহলে মনে হবে পাহাড় অথবা প্রাচীর সামিয়ানার মতো মাথার ওপরে ঝুলে রয়েছে এবং মাথার ওপর পতিত হতে চাচ্ছে। এ অবস্থাকে কুরআনে তূর পাহাড়কে তাদের মাথার ওপর উঠানো হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্বের প্রদর্শনী

তাদের ওপর পাহাড় তুলে ধরা বা ঝুলিয়ে দেয়া বনী ইসরাঈলকে অঙ্গীকারের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য নয় অর্থাৎ তারা যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয় তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। বিষয়টি এমন নয়। কেননা অঙ্গীকার গ্রহণ করা বা না করা একটি ঐচ্ছিক বিষয়। দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জবরদস্তি পসন্দ করেন না। এখানে যা কিছু হয়েছে তা শুধুমাত্র আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্বের একটি প্রদর্শনী ছিলো, যাতে বনী ইসরাঈল একথা স্মরণ রাখে যে, যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা অংশ নিচ্ছে তিনি কোনো দুর্বল এবং এখতেয়ার বিহীন সত্তা নন, বরং তাঁর কুদরত হচ্ছে সীমাহীন। অঙ্গীকার পালন করলে যেমনিভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে তার নেয়ামত অসীম, তেমনিভাবে অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করলে তাঁর ক্রোধেরও কোনো সীমা নেই। তিনি তূরের মতো বিরাট পাহাড়কে তাদের মাথার ওপরে ঝুলিয়ে দিতে পারেন এবং তাদেরকে তা দ্বারা নিঃশেষও করে দিতে পারেন।

আসল অঙ্গীকার (ميثاق)

خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ঃ অর্থাৎ এ তাওরাত যা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট দান, তা পূর্ণ শক্তি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ আস্থা ও যোগ্যতার সাথে এর বিধি-বিধান ও হেদায়াতকে কাজে লাগাও। এর কতিপয় হুকুম সহজ আবার কতিপয় হুকুম কঠিন। মোদ্দাকথা হচ্ছে জীবনের সুসময় এবং দুঃসময় উভয় অবস্থাতেই তা মেনে চলার দায়িত্ব রয়েছে। এজন্যই দুর্বল হাত আর দুর্বল ইচ্ছা দ্বারা এর হক আদায় করা যাবে না। বরং এর জন্য প্রয়োজন শক্তি ও দৃঢ়তা।

وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ ঃ 'অর্থাৎ যা কিছু এতে রয়েছে তা স্মরণ করো' এর অর্থ বিধি-বিধান এবং হেদায়াতও হতে পারে। বিশেষ করে সেসব সতর্কতা ও হুমকিও এর অর্থ হতে পারে, যা এ অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফলের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাওরাতে বিস্তারিতভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, যদি তারা এ অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে যমীন এবং আসমান উভয় দিক থেকেই

www.pathagar.com

তারা আল্লাহর করুণা লাভ করবে। আর যদি তারা এ অঙ্গীকারের অসম্মান করে, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কঠিন শাস্তি হবে।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ঃ এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যাতে তোমরা 'তাক্ওয়া' অবলম্বন করতে পারো। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়ার পথ নির্দেশ করা। কিন্তু আমরা কথার স্থান এবং পূর্বাপর সম্পর্কের আলোকে এর দ্বারা 'আল্লাহর ক্রোধ ও গযব থেকে বাঁচা বুঝিয়েছি। আমাদের চিন্তা সেদিকে এজন্য গিয়েছে যে, এর পূর্বে তাদেরকে বিশেষ সেসব হুশিয়ারী এবং সতর্কতার কথা স্মরণ রাখার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে, যা তাওরাতে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফলের ব্যাপারে তাদেরকে শুনানো হয়েছিলো। আর তাদেরকে এসব শুনানোর উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, তারা নিজেদের ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব থেকে নিরাপদ থাকবে।

আয়াত ঃ ৬৪

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

পরবর্তীদেরকে পূর্ববর্তীদের কার্যকলাপের জন্য দায়ীকরণ

"এসবের পরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গিয়েছো" প্রকাশ থাকে যে, এ সম্বোধন কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কার বনী-ইসরাঈলের প্রতি করা হয়েছে। আসল অবস্থা এই যে, মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কাজটি তাদের পূর্ববর্তীদের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছিলো। তারা এ রাস্তার সূচনাকারী বা আবিষ্কারক নয়, বরং তারা হচ্ছে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অন্ধ অনুকরণকারী। সম্বোধনের এ পদ্ধতি দ্বারা এ মর্মে তাৎপর্যপূর্ণ ও লালিত্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, যদি পরবর্তী ব্যক্তিরা গোমরাহী অথবা হেয়াদাতের ব্যাপারে অবিকলভাবে নিজেদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে তাদের ইতিহাস আর তাদের পূর্বসূরীদের ইতিহাস এক ও অভিন্ন হবে। পূর্বসূরীদের কাজের সম্পর্ক উত্তরসূরীদের সাথে নির্দ্বিধায় জুড়ে দেয়া হবে। আর পরবর্তী লোকদের গোমরাহীর ইতিহাস তখন থেকেই শুরু হবে, যখন থেকে তাদের পূর্বপুরুষেরা এ অন্যায়কে স্বীয় সমাজে চালু করেছে।

مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ -এর অনুবাদ আমরা করেছি "এ সবের পরও"। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আরবী ভাষা এবং কুরআন মজীদে এ পদ্ধতির ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ذٰلِكَ যখন এভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন ওপরে অতিক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাওরাত অনুসরণ করার অঙ্গীকারের পর,

www.pathagar.com

আল্লাহর বড়ত্ব ও শান এবং তার সমস্ত হুশিয়ারী সাবধানতা সম্পর্কে ভাল করে অবগত হবার পরেও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা এ অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তোমরাও এ ব্যাপারে অন্ধভাবে তাদের হুবহু পদাঙ্ক অনুসরণ করেছো।

فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের কাজকর্ম তো শুরু থেকেই এমন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অভিসম্পাত দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তার অপার করুণা ও মেহেরবানী এটাই যে, তিনি তা করেননি। বরং তিনি তোমাদেরকে আজ পর্যন্ত সময় ও অবকাশ দান করেছেন। তাঁর এ রহমত ও করুণার দাবী হচ্ছে, তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা এবং নিজেদের চরিত্র ও নীতি সংশোধন করা। কিন্তু তোমরা এর বিপরীত পথে চলছো এবং নিজেদের বদ-নীতি নিয়ে গর্ববোধ করছো এবং এ অহংকারে নিমজ্জিত থেকে (মুক্তির) শেষ সুযোগটিও নষ্ট করতে চাচ্ছো, যারপর তোমাদের চরিত্র সংশোধনের আর কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকবে না।

আয়াত ঃ ৬৫

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۝

ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি উদাহরণ

এটি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি উদাহরণ যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের জন্য সপ্তাহের শনিবারের দিনটি ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো। এ দিন তাদের জন্য কাজ করা, ভ্রমণ ও শিকার করা নিষিদ্ধ ছিলো কিন্তু তারা আল্লাহর শরীআতের আনুগত্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্য অনেক শরয়ী বাহানা এমনকি ভ্রমণ ও শিকারের উদ্ভাবন করে নিয়েছিল। অনেক রাস্তা তারা খুলে দিয়েছিলো। এ আয়াতে তাদের এ ধরনের তৎপতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যেহেতু এসব কথা তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো, তাই কুরআন সেদিকেই একটি সুপরিচিত বিষয় হিসেবে ইঙ্গিত দিয়েছে।

فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ঃ এটি লা'নত এবং অভিশাপের বাক্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এ অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন, যারা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে শনিবারের পবিত্রতাকে ধ্বংস করেছে।

ইহুদীদের চেহারা পরিবর্তনের ধরন

ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এ অভিশাপের ফলাফল স্বরূপ তাদের বাহ্যিক দিকটাও বানরের মতো হয়ে গিয়েছিলো। অথবা এ পরিবর্তনটা ছিলো শুধুমাত্র জ্ঞানগত এবং আত্মিক পরিবর্তন কিন্তু আমাদের কাছে এ মতভেদ অতিরিক্ত গুরুত্ব বহনকারী কোনো মতভেদ নয়। মানুষ এবং বানরের মধ্যে বাহ্যিক অবয়ব আর ছুরতের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা হচ্ছে জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তির।

www.pathagar.com

মানুষের আসল বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, স্বীয় প্রবৃত্তির কোনো আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সময় প্রথমেই সে দেখে যে, তার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা জায়েয আছে কি না। যদি জায়েয থাকে তাহলে শরয়ী এবং নৈতিক সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতা আছে কি না ? পক্ষান্তরে বানরের কোনো বাসনা এবং কর্মের মধ্যে নৈতিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা নেই। তার প্রবৃত্তি যে জিনিস কামনা করে, তৎক্ষণাৎ সে তা করে ফেলে। যদি কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে কোনো মানুষ কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্য এ অবস্থা বিরাজ করতে থাকে তাহলে মানুষের মধ্যে আর বানরের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকে না। এমতাবস্থায় কিছুটা বাহ্যিক পার্থক্য থেকে যায় যা শুধুমাত্র ওই সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ও নৈতিক অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছে—যদি তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাহলে সামান্য বাহ্যিক পার্থক্যও শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়।

আয়াত ঃ ৬৬

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

نَكَالٌ -এর ভাবার্থ

نَكَالٌ -এর অর্থ হচ্ছে, 'উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণের নমুনা।' এখানে সেই বসতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে বসতির অধিবাসীরা শনিবারের পবিত্রতাকে ধ্বংস করার জন্য অন্যায় ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। ওপরে বর্ণিত আয়াতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বসতি এবং জনপদসমূহের জন্য কুরআন মজীদে এভাবে একাধিক স্থানে ضمير (সর্বনাম) ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার এ অভিশাপের ফলাফলের ক্ষেত্রে এ বসতি এবং এর পূর্বাপর বসতিগুলোর জন্য উপদেশ গ্রহণের নমুনা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যা প্রত্যক্ষ করে খোদাভীরু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নসীহত গ্রহণ করতে পারে।

কুরআনের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ বসতি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিলো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ জনপদের লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সভ্যতায় খুব উন্নতি অর্জন করেছিলো। কিন্তু এ অভিশাপের ফলে তাদের ওপর এমন অধঃপতন নেমে এলো যে, তাদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সবকিছুই বিকৃত হয়ে গিয়েছে, অভিশপ্ত জনপদের লোকজন এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য এক বিরাট উপদেশের ইতিহাস হয়ে গেল।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

www.pathagar.com

ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দ্বিতীয় উদাহরণ

এটা ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দ্বিতীয় উদাহরণের বর্ণনা। এ উদাহরণটি বর্ণনা করার জন্য কুরআন এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, একটি কথাকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। একটি অংশ ওই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, বনী ইসরাঈলের মন-মানসিকতা প্রথম থেকেই আল্লাহর শরীআত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কূটিলতা এবং পলায়নপরতা বিদ্যমান ছিলো। এর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হাজারো কূটিলতা অবলম্বন এবং ঝগড়া-বিবাদের পর যখন তারা কোনো কথা গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতো না বরং নির্দেশ পালন করা থেকে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করতো।

এ জিনিসকে সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআন বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে 'কাস্‌সামার' ঘটনা নির্বাচন করেছে। কুরআন মজীদের ইঙ্গিত থেকে ঘটনার সম্পর্কে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের কোনো এক ব্যক্তি নিহিত হয়েছিলো যার হত্যাকারীদের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না। হযরত মূসা (আ) নিজ শরীআতের বিধান অনুযায়ী নিহত ব্যক্তি যেখানে নিহত হয়েছিলো সে এলাকার লোকদেরকে একটি গরু কুরবানী করে কসম খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। লোকজন তো প্রথমে এ নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে করছি—করবো বলে গড়িমসি করতে থাকলো। জিজ্ঞেস করলো, গাভী কেমন হবে, এর রং কেমন, বয়স কতো ইত্যাদি। অবশেষে জবাই করলেও একথা জানা যায় যে, তারা মিথ্যা কসম করেছিলো।

মূসা (আ)-এর শরীআতে কসমের যে নিয়ম ছিলো তা 'দ্বিতীয় বিবরণ' গ্রন্থের নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

> "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিতেছেন, তাহার মধ্যে যদি ক্ষেত্রে পতিত কোন হত লোককে পাওয়া যায়, এবং তাহাকে কে বধ করিল, তাহা জানা না যায় ; তবে তোমার প্রাচীনবর্গ ও বিচারকর্ত্তৃগণ বাহিরে গিয়া সেই শবের চারিদিকে কোন্ নগর কত দূর, তাহা মাপিবে। তাহাতে যে নগর ঐ হত লোকের নিকটস্থ হইবে, তথাকার প্রাচীনবর্গ পাল হইতে এমন একটী গোবৎসা লইবে, যাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় নাই, যে যোঁয়ালি বহন করে নাই। পরে সেই নগরের প্রাচীনবর্গ সেই গোবৎসাকে এমন কোন একটী উপত্যকায় আনিবে, যেখানে জলস্রোত নিত্য বহে, এবং চাস বা বীজবপন হয় না, ও সেই উপত্যকায় তাহার গ্রীবা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। পরে লেবির সন্তান যাজকেরা নিকটে আসিবে, কেননা তাহাদিগকেই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার পরিচর্য্যার্থে ও সদাপ্রভুর নামে আপনার আশীর্ব্বাদ করণার্থে মনোনীত করিয়াছেন ; এবং তাহাদের বাক্যানুসারে প্রত্যেক বিবাদের ও আঘাতের বিচার হইবে। পরে শবের নিকটস্থ ঐ নগরের সমস্ত প্রাচীন উপত্যকাতে ভগ্নগ্রীবা গোবৎসার উপরে আপন আপন হস্ত ধুইয়া দিবে।"-দ্বিতীয় বিবরণ ২১ ঃ ১-৭

www.pathagar.com

قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ঃ বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর এ হুকুমকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ মনে করলো। তাদের একথা বুঝে আসেনি যে, হত্যাকারীকে বের করার জন্য এ কৌশলটাও একটা বিরাট কার্যকর কৌশল হতে পারে যেখানে হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করার সকল পথ বন্ধ সেখানে যদি সর্বশেষ কোনো কৌশল থেকেই থাকে তাহলে এটাই হবে যে, হত্যার স্থানের আশেপাশে বসবাসকারী নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে সমবেত করে তাদের কাছ থেকে কসম নেয়া যেতে পারে। কসমকে অধিকতর সম্মান ও পবিত্রতার মর্যাদা দেয়ার জন্য কুরবানীকৃত পশুর ওপর নেয়া যেতে পারে। চুক্তি এবং কসমের বিষয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ রেওয়াজ (রীতিনীতি) চালু ছিলো যে, সাধারণত চুক্তি বা অঙ্গীকার উপসনালয়ের সামনে সম্পন্ন করা হতো যাতে উভয়পক্ষ মিথ্যা এবং মুনাফিকী থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কোনো কোনো অবস্থায় এ পন্থাও অবলম্বন করা হতো যে, কুরবানীকৃত পশুর রক্ত কসমকারীদের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে কসম নেয়া হতো। সম্ভবত বনী ইসরাঈলের কাছেও কসমের অবস্থায় এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো যদিও উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে এর কোনো ইঙ্গিত মিলে না। মাওলানা ফারাহী (র) স্বীয় গ্রন্থ امعان فى اقسام القران -এর মধ্যে এ ধরনের কতিপয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ঃ جهل শব্দটি علم -এর বিপরীতেও এসে থাকে আবার حلم-এর বিপরীতেও এসে থাকে। এখানে এ শব্দটি حلم (বুদ্ধিমত্তা)-এর বিপরীতে এসেছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে হাসি-তামাশা করা থেকে আশ্রয় চাই। আমি যা কিছু বলছি, তার সবই আল্লাহর বিধান। আর তোমাদের জন্য এতেই রয়েছে কল্যাণ ও বরকত। একথা আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে বলছি না।

আয়াত ঃ ৬৮

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ط قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ط عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُوْنَ ○

ইহুদীদের বিকৃত স্বভাব

গাভী কুরবানীর নির্দেশের পর বনী ইসরাঈলের এ প্রশ্ন তাদের বিকৃত স্বভাব থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো, বাস্তবে এ প্রশ্নের উদয় হওয়ার কথা ছিলো না। তাদের স্বভাব যদি সুশৃংখল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, তাহলে তারা মধ্যম মানের কোনো গাভী যবেহ করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারতো। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের সেই মানসিকতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন যা এ প্রশ্নের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিলো, সেহেতু এ প্রশ্নের সেই জবাবই তিনি দিলেন যা তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। অর্থাৎ গাভীটি বয়সের দিক থেকে মধ্যম মানের হবে। তবে সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, যে

www.pathagar.com

নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তা বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করো। এ ধরনের প্রশ্ন করে শরীআত থেকে পালিয়ে যাবার পথও খোঁজ করবে না আর দীনের বিশালতাকে সংকীর্ণ করবে না।

আয়াত ঃ ৬৯

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ لا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○

গাভীর যত রং রয়েছে তার মধ্যে সোনালী ও পীত বর্ণ সবচেয়ে পসন্দনীয় রং। আরব কবিগণ এ ধরনের রং পসন্দের কারণে প্রেমিকার জন্য এ গুণ কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করে থাকে। فاقع শব্দটি এ রং-এরই গাঢ় অবস্থা এবং চিত্তাকর্ষক বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

ওপরের প্রশ্ন যদিও অপ্রয়োজনীয় ছিলো, কিন্তু বয়সের একটি সীমা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর গাভী সম্পর্কে প্রথম থেকেই আর কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ ছিলো না। কিন্তু এরপরও তারা রং-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করে বসলো যার জবাবে আল্লাহ তাআলা এমন রং-এর গাভী নির্দিষ্ট করে দিলেন যে রং-এর গাভী সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং পসন্দনীয় বলে মনে করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নের জবাবে সবচেয়ে পসন্দনীয় রং-এরই নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন এমন ধরনের ছিলো যার মাধ্যমে বনী ইসরাঈল নিজেদেরকে খোদায়ী বিধানের ব্যাপকতা ও ছাড় গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বাড়াবাড়ি এবং জটিলতার একটা সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছিল।

আয়াত ঃ ৭০-৭১

قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ لا اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ط وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ج مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ط قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

রং-এর সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও প্রশ্নকারীদের মনে প্রশান্তি আসেনি। তারা আরো স্পষ্ট বর্ণনা চায়, তখন নির্দেশনা আসলো যে, গাভী যেনো এমন হয়, যার দ্বারা কোনো কাজ করানো হয়নি। যার দ্বারা কোনো ক্ষেতে হাল-চাষ করানো হয়নি এবং পানি বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়নি। তদুপরি আরো নির্দেশনা এই ছিলো যে, গাভীটি যেনো সম্পূর্ণরূপে এক রং বিশিষ্ট হয় এবং অন্য কোনো রং-এর মিশ্রণ যেনো তাতে না থাকে, এমনিভাবে গাভীর গুণাগুণের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আর শর্তাবলী আরোপ করার পর তারা বললো ঃ হ্যাঁ, এখন ভালভাবেই কথা স্পষ্ট হয়েছে।

www.pathagar.com

حق শব্দের ব্যাখ্যা

حق (হক) শব্দটি কুরআন মজীদে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যে জিনিস ঘটা অবশ্যম্ভাবী, নিশ্চিত ও অবধারিত তাকে حق বলা হয়। এ অর্থানুযায়ী কেয়ামতকে হক বলা হয়েছে।

যে জিনিস চারিত্রিক ও নৈতিক দিক থেকে অপরিহার্য তাকে হক বলা হয়েছে। এ অর্থানুসারে ন্যায়নীতিকে হক বলা হয়েছে।

যে জিনিস বিবাদ এবং মতানৈক্যের মাঝখানে মীমাংসা সূচক কথার মর্যাদা রাখে তাকেও কুরআন মজীদে হক বলার একটা দিক রয়েছে।

লক্ষ এবং উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্যও কুরআন মজীদে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের বিবেচনায়ই আসমান এবং যমীনের সৃষ্টিকে হক বলা হয়েছে।

যে জিনিস স্বীয় প্রকাশের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টতার দাবীদার তাকেও হক বলা হয়।

নিচের আলোচনায় উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে হক শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শেষ প্রশ্নের সাথে তাদের জবান থেকে وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ (ইনশা আল্লাহ আমরা এখন সঠিক দিশা পাবো) এ শব্দগুলো বের হয়েছিলো। এ শব্দগুলো তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিফলক। এতে জানা যায় যে, একটার পর একটা প্রশ্ন করার পরে তাদের নিজেদের মধ্যেই প্রশ্নাবলীর অসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। তাদের এ অনুভূতির বরকতেই সম্ভবত তাদের জবান থেকে একথাগুলো বের হয়েছিলো এবং একথার বরকতেই তাদের ভাগ্যে এ হুকুম বাস্তবায়ন করার তাওফীক হয়েছিলো, অন্যথায় তাদের পক্ষ থেকে যে মানসিকতার বহিপ্রকাশ ঘটেছিলো তা দ্বারা এমন আশা করা যাচ্ছিলো না যে, কখনো তারা এ হুকুম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

আয়াত ঃ ৭২

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

دَرْءٌ এ অর্থ হচ্ছে দূর করা এবং নিক্ষেপ করা। এ থেকেই تَدَارَأْتُمْ -এর উৎপত্তি যা ادغم -এর নিয়মানুযায়ী ادّٰرَءْتُمْ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একে অপরকে অপবাদ দেয়া এবং দোষী বানানো।

একটি অতিরিক্ত বাক্য

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ঃ (আল্লাহ তাআলা সেসবের প্রকাশকারী যা তোমরা গোপন করো)। এখানে এটি একটি অতিরিক্ত বাক্য হিসেবে এসেছে। এর

www.pathagar.com

পরবর্তী অংশ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا (অতপর আমি বললাম, এর একটি অংশ দ্বারা একে আঘাত করো) فَادٰرَءْتُمْ فِيْهَا -এর সাথেই রয়েছে। এখানে অতিরিক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, কাউকে হত্যা করে তোমরা দুনিয়াতে একে অপরকে অপবাদ দাও এবং দোষী বানিয়ে অপরাধকে গোপন রাখতে চেষ্টা করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, দুনিয়াতে কোনো জিনিস তোমরা গোপন করলেও তা সবসময়ের জন্য গোপন থাকবে না বরং আল্লাহ তাআলা তোমরা যা গোপন করছো তার সবই একদিন প্রকাশ করবেন।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ দ্বারা গাভী জবাই করার জন্য যে হুকুম করা হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে। ওপরে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল যে আজ আল্লাহর শরীআতের একক ইজারাদার হয়ে বসে আছে, তাদের মন-মানসিকতা এ শরীআত গ্রহণ করার ব্যাপারে কি ছিলো ? কিভাবে তারা পদে পদে এটা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে ঝগড়া করে যাচ্ছে। এখন وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا দ্বারা আসন্ন অংশের মধ্যে এটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, গাভী জবাই করার এ হুকুম কি উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিলো আর এ বিষয়ে তারা কি ভূমিকা পালন করেছিলো।

আয়াত ঃ ৭৩

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"একে এর অংশ দিয়ে আঘাত করো" সাধারণভাবে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ এর দ্বারা এ অর্থ বুঝিয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তিকে গাভীর এক টুকরা গোশত দ্বারা স্পর্শ করো, এর ফলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাবে এবং স্বীয় হত্যাকারীর নাম বলে দিবে — যদিও এ রকম অর্থ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ তাআলার মহান কুদরত ও অসীম ক্ষমতার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় কিন্তু কাসামার সম্পর্ক থেকে কখনো কখনো আমার এ চিন্তা হয় যে, সম্ভবত এটি কসম বা অঙ্গীকার গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা গাভীর রক্ত ঢেলে দাও আর আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে শপথ আদায় করো। ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনার পরিবর্তে শুধমাত্র ইঙ্গিত এজন্যই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে যে, এখানে তো ঘটনার বর্ণনা দেয়া উদ্দেশ্য নয় বরং বনী ইসরাঈলকে শুধুমাত্র তাদের ইতিহাসের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য।

এ অর্থ গ্রহণ করা অবস্থায় كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى এ অংশ বনী ইসরাঈলের সে কথার জবাব হিসেবে গণ্য হবে যা তারা গাভী জবাই করার নির্দেশ শ্রবণ করার পর বলেছিলো যে, اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا (তুমি কি আমাদের সাথে হাসি-তামাশা করছো) অর্থাৎ তোমাদের কাছে এ হুকুম বা আদেশ এক প্রকার বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তোমরা যদি এর ওপর সহীহ অন্তর নিয়ে আমল করো এবং কুরবানী ও কসমের ক্ষেত্রে ঈমানদারীর পরিচয় দাও তাহলে এটাই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে হত্যাকারীদেরকে

www.pathagar.com

খুঁজে বের করা যাবে এবং কেসাস গ্রহণ করা যাবে, যার মধ্যে নিহিত আছে সবার জন্য জীবন।

কেসাসের মধ্যে সকলের জীবন নিহিত আছে

'কেসাসের মধ্যে নিহিত আছে সকলের জীবন' একথার উল্লেখ কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِي الْاَلْبَابِ - البقرة : ١٧٩ "-হে প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোক সকল! তোমাদের জন্য কেসাসের মধ্যে জীবন নিহিত রয়েছে। তাওরাতের মধ্যেও একজনের হত্যা এবং একজনের কেসাসকে সকলের জীবন বলে গণ্য করা হয়েছে। কুরআন মজীদে এ হুকুমের বরাত এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢبِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاط - المائدة : ٣٢

"আমি বনী ইসরাঈলের ওপর ফরয করে দিয়েছি যে, অন্যের জীবনকে হত্যা করা ছাড়া অথবা রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া যে ব্যক্তি কোনো জীবনকে হত্যা করলো সে যেনো সকলকেই হত্যা করলো আর যে ব্যক্তি তাকে বাঁচালো সে যেনো সকলকেই জীবন দান করলো।"-সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২

এ আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বনী ইসরাঈলের ওপর কেসাসের আইনের এ দর্শন সুস্পষ্ট ছিলো যে, কেসাস গ্রহণ না করার মধ্যে সকলের মৃত্যু আর কেসাস গ্রহণের মধ্যে সকলের জীবন নিহিত রয়েছে।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ-এর সম্পর্ক এতমাবস্থায় অতিরিক্ত বাক্যের সাথে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা যা কিছুই গোপন করে রাখছো তার মধ্যে কোনো জিনিসই লুক্কায়িত ও গোপন থাকবে না, বরং প্রতিটি জিনিসই প্রকাশিত হয়ে যাবে। এটা ওই কথার দিকে ইঙ্গিত করে যা ইহুদীরা গোপন করার চেষ্টা করেছিলো এবং যা গোপন করার জন্য দীনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন সাধন করেছিলো। কিন্তু সেগুলো কুরআনে কারীম এবং রাসূল (স)-এর মাধ্যমে একটি করে প্রকাশিত হচ্ছিলো। এটা মূলত সে কথারই স্পষ্ট আলামত ছিলো যে, আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কথা লুকানোর চেষ্টা করা ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি একদিন সমস্ত গোপন জিনিসের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করে দেবেনই।

আয়াত ঃ ৭৪

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

অন্তর কখন কঠিন হয়

"অতপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে।" এখানে ثُمَّ -এর ব্যবহারের ফলে একথা বের হয়ে আসে যে, দীনের ব্যাপারে তোমাদের ঝগড়াটে স্বভাব আর পলায়নপরতার ফলাফল হলো এই যে, তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে। যদিও এখানে স্পষ্ট করে এটা বলা হয়নি তবু কথার পূর্বেকার সম্পর্ক থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বনী ইসরাঈল গাভী যবেহের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে বহু তর্কের জন্ম দিয়েছিলো, একইভাবে তারা গাভী যবেহ করার পর এ কুরবানীর সঠিক মর্যাদা দিতে পারেনি বরং তারা মিথ্যা কসম খেয়ে হত্যাকারীকে গোপন করার চেষ্টা করেছে। অপরাধের সাথে যখন কূটিলতা, মিথ্যা বিতর্ক তদুপরি বেয়াদবী আর মিথ্যা বাহাদুরী ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা যোগ হয় তখন এ ধরনের অপরাধীদের মন আল্লাহর বিধান মোতাবেক পাথরের মত কঠিন হয়ে যায়। এরপরে তাদের অন্তরে নেকী ও তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি জন্ম লাভ করার যোগ্যতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

নষ্ট অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে থাকে

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً "অতপর তা পাথরের মতো অথবা পাথরের চেয়েও বেশী কঠিন হয়ে যায়।"একথার ঢং ঠিক এমন যেমনটি অন্য স্থানে বলা হয়েছে أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ - الاعراف : ١٧٩ "এসব লোক চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং ওদের চেয়েও অধিক গোমরাহ।"-সূরা সূরা আরাফ ঃ ১৭৯)। এটা শুধু আতিশয্য বুঝানোর বিশেষ বাকরীতি নয় বরং এটাই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা। প্রাণহীন জড় পদার্থ ইত্যাদির মধ্যে যে কাঠিন্য থাকে, সে কাঠিন্য ওদেরকে সেই যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করে না যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অভ্যন্তরে আমানত রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি নিজেকে নষ্ট করে ফেলে বা নিজেকে বিগড়ে ফেলে, তাহলে তার এ বিগড়ানো অবস্থা ধীরে ধীরে তাকে আল্লাহ তাআলার অপরিহার্য বিধান মোতাবেক ওইসব যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করবে যা স্বভাব প্রকৃতির পক্ষ থেকে তার মধ্যে আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে। পাথর কঠিন থেকে কঠিনতর হওয়ার পরও সে পাথরই থাকে তার মধ্যেও যদি আল্লাহ তাআলার কুদরতের ঝরণা প্রবাহিত হওয়ার যোগ্যতা নিহিত থাকে। তাহলে তা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে যোগ্যতা তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে কোনো নৈতিক ও চারিত্রিক ব্যাধির কারণে যদি মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায় তাহলে তার অন্তরের সকল ঝরণা শুষ্ক হয়ে যায়। এ কারণেই মানুষের এ বিগড়ে যাওয়ার মুকাবিলা দুনিয়ার কোনো বস্তুই করতে পারে না, সে যতই বিগড়ে যাক না কেনো।

এখানে বলা হয়েছে যে, কিছু পাথর এমনও হয়ে থাকে যা ফেটে ঝরণা প্রবাহিত হয়। কোনো কোনো পাথর এমনও হয়ে থাকে যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হয়। আবার কিছু পাথর এমনও রয়েছে যা আল্লাহর ভয়ে ছিটকে পড়ে। এসব পাথরের

www.pathagar.com

ওই স্বভাব ও প্রকৃতির যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা আল্লাহর কুদরত কর্তৃক এর মধ্যে আমানত হিসেবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাবস্থায় এ আমানত অবশিষ্ট থাকে।

এখানে একথা স্মৃতি-পটে রাখা প্রয়োজন যে; এটা শুধুমাত্র কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গি নয় যার কোনো সম্পর্ক ঘটমান পৃথিবীর সাথে নেই। বরং এটি ওইসব চাক্ষুস ঘটনার দিকে ইঙ্গিত বহন করে যা খোদ বনী ইসরাঈলের যাযাবরী জীবনে তাদের চোখের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা স্বচক্ষে এক বিশাল পাথর থেকে একত্রে বারটি ঝরণা ফেটে প্রবাহিত হতে দেখেছে এবং তূর পাহাড়ের একটি অংশ আল্লাহর নূরের ঝলকে টুকরো টুকরো হতে দেখেছে। কিন্তু এসব প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের নিজেদের অন্তরের কাঠিন্য থেকেই গিয়েছে, যার ফলে তারা কোনো আলামত দেখেও নম্র হয়নি। এরপর একথার মধ্যে সন্দেহের কি অবকাশ আছে যে, তাদের অন্তরের কাঠিন্য পাথর এবং পাথর বিশিষ্ট শক্ত যমীনের চেয়েও অধিক ছিলো।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ঃ "তোমরা যা করছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অনবহিত নন" অর্থাৎ নিজেদের মর্যাদা ও সম্মান, পবিত্রতা, অহংঙ্কার, বুযুর্গী ও নিষ্কলুষতার গালগল্প তো সেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলবে, যার ক্রিয়া-কলাপ ঢাকা এবং গোপন থাকে এবং কেবলমাত্র তার সামনেই বড় গলায় বলবে যে কোনো খবর রাখে না এবং অজ্ঞ। যিনি প্রতিটি কথা সম্পর্কে খবর রাখেন তাঁর সামনে এসব দাবী আর অহংকার করে কী লাভ?

আয়াত ঃ ৭৫

أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

একটি বিষয়ের প্রতি আনুসংগিক দৃষ্টি আকর্ষণ

ইহুদীদেরকে সম্বোধন করার মাঝখানে আনুসংগিকভাবে মুসলমানদের প্রতি এমন একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যে বিষয়ে ৬-৭ আয়াতে রাসূল (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর ২১-২৯ আয়াতে বনী ইসরাঈলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ দৃষ্টি আকর্ষণের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে ঃ

এক ঃ মুসলমানদেরকে এ মর্মে প্রবোধ দেয়া যে, তারা যেন বনী ইসরাঈলের বিরোধিতার কারণে মন খারাপ না করে এবং একথায় অবাকও হবে না যে, এত লেখাপড়া জানা এবং দীন ও শরীআতের আলেম লোকেরা এ দাওয়াতের বিরোধিতা করে চলছে (কারণ এটাই ইহুদীদের স্বভাব)। যাদের মস্তিষ্ক এতোটাই বক্র যে, একটি কথা নিজেদের নবীর জবান থেকে শ্রবণ করার পর এবং এর দাবী বা মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝার পরও এর মধ্যে বক্রতার সৃষ্টি করতে থাকে আর এর উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত

www.pathagar.com

অর্থে পেঁচাতে থাকে। যেমন গাভী কুরবানী করার নির্দেশের ব্যাপারে তোমরা তাদের আচরণ সম্পর্কে জানতে পেরেছো। এ রকম বক্র মানসিকতা সম্পন্ন লোকজন কিংবা তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের কাছ থেকে তোমরা কি এমন আশা করতে পারো যে, তোমাদের সোজা সরল কথাকে সোজা সরল পন্থায় অনুধাবন করার চেষ্টা করবে ?

দুই ঃ মুসলমানদেরকে এসব ইহুদীদের গোপন গতি-বিধি সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে যেসব সহজ সরল মুসলমানরা তাদের প্রতারণামূলক ঈমানী দাবীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলো, অথবা যারা তাদের সাথে মেলামেশা ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আকাঙ্ক্ষিত ছিলো তারা যেনো সাবধান হয়ে যায় এবং একথা বুঝতে পারে যে, এসবই ধোঁকাবাজী। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই।

تحريف-এর অর্থ এবং এর ধরন

حَرَّفَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ ؛ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ -এর অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসকে তার সঠিক দিক থেকে ঘুরিয়ে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এ থেকেই حرف القول অথবা حرف الكلام এর উৎপত্তি যার অর্থ কথা কিংবা বাক্যকে বিকৃত করে দেয়া। এ বিকৃতি বা পরিবর্তনের কয়েকটি ধরন হতে পারে, যেমন ঃ কোনো কথার অর্থকে জেনে-বুঝে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যা বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়।

কোনো শব্দের বর্ণনাভঙ্গি ও পঠন পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন সাধন করা, যেমন مروه (মারওয়া মক্কার একটি পাহাড়ের নাম)-কে موره (মাওরায়া) অথবা مريا [মিরয়া] বানিয়ে দেয়া।

কোনো বাক্য কিংবা কথার মধ্যে এমন বেশকম করে দেয়া যার ফলে তার আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট ও অর্থহীন হয়ে যায়। যেমন ঃ ইহুদীরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের ঘটনাকে এমনভাবে রদবদল করেছে যে, যাতে কা'বাঘরের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কই প্রমাণিত না হয়।

অর্থবহ কোনো শব্দের এমন তরজমা করা যা পূর্বাপর বিষয়ের সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন ইবরানী ভাষার ابن -এর তরজমা ছেলে করা হয়েছে অথচ এর অর্থ বান্দা ও দাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কোনো কথার অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ও বোধগম্য। কিন্তু এ ব্যাপারে এমনসব প্রশ্ন করা যাতে এর স্পষ্ট অর্থকে অস্পষ্ট বানিয়ে ফেলে অথবা আসল কথাকে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়।

আহলে কিতাব (আসমানী কিতাবধারীরা) বিকৃতি ও পরিবর্তনের যত শ্রেণী রয়েছে সবগুলোই সম্পন্ন করে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। কুরআন কারীম তাদেরকে এসব অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করেছে। এ কিতাবের পরবর্তী আলোচনায় স্থান ও সুযোগ

www.pathagar.com

মোতাবেক প্রতিটির বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজনীয় প্রমাণাদীসহ পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন অবস্থার আলোকে শুধু এতটুকুই স্মরণ রাখতে হবে যে, বিকৃতি বা তাহরীফকে কেবল তখনই তাহরীফ বলা হবে যখন تحريف (পরিবর্তন ও বিকৃতি) স্বজ্ঞানে জেনে-বুঝে সম্পন্ন করা হবে। কুরআন মজীদ এর সাথে একটি শর্ত লাগিয়েছে। مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ তারা যে বিকৃতি ঘটাচ্ছে তা জানা ও বুঝার পরেই তারা تحريف (পরিবর্তন ও বিকৃতি) করতো। এটিই হচ্ছে সেই জ্ঞান ও অনুভূতি যা প্রকৃতপক্ষে تحـــريف কে এক জঘন্য অপরাধে পরিণত করেছে আর এর শাস্তি হিসেবে এ অন্যায়কারীদেরকে আল্লাহ তাঁর মহান দান জ্ঞানের আলো থেকে একদম বঞ্চিত করে রাখেন।

আয়াত ঃ ৭৬

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

ইহুদীদের ঈমানের দাবীর প্রকৃত স্বরূপ

"যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে আমরা তো ঈমান এনেছি।" অর্থাৎ দীন আর ঈমানের ইজারাদারী মুসলমানদের একার নয়, আমাদেরও ঈমান আছে। একথার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যা ৮-৯ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলাম ঠিক তাই। ঈমানের কথা বলে মুসলমানদেরকে শুধু ধোঁকাই দেয়া হচ্ছিলো। তারা এর বাহ্যিক শব্দাবলীর দ্বারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছিলো যাতে মুসলমানরা তাদেরকে বিশ্বাস করে তাদের ওপর নির্ভর করতে থাকে। তারা নিজেদের মস্তিষ্কে এর উদ্দেশ্য এটাই নিচ্ছিলো যে, তাদের নিজেদের নবী ও সহীফাগুলোর (ছোট আসমানী কিতাব) প্রতি তো ঈমান আছেই। আর কোন্ জিনিসকে ঈমান বলে ? কুরআন এখানে মুসলমানদেরকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছে যে, তারা যেনো তাদের এ ধরনের প্রতারণামূলক কথার ফাঁদে আটকা পড়ে তাদের কাছ থেকে ভাল কোনো আশা পোষণ না করে। কেননা তাদের প্রকাশ্য ও গোপন কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সামনে তারা اٰمَنَّا (আমরা ঈমান এনেছি।) বলে দাবী করে; কিন্তু যখন তারা নিজস্ব মজলিসে বসে তখন সেখানে তারা এসে অন্যের কঠিন সমালোচনা করে এবং হিসাব নেয়। যদি নিজেদের উদারতা প্রকাশ করার আবেগে তোমাদের সামনে তাদের কারো জবান থেকে ভুলক্রমে এমন কথা বেরিয়ে যায় যা ইসলামের পক্ষে যায়, তাহলে নিজেদের মজলিসে তাকে খুব শক্ত করে পাকড়াও করে। তারা বলে যে, তোমরা কি মুসলমানদের সামনে শেষ যমানার নবী (স) এবং ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এমন কথা তোমরা প্রকাশ করে দিচ্ছো যা আল্লাহ তাআলা আসমানী

www.pathagar.com

সহীফার মাধ্যমে শুধু তোমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। তোমরা, কেনো একথা অনুধাবন করছো না যে, তোমাদের এসব বর্ণনাগুলোকে মুসলমানরা কেয়ামতের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী আর প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করবে।[১]

আয়াত ঃ ৭৭

أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

এটি তো একটি সাধারণ বাক্য। আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই জানেন। কিন্তু এখানে কথার অবস্থান এ মর্মে অতীব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এসব লোক মুসলমানদের সাথে ধোঁকাবাজী করছে, অথচ এ চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তাআলা তাদের اٰمَنَّا (আমরা ঈমান এনেছি) কথার রহস্য সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবগত আছেন। যা তারা প্রকাশ করে এবং তাদের বিশেষ মজলিসগুলোতে তারা নিজেরা একে অপরকে মুসলমানদের সামনে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়ার জন্য যে তীব্র সমালোচনা করা হয় তাও তিনি ভালভাবেই জানেন। এ নির্বোধ লোকেরা মুসলমানদের সামনে নিজেদেরকে বানোয়াট পোশাকে লুকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু সেই মহান আল্লাহর কাছ থেকে লুকানোর কি পন্থা চিন্তা করছে, যিনি তাদের ভিতরে ও বাহিরে তথা সমস্ত জায়গায় উপস্থিত রয়েছেন এবং প্রকাশ্য ও গোপনের সকল জিনিস যার কাছে সমুজ্জল হয়ে আছে ?

আয়াত ঃ ৭৮

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

اُمِّيٌّ বা নিরক্ষর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে

اُمِّيُّوْنَ হচ্ছে اُمِّيٌّ -এর বহুবচন। যার অর্থ যে ব্যক্তির লেখা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। এর দ্বারা এখানে ইহুদীদের নিরক্ষর লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার ফলে একথাই বের হয়ে আসে যে, উপরোল্লিখিত আয়াতের মধ্যে فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ শব্দ দ্বারা ইহুদীদের মধ্যে লেখাপড়া জানা সাবধানী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের যে তৎপরতার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাও সাবধানী এবং লেখাপড়া জানা লোকদেরই হতে পারে। আল্লাহর কালামের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করা এবং মুসলমানদেরকে চমকে দেয়ার প্রচেষ্টা স্পষ্টতই পশুর মতো মূর্খ সাধারণ লোকের কাজ হতে পারে না। তাদের কথা উল্লেখ করা আর মুসলমানদেরকে তাদের পক্ষ থেকে নিরাশ করার পর এখন ইহুদীদের সাধারণ লোকদের কথা উল্লেখ

১. এ স্থানে এ সূরারই ৮-১৪ আয়াতের তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআন থেকে পড়ে নেয়া উচিত। সামান্য ব্যতিক্রমসহ উভয় স্থানেরই বিষয় একই রকম বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

করা হয়েছে এবং একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকেও হক কবুল করার আশা করা মুসলমানদের জন্য ঠিক হবে না। কেননা প্রথম সম্প্রদায়টি যেভাবে দুষ্টামী আর কুটিলতার মধ্যে নিমজ্জিত, তেমনিভাবে দ্বিতীয় দলটিও মিথ্যা বাসনা আর কল্পনার মধ্যে নিমজ্জিত।

সাধারণ ইহুদীদের ব্যাধি

তাদের রোগের কথা এভাবে বলা হয়েছে لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ (এরা তাওরাত কিতাবকে শুধুমাত্র নিজেদের কামনা-বাসনার সমষ্টি মনে করে) اَمَانِيَّ হচ্ছে امنيه এর বহুবচন। যার অর্থ কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা। এসব লোক তাদের কিতাবের আসল বিষয়, অর্থাৎ এতে তাদেরকে কি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আর কি শিক্ষা দেয়া হয়নি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। তাদের মাথায় কিছু আকাঙ্ক্ষা, কামনা আর বাসনা আছে, যদিও তা ভিত্তিহীন অবাস্তব, কিন্তু তাদের আলেমদের ভুল শিক্ষার কারণে তাদের আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই থেকে যায়। তারা তাদের কিতাবকে নিজেদের অসংখ্য কামনার সমষ্টি মনে করে। তাদের ধারণায় তাদের কিতাব তাদের ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করে না, বরং তাদের বাসনাগুলোর সনদ সত্যায়িত করার জন্যই নাযিল হয়েছে। কুরআন মজীদ তাদের কিছু কামনা-বাসনার উল্লেখ করেছে। যেমন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط ـ البقرة : ٨٠

"তারা বলে যে, আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না, তবে গণাগণতি কয়েক দিন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮০

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط ـ البقرة : ١١١

"তারা আরো বলে যে, ইহুদী অথবা নাসারা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা তাদের বাসনা মাত্র।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১১

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ البقرة : ٩٤

"আপনি বলে দিন, যদি আখেরাতের সফলতা আল্লাহর কাছে অন্য লোকদেরকে বাদ দিয়ে শুধু তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৯৪

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ط ـ المائدة : ١٨

"ইহুদী ও নাসারারা বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।"

এগুলো হচ্ছে তাদের অসংখ্য কামনা ও বাসনার মাত্র কয়েকটি, যা উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যেসব লোক এ ধরনের কল্পনায় নিমজ্জিত

www.pathagar.com

এবং এমনসব সুখ-স্বপ্ন দেখে, যাদের ওপর (কতিপয় রসম-রেওয়াজ আদায় করা ছাড়া) কোনো দায়িত্বের বোঝা পর্যন্ত নেই, যাদের সমস্ত অধিকার আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত, তারা ওই কুরআনের ওপর ঈমান আণয়নকারী কিভাবে হবে যে কুরআন তাদেরকে এসব সুখ-স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে জীবনের বাস্তবতা এবং এর দায়িত্ব ও কর্তব্যের সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছিলো ?

وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ ঃ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র তাদের নিজেদের এবং তাদেরই আলেমদের মস্তিষ্ক প্রসূত, মূল বিষয়ের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

আয়াত ঃ ৭৯

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

মনগড়া ফতোয়া

এ সূরার শুরুতে কিতাব (كتاب) শব্দের ব্যাখা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, এ শব্দটি কুরআন মজীদে অন্যান্য অর্থসহ শরীআতের বিভিন্ন বিধি-বিধানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে এর দ্বারা ওইসব ফতোয়া বুঝানো হয়েছে যা ইহুদী আলেমরা শরীআতের কোনো প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজেদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষা এবং সাধারণ লোকদেরকে খুশী করার জন্য জারি করছিলো আর দাবী করছিলো যে, এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম।

"নিজেদের হাতে লেখা" দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, এসব ফতোয়ার পক্ষে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে কোনো ভিত্তি এবং প্রমাণ ছিলো না, এসব ছিলো তাদের স্বভাব প্রসূত এবং মনগড়া ফতোয়া। কিন্তু এগুলোর সম্পর্ক তারা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর শরীআতের সাথে জুড়ে দিতো। এ রকমই একটি ফতোয়া ছিলো যার দ্বারা তাদের সাধারণ লোকজন শরীআতের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এমনসব কল্পনায় নিমজ্জিত ছিলো যার প্রতি উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ পন্থায়ই তাদের দীনের মধ্যে এমনসব জিনিসের মিশ্রণ ঘটেছে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক দীনের সাথে ছিলো না।

لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ঃ (যাতে এর বিনিময়ে তারা স্বল্পমূল্যের জিনিস অর্জন করতে পারে) স্বল্পমূল্যের জিনিস বলা হয়েছে এজন্য যে, দীনের এ বেচাকেনা তারা শুধু পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্যই করতো। দুনিয়ার বৃহৎ থেকে বৃহত্তম লাভও যদি দীন বিক্রি করে অর্জিত হয়, তাহলেও সর্বাবস্থায় তা হবে স্বল্পদামী ও তুচ্ছ জিনিস।

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ঃ (তাদের জন্য ধ্বংস ওই জিনিসের কারণে যা তারা স্বহস্তে লিখেছে এবং ওই জিনিসের কারণেও তাদের জন্য

www.pathagar.com

ধ্বংস এর বিনিময়ে যা তারা অর্জন করছে) অর্থাৎ উভয় জিনিসই তাদের জন্য আখেরাতে ক্ষতি এবং ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের নিজেদের মন থেকে শরীআত প্রণয়নের এ কাজটিও ধ্বংসের কারণ আর আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে তাদের পার্থিব স্বার্থ অর্জনের বিষয়টিও তাদের ধ্বংসের জন্য অপরিহার্য কারণ।

আয়াত ঃ ৮০

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ○

মিথ্যা ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার একটি উদাহরণ

তারা আরো বলে যে, গণাগণতি কয়েক দিনের বেশি জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। এখানে এমন একটি মিথ্যা ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার উল্লেখ ওপরে অতিক্রান্ত হয়েছে। ইহুদীরা কোনো অবস্থাতেই নিজেদের ক্ষেত্রে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তির পক্ষে কথা বলে না। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম যে আমল বা কর্মের ফলাফল তা বুঝার পরিবর্তে এটা বুঝাতো যে, তারা আল্লাহ তাআলার প্রিয় এবং করুণা ধন্য জাতি। এজন্য তাদের কর্ম যাই হোক না কেনো, প্রথমতঃ তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানোই হবে না। আর যদিই বা পাঠানো হয়, তাহলে মামুলীভাবে অল্প কিছু দিন শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদের এ অলিক কল্পনা তাদের সাধারণ ও বিশেষ লোকদেরকে শরীআতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ও বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে। আখেরাতে নাজাতের ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ ভরসা কর্ম ও আকীদার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত ও বংশীয় সম্পর্কের ওপরই রয়ে গিয়েছে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা মুসলমানরাও এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছি।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ঃ ("অথবা তোমরা আল্লাহর দিকে এমন কথার সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছো, যা তোমরা জানো না।") "তোমরা জানো না" অর্থাৎ যার কোনো প্রমাণ কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় না। তোমরা একটি কথাকে নিজের মন থেকে বানিয়ে আল্লাহর দিকে তার সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছো। অথচ তোমাদের কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা সত্যকথা ছাড়া কোনো কথাই আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে না। اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لاَّيَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ـ الاعراف : ١٦٩

আয়াত ঃ ৮১-৮২

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

www.pathagar.com

ইহুদীদের ধারণার অপনোদন

একথাগুলো ইহুদীদের ওই অবাস্তব ধারণার জবাব যার উল্লেখ ওপরে অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাত এবং জাহান্নামের সম্পর্ক বংশীয় এবং গোষ্ঠীগত সম্বন্ধের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং সম্পর্ক হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আমলের সাথে। যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করবে, আর ওই খারাব কর্মটি তাকে যদি স্বীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে তাহলে তার জন্য রয়েছে অনন্তকালের জাহান্নাম, তার সম্পর্ক যে কোনো দল বা গোষ্ঠীর সাথেই থাকুক না কেনো, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তার জন্য রয়েছে অনন্তকালের জান্নাত, তার সম্পর্ক যে কোনো বংশের সাথেই থাকুক না কেনো।

এ সূরার প্রথমে যেমনিভাবে বর্ণনার ক্রমধারার ইতি টানতে গিয়ে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا الاية আয়াতটি পেশ করা হয়েছিলো, একইভাবে বর্ণনার দ্বিতীয় ক্রম ধারার ইতি টানতে গিয়ে بَلٰى مَنْ كَسَبَ الاية পেশ করা হয়েছে। এ উভয় আয়াতের উপলক্ষ এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। এজন্য এ দুটি আয়াতকে অপরটির আলোকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। সামনে যথাস্থানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবে।

৩৮. পরবর্তী আলোচনা : ৮৩-৯৬ আয়াত

ইহুদীদের জন্য কুরআন এবং রাসূল (স)-এর ওপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে যে জিনিসটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাহলো তাদের অহংকার ও গর্ব। তাদের অহংকার ছিলো এই যে, তারা নিজেরাই কিতাব এবং শরীআতের ধারক-বাহক, আর তাদের সম্পর্ক এমন এক বংশের সাথে আল্লাহ তাআলা যাকে দীনি এবং দলীয় নেতৃত্ব আর দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই স্বীয় ভালবাসা ও মুহাব্বতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তারা এমন এক পসন্দনীয় দল যে প্রথমত, তারা একথার মুখাপেক্ষীইবা কবে ছিলো যে, অন্য কোনো কিতাব ও শরীআতের প্রতি ঈমান আনবে ? দ্বিতীয়ত, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ তাআলা কিতাব ও শরীআত দেবেন এটা কেমন করে হয় ?

ইহুদীদের অহংকার ও দর্পের ওপর আঘাত

এখানে কুরআন প্রথমেই তাদের অহংকার ও দর্পের ওপর আঘাত হেনেছে এবং বলেছে যে, তারা নিজেদেরকে কিতাব ও শরীআতের ধারক-বাহক মনে করে এটা তাদের একটি বাতিল কল্পনা মাত্র। এজন্য যে, তাদের কাছ থেকে এক আল্লাহর ইবাদাত, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন এতিম ও মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার, নামায ও যাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ পালন, নিজেদের ভাইদের সাহায্য ও আশ্রয়ের ব্যাপারে যে প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো, তারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে অতপর উক্ত প্রতিশ্রুতির নবায়ন এবং তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে সমস্ত নবীগণকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকেও তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে অথবা হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তাদের এ দাবীর কি মূল্য হতে পারে যে তারা কিতাব ও শরীআতের ধারক-বাহক ?

www.pathagar.com

ইহুদীদের হঠকারিতা

এরপরই বলা হয়েছে যে, এ কুরআন ওই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে, যা তাদের ছোট ছোট আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং এর জন্য তারা প্রতীক্ষাও করছে। কিন্তু বর্তমানে যখন তারা সেই প্রতিশ্রুত এবং প্রতীক্ষিত জিনিসের কাছে চলে এসেছে আর সে জিনিসটি চিনেও নিয়েছে তখন এর প্রতি শুধু ক্রোধ ও শত্রুতার কারণেই বিরোধিতা করছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে এ কিতাব কেনো বনী ইসমাঈলের ওপর অবতীর্ণ হলো, তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর অবতীর্ণ হলো না কেনো।

ইহুদীদের ঈমানের দাবীর স্বরূপ

এরপর তাদের ঈমানের দাবীর পিছনে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা উদঘাটন করা হয়েছে, যে ঈমানকে নিয়ে তারা এত অহংকারী যে, অন্য কাউকে হিসাবই করে না, সেই ঈমানের অবস্থা শুরুতেই এমন ছিলো যে, খোদ মূসা (আ)-এর উপস্থিতিতেই বাছুর পূজা করেছে। এর পরবর্তী যমানায় তারা আল্লাহর নবীদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে এবং কিছুসংখ্যক নবীকে তারা হত্যাও করেছে।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে খোদ ইহুদীদের বিবেকের সাক্ষ্য

তাদের একটি দাবী হচ্ছে এই যে, আখেরাতে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও নেতৃত্ব শুধু তাদেরই থাকবে। কারণ তারাই আল্লাহ তাআলার পসন্দনীয় এবং প্রিয় বান্দা। এ দাবীর বিরুদ্ধে খোদ তাদের অন্তরই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের এ দাবী যদি সত্যি হয়, তাহলে তারা ইহকালীন জিন্দেগীর প্রতি এতো লোভী হয়ে বসে আছে কেনো। ইহজীবনের চেয়ে তো মৃত্যুর প্রতি বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত।

এ সমগ্র বর্ণনা যার একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক নিবীড় তা বনী ইসরাঈলের সামনে এ রহস্য স্পষ্ট করার জন্যই করা হয়েছে যে, কুরআনের বিরোধিতার জন্য তারা যে দিকটি গ্রহণ করেছে, তার কোনো একটিরও ভিত্তি নেই। এসব কথাই শুধুমাত্র জাতীয় অহংকার, নাফরমানী আর হিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ বর্ণনার মধ্যে কিছু কথা বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কিছু কথা তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে। আর কিছু কথা রাসূল (স)-এর জবানে বলানো হয়েছে। সম্বোধনের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতা মূলত ভাষার লালিত্যের প্রয়োজনেই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলোর তেলাওয়াত গভীর চিন্তার সাথে করবে সে ইনশাআল্লাহ সম্বোধনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সৌন্দর্যের বিষয়টি নিজেই বুঝতে পারবে। মনের স্বাদ বোধের সাথে সম্পৃক্ত এসব বিষয় ভাষায় বর্ণনা করা কষ্টকর।

এসব ব্যাখ্যা স্মৃতিপটে রেখে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ
هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا
مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

www.pathagar.com

لِمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۖ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ
أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا
يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ
الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ
الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

www.pathagar.com

৮৩. তোমরা স্মরণ করো, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীনের অধিকার দিয়ে দিবে এবং মানুষের সাথে ভাল কথা বলবে, তোমরা নামায কায়েম করবে, এবং যাকাত আদায় করবে, অতপর অল্প কিছু লোক ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর মুখ ফিরিয়ে নেয়াই তো তোমাদের স্বভাব।

৮৪. এবং স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা নিজেদের লোকদের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং নিজেদের লোকদেরকে তাদের আবাসভূমি থেকে বের করে দিবে না। তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিলে, তোমরাই এর সাক্ষী। ৮৫. অতপর তোমরা নিজেদের লোকদেরকে হত্যা করছো এবং তোমাদেরই একটি দলকে তাদের আবাসভূমি থেকে বহিষ্কার করছো। প্রথমে তাদের অধিকার হরণ করে ও তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করছো, অতপর যদি তারা তোমাদের কাছে বন্দী হয়ে আসে, তখন মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করছো। অথচ আদৌ তাদেরকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিলো। তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান রাখো, আর অন্য অংশকে অস্বীকার করো ? তোমাদের মধ্যে যারাই এ রকম করে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই নয়, আর আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে পাঠানো হবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করছো সে ব্যাপারে অনবহিত নন। ৮৬. এরাই সেসব লোক, যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। অতএব তাদের শাস্তি লঘুও হবে না, আর কোনো সাহায্যও তাদের কাছে পৌঁছবে না।

৮৭. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি আর পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করছি। অতপর যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কথা নিয়ে আসবে যা তোমাদের ইচ্ছার পরিপন্থী তখন কি তোমরা অহংকার করবে ? শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছো, আর একটি দলকে তোমরা হত্যা করেছো। ৮৮. তারা বলে, আমাদের হৃদয় রুদ্ধ। বরং আল্লাহ তাআলা কুফরীর কারণে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তাদের অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে।

৮৯. যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসলো, যার ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কাছে রয়েছে এবং প্রথম থেকেই কাফেরদের মোকাবেলায় বিজয় লাভের জন্য দোয়া করছিলো, অবশেষে যখন তাদের কাছে ওই জিনিস পৌঁছলো যা তাদের কাছে সুপরিচিত ছিল। তখন তারা তা অস্বীকার করে বসলো। অতএব অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। ৯০. যে জিনিসের বিনিময়ে তারা নিজেদের জীবনকে বিকিয়ে দিয়েছে, সেটা কতইনা খারাপ। তারা ওই জিনিসকে অস্বীকার করছে যা

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন এটা শুধু ওই জিদের ভিত্তিতে করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে করুণা করেন। অতএব আল্লাহর গযবের পর গযব তাদের কপালে জুটেছে। আর অস্বীকারকারীদের জন্য অপমানকর শাস্তি।

৯১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন সে জিনিসের প্রতি ঈমান আনয়ন করো, তখন তারা বলে, আমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে সে জিনিসের প্রতি তো আমাদের ঈমান আছেই। তা ছাড়া সবগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ এ কিতাবটি সত্য এবং এটি অবতীর্ণ হয়েছে। ওই (কিতাবের) ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক যা তাদের কাছে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাহলে তোমরা কেনো ইতিপূর্বে নবীদেরকে হত্যা করেছিলে যদি তোমরা মু'মিন হও? ৯২. মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎসকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছো। নিজেদের ওপর তোমরা যুলুম করেছো।

৯৩. স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম আর তূর পাহাড় তোমাদের ওপর তুলে ধরলাম এবং হুকুম দিলাম যে, তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো, তা শ্রবণ করো আর মান্য করো। তারা বললো ঃ আমরা শ্রবণ করলাম এবং অমান্য করলাম। তাদের কুফরীর কারণে অন্তরে গো-বৎসের পূজার প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে ওই জিনিস কতই না খারাপ যে জিনিসের প্রতি তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে।

৯৪. আপনি বলে দিন, যদি আখেরাতের সফলতা আল্লাহর কাছে অন্যকে বাদ দিয়ে কেবল তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো। ৯৫. কখনো তারা মৃত্যু কামনা করবে না ওইসব কৃতকর্মের কারণে যা করে তারা অপরাধী হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যালেমদেরকে ভালভাবেই জানেন।

৯৬. আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি ওইসব লোকদের চেয়েও বেশি লোভী দেখতে পাবেন, যারা শিরক করেছে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই চায়, যদি সে হাজার বছর বাঁচতে পারতো। অথচ এ আয়ু তারা পেলেও আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে সক্ষম হবে না। তারা যা করছে তা আল্লাহ তাআলা দেখতে পাচ্ছেন।

৩৯. শব্দাবলীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৮৩

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

বনী ইসরাঈল থেকে গৃহিত প্রাথমিক অঙ্গীকার

এ আয়াত সেই প্রাথমিক প্রতিশ্রুতির প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে শিরক থেকে বিরত থাকা, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীনের অধিকার আদায়, নামায ও যাকাতের বিধান কায়েম করার ব্যাপারে নেয়া হয়েছে। এতে সর্বপ্রথম لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ -এর উল্লেখ সর্বপ্রথমেই করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো ইবাদাত তোমরা করবে না। এর এ বাক্যটি বাহ্যত خبر -এর ছাঁচে রয়েছে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে نهى বুঝানো হয়েছে। তাই এর পরবর্তীতে جمله انشائيه গুলোর عطف সংগতিপূর্ণ হয়েছে।

আল্লাহর হকের পর সবচেয়ে বড় হক

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ঃ আল্লাহর হক বা অধিকারের বর্ণনা করার পর এক সাথে পিতা-মাতার অধিকার উল্লেখ করার বিষয়টি একথারই প্রমাণ পেশ করে যে, আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার যদি কারো থাকে, তাহলে তাঁরা হচ্ছেন পিতা-মাতা অন্য কেউ নয়। কিন্তু এ অধিকার হচ্ছে শুধু মাত্র احسان বা সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ইবাদাতের ক্ষেত্রে নয়। এর দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে, আল্লাহ তাআলা যখন ইবাদাতের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে শরীক করার অনুমতি দেননি যাদের মর্যাদা আল্লাহ তাআলার পরেই সুনির্দিষ্ট রয়েছে, তখন অন্যকে অনুমতি দেয়ার প্রশ্নই আসে না।

وَذِى الْقُرْبٰى ঃ একথাকে احسان অর্থাৎ সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়, যা পিতা-মাতার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জন্য সংগতিপূর্ণ অন্য কোনো فعل কে مخذوف (গুপ্ত) ধরা যেতে পারে। কুরআন মজীদে এ উভয় ছুরতেরই উপমা রয়েছে। যেমন এক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

ـ النساء : ٣٦

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এবং ইয়াতীম ও মিসকীনের সাথে ভাল ব্যবহার করো।"

এ আয়াতে وَبِذِى الْقُرْبٰى কে اِحْسَانًا -এর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط .... وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ـ بنى اسرائيل : ٢٣ـ٢٦

"তোমার রবের ফায়সালা হচ্ছে, তাঁর ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদাত করবে না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো .... আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং মুসাফিরদের হক আদায় করো।"–বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৬

সদ্ব্যবহার এবং অধিকার আদায়

এখানে পিতা-মাতার জন্য اِحْسَانَ আর আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য হক আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক فعل (ক্রিয়া) ব্যবহার করা হয়েছে। এ উভয় স্থানকে একত্রে মিলিয়ে দেখলে একটি কথা বের হয়ে আসে। তা হচ্ছে এই যে, اِحْسَانَ। মূলত হক আদায়েরই নামান্তর। যদি হকই আদায় করা না হয় তাহলে কেবল কথার দ্বারা اِحْسَانَ এর ফরয আদায় করা যায় না।

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ঃ অধিকার আদায়ের ক্রমের ক্ষেত্রে প্রথমেই হচ্ছে পিতা-মাতার স্থান, তারপরই হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন এবং এরপরই ইয়াতীম ও মিসকীনের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা সেই গুরুত্বের প্রকাশ ঘটেছে যা ইসলামী সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে দেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য তার পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করার পর ইয়াতীম এবং মিসকীনের হক আদায় করতে বলা হয়েছে। এদের হক বা অধিকার আদায় করা ছাড়া কোনো ব্যক্তিই শরীআত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সংক্রান্ত অঙ্গিকার থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

এদের অধিকারের জন্য আমরা 'অধিকার' শব্দটি নিজেদের পক্ষ থেকে শুধু রূপক অর্থে ব্যবহার করিনি বরং এ শব্দটি খোদ কুরআন মজীদ ব্যবহার করেছে। এবং ইসলামী নীতিতে অধিকার হিসেবেই এটিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا-এর মর্মার্থ

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا ঃ "এবং লোকদের সাথে ভাল কথা বলো" এ অংশটির একটি সাধারণ অর্থ আছে যা বাহ্যিক শব্দাবলী থেকেই বের হয়ে আসে। এ বিবেচনায় নেকী, বুযুর্গী এবং উপদেশ ও নসীহতের সেসব কথা এর অন্তর্ভুক্ত হবে যার শিক্ষা ও প্রচারের জন্য সর্বাবস্থায় মুসলমানদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে। আমাদের কাছে এটিকে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক বলে ধরে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের ব্যাখ্যাকারীগণ এটিকে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপকই রেখে দিয়েছেন। কিন্তু হুবহু একথা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। এসব আয়াতগুলোকে একত্রিত করলে একথা জানা যায় যে, যে বিষয়ে

এখানে এ শব্দগুলো এসেছে, এগুলোর একটা বিশেষ অর্থও রয়েছে। যা কুরআন অধ্যয়নকারীর অজানা থাকা কাম্য নয়। আমরা এখানে সবগুলো সমার্থক আয়াত একত্রিত করে উক্ত বিশেষ অর্থকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।

সূরা আন নিসাতে ইয়াতীমদের ব্যাপারে তাদের অভিভাবকদের কতিপয় দায়িত্বের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে গিয়ে এরশাদ করছেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ ـ النساء : ٥

"তোমরা অবুঝ ইয়াতীমদের কাছে সেই সম্পদ হস্তান্তর করো না যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন। অবশ্য এ সম্পদ থেকে তাদেরকে ভাল করে খাওয়াও পরাও আর ভাল পন্থায় তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৫

এ সূরা আন নিসাতেই অন্য এক জায়গায় তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ ـ النساء : ٩،٨

"মিরাসের সম্পদ বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন এসে উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে ভাল পন্থায় সান্ত্বনার কথা শোনাও। যদি তারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল ও অক্ষম সন্তান-সন্তুতি রেখে যায়, আর তাদের জন্য আশংকা করে, তখন তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং সংযত কথা বলা।"–সূরা আন সিনা ঃ ৮-৯

সূরা আল বাকারাতে আছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لا لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝ ـ البقرة : ٢٦٢ـ٢٦٣

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে এবং খরচ করার পর তারা নিজেদের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে খোটা দেয় না। আর কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাও করবে না। নিয়মানুযায়ী একটি বিনম্র কথা আর ক্ষমা প্রদর্শন করা ওই

দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম, যে দানের পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী এবং সহিষ্ণু।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬২-২৬৩

দান-খয়রাতের ধারাবাহিকতায় সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا ○

"যদি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো করুণার প্রতাশায় থাকো, যার জন্য তোমরা অপেক্ষায় রয়েছো এমতাবস্থায় যদি কোনো সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তবে তাদের সাথে নম্রতার সাথে কথা বলো।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৮

এ আয়াতগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে একথা বের হয়ে আসে যে, এখানে قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا -এর শব্দগুলোর মধ্যে ওইসব কথাই বলা হয়েছে, যা ইয়াতীম, মিসকীন, এবং মুসাফিরদের সম্পর্কে ওপরের আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন ঃ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا এবং وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ও قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ -এর শব্দাবলীতে একই কথা বলা হয়েছে।

কুরআন মজীদে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে একদিকে যেমনিভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি বিনম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলার জন্য হেদায়াত করা হয়েছে। অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অসন্তুষ্টি থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কারণ এ চরিত্র ছাড়া কোনো ব্যক্তি তাদের অধিকার ও ফরয আদায়ের কাজ যথাযথ সম্পন্ন করতে পারবে না। কোনো কোনো সময় মানুষ তাদের দুর্বলতার কারণে তাদের আত্মসম্মান বোধের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে তাদের ব্যথাতুর মন আরো আঘাত প্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো সময় মানুষের অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ পুঞ্জীভূত থাকে এবং তাদেরকে অপারগ ও অনন্যোপায় পেয়ে তা অধিকতর কঠিন ও নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আবার কোনো কোনো অবস্থায় এসব মুখাপেক্ষী লোকদের আচার-আচরণ ও বিরক্তিকর রূপ ধারণ করে। এটাও মানুষের জন্য কর্কশ ও কটূ কথাবার্তার কারণ হয়ে বসে। কুরআন এসব জিনিস থেকে মানুষকে বিরত রেখে তাদের সাথে ভাল কথাবার্তা বলার জন্য উপদেশ দিয়েছে এবং একটি সান্ত্বনামূলক কথাকে সেসব দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা দিয়েছে যেসব দানের মধ্যে তিক্ত কথা, অপমান এবং মনে কষ্ট দেয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। একথাটিকে এখানে قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا শব্দাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও শব্দগুলো সাধারণ কিন্তু আলোচনার ধারা ও বর্ণনা পরম্পরা প্রমাণ করে যে, এটাই এর মর্মার্থ।

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ঃ (নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো) এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করার উল্লেখ বিস্তারিত বর্ণনার পর

www.pathagar.com

সার-সংক্ষেপের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ এ দুটি জিনিসই ওপরের সমস্ত কথাগুলোকে নিজের মধ্যে একীভূত করে নেয়।

নামায এবং যাকাত দ্বারা সমস্ত নেকীকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়

ওপরে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদাত, সেই সাথে নিকটাত্মীয় স্বজন, মিসকীন এবং ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহারের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামায কায়েম এবং যাকাত আদায় দ্বারা সেসব নেকীকে সুশৃংখল করা যায়। এজন্য অংশ বা শাখার উল্লেখ করার পর মৌলিক জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে একথা আপনা-আপনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তোমরা যদি নামায কায়েম করো আর যাকাত আদায় করো, তাহলে তোমাদের জন্য ওপরে বর্ণিত নেক কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। আর যদি নামায রোযাকেই হারিয়ে বসো তাহলে সবকিছুই হারিয়ে ফেলবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ঃ (তোমাদের মধ্য থেকে অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো, আর মুখ ফিরিয়ে নেয়াই তোমাদের স্বভাব।) এটাই হচ্ছে সেই কথা, যা সুস্পষ্ট করার জন্য উপরোল্লিখিত অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এতো গুরুত্বের সাথে যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছো, তা তোমরা ভঙ্গ করে ফেলেছো, তোমাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই এ প্রতিজ্ঞার ওপর দৃঢ় থাকতে সক্ষম।

ইহুদীদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত

কুরআন মজীদ এ স্থানে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের বিষয়টি প্রথমে فعل বা ক্রিয়া পদের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (বিশেষ্য পদ) বলে তাদের স্বভাবকে একটি স্থায়ী বিশেষণ আকারেও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এটা এমন কোনো অপরাধ নয় যে, এটা হঠাৎ করেই প্রকাশ পেয়েছে। বরং এ বিমুখতা এবং বিচ্যুতি তাদের জাতীয় স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুরআন মজীদ তাদের যে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে, হযরত মূসা (আ)-ও তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বার বার বনী ইসরাঈলের নাফরমানীর জন্য ভর্ৎসনা করতঃ একথা বলেছেন যে, তোমরা বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান লোক।

এ আলোচনার অন্তর্নিহিত এ নিগূঢ় তত্ত্বটি ভুলে গেলে চলবে না যে, বনী ইসরাঈলকে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের বিষয় স্মরণ করিয়ে তাদের অহংবোধে আঘাত করা হয়েছে। কেননা তারা নিজেদেরকে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার, আল্লাহর শরীআতের বাহক এবং আল্লাহর পার্থিব ও পরকালীন নেয়ামতের একক ইজারাদার মনে করে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তারা নতুন নবুওয়াত ও রেসালাতের প্রয়োজনীয়তারই বিশ্বাসী ছিলো না এবং নিজেদের পরিমণ্ডলের বাইরে কোনো নবুওয়াত ও রেসালাতের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলো না। এদেরকে এ আয়াত এবং তৎপরবর্তী আয়াতগুলোতে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা

www.pathagar.com

তাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং যার জন্য তাদের এত গর্ব-অহংকার সে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞাকে তারা কিভাবে অপমানিত করেছে এবং অসম্মান করেছে।

আয়াত ঃ ৮৪

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

আরো একটি প্রতিজ্ঞার কথা

এখানে বনী ইসরাঈলের আরো একটি প্রতিজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিলো একথার ওপর যে, তারা একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করবে না আর নিজেদের ভাইদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়ার প্রচেষ্টা করবে না। কিন্তু তারা এ প্রতিজ্ঞাকে দুঃখজনকভাবে পদদলিত করেছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

পূর্ববর্তী লোকদের প্রতিজ্ঞার দায়িত্ব বর্তায় পরবর্তী লোকদের ওপর

এ প্রতিজ্ঞার গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ যার দুটি অর্থ হতে পারে। এ উভয় অর্থ দ্বারা এর গুরুত্ব এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ক্ষতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। একটি অর্থ যা সাধারণ মুফাস্‌সিরীন গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এ প্রতিজ্ঞায় তোমাদের স্বীকারোক্তি রয়েছে এবং আজও তোমরা এর সাক্ষী হয়ে আছো এজন্য যে, এর উল্লেখ তাওরাতের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বিতীয় অর্থ এটা হতে পারে যে, তোমরা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছো এবং তোমরা এ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়ার সময় হযরত মূসা (আ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলে।

এখানে একথাটি স্মরণ রাখা চাই যে, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ সর্বদাই পূরো জামায়াতের সম্মুখে জানিয়ে দিতেন এবং এ বিধানগুলো মেনে নেয়ার ব্যাপারে পূরো জামায়াতের কাছ থেকে অংগীকার নিতেন যাতে করে ঐক্যবদ্ধ স্বীকারোক্তি দ্বারা লোকদের মধ্যে এগুলো মান্য করার চেতনা যথাযথ গুরুত্ব লাভ করতে সক্ষম হয় এবং বংশ পরম্পরায় তাদের মধ্যে এ স্মৃতি জীবন্ত থাকে যে, এ প্রতিজ্ঞা আমরা অমুক স্থানে জামায়াতবদ্ধভাবে করেছি। এখানে কুরআন তার নাযিল হওয়ার সময়ে বনী ইসরাঈলের যেসব লোকজন ছিলো তাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের যেসব ঘটনাবলী ও কাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করো, যখন তাদের পুরো জামায়াতের এ স্বীকারোক্তি ও প্রতিশ্রুতি তোমাদের কিতাবে পাওয়া যায় তখন তোমরা এর দায়িত্ব ও জিম্মাদারীকে কিভাবে অস্বীকার করতে পারো ?

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ৮৫

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

একদিকে দীনের বিরোধিতা, অপরদিকে দীনদারীর প্রদর্শনী

অর্থাৎ যে প্রতিজ্ঞায় তোমরা এতো গুরুত্বের সাথে আবদ্ধ হয়েছো, সে প্রতিজ্ঞাকে তোমরাই আবার ভঙ্গ করছো। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ধরনই কুরআন মজীদ বর্ণনা করেছে যে, তোমরা নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের দুশমনদের সাথে ষড়যন্ত্র করছো এবং তাদের সাহায্যকারী হয়ে নিজেদের ভাইদেরকে স্বীয় আবাসস্থল থেকে বহিষ্কার করছো। এভাবে তাদেরকে অপমানিত আর লাঞ্ছিত করার পর যখন তারা দুশমনদের হাতে বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে তখন জাতির অভিভাকত্ব আর বন্ধুত্বের মহড়া দেয়ার জন্য মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে আবার ছাড়িয়েও আনছো। এটা তাওরাতের নির্দেশ, অথচ তাওরাতে যেভাবে এ মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার নির্দেশ রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের ভাইদেরকে স্বীয় আবাস ভূমি থেকে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে।

বনী ইসরাঈলের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে একথা জানা যায় যে, ইহুদী এবং ইসরাঈলী রাজ্য পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর থেকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধরনের ঘটনাবলী বহু সংঘটিত হয়েছে। উভয় রাজত্বের মধ্যে কট্টর দুশমনি বিদ্যমান থাকতো এবং একে অপরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সহজ পথ এটাই ছিলো যে, বিরোধী শক্তিকে উত্তেজিত করে সতীর্থদের ওপর চড়াও হওয়ার ব্যবস্থা করতো। যখন তারা হত্যা ও যুলুমের শিকারে পরিণত হয়ে দুশমনদের হাতে বন্দী হয়ে সাহায্য প্রার্থী হতো, তখন তাদেরকে ছাড়িয়ে এনে জাতীয় দরদী সেজে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বাহবা নিতো।

এ রকমের অবস্থা সেসব ইহুদীদেরও ছিলো, যারা কুরআন নাযিলের সময় আরবে বসবাস করতো। তাদের বিভিন্ন শাখা আনসারদের বিভিন্ন শাখার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বনু কাইনুকা আর বনু নযীর খাযরাজের সাথে চুক্তিবদ্ধ বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলো। এমনিভাবে বনু কুরাইযা বনু আওছের সাথে চুক্তিবদ্ধ বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলো। আওছ এবং খাযরাজের মধ্যে সবসময়ই গোত্রীয় যুদ্ধ

www.pathagar.com

লেগে থাকতো। এসব যুদ্ধে ইহুদীরাও নিজেদের চুক্তিবদ্ধ বন্ধুদের সাথে অংশগ্রহণ করতো এবং নিজেদের ভাইদেরকে হত্যা এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করার কারণ হতো। কিন্তু ভাইদের সাথে এ শঠতার সাথে সাথে নিজেদের দ্বীনদারী প্রকাশ করার জন্য তাদের দীনি ভাই যখন শত্রুদের হাতে বন্দী হতো তখন তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে এনে বলতো, এটাতো তাওরাতেরই নির্দেশ।[১]

একদিকে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা, অপরদিকে দীনদারীর প্রদর্শনী সুস্পষ্ট মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাবের যে কথা স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে তা মানা যাবে। আর যে কথা স্বীয় প্রবৃত্তির খেলাফ হবে তা অস্বীকার করতে হবে। এ ধরনের মনগড়া ঈমান (অর্থাৎ মন চাইলো তো মানলাম আর মন চাইলো না তাই মানলাম না) আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব লোক আল্লাহর শরীআতের ব্যাপারে এ ধরনের আচরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতে অপমানিত করেন আর আখেরাতে তারা কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে।

আয়াত ঃ ৮৬

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○

اشتراء শব্দের অর্থ

এখানে اشتراء -এর অর্থ কেনাবেচা নয়, বরং শুধুমাত্র অগ্রাধিকার দেয়াকে বুঝানো হয়েছে। মানুষ যখন একটি জিনিসকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে, তখন উক্ত জিনিসকে মূল্যের মোকাবেলায় অগ্রাধিকার দেয়। لسان العرب এ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ - এর সম্পর্কে আবু ইসহাকের একটি কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, "এখানে বেচাকেনা উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধুমাত্র একথা প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য যে, ক্রেতা যেভাবে নিজের অর্থ দিয়ে একটি কাঙ্ক্ষিত এবং পসন্দনীয় জিনিস গ্রহণ করে, এমনিভাবে কাফেররাও পথভ্রষ্টতাকে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত ও পসন্দনীয় জিনিস হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। আরবের লোকেরা এ ধরনের প্রত্যেক স্থানেই যখন একটি জিনিস ছেড়ে দিয়ে অন্য জিনিস বেছে নেয়, তখন বলে থাকে "اشتراه" সে এ জিনিসটি ক্রয় করেছে অর্থাৎ এ জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কুরআন মজীদে এ শব্দটি এ অর্থে একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ঃ (তাদের শাস্তি লঘুও করা হবে না, কোনো প্রকার সাহায্যও তাদের কাছে পৌছবে না) অর্থাৎ ভিতর থেকেও তাদের প্রতি

১. এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করার সময় মুসলিম সরকার ও মুসলিম জামায়াতগুলোর ওইসব যোগসাজসের প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই যা একে অন্যের বিরুদ্ধে করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা এত বাড়াবাড়ি করে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের সাথে ষড়যন্ত্র করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না অথবা দোষের কিছুই মনে করো না।

www.pathagar.com

কোনো প্রকার বিবেচনা করা হবে না, বাইরে থেকেও তাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার চিরস্থায়ী শাস্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার পর আশা ও সম্ভাবনার সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আয়াত ঃ ৮৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ۝

প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা

ওপরের প্রতিজ্ঞাকে সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা করেছেন এ আয়াত সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। আর সে ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা (আ)-কে কিতাব দেয়ার পর সে কিতাবকে স্মরণ করার জন্য সর্বদাই নবী পাঠানো হয়েছে। বিশেষ করে মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন 'নিদর্শন' সহকারে পাঠিয়েছেন। নিদর্শন বলতে সেই মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে যা হযরত ঈসা (আ)-কে দেয়া হয়েছে। এসব মু'জিযাগুলো এতই সুস্পষ্ট ছিলো যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কেবলমাত্র হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কিন্তু ইহুদীরা এসব সুস্পষ্ট মু'জিযাগুলো আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন এবং রুহুল কুদুছ। (জিবরাঈল) এর ফয়েজ এর ফলাফল স্বীকার করার পরিবর্তে نَعُوْذُ بِاللّٰهِ শয়তানী কর্মকাণ্ডের ফলাফল বলে আখ্যা দিয়েছে। তাদের কথা ছিলো এই যে, হযরত ঈসা (আ) এসব মু'জিযা শয়তান ও ভুতদের সরদার 'বাআলাজিবুলের' সাহায্যে দেখান। কুরআন মজীদ ইহুদীদের এসব অপবাদের অপনোদন করতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছে اَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ– 'আমি তাকে রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা সাহায্য করেছি।" অর্থাৎ যত মু'জিযা তিনি দেখিয়েছেন তা মূলত তাঁকে রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করারই ফলাফল। ইহুদীদের ধারণা অনুযায়ী কোনো শয়তান অথবা জ্বিনের সাহায্যের ফলাফল নয়।

اَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ বা রুহুল কুদ্দুছ দ্বারা সাহায্য করার অর্থ

ইহুদীদের অপবাদের কথা ইঞ্জিলে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের এ অপবাদের জবাব হযরত ঈসা (আ) দিয়েছেন একথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এখানে মথি-এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, যা দ্বারা আমাদের ওপরে উত্থাপিত বিষয়ের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। মথি ১২ অধ্যায়ে রয়েছে ঃ

"তখন একজন ভূতগ্রস্ত তাঁহার নিকটে আনীত হইল, সে অন্ধ ও গোঁগা ; আর তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা কহিতে ও দেখিতে লাগিল। ইহাতে

www.pathagar.com

সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল ও বলিতে লাগিল, ইনিই কি সেই দায়ূদ সন্তান ? কিন্তু ফরীশীরা তাহা শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি আর কিছুতে নয়, কেবল ভূতগণের অধিপতি বেল্-সবূলের দ্বারাই ভূত ছাড়ায়। তাহাদের চিন্তা জানিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা উচ্ছিন্ন হয় ; এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা স্থির থাকিবে না। আর শয়তান যদি শয়তানকে ছাড়ায়, সে ত আপনারই বিপক্ষে ভিন্ন হইল ; তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে ? আর আমি যদি বেল্সবূলের দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায় ? এই জন্য তাহারাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আর অগ্রে সেই বলবান্ ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া কে কেমন করিয়া সেই বলবানের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘরের দ্রব্য লুট করিতে পারিবে ? বাঁধিলে পরেই সে তাহার ঘর লুট করিবে। যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ ; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে। এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুস্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ মনুষ্য পুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে ; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে না, ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়। হয় গাছকে ভাল বল, এবং তাহার ফলকেও ভাল বল ; নয় গাছকে মন্দ বল, এবং তাহার ফলকেও মন্দ বল ; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়।"–মথি ১২ ঃ ২২-৩৩

এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ -এর শব্দগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তাহলে আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে আসবে যে, তাতে কোন্ কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো আর কোন্‌টিকে প্রতিহত করা হলো। رُوْحِ الْقُدُسِ -এর সমর্থন ও সাহায্য সকল নবীর জীবনেই অর্জিত হয়েছে। আর নবীগণের পক্ষ থেকে যেসব মু'জিযার সূচনা হয়েছে সেগুলো এর সাহায্যের ফলশ্রুতিতেই হয়েছে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রে একথা বার বার প্রকাশ এজন্যই করা হয়েছে যে, ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে উপরোক্ত অপবাদ বার বার আরোপ করতো। رُوْحِ الْقُدُسِ দ্বারা পবিত্র আত্মা বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আর ইবরানী ভাষায় এর দ্বারা জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

আয়াত ঃ ৮৮

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ -এর মর্মার্থ

একথা ইহুদীদের পক্ষ থেকে একটা খোঁড়া অজুহাত হিসেবেও হতে পারে, আবার অহংকারের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হচ্ছে, এসব কথা

যা আম্বিয়া কেরাম আমাদের কাছে পেশ করেন, তা আমাদের অন্তরে কিছুতেই প্রবেশ করছে না। এসব কথা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তাহলে সবই তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি এসব কথার জন্য আমাদের অন্তর খুলে দেন না কেনো ?

দ্বিতীয় অবস্থায় এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের মন ও মস্তিষ্ক এ ধরনের অর্থহীন কথার জন্য তৈরী হয়নি। এজন্যে কোনো অবস্থাতেই এসব কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করছে না। যদি এর মধ্যে সামান্যতম যৌক্তিকতা থাকতো তাহলে যৌক্তিক কথাগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী আর কে হতে পারে ?

এ উভয় অর্থের সমর্থনে কুরআন মজীদের অসংখ্য উপমা এবং প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এখানে দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। কারণ তাদের একথার পরে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ (বরং আল্লাহ তাআলা তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন)-এর দ্বারা গৃহিত অর্থেরই সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ তারা নিজেদের অহংকার আর দাম্ভিকতার কারণে একথা বুঝে নিয়েছে যে, নবীগণের কথাই এ রকম যে, তা কোনো বুদ্ধিমান লোকের অন্তরে স্থান পেতে সক্ষম নয়, অথচ প্রকৃত অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নবীগণের কথা খুবই যুক্তিসংগত এবং অন্তরে স্থান পাওয়ার মতো। কিন্তু এসব লোকের কুফরী, ক্রোধ আর হটকারিতার কারণে এদের অন্তরের প্রতি আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন। এ কারণেই তাদের অন্তরে এসব যৌক্তিক কথা গ্রহণ করার মতো কোনো যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট নেই।

আয়াত ঃ ৮৯

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

ইহুদীদের প্রতি আল কুরআনের অনুগ্রহ

কিতাব দ্বারা এখানে কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে, যা ওইসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়ন করতঃ নাযিল হয়েছে যা ইহুদীদের সহীফাগুলোতে এসেছে। এ দিক থেকে কুরআনের সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। ইহুদীদের প্রতি এই যে, কুরআন তাদের সহীফা (ছোট ছোট ঐশীগ্রন্থ)-গুলোর অনেক কথাকেই সত্য বলে সাব্যস্ত করেছে। এ দয়া ও মেহেরবানীর এটাই হক ছিলো যে তারা সর্বাগ্রে এ প্রিয় কিতাব হাতে নিবে এবং গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও হিংসার কারণে এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কুরআন মজীদকে অতীতের সহীফাগুলোর সত্যায়নকারী হিসেবে আখ্যা দেয়ার মর্মার্থ আমরা এ সূরারই ৪১ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

www.pathagar.com

কুরআন ও আখেরী যমানার নবী করীম (স)-এর আগমন সম্পর্কে যেহেতু ইহুদীদের সহীফাগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেহেতু এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারে তারা তীব্র প্রতীক্ষার মধ্যে ছিলো। তাদের আশা ছিলো যে, যখন প্রতিশ্রুত নবীর আগমন ঘটবে তখন তাদের দুর্ভাগ্য আর দুঃখের দিন দূরীভূত হয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত দুশমনের ওপর বিজয় দান করবেন। এ বিজয়ের জন্য তারা দোয়াও করেছিলো। কিন্তু এটা বিস্ময়কর দুর্ভাগ্য যে, যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো, প্রতীক্ষিত ব্যক্তির আগমন ঘটলো আর তাঁর কর্মকাণ্ড দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো যে, ইনিই সেই ব্যক্তি যার নিদর্শনাবলী অতীতের সহীফাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরাও তাঁকে খুব ভাল করেই চিনতে পেরেছে, তখন শুধুমাত্র হঠকারিতা ও হিংসার কারণে তাঁকে অস্বীকার করেছে। ইহুদীদের এ আচরণকে হযরত ঈসা (আ) দশ কুমারী সংক্রান্ত উদাহরণে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যা মথি-এর পঁচিশতম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

আয়াত ঃ ৯০

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

اشْتَرَاء-এর মর্মার্থ

এখানে اشْتَرَاء -এর অর্থ বিক্রয় ও বিনিময় করা। হুবহু একই বিষয়ে এ সূরার অন্য স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ○ - البقرة : ١٠٢ (ওই জিনিস কতোই না খারাপ যার বিনিময়ে তারা নিজেদের জান বিক্রয় করেছে।) সাধারণভাবে আরবী ভাষাভাষী লোকজন এ শব্দটিকে 'বিপরীত' অর্থ গণ্য করে থাকেন। এটি 'বিপরীত' অর্থ হিসেব গণ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমাম রাগেব একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ فاما اذا كان بيع بسلعة صح ان يتصوّر كل واحد منهما مشتريا وبائعا ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما فى موضع الاخر [কিন্তু যখন জিনিসের বিনিময়ে জিনিস হয় তখন উভয় দলের মধ্য থেকে প্রত্যেককে مشترى (খরিদদার) এবং প্রত্যেককে بايع (বিক্রেতা) বুঝে নেয়া ঠিক হবে। এ দৃষ্টিতে بيع এবং شراء শব্দ দুটি একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হয়] এ বিশ্লেষণের আলোকে উল্লেখিত আয়াতের অনুবাদ হবে ঃ (ওই জিনিস কতোই না খারাপ যা দ্বারা তারা নিজেদের জানকে বিনিময় করেছে) অর্থাৎ নিজেদের মুক্তি ও সফলতা থেকে বেপরোয়া হয়ে অন্যের বিরোধিতায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে এবং অন্যের ক্ষতি করার জন্য নিজেদের নাক কাটিয়েছে।

www.pathagar.com

اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ঃ এটি হচ্ছে সেই জিনিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা যা তারা গ্রহণ করেছে। আর তা হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাব এবং তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের পরিবর্তে তাঁকে অস্বীকার করা এবং বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যেহেতু তারা জেনে-বুঝেই অস্বীকার ও বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছে, সেহেতু বিরোধিতা ও অস্বীকারের একমাত্র কারণ হলো জিদ ও হঠকারিতা। হঠকারিতা এজন্য আল্লাহর ওপর তাদের আক্রোশ ছিল যে, কেনো আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ দীন এবং সর্বশেষ নবী দ্বারা বনী ইসমাঈলকে অনুগৃহীত করলেন। তাদের নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে নবী হিসেবে পাঠালেন না কেনো ? ভাবখানা এমন যেনো আল্লাহ তাআলার সমস্ত নেয়ামতের একচেটিয়া অধিকার তাদেরই। তারাই বলে দিবে যে, কোন্ পদের জন্য কাকে নির্বাচিত করা উচিত। আর কাকে নির্বাচিত করা অনুচিত।

بغى এখানে بغى -এর অর্থ হঠকারিতা ও বিরোধিতা। এ হঠকারিতা ও বিরোধিতা আল্লাহর সাথে তাদের নাফরমানী করা এবং তাদের অহংকারের ফলাফল ছিলো। عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ এর শব্দগুলো যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তথাপি এখানে বিশেষ করে বনী ইসমাঈলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাছাই ক্ষমতার ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য এ عموم (সাধারণ ও ব্যাপক) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ঃ (তারা আল্লাহর গযবের ওপর গযব নিয়ে প্রর্ত্যাবর্তন করেছে) এর মূল অর্থ হচ্ছে, যেখান থেকে সবচেয়ে বড় রহমত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা তাদের উচিত ছিলো, সেখান থেকে তারা নিজেদের ঘৃণ্য কর্মের কারণে আল্লাহর গযব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সুফল সর্বশেষ নবীর ওপর ঈমান আনয়নের ওপর নির্ভরশীল ছিলো এবং এটা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত বিষয়ও ছিলো, বরং তারা এর জন্য দোয়াও করেছিলো। কিন্তু যখন এ নেয়ামত উপভোগ করার সময় এসে গেলো, তখন তাদের দুর্ভাগ্য তাদেরকে বিপথগামী করলো এবং এর বিরোধিতার ফল স্বরূপ তারা আল্লাহর গযবে নিপতিত হলো। অতপর শুধু গযবই নয়, বরং গযবের ওপর গযবের অধিকারী হলো। প্রথমতঃ তারা আল্লাহর গযবের অধিকারী হয়েছে সেই প্রতিজ্ঞা ভংগের জন্য যা তারা মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে করেছিলো। দ্বিতীয় গযবের অধিকারী তারা এজন্য হয়েছে যে, যখন তারা পুনরায় আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেলো, তখন তারা হঠকারিতা আর হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে ওয়াদা থেকে উপকারিতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

عَذَابٌ مُّهِيْنٌ দ্বারা অপমানকর শাস্তি বুঝানো হয়েছে। অপমানকর শাস্তি তাদেরকে এজন্য দেয়া হবে যে, তাদের অপরাধের মূল চালিকাশক্তি ছিলো অহংকার ; যেমনটি ওপরে অতিক্রান্ত হয়েছে ঃ اَفَكُلَّمَا جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ

www.pathagar.com

—"যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কথা নিয়ে আসবে যা তোমাদের প্রবৃত্তির পরিপন্থী হবে তখন কি তোমরা অহংকারের সাথে অস্বীকার করে বসবে ?"

আয়াত ঃ ৯১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

ইহুদীদের ঈমান কুরআনের ওপরও নেই তাওরাতের ওপরও নেই

অর্থাৎ যখন তাদেরকে কুরআনের ওপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তখন তারা খুব অহংকারের সাথে বলে, আমরা ওই জিনিসের ওপরই ঈমান আনি যা আমাদের ওপর নাযিল হয়েছে। এরপর তাদের কথাকে এভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তাওরাতের পরে তারা অন্য কোনো জিনিসের ওপর ঈমান আনতে রাজী নয়। অথচ তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেকও ওই কিতাবই সঠিক ও সত্য যা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। আর সেটা তাওরাত নয়।

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ঃ প্রথমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পর সেই ঈমানই বিবেচনার যোগ্য যে ঈমান কুরআনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, শুধু তাওরাতের ওপরই নয়। অতপর এটাও সুস্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, তাওরাতের ওপর ইহুদীদের ঈমান আছে, তাদের এ দাবীও সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। যদি বাস্তবে তাদের ঈমান তাওরাতের ওপর থাকতো তাহলে তারা আল্লাহর সেসব নবীদেরকে হত্যা করার দুঃসাহস কিভাবে করে, যারা এ তাওরাতেরই নবায়ন আর সত্যায়িত করার জন্য এসেছেন ঃ

আয়াত ঃ ৯২

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

ইহুদীদের ঈমানের দাবীর অপনোদন

এটা হচ্ছে ইহুদীদের ঈমানের দাবীর আরো অধিক অপনোদনকারী বক্তব্য। দাবী অপনোদনের বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, তাদের প্রাথমিক ইতিহাস অর্থাৎ গো-বৎস পূজা করার বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, আজ তোমরা

www.pathagar.com

নিজেদের ঈমান এবং দীনদারীর গালগল্প এতো বৃদ্ধি করে রেখেছো যে, তোমরা না কুরআনকে পরোয়া করো, না শেষ যমানার নবীকে পরোয়া করো। অথচ তোমাদের এ ঈমানের অবস্থা প্রথম থেকেই এমন যে, খোদ মূসা (আ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখেও নিজেদের রবকে ছেড়ে এক গো-বৎসের পূজা শুরু করে দিয়েছো।

ইহুদীদের এ ধরনের অহংকারের জন্য পরবর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামও তাদেরকে শাসিয়েছেন। গো-বৎস পূজা করার এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ হে ইসরাঈল! [বনী ইসরাঈল] তোমরা তো ওইসব লোক যে, তোমরা প্রথম রাতেই নিমকহারামী করেছো। কুরআনের শব্দগুলো তার মর্যাদা অনুযায়ীই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মূলত সে কথাই কুরআনে বলা হয়েছে যা পূর্বের আম্বিয়ায়ে কেরাম বলে গিয়েছেন।

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ -এর অর্থ হুবহু وَاَنْتُمْ مُشْرِكُوْنَ -এর অর্থজ্ঞাপক। কুরআনে شرك -কে বিভিন্ন স্থানে ظلم শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ظلم -এর আসল অর্থ হচ্ছে হক (অধিকার) নষ্ট করা। আল্লাহর যে হক এবং নিজেদের যে হক মানুষ শিরকের মাধ্যমে নষ্ট করে থাকে তা অন্য কোনো পন্থায় হয় না। এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে পেশ করেছে যেমন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

আয়াত ঃ ৯৩

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

কথার মাধ্যমে অবস্থার বর্ণনা

এ সূরারই ৬৩ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এ অংশের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছি। এখানে ইহুদীদের পক্ষ থেকে যে জবাব উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (তারা বললো ঃ আমরা শুনলাম এবং নাফরমানী করলাম) এটা হলো বাস্তব অবস্থার বর্ণনা। তারা এ প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে, আমরা শ্রবণ করলাম, আমরা আনুগত্য করবো। কিন্তু তাদের কর্মটি ছিলো এই যে, তারা যা কিছুই শুনেছে তার নাফরমানী করেছে। এ বাস্তব অবস্থা যা তাদের কর্মের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে কুরআন তাদের কথার জায়গায় রেখে দিয়েছে। তারা যেনো শুরুতেই আনুগত্য নয়, বরং নাফরমানীরই স্বীকারোক্তি করেছিলো।

www.pathagar.com

মুনাফিক আর ইহুদীরা রাসূল (স)-এর মজলিসে কখনো আগমন করলে তারা سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا এর বদলে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا -ই বলতো। কিন্তু এমনভাবে উচ্চারণ করতো যে শ্রবণকারী عَصَيْنَا -কে اَطَعْنَا বুঝতো। এ আচরণ ও কর্ম তারা তাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শিখেছিলো। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিলো যে, তারা মুখে اَطَعْنَا বলতো, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো عَصَيْنَا আর এরা মুখেও عَصَيْنَا বলে, আর তাদের উদ্দেশ্য عَصَيْنَا। কিন্তু জিহ্বাকে ওলটপালট ও বিকৃত করে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতো যে, মুসলমানরা যেনো عَصَيْنَا -কে اَطَعْنَا বুঝে নেয়।

আয়াত ঃ ৯৪

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

ওপরের ৯০ আয়াতে একথা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো করুণা ও নেয়ামতের অধিকারী অন্য কেউ হোক ইহুদীরা এটাকে খুবই খারাপ মনে করতো। তারা নিজেদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সমস্ত নেয়ামতের হকদার মনে করতো এবং আখেরাতের সমস্ত নেয়ামতের হকদার এককভাবে নিজেদেরকেই মনে করতো। এতে তারা অন্য কারো কোনো অংশীদারিত্ব মেনে নিতো না। কুরআন তাদেরকে এ মর্মে হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, যদি প্রকৃত অর্থে আখেরাতের সমস্ত সাফল্য একমাত্র নিজেদের অধিকার বলে মনে করো আর অন্য কোনো অংশীদারিত্ব স্বীকার না করো, তাহলে তো এর অনিবার্য ফল এটাই হওয়া চাই যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে এবং তোমরা এর জন্য মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা তো এই যে, আহলে কিতাব (আসমানী কিতাবের অধিকারী) হয়েও ইহ জিন্দেগীর প্রতি তোমাদের ভালবাসা এতো অধিক যে, আরব দেশের মুশরিকদেরকেও তোমরা হার মানিয়েছো।

কুরআন ইহুদীদের অহমিকার রগ এমনভাবে টেনে ধরেছে যাতে আল্লাহ তাআলার প্রিয় এবং নৈকট্য লাভকারী হওয়ার যে অহংকার তাদের ছিলো সে ব্যাপারে কথা বলতে তারা যেনো কিছুটা হলেও লজ্জাবোধ করে। যদিও তারা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী সদম্ভে বলতে পারতো যে, আমরা তো মৃত্যুই কামনা করি। কিন্তু মানুষের কাছে তো নিজেদের অন্তরের অবস্থা লুকিয়ে রাখা যায় না। এ কারণেই এদের আসল অবস্থা তাদের জন্য খুবই তিক্ত এবং তাদের নিজেদের দৃষ্টিতেই তাদের অবস্থা খুব অপমানকর ছিলো।

আয়াত ঃ ৯৫

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۢبِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য এবং আখেরাতের ইজারাদারীর দাবী সত্ত্বেও তারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কোনো দিনই করবে না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর

www.pathagar.com

শরীআতের সাথে যে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা তারা করেছে তাতে তারা অন্যের মুখোমুখী হোক বা না হোক, খোদ তাদের অন্তরের মধ্যে তো তা লুকিয়ে নেই। এজন্যই মৃত্যুর কল্পনা করলেই তাদের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যু থেকে তারা কতদিন পর্যন্ত পালিয়ে থাকবে ? আর মৃত্যু থেকে পালিয়ে যাবেই বা কোথায় ? অবশেষে একদিন তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে এবং সেই রবের সামনে তাদেরকে হাজির হতে হবে যিনি এসব যালেমদের সমস্ত কর্মের খবর ভালভাবেই রাখেন। একথা সূরা জুমুআর ৮ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– "আপনি বলে দিন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো সে মৃত্যু তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবেই। অতপর যিনি উপস্থিত এবং অদৃশ্যের সবকিছুই জানেন তাঁর সামনে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমরা যা করছো তা সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবগত করাবেন।"

আয়াত ঃ ৯৬

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ج وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

ইহুদীরা মুশরিকদেরকেও অতিক্রম করে ফেলেছে

অর্থাৎ তারা তো এক দিকে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা এবং তাদের প্রতি আল্লাহর ভালবাসার দাবী করে, অপর দিকে জীবনের প্রতি তাদের ভালবাসার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে জীবনের প্রতি অধিক লোভী। এমনকি তারা দুনিয়ার প্রতি লোভী হওয়ার ক্ষেত্রে আরবের সেসব মুশরিকদেরকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে যাদের কাছে দুনিয়াটাই সবকিছুর মূল। তাদের সামনে প্রথম থেকেই আখেরাতের কোনো ধ্যান-ধারণা নেই।

কুরআন একাধিক স্থানে ইহুদীদেরকে আরবের মুশরিকদের সাথে তুলনা করে এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে, ইহুদীরা আকীদা-বিশ্বাস ও কর্ম উভয় দিক থেকে মুশরিকদেরকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। মুশরিকরা কিতাব ও শরীআত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা এবং নৈতিকতার দিক থেকে খুবই নিম্ন স্তরের ছিলো। কুরআন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কিতাব ও শরীআতের সুমহান আওয়াজের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও নৈতিকতার বিবেচনায় এ ইহুদীদের অবস্থা মুশরিকদের চেয়েও লজ্জাজনক। অথচ এরা তাদেরকে খুবই হীন ও নীচু মনে করে।

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ ঃ এর অনুবাদ আমরা যা করেছি তাও হতে পারে। আবার দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, কাউকে তার দীর্ঘায়ূ আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে

www.pathagar.com

না। অর্থের বিবেচনায় উভয় অনুবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভাষার নীতির দিক থেকে আমার কাছে দুটোই সঠিক। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করেছেন।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ঃ অর্থাৎ কারো দীর্ঘ জীবন তার কর্মকাণ্ডকে আল্লাহর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। এরা যা করছে আল্লাহ তার সবই দেখতে পাচ্ছেন। আর যখন তিনি দেখতেই পাচ্ছেন তখন তিনি এর বিনিময় বা পাওনা দিবেন না তা কি করে সম্ভব ? এখানে দেখার দ্বারা ওই জিনিস বুঝানো হয়েছে। যা দেখার দ্বারা অপরিহার্য হয়ে উঠে। কথার এ পদ্ধতি ও ধরন কুরআন মজিদের অসংখ্য স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪০. এ আয়াতগুলোর কতিপয় শিক্ষা

এসব আয়াতের শিক্ষার প্রতি আমরা এর বিভিন্ন অংশের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিবরণের মাধ্যমে যে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি তাই যথেষ্ট। তবে কতিপয় জিনিসের বর্ণনা এমন হয়েছে যার গুরুত্বের দাবী হচ্ছে যে, আমরা ওইসব জিনিসের দিকে যেনো পুনরায় ইঙ্গিত করি।

আল্লাহ তাআলার শরীআতের হক এর সমস্ত বিধি-বিধানের ওপর আমলের মাধ্যমে আদায় হয়

১. এতে একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে আর তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা যে শরীআত দান করেন, তার হক আদায় হয় তার নির্দেশে প্রতিটি জিনিস আমল বা কর্মে পরিণত করার মাধ্যমে। কোনো ব্যক্তি যদি শরীআতের ওইসব অংশগুলো আমল করে যা তার প্রবৃত্তির অনুকূল আর যা প্রবৃত্তির পরিপন্থী সেগুলো যদি আমল না করে তাহলে শরীআতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ايمان ببعض الكتاب। -কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা এবং কিতাবের কিছু অংশের সাথে নাফরমানী করা। এ ধরনের ঈমান আল্লাহর কাছে ঈমান হিসেবে গণ্য তো নয়ই, বরং এ ধরনের লোকদের জন্য কুরআন শাস্তির বর্ণনা এভাবে দিয়েছে যে, "এদের জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।"

হক গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়

২. দ্বিতীয় তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, জাতীয় অহমিকা, দলীয় গোঁড়ামী এবং গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হক গ্রহণের পথে এক বিরাট অন্তরায়। যে দল এ রোগে আক্রান্ত হয় তার জন্য সে নিজে যা হক বলে স্বীকার করে তা ছাড়া অন্য কোনো হক গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটিই হচ্ছে সেই শিকড়, যাকে কুরআন মজীদ ইবলিসের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যা দিয়েছে। এ থেকেই সেই হিংসার জন্ম হয় যা স্বীয় প্রবৃত্তির

www.pathagar.com

পরিপন্থি সকল হক থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দেয় এবং তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

জীবনের প্রতি লোভ আল্লাহর ভালবাসার পরিপন্থী

৩। তৃতীয় তত্ত্বটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যেমনিভাবে জীবনের তিক্ততায় ঘাবড়িয়ে গিয়ে মৃত্যুর কামনা করা অথবা আত্মহত্যা করা ঈমান এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পরিপন্থী, তেমনিভাবে জীবন ও দীর্ঘায়ুর প্রতি লোভ এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করার মানসিকতাও ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পরিপন্থী। যারা আল্লাহ তাআলা এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহকে ভালবাসে তারা মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চায় না বরং আল্লাহর পথে তারা মৃত্যু কামনা করে। এখানে একটি সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, যে জিনিস মানুষকে মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত করে তোলে, সেটা মূলত পাপপূর্ণ এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার জীবন। মানুষ যদি তার জীবনকে পাপ ও নাফরমানীর জিন্দেগী থেকে দূরে রাখার চেষ্টা-সাধনা করে, তাহলে মৃত্যু তার কাছে একটি প্রিয় জিনিসে পরিণত হয়।

৪১. পরবর্তী আলোচনা ঃ ৯৭-১০৩ আয়াত

কুরআনের সাথে ইহুদীদের শত্রুতার বিস্তারিত বর্ণনা

পরবর্তী আয়াতগুলোতে কুরআনের সাথে ইহুদীদের দুশমনীর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা দুশমনীর ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরাম, জিবরাঈল এবং মিকাঈল সকলেরই দুশমনে পরিণত হয়েছে। এভাবেই তারা আল্লাহকে তাদের দুশমন বানিয়ে নিয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কুরআনের সাথে তাদের দুশমনীর কারণ এটা নয় যে, হকের প্রমাণাদি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে তাদের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু এরা হচ্ছে নাফরমান আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী। প্রথম থেকেই তাদের আচরণ এমন ছিলো যে, যখনই তারা আল্লাহর সাথে কোনো প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্য থেকেই কোনো একটি দল সুযোগ বুঝে তা ভঙ্গ করেছে। যেমন আল্লাহর শেষ নবীর ক্ষেত্রেও তারা একই পথ অবলম্বন করেছে। তাওরাতের হুবহু ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষ নবী আগমন করেছেন। কিন্তু ইহুদীরা তাওরাতের ওপর ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এমনভাবে আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে মেরেছে, মনে হচ্ছে যেনো কখনোই তাদের কোনো সম্পর্ক এর সাথে ছিলো না। অতপর বলা হয়েছে যে, তাদের প্রকৃত আকর্ষণ কিতাবের প্রতি নয় বরং আকর্ষণ হচ্ছে এমন নীচ আর শয়তানী কর্মকাণ্ডের প্রতি যা তারা ফিলিস্তিনী আর কালদানীদের কাছ থেকে শিখেছিলো। যাদু, টোনা, মন্ত্র, প্রতারণা, তাবীজ-কবয ইত্যাদি তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া বানিয়ে দিয়ে ভিন্ন রাস্তায় চালিয়ে দিয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ
اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَكُلَّمَا
عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ ۙۗ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوْا مَا
تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ
كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ
بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا
وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

৯৭. আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু সে যেনো জেনে নেয় যে, জিবরাঈল এ বাণীকে আল্লাহর নির্দেশে তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন, যা তাদের

কাছে পূর্ব থেকেই রক্ষিত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ। এটা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদ দাতা। ৯৮. যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশ্তাকুল, রাসূলগণ, জিবরাঈল এবং মিকাঈলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা এসব কাফেরদের দুশমন।

৯৯. আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্য লোকেরাই কেবল এগুলোকে অস্বীকার করতে পারে। ১০০. তাদের কি এ নীতিই বজায় থাকবে যে, যখনই তাদের সাথে কোনো প্রতিজ্ঞা করা হয়, তখন তাদের একটি দল তা ছুঁড়ে মারবে ? বরং তাদের অধিকাংশেরই ঈমান নেই।

১০১. যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমন করলো, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তারা আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো যেনো তারা এর কিছুই জানে না।

১০২. তারা ওই জিনিসের অনুসরণ করলো যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করতো এবং শেখাতো। সুলাইমান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিলো। তারা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতো এবং ওই জিনিসের পাল্লায় তারা পড়ে গেলো যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি নাযিল করা হয়েছিলো। অথচ তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য—কাজেই তোমরা কুফরীতে পতিত হয়ো না। তখন তারা এদের কাছ থেকে এমন জ্ঞান শিখতো যা স্বামী এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। অথচ তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো অনিষ্টকারী হতে পারতো না। তারা ওই জিনিসই শিখলো যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার করে না। অথচ তাদের একথা জানা ছিলো যে, যে ব্যক্তিই এ জিনিস গ্রহণ করেছে পরকালে তার কোনো পাওনার অংশ নেই। ওই জিনিস কতোই না খারাপ যার বিনিময়ে তারা তাদের জীবনকে বিক্রয় করে দিয়েছে। হায় আফসোস! যদি তারা বুঝতে সক্ষম হতো।

১০৩. যদি তারা ঈমান আনয়ন করতো, তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে প্রাপ্য প্রতিদান তাদের জন্য কতোইনা উত্তম হতো, আফসোস যদি তারা বুঝতে পারতো।

৪২. শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ৯৭

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

এ বাক্যের মধ্যে فَـانَّهُ نَـزَّلَـهُ অংশটুকু شَــــرط এর জবাবের স্থানে রয়েছে। আরবী ভাষায় যখন কোনো شَــــرط এর জবাব এভাবে আসে, তখন এর মধ্যে এমন একটি বিস্তারিত কথা লুকিয়ে থাকে যা পরবর্তী বাক্য দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এখানে বিষয়ের সম্পর্ক দ্বারা বাক্যের যে অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে এই যে, যেসব লোক জিবরাঈলের বিরোধী তাদের কাছে এ সত্যটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, জিবরাঈলের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে মূলত আল্লাহ তাআলারই বিরোধিতা করা। কেননা জিবরাঈল আল্লাহ তাআলার যেসব বাণী রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো তিনি নিজের পক্ষ থেকে করেননি বরং তা নাযিল করেছেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে। জিবরাঈলের কোনো কাজই মনগড়া নয়। তিনি যা কিছুই করেন তা আল্লাহরই ইচ্ছা অনুসারে এবং তারই নির্দেশের অধীনে করে থাকেন। نَـزَّلَـهُ এর মধ্যে هُ সর্বনাম (ضَــــمِــــيــــر)দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে যার উল্লেখ ওপরের ৯১ আয়াতে করা হয়েছে। যথা وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ এ কারণেই এখানে اضمار قبل ذكر (বিশেষ) উল্লেখ করার পূর্বেই (সর্বনাম উল্লেখ করা) এর প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না। একথা উপরোক্ত কথারই একটা অংশ মাত্র।

কুরআনের বিরোধিতায় জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা

এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীরা কুরআন এবং নবী (স)-এর বিরোধিতার জন্য জিবরাঈল (আ)-কেও নিজেদের বিরোধী হিসেবে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। সম্ভবত ইহুদী আলেমগণ এবং নেতৃবৃন্দ যখন আশংকা করলো যে, কুরআনের দাওয়াত পেয়ে তাদের সাধারণ লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার না করে ফেলে, তখন তারা একটা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে তো তার বর্ণনা মোতাবেক জিবরাঈল ফেরেশতা আগমন করে। আর এ ফেরেশতা হচ্ছে আমাদের পুরোনো শত্রু। আমাদের ওপর অমুক অমুক বিপদ তার হাতেই এসেছিলো। এ কারণে আমরা এমন ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনতে পারি না, যার সাথে আমাদের বিরোধী ফেরেশতার সাথে মেলামেশা রয়েছে।

যদিও এটা অতীব আশ্চর্য বলে মনে হয় যে, ইহুদীরা নির্বুদ্ধিতার এমন একটি সীমায় পৌঁছে গেছে যে, তারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে পর্যন্ত নিজেদের শত্রু মনে করতে লাগলো। কিন্তু মানুষ যখন একগুয়েমী, হিংসা, দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতার পাগলামীতে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন কোনো আচরণই তার কাছ থেকে অসম্ভব থাকে না। [অর্থাৎ কাণ্ড-জ্ঞানহীন সব কথাই সে বলতে পারে] রাফেজীদের একটি দলেরও এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে যে, কুরআন আসলে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিলো হযরত আলী (রা)-এর ওপর, কিন্তু জিবরাঈল ভুল করে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে নিয়ে গেছে। এ দলের লোকেরা এ গুনাহের ওপর ভিত্তি করে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ওপর অভিশাপ দেয়। (নাউজুবিল্লাহ)

১. [হযরত মুজাদ্দিদ আল ফেসানী (র)-এর رودرو افض নামক পুস্তিকা থেকে সংগৃহিত]

www.pathagar.com

কুরআন ইহুদীদের এ আহাম্মকীকে যেভাবে পাকড়াও করেছে তা যথাযথ এবং খুবই জোরদার। এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা এ কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে জিবরাঈলের বিরোধী হয়ে গিয়ে থাকো যে, তিনি এ ওহী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর কেনো অবতীর্ণ করলেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তির ওপর কেনো অবতীর্ণ করলেন না, তাহলে তোমরা চিন্তা করে দেখো, একথার ফলাফল কোথায় গিয়ে পৌছে। এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে পর্যন্ত তোমাদের বিরোধী মনে করো। কেননা তোমাদের আকীদা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় জিবরাঈল আল্লাহ তাআলার একজন ফেরেশতা। তিনি কোনো কাজই আল্লাহর হুকুম ছাড়া করতে পারেন না। তিনি এ কাজটিও তাঁর একটি অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে আল্লাহ তাআলার হুকুমেই করেছেন। তাই তোমরা শুধু একা জিবরাঈলেরই বিরোধী নও বরং তোমরা আল্লাহ তাআলারও বিরোধী, আর আল্লাহও তোমাদের বিরোধী।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ঃ এ আয়াতে কুরআনের তিনটি গুণাগুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ কুরআন অতীতের ছোট ছোট আসমানী কিতাবগুলোকে সত্যায়িত করে।

দুই ঃ কুরআন সত্যের দিকে মানুষকে দিশা দান করে।

তিন ঃ যারা কুরআনের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করে তাদেরকে সে পরকালের বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ দান করে।

এ বিস্তারিত বর্ণনা এখানে এজন্যই করা হয়েছে যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহুদীদের এ বিরোধিতা শুধু কুরআনেরই বিরোধিতা নয়। বরং খোদ তাদের কিতাবেরই বিরোধিতা। তারা ওই হেদায়াতের বিরোধী যা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ওই হেদায়াতেরও তারা দুশমন যা পৃথিবীর পথ প্রদর্শনের জন্য এখন নাযিল হয়েছে।

আয়াত ঃ ৯৮

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

কথা কোথা থেকে কোথায় পৌছেছে

হযরত জিবরাঈল (আ)-এর বিরোধিতার দ্বারা যেসবের বিরোধিতা অপরিহার্য ও অবধারিত হয়ে উঠে এ আয়াত তারই বিবরণ। সাথে সাথে এ দুর্বৃত্তপণার কি শাস্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হতে পারে তারও বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ এর দ্বারা খোদ আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা অবধারিত হয়ে উঠে। এর কারণ ওপরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তারা এমন একটি কাজের জন্য জিবরাঈলের ওপর ক্ষিপ্ত যা তিনি আল্লাহর নির্দেশে করেছেন, তাহলে তো এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা খোদ আল্লাহ তাআলার ওপরও ক্রুদ্ধ। তারপর এর দ্বারা সকল ফেরেশতা, সমস্ত রাসূল এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের বিরোধিতা অবধারিত হয়ে উঠে। কেননা আল্লাহ

www.pathagar.com

তাঁর ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত রাসূলের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় বিদ্যমান। আম্বিয়ায়ে কেরাম সমস্ত কাজ আল্লাহর মর্জি মোতাবেক তাঁর হুকুমের অধীন সম্পন্ন করে থাকেন এবং একই দলের সাথে সম্পর্ক রাখেন। এ কারণেই তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে না। যে ব্যক্তি এঁদের মধ্য থেকে কারো বিরোধী হয়, তাহলে সে সকলেরই বিরোধী, আর যদি এঁদের একজনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে তাহলে সে সবাইকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। এখানে এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সামনে আরো বিস্তারিত কথা আসবে।

এখানে সাধারণ ফেরেশতাদেরকে উল্লেখ করার পর জিবরাঈল এবং মিকাঈলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের গুরুত্বের কারণে যেমনটি عَـــام-এর পরে خَـــاص -এর উল্লেখ করা হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাঈল মিকাঈল ফেরেশতাকে তাদের জন্য জিবরাঈলের বিপরীতে (যা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়) তাদের জন্য দরদী ও সাহায্যকারী মনে করতো। কুরআন এখানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে হযরত মিকাঈল (আ)-কে শামিল করে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, জিবরাঈলের বিরোধিতাকারী যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর সমস্ত নবী ও রাসূলগণের বিরোধী, ঠিক তেমনিভাবে সে মিকাঈলেরও বিরোধী। কারণ আল্লাহ তাআলার সমস্ত ফেরেশতা ও রাসূলগণের মিল্লাত তথা ধর্ম ও রীতিনীতি এক অভিন্ন। জিবরাঈল এবং মিকাঈল উভয়ই এ মিল্লাতের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তাও নেই, বিরোধিতাও নেই যে, জিবরাঈলের সাথে যাদের যুদ্ধ মিকাঈল তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন।

فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ঃ এ বাকাংশ থেকে একই সময় দুটি কথা সাব্যস্ত হয়। এক ঃ যাঁরা আল্লাহ তাআলা, তার রাসূল এবং তাঁর ফেরেশতাকুলের বিরোধিতা করে এবং শত্রুতা পোষণ করে তারা কাফের। দুই ঃ আল্লাহ তাআলাও এসব কাফেরদের দুশমন। কুরআনের এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ দুটি বক্তব্যকে এমনভাবে একত্রিত করেছে যে, কথাও পূর্ণ হলো, আবার যাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হলো তাদের পক্ষে অস্বীকার করা এবং তর্ক-বিতর্ক করার কোনো অবকাশই থাকলো না।

আয়াত ঃ ৯৯

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

بَيِّنَات-এর মর্ম

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূল (স)-কে। ايات بينات (সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী) দ্বারা রাসূল (স)-এর নবুওয়াত ও রেসালাতের সুস্পষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণাদি বুঝানো হয়েছে যা তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলো কুরআনের প্রমাণিত বর্ণনার অবস্থায় রয়েছে অথবা ওইসব কার্যাবলী, নিদর্শন, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং মু'জিযার অবস্থায় রয়েছে যা প্রিয়নবী (স)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে, এসব জিনিস

www.pathagar.com

তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণের ক্ষেত্রে এতখানি সুস্পষ্ট যে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র বোধশক্তি আছে সে এগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। কেবলমাত্র ওইসব লোকই অস্বীকার করতে পারে যারা নাফরমান আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী

فسق -এর অর্থ

فسق -এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নাফরমানী বড়ও হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে। কুরআন মজীদে এ শব্দটি বড় বড় নাফরমানীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের মতে এখানেও এর অর্থ এটাই। কথার পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা এটাই বুঝা যায়। এর অর্থ এই যে, কথা যদি সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের সত্যতা সুস্পষ্ট। কিন্তু যেসব লোক আল্লাহর সাথে সম্পাদিত প্রতিটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের কাছে এসব প্রমাণাদির কি গুরুত্ব আছে ?

আয়াত ঃ ১০০

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

বাক্যের এ ধরন ও পদ্ধতি বিস্ময় ও পরিতাপ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওপরে ইহুদীদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের উল্লেখ করে আলোচনা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের এ নীতি তারা এ প্রতিজ্ঞার এক্ষেত্রেও গ্রহণ করেছে যা সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিলো। অতপর বিস্ময় ও পরিতাপ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, তাদের কি এ নীতিই অব্যাহত থাকবে যে, যখনই তারা কোনো প্রতিজ্ঞা আল্লাহর সাথে করবে, সময় আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা তা ভঙ্গ করে ফেলবে, শুধু অল্প সংখ্যক লোক প্রতিশ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ? অতপর তাদের প্রকৃত চেহারা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ঃ বরং তাদের অধিকাংশই এমন লোকদের শামিল যারা প্রথম থেকেই ঈমান আনেনি। তারা তো তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো জিনিসের প্রতিই তাদের ঈমান নেই।

আয়াত ঃ ১০১

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

ওপরের আয়াতে ইহুদীদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের নীতি ও স্বভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে বাস্তব সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে যে, দেখো, যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল আসলো হুবহু সেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক যা তাদের কাছে প্রথম থেকেই সংরক্ষিত আছে। তখন তাদের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পিছনে ছুঁড়ে মারলো, যেনো তারা কোনো দিনই এ বিষয়ে অবগত নয়।

www.pathagar.com

رسول দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে ?

رسول দ্বারা রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। শব্দটি যদিও نكره (অনির্দিষ্ট) ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর কথার সম্পর্ক ও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা প্রকৃত মর্ম কি তা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর দ্বারা মূলত রাসূলের মহত্ত্বও প্রকাশ পেয়েছে।

كتاب الله -এর অর্থ তাওরাতও হতে পারে আর কুরআনও হতে পারে। এর অর্থ তাওরাত হলে সে অবস্থায় এর তাৎপর্য হবে, এসব আহলে কিতাব (কিতাবধারীরা) আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাব থেকে শেষ যমানার নবীর ব্যাপারে এমনভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো যেনো তাঁর বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। আর এর দ্বারা যখন বুঝানো হবে কুরআন, সে ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, আহলে কিতাব হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা কিতাবকে শনাক্ত করার জন্য এরাই ছিলো সবচেয়ে বেশি যোগ্য। কেননা এরা একটি আসমানী কিতাবের উত্তরাধিকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার দাবীদার ছিলো এবং এ ধরনের একটি কিতাব নাযিল হবে মর্মে আগাম খবরও এদের কাছে ছিলো। কিন্তু জেদ আর হিংসার বশবর্তী হয়ে আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পিছনে ছুঁড়ে মেরেছে মনে হচ্ছে যেনো তারা এর সম্পর্কে কিছুই জানে না।

আয়াত ঃ ১০২

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে যে জিনিসকে তারা বুকে টেনে নিয়েছে এখানে তারই বর্ণনা এসেছে।

কুরআন মজীদে شياطين দ্বারা বেশ কিছু স্থানে জ্বিন এবং মানব উভয় জাতির বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং খারাপ চরিত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানেও আমাদের কাছে উভয় ধরনের খারাপ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর রাজত্বের যুগ। আরবী ব্যাকরণের নীতি অনুযায়ী এখানে একটি مضاف লুপ্ত (محذوف) রয়েছে। অর্থাৎ عَلٰى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ধরতে হবে।

আল্লাহর কিতাবের স্থলে যাদু ও যাদু বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ

আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এ যালেমরা আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে মেরেছে এবং যাদুটোনা, মন্ত্র এবং জ্যোতিষবিদ্যাসহ যেসব যাদু বিদ্যা হযরত সুলাইমান (আ)-এর রাজত্বকালে জ্বিন এবং তাদের অনুগামী মানুষের যৌথ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে চালু ছিলো তা আল্লাহর কিতাবের স্থান গ্রহণ করেছে।

যাদু, যাদুবিদ্যা এবং এ ধরনের খারাপ ও শয়তানী বিদ্যার কিছু না কিছু চর্চা তো সর্বকালেই ছিলো। কিন্তু হযরত সুলাইমান (আ)-এর যুগে তাঁর রূহানী জ্ঞানের বিপরীতে জ্বিন ও মানব শয়তানদের একটি দলের প্ররোচনায় যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়ার প্রচলন খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিলো। অশান্তি সৃষ্টিকারী এসব লোকেরা এ খারাপ বিদ্যাকে সুবিন্যস্ত ও লিখিত আকারে সংরক্ষিত করেও রেখেছিলো। পরবর্তীতে যখন ইহুদীদের মধ্যে ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দিলো এবং কিতাব ও শরীআতের প্রতি তাদের আগ্রহের মৃত্যু ঘটলো, তখন আল্লাহর কুদরতের স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী তারা এ জাতীয় চিত্তাকর্ষক বিদ্যা শেখা ও শিক্ষাদানের প্রতি অতি মাত্রায় ঝুঁকে পড়লো। পবিত্রতা ও সম্মানের রং লাগানোর জন্য এগুলোকে তারা সত্যের পথিক হযরত সুলাইমান (আ)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতো এবং লোকদেরকে তাদের অনুসারী বানানোর জন্য এ দাবীও করতো যে, হযরত সুলাইমান (আ) এসব বিদ্যার জোরেই ওইসব কার্যকলাপ আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন যা তাঁর কীর্তি বলে অভিহিত করা হয়। আজও কিছু লোক এসব খারাপ জিনিসের প্রতি আগ্রহ রাখে এবং নিজেদের এসব কুসংস্কারের সমর্থনে হযরত সুলাইমান (আ)-এর বরাত দিয়ে থাকে। কিছু কিছু নক্‌শায় তো বিশেষ করে তাঁর নামকে যুক্ত করা হতো। এভাবে সমস্ত জিনিসই ইহুদীদের মাধ্যমে আমাদের এখানে চলে এসেছে। এগুলো হচ্ছে বিভ্রান্তির সেই অবশিষ্ট আবর্জনা যা হযরত সুলাইমান (আ)-এর রাজত্বকালের দুষ্ট জ্বীন ও মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছিলো এবং যা পরবর্তীতে ইহুদীদের হাতে বিকাশ লাভ করেছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ঃ এ বাক্যটি اِسْتِدْرَاكٌ কিংবা معترضه হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কথার ক্রমধারার মধ্যে হযরত সুলাইমান (আ)-কে ইহুদীরা যে অপবাদ দিয়েছে তা থেকে তাঁকে পবিত্র করার জন্য বলা হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর চরিত্র এসব নিকৃষ্ট যাদু ও খারাপ বিদ্যার সম্পৃক্ততা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এ ধরনের কুফরী কখনো করেননি। এরা হচ্ছে সেসব জ্বিন ও মানবরূপী শয়তান যারা এ খারাপ বিদ্যার পথ বেছে নিয়েছে অতপর লোকদেরকে এসব প্রতারণাপূর্ণ বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে।

www.pathagar.com

এখানে বাক্যের ধরন ও পদ্ধতির ব্যাপারে দুটি কথা স্মৃতিপটে থাকা উচিত। এক ঃ এ معترضه এর ভাষাগত লালিত্য হচ্ছে এই যে, বাক্যটি পড়ার সময় এমনটি অনুভূত হয় যে, বক্তার কাছে যাদু-টোনা ও খারাপ জ্ঞানের সম্পর্ক হযরত সুলাইমান (আ)-এর সাথে জুড়ে দেয়াটা এতোটাই অপসন্দনীয় যে, এর অপনোদনের ক্ষেত্রে কথা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি। বরং কথার ক্রমধারাকে থামিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ এর জবাব দেয়াকে খুবই জরুরী বিষয় মনে করেছেন। দুই ঃ এর জবাব দেয়াটাই এমন পদ্ধতিতে শুরু করেছেন যাতে আপনা-আপনি একথা বেরিয়ে আসে যে, যাদুবিদ্যা কুফর হওয়া এমন একটি সুস্পষ্ট সত্য যাকে কুফর হিসেবে প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজনই নেই।

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَا رُوْتَ ঃ ওপরের বাক্যটিকে আমরা যেমন বলেছি যে, এটি استدراك কিংবা معترضه হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ বাক্যটির عطف অপরিহার্যভাবে مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ -এর ওপর করা হয়েছে। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় প্রথমত তারা সেই খারাপ বিদ্যার অনুসরণ করেছে যা হযরত সুলাইমান (আ)-এর রাজত্বকালে শয়তানদের মাধ্যমে প্রচলিত ছিলো। দ্বিতীয়ত তারা সেই জিনিসের অনুসরণ করেছে যা বাবেলের বন্দী যুগে 'হারুত ও মারুত' দুই ফেরেশতার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো।

হরুত ও মারুতের প্রতি কি জিনিস অবতীর্ণ হয়েছিলো ?

এখানে এ প্রশ্ন উদিত হয় যে, এ ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রতি কি জিনিস নাযিল করা হয়েছিলো ? এ প্রশ্নের উত্তর মুফাস্সিরগণ সাধারণভাবে এটাই দিয়েছিলেন যে, এটা ছিলো যাদুবিদ্যা। কিন্তু এ জবাবটি কয়েক দিক থেকে খট্কাযুক্ত।

এক ঃ এর عطف যেমনটি আমরা পেশ করেছি مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ -এর ওপর যা দ্বারা খোদ কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যাদু বুঝানো হয়েছে। এখন যদি এরও উদ্দেশ্য যাদুই হয়, তাহলে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার দ্বারা বিশেষ কোনো উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছে না। আরবী ভাষায় যখন এ ধরনের معطوف এবং معطوف عليه আসে তখন সাধারণ নীতি অনুযায়ী এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য বা ভিন্নতা থাকা চাই। কোনো বিশেষ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ছাড়া আরবী ভাষাভাষী লোকেরা এ সাধারণ নীতি ও ব্যাকরণের ব্যতিক্রম করেননি। এখানে দুটি কথা একই জিনিস হওয়ার ব্যাপারে শুধু যে কোনো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না তা নয়, বরং এ রকম হওয়া পারিপার্শ্বিক প্রমাণের পরিপন্থী।

দুই ঃ এখানে উল্লেখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে أُنْزِلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এ علم (জ্ঞান) আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত ছিলো। এ শব্দের অনুগ্রহ ও উপকারিতার যে উচ্চ ধারণা নিহিত আছে সেটাকে সামনে রেখে যাদুর মতো শয়তানী, অপবিত্র ও সম্পূর্ণ বাতিল এমনকি কুফরী জিনিসের জন্য এ শব্দের

www.pathagar.com

ব্যবহার সাধারণ রুচির ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর অনুভূত হয়। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কুরআন মজীদে এ শব্দটি চতুষ্পদ জন্তু এবং লোহা ইত্যাদি রকমের জিনিস সৃষ্টি করার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এতটুকু কথা যাদুর জন্য এ শব্দটির প্রয়োগের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। লোহা এবং চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি সভ্যতা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের জন্য খুবই কল্যাণকর ও বরকতময় জিনিস। তাই এগুলোর জন্য এর ব্যবহার বুঝে আসে। কিন্তু আমাদের জানা মতে কুরআনের কোথায়ও এ শব্দটি এমন জিনিসের জন্য ব্যবহার করা হয়নি যা যাদুর মতো কুফরী এবং শয়তানী জিনিস হিসেবে গণ্য। কাফেরদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল করার জন্যও এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের ওপর যে আযাব নাযিল হয়, তা ঈমানদার লোকদের জন্য রহমত স্বরূপ, এর দ্বারা আল্লাহর যমীন পবিত্র হয়।

আমরা এ সত্যকে অস্বীকার করছি না যে, কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ দুনিয়াতে যা কিছুরই আগমন ঘটে, আল্লাহর ইচ্ছার অধীনেই ঘটে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাধীন বাতিলের পক্ষে সুযোগ অর্জিত হওয়া ভিন্ন জিনিস। আবার যাদুর মতো শয়তানী জ্ঞান দুই ফেরেশতার ওপর নাযিল হওয়া সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জিনিস।

তিন ঃ এ বিদ্যা কুরআনের শব্দ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, দুই ফেরেশতার ওপর নাযিল করা হয়েছিলো। এ ফেরেশতাদ্বয় লোকদেরকে এ বিদ্যার শিক্ষাও দান করতো। ফেরেশতাদের ব্যাপারে এটা স্বীকৃত যে, শিরক ও কুফরীর পঙ্কিলতা থেকে তারা পূত-পবিত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁদের স্বভাবকে এমন বানিয়েছেন যে, এ ধরনের কোনো পঙ্কিলতার স্পর্শও তাদের লাগে না। ফেরেশতারা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণের দাওয়াত ও শিক্ষার বাহন হয়েছেন। এ রকম জিনিসই তাদের জন্য যথোপযুক্ত। এ কারণেই যাদুবিদ্যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া এবং তাদের দ্বারা এর প্রচার ও প্রসার ঘটা (তা যত সতর্কতার সাথেই করা হকো না কেনো) বোধগম্য নয়। যদি ফেরেশতারা এ ধরনের কাজে লেগে যায়, তাহলে শয়তানদের জন্য কি কাজ আর অবশিষ্ট থাকবে ?

চার ঃ ফেরেশতারা তাদের এ বিদ্যার জন্য যে শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন তা দ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, তাদের বিদ্যা শয়তানী যাদুবিদ্যার চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো। শয়তানী বিদ্যা সম্পর্কে খোদ কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, এটা একদম কুফরী বিদ্যা। ফেরেশতারা তাদের বিদ্যার জন্য فتنة (ফেত্না) শব্দ ব্যবহার করেছে। আর ফেতনা শব্দের অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। কুরআন মজীদে এর দ্বারা সাধারণভাবে ওই জিনিস বুঝানো হয়েছে যা সৃষ্টি করা হয়েছে মূলত মানুষের উপকারের জন্য। কিন্তু মানুষ নিজের ভুল ব্যবহারের দ্বারা অথবা এর নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে এর ভালবাসার ফাঁদে পড়ে একে নিজের জন্য ফেতনা বানিয়ে নেয়। যার কারণে সে উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অপকারী বরং বিনাশী হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিকে কুরআন মজীদে فتنة (ফেতনা) বলা হয়েছে। সবাই জানে যে, এ দুটো জিনিসই মূলত খারাপ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার

www.pathagar.com

নেয়ামত। যদি মানুষ এগুলোর সঠিক মর্যাদা বুঝে তাহলে এ উভয় নেয়ামতই দুনিয়া এবং আখেরাতে তার জন্য উপকার সাধনকারী হতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন শরীআত বহির্ভূতভাবে এর মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে অন্ধ ভালবাসার পাল্লায় পড়ে আল্লাহ এবং আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়, তখন এসব জিনিসই তার জন্য বিপদ ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কোনো কোনো অবস্থায় এসব জিনিসের (ধন ও সন্তানাদি) ভালবাসা মানুষকে কুফরীতে পর্যন্ত লিপ্ত করে ছাড়ে।

এ যুক্তিগুলো থেকে বুঝা যায় যে, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ এ আয়াতের দ্বারা যাদু বুঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু যদি যাদু বুঝানো না হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, এটা কোন্ ধরনের বিদ্যা, যা ফেরেশতাদের ওপর অবতীর্ণ হওয়াটা তাদের জন্য শোভনীয় এবং যার প্রতি আসক্তি অথবা ভুল ব্যবহার দ্বারা ওইসব অনিষ্টের সৃষ্টি হতে পারে, যা এখানে এ বিদ্যার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এর প্রতি আসক্তি মানুষকে আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ বিদ্যা এক প্রকারের ফেতনা যার ভুল ব্যবহার দ্বারা মানুষ কুফরীতে পতিত হতে পারে। এ বিদ্যাকে খারাপ চরিত্রের লোকেরা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

বস্তু ও কথার আধ্যাত্মিক গুণাগুণ সংক্রান্ত বিদ্যা

আমাদের মতে এর দ্বারা বস্তু ও কথার আধ্যাত্মিক গুণাগুণ ও প্রভাব সংক্রান্ত সেই বিদ্যাকে বুঝানো হয়েছে। যার প্রচলন ইহুদীদের সূফী-সাধক ও পীরগণের মধ্যে ছিলো এবং যে বিদ্যাকে তারা তাবীজ এবং বিভিন্ন ধরনের আমল ও তদবীরের আকারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো। যেমন ঃ কোনো রোগ অথবা কষ্ট দূর করার জন্য অথবা খারাপ দৃষ্টি, যাদু ইত্যাদির খারাপ প্রভাব দূর করার জন্য অথবা যাদুমন্ত্রের আক্রমণ মুকাবেলা করার জন্য অথবা ভালবাসা এবং বিচ্ছেদের জন্য ব্যবহার করা হতো।

এ বিদ্যা যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলো, কারণ এর মধ্যে শিরকেরও কোনো সংমিশ্রণ ছিলো না এবং শয়তান ও জ্বীনের কোনো হাতও ছিলো না। কিন্তু এ বিদ্যা স্বীয় প্রভাব ও ফলাফল সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাদুর মতোই দ্রুত ক্রিয়াশীল ছিলো। সম্ভবত এ বিদ্যা বনী ইসরাঈলের বাবেলের বন্দীদশার যামানায় দু ফেরেশতার মাধ্যমে অর্জন করেছিলো। যাতে এর মাধ্যমে বাবেলের যাদু ও যাদুবিদ্যার মোকাবেলা করা যায় এবং নিজের জাতির স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন লোক এবং নিরীহ সাধারণ লোকদেরকে যাদুকরদের ভীতি থেকে রক্ষা করা যায়। আমাদের মন এ দিকে যায় দুটি কারণে—এক ঃ তাওরাত থেকে জানা যায় যে, বাবেলে যাদু, যাদুবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যার খুব জোর ছিলো। দুই ঃ একথা আল্লাহ অনুসৃত রীতি মোতাবেক বলে জানা যায় যে, যদি কোনো স্থানে কোনো খারাপ বিদ্যার ভয় এবং ব্যাপকতা থাকে, যা দ্বারা অশান্তি সৃষ্টিকারী লোকেরা ফায়দা লুটতে থাকে। তাহলে তার মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তাআলা ঈমানদার লোকদেরকে এমন জ্ঞান দান করেন যা জায়েয এবং মানুষের জন্য উপকারী।

www.pathagar.com

هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ঃ কুরআন দ্বারা স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, هَارُوْتَ ও مَارُوْتَ আল্লাহর দু'জন ফেরেশতা ছিলেন। এ কারণে তাফসীরের কিতাবগুলোতে তাঁদের ব্যাপারে যেসব বাহুল্য কথাবার্তা রয়েছে, তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। তাঁরা দুনিয়াতে ফেরেশতাদের চারিত্রিক গুণাগুণসহ প্রেরিত হয়েছেন এবং ফেরেশতাদের চারিত্রিক গুণ নিয়েই এ পৃথিবীতে ছিলেন তাঁদের বিদ্যা ছিল জায়েয এবং উপকারী। কিন্তু ইহুদীরা তাদের চারিত্রিক অধঃপতন এবং কুরুচির জন্য বিদ্যাকে খারাপ উদ্দেশ্যে শিখেছে এবং খারাপ উদ্দেশ্যেই তারা তা ব্যবহার করেছে। যার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এ বিদ্যাও তাদের কাছে যাদু ও যাদুবিদ্যার এক নতুন সংযোজন হিসেবে রয়ে গেলো এবং এর চর্চায় তারা এতোটাই ডুবে গিয়েছিলো যে, আল্লাহ তাআলার কিতাবের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই আর অবশিষ্ট থাকলো না এবং যতটুকু অবশিষ্ট থাকলো তা শুধু তাবিজের আমল করার সীমা পর্যন্ত থাকলো। অর্থাৎ অমুক আয়াত দ্বারা ফুঁক দিলে এ উপকার, অমুক আয়াতের তাবীজ দ্বারা এ ধরনের প্রভাব পড়ে বা আছর হয় ইত্যাদি।

সম্ভবত কারো কারো মস্তিষ্কে এ ধরনের প্রশ্নও উদয় হতে পারে যে, দুনিয়াতে এ ধরনের কোনো বিদ্যার আদৌ অস্তিত্ব আছে কি ? এর জবাবে আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, এ বিদ্যার অস্তিত্ব অস্বীকার করা একটি ধ্রুব সত্যেরই অস্বীকৃতি, যদিও আমি নিজে এ ধরনের বিদ্যার আমলকারী নই। কিন্তু বহুবার আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যার পর আমার পক্ষে এ জিনিসকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আমাদের ধারণা এই যে, আমাদের সূফী ও পীরগণের একটি গোষ্ঠী এ বিদ্যারই অবশিষ্টাংশকে ধারণ করে নিয়েছেন এবং এর দ্বারা তারা মানুষের অনেক উপকারও করেছেন। বরং ঘটনা প্রবাহ থেকে এটাও জানা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সাহায্যে তারা সন্ন্যাসী, জোতির্বীদ ইত্যাদির মোকাবেলায় ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে কিন্তু চারিত্রিক অধঃপতনের পর যেভাবে ইহুদীদের কাছে এ জ্ঞান, যাদু-টোনা ও খারাপ বিদ্যার লেজুড় এবং দোকানদারীর একটা উপায় হয়ে দাঁড়ালো, তেমনিভাবে আমাদের এখানেও তা শুধু পীর মুরীদীর দোকানদারী চালানোর মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং এর মধ্যে সত্যের চেয়ে মিথ্যা ও বাতিলের মিশ্রণ বেশি হয়ে গেছে। যার কারণে লোকদের ওপর এর প্রভাব অবিকল সে রকমই হচ্ছে, যা কুরআন কারীম বর্ণনা করেছে।

ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম সতর্কতা

وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ঃ এ আয়াতটি উপরোল্লিখিত وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ খণ্ডিত আয়াতের মতো যেমনিভাবে جملة معترضة স্বরূপ হযরত সুলাইমান (আ)-এর পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আয়াতের এ অংশটুকুও استدراك হিসেবে এ ফেরেশতাদ্বয়ের পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য এসেছে। এতে বলা হয়েছে যে, নিজেদের এ বিদ্যা তাঁরা যদি কাউকে শিক্ষা দিতো, তবে সাথে সাথে এ কথাও জরুরীভাবে সতর্কতা স্বরূপ বলে দিতো যে, দেখো, আমাদের এ বিদ্যা

www.pathagar.com

হচ্ছে একটি পরীক্ষা। তাই তোমরা কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্যে এ বিদ্যা ব্যবহার করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না, বরং এ বিদ্যাকে তোমরা শুধুমাত্র ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

ফেতনা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে

ফেতনা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে পূর্বের আলোচনায় সে দিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি। আল্লাহ তাআলার সকল জাগতিক নেয়ামত, স্ত্রী, সন্তানাদি ধন-সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি রাজত্ব ইত্যাদি হচ্ছে দুদিকে ধার বিশিষ্ট তলোয়ারের মতো। মানুষ যদি এগুলোর দ্বারা সঠিক ও শুদ্ধ কাজ করে তাহলে এগুলো তার নিয়ামত হিসেবেই থাকে। আর যদি এগুলোর কারণে সে বিপর্যয় ও অশান্তির মধ্যে পতিত হয়, তাহলে এগুলো তার জন্য শাস্তির কারণ হয়ে থাকে। এমনিভাবে এ বিদ্যার মধ্যেও অপকারিতা ও উপকারিতা উভয় দিক নিহিত আছে। এ বিদ্যাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করে নেকী অর্জন করা যায়, আবার একে বিচ্ছিন্ন ও বিভেদ সৃষ্টির উপায় বানিয়ে পথ ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের হাতিয়ার তৈরী করা যেতে পারে। মানুষ যেহেতু স্বীয় দুর্বলতার কারণে আল্লাহ তাআলার দেয়া শক্তিকে বেশির ভাগ ভুল পথেই ব্যবহার করে থাকে সেজন্য ফেরেশতা একজন হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের মতো নিজ থেকে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রথমেই জানিয়ে দিতো যে, আমাদের এ বিদ্যা হচ্ছে, দু'দিকে ধার বিশিষ্ট এক তলোয়ারের মতো। কেউ এ বিদ্যা শিখে খারাপ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যেনো ব্যবহার না করে। অন্যথায় সে কুফরী ও শিরকীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

এখানে ফেরেশতাদের শিক্ষাদানের বিষয়টি এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে এটাই মনে হয় যে, এরা লোকদেরকে মানুষের রূপ ধারণ করে শিক্ষা দান করতো। প্রকৃত ব্যাপার যদি এটা হয় তাহলে এর মধ্যে কোনো বিশেষ জটিলতা নেই। খোদ কুরআনের মধ্যে এ ধরনের কতিপয় ঘটনার দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতারা মানুষের মধ্যে মানুষের আকৃতি ও ছুরতে আত্মপ্রকাশ করতো। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, আমল-তদবীরে আসক্ত ব্যক্তি কোনো বিশেষ ধরনের সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সাথে আধ্যাত্মিক ধরনের কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি করে এ বিদ্যা অর্জন করতো। যদি এর দ্বারা এ অর্থ নেয়া হয় তাহলে কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই, যা এর বিপরীত।

ইহুদীদের কাপুরুষচিত তামাশা

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ঃ অর্থাৎ ফেরেশতাদের উল্লেখিত সতর্কবাণী সত্ত্বেও লোকজন তাদের কাছ থেকে বিশেষ করে এমন ধরনের আমল শিখতে লাগলো যার মধ্যেমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা যায়। এ অংশ দ্বারা ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয়, তাদের কাপুরুষতা এবং হীনতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের ওই আমলের প্রতিই সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিলো যাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কর্তনের জন্য কাঁচির মতো ব্যবহার করা যেতো। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মযবুত

www.pathagar.com

সম্পর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত গোটা সমাজ ও সত্যতার ভিত্তি। যদি কোনো ধর্মীয় দল নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধিকে এ ভিত্তি উপড়িয়ে ফেলার কাজে লাগিয়ে দেয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, যে কাজটা সাধারণত শয়তান করে থাকে তা সে নিজেই করেছে। যে বিদ্যা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সে বিদ্যা দ্বারা সমাজের শুধু গুণ্ডা-বদমাইশ লোকদেরই উপকার হতে পারে। ঘৃণা ও ভালোবাসা উভয়ই সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো বিদ্যার এর চেয়ে ধ্বংসাত্মক ব্যবহার আর কিছু হতে পারে না। অথচ এর দ্বারা সঠিক কাজও করা যায়, যা দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করা যেতে পারে।

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ এ অংশটুকুও আনুসংগিক বাক্য হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ এসব আমল ও তদবীরের বিদ্যায় আসক্ত ব্যক্তিরা মনে করে এসব জিনিস স্বয়ং উপকারী এবং অপকারী। অথচ আসল ব্যপার তা নয়। শয়তানী আমলই হোক আর রূহানী আমলই হোক, এর দ্বারা যদি কারো উপকার হয়ে থাকে অথবা উপকার সাধন করা হয়ে থাকে তাহলে সেটা সম্পন্ন হয়ে থাকে শুধু আল্লাহর অনুমতি এবং ইচ্ছার অধীনে। এসব জিনিস নিজে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

উপকারিতা এবং অপকারিতা আল্লাহর ইচ্ছাধীন

এ আনুসংগিক বাক্য দ্বারা সেই তাওহীদ ও এখলাসকে নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে, যা সমগ্র কুরআনের শিক্ষার বুনিয়াদ বা ভিত্তি। তাওহীদবাদী লোকের জন্য এখান থেকে এ শিক্ষা অর্জিত হয় যে, আল্লাহর কিতাবের ওপর ঈমান রেখে প্রথমত এ ধরনের জিনিসের প্রতি কোনো আগ্রহই সে রাখবে না। দ্বিতীয়ত, এর মধ্য থেকে যদি কোনো জিনিস সে শিখেও ফেলে, তাহলে এটাকে স্বয়ং ক্রিয়াশীল মনে করবে না। তা ছাড়া এ ধরনের কোনো জিনিস দ্বারা যদি তার ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়, তবে সে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর কাছেই সাহায্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করবে। যাদু, টোনা, টোটকা, মন্ত্রতন্ত্র ও তাবীজ-তুমারের ফাঁদে আটকা পড়বে না।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ঃ এ অংশকুটু ঐ বিদ্যা শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক এবং মানসিক অধপতনকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। যে বিদ্যা তারা শিখছিলো তাতে উপকার ও অপকার দুটোরই ক্ষমতা নিহিত ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মানসিকতা এতই খারাপ ছিলো যে, ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। যাদের মধ্যে ভালবাসা আছে তাদের মধ্যে বিভক্তি ও বিদ্বেষের বীজ বপন করতো, যাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা আছে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতো। নিজেদের অসদুদ্দেশ্যের কারণে তারা এ বিদ্যার উপকারিতা একেবারেই নিঃশেষ করে দিয়েছিলো।

তাওরাতে যাদু বিদ্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ঃ অর্থাৎ ইহুদীরা একথা ভালভাবেই জানতো যে, যারা এ ধরনের ফেতনায় পতিত হয়েছে পরকালে তারা কিছুই

www.pathagar.com

পাবে না। তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় এসব জিনিসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে উপস্থিত হইবে তুমি তথাকার জাতিগণের ঘৃনার্হ কার্য্যের ন্যায় কার্য করিতে শিখিও না। তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে, বা গণক, বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা গুণী বা প্রেতাসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্য্যকারীকে ঘৃণা করেন ; আর সেই ঘৃণার্হ কার্য্য প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন।"–দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ৯-১২

হযরত মূসা (আ) তাদেরকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়ার পরও ইহুদীরা এ সমস্ত ঘৃণিত কাজগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তাদের আগ্রহ এ কাজের গতি এতোই বেড়ে গিয়েছিলো যে, তালুত যখন তাদের শাসক হলেন, তখন সমগ্র জাতিকে এ থেকে পবিত্র করা তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। যেমন ১-শমূয়েল ২৮ ঃ ৩ এর প্রমাণ আছে ঃ

"আর শৌল ভূতড়িয়া ও গুণীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।"

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۠

এ আয়াতকে ভাল করে বুঝতে হলে উপরোল্লিখিত ১০১ আয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ করেছে এবং যাদু, জ্যোতির্বিদ্যা, ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ ইত্যাদি ফেতনার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাবের ওপর তারা ঈমান আনতো, আর যেসব ফেতনার মধ্যে তারা নিমজ্জিত রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতো তাহলে তাদের পুরস্কার অনেক বড় হতো। কিন্তু তারা স্বীয় চরিত্রহীনতা এবং কাপুরুষতার কারণে যাদুবিদ্যার দোকানদারীকেই অনেক বড় জিনিস মনে করতো। আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের পুরস্কার কত বড়, তা তারা ধারণাও করতে পারে না। আফসোস! যদি তারা একথাকে অনুধাবন করতে পারতো।

৪৩. আয়াত ৯৭-১০৩ সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কথা

উপরোক্ত কয়েকটি আয়াতে এমন কিছু কথা রয়েছে যেগুলোর আরো অধিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন রয়েছে। যাতে ভাল করে স্মৃতিপটে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

ছোট গোমরাহী বড় গোমরাহীর দ্বার উন্মোচন করে দেয়

এক ঃ কোনো কোনো সময় একটি গোমরাহী কিংবা খারাপ আকীদার বিষয়টি বাহ্য দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ বলে মনে হয়। কিন্তু তার ভেতরে এত বেশী ভ্রষ্টতা এবং খারাপ

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণা লুকিয়ে থাকে যার দ্বারা মানুষের পুরো দীন এবং ঈমানের শিকড় উপড়ে যায়। ইহুদীরা কুরআনের বিরোধিতার কারণে বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ)-এরও বিরোধী হয়ে গিয়েছে। আর এ বিরোধিতাকে তারা খুবই সাধারণ বিষয় বলে ধরে নিয়েছে। কুরআন যখন এর গোপন রহস্য উন্মোচন করে দিলো, তখন জানা গেলো যে, জিবরাঈলের বিরোধিতা করা শুধু জিবরাঈলের বিরোধিতা নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা এবং তার সকল ফেরেশতাদের বিরেধিতা, এবং তাঁর রাসূলগণেরও বিরোধিতার শামিল। সেই সাথে তার বিরোধিতার একটি অবধারিত কুফলের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যা উল্লেখিত কুফলগুলোর চেয়েও অধিক মারাত্মক। আর তা হচ্ছে এই যে, যারা এমন কট্টর কাফের আল্লাহ, ফেরেশতা এবং নবী সকলেরই দুশমন, আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাদের বন্ধু হতে পারেন ? এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ধরনের কাফেরদের দুশমন। একটু চিন্তা করে দেখুন, ব্যাপারটা কোথা হতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই

দুই ঃ দ্বিতীয় কথাটি মূলত উপরোল্লেখিত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা, তাঁর সমুদয় ফেরেশতা এবং তাঁর নবী-রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। তাদের মধ্য থেকে কাউকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার অর্থ হচ্ছে সবাইকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। এমনিভাবে তাদের কারো সাথে দুশমনি করার অর্থ হচ্ছে সবার সাথেই দুশমনী করা। এ কারণেই মুসলমানদের আকীদায় বলা হয়েছে ঃ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ - البقرة : ২৮৫ (তাঁর রাসূলদের মাঝে আমরা কোনো প্রকার পার্থক্য করি না) আরো একটু চিন্তা করুন, তাহলে জানা যাবে যে, এ মূলনীতির ওপরই সে হাদীস প্রতিষ্ঠিত যে হাদীসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূল (স) জানিয়েছেন ঃ من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب (যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে দুশমনী করলো সে খোদ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলো।) এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেসব লোক আল্লাহকে জানে এবং মেনে চলে তারা মূলত ওই নীতি ও দলের সাথে সম্পর্ক রাখে। যার মধ্যে নবী-রাসূলগণ এবং ফেরেশতাকুল অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তাদের কারো সাথে দুশমনী করার অর্থ যেমন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তেমনিভাবে ন্যায়বান এবং নেককারগণের মধ্যে থেকে কারো সাথে দুশমনী করার অর্থও হচ্ছে পরোক্ষভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

আল্লাহর কিতাবের সাথে নির্ভেজাল সম্পর্কের জন্য শর্ত

তিন ঃ যাদু, মন্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, জ্বিন-ভূত উপস্থিত করার জ্ঞান, ফাল এবং গণনা ইত্যাদি বিষয়াদি যেমন মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর শরীআত থেকে বিপথগামী করে, এমনিভাবে বস্তু ও কথার আধ্যাত্মিক গুণাগুণ ও ফলাফল তথা তাবীজ-কবজ এবং ঝাঁড়-ফূঁক সংক্রান্ত বিদ্যাও মানুষের জন্য এক ধরনের ফেতনা, যা কিতাব ও শরীআত থেকে তাকে বিচ্যুত করে দেয়। আল্লাহর কিতাবের সাথে সঠিক, মযবুত ও দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টির উপায় এটাই যে, মানুষ শুধু যাদু ও যাদুবিদ্যা থেকেই দূরে থাকবে না বরং এ ধরনের

www.pathagar.com

অন্যান্য জিনিস থেকেও যথা সম্ভব দূরে থাকবে। মানুষ যখন আমল ও তাবীজের চক্করে ফেঁসে যায়, তখন ওইসব ফেতনার মধ্যে সে অবধারিতভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায় যে ব্যাপারে হারুত-মারুত সতর্ক করে দিয়েছিলো। অতপর ওইসব বিপর্যয় ও বিশৃংখলার আত্মপ্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, ইহুদীদের হাতে যার উদ্ভব ঘটেছিলো, এবং যার কারণে তারা আল্লাহর কিতাবের আলো প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো।

৪৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১০৪-১২১ আয়াত

আরবদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইহুদীদের অপতৎপরতা

মুসলমানদেরকে ইহুদীদের এমন কতিপয় কুকীর্তির কথা সামনের আলোচনায় অবগত করানো হয়েছে। যার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, তারা সাধারণভাবে বনী ইসমাঈল আর বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে কুরআন এবং নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবে। এ ব্যাপারে ইহুদীদের এমন কিছু অভিযোগ উল্লেখ করে এর জবাবও দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের অন্তরে বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির জন্য তারা পেশ করতো। এর সাথে সাথে এমন কিছু নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে যার ওপর আমল করে মুসলমানরা এসব ফেতনার মোকাবেলা করে সত্য পথে দৃঢ় থাকতে পারতো। ঘোষণা হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ
وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا
ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ
مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن
وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ
مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

www.pathagar.com

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ
وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا
أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾
بَلَىٰ ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ
شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَٰرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ
الْكِتَٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن
مَّنَعَ مَسَٰجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ ۚ أُولَٰٓئِكَ مَا كَانَ
لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْءَاخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ
مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَٰوَٰتِ

وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم
مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا
أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَن
تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ
هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা 'রায়ি'না' বলো না, তোমরা 'উনযুরনা' বলো, আর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১০৫. যারা কুফরী করেছে তারা আহলে কিতাব হোক অথবা মুশরিক হোক, তারা চায়না যে তোমাদের ওপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো রহমত অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। তিনি পরম করুণাময়।

১০৬. আমি যে কোনো আয়াতই রহিত করে দেই অথবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম অথবা তার মতোই অন্য আয়াত তৎপরিবর্তে নিয়ে আসি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান? ১০৭. তোমাদের কি জানা নেই যে, আসমান এবং যমীনের একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধুও নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।

১০৮. তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের রাসূলকে এমন ধরনের প্রশ্ন করবে যে ধরনের প্রশ্ন ইতিপূর্বে মূসাকে করা হয়েছিলো? যেসব লোক ঈমানকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নেয়, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। ১০৯. বহুসংখ্যক

www.pathagar.com

আহলে কিতাব চায় যে, তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর তোমাদেরকে পুনরায় কুফরীর অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে শুধু তাদের হিংসা আর বিদ্বেষের কারণে এবং সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদেরকে তোমরা মার্জনা করো এবং ক্ষমা করো সেই সময় পর্যন্ত যখন আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে স্বীয় ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ সকল জিনিসের ওপর সর্বশক্তিমান। ১১০. তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো। তোমরা তোমাদের জন্য যে সৎকাজ করবে, আল্লাহর কাছে তা সংরক্ষিত পাবে। যা তোমরা করছো, আল্লাহ তাআলা দেখতে পাচ্ছেন।

১১১. তারা বলে ঃ ইহুদী এবং নাসারা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা মাত্র। আপনি বলে দিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে একথার পক্ষে প্রমাণ পেশ করো। ১১২. হ্যাঁ, নিসন্দেহে যে ব্যক্তি নিজেকে স্বীয় রবের কাছে সপে দিয়েছে এবং সঠিক আমল করেছে, সে ব্যক্তির পুরস্কার তার রবের কাছে নির্ধারিত রয়েছে। তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ১১৩. ইহুদীরা বলেছে খৃস্টানদের কোনো ভিত্তিই নেই, আবার খৃস্টানরা বলেছে ইহুদীদের কোনো ভিত্তি নেই। এ উভয় সম্প্রদায়ই (আল্লাহর) কিতাব তেলাওয়াত করে। এ ধরনের ওইসব লোকেরাও বলেছিলো যাদের কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তারা যে ব্যাপারে ঝগড়া করছে, সে ব্যাপারে মীমাংসা করবেন।

১১৪. তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মাসজিদকে আল্লাহর যিকির হওয়া থেকে বঞ্চিত করে এবং এগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে। এদের জন্য মসজিদসমূহে প্রবেশ করা ঠিক নয়, তবে ভীত অবস্থায় (প্রবেশ করতে পারে)। ওদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতি একমাত্র আল্লাহই। তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও আল্লাহ তাআলা সেদিকেই বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

১১৬. তারা বলে, আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব বিষয় থেকে পবিত্র। বরং আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সবই তাঁর ফরমাবরদার। ১১৭. তিনি আকাশ ও যমীনের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে লক্ষ্য করে শুধু বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

১১৮. যাদের জ্ঞান নেই তারা বলে, আল্লাহ তাআলা কেনো আমাদের সাথে কথা বলেন না ? অথবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে না কেনো ? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও তাদের অনুরূপ কথাই বলতো। তাদের অন্তর একই রকম। যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তাদের জন্য আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছি। ১১৯. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্য দীনসহ সুসংবাদদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আর জাহান্নামী লোকদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না।

১২০. ইহুদী এবং খৃস্টানরা আপনার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর প্রদর্শিত পথই আসল পথ। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলেন, সেই প্রকৃত জ্ঞানের পর যা আপনার কাছে এসেছে, তাহলে আল্লাহর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য না থাকবে আপনার জন্য কোনো বন্ধু, না থাকবে কোনো সাহায্যকারী।

১২১. আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই এর প্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৪৫. শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১০৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

راعنا-এর ভাবার্থ

مراعات،راعنا থেকে امر এর صيغه হয়েছে। যদি مخاطب (যাকে সম্বোধন করা হলো) বক্তার [متكلم] কথা ভালভাবে শুনতে না পেয়ে থাকে অথবা বুঝে না থাকে, তাহলে পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী বক্তাকে راعنا অর্থাৎ 'আমার প্রতি মনোযোগ দাও' কথাটা বলে থাকে। যেমনিভাবে ইংরেজীতে আছে (I beg your pordon) আরবীতে এরকম স্থানের জন্য انظرنا শব্দটিও ব্যবহৃত হয় যা نظر থেকে امر এর صيغه হয়ে থাকে, যার অর্থ একটু দৃষ্টি দিন, একটু থামুন, একটু অপেক্ষা করুন ইত্যাদি।

রাসূল (স)-এর মজলিসে ইহুদীদের দুর্বৃত্তপনা

ওপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, এখানে ইহুদীদের ওইসব খারাপ আচরণ ও দুষ্টামীর ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যা তারা রাসূল (স) এবং কুরআনের বিরুদ্ধে এজন্য করতো যাতে তাঁরা নিজেদের অন্তরের বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। আর যদি পারা যায় মুসলমানদেরকে ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবে। কথার ধরন ও পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা জানা যায় যে, কিছু কিছু ইহুদী শুধুমাত্র মুনাফিকীর উদ্দেশ্যেই

www.pathagar.com

রাসূল (স)-এর মজলিসে অংশগ্রহণ করতো এবং মজলিস থেকে উপকার লাভের আগ্রহ এবং শিক্ষালাভের প্রতি প্রবল ইচ্ছা ব্যক্ত করতো আর বারবার رَاعِنَا শব্দ উচ্চারণ করতো যাতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে এ রকম ধারণা দিতে পারে যে, এরা খুবই জ্ঞান পিপাসু এবং অতি বিদ্যোৎসাহী লোক। অথচ এরা এ শব্দটিকে শুধুমাত্র এজন্য ব্যবহার করতো যে জিহ্বাকে কিছুটা বিকৃত করে রাসূল (স)-কে অপমানিত করার একটা দিক তৈরী করা যেতো। رَاعِنَا কে কিছু নিচের দিকে দাবিয়ে উচ্চারণ করলে খুবই সহজেই رَاعِيْنَا হয়ে যায়, যার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের রাখাল। ইহুদীদের এ দুষ্টামীর কথা কুরআন মজীদের অন্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে। مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ "ইহুদীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বাক্যকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেদের জিহ্বাকে বিকৃত করে বলে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এবং رَاعِنَا এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ দুষ্টামী رَاعِنَا শব্দের মধ্যে জিহ্বাকে বিকৃত করে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এমনিভাবে عَصَيْنَا কে এমনভাবে উচ্চারণ করতো যে শ্রবণকারীরা ধোঁকা খেয়ে ভাবতো ওরা اَطَعْنَا বলেছে। আর اَسْمَعْ বলার সময় জিহ্বাকে কিছুটা দাবিয়ে চুপে চুপে غَيْرَ مُسْمَعٍ অর্থাৎ ওনার অশ্রাব্য কথাগুলো একটু শ্রবণ করো। এ দুষ্টমীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেমনটি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলাম এবং রাসূল (স)-কে অপমানিত করা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা।

ওপরের বর্ণনা মোতাবেক ইহুদীরা এ বিদ্রূপ করতো নিজেদের অন্তরে আক্রোশ প্রকাশ করার জন্য রাসূল (স)-কে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে রাসূল (স)-কে খাট করার অসদুদ্দেশ্যে।

শব্দাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট এক মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের তাৎপর্য

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ শব্দকেই মুসলমানদের মজলিসি শব্দ হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন এবং এর স্থানে একই ভাষার অন্য একটি পরিচিত শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন যা বিদ্রূপের দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলো। শব্দাবলীর ব্যাপারে এ মনস্তাত্ত্বিক রহস্যটি জানা থাকা প্রয়োজন যে, যদি কোনো শব্দের মধ্যে কোনো খারাপ অর্থ নিহিত থাকে অথবা অপব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ শব্দের ব্যবহার বর্জন করাই নিরাপদ। অন্যথায় এগুলোর বিষক্রিয়া অজান্তেই শব্দগুলো যারা বলবে এবং শুনবে তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে। মুসলমানদেরকে এর সংক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা رَاعِنَا ব্যবহার করা নিষেধ করে দিয়েছেন।

অতপর এর আরো একটি উপকারিতা রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, رَاعِنَا শব্দের নিষেধাজ্ঞা আর اُنْظُرْنَا শব্দের অনুমতি নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিকদের মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী আলামত তৈরী করে দিয়েছে। সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার পর এটা

www.pathagar.com

দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মজলিসে নববীতে এ শব্দ ব্যবহারের ধৃষ্টতা একমাত্র তারাই দেখাতে পারতো, যাদের অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ বাষ্পে এমনভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, এটাকে দমন করার কোনো শক্তিই তাদের নেই।

এ আয়াতে ।اسمعوا। শব্দটি এর পূর্ণ এবং আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মনোযোগের সাথে নবীর কথা শ্রবণ করো। এবং তা অনুধাবন করো, যাতে তোমাদের পক্ষ থেকে বারবার নবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনই না পড়ে। এখানে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই মর্মেও করা হয়েছে যে, ইহুদীরা নবীর মজলিসে কথা শোনার জন্যও আসে না, বুঝার জন্যও আসে না। বরং তারা আসে এজন্য যে, সুযোগ বুঝে رَاعِنَا শব্দের ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজেদের মনের ঝাল ঝাড়বে।

আয়াত ঃ ১০৫

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

বিরোধীদের গোপন মানসিকতার ওপর আলোকপাত

এ আয়াত বিরোধীদের গোপন মানসিকতার চিত্র তুলে ধরেছে। মুসলমানদেরকে লক্ষ করে এখানে বলা হয়েছে যে, আসল ব্যাপার শুধু একটি শব্দ ব্যবহার করা আর না করা নয়, বরং ব্যাপার হচ্ছে এসব ইহুদী আর মুশরিক উভয়ই ক্রোধ আর হিংসায় জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তারা ভেবেই পাচ্ছে না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মহা কল্যাণের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা তোমরা কিভাবে পেলে। তারাতো মনে করে সমস্ত কল্যাণ ও সম্মানের একচেটিয়া উত্তরাধিকারী শুধু তারাই। তোমাদের মতো চালচুলো বিহিন নিস্ব গরীব মুসলমানরা নও। কিন্তু যখন তারা দেখতে লাগলো যে, এতদ্বসত্ত্বেও তোমাদের দিকেই কল্যাণকর সব বড় বড় উত্তরাধিকার চলে আসছে আর তোমরাও তার বাহক হতে যাচ্ছো। তখনই তারা এ ধরনের হীন তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমাদের দৃষ্টিতে ইসলাম এবং শেষ যমানার নবীর ইজ্জত ও সম্মানে যেনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়। যাতে তারা যেভাবে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে তোমরাও যেনো তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাও। তোমরা তাদের এ ছল-চাতুরী থেকে সাবধান হয়ে যাও। তোমরা তাদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদেরই দুরাশা পূরণের হাতিয়ার হয়ো না। অতপর আল্লাহ এরশাদ করেছেন,,আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমত ও করুণার ইজারাদারী ইহুদীদেরকেও বানাননি, কুরাইশ সরদারগণকেও বানাননি। বরং স্বীয় রহমত ও করুণার একচ্ছত্র মালিক ও অধিকারী তিনি নিজেই। তিনিই তাঁর ন্যায়নীতি ও হিকমতের দাবী মোতাবেক যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তার করুণা দ্বারা ধন্য করেন।

www.pathagar.com

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

نَنْسَخْ -এর তাৎপর্য

نَنْسَخْ -এর আসল অর্থ হচ্ছে সরিয়ে দেয়া এবং মুছে ফেলা। কুরআন মজীদে আছে ঃ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ـ الحج : ٥٢ (আল্লাহ সরিয়ে দেন ওই জিনিসকে যা শয়তান ঢুকিয়ে দেয়। অতপর আল্লাহ তাআলা আয়াতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন।) এখানে এ শব্দটি একটি আইনকে সরিয়ে তার স্থানে অন্য একটি আইন আনার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। انساء এর অর্থ ভুলিয়ে দেয়া।

ইহুদীদের কুমন্ত্রণা খণ্ডন

মুসলমানদের অন্তরে ইহুদীরা এ কুমন্ত্রণা দিতো যে, কুরআন যখন হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহর নবী আর তাওরাতকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তাওরাতের বিধি-বিধানের রদ-বদল করার অর্থ কি ? আল্লাহ কি তাঁর নিজের তৈরী আইন-কানুন নিজ হাতেই পরিবর্তন করেন ? এখন কি অভিজ্ঞতার পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের ভুল-ত্রুটি ধরা পড়তে শুরু করেছে ? আর তিনি এগুলো কি সংশোধন করেছেন ?

এ ধরনের আপত্তি তুলে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে কুরআন এবং রাসূল (স)-এর ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছিল। কুরআন তাদেরকে এ জবাব দিয়েছে যে, তাওরাতের যেসব বিধি-বিধান রহিত করা হচ্ছে। এমনিভাবে তাওরাতের যেসব আইন-কানুন ইহুদীরা মুছে ফেলেছিলো সেগুলোর নবায়ন করা হচ্ছে। আর যদি নবায়ন করা না হয়, এবং তা বাদ দেয়া হয়, তবে এগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নতুন বিধি-বিধান দেয়া হয়। অর্থাৎ এ পরিবর্তন দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাগণকে এক দিকে ভাল থেকে অধিক ভালর দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছেন অপর দিকে দীনের যে সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছিলো তার পরিবর্তে দীনের ভাণ্ডারকে নতুন সম্পদে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনোটাই এমন নয় যা প্রতিবাদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ঃ এ সম্বোধনটি একটি সাধারণ সম্বোধন। এটি তাদের জন্যও হতে পারে যারা কুমন্ত্রণার কাজে লিপ্ত ছিলো। আবার তাদের জন্যও হতে পারে যারা কুমন্ত্রণায় প্রভাবান্বিত হচ্ছিলো। এদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে শরীআত দান করে তিনি স্বীয় শক্তি ও কর্তৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করে বসেছিলেন যে, তিনি দুনিয়াতে আর কাউকে শরীআত দান করবেন না, তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধনও করবেন না, তার মধ্যে কোনো সংস্কারও সাধন করবেন না—এমনকি তারা যদি এটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে রেখেও দেয়। বরং তিনি স্বীয়

www.pathagar.com

নীতি মোতাবেক তাঁর কর্তৃত্বে সম্পূর্ণরূপে বহাল আছেন। তিনি তাঁর কৌশল অনুযায়ী স্বীয় কর্তৃত্বকে এখনো কাজে লাগাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও লাগাবেন।

আয়াত ঃ ১০৭

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

জবাবের একটি বিশেষ দিক

এখানেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে যাদেরকে ওপরের আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। অবশ্য জবাবের মধ্যে ওই মানসিকতার প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে যা উপরোক্ত প্রশ্নের পিছনে লুক্কায়িত ছিলো। তার কিছু বিস্তারিত আলোচনা আগেই এসে গিয়েছে। ইহুদীরা আয়াতের نسخ (রহিত করণ) এর কথা বলে সাধারণ লোকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছিলো তার আসল রূপ ছিলো এই যে, তারা একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, এ তাওরাতের কিছু নির্দেশনাবলী রহিত হওয়া এবং তার স্থলে অন্য নির্দেশ চলে আসা শুধু তাওরাতের কিছু নির্দেশ রহিত করণকেই বুঝায় না, বরং তার মধ্যে ইহুদীদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে তাদের স্থানে অন্য জাতিকে তাদের স্থানে বসানোর সিদ্ধান্তের বার্তাও এর মধ্যে নিহিত আছে। মূলত এ জিনিসেরই দুশ্চিন্তা আর ক্রোধ তাদেরকে দিশেহারা করে দিচ্ছিল এবং এটা প্রকাশ করার জন্যই রহিতকরণের প্রশ্নটিকে তারা একটি পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলো। কুরআন এ পর্দাকে উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ জবাব দিয়েছে যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব ও কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার কাছ থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেন আবার যাকে চান তাকে কর্তৃত্ব দান করেন। এখন যদি তোমরা সেই পদমর্যাদার অযোগ্য প্রমাণিত হও যে পদমর্যাদা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দান করেছিলেন, তাহলে তাঁর হেকমত ও নীতির দাবী হচ্ছে যে, তোমাদের স্থানে অন্য কাউকে এ মর্যাদা দান করবেন। তোমাদের দুশ্চিন্তা এবং ক্রোধ সত্ত্বেও এ রকম হতে থাকবে। আর আল্লাহ তাআলার এ ফায়সালা থেকে তোমাদের কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না।

আয়াত ঃ ১০৮

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

سوال শব্দের ভাবার্থ

'سوال' শব্দের কয়েকটি ভাবার্থ রয়েছে। যেমন ঃ প্রার্থনা করা, দরখাস্ত করা, দাবী করা, জিজ্ঞেস করা, চাওয়া, প্রশ্ন করা। سوال কোনো কোনো অবস্থায় প্রতিবাদের আকারেও

www.pathagar.com

হয়ে থাকে। এজন্য এর ভাবার্থের মধ্যে প্রতিবাদ করাও অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো অবস্থায় বিশ্লেষণের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় এর ব্যবহার 'عَنْ' অব্যয় যোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কোনো অবস্থায় 'ســــوال' শব্দটি ঠাট্টা-বিদ্রূপ আকারেও এসে থাকে। এমতাবস্থায় এর ব্যবহার 'بِ' অব্যয় যোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, سَـاَلَ سَـائِـلٌ بِعَـذَابٍ وَّاقِعٍ "(এক বিদ্রূপকারী বিদ্রূপ করলো অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে।–সূরা মাআরিজ ঃ ১) কুরআন মজীদে এ শব্দটি উপরোল্লিখত সব কটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রতিবাদ অর্থে ســــوال শব্দটি যে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান আয়াতের বক্তব্যই তার প্রমাণ।

মুসলমানদের প্রতি একটি সতর্কবাণী

এখানে যেসব দুর্বল মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা ইহুদীদের উত্থাপিত প্রশ্নের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে প্রশ্নগুলো পেশ করতো এবং এভাবেই প্রশ্নগুলো উপস্থাপন ও প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীদের প্রতিনিধিত্ব করতো। কুরআন মজীদ প্রশ্নের উত্তর ওপরেই দিয়ে দিয়েছে। যাতে ইহুদীদের অপপ্রচারের জবাব হয়ে যায়। ওপরের আয়াতে যেমনিভাবে ইহুদীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীদের প্রতিনিধিদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নগুলো এর অন্তর্নিহিত মানসিকতা ও প্রকৃতিগত বিবেচনায় সেসব প্রমাণকারী অন্তর্ভুক্ত ছিলো যেগুলো ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)-কে করেছিলো। এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হেদায়াত ও ঈমানের লক্ষণ নয়। বরং ঈমানকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করার লক্ষণ। যেসব লোক এ নীতি গ্রহণ করে তারা ইহুদীদের মতোই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

এ প্রশ্নের অন্তরালে মূলত ইহুদীরাই সক্রিয় ছিলো। এ কারণেই কুরআন বলেছে, এ ধরনের প্রশ্নাবলী ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ)-কে করা হয়েছিলো। অত্যন্ত লালিত্যপূর্ণ ভাষায় সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে অজ্ঞ নন।

আয়াত ঃ ১০৯

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

এখানে আরো সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, ইহুদীদের এ অব্যাহত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে ঈমানের পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহীর পথে নিয়ে যাওয়া। তোমরা এটা কখনো মনে করো না যে, তাদের এ দৌড়-ঝাপ তোমাদের কল্যাণের জন্য

www.pathagar.com

অথবা তোমাদের সাবেক ধর্মকে তারা সত্য বলে মনে করে, তাই তারা তারই সমর্থন করছে। অথবা ইসলামের ব্যাপারে তাদের কোনো ভুল বুঝাবুঝি আছে বলে এসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এবং তাদের এ অপচেষ্টা শুধু হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে, যা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অথচ ইসলাম সত্য হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

এ সতর্কতা এজন্যই প্রয়োজন ছিলো যে, কিছু কিছু সৎ ও নেক অন্তর বিশিষ্ট মুসলমান এ ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারতো যে, এসব আহলে কিতাব শুধু তাদের কল্যাণ কামনার্থে অথবা একটি ধর্মীয় খেদমত হিসেবে তাদের ঈমানের ব্যাপারে এতটুকু ব্যাকুলতা অনুভব করছে। কুরআন এ ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে বলেছে, এসব কিছুর কারণ শুধু حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ (তাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।) অর্থাৎ এসব প্রচেষ্টা তাদের দীনী আবেগের কারণে নয়, বরং তাদের অন্তরের উপচে পড়া হিংসা-বিদ্বেষের বিষফল মাত্র।

ইহুদীদের প্রতি হুশিয়ারী

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ঃ এর একটি অর্থ হচ্ছে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কাউকে উপেক্ষা করা। যেমন ঃ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ـ المائدة : ١٥ – "তোমাদের জন্য এমন অনেক বিষয় বর্ণনা করেন যা তোমরা কিতাবের মধ্য থেকে গোপন করো আবার অনেক জিনিসকে তিনি উপেক্ষা করেন।" صفح -এর অর্থ হচ্ছে দেখেও না দেখার ভান করা এবং উপেক্ষা করা।

কোনো কবি বীরদর্পে বলেন ঃ

صفحنا عن بنى ذهل   وقلنا القوم اخوان

"আমরা বনী যাহলের অত্যাচারকে উপেক্ষা করেছি আর মনে মনে বলেছি যে, এরা তো আমাদেরই ভাই।"

আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কিছু দিনের জন্য তোমরা ইহুদীদের দুষ্টামীকে উপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে কোনো ফায়সালা দেন। এ পূরো আয়াতটি ইহুদীদের জন্য হুঁশিয়ারী এবং শাস্তি প্রদানের ঘোষণা। আর بِاَمْرِهٖ -এর মধ্যে ওইসব ব্যাপার লুকিয়ে আছে যা পরবর্তীতে যুদ্ধের নির্দেশ, তাদের পরাজয়, তাদেরকে হত্যা এবং দেশ থেকে বহিষ্কার, জিযিয়া আদায় ইত্যাদি আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১১০

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

বিরোধীদের বিরোধিতার দাওয়াই

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতার দাওয়াই বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি এসব ফেতনার ওপর বিজয় অর্জন করতে চাও তাহলে নামায কায়েম করো। যাকাত আদায় করো। এর মাধ্যমে তোমাদের আত্মিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ হবে, এর ফলে একদিকে বিরোধীদের কুমন্ত্রণা থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে। অপর দিকে এ নামায ও যাকাত তোমাদেরকে সামষ্টিক আকারে এমন এক মজবুত প্রাচীর বানিয়ে দেবে যে, কোনো শক্তিই তখন তোমাদেরকে হেলাতে পারবে না। কুরআনের মধ্যে নামায এবং যাকাতকে সমস্ত দীনের ভিত্তি সমস্ত প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের মূল এবং সমস্ত শক্তির আধার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত জিনিসকে এর অনুযায়ী বলা হয়েছে। মক্কী সূরাগুলোতে যেখানে রাসূল (স)-কে সমস্ত দুশমনদের মোকাবেলায় ধৈর্য এবং দৃঢ়তার শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেখানে নামাযের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ সূরা বাকারাতেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পর যখন বিরোধিতার ঝড় উঠলো, তখন বলা হয়েছে ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - البقرة : ١٥٣ "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের সাথে আছেন।" এমনিভাবে যেসব লোক মযবুত প্রশিক্ষণ ছাড়া জিহাদ এবং যুদ্ধের জন্য তাড়াহুড়ো করছিলো তাদেরকে নামায এবং যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষণের জন্য হেদায়াত দেয়া হয়েছে ঃ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "এখন তোমাদের হাতকে থামাও এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো।" সূরা হাজ্জে মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়ার পর হেদায়াত দেয়া হয়েছে ঃ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ "অতএব তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো।" একই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে নামায এবং যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো আলোচনা সামনে আসবে।

আয়াত ঃ ১১১

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

هُوْدٌ، هَائِدٌ -এর বহুবচন। এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ৬২ আয়াতে অতিক্রান্ত হয়েছে।

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ইহুদী-নাসারাদের যৌথ প্রচারণা

'نَسْخٌ' রহিত করণের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ যেমনিভাবে মুসলমানদের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য উত্থাপন করা হয়েছিলো এমনিভাবে ইহুদী ও নাসারাদের পক্ষ থেকে এ প্রচারণাও চালানো হয়েছে যে, নাজাত লাভের যদি কোনো পথ থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ইহুদীবাদ এবং খৃস্টবাদ গ্রহণ করা। কারণ এ উভয়টাই আল্লাহর দীন। এসব দীন থাকা অবস্থায় কোনো নতুন দীনের প্রয়োজনও নেই অবকাশও নেই।

ইহুদী নাসারাগণ ভিতরে ভিতরে পরস্পরের দুশমন ছিলো। কিন্তু জানা যায় যে, ইসলামের বিরোধিতা করার জন্য তারা পরস্পরে বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো। উভয়ে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিলো এবং এক জবান হয়ে এ প্রচারণা করছিলো যে, যে ব্যক্তি নাজাত চায় সে যেনো ইহুদী অথবা নাসারা হয়ে যায়। এ নতুন দীনের মধ্যে ভালোর কি আছে? এটা তো শুধু একটা ফেতনা।

ইহুদীরা ইসলামের বিরোধিতার জন্য খৃস্টানদের প্রতি যে উদার মনোভাব অবলম্বন করেছিল তা মুশরিকদের সাথেও অবলম্বন করেছিল। খৃস্টানরা তো তাদের ভাই ব্রাদার ছিলই। কুরআন মজীদে সত্যের সাথে তাদের এ শত্রুতার কথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا - النساء : ٥١ – "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদের আল্লাহর কিতাবের অংশ দান করা হয়েছে? তারা মূর্তি এবং তাগূতের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর কাফেরদের ব্যাপারে বলে যে, এরা ঈমানদার লোকদের চেয়ে অধিক হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।"

এ প্রচারণা সম্ভবত এ কারণে আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকবে যে, আরববাসীরা আহলে কিতাবের ব্যাপারে প্রথম থেকেই একটা ভাল ধারণা পোষণ করেছিলো। এছাড়াও তারা তাদের সমর্থনে একথাও বলে থাকে, ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ যে আল্লাহর দীন সে কথা তো কুরআনও অস্বীকার করেনি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন এর বিস্তারিত বর্ণনাসহ জবাব দিয়েছে। কুরআন বলছে, تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ এটা তাদের একটা ভিত্তিহীন আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ এটা তাদের শুধুমাত্র মনগড়া কথা যা তারা কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই শুধু তাদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মন থেকে বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইহুদীবাদ এবং খৃস্টবাদ কোনোটার জন্যই পরোয়ানা জারি করেননি, যে কেউ নাসারা অথবা ইহুদী হয়ে গেলেই তার জন্য জান্নাত অবধারিত। যদি তারা একথার দাবী করে তাহলে তারা যেনো তাদের দাবী সত্যতার পক্ষে তাদের কিতাব থেকে কোনো প্রমাণ পেশ করে। তারা এ ধরনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে দীন ও আকীদা বানিয়ে কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই অন্তরে লালন করছিলো। কুরআন যদিও এখানে

একটির উল্লেখ করেছে, কিন্তু বহুবচন বিশিষ্ট শব্দাবলী ব্যবহার করে সবগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা এ সূরারই ৭৮-৮১ আয়াতের ব্যাখ্যায় اَمَانِىٌّ (আকাঙ্ক্ষা)-এর বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছি।

আয়াত ৪ ১১২

بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

নাজাতের আসল পথ

অর্থাৎ নাজাত প্রাপ্ত এবং জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্য ইহুদী কিংবা নাসারা হওয়া শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে মানুষকে জান্নাতে যেতে হলে তাকে মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে। ইসলামের অর্থ হচ্ছে, একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিবে। ইসলামের নবী এবং রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে নিজের পূর্ণ জিন্দেগীকে আল্লাহর শরীআতের অনুগামী বানিয়ে দিবে। এহসান [احسان]-এর ভাবার্থ হচ্ছে শরীআতের নিদর্শনাবলীকে পূর্ণ একনিষ্ঠতা, আমানতদারী, পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে পালন করবে। যেসব লোক এভাবে আল্লাহর বন্দেগী এবং তাঁর আনুগত্যের হক আদায় করবে, তাদের জন্য তাদের রবের পক্ষ থেকে রয়েছে পুরস্কার। এসব লোকদের জন্য না থাকবে কোনো ভয়, না থাকবে কোনো দুশ্চিন্তা। এটাই হচ্ছে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা। আর এটাই হচ্ছে বিবেক ও স্বভাবের দাবী।

এ পুরো বিষয়টা এ সূরারই ৭৮-৮১ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে আমরা এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি।

আয়াত ৪ ১১৩

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

ইহুদী এবং নাসারাদের পারস্পরিক তর্ক যুদ্ধ

অর্থাৎ ইসলামের বিরোধিতার জন্য যদিও ইহুদী এবং নাসারা একই প্লাটফর্মে একত্রিত হয়ে গিয়েছে এবং একে অপরকে খুব গর্বের সাথে নাজাত প্রাপ্ত এবং জান্নাতী

বলে ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু এ প্লাটফর্মের বাইরে তাদের পরস্পরকে কাফের ও ফাসেক ফতোয়া দেয়া এবং তর্কযুদ্ধের অবস্থা হচ্ছে এই যে, ইহুদীরা নাসারাদের কোনো ভিত্তি আছে বলে স্বীকার করে না। আর খৃষ্টানরাও ইহুদীদের কোনো ভিত্তি আছে বলে স্বীকার করে না। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করার দাবী করে। তাওরাত হচ্ছে তাদের যৌথ কিতাব। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আজ তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা মূলত দীনের হেফাজতের জন্য নয় এবং কোনো সততা ও নেক নিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং এ বন্ধুত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (যারা জ্ঞান রাখে না) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বনী ইসমাঈলের মধ্য থেকে যারা শিরকে লিপ্ত তারা। কেননা তারা কিতাব ও শরীআতের ব্যাপারে উদাসীন ও অজ্ঞ ছিলো তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এরাও ওদের মতোই কথা বলেছে। অর্থাৎ এরাও নিজেদেরকে ছাড়া বাকী সবাইকে বাতিল (না হক) বলে মনে করে। কিন্তু ইসলামের বিরোধিতার জন্য এরাও প্রচারণার যৌথ প্লাটফর্মে শামিল হয়েছে। তারা একই কিতাবের ও আমলের দাবীদার হয়ে দীনের এ খেদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছে আর কোনো জ্ঞান ছাড়া তাদের দলভুক্ত হয়ে গিয়েছে كَذٰلِكَ এবং مِثْلَ قَوْلِهِمْ এ শব্দ দুটির বাহ্য দৃষ্টিতে একই অর্থবোধক মনে হচ্ছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দু'টি মর্মার্থ বেরিয়ে আসবে। একটি দ্বারা আন্দোলিত করা এবং অনুপ্রাণিত করার সম্মিলিতভাব প্রকাশ পায়, আর অপরটি দ্বারা অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এরাও নিয়ত এবং আমল উভয় ক্ষেত্রে ইহুদী ও নাসারাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে।

পরিশেষে ধমকের ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাদের এ ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা এখন আখেরাতে আল্লাহর আদালতে নিষ্পন্ন হবে। এখানে রাসূল (স)-এর জন্য এ সান্ত্বনার বাণীও রয়েছে যে, আপনি এ ঝগড়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র হকের তাবলীগ বা প্রচারের দায়িত্ব পালনকারী। এর অতিরিক্ত আপনার ওপর আর কোনো দায়িত্ব নেই।

আয়াত ঃ ১১৪

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ط اُولٰۤئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَاۤئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

একের উপাসনালয় অপর কর্তৃক ধ্বংস সাধন

এখানে জান্নাতের দাবীদার এ আহলে কিতাবের সেই কার্যকলাপের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কাজ শুধুমাত্র পারস্পরিক বিরোধিতা দুশমনির কারণেই তারা করতো। এর ফলে তারা একে অপরের উপাসনালয়কে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত থাকতো, ইতিহাস

www.pathagar.com

থেকে প্রমাণিত যে, ইহুদী এবং নাসারাদের মধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে একে অপরের যিকির এবং ইবাদাত বাধাগ্রস্ত করার জন্য বহু খুন-খারাবী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিলো। এর বাইরেও যেখানে এবং যখনই কারো কোনো সুযোগ মিলেছে, তখনই তারা প্রতিপক্ষের উপাসনালয়কে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে। এছাড়াও ইতিহাস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, খৃস্টানরা যেসব লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহতে আসতো তাদেরকে বাধা প্রদান করার জন্য বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন তারা ব্যর্থ হলো তখনই আবরাহা মক্কার ওপর চড়াও হয়েছে এবং কা'বাঘর ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। এ অন্যায় ও পাপ কর্মের জন্য তার এবং তার সৈন্যদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছে।

এসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। আর তা হচ্ছে এই যে, যেসব লোক বর্তমানে ইসলামের বিরোধিতায় একাত্মতায় পরিণত হয়ে গিয়েছে, তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও গোঁড়ামীর অবস্থাটা কি এবং নাজাতের এসব ঠিকাদারদের কার্যকলাপ মসজিদের ব্যাপারে কতটুকু হীন ও জঘন্য ছিলো। এর সাথে সাথে আল্লাহর মসজিদের মর্যাদা ও সম্মান সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় যালিম হচ্ছে সেসব তাকওয়া ও হেদায়াতের দাবীদার যারা আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর যিকিরকারীদেরকে বাধা প্রদান করে আর মসজিদগুলোকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করে। যে ঘর আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্মিত হয়েছে সেটাই আল্লাহর ঘর, কারো জন্য এটা বৈধ নয় আল্লাহর ঘরের মধ্যে এরই ধ্বংসের জন্য দাম্ভিকতার সাথে প্রবেশ করে। আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করার জন্য একটিমাত্র পন্থা আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তিই এ ঘরে প্রবেশ করবে সে ভয়ে ভয়ে এবং বিনম্রভাবে প্রবেশ করবে। যারাই এ নীতির বিপরীত করবে তাদের জন্য বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে অপমান ও লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

আল্লাহর মসজিদসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ নীতির কারণেই ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তাদের গীর্জা ও উপাসনালয়-গুলো ধ্বংস করা কিংবা অবমাননা করার অনুমতি মুসলমানদেরকে দেয়া হয়নি। এ বিষয়টি বিশেষ করে সেসব মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনার বিষয় যারা শুধু দলীয় গোঁড়ামীর কারণে সামান্য ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিজ নিজ মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করে এবং কোনো কোনো সময় ভিন্ন মত পোষণকারীদের মসজিদগুলোর অবমাননার পর্যন্ত প্রয়াস চালায়।

আয়াত ৪ ১১৫

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ

এখানে ঝগড়া-বিবাদ এবং মতবিরোধের সেই কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ইহুদী এবং নাসারাদের মধ্যে উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহের অবমাননা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নাসারা এবং ইহুদীদের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস ছিলো। কিন্তু নাসারাগণ বিশেষ করে এর পূর্বাংশকে নিজেদের কেবলা হিসেবে নির্বাচিত করে নিয়েছিলো। সম্ভবত এটা এ কারণে হয়েছিলো যে, এটি ছিলো বাইতুল মুকাদ্দাসের সেই অংশ যখানে হযরত মরিয়ম (আ) এ'তেকাফ করেছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের তৎকালীন নকশা থেকেও জানা যায় যে, ওই অংশটিই মহিলাদের ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। এটাই ছিলো বিবাদের দিক, আর কুরআন থেকেও এ রকমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূরা মরিয়মে বর্ণনা করা হয়েছে وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا –"এ কিতাবে মরিয়মের কথা স্মরণ করুন যখন সে তার পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এ'তেকাফকারিণী হয়ে অবস্থান নিলো" এর বিপরীতে ইহুদীরা এর পশ্চিম দিক বাছাই করে নিলো। অতপর বাইতুল মুকাদ্দাসের এ আভ্যন্তরীণ বিভাজন বাইরেও প্রভাব ফেলে আলাদাভাবে পূর্ব ও পশ্চিম হিসেবে বিভক্তির রূপ ধারণ করলো। অর্থাৎ খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে নিজেদের কেবলা বানিয়ে নিলো আর ইহুদীরা পশ্চিম দিককে কেবলা বানিয়ে নিলো। অতপর এ পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধিতা তাদের উভয়ের মধ্যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত করেছে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিতরেও এবং বাইরেও। এর ফলে উভয় দলই একে অপরের উপাসনালয়কে নির্মমভাবে অবমাননা করেছে।

কুরআন মজীদ এখানে বিরোধিতা ও ঝগড়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে এর অসারতার প্রতিও ইঙ্গিত করে বলেছে, পূর্ব হোক আর পশ্চিমই হোক উভয় দিকই আল্লাহর। এর মধ্য থেকে মানুষ যে দিকেই মুখ করবে যদি সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুখ করে তাহলে সে দিকটাই আল্লাহর দিকে মুখ করা হিসেবে গণ্য হবে। যদি এ জিনিসকে নাসারা এবং ইহুদীরা মাথা ফাটানো আর উপাসনালয় ও মসজিদ ধ্বংসের কারণ বানিয়ে থাকে তাহলে এটা হবে তাদের মূর্খতা এবং আহম্মকী। কোনো দিকই আল্লাহর জন্য খাস (নির্দিষ্ট) নয়। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে দিকেই মুখ ফিরাবে সে দিকটাই আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানো হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং তাঁর জ্ঞানের বিশালতা সকল জিনিসকেই ঘিরে রেখেছে।

এ আলোচনা আরো বিস্তারিত বিবরণসহ সামনে কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আয়াতের অধীনে আসছে।

আয়াত ঃ ১১৬

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا لا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ ۝

وَلَدٌ - এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

وَلَدٌ -এর অর্থ হচ্ছে সন্তান। এ শব্দটি একবচন, বহুবচন, স্ত্রী লিঙ্গ ও পুং লিঙ্গ সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আকীদা বা ধ্যান-ধারণার বিভ্রান্তি

ওপরে আলোচনায় ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট যারা গঠন করেছে তাদের সেসব কর্মকাণ্ডের বরাত দেয়া হয়েছে যা তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ ধ্বংস করার ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন করেছিলো। এখন তাদের শিরকী আকীদা বা ধ্যান-ধারণার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে হেদায়াত এবং নাজাতের ইজারাদারীর দাবীদার ব্যক্তিদের এ দিকটাও সম্মুখে এসে যায় যে, আকীদার দিক দিয়ে তারা কোন্ স্তরে রয়েছে। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এরা এ আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাআলার ছেলে-মেয়ে আছে। ইহুদীরা عـزير (ওযাইর)-কে আল্লাহর পুত্র বলে, খৃস্টানরা মসীহ [হযরত ঈসা (আ)]-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সন্তান বলে। এসব অপবাদের জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন سُبْحَانَهُ আল্লাহ তাআলা এসব সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কোনো জিনিসই কোনো দিক থেকে তাঁর সত্ত্বা, গুণাগুণ অথবা অধিকারের মধ্যে অংশীদার ও শরীক নেই। বরং আকাশ ও যমীনের সকল কিছুই তাঁর সৃষ্ট এবং কর্তৃত্বাধীন। কারো এ মর্যাদা নেই যে, তার দাসত্ব এবং আনুগত্যের শৃংখল থেকে সে মুক্ত বরং সবাই হচ্ছে তারই অনুগত।

আয়াত ঃ ১১৭

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

'بدع' - এর বিশ্লেষণ

بدع -এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে তার অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং কোনো নমুনা ও মূল ছাড়া কোনো কিছুকে সৃষ্টি করা। এখান থেকে بدعت শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে দীনের মধ্যে এমন কোনো জিনিস আবিষ্কার করা যার কোনো উদাহরণ, নমুনা, মূল ও উৎসস্থল নেই। بديع এর সমমাপের [وزن এর] শব্দ হচ্ছে فعيل এর অর্থ হবে فاعل এর। অর্থাৎ নমুনা ছাড়া মূল থেকে সৃষ্টিকারী।

আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার বিস্তারিত বর্ণনা

ওপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার সংক্রান্ত বিষয়ের আরো অধিক বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এসব লোক আল্লাহর জন্য ছেলে ও মেয়ে হওয়ার যে কল্পিত ধারণা অবলম্বন করেছে, তা এ অনুমানের ভিত্তিতে অবলম্বন করেছে যে, যেমনিভাবে অন্যরা নিজেদের বিষয়াদী ব্যবস্থাপনা ও আনজাম দেয়ার জন্য সাহায্যকারী এবং অংশীদারের মুখাপেক্ষী হয় তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলারও এ ধরনের সাহায্যকারী

এবং অংশীদারের প্রয়োজন হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা এ ধরনের অংশীদার ও সাহায্যকারীর ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষীহীন। তিনি আকাশ ও যমীনকে একাই স্বীয় কুদরত ও কৌশলের দ্বারা অস্তিত্বে এনেছেন। কোনো জিনিসের ফায়সালা করার যখন তার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি শুধু বলেন, "হয়ে যাও"। তখনই তা হয়ে যায়। এ রকমের মুখাপেক্ষীহীন এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী যে সত্তা তাঁর সন্তানাদীর কি প্রয়োজন ?

আয়াত ঃ ১১৮-১১৯

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ط تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ط قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۝

মুশরিকদের কতিপয় দাবীর জবাব

اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা ১১২ আয়াতের ব্যাখ্যায়ই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বনী ইসমাঈলের অন্তর্ভুক্ত মুশরিকবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে। ওপরে আহলে কিতাবের অভিযোগ ও আপত্তি এবং তাদের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ যুক্তফ্রন্টের তৃতীয় সদস্য অর্থাৎ মুশরিকদের কতিপয় দাবী উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

তাদের প্রথম দাবী ছিলো এই, মুহাম্মাদ (স) দাবী করেছিলেন, আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর কথাবার্তা হয়। যদি এমনই হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা কথাবার্তার জন্য আমাদের মধ্য থেকে তাঁকে [মুহাম্মাদ (স)] কেনো বাছাই করে নিলো ? সর্বোপরি আমরা যে কুরাইশ সরদার ও নেতৃবর্গ রয়েছি প্রভাব, প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে কতো উঁচু স্তরে রয়েছি। তাহলে আল্লাহর সাথে আমাদের কথোপকথন হয় না কেনো ? এ দাবীর জবাব কুরআন কয়েকটি স্থানেই দিয়ে দিয়েছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ কোনো মানুষের জন্যই এমন মর্যাদার আসন নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি শুধু অহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরালে কথা বলে থাকেন। অতপর অহী এবং রেসালাত সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই এ পদমর্যাদার যোগ্য হতে পারে না। এটা শুধু আল্লাহই জানেন যে কোন্ ব্যক্তি এ মহান পদমর্যাদার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এখানে এ বিশেষ দাবীর জবাব দেয়া হয়নি। আমাদের কাছে এর জবাব না দেয়ার মধ্যে যে ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এ দাবীটা এতোটাই বেয়াদবী আর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক যে, এর জবাব না দেয়াই এর সঠিক জবাব। চিন্তা করে দেখুন, এ স্থানে কুরআনে এ নিরবতা কুরাইশ নেতাদের নেতৃত্বের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার ওপর কি রকম আঘাত ছিলো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দাবীটি ছিলো এই যে, আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন কেনো আসে না ? নিদর্শন দ্বারা তারা এমন কোনো নিদর্শনকে বুঝাচ্ছিল যে, স্পর্শ ও অনুভব যোগ্য অলৌকিক ধরনের এমন কিছু যা প্রতিটি মানুষ দেখেই চিৎকার করে বলে উঠবে নিসন্দেহে এ নিদর্শন প্রদর্শনকারী আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি এবং তাঁর রাসূল। যেমন এ রাসূলের সাথে সাথে কোনো ফেরেশ্‌তা তার রেসালাতের ঘোষণা দিতে থাকবে। অথবা তার নির্দেশে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠবে। অথবা তার ইঙ্গিতে পাহাড় চলতে শুরু করবে। অথবা তার ইচ্ছানুযায়ী মরুভূমি বাগানে পরিণত হয়ে যাবে। আর তা না হলে কমপক্ষে তার ইশারায় সেই শাস্তির নমুনা বাস্তবে রূপ দিতে হবে, যে শাস্তির হুমকি তিনি প্রতিদিন দিতে থাকেন।

এ দাবীর জবাবে প্রথমেই তো একথা বলা হয়েছে যে, যে ধরনের নিদর্শন এরা দাবী করছে হুবহু এ ধরনের নিদর্শনের জন্য তাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোও নিজ নিজ নবীগণের কাছে দাবী করেছিলো। তারাও সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর শুধুমাত্র রাসূলকে বিরক্ত ও বিব্রত করার জন্য এ ধরনের নিদর্শন দাবী করেছিলো। এরাও সত্যকে অনুধাবন করা সত্ত্বেও শুধু বিব্রত করার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য এ দাবী করছে। তারপর বলা হয়েছে যে, এদের অন্তরও সম্পূর্ণরূপে তাদের অন্তরের মতোই হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তাদের অন্তরও কাঠিন্য, বিদ্রোহ এবং সত্যের প্রতি শত্রুতার কালিমা দ্বারা ছেয়ে গিয়েছে। এর অবধারিত ফলস্বরূপ এদের ওপরও সে ধরনেরই কোনো শাস্তিই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে যে ধরনের শাস্তি তাদের পূর্ববর্তীদের ওপর এসেছিলো।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, তোমার রেসালাত এবং দাওয়াত যে অকাট্য সত্য, তার প্রমাণাদি আকাশের দিগন্ত থেকে, মানুষের নিজ সত্তা থেকে, আকাশ থেকে, যমীন থেকে, ইতিহাস নিদর্শনাবলী থেকে সর্বতোভাবে আমি খুলে খুলে কুরআন মজীদে বর্ণনা করে দিয়েছি। এসব প্রমাণাদি এতোই স্পষ্ট যে, এরপর কোনো নিদর্শন এবং মু'জিযার কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এসব প্রমাণাদি তাদের জন্যই অর্থবহ, যারা বিশ্বাস করতে চায়। আর যারা বিশ্বাস করতে চায় না, দুনিয়ার কোনো জিনিসই তাদেরকে এর সমর্থক বানাতে পারবে না। এসব লোক আযাব দেখেও ঈমান আনয়ন করে না, এমনকি যদি আযাব তাদের কোমর ভেঙ্গেও দেয় তবুও নয়।

তৃতীয় কথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ "আমি তোমাকে সত্যসহকারে এজন্য প্রেরণ করেছি যে, তুমি এর কবুলকারীকে মুক্তি ও সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়ে দেবে এবং এর অস্বীকারকারী ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীকে মিথ্যার অশুভ পরিণতির ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করবে।" এ সুসংবাদ আর ভয় প্রদর্শনের ফরয দায়িত্ব পালনের পর তোমার দায়িত্ব ও জিম্মাদারী শেষ হয়ে যায়। তাদের দাবী পূরণের ক্ষেত্রে তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী নিদর্শন এবং মু'জিযা দেখানো তোমার দায়িত্ব নয়। তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তোমার রেসালাত পৌঁছানোর ফরয আদায় করা সম্পর্কে। এ ব্যাপারে তোমাকে কখনো প্রশ্ন করা

www.pathagar.com

হবে না যে, জাহান্নামের যাত্রীরা কেনো জাহান্নামে গেলো, ঈমান কেনো আনয়ন করলো না।

এসব কথা যা ওপরে পেশ করা হয়েছে, মক্কী সূরাগুলোতে পরবর্তী জাতিগুলোর কার্যকলাপের অধীনে বিভিন্ন ঢং ও পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হবে, এজন্য আমরা এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করছি না।

আয়াত ঃ ১২০

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

নাসারা ও ইহুদীদের আসল রোগ

মুশরিকদের নীতি ও চাল-চলনের ব্যাপারে নিরাপদ করে দেয়ার পর এ আয়াতের দ্বারা রাসূল (স)-কে নাসারা এবং ইহুদীদের নীতি ও আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, এরাও তোমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মকে অনুসরণ করো। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ গ্রহণ করো। আর এটা এজন্য যে, তাদের সামনে প্রশ্ন কেবলমাত্র হকের সুস্পষ্টতা আর প্রমাণাদীর প্রকাশই নয় বরং তাদের নিজ নিজ নীতির ওপর স্থবির হয়ে থাকাই হচ্ছে মূল কথা। তারা সত্যের চেয়ে স্বীয় প্রবৃত্তির পূজাকেই বেশী পসন্দ করে। তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইলম' অর্থাৎ ওহীর জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তাদের প্রবৃত্তি এবং বেদআত ও কুসংস্কারের আনুগত্য করার কোনো প্রশ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না। এজন্যই এদেরকে এ চূড়ান্ত জবাব দিয়ে দাও যে, আসল হেদায়াত হচ্ছে ওই হেদায়াত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এখন যেহেতু আমার কাছে আল্লাহর হেদায়াত এসে গিয়েছে, সেহেতু আমি এ হেদায়াত পরিত্যাগ করে কিভাবে অন্য পথের আনুগত্য করতে পারি ? এখানে নাসারা এবং ইহুদীদের গৃহীত পন্থাকে اَهْوَآءَ অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত আসার পর অন্য কোনো পন্থার ওপর স্থবির হয়ে পড়ে থাকা মূলত কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ -এর মধ্যে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে যে হুমকি ও ভর্ৎসনার বিষয়টি এসেছে, তার লক্ষ হচ্ছে নাসারা এবং ইহুদীরা। এ ধরনের সম্বোধন পদ্ধতির উদাহরণ কুরআন মজীদে বহু পাওয়া যায়।

এ আয়াতে مِلَّتَ শব্দ এসেছে এর আসল অর্থ হচ্ছে নীতি ও পন্থা। কিন্তু এর দ্বারা কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর ওই জীবন পদ্ধতিও বুঝানো হয় যার ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম ও ধর্মীয় ঐতিহ্য।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১২১

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

সৎকর্মশীল আহলে কিতাবের উল্লেখ

সাধারণ আহলে কিতাবের নীতি ও আচরণের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশের পর ওইসব আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিজেদের কিতাবের প্রতি বাস্তব অর্থেই ঈমান পোষণ করছিলো। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এরা আল্লাহ তাআলার সেই হেদায়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে যা তুমি তাদের সামনে পেশ করছো।

আমাদের মতে এখানে সৎকর্মপরায়ণ আহলে কিতাবগণকে বুঝানোর কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ

প্রথম কারণ ঃ তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ (তারা যথাযথভাবে হক আদায় করে কিতাব পাঠ করে) আমাদের মতে حَقَّ تِلَاوَتِهٖ আয়াতাংশ দ্বারা 'يتلونه' এর 'ہ' সর্বনাম কর্মপদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য একথা প্রকাশ করা যে, প্রথম থেকেই তাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তার যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। তারা কখনো সেসব লোকদের মত ছিল না যাদের অবস্থা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (তাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহনকারী গাধার মত) অর্থাৎ তারা পিঠে কিতাব বহন করছে অথচ এসব কিতাবে কি আছে তা তাদের জানা নেই। বরং তারা হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণাসহকারে কিতাব তিলাওয়াত করত। নিজেদের মনগড়া আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার দলীল-প্রমাণ তালাশ করার জন্য তারা কিতাব পাঠ করতো না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যে হেদায়াত নাযিল করেছেন তার প্রতি তারা ঈমান আনবে।

তৃতীয় কারণ ঃ এখানে সেই আহলে কিতাবদের সম্পর্কে اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ (আমরা তাদেরকে কিতাব দান করেছি) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, এ শব্দটি সাধারণত আহলি কিতাবদের জন্য প্রশংসার স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

١۔ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ۔ البقرة : ١٤٦

"আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাঁকে চেনে যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৬

www.pathagar.com

٢- وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ - الانعام : ١١٤

"আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে।"-সূরা আল আনআম ঃ ১১৪

٣- وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ - الرعد : ٣٦

"এবং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তজ্জন্য আনন্দিত হয়।"-সূরা আর রা'দ ঃ ৩৬

٤ - اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○ - القصص : ٥٢

"কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে।"
-সূরা আল কাসাস ঃ ৫২

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে) এর বিপরীত اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اَلْكِتٰبَ (আমি তাদেরকে কিতাব দান করেছি) এ শব্দসমূহের মধ্যে গুরুত্ব অনুগ্রহের যে দিকটি পরিলক্ষিত হয় তা ঐসব লোকদের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে না। যারা মা'রুফ ও মাজহুল (কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া ও কর্মবাচ্যবোধক ক্রিয়ার) ব্যবহারের স্থান এবং আরবী ভাষায় উভয় পদ্ধতির সাহিত্যিক অলংকার সম্পর্কে সম্যক অবগত। উল্লেখিত পদ্ধতিতে কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া এ তত্ত্ব প্রকাশ করে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই কিতাব প্রদান করে থাকেন যারা তাঁর কিতাবের মর্যাদা দিয়েছে। যারা আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা দেয়নি বলা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি কিতাবই নাযিল করেননি। এ পার্থক্যের কারণে اُوْتُوا الْكِتٰبَ (কর্মবাচ্যবোধক ক্রিয়া) প্রশংসার ক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহার করা হয়েছে। اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ এ বাক্যটি পূর্বোক্ত اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ -এর খবর (বিধেয়) হয়েছে। অর্থাৎ যেসব আহলে কিতাব নিজেদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের হক যথাযথভাবে আদায় করেছিলো তারাই আল্লাহ তাআলার সেই হেদায়াতের ওপর ঈমান আনবে যা নবী করীম (স) তাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহর চিরন্তন রীতি হলো, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক নেয়ামতের বরকত ও প্রাচুর্য তাদেরকেই প্রদান করে থাকেন যারা তাঁর নেয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা তাঁর নিয়ামতের, মর্যাদা দেয় না তাদেরকে নেয়ামতের প্রাচুর্য দেয়া তো দূরের কথা বরং যা দেয়া হয়েছিল সেটাও তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আখেরী শরীআতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট এ অঙ্গিকার করেছিলেন যে, তোমার বংশধরদের উত্তম লোকেরাই সেই শরীআতে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং মন্দ লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত হবে। একথাই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, যারা তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনবে। আর এ মূল কথাটিই হযরত ঈসা (আ) বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন-এর বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

www.pathagar.com

৪৬. নস্‌খ বা রহিত করণের তাৎপর্য ও তার প্রয়োজনীয়তা

আমরা এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গক্রমে এর গুরুত্বপূর্ণ সকল শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে এসেছি। গভীরভাবে অধ্যয়নকারীদের জন্য এটাই যথেষ্ট। অবশ্য ১০৬ আয়াতের নস্‌খের (রহিত করণের) যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা আরো অধিক বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আমরা এখানে এর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো দিকের ওপর আলোকপাত করবো এবং এ আলোচনার মধ্যে আমার ওস্তাদ ইমাম ফারাহী (র)-এর চিন্তাধারা থেকেও জ্ঞান লাভ করব।

নস্‌খ বা রহিত করণ সম্পর্কিত যে আয়াত ওপরে অতিবাহিত হয়েছে, তার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا -"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। আলোচনার ধারাবাহিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাক্যের বিন্যাস ও গ্রন্থনার আলোকে আমরা এ আয়াতকে কেবল পূর্ববর্তী দীনসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছি। আহলে কিতাবগণ আপত্তি উত্থাপন করেছিলো যে, কুরআন আমাদের কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলে মেনে নেয়া সত্ত্বেও তার শিক্ষাসমূহকে কেন রহিত করেছে ? কুরআন তাদের এ আপত্তির জবাব দিয়েছে। আসুন কুরআনের এ জবাবের ধরন ও প্রকৃতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখুন, এর প্রতিটি দিক যুক্তিসংগত কিনা এবং এর প্রতি নিশ্চিন্ত ও আস্থাশীল হওয়া যায় কিনা ? আয়াতের ওপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে জবাবের দুটি দিক পরিষ্কারভাবে সামনে ভেসে ওঠে ঃ

নস্‌খের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো থেকে অধিক ভালোর দিকে

১ নস্‌খের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ভালো থেকে অধিক ভালোর দিকে অগ্রসর হওয়া ও উন্নত করা। অন্য ভাষায় এটা আল্লাহ তাআলার অঙ্গিকার পূর্ণ করা, তিনি হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-কে বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীতে শেষ নবী পাঠাবেন যিনি আল্লাহর শরীআতকে পরিপূর্ণ করে দেবেন, সকল পবিত্র ও ভালো জিনিসকে হালাল করবেন, সকল অপবিত্র ও নোংরা জিনিসকে হারাম করে দেবেন এবং লোকদেরকে অসংখ্য বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন যেসব বন্ধনে মানুষ এখন আবদ্ধ রয়েছে।

এ মূল তত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ংগম করার জন্য নিম্নের বিষয়গুলোকে সামনে রাখতে হবে—

(ক) আল্লাহ তাআলার শরীআত পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে করতে পূর্ণতার কেন্দ্র বিন্দুতে পৌছে গেছে যা কুরআনে হাকীমে পরিদৃষ্ট হয়। মানবজাতির স্বভাব প্রকৃতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহর শরীআতের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছিলো। আল্লাহ তাআলা মানব জাতির স্বভাব প্রকৃতিকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রশিক্ষণের ক্রমধারার মাধ্যমেই মানব প্রকৃতি সে স্থানে পৌছুতে সক্ষম হয় যেখানে পৌছুলে সে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দীন মেনে চলার উপযোগী হয়। মানব প্রকৃতি সে স্থানে পৌছার পূর্বে

www.pathagar.com

মানবজাতির নিকট আল্লাহর তরফ থেকে যে জীবন ব্যবস্থা এসেছে তা ছিলো ইসলামেরই মৌলিক ও প্রারম্ভিক রূপ। তবে বাহ্যিক আকার আকৃতি অর্থাৎ শরীআতের দিক থেকে আনেকটা সেই অবকাঠামোয় ঢেলে সাজানো ছিলো, যা সেই যুগের জ্ঞানগত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার উপযোগী ছিল। প্রশিক্ষণের ক্রমধারার মাধ্যমে যখন মানব জাতির স্বভাব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ দৃশ্যমান হয় এবং তার বিবেক বুদ্ধি পরিপূর্ণ হয়, রসম রেওয়াযের বাধ্য বাধকতা এবং জাতিগত ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করা শুরু করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের স্বভাব প্রকৃতির যথাযথ চাহিদা মোতাবেক বর্তমান আকার আকৃতিতে এবং বর্তমান শরীআতের আকারে (পরিপূর্ণরূপে) ইসলাম নাযিল করেছেন। এতে না কোনো কিছুর অভাব আছে এবং না কোনো কিছু অতিরিক্ত আছে। এ পর্যায়ক্রমিক উন্নতি ও অগ্রগতির স্বাভাবিক দাবী এ দাঁড়ায় যে, পূর্ববর্তী সকল শরীআতের বহু বিধি-বিধান পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ইসলামে তা স্বীয় সহজাত ও মানসম্মত আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) তাওরাতের অনেক বিধানের বাহ্যিক আকৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, এসব বিধান যখন নাযিল হয়েছিল তখন অপরিপক্ক ছিল ; এগুলো পরিপক্ক হওয়ার জন্যে অন্য কোনো ঋতুর অপেক্ষা করছে। ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সেই কাঙ্ক্ষিত ঋতুর আগমন ঘটেছে এবং অপরিপক্ক বিধানসমূহ পরিপক্কতা অর্জন করেছে। যেমন তাওরাতে মদ পান করা কেবল ইবাদাতখানাসমূহের দায়িত্বশীলদের জন্য হারাম ছিল। এটা এ মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে, মদ পান করা আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার পরিপন্থী এবং একদিন সকলের জন্যই এটা হারাম হয়ে যাবে। যেমন, ইসলাম এটাকে হারাম করার ধারাবাহিকতার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নামাযের সময় এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে। অতপর পর্যায়ক্রমে মদ পান করাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপ হারাম করে দিয়েছে। হাদীসের বর্ণনা এমন কি কুরআনের ইঙ্গিত থেকেও জানা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা বেশি বিচক্ষণ ছিলেন এবং দীনের মূল প্রাণশক্তির চাহিদা অনুধাবন করতে পারতেন তারা মদ পান সংক্রান্ত প্রথম হুকুম শোনা মাত্রই এর গতি প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন এবং তখন থেকেই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে মদ পান পরিত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে পানাহারের অনান্য জিনিসের হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, কোনো কোনো জিনিস হয়ত বনী ইসরাঈলের বিশেষ জাতিগত অভিরুচির কারণে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল অথবা তাদের অযথা প্রশ্ন করার দরুন শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। যেমন, উট অথবা জবাইকৃত জন্তুর কোনো কোনো অংশের চর্বি হারাম হওয়া। এসব জিনিসের হারাম হওয়ার প্রকৃতি থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, এসবের হারাম হওয়া বৈপত্তিক ও সাময়িক। এমন একদিন আসবে যখন এ ধরনের বাধ্যবাধকতাও নিয়মানুবর্তিতা মানুষের সহজাত প্রকৃতির পরিপন্থী হওয়ার কারণে রহিত হয়ে যাবে। অতপর স্বভাবসূলভ দীন اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ। –"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে।" এর

www.pathagar.com

সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সকল কড়াকড়িকে রহিত করে দিয়েছে। তাওরাত থেকে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি মূলতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করাই এর উদ্দেশ্য।

(গ) পরিপূর্ণতা সাধন ও উন্নয়নের উক্ত প্রয়োজনের প্রতি হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন, যেমন হযরত মূসা (আ) বলেছেন :

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।"

–দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৫-১৯

উপরোক্ত আলোচনাসমূহে যেখানে আখেরী যামানার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের সুস্পষ্ট অঙ্গিকার রয়েছে সেখানে একথার প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তাঁরই মাধ্যমে দীন পূর্ণতা লাভ করবে। হাওরার নামক স্থানে বনী ইসরাঈল স্বেচ্ছায় এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে যে, তারা নিজেদের মধ্যে এ মুহূর্তে বর্ধিত আকারের শরীআতের ভার বহন করার শক্তি অনুভব করছে না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের অপারগতার স্বীকারোক্তির অনুমোদন করতঃ এ অঙ্গিকার করেছেন যে, তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে হযরত মূসা (আ)-এর মত আরেকজন নবী পাঠাবেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তিনি স্বীয় দীনকে পরিপূর্ণ করবেন।

এর চেয়ে আরো স্পষ্ট ভাষায় হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন :

"কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে এখন যাইতেছি, আর তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞেস করে না, কোথায় যাইতেছেন ? কিন্তু তোমাদিগকে এই সমস্ত কহিলাম, সেই জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করিবেন। পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না ; ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার

www.pathagar.com

নিকটে যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না ; বিচারের সম্বন্ধে, কেননা এ জগতের অধিপতি বিচারিত হইয়াছে। তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

–যোহন ১৬ ঃ ৫-১৩

এ আয়াতসমূহের "সাহায্যকারী" ও "সত্যের প্রবক্তারা" অথবা অপর কয়েকটি অনুবাদে প্রতিনিধি শব্দসমূহ দ্বারা যাকে বুঝানো হয়েছে তিনি মহান ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কে হতে পারে। হুযুর (স)-এর ব্যাপারেই কেবল একথা বলা চলে যে, তিনি তোমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাবেন এবং এ মাহাত্ম্য কেবল হুযুর (স)-এরই হতে পারে যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলবেন না। যা শোনবেন কেবল তাই বলবেন। হুবহু একথাই কুরআন মজীদে এভাবে এরশাদ হয়েছে ঃ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى (তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলতেন না বরং এটা অহী যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়) অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ) মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, প্রতিশ্রুত নবী সেই কথাই বলবেন, যা মহান আল্লাহ তাঁকে বলতে আদেশ করেছেন এবং যে খবর তিনি দেবেন তাতে তিনি সত্যবাদী প্রশংসিত হবেন।

তাওরাত ও ইঞ্জীলের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি সূরা আল আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

قَالَ عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُ ج وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ج اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ○يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ لا اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

"তিনি বলেন, আমার আযাব যাকে ইচ্ছা করি তার ওপরই নাযিল করি। আর আমার রহমত সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা আমাকে ভয় করতে থাকবে। যাকাত আদায় করতে থাকবে এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান রাখবে। অর্থাৎ যারা আনুগত্য করবে সেই রাসূল এবং নিরক্ষর নবীর যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পাবে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের এবং নিষেধ করেন অসৎকর্ম থেকে,

www.pathagar.com

তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন নাপাক বস্তুসমূহ-আর তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং কড়াকড়ি অপসারণ করেন যা তাদের ওপর পূর্ব থেকে ছিলো। সুতরাং যারা তার ওপর ঈমান এনেছে, যারা তার সাহায্য করেছে, শক্তি যুগিয়েছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, এ লোকেরাই সফলকাম।"-সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬-১৫৭

দীনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে রহিতকরণ

২ জবাবের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, দীনের সংস্কার ও দীনকে পুনরুজ্জীবিত করণের দাবীর প্রেক্ষিতে এ রহিত করণ। এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা যে দীন পেয়েছিল—কুরআনে এর বর্ণনা রয়েছে যে, তারা এর কিছু অংশকে ভুলে গিয়েছিলো। এই বিস্মৃত অংশের যে বিষয়কে আল্লাহ তাআলা প্রয়োজন মনে করেছেন এ পরিপূর্ণ দীনের মাধ্যমে সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ফলে পাহারাদারের অবহেলা ও অযোগ্যতার কারণে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটাকে নতুন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আর বিস্মৃত কোনো অংশকে বিজ্ঞানময় মহান আল্লাহর হিকমত ও প্রজ্ঞা যদি প্রয়োজন মনে না করে বরং তাঁর বিচক্ষণতার দাবী যদি সেটাকে বিস্মৃতি করে দেয়া হয় তাহলে তদস্থলে তিনি সমপর্যায়ের ও সমমর্যাদার অন্য কোনো বিধান প্রবর্তন করেন।

এখানে انساء ক্রিয়ামূল থেকে ننس শব্দ (ক্রিয়া) ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ ভুলিয়ে দেয়া। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ (ভুলিয়ে দেয়ার) কাজটিকে নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সম্বন্ধে কুরআনে কারীমের অপর একটি আয়াত فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ (তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করেছে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়েছেন)-এর মত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার এ বর্ণনা শৈলী এ সত্য প্রকাশ করে যে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে এ ব্যবহার স্বীয় নীতির কৌশল অনুযায়ী করেছেন। আর এটা তিনি এজন্য করেছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদের ঔদাসীন্যের কারণে তারা এরূপ ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান যেহেতু সমগ্র মানব জাতির যৌথ সম্পদ, সেহেতু যেভাবে তার সাময়িক বিধানকে ইসলামের সর্বকালীন, সার্বজনীন ও সর্বোত্তম বিধানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে ভুলে যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া বিধানকে তার সদৃশ্য বিধানের দ্বারা কুরআনুল কারীমে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের পবিত্রকরণ

৩ দীনকে পরিপূর্ণ করা ও শরীআতকে সংস্কার করার দিক দিয়ে রহিত করণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। আর এটা এতই স্পষ্ট যে, ইহুদী খৃস্টানদেরও তা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু কুরআন মজীদ কেবল রহিত করণের উপরোক্ত দুটি দিকের বর্ণনা করেই শেষ করেনি বরং তৃতীয় একটি দিকের বর্ণনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এটি হলো দীন ও শরীআতের পবিত্রকরণের দিক। অর্থাৎ বেদআতী ও প্রবৃত্তি পূজারীরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর শরীআতে যেসব বেদআত ও

www.pathagar.com

কামনা-বাসনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তা থেকে কিতাব ও শরীআতকে পবিত্র করা। আমরা ওপরে সূরা হজ্জের যে আয়াত উদ্ধৃত করেছি তাতে এর আলোচনা রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ –"অতপর আল্লাহ সেসব জিনিস দূর করে দেন যা শয়তান প্রবিষ্ঠ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।"

এ দিকটির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হবে যে, রহিত করণ বেদআত ও বাতিল জিনিসের বিলোপ সাধনের বিরাট বড় উপায়। দুষ্ট ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকেরা আসমানী কিতাব ও সহীফা এবং আল্লাহর শরীআতসমূহে যেসব বেদআত ও মনগড়া জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে নবীগণ এসব জিনিস থেকে দীনকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছেন এবং দীনের মূল শিক্ষাকে উজ্জীবিত করে কায়েম করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে যেসব নবীর আগমন ঘটেছে তাঁদের অধিকাংশই এরূপ ছিলেন যে, তাঁরা নতুন শরীআত নিয়ে আসেননি, বরং তাদের অধিকাংশেরই এ মিশন ছিল যে, তাঁরা পূর্বের নাযিলকৃত শরীআতকে বেদআত ও বিকৃতি থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তার মূল অবস্থার ওপর ফিরিয়ে আনতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের আলেমগণের ওপর এ মহান কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তারা সর্বদা বেদআত ও বিকৃতি থেকে দীনকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন এবং উম্মাতকে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে আনবেন।

পূর্ববর্তী শরীআতসমূহে এ ধরনের যেসব জিনিস প্রবিষ্ট করা হয়েছে এবং ইসলাম সেগুলোকে রহিত করে তার আসল অবস্থা তুলে ধরেছে, এখানে আমরা তার কিছু উদাহরণ পেশ করবো। যাতে রহিতকরণের এ দিকটির প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমানিয়াতের বিষয়ে ইহুদী-খৃস্টানগণ যে ধরনের মিথ্যা ও হাস্যাস্পদ জিনিসের সংযোজন ঘটিয়েছে এবং কুরআন যার সংশোধন করেছে তার মধ্যে তাদের এ আকীদা উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়জন অথবা উদাহরণ স্বরূপ ইহুদীরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন ইত্যাদি। অথবা আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করে অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তাই তিনি শনিবার বিশ্রাম নেন ; অথবা আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছেন যে, কোনো নবী যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ কুরবানী পেশ না করবেন যা খাওয়ার জন্য আসমান থেকে আগুন অবতীর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর ওপর ঈমান আনবে না। অথবা মূসা (আ)-এর হাতে ধবল রোগ ছিল কুরআন মাজীদ এসব মিথ্যা ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের খণ্ডন করে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

অনুরূপভাবে ইহুদীরা নিজেদের দুষ্কর্মময় জীবনকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য অধিকাংশ নবীগণ সম্পর্কে অমার্জিত ও আশোভন ধরনের কিস্সা কাহিনী নিজেদের সহীফাসমূহে (আসমানী ছোট কিতাব) সংজোযন করে দিয়েছে যা তাঁদের পূত পবিত্র স্বভাব চরিত্রকে

www.pathagar.com

নিদারুণভাবে বিকৃত করে ছেড়েছে। কুরআন মাজীদ সেইসব নবী (আ)-কে ঐ ধরনের সকল মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করে তাঁদের জীবনীকে প্রকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে।

দৈনন্দিন কাজকর্মে তারা যেসব বেদআত ঢুকিয়েছে তার কয়েকটির উদাহরণ এ সূরায় ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কয়েকটির আলোচনা সামনে রয়েছে। যেমন তাদের সেই নীতি যা তারা তাদের সম্প্রদায়ের বন্দীদের ব্যাপারে অবলম্বন করেছে, অথবা সুদের ব্যাপারে তারা যে পন্থা অবলম্বন করেছে খৃষ্টানরা শূকর ও ঘাড় মোচড়ানো প্রাণী খাওয়া জায়েয করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে তারা ইতিহাস ও সত্য ঘটনাসমূহকে বিকৃত করে নিজেদের মনগড়া ভংগীতে উপস্থাপন করেছে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) ও কা'বাঘরের অধিকাংশ ইতিহাস গোপন করে ফেলেছে যাতে কা'বাঘরের সাথে ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্ক প্রমাণিত হতে না পারে, যাতে হযরত মুহাম্মাদ (স) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকেও বিকৃত করা যায়। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত হাজেরার কাহিনীতেও অনেক রদবদল করা হয়েছে। কুরআন মজীদ এসব বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে এবং প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। উস্তাদ ইমাম ফারাহী "যবীহ" নামক পুস্তিকায় এসব বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। সামনে আমরাও যথাস্থানে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করবো।

ইসলামী শরীআতে নস্‌খের (রহিতকরণের) ধরন

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতটি পরিপূর্ণভাবে পূর্ববর্তী দীনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এতে যে নসখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা এতই স্পষ্ট যে, কোনো নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলামী শরীআতেও কি নসখ বা রহিতকরণ হয় ? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক রয়েছেন। এক শ্রেণীর লোকেরা তো শুধু রহিতকরণের কথাই বলেন না বরং তারা এর পরিধি অনেক বাড়িয়ে দেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা রহিতকরণ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা যদিও রহিতকরণের পক্ষে, কিন্তু তারা মনে করে এটা কেবল কয়েকটি বিধানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এ তিন শ্রেণীর মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা রহিতকরণের পরিধি এজন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, তাদের মতে নসখের (রহিতকরণের) একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। এ লোকেরা সেইসব জায়গায়ও রহিতকরণ হয়েছে বলে মনে করেন যেখানে কোনো জিনিস কোনো আম (সাধারণ বিধান)-কে খাস (নির্দিষ্ট বা বিশেষ বিধানে) অথবা খাসকে আম-এ রূপান্তরিত করে দেয়। কিংবা মুজমাল (সংক্ষিপ্ত বিষয়)-কে মুফাস্‌সাল (বিস্তারিত) করে দেয়। অথচ এরূপ জায়গাসমূহে রহিত করণ মেনে নেয়া অপেক্ষা অধিক যুক্তিসংগত হলো, আম (সাধারণ) খাস (নির্দিষ্ট) এবং মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) ও মুফাস্‌সাল (বিস্তারিত) এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা। আর এরূপ ক্ষেত্রে অতি সহজেই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। যে শ্রেণীর লোকেরা রহিতকরণকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

www.pathagar.com

হলো, ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান পরিস্থিতির অধীন। যেসব বিধান রহিত হয়ে গেছে তা এজন্য রহিত হয়েছে যে, এসব বিধান যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিস্থিতি যদি আবার ফিরে আসে তাহলে সেই রহিত বিধান নতুনভাবে বহাল হয়ে যাবে। এ কারণে বাহ্যত রহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রহিত হয়নি বরং তা স্বীয় বিশেষ অবস্থার মধ্যে যথারীতি বহাল ও জীবন্ত রয়েছে। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে একথা বলে যে, ইসলামী শরীআতের ক্রমোন্নতি সহজ থেকে কঠোরতার দিকে হয়েছে। এ কারণে পরিস্থিতি যখন সহজের দিকে পরিবর্তনের দাবীদার হয় তখন এ পরিবর্তন ইসলামী শরীআতের মেজায ও প্রকৃতির সাথে যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

আমাদের দৃষ্টিতে এ মতের মধ্যে অনেকগুলো ক্রটি রয়েছে। প্রথমত "ইসলামী শরীআত প্রথম দিকে সহজ ছিল, পরে তা কঠিন হয়েছে" এ দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা কুরআন মজীদের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, কোনো কোনো বিধানে ইসলামী শরীআতের ক্রমোন্নতি যদিও সহজ থেকে কঠিনের দিকে হয়েছে, যেমন মদ হারাম হওয়া ও সাওমের বিধান ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিধান ক্রমোন্নতি কঠিন থেকে সহজের দিকেই হয়েছে। যেমন রাতের নামায এবং মুজাহিদগণের সংখ্যার বিষয়। ফলে "ইসলামী শরীআতের ক্রমোন্নতি সহজ থেকে কঠিনের দিকে হয়েছে।" এ ফর্মূলা তৈরি করে রহিতকরণের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসা ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ নয়।

দ্বিতীয়ত, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর যুগ ও আমাদের যুগের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এখানে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি। হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন পৃথিবীতে ইসলামী শরীআতের দাওআত দিয়েছিলেন তখন লোকদের নিকট ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণ অভিনব ও আনকোরা ছিলো। তাঁর সাথীদের সংখ্যাও ছিলো খুব কম। তখন লোকেরা জাহেলী রসম রেওয়াজে এতো বেশি অভ্যস্ত ছিলো যে, সেখান থেকে তাদের বেরিয়ে আসা সহজ ছিলো না। অপর দিকে বর্তমান যুগের অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভিন্ন। পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা কোটি কোটি। ইসলামের বিধি-বিধান ও আইন-কানুন লোকদের নিকট অপরিচিত ও নতুন কোনো জিনিস নয়। ফলে সেই যুগকে বর্তমান যুগের সাথে তুলনা করে এক যুগের বিধি বিধানকে অপর যুগের ওপর প্রয়োগ করা আমাদের দৃষ্টিতে কোনো অবস্থাতেই সঠিক নয়।

তৃতীয়ত, পরিস্থিতির পরিবর্তনের অজুহাতে যদি শরীআতের বিধান রহিতকরণের দিকে ফিরে যাওয়া জায়েয বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে তাতে ফিতনাবাজ লোকদের জন্য শরীআত থেকে পলায়ন করার এমন এক রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে যা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর এ দলিলের ওপর নির্ভর করে সুবিধাবাদী লোকেরা অনায়াসে নামায, রোযা, মদ হারাম হওয়া ও ব্যভিচারের শাস্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যথেচ্ছা ইজতিহাদ শুরু করে দেবে। ফলে দীনি আচার-আচরণ ও নিয়ম পদ্ধতি অস্থিতিশীল ও নিরাপত্তাহীন

www.pathagar.com

হয়ে পড়বে। যেমন অতীতে দীনের বিভ্রান্ত আহ্বানকারীদের হাতে এর তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং বর্তমান যুগেও হচ্ছে। আর এর আড়ালে বেদআতীরা নিজেদের পীরদের জন্য শরীআতের পক্ষ থেকে হারাম ঘোষণা করা জিনিসকে জায়েয সাব্যস্ত করে নিয়েছে, অতপর এসব জিনিসের হারাম হওয়ার অনুভূতিও তাদের মধ্য থেকে লোপ পেয়ে গেছে। একথা সত্য যে, বিকারগ্রস্থ সমাজে দীনের প্রচারকগণ কখনো কখনো নবাগত ও নওমুসলিমদের জন্য শরীআতের কোনো কোনো বিষয়ে উদারতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তাদের এ উদারতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করা নিসন্দেহে এ কারণে ছিল না যে, তারা "অবস্থার পরিবর্তনের ফলে শরীআতের বিধান মানসূখ হওয়ার" মতে বিশ্বাসী ছিলেন। বরং এটা ছিল তাদের এক ধরনের ক্ষমা এবং দেখেও না দেখার ভান করা যেমন সংশোধন প্রয়াসী বা প্রশিক্ষণদানকারী কোনো ব্যক্তি কখনো কখনো তার দুর্বল কিংবা বিপদগামী কোনো ছাত্র অথবা অনুসারীর খারাপ কোনো আচরণ দেখেও না দেখার ভান করে অথবা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এ ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশিক্ষণেরই একটি অংশ বিশেষ। এ ধরনের দুর্বল ও অপূর্ণ লোকদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে সাহচর্য ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহজেই সংশোধন হয়ে যাবে এ প্রত্যাশা নিয়েই এ পন্থা অবলম্বন করা হয়। আর অভিজ্ঞতার আলোকেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ প্রত্যাশা পূরণ হয়ে থাকে। তবে প্রশিক্ষণ দানকারীকে অবশ্যই তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। গম দেখিয়ে যব বিক্রির দোকান চালানোর মত ধোঁকাবাজী করা যাবে না। অতএব, এ উদার ও নমনীয় আচরণের ভিত্তিতে এরূপ মনে করা সঠিক নয় যে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লোকেরা শরীআতের বিধান ত্যাগ করে মানসূখকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের ভিত্তিতে আমরা নস্খ বা রহিতকরণ সংক্রান্ত প্রথমোক্ত দুটি মতকেই দুর্বল মনে করি। অবশিষ্ট থাকে তৃতীয় অর্থাৎ সেসব লোকের মত, যারা কুরআনের কোনো কোনো আয়াত মানসূখ (রহিত) হয়েছে বলে মনে করেন। আমরা এ মতটিকেই সহীহ বলে মনে করি।

এখন প্রশ্ন হলো কোন্ কোন্ আয়াত মানসূখ হয়েছে, কোন্ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে এবং মানসূখ হওয়ার কারণ কি ? এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জায়গা এটা নয়। আল্লাহই চাইলে এ কিতাবেই স্ব-স্ব স্থানে এর আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু মৌলিক কয়েকটি কথা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

এক ঃ কুরআনের কোনো হুকুম মানসূখ হয়ে থাকলে তা কুরআন দ্বারাই মানসূখ হয়েছে এবং নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ উভয়টা কুরআনেই বর্তমান রয়েছে। কুরআন ছাড়া অন্য কোনো জিনিস কুরআনের কোনো হুকুমকে মানসূখ করতে পারে না। কোনো কোনো ফকীহ্র মতে হাদীস দ্বারাও কুরআন মানসূখ হয়। কিন্তু আমাদের নিকট এ মতটি সঠিক নয়। এ মতের দুর্বলতা এতই সুস্পষ্ট যে, এটাকে খণ্ডন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

দুই ঃ এ নস্খ শুধু মাত্র বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত। আকাঈদ ও ঈমান, নৈতিকতা ও স্বভাব-প্রকৃতি এবং ঘটনাবলীও মৌলিক নীতিমালা ও তত্ত্বসমূহের সাথে নসখের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এ বিষয়সমূহ এমন নয় যে, এগুলো আজ এক রকম আছে কাল তা ভিন্ন রকম হয়ে যাবে। তবে বিধি-বিধান ও আইন-কানুনে আইন দাতা নিজেই যদি কোনো সংশোধন ও সংস্কার করেন তাহলে এতে আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং এতে মূল উদ্দেশ্য আরো শক্তিশালী হয়।

তিন ঃ এ নসখের প্রয়োজন এ কারণে দেখা দেয়নি যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার মহান জ্ঞান ভাণ্ডারে ক্রুটি ছিল, যার ফলে তাঁর নাযিলকৃত আইন ও বিধানের জন্য অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষামূলক স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বরং এর একমাত্র কারণ বান্দার কিছু কিছু স্বভাবগত দুর্বলতা ও অপরিপক্কতা, যার কারণে সে অনেক সময় কোনো আইন বা বিধান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্বীয় বান্দার প্রতি অতিশয় দয়াবান, সেহেতু তিনি অনুগ্রহ পূর্বক স্বীয় বিধি-বিধান ও আইন-কানুন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পর্যায়ক্রমের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছেন।

আল কুরআনের নাসিখ্ ও মানসূখ বিধানের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে শিক্ষা ও পর্যায়ক্রমের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং জানা যায় যে, বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কর্মপন্থার অবলম্বন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন কোনো কোনো অবস্থায় এটা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় যে, সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে বিরাজমান পরিস্থিতির দাবী অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অস্থায়ীভাবে কোনো বিধান প্রদান করা হোক এবং সামাজিক অবস্থা যখন পরিপক্ক হয়ে যায়, তখন অস্থায়ী বিধানকে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হোক। যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তরাধীকারীদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য অসিয়তের হুকুম দেয়া হয়েছে, দুষ্কৃতির পথ চিরতরে বন্ধ করার জন্য শালিশী কমিটি কর্তৃক শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। আনসার ও মুহাজিরগণের ভ্রাতৃত্বকে নৈতিক ভ্রাতৃত্ব থেকে প্রসারিত করে আইনগত ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সমাজ একটি ইসলামী সমাজের পদমর্যাদা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তখন উত্তরাধীকারের চূড়ান্ত ও অকাট্য আইন এবং ব্যভিচারের নির্দিষ্ট ও অকাট্য দণ্ডবিধি পূর্বোক্ত সাময়িক বিধানকে মানসূখ বা রহিত করে তার জায়গা দখল করে নিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়ের প্রয়োজন হয় যে, মানবজাতির সাধারণ স্বভাব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো আইন ও বিধান ধাপে ধাপে তাঁর শেষ সীমা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়, যেমন মদ। আরবের লোকেরা যেহেতু বাল্যকাল থেকেই মদ পানে অভ্যস্ত ছিল তাই প্রথমে কেবল নামাযের সময় মদ হারাম করা হয়েছে। আরবের মত গরম দেশে রোযা রাখা বড় কঠিন কাজ ছিল। ফলে প্রথম দিকে সফরে থাকাকালীন ও অসুস্থ অবস্থায় রোযা না রেখে তার পরিবর্তে ফিদিয়া

www.pathagar.com

দেয়ার সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে লোকেরা যখন এসব বিধানের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে যায় তখন মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা, মাহে রমযানের রোযার সংখ্যা পূর্ণ করার নির্দেশ এবং সফরে ও অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখার পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়ার অনুমতি বাতিল করার মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে শরীআতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। এরপর কেবল চরম অপারগতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি অব্যাহত থাকে। কোনো কোনো অবস্থায় এমনও দেখা যায় যে, নবী করীম (স)-কে পূর্ববর্তী শরীআতের কোনো বিধানের ওপর আমল করার জন্য কিছু দিন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে অনুমতি মানসূখ বা রহিত করে সে স্থলে ইসলামী শরীআতের চিরস্থায়ী বিধান প্রদান করা হয়েছে, যেমন কেবলা সংক্রান্ত বিধান। কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে—এর উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের পরীক্ষা করা যে, কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় এবং কে এখনো পূর্ববর্তী রীতির অন্ধ ভক্ত রয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এ পরীক্ষা প্রশিক্ষণেরই একটি অংশ। অনুরূপভাবে কোনো কোনো অবস্থায় সমাজের ব্যক্তিবর্গের, নৈতিক দুর্বলতা দূর করার জন্য অস্থায়ীভাবে এরূপ কিছু কিছু বিধান প্রদান করার প্রয়োজন হয় যা তাদের মান বৃদ্ধি করে এবং সংখ্যার স্বল্পতার কারণে অধিক ভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। যেমন প্রথম দিকে সাধারণ মুসলমানদের প্রতিও নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের হুকুম দেয়া হয়েছে। জিহাদের ময়দানে একজন মুসলিম মুজাহিদকে দশজন কাফেরের প্রতিপক্ষ স্থির করা হয়েছে। ইসলামী জামাআতের মজবুতি ও পবিত্রতা অর্জনের দাবীর প্রেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর সাথে গোপনে আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের হুকুম করা হয়েছে। পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক মান বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামী জামায়াতের পবিত্রতা অর্জনের সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তখন এসব বিষয়ে নমনীয়তা এনে এ ক্ষেত্রে শরীআতের পূর্ববর্তী নির্ধারিত সাধারণ বিধান পুনর্বহাল করা হয়।

আমরা এখানে কতিপয় মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছি। সকল নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) আয়াতের পূর্ণাংগ তালিকা দেয়া ও তার কল্যাণ বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। মানসূখ আয়াতসমূহের সাথেই প্রাসঙ্গিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানেই তা পাওয়া যাবে। এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহর শরীআত পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। এরপর এতে রহিত করণের আর কোনো অবকাশ নেই। এ শরীআতে সকল বিধানের সাথেই জটিলতা ও অপারগতার ক্ষেত্রে রেয়াৎ ও নমনীয়তার কথাও বর্ণনা হয়েছে। ফলে অবস্থার পরিবর্তনের অজুহাতে রহিত বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েয হওয়ার কোনো কারণ অবশিষ্ট নেই। অবশ্য বেদআতীদের সৃষ্ট গোমরাহী রহিতকরণের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইসলামে এ কাজের দায়িত্ব সংস্কারক ও আলেমগণের ওপর অর্পিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৪৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১২২-১৪১ আয়াত

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আহলে কিতাব বিশেষ করে ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো তাদের এ গর্ব যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। কাজেই তাদের হেদায়াতই আসল হেদায়াত এবং তাদের ধর্মই হল প্রকৃত ধর্ম। তাদের গণ্ডির বাইরে থেকে কেউ আখেরাতে মুক্তি পাবে এবং তাদের বাইর থেকে কোনো নবী ও রাসূল আসবে একথা তারা কল্পনাই করে না। তাদের মতে ইহুদী অথবা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়াই হেদায়াত ও মুক্তির একমাত্র পথ। উপরোক্ত আলোচনায় পবিত্র কুরআন বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের ধারণার অপনোদন করেছে। সামনে তাদের সেসব ধারণা খণ্ডন করার জন্য তাদের সামনে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তার সন্তানদের জীবনের ঘটনাবলীর ঐসব অংশ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত ও তাঁর রেসালাতের প্রতি সমর্থন এবং ইহুদী-খৃস্টান ও মুশরিকদের সকল দাবীর পুরোপুরি খণ্ডন হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) যেহেতু বনী ইসরাঈল ও বনী ইসমাঈল উভয়েরই পূর্বসূরী এবং আধ্যাত্মীক নেতা ছিলেন, সেহেতু ইতিহাসের এ অংশ সমভাবে তাদের সকলের জন্যই দলিল হওয়ার মর্যাদা রাখে। এদিক দিয়ে দেখলে পরিদৃষ্ট হবে যে, এ সূরার শুরু থেকে বনী ইসরাঈল এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বনী ইসমাঈলের যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা এখানে এসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর আলোকে কুরআন এখানে যেসব বিষয় প্রকাশ করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরের প্রসংগে আসবে। তথাপি আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ মৌলিক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করবো যাতে বক্তব্যের ধারা ও বিন্যাস সামনে এসে যায়। এ মৌলিক বিষয়সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইমামত তথা নেতৃত্বের যে পদমর্যাদা দান করেছিলেন তা তিনি উত্তরাধীকার সূত্রে পাননি। বরং এটা ছিল আল্লাহ তাআলার দান। প্রথমে আল্লাহ তাঁকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় ফেলে তাঁর আনুগত্য ও আল্লাহ প্রেম ভালোভাবে যাঁচাই করে নিয়েছেন। পরীক্ষায় তিনি পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাকে এ পদ মর্যাদায় আসীন করা হয়। এ পদমর্যাদা সম্পূর্ণরূপে তাঁর গুণগত মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বংশ ও পরিবারের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেও কেবল তারাই এ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন যাদের মধ্যে এর উপযোগী গুণাবলী বর্তমান রয়েছে। দুশ্চরিত্র ও আল্লাহর নাফরমান কোনো লোক এর হকদার হতে পারে না।

২. আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহকে ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরের জন্য কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তাকে কিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তাঁর অভিভাবকত্ব দান করেছেন।

www.pathagar.com

৩. এ ঘর নির্মাণ করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) স্বীয় বংশধরগণের মধ্য থেকে একটি মুসলিম উম্মাহ সৃষ্টি করার এবং তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন।

৪. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার ফল এবং ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতেরই প্রচারক। অতএব যারা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসারী বলে দাবী করে, আর মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত থেকে পশ্চাদপসরণ করে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে নির্বোধ ও বোকা প্রমাণ করেছে।

৫. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইয়াকুব (আ) নিজ নিজ সন্তানদেরকে (ইসলামী মিল্লাতের) দীন ইসলামের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানগণ ইয়াকুব (আ)-এর নিকট ওয়াদা করেছেন যে, তাঁদের জীবন ও মৃত্যু ইসলামী মিল্লাতের ওপরই হবে।

৬. এসব ঘটনাবলী ও তথ্যাবলীর দাবী হলো, আহলে কিতাব ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের গোঁড়ামীতে নিপতিত না হয়ে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করবে। যার দাওয়াত দিচ্ছেন মুহাম্মাদ (স)। আল্লাহর নবীগণের মাঝে কোনো প্রভেদ সৃষ্টি করবে না বরং তারা সকল নবী ও রাসূলগণের সার্বজনীন দীন ইসলাকেই গ্রহণ করবে। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর রঙে রঙ্গিন করতে চায় তারা ইসলামের রঙেই নিজেদেরকে রঙিন করবে। এটাই আল্লাহর রঙ। ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ আল্লাহর রঙ নয়। যারা ইসলামের রঙ ছাড়া অন্য কোনো রঙ গ্রহণ করতে চায় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ থেকে পৃথক দল গঠনে সচেষ্ট।

৭. এ দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, হযরত ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক্ব (আ), ইয়াকুব এবং তাদের বংশের অন্যান্য নবীগণ ইহুদী, অথবা খৃস্টান ছিলেন। যারা এ ধরনের দাবী করে থাকে তারা বাস্তব সত্যকে আড়াল করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। আল্লাহ তাআলা এ নবীগণের দীন সম্পর্কে এসব মিথ্যাদাবীদার অপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত।

৮. বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ বিষয়টিকে রেকর্ডের ন্যায় অল্প অল্প করে থেমে থেমে দু বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা এই যে, তোমরা নিজেদের যেসব বাপ দাদার ওপর ভরসা করেছো তারা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে ফেলেছে এবং নিজেদের আমলসমূহ নিজেদের সাথে নিয়ে গেছে। না তাদের কার্যাবলীর কৃতিত্ব তোমরা পাবে, আর না তাদের কোনো আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এ উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ
رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۭ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۭ قَالَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِىْ ۭ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۭ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۭ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاۗىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ ھٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَھْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ
قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۭ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ
اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ

www.pathagar.com

الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾
وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ
مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا
تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ
قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۙ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ
مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ
فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ
مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾
اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا

www.pathagar.com

هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً
عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছি তার কথা স্মরণ কর এবং আমি যে তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। ১২৩. সে কথাও স্মরণ কর ; আর ভয় কর ; সেদিনকে যেদিন কোনো প্রাণী কারো কোনো উপকারে আসবে না, তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। কোনো সুপারিশ তার কোনো উপকারে আসবে না এবং তাদের কেউ সাহায্যও করতে পারবে না।

১২৪. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন আর তিনি তা পূর্ণ করে দেখালেন। তখন পালনকর্তা বললেন ঃ আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাবো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার বংশধর থেকেও ? তিনি বললেন, আমার এ অঙ্গিকার অত্যাচারী লোকদেরকে শামিল করবে না।

১২৫. আরো স্মরণ কর, যখন আমরা বায়তুল্লাহকে মানুষের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করেছি এবং আদেশ করেছি তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে এক নামাযের জায়গা বানাও এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করেছি, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, এ'তিকাফকারী ও রুকূ'-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।

১২৬. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিলেন "হে পরওয়ারদিগার! এ স্থানকে নিরাপদ শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিযিক দান করুন। তিনি বললেন, যারা কুফরী করবে তাদেরকেও আমি কিছু দিন ঐশ্বর্য উপভোগ করার অবকাশ দেবো, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ঠেলে দেবো, সেটা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান।

১২৭. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তারা দোয়া করেছিল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ দোয়া কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী সর্বজ্ঞ।

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি করুন এবং আমাদেরকে আমাদের

www.pathagar.com

ইবাদাতের রীতিনীতি বাতলে দিন আর আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু। ১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানময়।

১৩০. যে ব্যক্তি নিজেকে বোকা বানিয়েছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীম-এর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে। আমি তাকে পৃথিবীতেও গণ্যমান্য করেছি এবং পরকালেও সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে আদেশ করেছেন "তুমি নিজেকে সমপর্ণ করে দাও" সে বলল, আমি নিজেকে বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট সমর্পণ করে দিয়েছি।

১৩২. ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এ দীনেরই অসিয়ত করেছে এবং ইয়াকুব তার সন্তানদেরকে এ দীনেরই অসিয়ত করেছে যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

১৩৩. যখন ইয়াকুব-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছিল তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? যখন সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করল, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা বলল, আমরা তোমার উপাস্য তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর উপাস্যের ইবাদাত করব। যিনি একক উপাস্য। আমরা তারই অনুগত।

১৩৪. তারা ছিল এক সম্প্রদায়—যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তারা পাবে। আর তোমরা যা উপার্জন করেছো তা তোমরা পাবে। তারা যা করত সে ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

১৩৫. তারা বলে, ইহুদী অথবা খৃস্টান হও তবেই হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আপনি বলুন, বরং ইবরাহীম-এর দীনের অনুসরণ করো, যিনি আল্লাহর প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ ছিলেন। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৩৬. তোমরা বল, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমন এনেছি এবং সেসব জিনিসের ওপর ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব জিনিসের ওপর ঈমান এনেছি যা মূসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। তাদের কারো মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না। আমরা কেবল তারই আনুগত্যকারী।

১৩৭. তোমাদের ঈমান আনার মত যদি তারা ঈমান আনে তবে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারাই বৈরিতায় লিপ্ত। তাদের মুকাবিলায় আপনার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। তিনি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

১৩৮. বলে দিন আল্লাহর রঙে রঙিন হও। আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? আমরা তারই ইবাদাত করি। ১৩৯. আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমরা কেবল তাঁর প্রতিই একনিষ্ঠ।

১৪০. তোমরা কি দাবী কর যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশি জান না আল্লাহ বেশি জানেন? তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সত্যকে গোপন করে? আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

১৪১. তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তারা পাবে এবং তোমরা যা উপার্জন করেছো তা তোমরা পাবে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

৪৮. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১২২-১২৩

يٰبَنِيٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّاتَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

এ আয়াতদ্বয় সামান্য শব্দের পরিবর্তন সহকারে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে আমরা এর ওপর বিস্তাতির আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য ৪৭ ও ৪৮ আয়াতের তাফসীর।

আয়াত ঃ ১২৪

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ط قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ○

ইবতিলা বা পরীক্ষার উদ্দেশ্য

ইবতিলা এর অর্থ যাঁচাই বাছাই করা ও পরীক্ষা করা। বান্দার চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য তাদের পরীক্ষা করা আল্লাহ তাআলার একটি সুন্নাত। তিনি বান্দার মধ্যে যে

দক্ষতা ও যোগ্যতা আমানত রেখেছেন এ পরীক্ষা দ্বারা তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে এবং খাঁটি ও ভেজালের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এ পরীক্ষা সহজ, কঠিন, ঠাণ্ডা, গরম, আনন্দদায়ক ও কষ্টকর, উৎসাহ বর্ধক ও সাহস নির্ণয়ক উভয় অবস্থার মাধ্যমেই করা হয়। কোনো অবস্থাতেই বান্দাকে দুঃখ কষ্টে পতিত করা এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো ও পূর্ণতায় পৌছানো। যেমন আমরা ইঙ্গিত করেছি আর এখানে এ ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

كَلِمَاتْ -এর তাৎপর্য

كلمات (কালিমাত) كلمه (কালিমা) এর বহুবচন। এর অর্থ একক শব্দও হয় এবং পরিপূর্ণ কথাও হয়। এখানে কালিমাত এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তাআলার সেসব নির্দেশ যা তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৃঢ়তা ও আপোস হীনতা যাঁচাই করার জন্য তাঁকে প্রদান করেছিলেন এবং যা তিনি নিঃসঙ্কোচে পালন করেছিলেন। যেমন তিনি আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে সরাসরি স্বীয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে আযান দিয়েছিলেন এবং শত শত বছর ধরে যেসব মূর্তিকে উপাস্য হিসেবে পূজা করা হচ্ছিল সেগুলোকে তিনি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার কারণে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একজন প্রতাপশালী ও স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ তাঁকে আল্লাহর সত্য দীন থেকে বিচ্যুত করতে চেয়েছিলো। সেই ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল। তাঁকে পরিবার, সম্পদ, সম্প্রদায় ও জন্মভূমি সবকিছু পরিত্যগ করে হিজরত করার হুকুম করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর নির্দেশে সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ করে হিজরত করেছেন। তাঁকে লোকালয় থেকে দূর মরুভূমিতে গিয়ে একমাত্র প্রাণপ্রিয় সন্তানের গলায় ছুরি চালানোর হুকুম করা হয়েছে। তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং তের বছরের প্রাণপ্রিয় সন্তানের গলায় ছুরি চালানোর জন্য তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে ফেলেন। আল্লাহ্ তাআলার হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে এ ধরনের জীবন বাজী ও জীবনোৎসর্গ করার মত বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা তাঁর জীবনের প্রতিটি পাতা আলোকজ্জল ও জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। এখানে আমরা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছি মাত্র।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় আদেশ ও হেদায়াতের অর্থ প্রকাশ করার জন্য কালিমাত (كلمات) শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে অলংকার শাস্ত্রের একটি বিষয় লুক্কায়িত রয়েছে। তা হলো, (কালিমা) শব্দটির মধ্যে এক ধরনের সংক্ষিপ্ততা ও দ্ব্যর্থবোধকতা রয়েছে। এটি كُنْ (হও) শব্দের ন্যায় অবশ্য পালনীয় বিধান সম্বোধিত ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করে। কিন্তু এ বিধানের সাথে এর দর্শন আদেশ পালনের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের পরীক্ষার জন্য এ ধরনের আদেশ সবচেয়ে কঠিন। এ কারণে আল্লাহর যে প্রিয় বান্দা এ ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তার প্রতিদান ও পুরস্কারও অত্যন্ত বড় হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা হযরত

www.pathagar.com

ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র কুরবানী করার জন্য স্বপ্নে ইঙ্গিত স্বরূপ আদেশ করেছিলেন। কিন্তু না তিনি এ আদেশের কোনো কারণ ও রহস্য স্পষ্ট করেছেন, আর না এর প্রতিদান ও পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। ইবরাহীম (আ) ইচ্ছা করলে এ স্বপ্নকে শুধু স্বপ্নের পর্যায়ে রাখতে পারতেন। অথবা এর কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বিশ্বজগতের সকল বস্তু যেভাবে আল্লাহ তাআলার কালিমা 'كُنْ' (হও) এর হুকুম পালন করে (সাথে সাথে অস্তিত্ব লাভ করে) এবং কোনো বস্তুই এর দর্শন ও এর প্রতিদান বা পুরস্কারের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। অনুরূপভাবেই হযরত ইবরাহীম তাঁর প্রভুর প্রত্যেকটি কালেমার আদেশ পালন করেছেন, তিনি না এর দর্শন জানতে চেয়েছেন, না এর পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। হুকুম এসেছে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার, অমনি আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। হুকুম হয়েছে, নিজের দেশ ও জাতিকে ত্যাগ করে হিজরত করার, সাথে সাথেই হিজরত করেছেন। আদেশ এসেছে, পুত্রের গলায় ছুরি চালাও তখনই পুত্রকে কুরবানী করার জন্য উদ্যত হয়েছেন। এ পরীক্ষামূলক আদেশসমূহ বিশেষ ধরনের হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনে এ আদেশ-সমূহকে (كلمات) কালিমাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র কুরবানী করার পরীক্ষা

এমনিতেই এ পরীক্ষাসমূহের সবগুলোই ছিল অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে প্রাণপ্রিয় সন্তান কুরবানী করার পরীক্ষাটা এরূপ কঠিন ছিল যে, এতে উত্তীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা এর চিন্তা করাটাই ছিল এক মহান পরীক্ষা। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) যখন এ পরীক্ষায়ও পুরোপুরি উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট এ অঙ্গিকার করেছেন যে, اِنِّىْ جَاعِلُكَ اِمَامًا। (আমি তোমাকে মানব জাতির নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবো) এটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি যে, এর মধ্যে একই সাথে দুটি ওয়াদা শামীল রয়েছে।

এক ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর থেকে কয়েকটি মর্যাদাবান জাতির উৎপত্তি হবে।

দুই ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের সকলের মহান নেতা হবেন। এ মহান পুরস্কারের অধিকারী তিনি এজন্য হয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর জন্য কেবল নিজের পরিবার পরিজন ও নিজের জাতিকেই পরিত্যাগ করেননি বরং তিনি এক বিরাণ মরুভূমিতে নিজের একমাত্র প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছেন, সে সন্তান তাঁর বৃদ্ধ বয়সের এবং একাকী জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তাওরাতে যদিও ইহুদীরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন চরিতের এ বিশেষ অংশে অনেক বিকৃতি ঘটিয়েছে তথাপি সামান্য শব্দের পরিবর্তন সহকারে এ প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান রয়েছে দেখুন, বাইবেলের আদিপুস্তক ২২ অনুচ্ছেদ।

"পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ হইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু বলিতেছেন, তুমি এই কার্য্য করিলে, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে

www.pathagar.com

অসম্মত হইলে না, এই হেতু আমি আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব, এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব ; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে; আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে ; কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ।"–আদিপুস্তক ২২ ঃ ১৫-১৮

এ প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে আল্লাহ তাআলা হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) উভয়ের বংশ থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি সৃষ্টি করেছেন যাদের সকলের পূর্বসূরী ও আধ্যাত্মিক নেতা সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) অতপর তাদের মধ্যে খ্যাতিমান বাদশাহও সৃষ্টি হয়েছেন যারা শত্রুদের রাজধানী জয় করেছেন, তাদের একটি শাখা থেকে শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব হয়েছে, যার মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসীর ঈমান ও হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

মুশরিকরা আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম

আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যখন এ ওয়াদা করেছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন নেতৃত্বের এ ওয়াদা কি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট না তাঁর বংশধরগণও এর মধ্যে শামিল ? এ প্রশ্নের জবাবে এরশাদ হয়েছে ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ –"যারা যালেম হবে তারা আমার এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হবে না।" কুরআনে যালেম শব্দটি দ্বারা কেবল সেসব লোকই বুঝায় না যারা অন্যের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করে, বরং এদের চেয়ে সেই লোকদেরকেই বেশি বুঝানো হয় যারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করেছে। যেমন– فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ –"সুতরাং তাদের মধ্যে কতক লোক স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুমকারী আর কতক লোক মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী।"–সূরা আল ফাতির ঃ ৩২। وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ –"উভয়ের বংশধরদের মধ্যে সৎকর্মশীলও আছে এবং নিজেদের আত্মার প্রতি স্পষ্ট যুলুমকারীও রয়েছে।"–সূরা আস সাফফাত ঃ ১১৩

সারকথা হলো, তোমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের নীতি ও আদর্শের ওপর কায়েম থাকবে এবং আমার দেয়া শরীআত ও হেদায়াতের ওপর স্থির থাকবে। তোমার পর তারা উত্তরাধীকারী সূত্রে এ নেতৃত্ব লাভ করবে। পক্ষান্তরে তারা বেঈমানী ও নাফরমানী করে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে। তারা এ নেতৃত্বের পদমর্যাদা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে।

এ ঘোষণা এখানে এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে বনী ইসরাঈল ও বনী ইসমাঈল উভয়ের নিকটই এ সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়ার যে গর্ব-অহংকার তাদের মধ্যে রয়েছে এবং যে কারণে তারা নিজেদেরকে ঈমান ও আমলের সকল দায়িত্ব মুক্ত মনে করছে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ যারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত, তারা কখনই ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধীকারীদের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

নয়। এ সত্য কথাটি আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তখনই জানিয়ে দিয়েছেন যখন তিনি তাঁকে নেতৃত্বের মহান মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আমাদের ধারণা যে, ওপরে আমরা তাওরাতের যে বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছি তাতে এ ঘোষণাও অবশ্যই ছিল। কিন্তু এটা যেহেতু ইহুদীদের হীন উদ্দেশ্যের বিপরীত ছিল সেহেতু তারা যেভাবে এ ক্রমধারার অন্যান্য ঘটনাবলীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে অনুরূপভাবে এ ঘোষণাটি কেউ তাদের ইচ্ছার বিপরীত হওয়ার কারণে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। ওস্তাদ ইমাম (র) তাঁর 'যাবীহ' পুস্তিকায় এসব পরিবর্তন ও বিকৃতির ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এ পুস্তিকাটি পড়া আবশ্যক।

আয়াত ঃ ১২৫

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

بَيْتُ-এর উদ্দেশ্য বায়তুল্লাহ

بَيْتُ (ঘর) এর উদ্দেশ্য বায়তুল্লাহ বা কা'বাঘর। পবিত্র কুরআনে এ আকৃতিতে 'بَيْتُ' শব্দটি কা'বাঘরের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। তাওরাতের আদিপুস্তকের বার নম্বর অনুচ্ছেদে এটিকে 'بَيْتُ اِيل' দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে ইবরানী ভাষায় আল্লাহকে اِيل (ঈল) বলা হয়।

مَثَابَةً-এর অর্থ

مَثَابَةً-এর অর্থ কেন্দ্র ও প্রত্যাবর্তন স্থল, যার কাছে সবাই ফিরে আসে, যার সাথে সবাই জড়িত ও সম্পৃক্ত এবং যা সকলের জন্য কেন্দ্র ও কিবলা।

لِلنَّاسِ (মানুষের জন্য)-এর অর্থ

এখানে 'لِلنَّاسِ' -এর অর্থ হচ্ছে সেসব লোক, اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ (আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব) এর মধ্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর সেসব সন্তান যাদের নেতৃত্ব তিনি লাভ করেছেন, চাই তারা হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশ থেকে হোক। কিংবা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ পরম্পরা থেকে হোক সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর সকল সন্তানের নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা এ সিদ্ধান্তও দিয়েছেন যে, আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যে ঘর তিনি নির্মাণ করবেন তা ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরগণের কেন্দ্র ও কিবলা হবে। উপরন্তু ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানগণের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহ এ ঘরের বরকতের অংশ পাবে। সামনে এর আলোচনা আসছে।

www.pathagar.com

তাওরাতে কা'বাঘরের বর্ণনা

এ বিষয়ে ওস্তাদ ইমাম ফারাহী (র) তাঁর নিম্নোক্ত অনুসন্ধান বর্ণনা করেন ঃ

তাওরাত অধ্যয়ন করলে জানা যায় ইহুদীদের নিকট প্রথমেই এ আদেশ এসেছিলো যে, তারা পবিত্র মক্কার দিক তাদের প্রধান কুরবানীগুলোর কিবলা নির্ধারণ করবে। এ সারকথার বিস্তারিত বিবরণ হলো, কুরবানীর জন্য আবশ্যক ছিল যে, কুরবানী ইবাদাতগাহে আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করতে হবে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'ی' বর্ণে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাদের নিকট যে কুরবানীর নাম 'কুদসুল আকদাস' ছিল তাকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে কুরবানী করা আবশ্যক ছিল। অনুরূপভাবে বার্ষিক কুরবানী, যাকে তারা সবচেয়ে বড় কুরবানী মনে করতো সেটাকেও দক্ষিণ মুখীই করা হতো। ইহুদীরা হয়তো এ বিষয়ের মূল রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো। যেমন আমরা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের 'ی' বর্ণে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছি, অথবা তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করতে চায়নি। বরং তারা নিজেদের অভ্যাসগতভাবে এর ওপর পর্দা পড়ে থাকাটাই পসন্দ করেছে। যেমন কবি বলেছেন ঃ

"সত্য পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন—এটা কখনো কল্যাণকর নয়।"

অথচ একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, প্রথম থেকেই তাদের ইবাদাতখানাগুলো উত্তরমুখী ছিল।"–যাত্রাপুস্তক ২৭ ঃ ৯

বরকত হাসিল করার জন্য তাদের বসবাসের ঘর দক্ষিণমুখী করে বানানো হতো। তাছাড়া যাত্রাপুস্তক ৪০ ঃ ২২-২৪ বর্ণিত হয়েছে ঃ

"পরে তিনি আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্করিণীর বাহিরে সমাগম-তাম্বুতে মেজ রাখিলেন, এবং তাহার উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে রুটী সাজাইয়া রাখিলেন ; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। পরে তিনি সমাগম-তাম্বুতে মেজের সম্মুখে আবাসের পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে দীপ বৃক্ষ রাখিলেন।"–যাত্রাপুস্তক ৪০ ঃ ২২-২৪

আমাদের মতে এ সকল বিন্যাসের মূল দর্শন হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে আসবে তার মুখ হবে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ পবিত্র মক্কা এবং ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানীর স্থানের দিকে। একথা থেকে এর প্রতি আরো সমর্থন পাওয়া যায় যে, শিবিরের মধ্যে পবিত্র বাসস্থানও দক্ষিণমুখী ছিল এবং জবাই করার স্থান তার সামনের দরজার দিকে ছিল। এ কারণে যে ব্যক্তি 'কুদসুল আকদাস' কুরবানী করতো সে জবাই করার স্থানের উত্তর দিকে দাঁড়াতো, যাতে তার মুখমণ্ডল আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তির বাসস্থানের দিকে হতে পারে, অর্থাৎ তার মুখমণ্ডল অবধারিতভাবে কা'বাঘরের দিকে হতো যার পাশেই মারওয়া অবস্থিত এবং যার কুরবানীর প্রথম স্থান হওয়ার মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে ইসমাঈল (আ)-এর বসাস্থান।"–রিসালায় যাবীহ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

এ বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কা'বাঘর যেভাবে আমাদের নামায ও কুরবানীর কিবলা অনুরূপভাবে প্রথম থেকেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকল সন্তানের ইবাদাত

www.pathagar.com

ও কুরবানীর কিবলাও কা'বাঘরকেই নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যেমন কা'বাঘরের দিকে তাদের ইবাদাতখানার কিবলা ছিল। এরপর সে দিকেই মুখ করেই বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ইহুদীরা কেবল গোঁড়ামীর কারণেই এ বাস্তব সত্যটিকে গোপন করার অপচেষ্টা চালায় সামনে এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে মাওলানা ফারাহী (র) বলেন ঃ

"আমাদের উল্লেখিত দাবীর আরো সমর্থন একথা থেকে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানকে ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরের জন্য কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সংক্ষিপ্ত কথার বিবরণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় সন্তানদের দ্বারা পূর্ব ও উত্তর আরবে জনবসতি গড়ে তোলেন এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানকে তাদের কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন তাওরাতে প্রমাণিত যে, তার সকল ভাইয়ের সামনে তার বসতিস্থাপন।"–যাত্রাপুস্তক ২৫ ঃ ১৮ এ আছে ঃ

"আর তাঁহার সন্তানগণ হবীলা অবধি অশূরিয়ার দিকে মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্যন্ত বসতি করিল ; তিনি তাঁহার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতিস্থান পাইলেন।"

এবং তাওরাতের যাত্রাপুস্তক ১৫ ঃ ১২ বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আর সে বনর্দদ্দভস্বরূপ মনুষ্য হইবে ; তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধ ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধ হইবে ; সে তাহার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে।"

"সব ভাইদের সামনে থাকার যে ব্যাখ্যা আমরা করেছি তা ছাড়া নির্ভুলভাবে অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এটা সকলেরই জানা কথা যে, বনী ইসরাঈল ছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আন্যান্য সকল সন্তান পূর্ব ও উত্তর দিকে বসতিস্থাপন করেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অবস্থান তাদের সকলের সামনে তখনই হতে পারবে যখন একথা স্বীকার করে নেয়া হবে যে, বনী ইসমাঈলের বসতি তাদের সকলের কিবলার দিকে ছিল। আমাদের মতে একথা মেনে নেয়া কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। কেননা এটা জানা কথা যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সকলের নেতা বানিয়েছিলেন এবং তার তিরোধানের পর হযরত ইসমাঈল (আ) উত্তরাধীকারী সূত্রে সেই নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছেন। এ বিষয়ের প্রতি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে।[১]–মাওলানা সামনে আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত আয়াত উদ্ধৃত করেছেন।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى (ইবরাহীম (আ)-এর বাসস্থানের একাংশে নামাযের জায়গা তৈরি করো) এ আয়াতাংশটি পূর্বোক্ত আয়াতাংশেরই অধিকতর বাখ্যা স্বরূপ। এ কারণেই উক্ত আয়াতাংশের সাথে "আমরা বলেছি" অথবা "আমরা আদেশ করেছি।" এর উল্লখ করার প্রয়োজন ছিল না। একই কথা দুটি বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন দুটি

১. দেখুন, মাওলানা ফারাহী (র) কর্তৃক রচিত যবীহ গ্রন্থে ষোল নং অনুচ্ছেদ।

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরের জন্য বায়তুল্লাহকে (কা'বাঘর) কেন্দ্র ও কিবলা বানানোর ফায়সালা করেছেন। অতপর বলেছেন, এ ফায়সালাকে কাজে পরিণত করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানগণকে এ আদেশ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর বাসস্থানের একাংশে নামাযের একটা জায়গা তৈরি করো।

"মাকামে ইবরাহীম"-এর ব্যাখ্যা

এ আয়াতে "মাকামে ইবরাহীম" শব্দটি এসেছে। মাকাম দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে। একদলের মতে এ দ্বারা সেই পাথরকে বুঝানো হয়েছে যার ওপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বাঘর নির্মাণ করেছিলেন বলে খ্যাতি রয়েছে। অপর দলের মতে[১] হারামের সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। এ দলটি মাকাম শব্দটি দ্বারা দাঁড়াবার নির্দিষ্ট কোনো জায়গার পরিবর্তে বাসস্থান ও আবাসস্থলের অর্থ গ্রহণ করেছে। আমাদের মতে এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার মধ্যে ব্যাপকতা ও সমন্বয় রয়েছে এবং সেই সাথে এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকও রয়েছে। তাহলো যে উদ্দেশ্যে এখানে একথা বলা হয়েছে, বাক্য বিন্যাসের বিবেচনায় এ ব্যাখ্যা থেকে সে উদ্দেশ্য অধিকতর স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে একথা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, এ ঘর ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরের জন্য কিবলা। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় নিবাসে আল্লাহর আদেশে সর্বপ্রথম এ ঘর নির্মাণ করেন যেখানে তিনি হিজরতের পর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-সহ বসবাস শুরু করেন।

আমাদের ও ইহুদীদের মাঝে বিতর্কিত বিষয়

এ বিষয়টি আমাদের ও ইহুদীদের মাঝে একটি বিরাট বিতর্কিত বিষয়। ইহুদীরা কা'বাঘর ও মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কুরবানীর ইতিহাসে এবং তাঁর হিজরতের ঘটনায় অত্যন্ত জঘন্য ধরনের বিকৃতি ঘটিয়েছে। এ বিকৃতির মাধ্যমে তারা একথাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যে ছেলের কুরবানী করেছিলেন তিনি হচ্ছেন হযরত ইসহাক (আ) ইসমাঈল (আ) নয়। তিনি যে জায়গায় কুরবানী করেছেন সেটি ছিল এরোশেলস নামক পাহাড়ের পাদদেশ মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশ নয়। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তিনি যে ঘর নির্মাণ করেছিলেন সেটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস কা'বা শরীফ নয়। হিজরতের পর তিনি কিনানে বসবাস শুরু করেন, কা'বাঘরের নিকটে নয়। তাওরাতই যেহেতু এসব বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ অথবা খণ্ডন করার একমাত্র মাধ্যম আর ইহুদীরা তাওরাতে নিজেদের ইচ্ছামত বিকৃতি ঘটিয়েছে—যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেহেতু প্রকৃত সত্যের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করা কাজটি বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু আমার ওস্তাদ মাওলানা ফারাহী (র) তাঁর 'যবীহ' গ্রন্থে তাওরাতের দলিল প্রমাণ দ্বারাই

১. উল্লেখ যে, এ দলের মধ্যে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আতা প্রমুখ বড় বড় তাফসীরকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

www.pathagar.com

ইহুদীদের সকল বিকৃতির পর্দা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাওরাতের বর্ণনা থেকেই তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বদেশ ত্যাগ করার পর হযরত ইসহাক (আ)-এর মাতাকে কিনানে রেখে তিনি নিজেই হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাতাকে সাথে নিয়ে সপ্তকূপের জনশূন্য মরু প্রান্তরে অবস্থান করেন। এ জায়গা অনাবাদী একটি জায়গা ছিল। এ কারণে তিনি এখানে সাতটি কূপ খনন করেন ও গাছ-পালা লাগান। এখানেই তাঁকে তার একমাত্র প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কুরবানী করার আদেশ করা হয়। তিনি হযরত ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে মারওয়া নামক ছোট পাহাড়টির পাদদেশে এসে কুরবানী করার আদেশ পালন করেন। এ পাহাড়ের নিকটেই তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর আবাস গড়ে তোলেন। অতপর এখান থেকে তিনি সপ্তকূপের নিকট ফিরে যান এবং নিজের অবস্থানের জন্য কা'বাঘরের নিকটবর্তী এমন জায়গা নির্বাচন করেন, যেখান থেকে যখন তখন হযরত ইসহাক (আ)-কেও দেখতে যাওয়া সম্ভব হয়।

মাওলানা ফরাহী (র) এমন বর্ণনা তাওরাতের নেহায়েত অখণ্ডনীয় দলীল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক প্রশ্নের সাথে মূল কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করলে তাতে কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় আমরা কেবল মূল কথাটা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করলাম। যারা বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তারা মাওলানা ফারাহী (র)-এর উক্ত গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করুন।

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন উক্ত এলাকায়ই অবস্থান করেন সিরিয়ায় নয় তখন ঐ এলাকাতেই নামাযের জন্য একটি কেন্দ্র নির্মাণের আদিষ্ট হওয়ার কথা। সুতরাং উক্ত আদেশ পালনার্থেই তিনি কা'বাঘর নির্মাণ করেছেন তাওরাতের যাত্রাপুস্তক অধ্যায়ে 'বায়তে ঈল' নামে তার বর্ণনা এসেছে। বায়তুল্লাহ ও বায়তে ঈল এর অর্থ সম্পূর্ণ এক। ইবরানী ভাষায় ঈল এর অর্থ আল্লাহ। এ 'বায়তে ঈল' দ্বারা ইহুদীরা যদি বায়তুল মুকাদ্দাসের অর্থ গ্রহণ করে তাহলে ইবরাহীম (আ) যে ঐ এলাকায় বসবাস করেননি সে কথা বাদ দিলেও ইহুদীদের এ দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার সবচেয়ে বড় দলিল এই যে, একথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শত শত বছর পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে নির্মাণ করা হয়েছে বস্তুত কা'বা ঘর প্রাচীন ও প্রথম হওয়ার কারণে কুরআন তাকে 'বায়তুল আতিক' এবং 'আউয়ালু বায়ত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে। اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ج فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ ، مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا - ال عمارن : ٩٧ –"নিশ্চয়ই প্রথম ঘর যা লোকদের তথা ইবরাহীমের সন্তানদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে সেটাই যা বাক্কায়[১] অবস্থিত। বরকতময় এবং সারা বিশ্বের জন্য হেদায়াতের উৎস। তাতে তার (প্রথম হওয়ার) অতিশয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে। এটা ইবরাহীম (আ)-এর বাসস্থান (এবং তার ঐতিহ্য হলো যে) যে এ ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।

১. বাক্কা অর্থ শহর। প্রাচীন আসমানী গ্রন্থে এটাই মক্কার নাম। ইহুদীরা বিকৃত করে একে বেকা উপত্যকা করেছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

مُصَلًّى (মুসাল্লা) দ্বারা বায়তুল্লাহর ব্যাখ্যা

এখানে বায়তুল্লাহকে مُـصَـلًّى (মুসাল্লা) অর্থাৎ 'নামাযের স্থান' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এ ঘর নির্মাণের মূল লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করাই এর উদ্দেশ্য যে, এ ঘর নামাযের কেন্দ্র হবে। হযরত ইসমাঈল (আ)-কে এ ঘরের রমহতের আশ্রয়ে বসবাস স্থাপন করানোর সময় হযরত ইবরাহীম (আ) এ দোয়া করেছিলেন, رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ (হে আমাদের প্রতিপালক, আমি এখানে এজন্য আমার সন্তানের বসতিস্থাপন করিয়েছি যে, সে নামায কায়েম করবে।) কিন্তু জাহেলী যুগে এ ঘরের মুশরিক ও বেদ'আতী মুতাওল্লীগণ এ ঘরকে বিদ'আতের এক আড্ডাখানা বানিয়ে নিয়েছে। এবং তাদের নামাযে শিষ দেয়া ও তালি বাজানোর এক পৌত্তলিক কুসংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে। এ দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয়, এখানে 'مُـصَـلًّى' শব্দের মধ্যে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উভয় শাখা নিজেদের কিবলার মূল উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে।[১] এখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন তিনি এ ঘরের মূল উদ্দেশ্যের নবায়ন করেছেন।

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ الاية ঃ عهد যখন الى অব্যয় এর সাথে ব্যবহৃত তখন এর অর্থ হয় কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা অথবা তাকে কোনো শর্তের অনুবর্তী করা যেমন, وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا - طه : ١١٥ -"এবং আমি ইতিপূর্বে আদমকে এক শর্তের অধীন করেছি। সে সেটাকে ভুলে গিয়েছে এবং আমি তার মধ্যে ইচ্ছার দৃঢ়তা পাইনি।" اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ - يس : ٦٠ -"হে আদম সন্তান ! আমি কি তোমাদেরকে এ শর্তের অধীন করেছিলাম না যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী কর না ? অতএব عَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ-এর মর্মার্থ এই দাঁড়াল যে, আমি তাদের ওপরে কা'বাঘরের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছি এবং তাদেরকে এ শর্ত দিয়েছি যে, তারা এ ঘরের তাওয়াফকারী, এ'তেকাফকারী ও রুকূ'-সাজদাকারীদের জন্য এ ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র রাখবে।

কা'বাঘর পবিত্রকরণের উদ্দেশ্য

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র রাখার অর্থ সুস্পষ্ট। তাহলো ঐ সকল জিনিস থেকে পাক-পবিত্র রাখা যা এ ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যের বিপরীত। এ অর্থ ব্যাপক। অর্থাৎ এটা আবর্জনা হোক বা নাপাকী হোক যাতে ইবাদাতকারীগণের মেজাজ ও প্রকৃতিতে মলিনতা সৃষ্টি হয় অথবা তা খেল তামাশাকারীদের কোলাহল হোক, যাতে ইবাদাতকারীগণের একাগ্রতার বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় অথবা মূর্তি ও প্রতিমা হোক যা আল্লাহর

১. প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পবিত্র কা'বা ও নামায—এ দুটিকেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থে একমাত্র কুরবানীরই উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের ইবাদাতখানাও এখন আর নামাযের ঘর নয় বরং কুরবানীর ঘর হিসেবে বহাল আছে। আমার কখনো কখনো ধারণা হয় যে, তাদের নামাযের মত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবার এটাও একটা কারণ যে, তারা আসল কেবলা পবিত্র কা'বা থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

ঘরকে শিরক ও মূর্তিপূজার আখড়া বানিয়ে রাখে এ সকল জিনিস থেকে এ ঘরকে পাক-পবিত্র রাখার দায়িত্ব হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ওপর অর্পণ করা হয়েছিলো। ইতিহাস সাক্ষ্য তাঁরা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের সন্তানরা যখন শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন তারা কা'বাঘরের অভিভাবকত্বের বিপরীত এর কোণায় কোণায় মূর্তিস্থাপন করে এবং যারা আল্লাহ্ তাআলার যিকিরের ধ্বনি, তাওয়াফ ও এ'তিকাফের সৌন্দর্য এবং রুকূ' ও সাজদায় মস্তক অবনত করার মাধ্যমে কা'বাঘরকে নতুন করে আবাদ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে এ লোকেরা সীমাহীন যুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে কা'বাঘর থেকে বহিষ্কার করেছে। কুরআন এখানে কা'বাঘরের প্রারম্ভিক ইতিহাসের সেই বাস্তব সত্যের প্রতি এজন্য ইঙ্গিত করেছে যাতে কুরাইশরা এ ঘরের ব্যাপারে নিজেদের দায়দায়িত্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু যখন তারা তা বুঝতে অস্বীকার করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কা'বাঘরের অভিভাবকত্বের পদমর্যাদা থেকে অপসারণ করার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ـ التوبة : ١٨-١٧ "মুশরিকদের এ অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহের পরিচালক হবে। অথচ তারা নিজেদের কুফরীর প্রতি সাক্ষী। এ লোকদের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে। এবং তারাই জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহর মসজিদসমূহের কার্যনিবাহক সেই লোকেরাই হতে পারবে, যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১৭-১৮

তাওয়াফের অর্থ ও তাৎপর্য

এখানে কা'বাঘরকে তিনটি জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট করার আদেশ করা হয়েছে। তাওয়াফ, এ'তেকাফ এবং রুকূ' ও সাজদা। তাওয়াফের অর্থ কা'বাঘরের চতুর্দিকে চক্কর লাগানো। নবী করীম (স)-এর সুন্নাহ্ তাওয়াফের মূল ইবরাহীমি পদ্ধতিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাওয়াফ এক প্রকার নামায। তবে এ নামায কেবল কা'বাঘরেই আদায় করা সম্ভব। কা'বাঘর ছাড়া অন্য কোথাও আদায় করা সম্ভব নয়। এর এ বিশেষত্বের কারণে প্রথমেই এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামায গাম্ভীর্য ও শিষ্টাচারের পরিসীমার মধ্যে থেকে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালোবাসার জযবা ও আবেগ যতটা প্রকাশ পায় ততটা অন্য কিছুতে প্রকাশ পায় না। মানুষের মধ্যে যদি সঠিক ঈমানী জযবা বর্তমান থাকে তাহলে তাওয়াফের মধ্যে প্রদীপ ও পতঙ্গের কাহিনী একটি বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়।

www.pathagar.com

এ'তেকাফ এর তাৎপর্য

عُكُوْف، عَاكِف থেকে নির্গত। এর মূলতত্ত্ব হলো, অন্যান্য বস্তুর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিশেষ কোনো জিনিস গ্রহণ করা। এ থেকেই হয়েছে এ'তেকাফ। এটা ধ্যান-মগ্নতা, যিকির ও চিন্তার ইবাদাত। বান্দা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বীয় প্রতিপালককে স্মরণ করার জন্য নির্জনতা অবলম্বন করবে—এর নামই এ'তেকাফ। এর নির্ভুল পদ্ধতি ও প্রণালী নবী করীম (স) স্বীয় সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে পেশ করেছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালোবাসার আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করা তাওয়াফের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার যিকির-এর ওপর বিবেক ও মনকে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করতে পারা এ'তেকাফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রুকূ' ও সাজদার তাৎপর্য

رُكَّعٌ - رَاكِعٌ -এর বহুবচন। এবং سُجُوْدٌ - سَاجِدٌ -এর বহুবচন। রুকূ' ও সাজদার আভিধানিক বিশ্লেষণ ৩৪-৪২ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উভয় শব্দই নামাযের অর্থ প্রকাশ করার জন্য এসেছে। রুকূ' ও সাজদা দ্বারা নামাযের অর্থ প্রকাশ করার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। একটি হলো—এ দুটি জিনিসই নামাযের অন্যতম ও প্রাচীনতম রুকন। নামাযের প্রকাশ্য আকৃতিতে যত পরিবর্তনই হয়েছে কিন্তু এ দুটি জিনিস যেমনিভাবে আমাদের নামাযের মধ্যে শামিল রয়েছে অনুরূপভাবে ইবরাহীমী নামাযেও শামিল ছিল। অপর বিষয়টি হলো—নামাযের উদ্দেশ্য কেবল যিকির ও চিন্তা-গবেষণাই নয় বরং এর বিশেষ গঠন ও আকৃতিও এর উদ্দেশ্য। আর রুকূ' ও সাজদার মধ্যেই রয়েছে নামাযের গঠন ও আকৃতির আসল সৌন্দর্য।

আয়াত ঃ ১২৬

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

হারেম এলাকার দুটি বিশেষ সমস্যা

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ -"হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর।" اٰمِنَ -এর অর্থ প্রশান্তি ও নিরাপত্তা। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া করেছিলেন সে জায়গার জন্য যেখানে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বসিয়েছেন এবং কা'বাঘর নির্মাণ করেছেন। আগেই জানা গেছে যে, এ এলাকা সভ্যতা-সংস্কৃতি, চাষাবাদ ও উর্বরতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলো। ঘরবাড়ী ও ঠিকানাবিহীন

www.pathagar.com

গোত্রসমূহ পানি ও চারণ ভূমির তালাশে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সফর করত। আয় রোযগারের উপায় ছিল কেবল পশু চারণ, শিকার করা, অথবা লুটপাট করা। এ কারণে বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে এ এলাকায় দুটি সমস্যা বড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি হলো নিরাপত্তা এবং অপরটি ছিলো খাদ্য।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাকবুল দোয়া

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উল্লেখিত দোয়া উপরোক্ত দুটি বিষয়ের জন্য ছিল। আল্লাহ তাআলা এ দুটি দোয়া যেভাবে কবুল করেছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর ও কা'বার অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এর যে বরকত প্রকাশিত হয়েছে তা ইতিহাসের এমন একটি জলন্ত ও বাস্তব সত্য যা কোনো কট্টর বিরোধী লোকও অস্বীকার করতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা এ দুটি জিনিস কেবলমাত্র কা'বাঘরেরই অসীলায় দান করেছেন। কাজেই এ ঘরের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য এটা ছিল একটা বিস্ময়কর নিদর্শন। এ ঘরের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় ও পন্থা অবলম্বন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কুরআনে এ ঘরকে বরকতময় (বরকত ও কল্যাণের ঝর্ণাধারা) বলা হয়েছে এটাও তার একটি দিক।

কি কি ভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবুল হয়েছে

এবার দেখুন, এ এলাকার বসবাসকারীদের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবুল হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, আল্লাহ তাআলা কেবল বায়তুল্লাহকেই নয় বরং যে স্থানে বায়তুল্লাহ অবস্থিত সে স্থানকেও সম্মানিত করেছেন। সেখানে ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা, কারো ওপর আক্রমণ করা, কাউকে হত্যা করা সবই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সেখানে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে প্রবেশ করবে। এতে কোনো প্রকার বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এর সীমানার বাইরে পরিবেশ বড়ই বিপদসংকুল ছিল কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিপালক এ পরিসীমার মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করে রেখেছেন। উপরন্তু এর সীমানার মধ্যে কোনো পশুকেও যে কোনো ধরনের কষ্ট দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত ভাষায় এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ۔ عَنكبوت : ٦٧ "তারা কি দেখে না যে, আমরা তাদের জন্য এক নিরাপদ হারেম বানিয়ে দিয়েছি অথচ এর চতুষ্পার্শের অবস্থা এই যে, দিন দুপুরেও লোকেরা অপহৃত হচ্ছে।"

–সূরা আনকাবুত ঃ ৬৭

হারাম মাসসমূহ

দ্বিতীয় বিষয় ঃ এ ঘরের হজ্জ ও যিয়ারত করার জন্য বছরের চার চারটি মাসকেও সম্মানিত করে দেয়া হয়েছে। এ মাসগুলোতে ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারী করা, রক্ত

প্রবাহিত করা, ফাসাদ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, চরম অসভ্য লোকও এ মাসগুলোর সম্মানার্থে তরবারী খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত এবং চরম বিপদ সঙ্কুল এলাকাও সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যেত—যাতে দেশের প্রত্যেক এলাকা ও প্রত্যেক কোণা থেকে লোকেরা হজ্জ ও উমরা করার জন্য আসতে পারে এবং নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে ঘরে ফিরে যেতে পারে।

বহিরাগত ভয় থেকে নিরাপত্তা

তৃতীয় বিষয় ঃ আল্লাহ তাআলা এ ঘরকে বাইরের শত্রুর আক্রমণের আশংকা থেকেও সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ও নিরাপদ করেছেন। এ ঘরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রথমতঃ বাইরের কোনো শত্রু কখনো এ ঘরে হামলা করার দুঃসাহসই করেনি। যদি কেউ কখনো করেও থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পরাক্রমশালী ক্ষমতা দ্বারা তাকে চরম ভীতিকর শাস্তি প্রদান করেছেন। আবরাহার সৈনিকদের যে পরিণতি হয়েছে তা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে রয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা ফীলেও তার উল্লেখ রয়েছে।

আর্থিক সচ্ছলতার বিভিন্ন দিক

এ ঘরের বরকতে এ এলাকার অধিবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতার দায় উন্মুক্ত হয়েছে। এখানে আমরা এর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করছি ঃ

প্রথমত, এ স্থানটি হজ্জের কেন্দ্র নির্ধারিত হওয়ার ফলে এখানে লোকদের আগমন বেড়ে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত যত সম্প্রসারিত হতে থাকে সে অনুপাতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে লোকদের আগমন ঘটতে থাকে। আর সে অনুপাতেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাহির থেকে সব ধরনের পণ্য-সামগ্রী মক্কার বাজারে আসতে থাকে এবং এখান থেকে বাহিরে রপ্তানীযোগ্য পণ্য রপ্তানী হতে থাকে। এ ঘর নির্মাণের পূর্বে এ এলাকার আয়-রোজগার পশু পালন, শিকার ও লুটতরাজের মধ্যে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল। এ ঘর নির্মাণের পর ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সব ধরনের পণ্য দ্রব্য ফলমূল অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয় এতে মানুষের জীবন জীবিকায় অত্যন্ত আনন্দদায়ক পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয়ত, কা'বাঘরের তত্ত্বাবধানের কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এমন সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছে যে, সমগ্র আরবের ওপর তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কাফেলা সিরিয়া, ইয়ামেন ও অন্যান্য আরব দেশগুলোতে নিয়মিত যাতায়াত করতো। কেউ তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাহস করত না। বরং ইতিহাস থেকে জানা যায় তারা যেসব বড় বড় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত সেসব জায়গায় বসবাসকারী গোত্রসমূহ তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে তাদের সাথে তাদের হেফাযত ও পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে সহচর বা পথপ্রদর্শক সরবরাহ করতো। "লিঈলাফ" এ (কুরাইশে) পবিত্র কুরআন কুরাইশদেরকে এ বাণিজ্যিক সফরের উদ্ধৃতি

www.pathagar.com

দিয়ে তাদের কাছে দাবী জানিয়েছে যে, فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ○الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ○وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ "তাদের উচিত এ ঘরের রবের দাসত্ব করা যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয়-ভীতি ও আশংকা থেকে নির্ভিক ও নিশ্চিন্ত করেছেন।"-(সূরা কুরাইশ ঃ ৩-৪)। কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা এ ঘরের বরকতেই জনমানব শূন্য বিপদ সঙ্কুল মরু প্রান্তরে নিরাপত্তা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং তাদের আয়-রোজগারের পথ প্রশস্ত হয়ে গেছে।

এক প্রশ্নের জবাব

উপরোক্ত আলোচনার সবদিক অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য এখানে এমন একটি বিষয় রয়েছে যাতে কারো কারো মনে খটকা লাগতে পারে—সেটা হলো এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের সন্তানদের জীবিকার জন্য যে দোয়া করেছেন তা বিশেষভাবে ফলের জীবিকার ব্যাপার ছিল। নিজের সন্তানদের জীবিকা ও কল্যাণের জন্য দোয়া করা বিশেষ করে যখন তাদেরকে পানি ও তরুলতাবিহীন এক মরু প্রান্তরে বসবাসের জন্য বসিয়েছেন তখন তাদের জন্য এরূপ দোয়া করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) জীবিকার জন্য দোয়া করতে গিয়ে কেন ফলের শর্তযুক্ত করেছেন। বিবেক তো বলে যে, তিনি তাদের জীবিকার জন্য পরিপূর্ণ দোয়া করে বাদবাকী বিষয় আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতেন যে, তিনি যেভাবে ও যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেন তাদেরকে রিযক প্রদান করবেন। নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ ধরনের রিযকের প্রস্তাব করা একজন পয়গাম্বরের জন্য সংগত মনে হয়নি। পবিত্র কুরআনে অন্যান্য নবীগণের এমন কি খোদ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অন্যান্য যেসব দোয়া বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলেও দেখা যাবে যে, এ ধরনের নির্দিষ্ট করে কোনো কিছুর প্রস্তাব করা থেকে সাধারণত বিরত রয়েছেন।

ثمرات-এর অর্থ

আমাদের মতে এ খটকা কেবল এজন্যই সৃষ্টি হয়েছে যে, লোকেরা মনে করে ثمرات এর অর্থ শুধু ফল-ফলাদিই। অথচ ثمرات -এর অর্থ কেবল ফল-ফলাদিই নয় বরং ফল ফলাদির সাথে সাথে সব ধরনের পণ্য-দ্রব্য ও শষ্য জাতীয় জিনিসও এর অর্থের মধ্যে শামিল রয়েছে। ফল-ফলাদীর জন্য আরবীতে নির্দিষ্ট শব্দ হলো فوكه। ثمرات শব্দটি এর চাইতে ব্যাপক ও বিস্তৃত। পবিত্র কুরআনে এক জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করতে ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ (সব জিনিসের উৎপাদন) এর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ - القصص : ٥٧ "আমি কি এক নিরাপদ হারেমে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি যেখানে প্রত্যেক জিনিসের ফল আমদানী হয়?"-সূরা আল কাসাস ঃ ৫৭

www.pathagar.com

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, যে ভূখণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বসবাস করিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অনাবাদী এক মরু প্রান্তর ছিল। তাওরাতে এর জন্য "মরুভূমি" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) নিজেও স্বীয় দোয়ার মধ্যে একে غير ذى زرع (অনাবাদি উপত্যকা) নামে অভিহিত করেছেন। তাওরাত থেকে একথাও জানা যায় যে, পশু পালন ও শিকার করতে গিয়ে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল (আ)-এর সময় অতিবাহিত হয়ে যেতো যার কারণে তাঁর অধিকাংশ সময়ই বাহিরে কাটাতে হতো। এতে প্রতিয়মান হয় যে, জীবিকা নির্বাহ যেহেতু পশু পালন ও শিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যেহেতু তাঁর জীবনে স্থিরতা ও প্রশান্তি ছিল না অথচ হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে যে মিশন পরিপূর্ণ করা ও বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধানের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার জন্য স্থীরতা ও প্রশান্তি অত্যন্ত জরুরী ছিল। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্য এ দোয়া করেছেন যে, অনিশ্চিত জীবনের উদ্বেগ ও অস্থিরতার স্থলে সভ্য জীবনের স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ করতে পারেন যাতে তিনি আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদাত বন্দেগীর এ আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সেই মহান দায়িত্ব আনজাম দিতে পারেন যার জন্য তিনি নির্দেশিত হয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়া সূরা ইবরাহীমেও উদ্বৃত হয়েছে। সেখানে কিছু শব্দ বেশি আছে, তাতে সেই সত্যই সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যার প্রতি আমরা ইঙ্গিত করেছি ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের সন্নিকটে এক অনাবাদী উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমি এজন্য বসবাস করিয়েছি যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। অতপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি জীবিকা দান করুন। যাতে তারা আপনার শোকর আদায় করে।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭

এ দোয়ার শব্দসমূহের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হবে যে, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসমাঈল (আ) ও তার সন্তানদের জন্য স্বীয় পালনকর্তার নিকট দুটি জিনিসের জন্য আবেদন করেছেন এবং আবেদনের পক্ষে দুটি বিষয় সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আবেদন হলো ঃ আপনি লোকদের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূল দ্বারা জীবিকা প্রদান করুন। আর এ আবেদনের পক্ষে এ সুপারিশ পেশ করেছেন যে, এ ভূখণ্ড চাষাবাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ভূখণ্ড। তথাপিও আমি আমার সন্তানদেরকে এখানে কেবল এজন্য নিয়ে এসেছি যে, তারা আপনার পবিত্র ঘরের খেদমত করার এবং আপনার ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াত দেয়ার জন্য সালাত কায়েম করবে। চিন্তা করুন, ফলমূলের জীবিকার জন্য যখন তিনি এ কারণ পেশ করেছেন যে, এ ভূখণ্ড অনাবাদী ভূখণ্ড। তখন তাঁর দাবী ثمرات (ফলমূল) এর অর্থ শুধু

www.pathagar.com

ফল জাতীয় জীবিকা হতে পারে না বরং তার দাবী এটা হওয়াই যুক্তিযুক্ত যে, পশু পালন ও শিকারী অনিশ্চিত জীবনের অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে সভ্য ও স্থির জীবনের প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। আপনার ঘর ও আপনার দীনের বেশি বেশি খেদমত করতে পারবে। আয়াতের শেষে لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ এর যে, শব্দগুলো এসেছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ আমি তাদের জন্য যে প্রশান্ত ও স্থির জীবনের (settled life) আবেদন করেছি। তার অর্থ এ নয় যে, আমি তাদের জন্য ভোগ বিলাসের উপকরণের প্রাচুর্য চাই বরং আমি কেবল এজন্য আবেদন করেছি যে, তারা রুযী রোজগারের চিন্তামুক্ত হয়ে পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে বেশি বেশি করে স্বীয় মিশনের কাজ করার মাধ্যমে আপনার শুকরিয়ার হক আদায় করতে পারে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শর্ত

مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) জীবিকার জন্য যে, দোয়া করেছেন, তাঁতে তিনি এ শর্তযুক্ত করেছেন যে, এর হকদার হবে কেবল সেসব লোক যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে। নিসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ) এখানে এ শর্ত এজন্য লাগিয়েছেন যে, ওপরে ইমামত ও খেলাফতের বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে এ জবাব পেয়েছিলেন যে, যেসব লোক কুফর শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে, এ প্রতিশ্রুতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এ বিষয়টি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সামনে ছিল বিধায় তিনি এর ওপর কেয়াস করে নিজের দোয়ার মধ্যেও এ শর্তযুক্ত করেছেন যে, আমি এ দোয়া কেবল ঈমানদার লোকদের জন্য করছি। এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার প্রতি সন্তুষ্টির যে কত উঁচুস্তরে পৌছেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি যদি ইঙ্গিত পেয়ে যান যে, অমুক কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, অমনি তিনি তা করে ফেলেন। যদিও পরবর্তীতে সে ইঙ্গিতের কিছুটা ভিন্ন অর্থও প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ইমামত (নেতৃত্ব) ও খেলাফত এবং দুনিয়ার জীবিকা ও জীবনোপকরণের বিষয়াদিকে পরস্পর কেয়াস করা যথার্থ নয়। যারা আল্লাহর অবাধ্য তারা কখনো আল্লাহর খেলাফতের যোগ্য নয় কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তাদের এ অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদের জীবিকাও ছিনিয়ে নেবেন। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ অবাধ্য ও অনুগত সকলকেই রিযিক দিয়ে থাকেন। অবশ্য যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া রিযিক ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য চলে মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার যে শাশ্বত রীতি রয়েছে তো সামনে বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হবে। তাই আমরা এখানে কেবল সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত যথেষ্ট মনে করছি।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

www.pathagar.com

কা'বাঘর নির্মাণ করার সময় হযরত ইবরাহীম(আ)-এর দোয়া

قواعد - قاعده -এর বহুবচন। قاعده -এর অর্থ ভিত্তি বা ভিত্তিমূল। পূর্বোক্ত আয়াতে কা'বাঘর নির্মাণের আদেশ উদ্ধৃত হয়েছিলো। আলোচ্য আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপনের সময় হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) কি দোয়া করেছিলেন, এ ঘরের সাথে তাঁদের কি আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল এবং ভবিষ্যতে এ ঘর থেকে কোন্ ধরনের বিশ্বজোড়া কল্যাণ চালু করার জন্য তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ? হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন কাহিনীর এ অংশটি আমরা কেবল কুরআনের মাধ্যমেই অবগত হয়েছি। কেননা ইহুদীরা তাওরাতের এ বিশেষ অংশটি হয়ত বিলুপ্ত করে ফেলেছে। অথবা তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে বিকৃত করেছে। একথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এটা তার জীবন কাহিনীর এমন আবশ্যকীয় অংশ যা ছাড়া তাঁর জীবনী বিলকুল অসম্পূর্ণ বুঝা যায়। কুরআন এ বিকৃত অংশের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে একে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। এর মর্ম এটাও হতে পারে যে, আপনার ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াত দেয়ার জন্য আমরা এ ঘর নির্মাণ করছি। আপনি এ ঘরকে কবুল করুন। এবং আমাদের এ খেদমত কবুল করুন। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, আমরা আপনার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করার সময় কতিপয় প্রার্থনা করছি, আপনি আমাদের এ প্রার্থনাসমূহ কবুল করুন। আমরা এ দুটি অর্থে দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। প্রথমত, এ কারণে যে, এ অবস্থায় এ বাক্যটি বিশেষভাবে কা'বাঘরের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সামনে যে দোয়া রয়েছে সে পুরো দোয়ার ভূমিকায় পরিগণিত হবে। দ্বিতীয়ত, কা'বাঘর নির্মাণের এ কাজটি হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ তাআলার সেই হুকুম অনুযায়ী করেছিলেন যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে এর কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রথম থেকেই জানা ছিল।। اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এ আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলার এমন দুটি গুণ উদ্ধৃত হয়েছে যার ওপর ভরসা করে বান্দাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আর "একমাত্র আপনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" একথাটার মধ্যে যে সীমিত করণের অভিব্যক্তি রয়েছে তাতে দোয়াকারীদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ ভরসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আয়াত ঃ ১২৮

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

দোয়ার বিবরণ

দোয়ার মধ্যে বার বার رَبَّنَا শব্দটির পুনরাবৃত্তি এবং দোয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লাহ তাআলার গুণবাচক বিশেষ্যের উদ্ধৃতি দেয়া দোয়ার শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এর

দ্বারা দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এ দোয়া দুটি জিনিসের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

প্রথমত পিতা ও পুত্র উভয়ে যে দোয়া করেছিলেন, তা ছিল নিজেদেরকে মুসলিম বানানোর দোয়া। মুসলিম এর অর্থ হলো—আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। এ থেকে কয়েকটি মৌলিক সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রথম ঃ ঈমান, ইসলাম, আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া প্রার্থনার ক্ষেত্রে মানুষ সর্বপ্রথম নিজেকেই সামনে উপস্থাপন করে। এ বিষয়গুলো এতই জরুরী যে, এ থেকে কেউই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তা সে যত উঁচু মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের উচ্চতর মর্যাদার কোনো শেষ সীমা নেই। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ন্যায় পরিপূর্ণ ও অনেক উঁচু মর্যাদাশীল মুসলিম ও নিজেদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য দোয়া করছিলেন। অথচ তাদেরই মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর মানুষ ইসলামের নাম ও ইসলামের প্রাণ শক্তির সাথে পরিচিত হয়েছে। তৃতীয় মৌলিক বিষয় যা বিশেষভাবে এ অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বাক্যের বিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে, তা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) নিজেদের জীবনের সবচেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার সময় যখন তারা স্বীয় মিশনের কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন—নিজেদের জন্য যে বিষয়ে দোয়া করেছিলেন তা ছিল নিজেদেরকে মুসলমান বানানোর দোয়া ইহুদী ও খৃস্টান বানানোর দোয়া নয়।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) নিজেদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য দোয়া করার পাশাপাশি এ উপযুক্ত সময়ে নিজেদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম জাতি উত্থিত করার জন্যও দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ার মধ্যে যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর বংশধরের মধ্য থেকে শুধু পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেহেতু একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দোয়া হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। অতএব, তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির প্রকাশ ঘটেছে। যার জন্য এ দোয়া করা হয়েছিল। তাওরাত থেকে এ বিষয়টি উধাও করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুরবানীকৃত সন্তান সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান আছে যে, তোমার বংশধরের অসীলায় পৃথিবীর সকল জাতি বরকত লাভ করবে।

ارائت (ইরায়াত) শব্দের মর্ম

وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ঃ শব্দের মূল অর্থ হলো—"আমাদেরকে দেখাও" আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে স্বীয় দীন ও শরীআতের দিকে এরূপ অহীর মাধ্যমেও পথনির্দেশ করেন যার বাহ্যিক রূপ পবিত্র কুরআন। আবার কখনো স্বপ্ন যোগে অথবা কাশফের মাধ্যমে সরাসরি কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে উদ্দিষ্ট বিষয় কার্যকর করে দেখান অথবা বাতলে দেন। এ ধরনের পথপ্রদর্শন করাকে কুরআনের পরিভাষায় ارائت বলে।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে যে নবীগণ আগমন করেছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অধিকতর 'ارا ء ت' এর মাধ্যমেই পথপ্রদর্শন করা হতো। অর্থাৎ স্বপ্নযোগে তাদেরকে একটি বিষয় দেখিয়ে দেয়া হতো, অথবা আল্লাহর কোনো ফেরেশতা প্রকাশ্যে উদ্দিষ্ট কাজের প্রতি পথনির্দেশ করতো। তাওরাতের মাধ্যমে এর বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। এখানে দোয়ার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) এ 'ارا ء ت' এরই আবেদন করেছেন।

مَنَاسِكْ-এর ব্যাখ্যা

مَنَاسِكُ، مَنْسَكُ-এর বহুবচন। نسك-এর প্রকৃত অর্থ ধোয়া ও পাক-পবিত্র করা। نَسَكَ الثَّوْبُ।-এর অর্থ কাপড় ধুয়ে পাক পবিত্র করা। এ থেকেই এসেছে نسك; এর অর্থ হলো কুরবানী। কুরবানী বান্দাকে গুনাহর অপবিত্রতা, মলিনতা ও কদর্যতা থেকে পাক-পবিত্র করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিয়ে দেয়। অতপর এ থেকেই হয় منسك; এর অর্থ কুরবানী করার পদ্ধতি বা কুরবানীর স্থান। এর বহুবচন 'مناسك' এটি হজ্জের সকল ইবাদাত ও রীতি পরম্পরা হক্ব সামিল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ فَاذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ - البقرة : ٢٠٠ "যখন তোমরা হজ্জের বিধানসমূহ সম্পন্ন কর তখন আল্লাহকে স্মরণ কর।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২০০

তাওবার মর্ম

وَتُبْ عَلَيْنَا ঃ তাওবার মূল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা ও মনোযোগ ফিরানো, এটি 'عَلٰى' অব্যয়ের সাথে ব্যবহৃত হলে তখন এর মধ্যে রহমত ও দয়ার অর্থ লুকায়িত থাকে। ৩৭ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। وَتُبْ عَلَيْنَا এরপর اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ বলে রহমতের এ অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। বান্দা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত মনোভাব নিয়ে স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন পরম দয়ালু প্রভু বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান।

আয়াত ঃ ১২৯

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

দোয়ার সম্পর্ক ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের সাথে

তাদের মধ্যে তাঁদেরই মধ্য থেকে অর্থাৎ আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন। এখানে যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কেবল হযরত ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন এবং তাঁকেই চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাস করিয়েছিলেন, এ কারণে এ দোয়ার লক্ষ অনিবার্যরূপে ইসমাঈলের সন্তানরাই ছিল। হযরত ইসহাক

www.pathagar.com

(আ)-এর সন্তানদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক হতেই পারে না। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের মধ্য থেকেই যে শেষ নবীর আগমন ঘটবে তাওরাতের বর্ণনায়ও তার প্রমাণ রয়েছে।–দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৮ হযরত মূসা (আ)-এর যে প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব।" একটু সামনে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" এ শব্দসমূহ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, বনী ইসমাঈলই-এর লক্ষ্য। যদি বনী ইসরাঈল লক্ষ্য হতো তাহলে এর বিশুদ্ধ ভাষা "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" এর স্থলে "উহাদেরই মধ্য হইতে" হতো। অনুরূপভাবে "উহাদের ভ্রাতৃগনের মধ্য হইতে"-এর স্থলে "উহাদেরই মধ্য হইতে" এরূপ শব্দসমূহ ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও এখানে "তোমার সদৃশ"-এর শব্দসমূহও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ থেকে জানা যায় যে, যে নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা ছিল রেসালাতপ্রাপ্ত একজন রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত দোয়ার মধ্যে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূল শব্দ বর্ণিত হয়েছে। আমরা পরবর্তী কোনো প্রাসংগিক স্থানে নবী ও রাসূলের পার্থক্য আলোচনা করব।

এখানে যে রাসূল প্রেরণের জন্য দোয়া করা হয়েছে তার তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম, আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়, কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়া। তৃতীয়, পবিত্র করা।

তেলাওয়াতে আয়াত-এর তাৎপর্য

আভিধানিক অর্থে আয়াত ঐসব জিনিসকে বলা হয়—যাদ্বারা কোনো বস্তু বা বিষয়ের ওপর দলিল পেশ করা যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আয়াত হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর কুদরত ও হিকমাত এবং তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী, সৃষ্টি ও কার্যপ্রণালীর ওপর দলিল। অনুরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) থেকে যে সকল মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে তাও আয়াত হিসেবেই পরিগণিত। কেননা মু'জিযাসমূহ ও নবীগণের সত্যতার দলিল। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক বাক্যের ক্ষেত্রেও আয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়। কেননা বাস্তবে প্রত্যেকটি আয়াত একেকটি দলিল ও প্রমাণের মর্যাদা রাখে। যা দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী তাঁর বিধি-বিধান ও আইন-কানুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জ্ঞান লাভ হয়।

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ -এর শব্দসমূহ দ্বারা সেই শক্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ পায় যাদ্বারা সজ্জিত হয়ে আল্লাহর একজন রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেন। প্রকাশ থাকে যে, রাসূল কেবল একজন কারীর ন্যায় মধুর কণ্ঠে মানুষকে কুরআন শুনাবার জন্য আসেননি। বরং তিনি মহান আল্লাহর প্রেরিত দূতের পদমর্যাদা নিয়ে মানবজাতিকে আকাশ ও পৃথিবীর মালিক ও সৃষ্টিকর্তার রাজকীয় ফরমান ও রাজকীয় বিধান এবং তার দলিল প্রমাণসমূহ অবগত করান। অধিকন্তু আয়াত শব্দটি আল্লাহ তাআলার অহীর ওপর প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হয়

www.pathagar.com

যে, আল্লাহ তাআলার দীন কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও শক্তি প্রয়োগের ওপর ভিত্তিশীল নয় বরং আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তিশীল এবং আয়াতের প্রতিটি অংশেই দীনের দলিল রয়েছে।

কিতাব ও হিক্‌মাতে তা'লীম-এর তাৎপর্য

এরপর حكمت ও كتاب এর تعليم এর (শিক্ষাদানের) শব্দসমূহের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। একথা সুস্পষ্ট যে, তা'লীম তেলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জিনিস। আয়াত তেলাওয়াত করা হলো—রাসূল (স) কর্তৃক লোকদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর এ অহী নাযিল করেছেন। আর তা'লীম হলো পরম স্নেহ, আন্তরিকতা ও মনযোগ সহকারে প্রত্যেক শ্রেণীর যোগ্যতা ও মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের জন্য তাদের উপযোগী করে কিতাবের জটিল বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া, সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের বিশদ বিবরণ দেয়া। উহ্য বিষয়সমূহ স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং গোপনীয় ও অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা। এভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার পরও লোকদের মনে যদি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে তিনি তাদের প্রশ্নসমূহেরও জবাব দেবেন। উপরন্তু লোকদেরকে জ্ঞান মেধাগতভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের সামনে প্রশ্ন রাখবেন এবং তাদের উত্তরসমূহ বুঝার চেষ্টা করবেন। যাতে লোকদের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা এবং মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করার মানসিকতা জাগ্রত হয়। এসব বিষয় تعليم -এর অত্যাবশ্যকীয় অংশ। যেসব লোক রাসূল (স)-এর জীবনী অধ্যয়ন করেছেন তারা খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে কিতাব تعليم (শিক্ষা) দেয়ার ক্ষেত্রে এ সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

تعليم -এর সাথে এখানে আরো দুটি জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে। এক ঃ কিতাব। দুই ঃ হেকমত।

হেকমত-এর বিশ্লেষণ

কিতাবের উদ্দেশ্য যে পবিত্র কুরআন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সূরার দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীরে আমরা কিতাব শব্দের বিশ্লেষণ করেছি।

হিকমাত শব্দের যে বিশ্লেষণ মাওলানা ফারাহী (র) স্বীয় গ্রন্থ মুফ্‌রাদাতুল কুরআনে প্রদান করেছেন তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে পেশ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

"হেকমত হলো সেই শক্তি ও যোগ্যতা যা দ্বারা মানুষ লেনদেন, মামলা-মোকদ্দমা ও বিভিন্ন বিষয়ের সুবিচার পূর্ণ ফায়সালা করে। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রশংসার ক্ষেত্রে এরশাদ হয়েছে— وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ "আমি তাঁকে হেকমত দান করেছি এবং লেনদেন বিভিন্ন বিষয়ের সুবিচার পূর্ণ ফায়সালা করার যোগ্যতা।" এখানে فصل الخطاب শব্দ দ্বারা সেই ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে, যা হেকমতের

www.pathagar.com

ফসল। পারস্পরিক লেনদেন ও পারস্পরিক বিষয়সমূহের সুবিচারপূর্ণ ফায়সালার যোগ্যতা যেমন হেকমতের ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত তেমনি চরিত্রের পবিত্রতা এবং শিষ্টাচারও হেকমতের ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে আরবগণ হিকমাত শব্দটিকে মানুষের সেই শক্তি ও যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে যা বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার পূর্ণতা ও পরিপক্কতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সমন্বয়কারী। যেমন বিবেকবান ও বিচক্ষণ এবং ভদ্রলোককে হাকিম বলা হয় এবং যে কথা বিবেক বুদ্ধি ও মন উভয়ের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট তাকে হেকমত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।"

এখানে কিতাব-এর সাথে হেকমত-এর উল্লেখ একথা প্রমাণ করে যে, তা'লীমে হেকমত অর্থাৎ হেকমতের শিক্ষা তা'লীমে কিতাব তথা কিতাবের শিক্ষা থেকে অতিরিক্ত একটি বিষয়। যদিও এ হেকমত সম্পূর্ণরূপে কুরআনে হাকিম থেকেই গ্রহণ ও উদ্ভাবন করা হয়। এ কারণে আমরা মনে করি যারা হেকমত থেকে হাদীস উদ্দেশ্য নিয়েছে তাদের একথা অনেক গুরুত্বের দাবী রাখে। এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, হেকমত যেহেতু প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাকেও বলা হয় এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলার যোগ্যতাকেও সেহেতু তা'লীমে হেকমত বা হেকমত শিক্ষা দেয়ার অর্থ যেমন কাউকে কোনো প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়, তেমনি লোকদের মধ্যে হেকমত এর গুণাবলী ও যোগ্যতা সৃষ্টি করাও তা'লীমে হেকমত-এর আওতাভুক্ত।

تزكيه-এর অর্থ

রাসূল প্রেরণের তৃতীয় উদ্দেশ্য تزكيه বা পবিত্র করা। تزكيه শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে। এক ঃ পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। দুই ঃ ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি। আমাদের মতে এ দুটি অর্থই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যে বস্তু বিপরীতধর্মী সাংঘর্ষিক এবং ক্ষতিকর উপাদান থেকে পাক-পবিত্র হয় তা নিজের স্বভাবগত যোগ্যতা অনুসারে অবশ্যই বিকাশ লাভ করবে। নবীগণ (আ) মানুষের আত্মার যে যে তাযকিয়া করেন তাতে উপরোক্ত দুটি অর্থই পাওয়া যায়। তাঁরা মানুষের মনকে ও তাদের কার্যকলাপ ও স্বভাব-চরিত্রকে ত্রুটিপূর্ণ ও অশুদ্ধ জিনিস থেকে পাক-পবিত্রও করেন এবং তাদের কার্যক্রম ও স্বভাব-চরিত্রের উন্নতি ও বিকাশ ঘটিয়ে তাতে ক্ষতিকর, বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক জিনিসের বিপরীত ধৈর্য, স্থিরতা ও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা দেখানোর মত নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে দেন। এ কারণেই কিতাব শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা মানুষের আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা অনেক অনেক গুণ বেশি কষ্ট, ধৈর্য ও শ্রম-সাধনার দাবী রাখে। তাই পবিত্র কুরআনে একে গোটা দীন ও শরীআতের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সামনে অনুকূল কোনো জায়গায় আমরা এ বিষয়টির আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ!

عزيز ও حكيم-এর তাৎপর্য

আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ عزيز ও حكيم-এর উল্লেখ করা হয়েছে। عزيز-এর অর্থ—বিজয়ী, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যিনি পূর্ণ

শক্তি, ক্ষমতা, প্রভাব এবং পরিপূর্ণ প্রতাপ ও কর্তৃত্বের সাথে এ বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন। حَكِيْم -এর অর্থ—যার প্রত্যেকটি কাজে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, কল্যাণ এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার এ দুটি গুণ সাধারণত এক সাথেই উল্লেখ হয়। এ থেকে এ মূলতত্ত্ব প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তাআলা পূর্ণ শক্তি, ক্ষমতার সাথে এ বিশ্বজাহানের ওপর কর্তৃত্বকারী ও পরিবেষ্টনকারী। কিন্তু তাঁর এ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁর ক্ষমতা বলে যা ইচ্ছা তাই করেন। বরং তিনি যা কিছু করেন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে কল্যাণের জন্যই করেন। তাঁর কোনো কাজই হিকমাত ও কল্যাণ থেকে খালি নয়। এখানে এ দুটি গুণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞানময়তার অনিবার্য দাবী হলো, তিনি তাঁর এ সৃষ্টিজগতে তাঁর দূত ও পয়গাম্বর পাঠাবেন যিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর বিধি-বিধান ও আইন-কানুন অবগত করাবেন এবং তাদেরকে তাঁর শরীআত ও হেকমতের শিক্ষা দেবেন।

আয়াত ঃ ১৩০

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

رَغِبَ ক্রিয়া যখন عَنْ অব্যয়ের সাথে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় কোনো জিনিসের প্রতি নিস্পৃহ হওয়া তা থেকে বিমুখ হওয়া বা মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

سَفِهَ শব্দের বিশ্লেষণ

سَفِهَ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকর্মক হয়। অবশ্য সকর্মকও ব্যবহার হয়। যেমন سَفِهَ نَفْسَهٗ -এর অর্থ হলো—সে নিজের ভাগ্য বিনষ্ট করেছে। سَفِهَ رَاْيَهٗ -এর অর্থ হবে, সে নির্বোধের ন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুরূপভাবে سَفِهَ نَفْسَهٗ -এর অর্থ হবে, সে নিজেই নিজেকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত করেছে।

বক্তব্যের এ পদ্ধতি বিস্ময় প্রকাশ ও দুঃখ প্রকাশ উভয়টাকেই সমবেত করে। এ বক্তব্য দ্বারা এখানে ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সারকথা হলো, এক দিকে তারা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের দীন বা আদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবী করে। বরং তারা নিজেদেরকে তাঁর আদর্শের একক ঠিকাদার হিসেবে মনে করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যাঁকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের আহ্বানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই শেষ নবীর প্রতি তারা সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ ও নাখোশ, আর তাঁর দাওয়াত কবুল করে যারা এ মিল্লাতের অনুসারী হয়েছেন তাদের তারা নির্বোধ ও বোকা মনে করে। নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।

www.pathagar.com

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا (এবং আমি পৃথিবীতে তাঁকে মনোনীত করেছি) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। এখানে সেই মনোনয়নের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১২৪ আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা আল্লাহ তাআলা যাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন তাঁর মিল্লাত ও আদর্শের অনুসরণ করা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা নিতান্তই নির্বোধ।

পবিত্র কুরআনে صٰلِحِيْنَ শব্দটি সাধারণ সৎলোকদের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণের পুরো সমষ্টির জন্যও ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে صٰلِحِيْنَ শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৩১

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ لا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ইসলামের অর্থ

'اسـلام' ইসলামের অর্থ হলো, নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর বিধানের প্রতি পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়া। আমাদের মতে এখানে এ আয়াত থেকে পুত্র কুরবানীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনিতেই তিনি যে সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তা সবই ছিল তাঁর ইসলাম বা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের বিষয়টি যাঁচাই করার জন্য। মনে হয় যে যেন প্রত্যেকটা পরীক্ষাই তাঁর নিকট এ দাবী উত্থাপন করছে যে, তুমি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করে দাও। বিশেষ করে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার আদেশ নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ ও একনিষ্ঠভাবে উৎসর্গ করার এমন একদাবী ছিল যা প্রকাশ করার সবচেয়ে বেশি উপযোগী, যথার্থ কোনো শব্দ যদি থাকে তাহলে তা اَسْلِمْ ই হতে পারে। এ শব্দটি কুরবানীর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য পবিত্র কুরআনের অন্য এক জায়গায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ - الصفت : ١٠٣–"অতপর পিতা ও পুত্র উভয়ে যখন নিজেকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সমর্পণ করে দিল এবং ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে উপুড় করে শায়িত করলো।"–সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ১০৩। আর পুত্র কুরবানী করার এ আদেশ এমন ছিল যে, এতে সফল হওয়ার পর তাঁকে নবুওয়াতের জন্য মনোনীত ও বিশ্ববাসীর নেতৃত্বের মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

এখানে ইসলাম শব্দ দ্বারা কুরবানীর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট করেছে। এক ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দুনিয়া ও আখেরাতে যে মনোনয়ন ও গ্রহণযোগ্যতা করেছেন—১২৪ আয়াতে যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—তা তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ত্যাগ, কুরবানী ও জীবনোৎসর্গ করেছেন তারই প্রতিদান। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্ব বিনা কষ্টে ও বিনামূল্যে অর্জিত হয়নি। যেমন ইহুদীরা তা বিনামূল্যে অর্জন করতে চায়। দুই ঃ

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসলাম অর্থাৎ পরিপূর্ণ সমর্পণ ও পূর্ণ উৎসর্গ করার আদেশ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর কথা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ইসলামের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের নয়—যেমন ধারণা করে থাকে ইহুদী ও খৃস্টানরা। তিন ঃ ইসলামের রূহ বা মূলতত্ত্ব হলো নিজেকে স্বীয় রবের নিকট পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেয়া। যার ফলে এমন কি বান্দার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কোনো বস্তু আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রিয় থাকবে না।

আয়াত ঃ ১৩২

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

تَوْصِيَه এর অর্থ শিক্ষা দেয়া ও উপদেশ দেয়া। এ শিক্ষা ও উপদেশ মৃত্যুর সময় প্রদান করা হোক বা জীবনের যে কোনো সময় প্রদান করা হোক, উভয়টাই এর মধ্যে শামিল।

'بِهَا' এর هَا সর্বনাম ইসলামী মিল্লাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ বলে যার উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অসিয়ত

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অসিয়তের বর্ণনা যদিও ইহুদীদের সহীফাসমূহে কোথাও পাওয়া যায় না কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, দীন সম্পর্কে নিজের সন্তানদের এবং নিজের অনুসারী অনুগামী সঙ্গী-সাথীদের শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া নবীগণের সাধারণ সুন্নাত বা রীতি। বনী ইসরাঈল ও বনী ইসমাঈলের সাধারণ পারিবারিক প্রধানগণ ও গোত্রীয় সরদারগণের এরূপ শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এমনকি তালমূদে বর্ণিত হযরত ইয়াকুব (আ)-এর এক অসিয়তও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অসিয়তের সাথে পূর্ণ মিল রয়েছে। পরিবার ও সম্প্রদায়সমূহে এ ধরনের অসিয়তের ঐতিহ্য পরিবারের মহৎ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গেরই কর্মনীতি থেকে প্রচলিত হয়। এ কারণে একথা পুরোপুরি যুক্তিগ্রাহ্য সাব্যস্ত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় কর্মনীতির মাধ্যমে তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য অসিয়ত করার এ সুন্নাত রেখে গেছেন। তবে বিশেষভাবে তিনি যে তাঁর সন্তানদেরকে মুহাম্মাদ (স) আনীত বিধান গ্রহণের অসিয়ত করে গেছেন। সে বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, এর জন্য বাড়তি কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইতোপূর্বে তাঁর জীবন-চরিতে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি যে দীনের সাথে পরিচিত হয়েছেন, যে দীনের তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এবং মহান কুরবানী দ্বারা তিনি যে দীনের মূল রহস্য প্রকাশ করেছেন, তা ইসলামই ছিল, তাহলে তিনি ইসলামকে বাদ দিয়ে নিজের সন্তানদের কিভাবে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের শিক্ষা দিতে পারতেন যার সাথে তাঁর আদৌ কোনো পরিচয়ই ছিল না !

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর আলোচনা এ বিশেষত্বের কারণে করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সরাসরি হযরত ইয়াকুবের সন্তান ছিল। মোটকথা হলো, অসিয়তে ঐতিহ্য যদি চালু থেকেই থাকে তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর থেকে পরবর্তী তিন পুরুষ পর্যন্ত ইসলামেরই অসিয়ত করা হয়েছে। ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের নয়। কাজেই যারা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসরণের দাবী করে, তারা কি ইসলামের অনুসরণ করবে—না ইহুদীবাদ কিংবা খৃস্টবাদের অনুসরণ করবে। সেটা তাদের বিবেককেই জিজ্ঞেস করা উচিত।

দীন-এর ব্যাখ্যা

দীন দ্বারা সেই আসল দীনই বুঝানো হয়েছে যা প্রথম থেকেই আল্লাহর দীন হিসেবে নির্ধারিত। অর্থাৎ ইসলাম। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - ال عمران : ١٩ "আল্লাহর নিকট প্রকৃত দীন হলো ইসলাম।" কুরআনের অন্য জায়গায় এরশাদ হয়েছে- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ - ال عمران : ٨٣ "তারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করছে, অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই আনুগত্য করছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩। এ দীনই হলো আল্লাহর দীন। আর এ দীনই তিনি স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সবসময় পাঠিয়েছেন। এ দীনেরই অনুসরণ করা, এ দীন নিয়ে জীবিত থাকা (অর্থাৎ দীন মোতাবেক জীবনযাপন করা) এবং এ দীনের ওপরই মৃত্যুবরণ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইয়াকুব (আ) নিজ নিজ সন্তানদেরকে অসিয়ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলগণ এটাকে বিকৃত করে এর রূপ কাঠামোই পাল্টে দিয়েছে এবং ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের বিভ্রান্তিকর মতবাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে।

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ঃ (এবং তোমরা কেবল মুসলিম অবস্থাই মৃত্যুবরণ কর) এতে এ বিষয়টি লুক্কায়িত রয়েছে যে, এ দীনের আমানত বড় কঠিন ও মহা সম্মানিত আমানত। তোমাদের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ আমানতের হক আদায় করা প্রয়োজন। এ পথে তোমরা বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। পূর্ণ দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে তোমাদের এসব পরীক্ষার মুকাবিলা করতে হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে, শয়তান যেনো জীবনের কোনো স্তরেই তোমাদেরকে এ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তোমাদের জীবন মৃত্যু এ আমানতেরই জন্য হতে হবে।

আয়াত ঃ ১৩৩

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ط

www.pathagar.com

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসিয়ত

প্রশ্নের এ বাচনভঙ্গি শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে সতর্ক করা এবং বক্তব্য অধিক কার্যকরী ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য অবলম্বন করা হয়েছে। সারকথা হলো, তোমরা দাবী করছো যে, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহুদী অথবা খৃস্টান মতাদর্শী ছিলেন। তবে কি তোমরা সে সময় হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পাশে ছিলে যখন তিনি জীবনের শেষ লগ্নে এসে পৌছেছেন এবং স্বীয় সন্তানদেরকে অসিয়ত করার জন্য ডেকেছেন ? তখন তিনি তাঁর সন্তানদের নিকট থেকে কোন্ বিষয়ের স্বীকৃতি গ্রহণ করেছেন আল্লাহর একত্ববাদ ও ইসলামের—না ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের ? এ প্রশ্নের পর পবিত্র কুরআন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিজের সন্তানদেরকে প্রশ্ন এবং তাঁর সন্তানদের সর্বসম্মত জবাব উদ্বৃত করেছেন যা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামের পক্ষেই ছিল। এ অসিয়ত সম্পর্কে ইহুদীদের সাহিত্যে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার ভাষা ও শব্দাবলী কুরআনের [ইয়াকুব (আ)-এর অসিয়ত সংক্রান্ত] শব্দাবলী থেকে যদিও কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু তাতে কুরআনের বর্ণনার পক্ষেই সমর্থন পাওয়া যায়, বনী ইসরাঈলের উল্লেখিত দাবীর পক্ষে নয়। কারণ তাতে ইহুদীবাদ অথবা খৃস্টান মতাদর্শের প্রতি কোনোই ইঙ্গিত নেই।[১]

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসিয়তের উদ্ধৃত দেয়ার নিগূঢ় রহস্য

এখানে এ সূক্ষ্ম লক্ষণীয় যে, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মৃত্যুকালীন অসিয়ত থেকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে কুরআন বিশেষভাবে তাঁর এ অসিয়তকে উদ্ধৃত করেছে।

১. আমাদের ওস্তাদ আবদুল মুজীদ দরইয়াবাদী ইহুদীদের সাহিত্য অনুসন্ধান করে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ স্থলে দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এক : ইসহাক (আ)-এর অসিয়ত সম্পর্কিত। দুই : হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসিয়ত সম্পর্কিত।

"হযরত ইসহাক (আ) যখন দেখলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে। তখন তিনি দু' সন্তানকেই ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দোহাই দিচ্ছি যিনি সর্বোচ্চ, মহান শাশ্বত, চিরন্তন, মহাপরাক্রমশালী, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুরই স্রষ্টা। তোমরা তাঁকেই ভয় করবে এবং তাঁরই ইবাদাত বন্দেগী করবে। کنز برکں کی قصص یہود جلد اول ـ٤١٦

ইয়াকুব (আ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তোমাদের কারো কারো মূর্তিপূজার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। তাঁর একথার জবাবে তাঁর বারোজন সন্তানই বলেন, হে আমাদের পিতা। হে ইসরাঈল! আপনি জেনে রাখুন! সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান আল্লাহ-ই আমাদের প্রভু। আল্লাহর প্রতি আপনার যেমন আন্তরিক ঈমান রয়েছে তেমনি এক আল্লাহর প্রতি আমাদের সকলেরই আন্তরিক গভীর ঈমান রয়েছে। کنز برک کی قصص یہود جلد ٢ صفحه ١٤١

যে বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) জীবনের একেবারেই শেষ মুহূর্তে নিজের সন্তানদের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, এ কারণে এ ধারণা করার কোনো অবকাশ নেই যে, তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর নীতি ও আদর্শ এবং দীনের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

দুই ঃ একজন দয়ালু ও মেহেরবান পিতা—যিনি একজন নবীও ছিলেন—জীবনের একেবারেই শেষ মুহূর্তে পৌঁছে নিজের সন্তানদের নিকট থেকে যে অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন তা তাঁর ও তাঁর সন্তানদের মাঝে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই হতে পারে। আর আনুগত্য পরায়ণ সন্তানদের নিকট সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক পবিত্রতম ফরয এটাই হবে যে, তারা সর্বাবস্থায় এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে। একমাত্র অযোগ্য কুসন্তানরাই কেবল এ ধরনের অঙ্গিকার প্রতিশ্রুতি লংঘন করতে পারে।

তিন ঃ আল্লাহকে ভয় করে ও সন্তানদের ভালোবাসে এমন একজন পিতার পক্ষে নিজের সন্তানদের ব্যাপারে জীবনের সর্বশেষ কর্তব্য হবে—মৃত্যুর সময় তিনি তাদের দুনিয়া অপেক্ষা পরকালের চিন্তা বেশি করবেন এবং তাদের সত্য দীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন ধারণ করা ও মৃত্যুবরণ করার উপদেশ দেবেন।

অসিয়ত ও অসিয়তের জবাবের কতিপয় সূক্ষ্ম দিক

হযরত ইয়াকুব (আ) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِى (আমার মৃত্যুর পর তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে) আয়াতাংশের প্রশ্নে 'مَـا' শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নের অনেক প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে, ফলে জবাবদাতাগণের মনে মাবুদ সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয় থাকলে প্রশ্নে জবাবেই তা প্রকাশ হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর সন্তানদের জবাব একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তখন পর্যন্ত তাদের মনে মাবুদ সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয় বা জটিলতা ছিল না। তাঁরা সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁকেই আনুগত্য ও ইবাদাত-বন্দেগীর একমাত্র উপযোগী সত্তা হিসেব স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানেরা এ জায়গায় যে গৌরবের অনুভূতি ও আস্থা সহকারে হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নিজেদের পূর্বপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সেই গৌরব ও বিশ্বাস সহকারেই তারা হযরত ইসমাঈল (আ)-এরও উল্লেখ করেছে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর যুগ পর্যন্ত তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর সন্তানদের বিপরীত সেই গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি যা পরবর্তী যুগে সৃষ্টি হয়েছিল।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৩৪

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

আলোচনার সারকথা

আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ আয়াতটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার এখানে এবং দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে কয়েক আয়াত পরে যেখানে এ আলোচনার ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়েছে। কারণ এ পূর্বোক্ত আলোচনার সারকথা যা সম্বোধিত ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা হয়েছে যে, তোমাদের সকল প্রকার গর্ব-অহংকার ও বিশ্বাস তোমাদের বাপ-দাদার ওপরই রয়ে গেছে। তোমরা মনে করছো, তোমাদের সকল দায়িত্ব কর্তব্য ও তোমাদের সকল নেক আমল তাঁরা পালন করে গেছেন। তোমাদের কাজ এখন কেবল তাঁদের নেক আমলসমূহের ফল ভোগ করা। তোমাদের ওপর এখন আর কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য নেই। তোমাদের এ গর্ব-অহংকার ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক কল্পনার ওপর ভিত্তিশীল। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের সৎকাজের প্রতিদান কেবল তাঁরাই পাবেন। সে প্রতিদানের কোনো অংশই তোমরা পাবে না। তোমাদের ওপর আর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমাদেরকেই পালন করতে হবে। যদি তোমরা তা পালন করো তাহলে তার প্রতিদান বা কল্যাণ তোমরা পাবে আর যদি তোমরা তা পালন না করো তাহলে তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর দরবারে তোমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। বরং তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আয়াত ঃ ১৩৫

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মূল দীন হলো ইসলাম

পূর্বোক্ত ১১১ আয়াতের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃস্টান উভয় জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে বলে, যে ব্যক্তি হেদায়াত ও মুক্তি পেতে চায় সে যেনো ইহুদী অথবা খৃস্টান হয়ে যায়। কেননা এ দুটি ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম। ইসলামের নামে তৃতীয় যে দীনের প্রচার করা হচ্ছে তা কোনো দীন নয়।

এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيفًا –"বল, বরং ইবরাহীমের দীনের অনুসরণ করো যিনি একনিষ্ঠ ও একত্ববাদী ছিলেন।" এখানে مِلَّةَ

www.pathagar.com

(মিল্লাত) শব্দটি কর্মবাচ্য বা খবর এর অবস্থানে উল্লেখ হয়েছে। এ কারণে এখানে একটি فـعـل বা ক্রিয়া উহ্য ধরা আবশ্যক। সাধারণভাবে লোকেরা এরূপ ক্ষেত্রে فـعـل مـاضـى বা অতীত কালসূচক ক্রিয়া উহ্য ধরে থাকে। এমতাবস্থায় এ আয়াতাংশের অর্থ হবে এরূপ যে, "বল আমরা ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসরণ করেছি।" কিন্তু আমি এখানে صـيـغـه امـر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়া উহ্য ধরে নিয়ে সেভাবেই অনুবাদ করেছি। আমি এখানে কয়েকটি কারণে এরূপ করেছি। কারণগুলো হলো, প্রথমত, এখানে ইহুদী ও খৃস্টানদের জবাবে আল্লাহ তাআলা قُلْ শব্দ (صـيـغـه امـر) উল্লেখ করতঃ নবী করীম (স)-এর পবিত্র মুখ দিয়ে তাদের জবাব প্রদান করিয়েছেন। নবী (স)-এর মুখে বিশেষ করে আহলে কিতাবের বিভ্রান্তিকর দাওয়াতের জবাবে দাওয়াত মূলক সম্বোধন করাই যথার্থ ছিল। দ্বিতীয়ত, সামনের আয়াতে মুসলমানদের মুখে নিজেদের ঈমান ও ইসলামের বর্ণনা قُـوْلُـوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الاية -এর (নির্দেশসূচক) শব্দ এসেছে। ফলে এ আয়াতটিকেও নির্দেশসূর্চক শব্দ ব্যবহার করে দাওয়াতী অর্থবোধক করা অধিক সংগত। তৃতীয়ত, আরবদের ভাষায় কোথাও যখন এরূপ কর্মবাচ্য বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তার প্রকৃতি শ্রোতাকে কোনো বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অথবা কোনো বস্তুর প্রতি ভীতি প্রদর্শন করার স্থানের সাথে অধিক সম্বন্ধ রাখে, যার জন্য امـر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়াই বেশী উপযোগী।

'حـنـيـف' -এর অর্থ

حَنِيْـفًـا শব্দটি حـنـف থেকে নির্গত হয়েছে। যার প্রকৃত অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। হানীফ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে সবকিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্য হানীফ একনিষ্ঠ হওয়ার গুণটি পবিত্র কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক সকলেই তাঁকে নিজেদের আধ্যাত্মিক নেতা মনে করতো। এ তিনটি জাতিরই দাবী ছিল যে, তারা যে ধর্মের অনুসারী হোক না কেন তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরসূরী। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রথমেই তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআলার প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সরল পথ—দীন ইসলাম থেকে চুল পরিমাণও নড়চড় করেননি। না তিনি ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের রাস্তার দিকে মোড় ফিরেছেন এবং না মুশরিকদের গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছেন। বরং তিনি সর্বদা ইসলামের রাজপথের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র সরল পথ।

আয়াত ঃ ১৩৬

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ○

মুসলিম উম্মার নীতি ও অবস্থান

ইহুদী ও খৃস্টানদের দাওয়াত ছিল যে, "তোমরা ইহুদী অথবা খৃস্টান হও তাহলে হেদায়াত লাভ করবে।" এ আয়াত মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইহুদী ও খৃস্টানদের এ দাওয়াতের জবাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর সেই হেদায়াতের প্রতি ঈমান রাখি যা আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) এবং ইয়াকুবের সন্তানদের বিভিন্ন শাখার ওপর তাদের নবীগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে হেদায়াতের ওপরও আমাদের ঈমান রয়েছে যা মূসা (আ), ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। আমরা এসব নবীগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা আল্লাহ তাআলারই অনুগত বান্দা।

আল্লাহ তাআলার শরীআত ও তাঁর নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে এ মুসলিম উম্মাহ অথবা এ মধ্যমপন্থী জাতির নীতি ও অবস্থান তথা অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এ জাতি আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো হেদায়াত না প্রত্যাখ্যান করে আর না কোনো নবী ও রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। বরং কোনো প্রকার পার্থক্য ও প্রভেদ না করেই সকলের প্রতি ঈমান রাখে। তাদের নীতি হলো, আল্লাহ তাআলার এসব নবী ও রাসূলগণ স্বীয় উম্মাতগণকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তারা হয়ত তাতে সংমিশ্রণ করেছে অথবা তার কোনো অংশকে বিস্মৃত করে দিয়েছে। এখন এ উম্মাত যে শরীআত পেয়েছে তা আল্লাহ তাআলার আসল হেদায়াতকে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আকৃতিতে উপস্থাপন করে।

আসবাত এর অর্থ

এ আয়াতে أَسْبَاط শব্দটি سِبْط -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া ও বিস্তৃতি করা। এ অর্থের দিক থেকে এ শব্দটি এক পিতার সন্তান-সন্তুতি ও তাদের বিভিন্ন শাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ইয়াকুব (আ) বংশধরদের বিভিন্ন শাখার জন্য এর ব্যবহার এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, মনে হয় যেনো শব্দটি এ অর্থের জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে।

রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করা

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ঃ (আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না) এর অর্থ ইহুদী ও খৃস্টানদের নবী ও রাসূলগণের কারো প্রতি ঈমান রাখে এবং কারো প্রতি ঈমান রাখে না, এরূপ পার্থক্য ও ভেদাভেদ আমরা করি না। এ উদ্দেশ্যে কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ

"তারা - بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً - النساء : ١٥٠ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি এবং তারা এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৫০। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের কাউকে মানা এবং কাউকে অস্বীকার করা সবাইকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এটা কেবল নবীগণের পরস্পরের মধ্যেই প্রভেদ সৃষ্টি করা নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যেও প্রভেদ করার শামিল।

আয়াত ঃ ১৩৭

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ج فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

ইহুদী ও খৃস্টানদের জন্য মুক্তির পয়গাম

তারা যদি এ ব্যাপক ভিত্তিক কালেমাটি স্বীকার করে নেয়—অর্থাৎ যেমনিভাবে তোমরা নবীগণ ও পরিপূর্ণ হেদায়াতের প্রতি ঈমান এনেছো অনুরূপভাবে তারাও যদি ঈমান আনে তাহলে অবশ্যই তারা হেদায়াত লাভ করবে। ইহুদী অথবা খৃস্টান হওয়া হেদায়াত পাওয়ার পথ নয়, যেমন ইহুদী ও খৃস্টানরা দাবী করে থাকে। বরং তোমরা যে পথ অবলম্বন করেছো সে পথই হেদায়াতের সঠিক পথ। অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণের প্রতি কোনো প্রকার প্রভেদ ও গোঁড়ামী না করে পক্ষপাতহীনভাবে সকলের প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তারা যদি এরূপ করতে অস্বীকার করে তাহলে তার অর্থ এটাই দাঁড়াবে যে, তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং ঐক্য ও সংহতির জ্ঞান পরিহার করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের বিপরীত পৃথক একটা ফেরকা বা দল প্রতিষ্ঠিত রাখবে। এটাই যদি তাদের কামনা হয় তাহলে তারা যে পথ অবলম্বন করেছে সে পথেই তাদেরকে চলতে দাও। তাদের মুকাবিলা করার জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলার স্বীয় গুণাবলীর মধ্য থেকে سَمِيْعٌ (শ্রবণকারী) ও عَلِيْمٌ (মহাজ্ঞানী)-এর উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো নবী (স)-কে সান্ত্বনা দেয়া যে, তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলকভাবে এ লোকেরা যেসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে তাতে তুমি বিন্দুমাত্রও ভীত হয়ো না। কারণ মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের পক্ষ থেকে এদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

আয়াত ঃ ১৩৮

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝

www.pathagar.com

ইহুদী ও খৃস্টানদের দাওয়াত প্রদান

ইহুদী ও খৃস্টানদের সম্বোধন করে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদেরকে আল্লাহর রঙে রঙিন করতে চাও তাহলে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রং অবলম্বন কর। এ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যটি—ইতোপূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ হেদায়াত এবং সকল নবী ও রাসূলগণকে একত্র করা হয়েছে। এটিই সেই বাক্য যাদ্বারা জীবনকে আল্লাহর প্রকৃত রঙে রাঙানো যায়। সুতরাং জীবনকে যদি আল্লাহর রঙে রঙিন করতে চাও তাহলে এ রঙেই রঙিন হও। এ রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে। এতে ইহুদী ও খৃস্টানদের ব্যাপ্টিজম এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। صِبْغَةَ اللّٰهِ এর صِبْغَةَ শব্দের শেষ বর্ণে যবর (َ) হওয়া প্রমাণ করে যে, এর পূর্বে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার অর্থবিশিষ্ট একটি ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

আয়াত ঃ ১৩৯

قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ج وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ج وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝

ইহুদী ও খৃস্টানদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের চূড়ান্ত ঘোষণা

তারা যদি এ সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি না মানে যা নবী-রাসূলগণের এবং আল্লাহর নাযিলকৃত পরিপূর্ণ হেদায়াতের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী ও তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতিকে শামিল করে। বরং তারা জিদ ধরে যে, তারা আল্লাহ তাআলার কতক নবীকে মানবে এবং কতক নবীকে অমান্য করবে। তাঁর কিছু হেদায়াতকে তারা গ্রহণ করবে এবং কিছু হেদায়াতকে তারা অমান্য করবে। অথচ সকল নবী-রাসূল আল্লাহ তাআলারই প্রেরিত এবং সমুদয় হেদায়াত তাঁরই নাযিলকৃত, তাহলে তাদের এরূপ করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, স্বয়ং আল্লাহর ব্যাপারেই তারা তোমাদের সাথে বির্তকে লিপ্ত হচ্ছে এতে মনে হয় যেনো, তোমাদের আল্লাহ একজন আর তাদের আল্লাহ ভিন্ন কেউ। অথচ এক আল্লাহ-ই তোমাদের ও তাদের প্রতিপালক। বাস্তবে তারা যদি নিজেদের জন্য ভিন্ন খোদা বানিয়ে নেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে থাকে তাহলে তাদের নিকট কোনো কল্যাণের আশা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এমতাবস্থায় তাদের সাথে এসব আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দাও যে, আমাদের আমলসমূহের কল্যাণ আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমাদের অর্থাৎ এখন থেকে তোমাদের সাথে আমাদের কোনো প্রকার আলোচনা ও বিতর্ক করা সম্পন্ন অনর্থক বলে আমরা বিশ্বাস করি। তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত একাগ্র ও একনিষ্ঠ না হবে ততক্ষণ আমরা তোমাদের সাথে যে কোনো ধরনের আলোচনা ও বিতর্ক করার পরিবর্তে একথা ঘোষণা করাই যথেষ্ট মনে করি যে, আমরা আমাদের প্রতিপালক এক আল্লাহর জন্যই সম্পূর্ণ একনিষ্ট ও আন্তরিক।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৪০

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ط قُلْ ءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের ব্যাপারে ইহুদী ও খৃস্টানদের বক্তব্যের পুনরোল্লেখ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে তাদেরকে লা-জবাব করার জন্য ও সবিশেষ যুক্তি তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। অর্থাৎ সত্যিই কি তোমরা এ ভয়ংকর বাতিল কথা বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ইয়াকুব ও তাদের উত্তরসূরীগণ ইহুদী বা খৃস্টান ছিল ?

অতপর ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এ লোকদের দীন ও আকীদা-বিশ্বাসের অবস্থা তোমরা বেশি জান না আল্লাহ বেশি জানেন ? এরপর আফসোস ও বেদনার ভঙ্গিতে বলেছেন, তাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যারা আল্লাহর কোনো সাক্ষ্য গোপন করে ? অর্থাৎ তাওরাত বর্তমান রয়েছে। তাতে তাঁদের দীন ও আকীদা-বিশ্বাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাওরাত থেকে জানা যায় যে, তাঁদের যুগে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। তাঁদের যুগ থেকে এক শতাব্দী পর এ নাম আবিষ্কৃত হয়। আল্লাহ তাআলা সব যুগেই স্বীয় নবী ও রাসূলগণের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার নাম হলো ইসলাম। এরপর নিতান্ত ধমকের সুরে এরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যে অপতৎপরতা চালাচ্ছ, আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে মোটেই অজ্ঞ নন। তোমাদের সামনে এর পরিণতি অবশ্যই আসবে।

আয়াত ঃ ১৪১

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

এ আয়াতটিই হুবহু ওপরে উল্লেখ হয়েছে। যে বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়াতটি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানেও সেই একই ধারাবাহিকতায় এসেছে। সেখানে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ১৩৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৪৯. নবী (স)-এর পদমর্যাদাগত অপরিহার্য কর্তব্যসমূহ

উপরোক্ত আয়াতটির ১২৯ আয়াতের তাফসীর যদিও আমরা ইতোপূর্বে প্রয়োজন অনুসারে করে এসেছি কিন্তু আয়াতটি যেহেতু সরাসরি নবী (স)-এর পদমর্যাদাগত

www.pathagar.com

অপরিহার্য কর্তব্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত এবং এসব বিষয়ে এ যুগের হাদীস অস্বীকারকারী লোকেরা নিতান্তই অমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেছে। এ কারণে আমরা এ আয়াতটির ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করবো।

হাদীস অস্বীকারকারীগণের দাবী হলো, নবী (স) আল্লাহর একজন পয়গম্বর হিসেবে তাঁর মূল দায়িত্ব শুধু এতটুকু ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি যে অহী নাযিল করেছেন তা তিনি মানুষের নিকট পৌছিয়ে দেবেন। এ দায়িত্ব পালন করার পর রাসূল হিসেবে তাঁর আবশ্যিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর না আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর কোনো দায়িত্ব রয়েছে, আর না আল্লাহর অহী—কুরআন—ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে তার কোনো কথা বা কাজের শরয়ী কোনো গুরুত্ব আছে। আমাদের মতে হাদীস অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করার জন্য পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিই যথেষ্ট। এতে রাসূল (স)-এর পদমর্যাদাগত আবশ্যিক দায়িত্বসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে মানুষকে কেবল কুরআন শুনিয়ে দেয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়নি বরং তার সাথে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, এসব বিষয়ের বর্ণনাও তাঁর নবুওতের অবশ্যিক বিষয় হিসেবেই করা হয়েছে। আয়াতটির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ـ البقرة : ١٢٩

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯

এটি একটি দোয়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করেছিলেন। এ দোয়া মোতাবেক যখন হযরত মুহাম্মাদ (স) আগমন করেন তখন আল্লাহ তাআলা আরবদের প্রতি তাঁর এ মহান অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ـ الجمعه : ٢

"তিনিই আল্লাহ, যিনি নিরক্ষরদের (বনী ইসমাঈলের) মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেন। নিসন্দেহে তারা ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল।"–সূরা জুমআ ঃ ২

www.pathagar.com

উপরোক্ত দুটি আয়াতের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যেসব গুণে ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাসূল প্রেরণের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স) হুবহু সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সহকারেই প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে কার্যত সে সকল কাজই আনজাম দিয়েছেন যার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছিলেন।

উপরোক্ত দুটি আয়াত (সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯, সূরা জুমআ ঃ ২) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপরিহার্য কর্তব্যের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তাতে কোনো প্রভেদ নেই। তবে এতটুকু পার্থক্য দেখা যায় যে, প্রথম আয়াতে (تزكية) পবিত্রকরণের উল্লেখ করা হয়েছে একেবারে শেষে এবং দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে تعليم كتاب وحكمت এর পূর্বে।

উপরোক্ত দুটি আয়াতে (সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯, সূরা আল জুমআ ঃ ২) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপরিহার্য কর্তব্যসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। উভয় আয়াতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত আয়াতে তাযকিয়া বা পবিত্রকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে সবার শেষে এবং দ্বিতীয় আয়াতে তা'লীমে কিতাব ও হেকমতের পূর্বে এবং তেলাওয়াতে আয়াত-এর পর উল্লেখ করা হয়েছে। এ সামান্য পার্থক্য ছাড়া উভয় আয়াতের বিবরণে আর কোনো পার্থক্য নেই। আর পার্থক্য কোনো প্রকার গুরুত্ববহও নয়। তায্‌কিয়ার বিষয়টি পূর্বে ওপরে উল্লেখ করার কারণ আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি[১] যে 'তাযকিয়া' সকল দীন ও শরীআতের লক্ষ এবং নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। আর যে জিনিস কোনো কাজের লক্ষ ও উদ্দেশ্যের মর্যাদা রাখে তা কার্যত বিলম্বিত হলেও তার ইচ্ছা প্রথমেই হয়ে থাকে। এ কারণে মূল প্রস্তাবে তার উল্লেখ প্রথমেও হতে পারে এবং শেষেও হতে পারে। এ হিসেবে এক আয়াতে তায্‌কিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমে এবং অপর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে শেষে। উভয় আয়াতে এ বিন্যাসগত পার্থক্য ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয় সম্পূর্ণ অভিন্ন। এ দুটি আয়াতে নবী (স)-এর নিম্নোক্ত কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

নবী (স)-এর কর্তব্যসমূহ

১-আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা
২-কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়া
৩-আত্মার পবিত্রকরণ

আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা

রাসূল (স)-এর অপরিহার্য কর্তব্যসমূহের মধ্যে প্রথম কর্তব্য হলো আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা। আর এ থেকে আমরা নির্দ্বিধায় একথা মেনে নিতে পারি যে,

১. এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমার লিখিত "তাযকিয়ায়ে নফস" নামক গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

www.pathagar.com

লোকদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনানোই এর উদ্দেশ্য। দীন ও জ্ঞান-বুদ্ধি একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর একজন রাসূলের প্রথম ও প্রধান অপরিহার্য কর্তব্য এটাই হওয়া উচিত যে, তিনি আল্লাহর অহী তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন। তবে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, লোকদেরকে পুরো কুরআন একত্রে একই সাথে তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দেয়া হয়নি। বরং দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুসারে হযরত মুহাম্মাদ (স) লোকদেরকে পর্যায়ক্রমে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন নাযিলের এ পদ্ধতি একথার প্রমাণ বহন করে যে, কুরআন হালকা ও চুটকী ধরনের কোনো কিতাব নয়, বরং এ কিতাব গভীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত কিতাব। এ কারণে এ কিতাব অল্প অল্প ও পাঠ পাঠ করে শিক্ষা দেয়ার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে এর রত্নভাণ্ডারে লোকেরা প্রবেশ করতে পারে। এ বাস্তব সত্যটিকে কুরআন এভাবে বিশ্লেষণ করেছে—وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ - بنى اسراءيل : ١٠٦ "এবং আমরা এ কুরআনকে অল্প অল্প করে নাযিল করেছি যাতে আপনি বিরতি দিয়ে দিয়ে লোকদেরকে শুনাতে পারেন।"

তা'লীমে কিতাব ও হেকমত (কুরআন হেকমত শিক্ষা দেয়া)

কুরআনে হাকীমের উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য একথার দাবী রাখে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) একজন (ক্বারীর) বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ন্যায় কেবল কুরআন তেলাওয়াত করে লোকদেরকে শুনিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না। বরং তিনি একজন দক্ষ শিক্ষকের ন্যায় পূর্ণ আন্তরিকতা, মমতা ও সহানুভূতি সহকারে লোকদেরকে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এ কারণে তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া তাঁর দ্বিতীয় অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার এ দায়িত্ব তাঁর নবুওয়াতী দায়িত্বসমূহেরই একটি অংশ এবং তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা পালন করা তাঁর রেসালাতেরই একটি দিক। অতএব তাঁর এ পদমর্যাদার ফলে তিনি লোকদেরকে যা কিছু শিখিয়েছেন এবং বাতলে দিয়েছেন তাঁর সেসব শিক্ষা ও নির্দেশনাসমূহকে না তাঁর অপরিহার্য কর্তব্য থেকে পৃথক করা যেতে পারে এবং না মূল কিতাবের তুলনায় সেগুলোর মর্যাদা হ্রাস করা যেতে পারে।

অতএব, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। কুরআনের এ শিক্ষার দাবী কি কি হতে পারে?

তা'লীমে কিতাব বা কুরআর শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক দাবী হলো, কুরআনে যেসব শরয়ী পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন সালাত, যাকাত, হজ্জ, সওম, তাওয়াফ, উমরাহ, নিকাহ, তালাক ইত্যাদি এসবের কার্যবিধি বা আমলের নিয়ম-নীতি ও আকৃতি যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি। নবী (স) এসব বিধান পালনের নিয়ম-নীতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেবেন যাতে লোকেরা ব্যবহারিক জীবনে তা পালন করতে পারে এবং এসব বিধানের বিভিন্ন অংশের যে অবস্থান ও মর্যাদা ইসলামে রয়েছে তা নির্ধারণ করতে পারে।

www.pathagar.com

কুরআন শিক্ষার দ্বিতীয় দাবী হলো, চিন্তা ও কাজের পরিশুদ্ধির যেসব মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে তার আবশ্যকীয় ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় দিক স্পষ্ট করে দেয়া হবে। যাতে ঐসব অধ্যায়ে আরো অধিক দিক নিদের্শনা হাসিল করার জন্য তা আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় বিষয়টি হলো, কুরআনে শরীআতের যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা কেবল মূলনীতিস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি মূলনীতির অধীন এরূপ অসংখ্য মাসআলা আসবে যার বিধান নির্ণয় করা প্রশিক্ষকের দিক-নির্দেশনা ও তার ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য যে, এ ইজতিহাদের জন্য সর্বোত্তম দিক-নির্দেশনা ওসব দৃষ্টান্ত ও নযীর থেকেই পাওয়া যায় যা নবী (স) এ কিতাবের নিষ্পাপ শিক্ষক হিসেবে স্বীয় ইজতিহাদ থেকে কায়েম করেছেন।

চতুর্থ দাবী হলো, কুরআন সামাজিক জীবনের জন্য একটি সমাজ ব্যবস্থাও প্রদান করেছে। তবে সে কেবল এর চারদিক নির্ধারণকারী মূলনীতি প্রদান করে তার আনুসঙ্গিক ও বিস্তারিত বিষয়াদি এবং কর্মপদ্ধতিগত কাঠামো ঠিক করার বিষয়টি শিক্ষকের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে। লোকেরা এ বিষয়টিও নবী (স)-এর শিক্ষা থেকেই গ্রহণ করেছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি বিষয় হলো, আলোচ্য আয়াতে কেবল তা'লীমে কিতাবের কথাই উল্লেখ করা হয়নি বরং এখানে তা'লীমে হেকমত বা হেকমত শিক্ষা দেয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তা'লীমে হেকমতের বিষয়টি তা'লীমে শরীআত থেকে অনেক ব্যাপক। এর উদ্দেশ্য হেকমত শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, হেকমত হলো সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং সেই অন্তর্দৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞান ও উপলব্ধি যা জীবনের এমন দূরবর্তী দিকসমূহেও মানুষকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে যেখানে তাকে দিক নির্দেশনা প্রদানকারী আর কোনো আলো নেই।

এবার চিন্তা করে দেখুন! এসব বিষয় তা'লীমের দাবী সম্পর্কীয় কি না ? এবং এ বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শিক্ষক হিসেবে নির্দেশিত ছিলেন কি না ? জবাব যদি হাঁ সূচক হয়—আর একথা সুস্পষ্ট যে, এর জবাব হাঁ সূচকই হবে—তাহলে এবার ভেবে দেখুন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর এ পদমর্যাদার ফলে তিনি যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন তাকে কিভাবে তাঁর অপরিহার্য নবুওয়াতী কর্তব্য বহির্ভূত বলা যেতে পারে এবং তার গুরুত্ব কিভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। অতপর এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, হাদীসে এ বিষয়সমূহ ছাড়া আর কি আছে যা হযরত মুহাম্মাদ (স) কিতাব ও হেকমতের শিক্ষক হিসেবে বর্ণনা করেছেন বা তার ওপর আমল করে দেখিয়েছেন ?

তাযকিয়া (পবিত্র করা ও পরিশুদ্ধ করা)

তা'লীমের ন্যায় তাযকিয়া সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধকরণের কাজটি তা'লীমের চেয়ে অধিকতর জটিল ও ব্যাপক। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, তাযকিয়ার মধ্যে পাক-পবিত্র করা ও ক্রমবিকাশ

www.pathagar.com

ঘটানো উভয় অর্থই শামিল। এটা একই সময়ে ও একই সাথে জ্ঞানগতভাবেও হয় এবং আমলগতভাবেও হয়, বাহ্যিকভাবেও হয় এবং আভ্যন্তরীণভাবেও হয়, বস্তুগতভাবেও হয় এবং শারীরিকভাবেও হয়, বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও হয় এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও হয়, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সামষ্টিকভাবেও হয় ; এ ক্ষেত্রেও সংক্ষেপে কয়েকটি মৌলিক দাবি সামনে থাকা প্রয়োজন। এর একটি অত্যাবশ্যকীয় দাবি হলো, লোকদের মন-মানসিকতা, কাজ-কর্ম ও স্বভাব-চরিত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাদেরকে সেই সব রোগ জীবাণু থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে হবে যা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক রোগের কারণ বা উৎস হয়ে থাকে। এবং সাথে সাথে তাদের মনে নেকী ও কল্যাণের বীজ বপন করতে হবে যা মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরকে সুশৃংখল করে এবং মানুষের অভ্যাস ও স্বভাব-প্রকৃতিকে মার্জিত ও পরিশোধিত করে।

এর দ্বিতীয় দাবি এই যে, লোকদেরকে এভাবে শিক্ষা দেয়া হবে যে, সব ধরনের কল্যাণ ও সৌন্দর্য তাদের হৃদয় ও মনে শিকড় গেড়ে বসবে এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে সব ধরনের মন্দের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

এর তৃতীয় দাবী হলো, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যা আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্র করণের জন্য এক প্রশস্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ কাজ দেবে। যে ব্যক্তি এ পরিবেশে গড়ে উঠবে সে এ পরিবেশের প্রভাবে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠবে। আর যে ব্যক্তি ঐ পরিবেশে প্রবেশ করবে তার গায়ে পরিবেশের রং লেগে যাবে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে, রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপরিহার্য নবুওয়াতী দায়িত্ব কেবল এটাই ছিল যে, তিনি শুধু লোকদের নিকট কুরআন পৌছিয়ে দেবেন। কারণ কুরআন পৌছিয়ে দেয়া ছিল তাঁর নবুওয়াতী দায়িত্বের একটি অংশ মাত্র। এটা ছাড়াও তাঁর আরো দায়িত্ব ছিল যে, তিনি একজন শিক্ষকের ন্যায় লোকদেরকে কুরআনের তা'লীম দেবেন, কুরআনের অন্তর্নিহিত ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, তার সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতমূলক বর্ণনাসমূহ এবং তার রহস্য, তাৎপর্য ও বাস্তব বিষয়সমূহ লোকদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, তার বিস্ময়কর রহস্যসমূহের ভাণ্ডার পর্যন্ত পৌছার জন্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন। অনুরূপভাবে তাঁর এ দায়িত্ব ছিল যে, কুরআনের দর্শনের আলোকে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি নীতিমালা রচনা করবেন এবং সেসব মূলনীতি মোতাবেক লোকদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।

এসব কাজই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপরিহার্য নবুওয়াতী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব, এ উদ্দেশ্যে তিনি যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন তার সবটাকেই মুসলিম উম্মাহ কুরআনের ন্যায় অবশ্য পালনীয় মনে করে এবং অনুরূপ গুরুত্ব সহকারেই তা সংরক্ষণ ও বর্ণনা করে। তার কোনো অংশের ব্যাপারে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, নবী (স)-এর সাথে তার সম্পৃক্ততা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত কি না ? কিন্তু সেটাকে

www.pathagar.com

দীন ও শরীআহ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করা সরাসরি কুরআনকে অস্বীকার করার সমার্থক।

৫০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৪২-১৬২ আয়াত

নেতৃত্বের পদমর্যাদা থেকে ইহুদীদেরকে অপসারিত করার কারণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দান এ আয়াত সমষ্টিতে সমাপ্ত করা হচ্ছে। এখন যেনো তাদেরকে অপসারণ করে সেখানে এক নতুন (উম্মাতকে) জাতকে প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা করা হচ্ছে। এ উম্মাত হলো মধ্যমপন্থী উম্মাত অর্থাৎ এ উম্মাত সেই সরল ও সঠিক পথের ওপর কায়েম রয়েছে যা আল্লাহর সত্য দীনের আসল রাজপথ। ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতই (দীন) হলো এ উম্মাতের মিল্লাত এবং ইবরাহীম (আ)-এর কিবলা পবিত্র বায়তুল্লাহ-ই হলো তার কিবলা। এ উম্মাতের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো, যেভাবে নবী (স) তাঁর সামনে আল্লাহর আসল দীনের সাক্ষ্য দিয়েছেন অনুরূপভাবে তারাও আল্লাহর সৃষ্টির সামনে আল্লাহর দীনের সাক্ষ্য প্রদানকারী হবে।

এ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত নবী (স) ও মুসলমানগণ বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলো। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের সাথে এ উম্মাতের সম্পৃক্ততার ফলে মাসজিদে হারাম এ উম্মাতের কিবলা হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এ কারণেই কিবলা পরিবর্তনের হুকুম করা হয়েছে। এরপর কিবলা পরিবর্তনের যে প্রতিক্রিয়া ইহুদীরা ও মুসলমানদের কোনো কোনো গোষ্ঠী ব্যক্ত করেছে, তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে কিবলা পরিবর্তনের যৌক্তিকতা, ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেইসব প্রয়োজনীয় (হেদায়াত) বা দিকনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যা মুসলমানদেরকে কিবলার ব্যাপারে সঠিক পথের ওপর সুদৃঢ় রাখার জন্য জরুরী ছিলো এবং যার গুরুত্ব না দেয়ার কারণে ইহুদী ও খৃস্টানরা মূল কিবলা থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে।

এরপর একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মুসলমানদের নিকট থেকে এ অংগীকার আদায় করা হয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পর তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করেছো। যেমন তোমাদের রাসূল একজন পৃথক রাসূল, তিনি সেইসব গুণাবলীতে ভাস্বর যার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিবলাই হলো তোমাদের কিবলা। সুতরাং তোমরা এখন আর ইহুদীদেরকে মোটেও ভয় করো না। ভয় কেবল আল্লাহকেই করবে, তাহলে তোমাদের আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দীনের নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য হবে এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর শরীআতের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে স্মরণ রাখবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

www.pathagar.com

এরপর সম্ভাব্য বিপদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর বিরোধী ও শত্রুদের পক্ষ থেকে আসতে পারে। আর সেসব বিপদ-মুসীবত মুকাবেলা করার মুসলমানদের যে প্রস্তুতি এবং যে ঈমানী ও চারিত্রিক বলে বলিয়ান হওয়া প্রয়োজন তার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সবশেষে কা'বাঘর সম্পর্কে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, কা'বা ঘরের ন্যায় সাফা ও মারওয়াও আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে মারওয়াই ছিল আসল উৎসর্গ করার স্থান। কিন্তু ইহুদীরা বিকৃত করে সেইসব চিহ্নসমূহ মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে যাতে এ ঘরের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। ইহুদীরা তাদের এ দুষ্টামী ও ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ ও সকল অভিশম্পাতকারীর অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

এ ভূমিকার পর এবার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে—

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ

www.pathagar.com

بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ
مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ
بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ
إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ
مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم
مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ

www.pathagar.com

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ
بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾
الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾ اِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ
لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৪২. এখন নির্বোধ লোকেরা বলবে, কোন্ জিনিস এ লোকদেরকে তাদের ঐ কিবলা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যার ওপর তারা পূর্ব থেকে ছিল। আপনি বলে দিন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা রাস্তা দেখান। ১৪৩. অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি—যাতে তোমরা মানবমণ্ডলীর ওপর সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের ওপর। আর আপনি যে কিবলার ওপর ছিলেন তাকে আমি কিবলা এজন্যই করেছিলাম যে, যারা রাসূলের অনুসারী

www.pathagar.com

তাদেরকে আমি সেই লোকদের থেকে পৃথক করে দেবো যারা তাঁর অনুসরণ থেকে পিঠ টান দেয়। নিসন্দেহে এটা বড় কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দিতে চাইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড় অনুগ্রহশীল ও করুণাময়।

১৪৪. আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখে আসছিলাম। অতএব আমি ফায়সালা করে ফেলেছি যে, আমি আপনাকে সে কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেবো যাকে আপনি পসন্দ করেন। এখন আপনি আপনার মুখ মাসজিদে হারামের দিকে করুন। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সে দিকেই মুখ করো। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক। তারা যা কিছু করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ১৪৫. আপনি যদি আহলে কিতাবদের সামনে সব ধরনের নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কিবলা মানতে পারেন না। আর না তারা একে অপরের কিবলা মানতে পারে। আপনি যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেন সে জ্ঞান লাভের পর যা আপনার কাছে এসে পৌঁছেছে, তবে অবশ্যই আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাঁকে চেনে, যেভাবে চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে। নিশ্চয় তাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করে। ১৪৭. এটাই সত্য যা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে। কাজেই এ বিষয় আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১৪৮. প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে যে দিকে সে মুখ করে। কাজেই তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও। তোমরা যেখানেই থাকবে আল্লাহ তোমাদেরকে অবশ্যই সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল।

১৪৯. যে স্থান থেকে আপনি বের হন নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফেরান। নিসন্দেহে এটাই সত্য আপনার রবের পক্ষ থেকে। বস্তুত তোমরা যা কিছু করেছো আল্লাহ সে ব্যাপারে অনবহিত নন।

১৫০. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন। নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে করুন। আর যেখানেই তোমরা অবস্থান করো নিজেদের মুখ সেদিকেই (মাসজিদে হারামের দিকেই) ফেরাও ; যাতে মানুষের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে ঝগড়া করার কোনো অবকাশ না থাকে। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে যারা যালেম তাদের কথা ভিন্ন। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো, যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দেই। আশা করা যায় যে, তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

www.pathagar.com

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদের কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেন এবং এমন সব বিষয়ের শিক্ষা দেন যা কখনো তোমরা জানতে না। ১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য, দৃঢ়তা ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তার জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুভব করো না। ১৫৫. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। ঐসব দৃঢ়পদ লোকদেরকে সুংসবাদ দাও। ১৫৬. যাদের অবস্থা এরূপ যে, যখন তাদের কোনো বিপদ আসে তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই দরবারে আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। ১৫৭. তারা সেইসব লোক যাদের প্রতি তাদের রবের অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে আর এ লোকেরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

১৫৮. নিসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ বা ওমরা পালন করে তাদের পক্ষে এ দুটির তাওয়াফ করাতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেকীর কাজ করে আল্লাহ তা কবুল করবেন ও অবগত হবেন। ১৫৯. নিশ্চয় যারা গোপন করে আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও আমার হেদায়াত আমি কিতাবের মধ্যে মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়ার পরও—তারাই ঐসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণও অভিসম্পাত করেন। ১৬০. তবে যারা তাওবা করেছে ও সংশোধন করে নিয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে আমি তাদের তাওবা কবুল করি। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। ১৬২. তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, তাদের আযাব না হালকা করা হবে এবং না তারা কোনো বিরাম পাবে।

৫১. শব্দ বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৪২-১৪৪

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط قُلْ لِّلّٰهِ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

ইহুদীদেরকে নির্বোধ বলার কারণ

سُفَهَاءُ - سَفِيْهٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ নির্বোধ ও বোকা। এ থেকে এখানে ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইহুদীদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করার কারণ ইতিপূর্বে আমরা وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ - البقرة : ١٣٠ (যে ব্যক্তি নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে সে ছাড়া কে ইবরাহীম (আ)-এর দীন থেকে বিমুখ হয়ে থাকে ?) এ আয়াতে ইঙ্গিত করে এসেছি। ইহুদীরা একদিকে নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, অপর দিকে তারা হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর শিক্ষা ও দাওয়াতের সবচেয়ে বড় শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। অথচ তিনি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের প্রকৃত দা'য়ী (আহ্বানকারী) হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বৈপরীত্ব ও স্ববিরোধিতা কেবল নির্বোধ ও বোকা লোকেরাই করতে পারে। এ কারণেই কুরআন ইহুদীদের বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে।

পূর্ব থেকেই কিবলা পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত

দু' আয়াত পর কিবলা পরিবর্তনের যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে এটা তারই ভূমিকা। এ ভূমিকায় ইহুদী ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে কিবলা পরিবর্তনের ওপর আপত্তি ও তার প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আসল হুকুম বর্ণনা করার পূর্বেই তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার জবাব বর্ণনা করার কারণ এই যে, এক ঃ কিবলা পরিবর্তনের বিধানটি সাধারণ কোনো বিধান ছিল না। এটি ছিলো ইসলাম বিরোধী ও তাদের সমর্থকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি বিধান। এ কারণে এ বিধান জারী করার পূর্বে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার জন্য লোকদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল। দুই ঃ

www.pathagar.com

ইতোপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরগণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে প্রত্যেক পাঠকের সামনে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ) এবং তাঁদের বংশধরগণের দীন ছিল ইসলাম। আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কা মুকার্‌রামায় যে কেন্দ্র তৈরি করেছেন তা তাঁর সকল সন্তান-সন্তুতি ও বংশধরগণের কিবলা ও কেন্দ্র ছিল। এমন কি বায়তুল মাকদিসও নির্মাণ করার সময় এভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে বনী ইসরাঈলের কুরবানীসমূহের মুখ কা'বাঘর মুখী হয়। এ বিষয়সমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নামায আদায় করার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী। এখন বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কা'বাঘরের দিকে ফিরে নামায আদায় করার বিধান জারী করার সময় এসেছে। এ কারণেই এ ভূমিকাটি ছিল এমন একটি ঘটনার ভূমিকা যার অপেক্ষায় ছিল ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম সকলেই।

কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে ইহুদীদের আপত্তি

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ঃ (কোন্ জিনিস মুসলমানদেরকে তাদের সেই কিবলা থেকে ফিরিয়ে ছিল যার ওপর তারা এখন পর্যন্ত ছিল) এটা কিবলা পরিবর্তনের বিধানের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃস্টানদের) প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। এ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের ব্যাপারে যেসব আপত্তি তুলেছিলো ইতোপূর্বে তার আলোচনা করা হয়েছে। এখন বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কা'বাঘরকে যখন কিবলা নির্ধারণ করা হবে তখন তারা হৈ চৈ শুরু করে দেবে যে, মুসলমানগণ সকল নবীর কিবলা-বায়তুল মাকদিস—যেদিকে মুখ করে তারা এখন পর্যন্ত নামায পড়ছিলো তা পরিত্যাগ করে তাদের দেড় ইটের মসজিদকে পৃথক কিবলা বানালো কেন ?

ইহুদীদের আপত্তির জবাব

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ঃ (বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক তো আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালনা করেন।) এ আয়াতাংশে ইহুদী ও খৃস্টানদের পূর্বোক্ত আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যে, কিবলার সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক ? তোমরা তো মূল কিবলার পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিমের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছো। খৃস্টানরা পূর্বকে নিজেদের কিবলা নির্ধারণ করে নিয়েছে। আর ইহুদীরা করেছে পশ্চিমকে। অথচ আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো দিকেরই কোনো বিশেষত্ব প্রদানের কোনো কারণ নেই। সবদিকেই তিনি আছেন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবই তাঁর কর্তৃত্ব ও রাজত্বের অধীন। তাঁর সাথে কোনো কিছুর বিশেষত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে এমন কোনো ঘরের সাথে থাকতে পারে যাকে তিনি বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং কিবলা নির্ধারণ করেছেন। আর এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘরটি হলো হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক নির্মিত ঘর মক্কার পবিত্র

www.pathagar.com

কা'বাঘর। এ পবিত্র ঘরটিই ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরের কিবলা নির্ধারিত হয়েছিলো। আর এটিকেই কিবলা নির্ধারণ করে বায়তুল মাকদিসও নির্মাণ করা হয়েছিলা। এ বাস্তব সত্যের নিদর্শন ও চিহ্ন তাওরাতে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু তোমরা (ইহুদীরা) গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে এসব চিহ্ন মুছে ফেলেছিলে। কিন্তু তোমাদের বিরোধী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যাকে তিনি ইচ্ছা করেছেন তাকে সোজা রাস্তা দেখিয়েছেন এবং তারা এখন তোমাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত থেকে বের হয়ে সঠিক রাস্তার ওপর চলতে শুরু করেছে।১

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؛ كَذٰلِكَ উপরোক্ত আলোচিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে আমি কিবলা সংক্রান্ত বিষয়ে ইহুদী খৃস্টানদের সৃষ্ট বাঁকা পথ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের চক্র থেকে তোমাদেরকে বের করে সরল ও সঠিক পথপ্রদর্শন করেছি। অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের সংকীর্ণ পথ থেকে রেহাই দিয়ে দীনের রাজপথের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি বানিয়েছি, যাতে রাসূল তোমাদের প্রতি সাক্ষ দেন এবং তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দীনের সাক্ষ দেবে।

মধ্যপন্থী জাতি

وَسَطٌ শব্দটি وَلَدٌ এর ন্যায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ, একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। وَسَطٌ বলা হয়—যে বস্তুটি দু' প্রান্তের ঠিক মাঝখানে থাকে। এ অর্থের কারণে এর মধ্যে উৎকৃষ্টের ভাব সৃষ্টি হয়েছে কেননা যে বস্তু দু' প্রান্তের মাঝ বরাবর হয় তা মধ্যম, ন্যায় সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। আর এটা এর উৎকৃষ্ট হওয়ার স্বাভাবিক প্রমাণ। মুসলিম উম্মাহকে 'উম্মাতে অসাত' বা মধ্যপন্থী জাতি বলার কারণ হলো, এ উম্মাত হুবহু দীনের এমন রাজপথের মধ্যবর্তী স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতকে পথপ্রদর্শনের মহান উদ্দেশ্যে স্বীয় নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে উন্মুক্ত করেছেন এবং যা সৃষ্টির আদি থেকেই হেদায়াতের প্রধান ও মূল রাজপথ। ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহর নবীগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে হেদায়াতের রাজপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের সংকীর্ণ রাস্তা তৈরি করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে তারা মূল কিবলা থেকে বিপথগামী হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তাদের রচিত জটিল ও বক্র পথে চালিত না হয়ে দীনের আসল রাজপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা বিভেদের পরিবর্তে ঐক্যের কথা বলে যা ইতোপূর্বে এ ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

১. এখানে আমরা যে বিষয় আলোচনা করেছি তা ভালোভাবে বুঝার জন্য আয়াত ১১৫ ও ১২৫ এ আমরা যা কিছু লিখেছি তা দেখে নিন।

www.pathagar.com

وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝ - البقرة : ١٣٦

"তোমরা বল, আমরা তো আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি সেইসব জিনিসের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁদের বংশধরগণের প্রতি এবং আমরা ঈমান এনেছি সেইসব জিনিসের ওপর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। আমরা নবীগণের মধ্য থেকে কারো মাঝে কোনো প্রকার পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্য করি।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৬

অনুরূপভাবে এ উম্মাত কিবলার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিমের ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কিবলার অনুসরণ করেছে যা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকে সকল নবী ও রসূলের কিবলা ছিলো। এমন কি বায়তুল মাকদিসও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিবলা কা'বার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এ সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেছে।

দীনের ব্যাপারে এটাই ছিলো মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য। যার কারণে পবিত্র কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ উম্মাতকে খায়রে উম্মাত বা শ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়েছে। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যে বস্তু দু' প্রান্তের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে থাকে এবং ন্যায়সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ হয় তা অবশ্যই উৎকৃষ্ট হয়। এ জাতি মধ্যপন্থী হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অলংকৃত করেছে।

কেউ কেউ এটা মনে করেন যে, ইহুদী ধর্ম ছিল খুব কঠিন এবং খৃস্টধর্ম ছিল সহজ। ইসলাম উভয়ের মাঝামাঝি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এ কারণেই এ ভারসাম্যপূর্ণ দীনের অনুসারী ও ধারক-বাহক জাতিকে "উম্মাতে অসাত" বা মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে আমাদের দৃষ্টিতে এ ধারণা সঠিক নয় মূল দীন হিসেবে ইহুদী ও খৃস্টান উভয়ের দীন একই। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় উম্মাতের প্রতি তাওরাতের অনুসরণ এতটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যেমন তার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিলো ইহুদীদের ওপর। তিনি যদি তাওরাত থেকে আলাদা কোনো কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে তার ধরন-প্রকৃতি তাওরাত থেকে পৃথক কোনো স্বতন্ত্র শিক্ষা নয় বরং সে শিক্ষা কেবল দীন বাস্তবায়নের বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ও দীনের প্রাণ সত্তার মর্যাদাসম্পন্ন। ইহুদীরা দুনিয়া পূজারী হওয়ার কারণে আসল দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবল রসম-রেওয়াজের গোলাম এবং শব্দ ও কথার পূজারী হয়ে গিয়েছিলো। হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে দীনের প্রাণ সত্তার সাথে পরিচিত করেছেন ইঞ্জিল তাওরাত থেকে স্বতন্ত্র কোনো কিতাব ছিল না বরং তাওরাতেরই রহস্য ও মূল তত্ত্বের প্রতি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ আকৃষ্ট করে।

www.pathagar.com

মধ্যপন্থী জাতির পদমর্যাদাগত দায়িত্ব

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ঃ (যেনো তোমরা মানবমণ্ডলীর ওপর আল্লাহর দীনের সাক্ষী হও এবং রাসূল হবেন তোমাদের ওপর আল্লাহর দীনের সাক্ষী)। এটা মধ্যপন্থী জাতির পদমর্যাদাগত অপরিহার্য কর্তব্য এবং এ কর্তব্য পালন তাদের সচেষ্ট ও উদ্যোগী হওয়ার গুরুত্বের বর্ণনা। উপরোক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের মহান পদমর্যাদায় আসীন করেছিলেন তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, তাঁর শরীআতকে পরিবর্তন করে ফেলেছে, তাঁর দীনের সোজা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, তাঁর নির্ধারিত কিবলা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তাদেরকে যেসব বিষয়ের সাক্ষ দেয়ার জন্য আমানতদার বানানো হয়েছিলো তারা সেগুলোকে গোপন করেছে। এমতাবস্থায় বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় কোনো প্রয়োজন যদি থেকে থাকে তাহলে সে প্রয়োজন এটাই যে, আল্লাহ তাআলা এমন একটা জাতির উত্থান ঘটাবেন যারা আল্লাহর সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে আসল দীনের ধারক-বাহক হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মানুষের সামনে আল্লাহর দীনের সাক্ষ দেবে।

"রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন এবং তোমরা সাক্ষী হবে মানবজাতির ওপর" এ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, রাসূল হিসেবে মানবজাতির ওপর সাক্ষী হওয়ার যে অপরিহার্য দায়িত্ব মুহাম্মাদ (স)-এর ছিল তাঁর অবর্তমানে তাঁর এ দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের ওপর বর্তাবে। এখন এ উম্মাতের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হলো যে, তারা সব যুগে সমগ্র বিশ্বে সকল ভাষায় মানব জাতির ওপর আল্লাহর দীনের সাক্ষ দেবে। তারা যদি তাদের এ অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ও অবহেলা করে তাহলে পৃথিবীর গোমরাহী ও বিভ্রান্তির ফলাফল ভোগের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সাথে তারাও সমানভাবে শরীক হবে। আমাদের ব্যাখ্যাদাতাগণ সাধারণভাবে এ সাক্ষকে পরকালের সাথে সম্পর্কিত করে বলেন, মুসলিম উম্মাহ পরকালে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে নবীগণের সমর্থনে এই বলে সাক্ষ দেবে যে, এসব পথভ্রষ্ট লোকদের নিকট আল্লাহর দীন পৌঁছেছিলো এ সত্ত্বেও তারা গোমরাহীর এ পন্থা অবলম্বন করেছে।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে পরকালের সাথে সাক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করা ও সীমাবদ্ধ করার কোনো প্রমাণ নেই। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ উম্মাত পরকালেও আল্লাহর সাক্ষী হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। তবে পরকালে এ মর্যাদা এ কারণেই অর্জিত হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে সাক্ষ্য দানের মর্যাদা দান করেছেন। যে জাতি পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার সত্য দীনের সাক্ষী হয়, বলা বাহুল্য যে, পরকালেও তারাই এ অবস্থানে থাকবে যে, তারা সাক্ষ দেবে (অন্যান্য জাতি) তারা মানুষের নিকট আল্লাহর দীন সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছে কিনা।

www.pathagar.com

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط

جَعَلَ-এর মর্ম

جَـــعَلَ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হলো জায়েয বলা এবং শরীআহ সম্মত সাব্যস্ত দ্বারাও হয়। যেমন مَـا جَـعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلاَ سَـائِبَـةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ - المائدة : ١٠٣-"আল্লাহ তাআলা বহিরা, সায়েবা ও ওসীলাকে শরীআহ সম্মত করেননি।"

عَلِمَ يَعْلَمُ-এর ব্যাখ্যা

عَلِمَ يَعْلَمُ-এর অর্থ যেমন জেনে নেয়া ও নির্দিষ্ট করা হয় অনুরূপভাবে অর্থ পার্থক্য করে দেয়া, যাচাই বাছাই করে ও ছেঁটে আলাদা করে দেয়া এবং প্রকাশ করে দেয়ার অর্থও হয়। যেমন وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ لا - محمد : ٣١ -"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদকারী এবং কারা সবরকারী।"-সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩১। اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ - ال عمران : ١٤٢"- তোমরা কি এটা ধারণা করে রেখেছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে এখনো সেইসব লোকদেরকে প্রকাশ করেননি যারা জিহাদ করেছে।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৩

বায়তুল মাকদিসকে অস্থায়ী কিবলা নির্ধারণ করার যৌক্তিকতা

তোমাদেরকে যে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো তার উদ্দেশ্য এই ছিলো না যে, এটা তোমাদের স্বতন্ত্র কিবলা। বরং এ অনুমতি ছিল সাময়িক ও অস্থায়ী। আর এ অনুমতি দানের উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, পরবর্তীতে এ কিবলা পরিবর্তন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য একটি মানদণ্ড হবে। এবং এর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা যাবে, তোমাদের মধ্যে কি পরিমাণ লোক এমন আছে প্রকৃতপক্ষে রাসূল (স)-এর অনুসারী এবং এমন লোক কি পরিমাণ রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণের চেয়ে বেশি নিজেদের পুরানো ধর্মের দিকে ফিরে চলে যায়। এখানে একথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নবী (স)-এর প্রতি যখন নামায আদায়ের হুকুম হয় তখন তিনি বায়তুল মাকদিসকে কিবলা নির্ধারণ করেন। প্রথম দিকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিয়ম ছিল যে, যে সকল বিষয় তার সামনে আল্লাহ তাআলার অহীর সুস্পষ্ট কোনো পথনির্দেশ না থাকতো সেসব বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

নবীগণের পন্থা অনুসরণ করতেন। যেমন কিবলার ক্ষেত্রেও তিনি এরূপ করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি যতদিন মক্কায় ছিলেন ততদিন নামায আদায় করার সময় তিনি এভাবে দাঁড়াতেন যাতে কা'বাঘর ও বায়তুল মাকদিস উভয়টাই তার সামনে থাকতো। কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পর কিবলার দিক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ফলে কা'বাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো আর সম্ভব হলো না। প্রাকৃতিকভাবে কা'বাঘর থেকে এ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা তাঁর মনঃকষ্টের কারণ হয়। এ বিষয়ে তিনি অহীর অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটাই হলো যে, তিনি আরো কিছু দিন বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতে থাকুন। ফলে হিজরতের পরও তিনি ষোল-সতের মাস বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকলেন। অবশেষে বদর যুদ্ধের আনুমানিক দু' মাস পূর্বে কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হলো।

দীনের মধ্যে পরীক্ষা করার হেকমত

আল্লাহ তাআলা এত সময় পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসকে কিবলা হিসেবে কায়েম রাখার এবং বায়তুল মাকদিস থেকে কিবলা পরিবর্তন করে কা'বাকে কিবলা নির্ধারণ করার এ হেকমত বর্ণনা করেছেন যে, এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে একটা পরীক্ষার সম্মুখীন করে তাদের মধ্য থেকে খাঁটি ও কৃত্রিমের পার্থক্য করেছেন। এতে মদীনায় আমার পর আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে অপরিপক্ক যেসব লোক মুসলমানদের সাথে শামিল হয়ে গেছে, এ পরীক্ষার মাধ্যমে তারা হয়তো ইসলামের প্রতি একাগ্র হয়ে যাবে অথবা ছিটকে পড়ে মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

ঃ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারটি ছিল একটা কঠিনপরীক্ষার বিষয়। কেননা এ ধরনের বিষয়সমূহে যার সম্পর্ক শুধু দীনের সাথে নয়, বরং দীনের কোনো মৌলিক বিষয়ের সাথে থাকে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আবেগপ্রবণ ও ঐতিহ্য পূজারী হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাধারণ কোনো পরিবর্তনও তার জন্য বড় কঠিন মনে হয়। কিন্তু দীনের আসল ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য এবং ইখলাস বা খালেস নিয়ত। আর গোঁড়ামী হলো ইখলাসের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলগণ সব যুগেই ক্রমাগতভাবে গোঁড়ামীর ওপর আঘাত করে থাকেন। নবীগণ ও দীনসমূহের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সকল নবীর আগমনেই উম্মাতের এ ধরনের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরূপ পরীক্ষা করা আল্লাহ তাআলার এক শাশ্বত রীতি। এ রীতির দাবী অনুসারে প্রত্যেক নবীর যুগেই দীনের রেওয়াজ ও বাহ্যিক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এর দ্বারা খাঁটি অখাঁটির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য হয়ে যায়। যেসব লোক নিজের জাতীয় ও গোত্রীয় গোঁড়ামীর ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কৃত্রিমতা প্রকাশ হয়ে যায়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হেদায়াত কবুল করার পরিবর্তে নিজেদের ঐতিহ্য ও রসম-রেওয়াজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে যাদের মধ্যে ইখলাসের প্রাণ সত্তা বর্তমান রয়েছে তারা তার

www.pathagar.com

ইখলাসের বরকতে আল্লাহর হেদায়াত কবুল করার তাওফীক লাভ করে। যেমনটি হয়েছে কিবলা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও। যেসব লোক নিজেদের গোঁড়ামী জালে আবদ্ধ থেকে সাময়িক কোনো স্বার্থ উদ্ধারের আশায় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে কিবলা পরিবর্তনের পর সেসব লোক ইসলাম থেকে পিছু হটে গেছে। পক্ষান্তরে যেসব লোক কেবল আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-বন্দেগী এবং রাসূল (স)-এর আনুগত্যের আবেগ অনুভূতি সহকারে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার হেদায়াত ও রহমতের বিশাল দরযা উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব

"আল্লাহ তাআলা এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। তিনি তো মানুষের ব্যাপারে বড়ই দয়ালু।" এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারটি কুরআনের বর্ণনা অনুসারেও একটি কঠিন পরীক্ষা। তবে আল্লাহ তাআলা কেন লোকদেরকে এ ধরণের কঠিন পরীক্ষায় ফেলা পসন্দ করেছেন। যার ফলাফল এ হতে পারে যে, বহু লোক এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণে নিজেদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছে ? কুরআন এ সন্দেহের অপনোদন এভাবে করেছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে এ ধরনের পরীক্ষাসমূহে এ জন্য ফেলেন না যে, তারা ঈমান নষ্ট করে ফেলুক। বরং এ ধরনের পরীক্ষা আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমতের বহিপ্রকাশ। এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দার যোগ্যতার বিকাশ ঘটে এবং তার সেইসব শক্তি ও যোগ্যতা তারই কাজে লাগে যে যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান ভাণ্ডার থেকে বান্দার মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটি, মুখলিস ও মুনাফিক এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য রচিত হবে। এ পরীক্ষা না হলে ভালো-মন্দ, পরিপক্ক ও অপরিপক্ক এবং গভীর ও অগভীরের কোনো পার্থক্য থাকতো না। প্রত্যেক দাবীদারের দাবীকে সত্য বলে মেনে নিতে হতো, প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর সকল কথার প্রতি সমর্থন করতে হতো। এমন কি পরকালেও কাউকে পুরস্কার ও কাউকে শাস্তি দেয়ার জন্য কোনো দলীল-প্রমাণ অবশিষ্ট থাকতো না। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টির এ কারখানার সকল সৌন্দর্য এবং তার সকল হেকমত ও বরকত আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার শাশ্বত রীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এটা যদি না হয় তবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সবকিছু সম্পূর্ণরূপে ভালো মন্দের বিচারবোধ হীন এবং কল্যাণহীন থেকে যেতো। বরং তা খেলোয়াড়ের একটা খেলার বস্তু হয়ে যেতো।

ভাষাগত এ সূক্ষ্ম দিকটিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নামসমূহের মধ্য থেকে "رَءُوفٌ" ও "رَحِيمٌ" নামের উল্লেখ করেছেন। رَءُوفٌ শব্দটি رَافَتْ থেকে নির্গত। এর মধ্যে মন্দ প্রতিরোধের দিকটি প্রবল। আর رَحِيمٌ শব্দটি رَحْمَتْ থেকে গঠিত। এর মধ্যে কল্যাণ সাধনের দিকটি সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, উল্লেখিত দুটি দিক আল্লাহ তাআলার যাচাই ও পরীক্ষার শাশ্বত নীতির মধ্যে লক্ষণীয়। এ আয়াত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ বান্দাকে মন্দ ও দুর্বলতা

www.pathagar.com

থেকে পবিত্র করে গুণ ও সৌন্দর্য্য দ্বারা সজ্জিত করা। এখানে এতটুকু ইঙ্গিত করেই শেষ করছি। সামনে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাআলার এ শাশ্বত নীতির বিভিন্ন দিকের ওপর প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা হবে।

সাধারণভাবে তাফসীরকারগণ এ আয়াতকে এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছেন যে, কিবলা পরিবর্তনের পর লোকদের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, যারা পূর্ববর্তী কিবলার সময়ে অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস কিবলা থাকাকালীন অবস্থায় মারা গেছে তাদের নামাযের কি অবস্থা হবে। তাদের নামায কবুল হবে কিনা ? এ আয়াতে এ প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে এখানে না এ প্রশ্ন সৃষ্টির কোনো কারণ ছিলো। আর না এর জবাব দেয়ারও কোনো প্রয়োজন ছিলো। মূলকথা সেটাই যার প্রতি আমরা ইঙ্গিত করেছি।

আরবী ভাষার এক বিশেষ পদ্ধতি

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ঃ এখানে আরবী ভাষার একটি বিশেষ পদ্ধতি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া প্রয়োজন। সেটি এই যে, افعال ناقصه (অসমাপিকাক্রিয়া) সাধারণত مضارع (বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল সূচক ক্রিয়া) এর পূর্বে বিলোপ করে দেয়া হয় যেমন "كَانَ يَفْعَلُ" এর স্থলে 'يَفْعَلُ' কেই যথেষ্ট মনে করা হয়। আরবী ভাষা ও পবিত্র কুরআনে এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কুরআন থেকে আমরা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি ঃ

সূরা হূদে এসেছে ঃ

فَلَاتَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰۤؤُلَآءِ ۭ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ - هود : ١٠٩

"অতএব, আপনি সেসব ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহে পতিত হবেন না যাদেরকে তারা উপাসনা করে। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন ওইসব বস্তুর পূজা-উপাসনা করত এরাও তেমন করছে।"–সূরা হূদ ঃ ১০৯

এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে "كَمَا كَانَ يَعْبُدُ" -এর স্থলে "كَمَا يَعْبُدُ" বলা হয়েছে। كَانَ শব্দটিকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে সূরা যখরুফে এসেছে ঃ

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

"পূর্ববর্তী লোকদের নিকট আমি অনেক রাসূলই প্রেরণ করেছি। যখনই তাদের মাঝে কোনো রাসূল আগমন করতো তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।"
–সূরা যুখরুফ ঃ ৬-৭

এ আয়াতে "وَمَا يَاْتِيْهِمْ" মূলত "وَمَا كَانَ يَاْتِيْهِمْ" ছিলো। আরবী পদ্ধতিগত কারণে "كَانَ" শব্দটি বিলোপ করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল আনআমে এসেছে ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - الانعام : ٧٥

"অনুরূপভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম।"–সূরা আল আনআম ঃ ৭৫

এখানে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ মূলত كُنَّا نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ ছিলো। সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে مضارع -এর পূর্ব থেকে ' كُنَّا' শব্দটিকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে।

এ পদ্ধতির অনুসারে আলোচ্য আয়াতে نَرٰى মূলত قَدْ كُنَّا نَرٰى ছিলো। অনুবাদে আমরা এ শব্দটির অর্থ বিলুপ্ত করিনি। কেননা উর্দুতে বিলুপ্ত করণের এ পদ্ধতির বর্ণনা নেই।

সারকথা এই দাঁড়ালো যে, আমি আপনাকে বার বার আসমানের দিকে তাকাতে দেখছিলাম যে, আপনি কিবলা পরিবর্তনের জন্য তীব্রভাবে অপেক্ষা করছেন। অতএব, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেবো যাকে আপনি পছন্দ করেন।

কিবলা পরিবর্তনের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপেক্ষা করার কারণ

ইতোপূর্বে এ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যে, মক্কায় থাকাকালে এক সাথে উভয় কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় সম্ভব ছিলো। কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পর এ সুযোগ আর থাকলো না ফলে ইবরাহীম (আ)-এর কিবলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তার কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। বিশেষ করে যখন অহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট এ সত্য স্পষ্ট হলো যে, তিনি ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছিলেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিবলাই তাঁর সকল বংশধরের সাধারণ কিবলা। তখন থেকে তিনি কিবলা পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে থাকেন। একটা সাধারণ নিয়ম রয়েছে যে, কেউ যদি কারো জন্য তীব্রভাবে অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে সে বার বার তার পথ পানে তাকাতে থাকবে। তদ্রূপ হযরত মুহাম্মাদ (স) বার বার আসমানের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কেননা হযরত জিবরাঈল (আ) আসমানের দিক থেকেই আগমন করতেন।

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ এ শব্দের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিবলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমি অনুবাদে অনুল্লেখিত বক্তব্য তুলে ধরেছি। প্রয়োজন ছিলো তার কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্বৃত করা। আমার মনে পড়ে আমার উস্তাদ মাওলানা (র) কতিপয় দৃষ্টান্তের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, লিখার সময় আমার নিকট উদ্বৃতি দেয়ার মত প্রয়োজনীয় কিতাব ছিল না। সম্ভব হলে ছাপার সময় এ অভাব পূরণ করব।

www.pathagar.com

কিবলার পরিবর্তন সংক্রান্ত মৌলিক বিধান

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

شطر -এর অর্থ দিক, পার্শ্ব। মাসজিদে হারাম দ্বারা সেই মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ বুঝানো হয়েছে যেটি বায়তুল্লাহকে চতুর্দিক থেকে বৃত্তের মতো পরিবেষ্টন করে আছে। বায়তুল্লাহ-ই হচ্ছে প্রকৃত কিবলা। তাই মাসজিদে হারামের মধ্যে বায়তুল্লাহর চতুর্দিক থেকে লোকেরা বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে। তবে বাইরের লোকদের জন্য মাসজিদে হারামকেও কিবলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে মুসলিম উম্মার জন্য কিবলার বিষয়কে কিছুটা প্রশস্ত ও সহজ করা হয়েছে। যেমন কুরবানীর মূল স্থান হলো মারওয়া (পাহাড়) কিন্তু উম্মাতের জন্য সহজ করার তাকিদে এটাকে মিনা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়েছে।

আমাদের মতে এটিই সেই আয়াত যা নবী (স)-কে মাদানী জীবনের শুরুতে বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল তা রহিত করে দেয়। অতপর মাসজিদে হারামের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার হুকুম করে। সেই সাথে একথাও বলে দেয়া হয় যে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মাসজিদে হারামের দিকেই মুখ করেই সালাত আদায় করবে। এ হেদায়াত মুসলমানদেরকে এজন্য দেয়া হয়েছে, তারা যেনো ইহুদী ও খৃস্টানদের ন্যায় বিভ্রান্তিতে লিপ্ত না হয়। উপরোক্ত ১১৫ আয়াতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা বায়তুল মাকদিসের মধ্যে বায়তুল মাকদিসকেই কিবলা বানাতো। কিন্তু এর বাইরে এসে তারা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিককেই কিবলা নির্ধারণ করতো। এ উম্মাতকে আল্লাহ তাআলা এ ধরনের গোমরাহী থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এ হেদায়াত প্রদান করেছেন যে, তোমরা মাসজিদে হারামের মধ্যে অথবা বাইরে যেখানেই থাকো না কেন নামাযের ওয়াক্তসমূহে অবশ্যই এ নির্ধারিত কিবলা-কা'বার দিকেই মুখ করে দাঁড়াবে।

বাক্যের বাচনভঙ্গি পরিবর্তনের তাৎপর্য ও ভাষাগত অলংকার

আলোচ্য আয়াতে বাচনভঙ্গি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট দৃশ্যমান বিষয়টি অনুধাবন করা আবশ্যক। এখানে প্রথমে فَوَلِّ وَجْهَكَ বাক্যাংশে একবচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। অতপর فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ -এর মধ্যে বহুবচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে এ পরিবর্তনের কারণ এই যে, প্রথমে সমগ্র উম্মতের বা মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এককভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার বহুবচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে একথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত বাক্যাংশে বাহ্যদৃষ্টিতে যদিও একবচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এটা কেবল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাথেই নির্দিষ্ট নয় বরং তাঁর সমগ্র উম্মাত এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও প্রথমে একবচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করার কারণ এটাও যে, ইতোপূর্বে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে কিবলা পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাতে যথেষ্ট

www.pathagar.com

অস্পষ্টতা ছিল। ফলে প্রথমে বিশেষভাবে তাঁকে কিবলা পরিবর্তনের সুসংবাদ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এখানে সেটাই করা হয়েছে।

এ কিবলা সঠিক হওয়ার বিষয়টি আহলে কিতাবের নিকট স্পষ্ট ছিল

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ঃ এখানে اَنَّهٗ দ্বারা একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ উম্মাতের কিবলা হলো মাসজিদে হারাম। আর একথাটা যে সত্য এবং আল্লাহর কথা তা আহলে কিতাবের নিকট নিতান্তই স্পষ্ট ছিল। কারণ কুরআন ইতোপূর্বে যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছে তা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে গেছে।

এক ঃ ইহুদীদের একথা জানা ছিল যে, বায়তুল্লাহ বা কা'বাঘর হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) নির্মাণ করেছেন। আর এ বায়তুল্লাহ-ই হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরের আসল কিবলা।

দুই ঃ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের মধ্য থেকেই শেষ নবীর আবির্ভাব হবে এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির উত্থান ঘটাবেন।

তিন ঃ প্রথম থেকে এ বায়তুল্লাহ-ই ছিল হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের কিবলা ও কেন্দ্র। এ সকল বিষয়ের প্রতি বহু আভাস ইঙ্গিত তাওরাতে ছিল এবং মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব ও তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি তাওরাতের ওইসব আভাস-ইঙ্গিতের সমর্থন ছিলো। কিন্তু ইহুদীরা বনী ইসমাঈল ও মুসলমানদের প্রতি চরম হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। এ কারণে তারা এ সকল সত্য বিষয়কে গোপন করতো। এসব সত্যকে গোপন করার কারণে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করে বলা হয়েছে এ লোকেরা যা কিছু করছে আল্লাহ সে ব্যাপারে অনবহিত নন। অর্থাৎ নিজেদের সত্য-গোপন করার উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই পাবে।

আয়াত ঃ ১৪৫

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

মনোযোগ আকর্ষণ

এ আয়াতটিতে মনোযোগ আকর্ষণ হিসেবে নবী (স)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, কিবলার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের এ আচরণ কোনো সন্দেহ সংশয়ের কারণে নয়।

www.pathagar.com

বরং এ বিষয়টি তাদের খুবই জানা-শুনা বিষয়। তারা কেবল হিংসা, বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েই এরূপ আচরণ করছে। কাজেই আপনি যদি তাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত মু'জিযাও দেখান তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না। দলিল-প্রমাণ ও মু'জিযা দ্বারা তাদেরকে আশ্বস্ত করা যাবে না। তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাইলে তোমাদেরকে অবশ্যই তাদের কিবলার অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়ার পর তোমাদের পক্ষে তাদের কিবলার অনুসরণ করার কোনো অবকাশ নেই। অতপর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের এ বিরোধিতা যে কেবল তোমাদের সাথেই হচ্ছে তা নয় বরং ইহুদী ও খৃস্টান উভয়ে একে অপরের কিবলার অনুসরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা এখন পূর্ব ও পশ্চিমের ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ ঝগড়া শেষ হবার নয়। একই কিবলার দাবীদাররা যখন এক হতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে তখন তোমাদের কিবলার অনুসরণ তারা কিভাবে করতে পারবে?

অবশেষে বলা হয়েছে অহীর ইলম বা জ্ঞান আসার পর তোমরা যদি তাদের মনগড়া কথার অনুসরণ করো তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এটা এক ধরনের সতর্কবাণী যাতে বাহ্যিকভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ও খৃস্টানরাই হচ্ছে এর মূল লক্ষ। এ আয়াতে اَلْعِلْم (জ্ঞান)-এর অর্থ হচ্ছে প্রকৃত ও আসল ইলম যা কেবল অহীর মাধ্যমেই লাভ করা যায়। আর اَهْوَاءَ -এর অর্থ হলো ইহুদী ও খৃস্টানদের বেদআত তথা মনগড়ার নতুন আবিষ্কার। এ শব্দ দুটির তাৎপর্য ১২০ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আয়াত ঃ ১৪৬

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ط وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ○

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ দ্বারা এখানে কিতাবধারীদের মধ্যকার ঐসব সৎ ও সত্যপন্থীদের বুঝান হয়েছে। যারা তাদের জ্ঞান-সীমা পর্যন্ত নিজেদের দীনের ওপর অবিচল ছিল। যারা তাদের নিকট রক্ষিত আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত শেষ নবীর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রকাশ পাওয়ার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। এদ্বারা যে সত্যপন্থী আহলে কিতাবদেরই বুঝান হয়েছে তার বিভিন্ন কারণ ও প্রমাণাদি ১২১ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি।

يَعْرِفُوْنَهٗ শব্দটির শেষে ব্যবহৃত 'যমীর' তথা ইঙ্গিত সূচক অব্যয়টির مَرْجَع বা প্রত্যাবর্তনস্থল হলো কুরআন মজীদ এবং শেষ নবীর আবির্ভাব ও ইতোপূর্বে উল্লিখিত কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে কুরআন যা বর্ণনা করেছে তা। এ আয়াতটি অবিকল একই শব্দ ও ভাষায় সূরা আল আনআমেও উক্ত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ - الانعام : ٢٠ "যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে তেমনি চেনে, যেমন তাদের পুত্রদের চেনে।"-সূরা আল আনআম ঃ ২০

www.pathagar.com

উপমায় নিহিত অলংকারিত্ব

পুত্রদের ন্যায় চেনার মধ্যে এ উপমা নিহিত রয়েছে যে, পুত্র থেকে দূর দূরান্তে অবস্থানরত কোনো পিতা স্বভাবতই পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল থাকে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যখন সে ফিরে আসে তখন দূর থেকেই তার জামার খুশবু পিতার জন্য আনন্দের বার্তা বহন করে আনে। ঠিক তদ্রূপ এ সত্যপন্থী আহলে কিতাবরা শেষ নবীর আবির্ভাব সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাদের সামনে যখনই কোনো সাক্ষ-প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করে তৎক্ষণাত তারা তাকে হারানো ইউসুফের মতই সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ভাল আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত সত্যের জন্য প্রতিজ্ঞা ও আগ্রহের যে ভাবধারা বিদ্যমান ছিল কুরআন মজীদের অন্যত্র তা বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ - المائدة : ٨٣ "আর তারা যখন শোনে রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু-বিগলিত দেখতে পাবেন, কারণ তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি ; অতএব আপনি আমাদেরকে সত্য স্বীকারকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৩

আয়াত ঃ ১৪৭

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

বাক্যের উদ্দেশ্যকে উহ্য রাখার অলংকার

আমাদের মতে এখানে اَلْحَقُّ শব্দটি বিধেয় আর উদ্দেশ্যটি উহ্য রয়েছে। উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে দিলে পূর্ণ বাক্য হবে এরূপ ঃ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ অর্থাৎ এটাই প্রকৃত সত্যবাণী। مِنْ رَّبِّكَ বাক্যাংশ বিধেয়-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শ্রোতার সম্পূর্ণ মনোযোগ বিধেয়ের প্রতি নিবদ্ধ করে দেয়াই যেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয়, আরবীতে সাধারণত সেরূপ ক্ষেত্রেই বাক্যের উদ্দেশ্য উহ্য করে দেয়া হয়। ১৪৪ আয়াতে اَلْحَقُّ শব্দটি বিধেয়ের স্থানেই রয়েছে। ১৪৯ আয়াতেও একইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ -এর সম্বোধন বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি। কিন্তু ভীতি প্রদর্শন ও ভর্ৎসনার লক্ষ মূলত বিরুদ্ধবাদীরা। ১৪৫ আয়াতটি লক্ষ্য করুন।[১]

১. সম্বোধনের বিভিন্ন দিক ভালভাবে বুঝার জন্য মাওলানা ফারাহী (র)-এর তাফসীরের ভূমিকায় সম্বোধন বিষয়ক অনুচ্ছেদটি গভীরভাবে পড়ে নিন। সূরা আবাসা-এর তাফসীর থেকেও এ ব্যাপারে ভাল সাহায্য ও উপকার লাভ করতে পারবেন।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৪৮

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ
اللّٰهُ جَمِيْعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

كُلٌّ শব্দের অর্থ

كُلٌّ শব্দটি যদিও শাব্দিকভাবে অনির্দিষ্ট কিন্তু সাধারণত এর দ্বারা বিশেষভাবে ঐ দল বা ব্যক্তিবর্গকেই বুঝান হয়ে থাকে যাদের উল্লেখ পূর্বোক্ত বাক্যে অতিবাহিত হয়েছে। যেমন ঃ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ـ مريم : ٤٩ –"আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আর তাদের প্রত্যেককেই আমি নবী বানিয়েছি।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৪৯। وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ الانبياء : ٨٥ - "আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফল, তাদের প্রত্যেকেই ছিল দৃঢ়চেতা ধৈর্যশীল।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৫

অতএব এখানেও لِكُلٍّ দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঐ দলকেই বুঝান হয়েছে যাদের আলোচনা পূর্ব থেকেই চলে আসছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ কিবলার জন্য একেকটি দিক নির্ধারণ করে নিয়েছে ; কেউ পূর্বকে আর কেউবা পশ্চিমকে। এরা নিজেদের নির্ধারণ করা এ দিককেই কিবলা বানাবে তোমরা যত প্রবল শক্তিই প্রয়োগ কর না কেন, এ কঠিন শিলা স্বীয় অবস্থান থেকে এতটুকুন অপসারিত হবার নয়। তাই তোমরা তাদের পেছনে বৃথা সময় অপচয় করো না। তোমরা আল্লাহর দেখানো সরল-সঠিক পথে সামনে এগিয়ে চল এবং সৎ ও ভাল কাজে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও।

কিবলা পরিবর্তন জনিত বিষয়ে আহলে কিতাবদের কর্মনীতির প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ

পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ 'অর্থাৎ যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাঁদের কাছে আপনি সমস্ত প্রমাণ পেশ করলেও তারা আপনার কিবলা অনুসরণ করবে না—এখানেও যেন ঠিক একই কথা ভিন্ন আঙ্গিকে বলে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কিবলার ব্যাপারে কোনো প্রকার নমনীয়তা ও শৈথিল্য প্রদর্শন কখনো নয়। বরঞ্চ এর উদ্দেশ্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের কর্মনীতির প্রতি সর্বাত্মক অসন্তোষ প্রকাশ। মুসলমানদের এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, এ সকল হঠকারী ও দুর্বিনীতদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং তোমরা সৌভাগ্য ছিনিয়ে আনার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা চালাও।

www.pathagar.com

দাসত্ব কবুলের পথ-পরিক্রমায় কিবলা একটি মাইল ফলক

فَاسْتَبِقُوا শব্দের مصدر ، اِسْتِبَاقٌ -এর অর্থ দৌড় প্রতিযোগিতায় একে অন্যের মোকাবিলায় অগ্রগামী হওয়ার প্রচেষ্টা চালান। যেমন ঃ ১৭ : يوسف - اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ –"আমরা পরস্পর দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দূরে চলে গেলাম।"–সূরা ইউসূফ ১৭। দৌড় প্রতিযোগিতায় যেরূপ একটি চিহ্ন নির্ধারণ করে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়োর প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে অনুরূপ দাসত্ব, আনুগত্য এবং সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের সংগ্রাম-সাধনায় কৃতকার্য হওয়ার পথে কিবলাও আল্লাহ নির্ধারিত একটি চিহ্ন বা গোলপোষ্ট। উক্ত চিহ্নকে—ইতোপূর্বে যেমনটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—পূর্ববর্তী উম্মতরা বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে তাদের দৌড়ঝাপও সম্পূর্ণ ভিন্ন উপত্যকাসমূহে পর্যবসিত হয়েছে। মহান আল্লাহ সত্যের এ মাইলফলককে মধ্যপন্থী উম্মতের জন্য পুনর্বার উচ্চকিত করেছেন। তিনি তাদের আহ্বান করেছেন। এ ময়দানে অন্য কেউ অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত না হলে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরাই নিজেদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে উক্ত ময়দানকে সরগরম করে তোল।

সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনে কিবলা একটি চিহ্ন ও মাইলফলকের মর্যাদা বহন করে—কিবলা সম্পর্কে এটা নিছক কোনো রূপক ভাষা বা অতিশয়োক্তি নয় ; বরং এটি একটি বাস্তব সত্য। এ সত্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ঐ মহান ইতিহাসকে নতুনভাবে স্মৃতিপটে জাগ্রত করার চেষ্টা করুন।—যা কিবলা হিসেবে নির্বাচিত ঘরটির প্রতিটি পাথরের ওপর অংকিত রয়েছে। এটি তো সেই ঘর যেটিকে নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আ)ও আল্লাহর রাহে যবেহকৃত ও উৎসর্গীকৃত ইসমাঈল (আ) তাঁদের পূত-পবিত্র হাতে। এটি তো সেই ঘর যেটি বিশ্বজাহানে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাতের প্রথম ও প্রাচীনতম কেন্দ্র। এ ঘরের পার্শ্বে রয়েছে মৃত পাহাড়। এ পাহাড়ের পাদদেশেই মহান আল্লাহর সন্তোষ লাভের লক্ষে বৃদ্ধ পিতাকে তার একমাত্র প্রিয়তম সন্তানের গলায় তরবারী চালাতে হয়েছে। এখানেই তাকে খাঁটি ও বিশুদ্ধ ইসলামের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে দেখেছে আসমানী চক্ষু। এ ঘরেরেই আশেপাশের উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরসমূহকে মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির বিকাশ এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত করেছেন ঃ যদ্দারা পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমত বণ্টিত হবার ছিল। এটিই সেই ঘর যা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে শুরু করে সর্বকালেই পবিত্রাত্মাদের কিবলা ছিল। যে ঘরের তওয়াফ ও এ'তেকাফ এবং রুকূ' ও সাজদা করার সৌভাগ্য মানবজাতির এত বিপুল ও অজস্র লোক অর্জন করেছে, যা পৃথিবীর প্রতিটি বালুকণা ও আসমানের তারকারাজির সংখ্যাকেও হার মানাতে বাধ্য। একইভাবে পবিত্রাত্মাগণের সংখ্যা নিরূপণ করাও রীতিমত অসম্ভব। এ ঘরেরেই অদূরে রয়েছে এমন এক প্রান্তর যার প্রতিটি ধূলি-কণা তাওবা ও ইস্তিগফারের অজস্র সাজদার সাক্ষী এবং আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীদের অশ্রু ধারার বিশ্বস্ত আমানতদার। এ ঘরেরেই এককোণে রয়েছে ঐ পবিত্র পাথর যাকে আল্লাহর দক্ষিণ হস্তের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে ; যেটিকে স্পর্শ করে বা চুম্বন করে লক্ষ-কোটি নবী, সিদ্দীক, সৎ ও নেক বান্দারা

তাদের রবের বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি ও পরম বিশ্বস্ততাকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। এরই সন্নিকটে রয়েছে ওইসব শিলা-স্তম্ভ যেগুলো এ ঘরের শত্রুকুলের লাঞ্ছিত ও পদদলিত হওয়ার স্মারক হয়ে রয়েছে। যেগুলোর প্রতি পাথর বর্ষণ করে ঈমানদাররা তাদের অন্তরে আল্লাহর দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের চেতনা জাগ্রত করে আসছে অনাদিকাল থেকে। সর্বোপরি, এ ঘরেরই ছত্র-ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (স)। যাঁর আনীত আলো ও যাঁর বিচ্ছুরতি জ্যোতি ও দ্যুতি গোটা পৃথিবীকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে দিয়েছে।

এহেন সুমহান ঐতিহ্যের বিশ্বস্ত ধারক বাহক একটি ঘরকে কিবলা বানাবার তাৎপর্য নিসন্দেহে এটাই যে, এটাকে একটা চিহ্ন বা প্রতীক সাব্যস্ত করা হবে। অতপর এর সাথে সংশ্লিষ্ট আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য হাসিলের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম সাধনা চলবে ; যা আমাদের নেতা হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (স) পর্যন্ত এ ঘরে সঞ্চিত ও গচ্ছিত হয়েছে। অন্য কথায়, এটিকে একটি শক্তি কেন্দ্র (Power house) ধরে নিন। যার থেকে গোটা মুসলিম জাতি জীবনী শক্তি, উষ্ণতা, আলো ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। কিবলার মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের এ দিকটি যাদের নিকট স্পষ্ট নয় তারা প্রায়শই এই ভেবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন যে, ইট পাথর দ্বারা নির্মিত একটি ঘরকে ইসলামে এতটা গুরুত্ব কেনইবা দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা নিশ্চয়ই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আসল গুরুত্ব মূলত, ইট-পাথর নির্মিত ঘরের নয় ; বরং গুরুত্ব ঐ মহান ইতিহাস-ঐতিহ্যের যা এ ঘরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যা এ পার্থিব জগতে আধ্যাত্মিক ও ঈমানী জিন্দেগীর একক উপায় ও মাধ্যম। এ সকল ঐতিহ্যের কারণে দৈহিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে হৃদপিণ্ডের যে মর্যাদা, মুসলিম জাতির সামষ্টিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় উক্ত ঘরের গুরুত্ব ও মর্যাদাও ঠিক তদ্রূপ। হৃদপিণ্ড ভিন্ন যেরূপ দেহের অস্তিত্ব অবাস্তব, অনুরূপ কিবলা ব্যতিরেকে মুসলিম জাতি সত্তার ধারণাও অবান্তর। কিবলা সম্পর্কিত এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই আমরা এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি অন্যত্র যথাস্থানে এর গুরুত্বের অন্যান্য দিকের ওপর আলোচনার প্রয়াস পাব।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ঃ (যেখানেই তোমরা থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।)-এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক ঃ উক্ত কিবলাকে কিবলা সাবস্ত করে যেখান থেকেই তোমরা নেকী ও কল্যাণের পথে প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালাবে তা বিনষ্ট হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রত্যেক স্থান থেকে একত্রে সমবেত করবেন এবং তোমাদের প্রতিটি ছোট-বড় ভালো কাজের বদলা দেবেন। এটা استباق الى الخير। তথা সৎকাজের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হওয়ার জন্য একটি প্রতীক স্বরূপ। তার নৈকট্য ও দূরত্ব অন্তরের সম্পর্কের দৃষ্টিতেই বিচার্য। প্রতিটি মানুষ প্রত্যেক স্থান থেকেই তার সাথে সম্পর্ক জুড়তে পারে। মহান আল্লাহও তাঁর সাথে যারা সম্পর্ক জুড়বে তাদেরকে প্রত্যেক জায়গা থেকে সমবেত করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

দুই ঃ যে যেদিকেই মুখ ফেরাতে চায় তাকে তা করতে দাও। তোমরা এসব বিতর্কে জড়াবার পরিবর্তে ভাল ও সৎকাজের পথে এগিয়ে যাও। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন কে সৎপথের পথিক ছিল আর কে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার নীতি অবলম্বন করেছিল তিনি তার মীমাংসা করে দেবেন।

আয়াত ঃ ১৪৯

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

সফররত অবস্থায় কিবলা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ

কিবলা পরিবর্তনের মূল নির্দেশ সম্বলিত ১৪৩ আয়াতের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কেউ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, কিবলার দিকেই মুখ ফেরাবে কিন্তু সফররত অবস্থা সম্পর্কে সেখানে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি যে, তখনো এ নির্দেশের বাধ্যবাধকতা অত্যাবশ্যক কিনা অথবা তাতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে কিনা। সফরাবস্থায় কোনো সুনির্দিষ্ট কিবলার অনুসন্ধান ও যাচাই পরখ করা এক কঠিন কাজ। তাই এটাই অনুমিত হয় যে, সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকাই উচিত। কিন্তু ওপরে কিবলার যে গুরুত্ব বিবৃত হলো, তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কোনো অবস্থাতেই এ শক্তি কেন্দ্র থেকে মানুষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া সমীচীন নয়। সফরাবস্থায় এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়ে দিলে ইহুদী-খৃস্টানরা যেরূপ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, এ কিবলার ব্যাপারে তদ্রূপই বিপথগামীতার পথ উন্মোচিত হয়ে যেত। এজন্যই এ উম্মতকে স্পষ্ট ভাষায় যথাযথ গুরুত্বের সাথে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'ইকামাত' অবস্থার ন্যায় সফরাবস্থায়ও কিবলার অনুবর্তন অপরিহার্য। এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে মুসলিম জাতি তার মূল উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই দুর্বলতার শিকার না হয়।

এর ওপর জোর দেয়ার সাথে সাথে এটাও যথাবিহিত গুরুত্বের সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ কিবলাই আল্লাহ্ নির্ধারিত প্রকৃত কিবলা। কাজেই মনে রেখো—"আল্লাহ্ তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনবহিত ও উদাসীন নন।" এ সতর্কীকরণ সফরের অজুহাতে কিবলার ব্যাপারে সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগিতা ও নিফাক-মিশ্রিত দুর্বলতার শিকড় কেটে দিয়েছে। শুরুতে সম্বোধন করা হয়েছে একবচনে। পক্ষান্তরে আয়াতের শেষে বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, উম্মতের অভিভাবক হিসেবে সূচনাতে মহানবী (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ; এদ্বারা উদ্দেশ্য গোটা উম্মত।

এখানে এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অধিকাংশ সময় সফরাবস্থায় কিবলা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে হাতের কাছে প্রাপ্ত উপায় উপকরণের সাহায্যে

www.pathagar.com

যতদূর সম্ভব যাঁচাই করে কিবলা অন্বেষণ করাই শরীআতে কাম্য। ইসলাম কোনো ব্যাপারে উম্মতের ওপর সাধ্যাতীত কোনো বোঝা বা দায়িত্ব চাপায়নি। সহজলভ্য উপায় উপাদানের সাহায্যে যাচাই করে যে প্রবলতর ধারণা অর্জিত হবে সে মোতাবিকই নামায আদায় করতে হবে। কিবলার ব্যাপারে যে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়েছে, তা নিরুপায় অবস্থায় শরীআত উম্মতকে যে রুখসত প্রদান করেছে তাকে কোনো মতেই অস্বীকার করে না। বলাবাহুল্য, এ সম্পর্কে হাদীস ও ফিক্‌হের গ্রন্থাদিতে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান।

আয়াত ঃ ১৫০

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ق إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ق فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ق وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

পুনর্বার নির্দেশ দানের গূঢ় রহস্য

ইতোপূর্বে ইকামাত ও সফর উভয় অবস্থার সাথে সম্পর্কিত এ উভয় নির্দেশই বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে এ উভয় নির্দেশের হুবহু একই শব্দমালায় পুনরুক্তি বাহ্যত কিছুটা অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কুরআন যেহেতু সংক্ষিপ্ততা ও অলংকার সমৃদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে মু'জিযা রূপে গণ্য। তাই এটা কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। কিন্তু এটা একান্তই গভীর চিন্তা-গবেষণা না করার ফলশ্রুতি বৈ নয়। এখানে নির্দেশের পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য পুনর্বার বিধান বর্ণনা করা অবশ্যই নয়। বরঞ্চ এ বিধানসমূহের মধ্যে নিহিত ঐ তিনটি বিরাট সূক্ষ্ম রহস্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য যা এ উম্মতের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে। এ সূক্ষ্ম রহস্যগুলো সামগ্রিকভাবে উভয় নির্দেশের সাথেই সম্পর্ক রাখে—সামনে তা স্পষ্ট হবে। আর এগুলো সম্পর্কে সামান্য অবহেলা বা উদাসীনতাও এ উম্মতকে এমন সব ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করতে পারে যার সংশোধনের কোনো উপায়ই অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্য কুরআন ওইসব রহস্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ ওইসব বিধি-বিধানের প্রতি পুনঃমনোযোগ নিবদ্ধ করে দিয়েছে যে, ভেতর ও বাহিরে. সফর ও ইকামাতে সদা সর্বত অতিশয় কঠোরতা এবং জোর ও সতর্কতার সাথে একমাত্র বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফেরাবার যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এটা কোনো সাধারণ ও গুরুত্বহীন নির্দেশ নয়। বরং এ নির্দেশ বিরাট যুক্তি ও প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তিশীল। এটাকে যথাযথ অনুশীলন ও বাস্তবায়নে তোমরা সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং তজ্জনিত কারণে একটি পদক্ষেপ ও ভ্রান্ত পথে উত্তোলিত হলে তোমাদের গোটা সফরই ভুল দিকে ধাবিত হয়ে যাবে। তাই এর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ কর এবং এতে নিহিত যুক্তি ও কল্যাণসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে নাও। এ ভূমিকার পর এতে নিহিত যুক্তি ও কল্যাণগুলো নিম্নোক্ত ভাষায় বিবৃত হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

অর্থাৎ "যাতে لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ق اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ق فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ق وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ - "মানুষের কোনো অবকাশ না থাকে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম, তাদের কথা আলাদা। অতএব তাদের ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ পূর্ণরূপে তোমাদের দান করতে পারি এবং তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পার।" চিন্তা করে দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানে এ বিধানের তিনটি যুক্তি ও কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে। এক. প্রমাণ কর্তন দুই. অনুগ্রহের পরিপূর্ণকরণ এবং তিন. সঠিক পথপ্রদর্শন। এক্ষণে আমরা তিনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরব ; যাতে উক্ত বিধানের পুনরুল্লেখের কল্যাণকারিতা এবং বাচনভঙ্গি ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রমাণ কর্তনের তাৎপর্য এই যে, আহলে কিতাব বিশেষত ইহুদীদের জন্য কথায় কথায় তোমাদেরকে পাকড়াও করার এবং তোমাদের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কোনো সুযোগ যেন অবশিষ্ট থেকে না যায়। বাচনভংগি সাক্ষ দেয় যে, এখানে لِلنَّاسِ দ্বারা আহলে কিতাবদের বুঝান হয়েছে। একই কিবলাধারী হওয়ার জন্য আহলে কিতাবরা বিশেষ করে ইহুদীরা প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এন্তার এ অভিযোগ উত্থাপন করে চলছিল। তারা বলছিল, এরা যখন আমাদেরই কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ছে, তখন নামায ও ইবাদাতের পদ্ধতির বেলায় পৃথক নীতি অবলম্বন করছে কেন ? একটি মৌলিক বিষয়ে একাত্ম হওয়ার পর অন্যান্য ব্যাপারে মতপার্থক্যকে এরা—(নাউযুবিল্লাহ) প্রিয়নবী (স)-এর নিজস্ব মনগড়া আবিষ্কার বলে অভিহিত করত। তাদের এ প্রচারণা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছিল আর এতে এ সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পথে বড়ই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল যে, প্রিয়নবী (স)-এর আবির্ভাব ইহুদী অথবা খৃস্টধর্মের ওপর নয়, বরং ইবরাহীমী ধর্মের ওপরই হয়েছে। এক্ষণে এ প্রচারণার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার উপযুক্ত সময় এসে গিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে উপরোল্লিখিত ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়া জরুরী ও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ধরে নিন, এ সাবধানতা অবলম্বন না করে মুসলমানদেরকে যদি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত যে, যখন তারা মসজিদুল হারামের বাইরে বা সফর অবস্থায় থাকবে তখন যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই নামায পড়ে নিলেই চলবে—তাহলে কিবলার ব্যাপারে আহলে কিতাবরা যেরূপ বিপথগামী হয়ে গিয়েছে তদ্রূপ মুসলমানরাও এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেত। শুধু কোনো কোনো ব্যাপারে বাহ্যিক একাত্মতার কারণে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও সন্দেহ সৃষ্টির কোনো না কোনো পথ আবিষ্কার করে নিত। উল্লিখিত কড়াকড়ি সে সকল ছিদ্র পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও এ প্রমাণ কর্তনের পরও মন্দ লোকেরা তাদের অপপ্রচারকে বন্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে কোনো সাবধানতাই সর্বপ্রকার লোকের মুখ বন্ধ করতে পারেনি। এ জাতীয় লোকদের চিকিৎসা কুরআনের ভাষায় ঃ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ –"তোমরা তাদের ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর।"

নেয়ামত বা অনুগ্রহের পরিপূর্ণকরণ অর্থ দীনকে পরিপূর্ণকরণের সেই নেয়ামত যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এ উম্মত সম্পর্কে। এটা করেছিলেন তখন যখন ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-এর কুরবানীতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তখন তাঁকে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, এ পুত্রের বংশে একটি মহান জাতির উদ্ভব হবে—যদ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি দীনের কল্যাণ পেয়ে ধন্য হবে। এ সুবাদে তাঁরই বংশ থেকে মহান আল্লাহ দুনিয়ার সর্বশেষ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (স)-কে প্রেরণ করেছেন। যাঁর কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহর ঐ ঘরকে যা গোটা পৃথিবীর কল্যাণ ও মঙ্গলের ফল্গুধারা এবং যেটিকে দীনের পরিপূর্ণতার কেন্দ্রভূমির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল।

সঠিক পথ প্রদর্শনের অর্থ ঐ সকল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেয়। ঐ সকল ও স্বাভাবিক পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰانِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ـ الانعام : ١٦١ –"বলুন, অবশ্যই আমার রব আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। ফিতরাতের ধর্ম ইবরাহীমের মিল্লাতের প্রতি, যা ছিল দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও একনিষ্ঠ দীন।" এ কিবলাই ইবরাহীমী মিল্লাতের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী সুউচ্চ মিনার যেমনটি ওপরেও আমরা বলে এসেছি। এ কারণেই পথপ্রদর্শনের এ প্রতীক চিরদিন এ উম্মতের দৃষ্টি সমক্ষে থাকা অপরিহার্য।

আয়াত ঃ ১৫১

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

كَمَا -এর মধ্যে ك অক্ষরটি উপমার হরফ। তাই এখানে প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, এ উপমা কিসের সাথে দেয়া হয়েছে ? তার জবাব হল, كَمَا শব্দটি অনেক সময় এরূপ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে আমরা 'অতএব' ব্যবহার করে থাকি। এর তাৎপর্য এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে ও যে উদ্দেশ্যে আমি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তদ্রূপ আমার অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করে দেয়া ও ইবরাহীমী মিল্লাতের দিকে পথপ্রদর্শনের জন্যই আমি এ কিবলা পরিবর্তন করে দিলাম। ১২৯ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা উক্ত আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুক্তি অবান্তর। وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ আয়াত শেষের উদ্ধৃতাংশটুকু মূলত বনী ইসমাঈলের প্রতি মহান আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। তা হচ্ছে এই যে, তোমরা দীন ও শরীআত সম্পর্কে অনবহিত ও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলে। আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা ও হেদায়াতের জন্য এ নবী (স)-কে পাঠিয়েছেন, কাজেই তোমাদের তো তাঁর সর্বাধিক মর্যাদাদান ও মূল্যায়ন করা উচিত।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৫২

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝

মহান আল্লাহ ও মুসলিম জাতির মধ্যে এক মহান চুক্তি

কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশের পর এ মুসলিম জাতি একটি সম্পূর্ণ আলাদা মর্যাদাবান জাতি হিসেবে আবির্ভূত হলো। ইহুদীরা নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হলো এবং মানবজাতির ওপর সাক্ষদানের সুমহান দায়িত্ব কিয়ামত অবধি মুসলিম জাতির ওপর অর্পিত হলো। এহেন গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, "তোমরা আমাকে স্মরণ রাখলে আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" এ স্মরণ করিয়ে দেয়ার ধরন মহান আল্লাহ ও এ উম্মতের মধ্যকার এক মহান চুক্তির ন্যায়। আর আল্লাহকে স্মরণ রাখার অর্থ ঐ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্মরণ রাখা ও পালন করা যা এ উম্মতের প্রতি ন্যস্ত করা হচ্ছে। এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জবাবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে যে, আমি তোমাদের স্মরণ রাখব। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে সফলতা, সাহায্য, বিজয় এবং সুনাম-সুখ্যাতির যে প্রতিশ্রুতি এ উম্মতকে প্রদান করেছি, তা আমি পূর্ণ করব। 'আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক'-এর তাৎপর্য, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নেয়ামত তোমরা লাভ করেছ এবং ভবিষ্যতে লাভ করবে তার সঠিক ও যথাযথ হক আদায় করবে। উক্ত নেয়ামতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত ছিল খোদ ঐ শরীআত যা এক্ষণে তার পরিপূর্ণ অবয়বে এ উম্মতের প্রতি স্থানান্তরিত হচ্ছে। আয়াতের শেষ শব্দগুলো وَلَا تَكْفُرُوْنِ (আর তোমরা আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।)—এতে এ সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন নিহিত রয়েছে যে, ইহুদীরা যেমন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের কৃতকর্মের তিক্ত ফল লাভ করেছে, আল্লাহর এ আইন ও বিধানের কঠিন পাকড়াও থেকে তোমরাও রক্ষা পাবে না।

বনী ইসরাঈলকেও হুবহু একইভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তার এতটুকুন পরোয়া করেনি। কুরআন মজীদে তার বর্ণনা এসেছে এভাবে ঃ اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ج وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ - البقرة : ٤٠। -"হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং পূর্ণ কর আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার। আমিও তোমাদের সাথে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবো। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।"-সূরা আল বাকারা ঃ ৪০

আয়াত ঃ ১৫৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

www.pathagar.com

নেতৃত্ব পদের জটিলতাসমূহ ও তার সমাধান

বক্ষমান আয়াত ও পরবর্তী চারটি আয়াতে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভের পর আপতিত হবে বা হতে পারে এমন সব বিভীষিকা এবং কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায় ও পন্থা বাতলে দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের যে শত্রুতা ছিল তাতো ওপরের আলোচনায় স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সকল বিরোধ ও মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই কিবলাধারী হওয়ার সুবাদে ইহুদীরা এযাবত উভয়ের মাঝে ঐকমত্যতার একটা ক্ষীণ রেখা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের পর তারা দিব্য চক্ষে দেখতে পেল, মুসলমানরা এক্ষণে ইবরাহীমি মিল্লাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা মর্যাদা নিয়ে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অবির্ভূত হয়েছে। এ বিষয়টি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের গোস্বা ও আক্রোশকে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিগুণ করে দিল। অপরদিকে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে একটি মিথ্যে আশায় দিন গুণছিল। তারা ভেবে নিয়েছিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অপরিচিত এক পরিবেশ দীনের এ দাওয়াত আপনা থেকেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এক্ষণে তারা অনুভব করতে লাগল যে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত মুসলমানরা মদীনায় একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে এবং তাদের দাবি হলো, ইবরাহীমী মিল্লাতের তারাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও কা'বা শরীফের বৈধ মোতাওয়াল্লী ও অভিভাবকও তারাই। একই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে তারা উক্ত ঘরকে নিজেদের কিবলাও নির্ধারণ করে নিয়েছে। যার পরিণতি এও হতে পারে যে, তারা এটিকে দখল করে নেয়ার চেষ্টা করবে। এ অনুভূতি তাদেরকে সতর্কিত করে দিল। তারা আসন্ন এ বিপদ-বিভীষিকার পথ বন্ধ করার উপায় ও পন্থা সম্পর্কে ভাবতে লাগল। যার ফলশ্রুতিতে কিবলা পরিবর্তনের মাত্র দু মাসের ব্যবধানেই তারা ঐ যুদ্ধের কারণ ও উপকরণ সৃষ্টি করে দিল যেটি ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সুগভীর চিন্তা-গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত হলো, এটা মদীনার ইহুদী ও মক্কার কুরাইশদের পারস্পরিক যোগসাজস ও ষড়যন্ত্রের ফলেই সংঘটিত হয়েছিল। সূরা আনফালের তাফসীরে আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল, ইবরাহীমী মিল্লাত ও ইবরাহীমী কিবলার দাবীদার হিসেবে যে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতির উত্থান হতে যাচ্ছিল তা অংকুরেই ধ্বংস করে দেয়া।

এ পরিবেশ-পরিস্থিতি যদিও তখনো পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে ছিল কিন্তু সকল অদৃশ্যের জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট তা প্রচ্ছন্ন ছিল না। বলাবাহুল্য, তিনি তো গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবহিত। তাই তাঁর দয়া ও প্রজ্ঞার দাবি এ দাঁড়াল যে, তিনি মুসলমানদেরকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবেন এবং এসব বিভীষিকার মুকাবিলায় যেসব জিনিস তাদের সাহস ও মনোবলকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম তারও পথনির্দেশ দান করবেন।

এ ধারাবাহিকতায় প্রথম বিষয় যা আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে তাহলো, আসন্ন বিপদ-ঝঞ্ঝায় তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। ধৈর্য ও

www.pathagar.com

নামাযের আভিধানিক অর্থ-তাৎপর্য, এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে এ দুটি জিনিসের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা এ সূরারই ৪৫ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। তদুপরি ৩২ অনুচ্ছেদেও এগুলোর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। অবশ্য কিছু বিষয় এ বিশেষ স্থানটির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

এক ঃ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে যে নামাযের সাহায্য নিতে এখানে বলা হয়েছে, তা দ্বারা শুধু নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বুঝান হয়নি, এ দ্বারা তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযকেও বুঝান হয়েছে। বলাবাহুল্য, এসব নামাযই মু'মিনের মাঝে প্রাণশক্তি ও জীবনের সঞ্চার করে ; যা সত্যের পথে আগত সকল বিপদাপদে বিজয় ছিনিয়ে আনে। এরই সাহায্যে আল্লাহর সাথে মু'মিনের সে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, যার ফলে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষায় ও সে পরাস্ত হয় না। এর দ্বারা সে নৈকট্যের মর্যাদা অর্জিত হয় যা আল্লাহর সাহচর্যের গ্যারান্টি প্রদান করে—উক্ত আয়াতে ধৈর্যশীলদের জন্য যার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। মক্কী সূরাসমূহে এ পর্যায়ে বিশদ বর্ণনা আসবে। তাই এখানে আমরা কেবলমাত্র ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

দুই ঃ সকল ইবাদাতের মধ্যে নামাযই যিকির ও শোকর-এর সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব নমুনা ও দৃষ্টান্ত। কুরআন মজীদে বিভিন্নভাবে এ সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে যে, নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখলে জানা যাবে যে, ওপরে এ উম্মতের কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।)—এ জিনিসের প্রতিষ্ঠায় নামাযই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থার মর্যাদা রাখে।

তিন ঃ এ নামায দীনের দাওয়াত ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে দৃঢ় মনোবল ও অবিচলতা অর্জনের জন্য একান্তভাবে কাম্য। এজন্যই কেউ যখন সত্যের পথ পরিক্রমায় বাতিলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামরত থেকে নামাযের অনুশীলন করে তখনই নামাযের প্রকৃত কল্যাণ ও মাহাত্ম্য বাঙময় হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে যে লোক আদৌ বাতিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছাই পোষণ করে না, তার জন্য যে এই অস্ত্র অনেকটা অনুপকারীই থেকে যায়, তা সুস্পষ্ট।

চার ঃ এখানে ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য লাভ করার পর বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' এটা বলা হয়নি যে, আল্লাহ নামায আদায়কারী ও ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। এর কারণ, উস্তাদ ইমাম ফারাহী (র)-এর মত এই যে, নামায দ্বারা আল্লাহর সাহচর্য অর্জিত হওয়া এতই স্পষ্ট ব্যাপার যে, তা খুলে বলার প্রয়োজন ছিল না। স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন ছিল এটাই যে, যারা সত্যের পথে অবিচল থাকে এবং এ অবিচলতা অর্জন করার জন্য নামাযকে উপায় ও পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গী হয়ে যান।

www.pathagar.com

পাঁচ ঃ আল্লাহর সাথে ও সাহচর্য—এখানে ধৈর্যশীলদের জন্য যার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে—কোনো মামুলি জিনিস নয়। বরং যে প্রেক্ষাপটে বাণীটি এসেছে তা সাক্ষ্য দেয় যে, এখানে এ দুটো শব্দের মধ্যে সুসংবাদের এক জগত লুক্কায়িত আছে। সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রকৃত সম্রাট, সকল কর্তৃত্ব-ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতিতো একমাত্র মহান আল্লাহই। অতপর তিনিই যদি কারো পৃষ্ঠপোষক হন, তবে তাকে পৃথিবীর যত বড় শক্তিই হোক না কেন, কিভাবে পরাস্ত করতে পারে ?

আয়াত ঃ ১৫৪

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক ধারণা

কঠোর মনোবল ও স্থিরচিত্ততার ওপর অবিচল থাকার জন্য অপর যে জিনিসটি কাম্য এখানে তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক ইসলামী ধারণা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। আখেরাতের ওপর যাদের ঈমান নেই তাদের দৃষ্টিতে তো স্রেফ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। যে মৃত্যুবরণ করল বা নিহত হলো, ব্যস, সেতো চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু মু'মিনের দৃষ্টিতে এ পার্থিব জীবন হাতেগোণা কতক দিনের জন্য এবং এ জীবন ধ্বংসশীল। তাদের দৃষ্টিতে প্রকৃত জীবন তথা চিরন্তন জীবনের সূচনা তো তখনই হয়, যখন এ নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ জীবন বরযখের জগতে ও পরকালীন জগতে অর্জিত হয়। মৃত্যুর পরে যে জীবন এটা তো কাফির ও মু'মিন সবার জন্যই অবধারিত। কিন্তু কাফিরের জীবন হবে যেহেতু কষ্ট ও শাস্তির জীবন, তাই সেটা উল্লেখের যোগ্য নয়। অবশ্য ঈমানদাররা বরযখের জীবনেও নিজেদের মর্যাদা ও স্তর হিসেবে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত জীবন লাভ করবে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা সত্যের পথে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। এ জড় জগতে বসে তাদের বরযখের জীবনের সফলতা ও কামিয়াবীর ধারণা পর্যন্ত করা রীতিমতো অসম্ভব। তারা তাদের শাহাদাতের পূত-পবিত্র রক্তের দ্বারা পার্থিব জগতে সত্যের জমিনকে যেভাবে সিক্ত ও সঞ্জীবিত করেছিল বরযখের জীবন থেকেই তার পুরস্কার পেতে শুরু করবে। এ প্রসঙ্গেই কুরআন মজীদের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - ال عمران : ١٦٩ –"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা কখনো তাদের মৃত ধারণা করো না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯

আয়াত ঃ ১৫৫

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের বিপদাপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ভবিষ্যতে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব বিপদ ও পরীক্ষা আসবে এখানে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এসব পরীক্ষা যদিও ইসলামের শত্রুদের অনিষ্ট ও ষড়যন্ত্রের দরুনই সংঘটিত হবে। তথাপি মহান আল্লাহ নিজের দিকেই এর ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব এবং তাও বলেছেন تاكيد এর صيغه সহকারে। এরূপ বলার কারণ এই যে, এটা খোদায়ী বিধানের চিরন্তন নীতি। হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই তিনি আবহমানকাল থেকে পরীক্ষা করার এ নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছেন। বলাবাহুল্য, সত্যপন্থীদের জন্য এ পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই আল্লাহর বিধানে অপরিহার্য। এ ধরনের পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেই বান্দার যোগ্যতা উৎকর্ষমণ্ডিত হয় এবং তাদের মধ্যে কে খাঁটি আর কে নকল ও কৃত্রিম তার পার্থক্য নিরূপিত হয়। এ পরীক্ষা ভিন্ন কোনো দলই মহান আল্লাহ্র পরকালীন নেয়ামতরাজির যোগ্য বিবেচিত হয় না।

ভয়

এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ভয় মানে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশংকা। ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, একটি স্বতন্ত্র উম্মত বা জাতিসত্তায় অভিষিক্ত হওয়া মাত্রই কুরাইশরা যেমন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ রচনা করার অজুহাত সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু করেছিল, তেমনি ইহুদীরাও চক্রান্তের জাল বিস্তার করা শুরু করে দেয়। অতপর ধীরে ধীরে তাদের পক্ষ থেকে এক অফুরন্ত আক্রমণের ধারা শুরু হয়ে গেল। এমনকি বাইরের অন্যান্য জাতিগুলোও এ ব্যাপারে ইন্ধন যোগাতে শুরু করলো। আর এ ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঠিক তখনই ঘটল যখন মুসলমানরা নিজেদের দৃঢ় মনোবল অটল অবিচল শক্তির পরাকাষ্ঠা দ্বারা তাদের সফল প্রতিপক্ষের শক্তি চূর্ণ করে দিল।

خَـــوْفٌ বা ভয় শব্দের সাথে بِشَىْءٍ অর্থাৎ 'কিছু পরিমাণ'-এর সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মুসলমানদের উৎসাহ ও মনোবল বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ এ ধরনের পরিস্থিতিতো আসবে ঠিকই কিন্তু তা ঐ পরিমাণ থেকে বেশী হবে না যা তোমাদের মনোবল ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য জরুরী। তাই এতে হতোদ্যম হওয়ার ও সাহস হারাবার পরিবর্তে পূর্ণশক্তি ও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করা কর্তব্য।

অর্থনৈতিক সমস্যাদি

ক্ষুধা দ্বারা ঐসব অর্থনৈতিক সমস্যা ও অসুবিধাসমূহকে বুঝান হয়েছে যা কুরাইশ ও ইহুদীদের সম্মিলিত বিরোধিতা, ভয়-ভীতির অবস্থা এবং তাদের পক্ষ থেকে রুজি-রোজগারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে সৃষ্টি হতে পারে। তখনো পর্যন্ত দেশের যাবতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উপায়-উপাদানের ওপর কার্যত ইহুদী ও কুরাইশদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। এ কারণে তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়াটা ছিল সমুদ্রে বসবাস করে কুমীরের সাথে শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপনের সমার্থক।

www.pathagar.com

অথচ মুসলমানদের অবিভীষিকাকেও বরণ করে নেয়াই ছিল তাদের সত্য প্রীতির দাবি। শেষ পর্যন্ত তারা এ বিপদকেও বরণ করে নিল এবং ইতিহাস সাক্ষী, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ বিপদ ভয়াবহ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানের মুকাবিলায় তা শুষ্ক তৃণ খণ্ডের (بشیء) ন্যায়ই প্রতিপন্ন হলো।

সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি

এরপর সম্পদ ও জীবনের কমতি ও ক্ষয়-ক্ষতির পরীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এটাতো জানা কথা, যুদ্ধ জিহাদে এ দুটি জিনিসই সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং একই কারণে এ দুটি জিনিসেরই ত্যাগ ও কুরবানী সর্বাধিক পরিমাণে দিতে হয়। উপরন্তু শান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে এ দুটি জিনিসই ওই রক্ষণাবেক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে যা এগুলোর লক্ষণ ও বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক।

ফল-ফসল

সম্পদের উল্লেখ করার পর ফল-ফসলের উল্লেখ কিছুটা অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ এগুলোও সম্পদের মধ্যেই শামিল। কিন্তু এর উল্লেখে বাক্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আরববাসীদের সম্পদের মধ্যে ছিল উট অথবা মেষ ও বকরী। এগুলোকেই সম্পদ পদবাচ্যে অভিহিত করা হতো। অপরদিকে ছিল ফল-বিশেষত খেজুর। দেশের এ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটেই সম্পদের সাথে ফল-ফসলেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে, এ সকল পরীক্ষা সত্ত্বেও যারা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে এবং নিজেদের মনোবল ও ঈমানে কোনো প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেবে না তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যত্র উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে জানা যায়, পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জাহানের সফলতাই এ সুসংবাদে শামিল রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"ওহে যারা ঈমান এনেছ ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দেব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে ? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন তোমাদের এমন সব উদ্যানে যার পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এমন মনোরম গৃহ যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য। আর অন্য একটি পার্থিব অনুগ্রহ রয়েছে, যা তোমরা পসন্দ কর। তাহলো আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আপনি মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দিন।"

–সূরা আস সফ ঃ ১০-১৩

আয়াত ঃ ১৫৬

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

ধৈর্যশীলদের ঢাল

এখানে ধৈর্যশীলদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা মন খারাপ কিংবা কাপুরুষতার সাথে পরীক্ষার মোকাবেলা করে না। তারা বরং হাসি মুখে, অবিচলতা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে তার মোকাবেলা করে। এখানে যে বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে, এটা মূলত তাদের মৌল বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ; সে ভিত্তি-প্রস্তরের ওপর ধৈর্য ও অদম্য সংকল্পের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বিশ্বাসের একটি অংশতো এই যে, মানুষ এ বিশ্বাস ও আস্থা রাখবে যে, সে এ পার্থিব জগতে একমাত্র আল্লাহর এবং একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আর এর অপর অংশ হল, মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে। যে কেউ এ দুটি মহাসত্যের ওপর মযবুত ঈমান পোষণ করবে, যে কোনো মহাবিপদ ও সত্যের পথ থেকে তার পদস্খলন ঘটাতে পারবে না। আমরা যখন এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত হয়ে এসেছি ; তাঁরই জন্য আমাদের জীবন ও মরণ এবং মৃত্যুর পরে তাঁরই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে। অতপর সে মহান আল্লাহর জন্য তো আমরা সবকিছু ত্যাগ করতে পারি এবং সবকিছু থেকে মুখ ফেরাতে পারি। কিন্তু এমন কোন্ শক্তি রয়েছে যা আমাদের মুখকে তার থেকে ফিরিয়ে দেবে ?

এ বাক্যটিই ধৈর্যশীলদের ঢাল ও বর্ম স্বরূপ। এ দ্বারাই তারা বিপদ ও মসিবতের প্রতিটি আঘাতকে প্রতিরোধ করে থাকে। এতে আল্লাহর প্রতি যে ভরসা ও নির্ভরতা রয়েছে এতো আত্মবিক্রয় ও আত্মোৎসর্গের দাসখত বৈ নয়। এর মানে তো এটাই যে, প্রয়োজন দেখা দিলে মু'মিন বান্দা এ শ্লোগান উচ্চারণ করেই তার রবের উদ্দেশ্যে সাগর ও পাহাড়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সে সকল শত্রুকে যুদ্ধের ময়দান থেকে উৎখাত করে ছাড়বে কিন্তু তাকে কোনো শক্তি উৎখাত করতে পারবে না।

আয়াত ঃ ১৫৭

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

www.pathagar.com

صلوت শব্দের তাৎপর্য

صلوات শব্দটি صلوة শব্দের বহুবচন। অভিধানে এর মূল অর্থ "اقبال الى الشئ", অর্থাৎ কোনো জিনিসের প্রতি অগ্রসর হওয়া। এ অর্থের সুবাদেই শব্দটি নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা নামাযের মাধ্যমে তার রবের দিকে অগ্রসর হয়। একইভাবে শব্দটি মহান আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যে দয়া ও কৃপাদৃষ্টি নিয়ে মনোযোগ দেন তার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। উভয় ক্ষেত্রে শব্দের প্রাণসত্তা তো একই থাকে কিন্তু সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বদলের জন্য একটিতে বিনয়-নম্রতা ও অপর অর্থটিতে অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্যই আমরা এর অর্থ করেছি 'অনুগ্রহ'। সম্বন্ধ বদলের দরুন শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যে এ ধরনের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় অনেক পাওয়া যায়। এখানে ধৈর্যশীলদের জন্য যে অনুগ্রহ ও দয়া এবং যে হেদায়াতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার সম্পর্ক দীন ও দুনিয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের সাথেই রয়েছে। ওপরেও এটা আলোচিত হয়েছে ঈমানদারের ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের হকদার বানিয়ে দেয়। আর ঐ অনুগ্রহ ও কৃপা দ্বারাই সেই সরল সঠিক পথের হেদায়াত লাভে সে ধন্য হয় যা পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জাহানের সফলতার গ্যারান্টি প্রদান করে।

আয়াত ঃ ১৫৮

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

মূল আলোচনার ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন

এ আয়াতটি মূল আলোচনার ধারাবাহিকতা অর্থাৎ কিবলার আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। ওপরের আলোচ্য বিষয়—যেমনটি স্পষ্ট হয়েছে-প্রসঙ্গত নিছক সতর্কীকরণ হিসেবে এসে পড়েছিল যে, এই কিবলার পরিবর্তন কোনো সাধারণ পরিবর্তন নয়। বরং এটা মুসলমানদের জন্য অজস্র পরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু যেগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় ধৈর্য ও নামায। এ প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর মূল আলোচনার ধারা পুনরায় শুরু হয়েছে। সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান ও হেদায়াতের আলোচনা এসেছে। কারণ ইহুদীরা বায়তুল্লাহ্‌র ইবরাহীমি কিবলা হওয়ার ব্যাপারটিকে গোপন করার চেষ্টা করেছিল। ওপরে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে ইহুদীরা ইবরাহীম (আ)-এর মূল কুরবানী ক্ষেত্র যে মারওয়া, এ বিষয়টিকেও গোপন করার প্রয়াস পেয়েছিল। পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করব।

www.pathagar.com

মূল কুরবানী স্থল মারওয়া

সাফা ও মারওয়া আল্লাহর ঘরের সন্নিকটস্থ ওই দুটি পাহাড়, হজ্জ ও উমরা পালন ব্যাপদেশে যেগুলোর মধ্যবর্তী স্থলে সাঈ করা হয়। মাওলানা ফারাহী (র) তাঁর রচিত "الرای الصحیح فی من هو الذبیح" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে যে স্থানটিতে কুরবানী করেছিলেন সেটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মারওয়া।[১] বিষয়টি তাওরাতেও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বায়তুল্লাহর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য তারা শব্দটিকে পরিবর্তন করে পুরো ব্যাপারটিকে তালগোল পাকিয়ে দেয়।

شَعَائِر -এর মর্মার্থ

شعائر শব্দটি شعیره শব্দের বহু বচন। এর অর্থ এমন কোনো জিনিস যা কোনো নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতি প্রদান করে থাকে এবং যা তার বহিঃপ্রকাশকারী ও প্রতীক স্বরূপ (Symbol)। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় এ অর্থ শরীআতের ঐসব স্মৃতি-নিদর্শন যা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো আভ্যন্তরীন সত্যের উপলব্ধি সৃষ্টি করার জন্য চিহ্ন বা প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শনের মূল উদ্দেশ্যতো এগুলোর মধ্যে যে মহাসত্য লুক্কায়িত রয়েছে তা-ই। কিন্তু এ নির্ধারণটা হয়ে থাকে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে। এ কারণে ওই নিগূঢ় তত্ত্বের সম্পর্কের দরুন এ নিদর্শনগুলোও পবিত্রতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে যায়। যেমন, কুরবানী ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্বের একটি নমুনা। ইসলামের মূলকথা, বান্দা যেন তার রবের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়। নিজেদের প্রিয় থেকে প্রিয়তর কোনো বস্তুও তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে কুণ্ঠিত না হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) আপন পুত্রকে কুরবানী করার মাধ্যমে যে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মানবজাতির ইতিহাসে তা এক নজির বিহীন ঘটনা। এজন্য মহান আল্লাহ তার স্মরণিকা হিসেবে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর কুরবানীকে একটি প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা এজন্য করেছেন, যাতে এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ইসলামের মূল ভাবধারা সদা-সর্বদা সঞ্জীবিত থাকে।

অনুরূপ হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর একটি স্মারক। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকেই এতে চুমো খেয়ে বা এটি স্পর্শ করে বান্দা স্বীয় রবের সাথে বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি ও আনুগত্যের অঙ্গীকার নবায়ন করে আসছে। এটা এক ঐতিহ্যবাহী প্রতীক। কোনো কোনো হাদীসে তো এটিকে "یمین اللّٰه" বা আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা যখন এটাকে স্পর্শ করে, যেন সে আল্লাহর হাতে নিজের হাত রেখে তা থেকে আল্লাহর সাথে কৃত বাইয়াতের নবায়ন করে নেয়। আর

১. প্রকাশ থাকে যে, প্রকৃত কুরবানী স্থল তো এ মারওয়া-ই। কিন্তু উম্মতের ব্যাপকতা ও বিশালতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেটিকে মিনা পর্যন্ত প্রশস্ততা দান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য মরহুম উস্তাদের 'যবীহ' গ্রন্থটি পড়ে দেখার অনুরোধ রইল।

www.pathagar.com

যখন সে তাতে চুমো খায়, যেন তার তরফ থেকে আল্লাহর সাথে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এমনিভাবে পাথর নিক্ষেপও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর একটি। এ চিহ্নগুলোর ওপর কংকর নিক্ষেপ করে হাজীরা যাতে নিজেদের মনোবল প্রকাশ করতে পারে জন্যই এ নিশানগুলো কায়েম করা হয়েছে। তারা বায়তুল্লাহর শত্রুদের—চাই তা ইবলীসের বংশধর থেকে হোক কিংবা মানব প্রজাতির কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত হোক—অভিসম্পাত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

একই নিয়মে বায়তুল্লাহও একটি প্রতীক, বরং সবচেয়ে বড় প্রতীক। যা গোটা উম্মতের কিবলা এবং তাওহীদ ও নামাযের কেন্দ্র। এর চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করে এবং একে নিজেদের নামায ও নিজেদের মসজিদসমূহের কিবলা নির্ধারণ করে আমরা এ নিগূঢ় সত্যই প্রকাশ করে থাকি যে, একক খোদার ইবাদাতের জন্য এ ঘর নির্মিত হয়েছে, আমরা তাঁরই বান্দা, তাঁর দিকেই আমরা মুখ ফেরাই, তাঁরই ইবাদাত করি এবং আমরা তাঁরই তাওহীদের প্রদীপে আত্মাহুতি দানকারী পতঙ্গ সদৃশ।

তদ্রূপ সাফা ও মারওয়ার মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। এগুলোর নিদর্শন হওয়ার কারণ তো সাধারণভাবে এটাই বর্ণনা করা হয় যে, এ দুটি পাহাড়ের মধ্যে হযরত হাজেরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্য পানির অনুসন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। কিন্তু উস্তাদ ইমাম (র)-এর অভিমত হলো প্রকৃত কুরবানী স্থল হলো মারওয়া। এখানেই হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর রবের নির্দেশ পালনে আনুগত্য ও দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এরই জন্য এ দুটি পাহাড়কেই নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয় এবং তাদের সাক্ষ্যর স্মৃতি চিরকালের জন্য সুসংরক্ষিত করে দেয় হয়।

নিদর্শনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মৌলিক কথা

এ সকল নিদর্শনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মূলনীতি সূচক কথা স্মরণ রাখা কর্তব্যঃ

এক ঃ এসব নিদর্শন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত। নিজস্বভাবে কোনো জিনিসকে দীনের নিদর্শন সাব্যস্ত করার কোনো অধিকার কারো নেই। অথবা যে জিনিস নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত তাকে নিদর্শনের তালিকা থেকে বাদ দেয়ারও কোনো অধিকার নেই। দীনের মধ্যে এ ধরনের মনগড়া হস্তক্ষেপের দ্বারা শিরক ও বেদআতের পথ উন্মুক্ত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, যে সকল জাতি মনগড়া নিদর্শনাবলী সাব্যস্ত করে নেয়, তারা এভাবে শিরক ও মূর্তিপূজার পথ খুলে দিয়েছে।

দুই ঃ নিদর্শনাবলী যেরূপ আল্লাহ নির্ধারিত অনুরূপ ইসলামে নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমাও আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুনির্ধারিত। কোনো নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের যে পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে সেটাই ঐ নিদর্শনের মধ্যে নিহিত নিগূঢ় সত্যকে প্রকাশ করার একমাত্র পদ্ধতি। তার থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া উক্ত

www.pathagar.com

নিদর্শনের মূল তাৎপর্য থেকে মানুষকে বঞ্চিত করারই নামান্তর। শুধু তাই নয়, এদ্বারা শিরক ও বেদআতের পথও খুলে যেতে পারে। ধরুন, 'হাজরে আসওয়াদ' একটি নিদর্শন। এটিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাওয়াফকালীন এটিকে চুমো খাওয়া বা এটিকে হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতে চুমো খাওয়া কিংবা তার দিকে ইশারা করার পদ্ধতিগুলো খোদ দীনের বাহকের পক্ষ থেকেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কেউ সম্মান প্রদর্শনের এ পদ্ধতিগুলোর ওপরই তৃপ্ত না থেকে যদি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে যেয়ে আবেগের আতিশয্যে এ পাথরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে শুরু করে বা তার সম্মুখে ভেট নিবেদন করতে আরম্ভ করে কিংবা এমনি ধরনের অন্য কোনো ক্রিয়া-কলাপ শুরু করে দেয়, তাহলে সে এ নিদর্শনের মাঝে নিহিত যে মৌল তাৎপর্য, তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হবে। শুধু তাই নয়, সে তো বরং শিরক ও বেদআতের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

তিন ঃ এ সকল নিদর্শনাবলীর মধ্যে লুক্কায়িত যে মৌল তাৎপর্য রয়েছে তাই মূলত লক্ষণীয়। এ তাৎপর্যসমূহ প্রকাশ করার জন্য এ নিদর্শনগুলো অনেকটা কাঠামোর মর্যাদা রাখে। তাই মানুষের অন্তরে ও মন-মানসিকতায় এ তাৎপর্যগুলো সদা-সর্বদা সতেজ ও সঞ্জীবিত করে রাখাই একটি জাতিকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন। এ দিকটির ব্যবস্থাপনায় শিথিলতা এসে গেলে দীনের মূল প্রাণশক্তি বের হয়ে যায়, শুধু কাঠামোটাই অবশিষ্ট থেকে যায়। অতপর ধীরে ধীরে ঐ কাঠামোর প্রতিই মানুষের সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে পরিশেষে দীন কতিপয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে এই যে বলা হয়েছে "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত," এদ্বারা একদিকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ উভয় নিদর্শনকে জাহেলিয়াতের মালিন্য ও পুঁতিগন্ধময়তা থেকে পবিত্র করে ইবরাহীমি উত্তরাধিকারের বাহক উম্মতের জন্য নতুনভাবে উচ্চকিত করে তুলে ধরতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, জাহেলী আরব এ দুটি পাহাড়ে দুটি মূর্তিস্থাপন করেছিল এবং এ মূর্তির উদ্দেশ্যে তারা সাঈ ও তাওয়াফ করা শুরু করে দিয়েছিল। এ কারণে এ নিদর্শনগুলোর ইবরাহীমি নিদর্শন হওয়ার বিষয়টিই সন্দেহপূর্ণ হয়ে পড়ে। উপরন্তু এগুলো প্রকাশ্য শিরক ও মূর্তিপূজার আখড়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কুরআন পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে একদিকে বায়তুল্লাহকে যাবতীয় মুশরিকী অপবিত্রতা থেকে পূত-পবিত্র করতঃ তাকে প্রকৃত ইবরাহীমি সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছে। অপরদিকে এখানে সাফা ও মারওয়ার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছে যে, এগুলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকেই আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত এবং এগুলোর সাঈ ও তাওয়াফের যে সুন্নত তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাঈ ও তাওয়াফেরই স্মারক। কিন্তু মুশরিকরা তাওহীদের কেন্দ্রস্থল বায়তুল্লাহতেই যেরূপ অসংখ্য মূর্তিস্থাপন করে রেখেছিল তদ্রূপ এ নিদর্শনগুলোকেও মূর্তিপূজা দ্বারা কলংকিত করে ছেড়েছিল। এক্ষণে অপবিত্রতা ও আবর্জনার এ জঞ্জাল অপসারিত করে এ

www.pathagar.com

নিদর্শনগুলোকে নতুনভাবে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরা এবং এগুলোর সা'ঈ ও তাওয়াফকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব।

অপরদিকে ইহুদীরা এ নিদর্শনগুলোর ওপর পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সত্য গোপন করার যে আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছিল—পরবর্তী আয়াতে যার বর্ণনা আসছে—কুরআন উক্ত আচ্ছাদনকেও অপসারিত করে দিয়েছে। ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, তাওরাতে স্পষ্টভাবেই এর উল্লেখ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর একমাত্র পুত্রকে মারওয়ার নিকটেই কুরবানী করেছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা শব্দটির সঠিক উচ্চারণ সম্পূর্ণ বিকৃত করে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কোনোভাবে উক্ত জায়গাকে মক্কার পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসে পরিবর্তিত করে দেয়া ও তা প্রমাণ করা, যাতে তাওরাতে শেষ নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল, তা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশের পরিবর্তে হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। ইহুদীরা সম্পূর্ণ বিদ্বেষ বশত ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে বিষয়টি বিলুপ্ত করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল কুরআন এখানে মারওয়ার বরাত দিয়ে তার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে।

এ দুটি পাহাড়ের তাওয়াফ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সঠিক পদ্ধতি ও তার সীমা নির্ধারণ হজ্জের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার ন্যায় নবী (স)-এর সুন্নতের অন্তর্গত। যদিও কুরআনে তাওয়াফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এর অর্থ আসলে সা'ঈ ; যা উভয় পাহাড়ের মাঝখানে করা হয়ে থাকে। এ সা'ঈকে তাওয়াফ শব্দে ব্যক্ত করার কারণ, এর বাস্তব রূপ সেই তাওয়াফের সাথে অনেকটাই সাজুয্য রাখে, যা কা'বাঘরের চতুষ্পার্শ্বে করা হয়ে থাকে। এ সা'ঈকে হজ্জ ও উমরার অন্যতম শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মানে, এটা হজ্জ ও উমরার সমষ্টিরই একটা অংশ ; এগুলো থেকে আলাদাভাবে এর স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা নেই। এদ্বারা মুশরিকরা এসব নিদর্শনকে ঘিরে যেসব মুশরিকী নিয়ম-প্রথার প্রবর্তন করেছিল তার সবই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যে ভাষায় এ তাওয়াফের নির্দেশ এসেছে তা কিছু পরিমাণে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

"সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ বা উমরা পালন করে তার পক্ষে এ দুটির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই।"

সা'ঈ'র নির্দেশের ধরন

এ বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বাহ্যত, এটাই বুঝা যায় যে, শরীআতে এ সা'ঈ করার অনুমতি আছে মাত্র, কেউ যদি এটা না করে বা করতে না পারে তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের মতে এ ধারণা সঠিক নয়। এটাই যদি এর অর্থ হতো তাহলে—যেমনটি হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন—বাকভঙ্গি হতো- فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -এর পরিবর্তে اَنْ لاَيَطَّوَّفَ بِهِمَا দ্বিতীয়ত, 'সাফা ও মারওয়া এ দুটিই আল্লাহর নিদর্শন'—

বলার পর একথা বলা যে, 'এগুলোর তাওয়াফ করা ও না করা উভয় বরাবর' নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও বেমামান হয়ে যায়। প্রথম কথাটি বলার পর তার সমপর্যায়ের এবং তার সাথে খাপ খায় এরূপ কথাতো এটাই হতে পারে যে, এগুলোর তাওয়াফ করা জরুরী ও অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত করে দেয়া হবে। এখন প্রশ্ন থাকে এটা যে, এ তাওয়াফ করা কতখানি জরুরী। এটা কি ফরয, না ওয়াজিব কিংবা মোস্তাহাব ? এতে মতভেদ হতেই পারে। কিন্তু এটা মনে করার কোনো অবকাশই নেই যে, এতটা জাঁকজমকপূর্ণ ভূমিকা দেয়ার পর মূলকথাটি এতই দুর্বল হবে। এ কারণে আমাদের ধারণা এটাই যে, এখানে সাঈ'র নির্দেশ বর্তমান রয়েছে এবং এ নির্দেশ ওয়াজিবের মর্যাদাসম্পন্ন।

কিন্তু এখানে অবশ্যই একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়। যদি আয়াতের বক্তব্য এটাই হয়ে থাকে তাহলে فَلَا جُنَاحَ (কোনো দোষ নেই)-এর তাৎপর্য কি দাঁড়াল ? এর জবাব হলো, 'কোনো দোষ নেই'—কথাটির সম্পর্ক সাঈ'র হুকুমের সঙ্গে নয় ; বরং এর সম্পর্ক ওইসব পাপ ও দুষ্কর্মের সাথে যা এ নির্দেশ নাযিলের সময় সা'ঈর স্থানে মূর্তি স্থাপিত থাকার দরুন সংঘটিত হতো। অর্থাৎ যদিও বর্তমানে সাফা ও মারওয়ায় এসব পাপ বর্তমান তথাপি, যেহেতু এটা আল্লাহর নির্ধারণ করা হজ্জের নিদর্শনসমূহের একটি, তাই হজ্জ ও উমরা পালনকালে তোমরা এগুলোর মধ্যে সা'ঈ কর। তোমাদের আমল তোমাদের নিয়ত অনুসারেই অনুষ্ঠিত হবে।

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَانَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ এতে تَطَوَّعَ-এর অর্থ, কেউ কোনো ফরয সমার্পন করার পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য হাসিল করার জন্য অতিরিক্ত কোনো সাঈ নফল নেকী হিসেবে করলে করতে পারে। এখানে تَطَوَّعَ এর সম্পর্ক শুধু সাঈর হুকুমের সাথেই নয়। ওপরে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সাঈ স্বতন্ত্র কোনো ইবাদাত নয়; বরং এটা হজ্জ ও উমরারই একটা পরিশিষ্ট মাত্র। তাই এই تَطَوَّعَ-এর সম্পর্কও হজ্জ ও উমরার সাথেই হতে পারে। অর্থাৎ এক প্রকারের হজ্জ ও উমরা তো হলো ওই ইবাদাত যা ফরয হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েও (নফল হিসেবে) হজ্জ ও উমরা করা যেতে পারে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ তাদের সে নেকী কবুল করবেন এবং এটা তাঁর ইলম ও জ্ঞানে থাকবে। একদিন তিনি এর পুরোপরি বদলা দান করবেন।

'শোকর' শব্দটিও 'সালাত' বা 'তাওবা' শব্দের অনুরূপ একটি শব্দ। অর্থাৎ সম্পর্ক-সম্বন্ধের পরিবর্তনে এগুলোর অর্থের মধ্যেও পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এ শব্দটি বান্দার পক্ষ থেকে হলে এর অর্থ হয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কিন্তু এর সম্পর্ক আল্লাহর তরফ থেকে হলে তার অর্থ হয়ে যায় কবুল করা।

আয়াত ঃ ১৫৯

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ○

ইহুদীদের সত্য গোপন

এখানে ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে بينات ও هدى-এর অর্থ যদিও সাধারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও হতে পারে এবং যা ইহুদীরা গোপন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তথাপি এখানে আয়াতের প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে যে, এর দ্বারা বিশেষ করে ওইসব নিদর্শনই বুঝানো হয়েছে, যা মহান আল্লাহ তাওরাতে বিবৃত করেছেন। বিবৃত করেছেন এজন্য যাতে করে ঐগুলোর সাহায্যে ইহুদীরা শেষ নবী সম্পর্কে সঠিক পথনির্দেশিকা লাভ করতে পারে। কিন্তু ইহুদীরা ঐ নিশানীগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে বরং সেগুলোকে গোপন করার ও লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে উদ্ধৃত করে এসেছি। এখানে আমরা উস্তাদ ইমাম (র)-এর মহান রচনা الراى الصحيح فى من هوا الذبيح নামক গ্রন্থের অষ্টম অনুচ্ছেদের বরাত দেব। যেখানে তিনি মারওয়া সম্পর্কে ইহুদীদের কিতাব বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানী স্থলকে তাওরাত থেকে অদৃশ্য করে দেয়ার জন্য কি কি কূটিলপন্থা অবলম্বন করেছিল এবং কিরূপ নির্দয়ভাবে মারওয়া শব্দটির আকৃতির ব্যবচ্ছেদ করেছে। এটা করেছে তারা শুধু শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই।

তারা এমন একটি মহাসত্যকে গোপন করার প্রয়াস চালায় যা তাদের কিতাবে অত্যন্ত ভালভাবে প্রোজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়; উক্ত সত্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্যও তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন সূরা আলে ইমরানের ১৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ (স্মরণ কর, যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আহলে কিতাবের ঃ তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে।) এতদসত্ত্বেও তাদের এ সত্য গোপন এমন এক অপরাধ ছিল, যদ্দরুন তারা আল্লাহর অভিসম্পাতের যোগ্য বিবেচিত হয় এবং তাদের উপর খোদায়ী গ্রন্থের যে আমানত ন্যস্ত করা হয়েছিল তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় ও তা অন্যদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

উক্ত অভিসম্পাত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ এর বিশদ ব্যাখ্যা সামনে আসছে। এখানে এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, اصطفاء অর্থাৎ কোনো জাতিকে দুনিয়ায় নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করা মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত। যে জাতিকে এ শাস্তি প্রদান করা হয়, সে জাতিকে পৃথিবীতে হেদায়াতের সৌভাগ্য ও নেতৃত্বের আসন থেকে বঞ্চিত ও অপসারিত করে লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়। অপরদিকে আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে চিরন্তন শাস্তির ব্যবস্থা। এর কারণ এই যে, এরা নিজেদের সত্য গোপন দ্বারা শুধু তাদের নিজেদের ভ্রষ্টতার পাল্লাই ভারী করে না বরং পথের হেদায়াতের নিশানীসমূহকে অদৃশ্য করে দিয়ে অন্যান্য সীমা-সংখ্যাহীন লোকদেরকেও ভ্রান্তি ও ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে থাকে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৬০

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

তাওবার জন্য শর্ত

এখানে ওইসব লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যারা উক্ত অভিসম্পাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এরা ওইসব লোক যারা উক্ত সত্য গোপন জনিত অপরাধ থেকে তাওবা করে নেবে। উক্ত তাওবার সাথে اَصْلَحُوْا -এর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এদ্বারা এ সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার বর্তমান ভুলের সংশোধন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এর সাথে অতিরিক্ত আরেকটি শর্তও লাগানো হয়েছে। তাহলো بَيَّنُوْا ; এটা প্রেক্ষাপটের সাযুজ্য রক্ষার্থে। আর এটা পূর্বোক্ত اَصْلَحُوْا-এর ব্যাখ্যা করছে। অর্থাৎ শেষ নবী সম্পর্কে তাওরাতের যেসব সত্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি তারা লুকিয়ে ফেলেছিল তা প্রকাশ করে দেবে।

এতে বুঝা যায়, সে সময় পর্যন্ত কমপক্ষে ইহুদীদের বিশিষ্ট লোকেরা ও আলেম সম্প্রদায় সত্য গোপন করার ষড়যন্ত্রের অধীন যেসব বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছিল ও হচ্ছিল তা জানতো। এ থেকেও এর প্রমাণ মেলে যে, ইহুদী আলেম ও বিজ্ঞদের মধ্য থেকে যারা ইসলামের নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন তারা এ ধরনের অনেক তথ্যাদির ওপর থেকেই পর্দা উন্মোচন করেছেন।

اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ -এতে তাওবার সাথে عَلٰى অব্যয়টির ব্যবহার এটাই সপ্রমাণ করে যে, এর মধ্যে রহমত ও দয়ার বিষয়টিও লুক্কায়িত আছে। অর্থাৎ এ ধরনের লোকদের তাওবা আমি কবুল করি এবং তাদের প্রতি দয়া ও কৃপা বর্ষণ করি। শব্দের এ গুপ্ত সত্যটিকে اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ বলে ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৬১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

"যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে"—দ্বারা ওইসব লোকদের বুঝান হয়েছে যারা নিজেদের হঠকারিতা ও একগুঁয়েমীর ওপর অবিচল থাকে এবং তাওবা ও সংশোধন এবং সত্যের প্রচার ও প্রকাশ থেকে বঞ্চিত থাকাবস্থায়ই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সত্য গোপন এমন এক অপরাধ যা তাদের দীনদার অন্য সকল গুণাবলী এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও মহব্বতের সর্বপ্রকার দাবীকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ তারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও গোটা মানবজাতির অভিসম্পাতের যোগ্য পাত্রে পরিণত হয়। এখানে

www.pathagar.com

আল্লাহর অভিসম্পাতের সাথে ফেরেশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিসম্পাতের উল্লেখ দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লিখিত يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যাই ব্যক্ত হয়েছে। আর النَّاسُ -এর সঙ্গে أَجْمَعِيْنَ শব্দের শর্তারোপ এ সত্যই প্রতিভাত করে যে, কিয়ামতের দিন যখন প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে তখন শুধু ভাল লোকেরাই তাদেরকে অভিসম্পাত করবে না ; বরং ওইসব পাপী-অপরাধীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবে, যারা তাদের আনুগত্য করে বিপথগামী হয়েছিল।

আয়াত ঃ ১৬২

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

অর্থাৎ, তাদেরকে যে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে তা না এতটুকুন হ্রাস করা হবে, না তাতে কিছুমাত্র বিরতি বা অবকাশ দেয়া হবে। অবিরাম-অব্যাহত শাস্তির মাঝে মুহূর্তের জন্য শ্বাস নেয়ারও সুযোগও তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

৫২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৬৩-১৭৬ আয়াত

সূরার দ্বিতীয় অধ্যায়

১৬২ আয়াতে এ সূরার প্রথম অধ্যায় শেষ হলো। এ অধ্যায়ে ইহুদীরা নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হয়েছে এবং একটি নতুন জাতি তাদের সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সহকারে সমুদ্ভাসিত হয়েছে। এক্ষণে পরবর্তী ১৬৩ আয়াত থেকে সূরাটির দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হচ্ছে। আর এতে এ নয়া জাতির জন্য নতুনভাবে আল্লাহর দেয়া শরীআতের উপস্থাপনা করা হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটা যথোপযুক্ত বিন্যাস সহকারে এ উম্মতকে ঐ সকল বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে যার জন্য সূরার নাযিল হওয়ার পটভূমি উপযোগী ছিল। একই সাথে ইহুদী ও মুশরিকরা আল্লাহর দেয়া শরীআতে যে সকল বেদআত সন্নিবেশিত করেছিল প্রতিটি বিধানের বেলায় তাও খণ্ডন করা হয়েছে।

তাওহীদের আলোচনা দ্বারা এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। কারণ এরই ওপর গোটা দীনের ভিত্তি স্থাপিত। তাওহীদের আলোচনার পর তার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদের এ প্রমাণ মূলত ওই প্রমাণ, এ গ্রন্থের ২৩তম অধ্যায়ে আমরা 'সহায়ক দলিল' শিরোনামে যার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। এখানে প্রমাণ তার নিজস্ব নতুন আঙ্গিকে পরিব্যক্ত হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে। অতপর শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার নিন্দা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রকৃত বিচারে এটাও শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত।

এরপর প্রকৃতই আল্লাহ যেসব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করা হয়েছে। যাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুশরিকরা বা আহলে কিতাবরা নিছক নিজেদের মুশরিকী ধ্যান-ধারণা ও খেয়াল-খুশী মত যেসব জিনিস বৈধ

www.pathagar.com

কিংবা নিষিদ্ধ করে নিয়েছিল আল্লাহর দেয়া শরীআতে বিধিবদ্ধ হালাল ও হারামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতপর কতক আয়াতে মুশরিকদেরকে তাদের পিতৃপুরুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং কিতাবধারীদেরকে তাদের সত্য গোপন করার জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা বোধশক্তি দ্বারা কাজ নিলে এবং নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণে হেদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার না দিলে কিছুতেই তাওহীদের বিরুদ্ধাচরণ এবং শিরকের মদদ দান করতো না। কিন্তু তারা তাদের অশুভ কর্মের ফলশ্রুতিতে নিজেদের জন্য চিরন্তন ধ্বংসের পথকেই ভাগ্যলিপি করে নিয়েছে।

উপরোক্ত কথাগুলোর আলোকে সামনের আয়াতগুলো পাঠ করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن
مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا
كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ

www.pathagar.com

حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾
اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّ
بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ
اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۴﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۷۵﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ
اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ
شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۱۷۶﴾

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ ; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু। ১৬৪. নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও

www.pathagar.com

দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণ সাধানকারী সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং যদ্বারা সব ধরনের জীব-জন্তু সেখানে বিস্তার করে। বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে নিদর্শন রয়েছে। বিবেকবান লোকদের জন্য।

১৬৫. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসতে হয় সেরূপ তাদের ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর যালিমরা যেমন বুঝবে এখন যদি তারা তেমন বুঝতো যে, নিশ্চয় সব শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

১৬৬. স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা, যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন তাদের অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৬৭. ওদিকে যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে ঃ হায় ! যদি একবার আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আমরাও তাদের অস্বীকার করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে করেছে। এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপ রূপে তাদের দেখাবেন ; কিন্তু তারা কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

১৬৮. হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯. সেতো তোমাদের নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলতে বলে যা তোমরা জান না।

১৭০. আর যখন তাদের বলা হয় ঃ তোমরা তা অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে ঃ না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি যদি তাদের বাপ-দাদারা কিছুই না বুঝতো এবং হেদায়াত প্রাপ্তও না হতো তবুও ? ১৭১. যারা কুফরী করে তাদের উদাহরণ এমন, যেন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কোনো কিছুই শোনে না হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া। এরা বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

১৭২. হে ঈমানদাররা! তোমরা আহার কর পবিত্র বস্তু থেকে যা আমি তোমাদের দান করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যদি শুধু তাঁরই বন্দেগী করতে চাও। ১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং তা যার ওপর জবাইর সময় আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজেদের পেটে আর কিছুই ভরছে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৭৫. এরাই হচ্ছে সে সকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাব খরিদ করেছে। হায় ! জাহান্নামের ব্যাপারে তাদের কতই না ধৃষ্ঠতা।

১৭৬. আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন। আর যারা কিতাবে মতভেদ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয় তারা সুদূর প্রসারী মতবিরোধের মধ্যে নিপতিত রয়েছে।

৫৩. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৬৩

وَالٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

اِلٰـهٌ (ইলাহ) শব্দের অর্থ মাবুদ বা উপাস্য। এর শুরুতে নির্দিষ্টকরণ সূচক আলিফ লাম যোগ করে اَللّٰـهُ শব্দের তৈরী। আর এটি আল্লাহর মূল নাম রূপে ব্যবহৃত। رَحْمَانٌ ও رَحِيْمٌ শব্দদ্বয়ের তাহকীক ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিশদ ব্যাখ্যা সূরা ফাতিহার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

এ তাওহীদই সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান বিষয় যা ইবরাহীমি মিল্লাতের উত্তরাধিকার হিসেবে এ মুসলিম জাতির প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানে এর উল্লেখ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই করা হয়েছে। যাতে এর মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁক-ফোকড়ের অবকাশ থেকে না যায়। এর মধ্যে যদি কোনো প্রকার ফাঁটল সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তা হবে ভিত্তির ফাঁটল। আর এতে করে গোটা দীনের মধ্যেই শয়তানের ফাঁটল সৃষ্টি করার সুযোগ হস্তগত হয়ে যাবে।

رَحْمَانٌ ও رَحِيْمٌ-এর উল্লেখের দুটি দিক

তাওহীদের আলোচনা প্রসঙ্গে সুন্দরতম নামসমূহ-এর মধ্য থেকে رَحْمَانٌ ও رَحِيْمٌ শব্দদ্বয়ের উল্লেখে দুটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে ঃ

এক ঃ শিরকের কারণ ও উদ্বোধকসমূহের মধ্যে আল্লাহর সর্বপ্রকার জাগতিক কর্মকাণ্ড ও সৃষ্টিজগতের যাবতীয় সম্পর্ক থেকে শ্রেষ্ঠতর হওয়া উর্ধে থাকার ভ্রান্ত ধারণাও একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এ ধারণাতো আল্লাহর সর্বাত্মক পবিত্রতা ও মহত্ব মূলক ধারণা। কিন্তু কখনো কখনো এটা আল্লাহর অদ্বিতীয়তা ও সমকক্ষহীনতাকে এত উচ্চ মার্গে নিয়ে যায় যে, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্কই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তাঁর নৈকট্য হাসিল

করা বা সৃষ্টির ক্রিয়া-কলাপে তাঁর কোনো প্রকার সংশ্রব রাখা তাঁর উলুহিয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সাথে সংশ্রবহীন হওয়ার এ ধারণা স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে তাঁর পক্ষ থেকে এক প্রকার হতাশার জন্ম দেয়। আর এ হাতাশা অবশেষে এমন সব উপায় ও মাধ্যম সৃষ্টি করে যেগুলোকে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে ব্যর্থতার জন্য প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির উপকরণ বানিয়ে নেয়। কুরআন এ বিভ্রান্তিকে দূর করার জন্য বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর একত্ব, তার অদ্বিতীয়তা ও তার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর এমন সব গুণাবলীও উদ্ধৃত করেছে যা সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ককে উদ্ভাসিত করে তোলে। যাতে মানুষ বিকল্প উপায় ও মাধ্যমের সহায়তা অনুসন্ধান করার পরিবর্তে সরাসরি আল্লাহর রহমতের আঁচল ধরার ও তাতেই প্রশান্তি হাসিল করার চেষ্টা করে। লক্ষণীয় যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের শ্রেষ্ঠতম সূরা—সূরা ইখলাসে একদিকে যেমন আল্লাহর অতুলনীয় সত্তাকে উদ্ভাসিত করে তোলার জন্য هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (তিনি আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়) বলা হয়েছে, তদ্রূপ তাঁর সমকক্ষহীনতা তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে— اَللّٰهُ الصَّمَدُ (আল্লাহ স্বয়ম্ভর, পরমুখাপেক্ষীহীন।) যাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ পরমুখাপেক্ষীহীন ও শ্রেষ্ঠতর হওয়া সত্ত্বেও সবার জন্য আশ্রয়, সবার জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল এবং সবার জন্য সাহায্যের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বনও বটে।

এ মৌল নীতির ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহর একত্ববাদকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকে বর্ণনা করার পর এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, একই সাথে তিনি 'রহমান' এবং 'রহীম'ও। আমরা সূরা ফাতিহায় এ দুটি শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেছি। আমরা বলেছি, প্রথম শব্দটি আল্লাহর দয়া ও মহত্ত্বের অবেগ-উদ্দীপনার অর্থ প্রকাশ করে। আর দ্বিতীয় শব্দটি তাঁর দয়ার চিরন্তনতা ও শাশ্বত হওয়ার তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ আল্লাহ একদিকে যেমন এক ও অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভর ও পরমুখাপেক্ষীহীন এবং সবার চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ, অপর দিকে তেমনি তিনি রহমান ও রহীমও। তিনি তাঁর অপার রহমত ও দয়ার আতিশয্যে তোমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন, তাঁরই রহমতের ক্রোড়ে লালন-পালন করেছেন এবং তাঁর এ রহমত ও দয়ার ফলশ্রুতিতেই শাস্তি ও পুরস্কারের একটি দিন নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমরা তাঁরই জন্য বেঁচে থাক, তাঁরই জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর এবং তোমাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র তাঁরই সাথে সম্পর্কিত করে নাও।

দুই ঃ মুশরিক ও মূর্তিপূজারী জাতিসমূহ সর্বদাই ক্রোধ ও প্রতিশোধকে খোদায়ীত্বের অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচনা করেছে। বিশ্বজাহানের সম্রাটকে তারা পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের সাথে তুলনা করেছে। তারা মনে করে নিয়েছে। দুনিয়ার বাদশাহরা নিছক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের সম্রাট হয়েই মহাসম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে যায়। তাদের একান্ত নৈকট্য ভাজন ও সভাসদগণ ব্যতিরেকে কেউ তাদের সামনে শ্বাস নেয়ারও সাহস করে না। তারা যাকে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। দুনিয়ার ক্ষুদ্র রাজাদেরই যখন এ অবস্থা, তখন গোটা বিশ্বজগতের যিনি সম্রাট, তাঁর সম্মান ও

www.pathagar.com

পরাক্রম এবং তাঁর ক্রোধ ও প্রতিশোধের পরিমাপ করা কার সাধ্য ? এভাবে তারা আল্লাহকে এক অতীব ভয়াবহ ও সর্বনাশা সত্তারূপে ধারণা করে নিয়েছে। অতপর তারা তাঁর কতক কাল্পনিক নৈকট্যভাজন ও সভাসদদের আবিষ্কার করে নিয়ে তাদের পূজা করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য, ঐ ভয়াবহ আল্লাহর বিপদ থেকে তারা যেন তাদের সুরক্ষা করে। ঐশী ধর্মের ধারক বাহক জাতিগুলো যদিও আল্লাহর বিশুদ্ধ ধারণা রাখতো, তথাপি যুগ ও কালের পরিক্রমায় মুশরিক জাতিগুলোর প্রভাব প্রতিক্রিয়া তাদের আকীদা -বিশ্বাসকেও সংক্রমিত করে ছেড়েছে। ফলে তাদের দৃষ্টিতেও আল্লাহর মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সূচক গুণাবলীর ওপর পরাক্রম সুলভ গুণাবলীর রঙ প্রাধান্য লাভ করেছে। একই কারণে তাওরাত অধ্যয়নে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, ইহুদীরাও আল্লাহর ক্রোধ ও পরাক্রমের উপাখ্যানকে এতটাই দীর্ঘায়িত করে নিয়েছিল যে, তার বিপরীতে আল্লাহর 'রহমান' ও 'রহীম' হওয়ার ধারণা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায়। এর ফল এই দাঁড়াল যে, তারাও মুশরিক জাতিগুলোর ন্যায় আল্লাহর রহমত হাসিল করার জন্য নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সুপারিশকারীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের নিকট যাদের পবিত্রতা ও নৈকট্যের সার্টিফিকেট বর্তমান ছিল, তাদের সেসব 'বুযুর্গদের অসিলা সাব্যস্ত করলো। অতপর ধীরে ধীরে তারা তো ইসরাঈলের বংশধরদের আল্লাহর একান্ত প্রিয়ভাজন ও বন্ধুরূপে নির্ধারণ করে নিল এবং আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতিশোধের পাত্র রূপে থেকে গেল তাবৎ অইসরাঈলীরা। আলোচ্য আয়াতে তাওহীদের এ আমানত বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিম জাতির ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। তাই ইহুদীরা মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ দ্বারা আল্লাহর রহমান ও রহীম নামের গুণের ওপর যে আবরণ জড়িয়ে দিয়েছিল, এক্ষণে তা অপসারিত করে দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যাতে মধ্যমপন্থী জাতির বৈশিষ্ট্যধারী হিসেবে এ জাতি আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে চলে আসতে পারে এবং এভাবে শিরকজনিত ফিতনারও অবসান হয়ে যায়।

আমরা এখানে এ দুটি দিকের ওপর আলোকপাত করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। এর আরো কিছু দিকের ওপরও আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু তার ওপর আলোচনার জন্য অত্র গ্রন্থের অধিকতর উপযোগী স্থান পরবর্তী পর্যায়ে আসবে।

আয়াত ঃ ১৬৪

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

আসমান ও যমীনের নিশানীসমূহের প্রতি একটি সার্বিক ও সর্বাত্মক ইঙ্গিত

আসমান ও যমীনের সৃষ্টির অর্থ এগুলোর ওই সৃষ্টি নৈপুন্য, যদ্বারা সৃষ্টিকর্তার মহান কুদরত উদ্ভাসিত হয়। এগুলোর ওই গঠন প্রণালীও, যদ্বারা তার অতুলনীয় সৃষ্টিকুশলতা ও বিস্ময়কর প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এগুলোর ওই উপকারিতা ও কল্যাণকারিতাও যদ্বারা স্রষ্টার রহমান ও রহীম হওয়ার এবং তার পালনকর্তা হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সে উদ্দেশ্য যা একথার সাক্ষ প্রদান করে যে, এহেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সৃষ্টি সম্ভার নিরর্থক ও উদ্দেশ্য বিহীন নয় ; বরং এর পেছনে রয়েছে এক বিরাট ও মহান উদ্দেশ্য ও পরিণতি—একটি নির্ধারিত দিনে যা সত্যি আত্মপ্রকাশ করবে। একই সাথে আসমান ও যমীনের সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়াও এটাই প্রমাণ করে যে, এ আকাশ ও পৃথিবী একই স্রষ্টার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, তাঁরই পরিকল্পনার অধীন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধান ও নির্দেশক্রমে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে আর কারো ইচ্ছা ও তত্ত্বাবধানের এতটুকুন দখল নেই। এ বিষয়গুলো কুরআন মজীদের ছত্রে ছত্রে বিচিত্র আঙ্গিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

রাত ও দিনের পরিবর্তন অর্থ—পূর্ণ নিয়ম শৃংখলা ও কাঁটায় কাঁটায় সময়ানুবর্তীতা সহকারে এবং অবিরাম ও অব্যাহত গতি ও পদ্ধতিতে এগুলোর আগমন-নির্গমন। যেমন বলা হয়েছে ঃ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا - الفرقان : ٦٢ "তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা শোকর করতে চায়।"–সূরা ফুরকান ঃ ৬২ দ্বিতীয়ত, রাত ও দিনের ওই পরিবর্তনও এতে শামিল রয়েছে, যা এগুলোর গঠন প্রকৃতি, এগুলোর স্বভাব, এগুলোর আকার-আকৃতি এবং এতদূভয়ের প্রকাশ ও প্রচ্ছন্ন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলে নিহিত রয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন ও বৈপরীত্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এ আসমান ও যমীন বিশ্বজগতের সার্বিক সেবা ও কল্যাণে রাতদিন সদা তৎপর রয়েছে।

فُلْكٌ অর্থ নৌযান। শব্দটি একই সাথে একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ — সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেই স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজীদের فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ আয়াতাংশে পুংলিঙ্গ হিসেবে এসেছে।

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ (যা মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনকারী) অর্থাৎ ওইসব ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উপকরণাদি যেগুলোর বহন ও স্থানান্তরে এসব নৌযানসমূহ ব্যবহৃত হয় এবং যদ্বারা সমাজ ও তমদ্দুনের সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে।

যমীনের মৃত্যু ও তার জীবন অর্থ ভূমি শুষ্ক এবং পানি ও লতা-গুল্মবিহীন হয়ে যাওয়ার পর নতুনভাবে সবুজের সমারোহ ও রকমারী গাছ-গাছালীর অঙ্কুরোদগমে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা।

www.pathagar.com

دَابَّة শব্দের ব্যবহার

دابة শব্দের ব্যবহার প্রধানত যমীনের বুকে বিচরণশীল প্রাণীদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বরঞ্চ সেসব প্রাণী সওয়ারী বা ভারবহনের কাজে এসে থাকে সেগুলোর বেলায়ই শব্দটির ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কিন্তু 'প্রাণী' বলতে আমরা যা বুঝি সে অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত অর্থের দিক থেকে পক্ষীকুল এর অর্থের বহির্ভূত থেকে যায়। শুধু যমীনে চলাফেরাকারী ও হামাগুড়ি দিয়ে চলা সরিসৃপ ইত্যাদি প্রাণীই এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই এ শব্দের অর্থ বহির্ভূত রাখা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ - الانعام : ٣٨ –"পৃথিবীতে যত প্রকার বিচরণশীল প্রাণী আছে এবং যত প্রকার পাখী দু ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় তারা সবই তোমাদেরই মত এক একটি উম্মত।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

কিন্তু যখন এটি তার দ্বিতীয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর আওতায় খেচর ও ভূচর গোটা প্রাণীজগতই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বরঞ্চ সেক্ষেত্রে তো মানবজাতিকেও তার অর্থের মধ্যে শামিল করে নেয়। এ অর্থ ও তাৎপর্যের বিচারে কুরআন মজীদ থেকে কতক দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ -

"আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও রেহাই দিতেন না।"–সূরা ফাতির ঃ ৪৫

এ আয়াতে دابة শব্দটি গোটা প্রাণীজগতের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর তার মধ্যে শামিল রয়েছে খেচর-ভূচর তথা মানুষসহ সবই।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ز - عنكبوت : ٦٠

"আর এমন অনেক প্রাণী আছে যারা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন এবং তোমাদেরকেও।"–সূরা আনকাবূত ঃ ৬০

এ আয়াতে دَابَّة শব্দটি খেচর ও ভূচর সকল প্রাণীর জন্যই প্রযোজ্য।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - هود : ٦

"আর ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর নয়।"
–সূরা হূদ ঃ ৬

এ আয়াতেও শব্দটি তার ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

تصريف رياح-এর তাৎপর্য

تصريف رياح অর্থ বায়ুর দিক পরিবর্তন। বায়ুর পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। কখনো এটি বৃষ্টির পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালাকে নিজ কাঁধে বহন

করে আনে এবং যমীনকে জলভারে সিক্ত-পরিতৃপ্ত করে তোলে, কখনো বা এটি ঐ মেঘমালাকে এহেন দূর-দূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে যায় যে, তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো জাতির জন্য এটি শাস্তিরূপে আবির্ভূত হয়, আবার কোনো জাতির জন্য আবির্ভূত হয় রহমত বা আশীর্বাদরূপে। এ বায়ুর ঘূর্ণন ও পরিবর্তনে ফেরাউন ও তার জাতি সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়। আর এ বায়ুর কল্যাণেই মূসা (আ) ও তাঁর জাতি একই সমুদ্র মহা স্বাচ্ছন্দে অতিক্রম করে পার হয়ে যান। কখনো তা জলীয় বাষ্পে সমৃদ্ধ হয়ে ফল ও শস্যকে ক্রমবিকশিত করে তোলে। সেগুলোর অঙ্কুরোদগম ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। কখনো বা উষ্ণ ও শুষ্ক রূপ ধারণ করে সেগুলোকে পরিপক্ক ও খাবারোপযোগী করে তোলে। কখনো শীতকাল হয়ে পত্র পল্লবকে ম্লান ও শুষ্ক করতঃ সবুজ উদ্যানকে উজাড় করে দেয়। কখনো বা বসন্ত-রূপ ধারণ করে প্রতিটি শাখা-প্রশাখাকে কুঁড়ি এবং ফুল ও পাঁপড়ির ভারে আনত করে তোলে। প্রতিটি ফুলের রূপ-রস-গন্ধ আলাদা ও বিচিত্র। প্রতিটির মাঝে রয়েছে পৃথক সৌন্দর্য ও নিত্যনব ঐশ্বর্য। আর প্রত্যেক ফুলের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সুষমার পেছনে সক্রিয় রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও কুদরত এবং তাঁর অপার দয়া ও রবুবিয়াতের এক বিরাট নিশানী।

تَسْخِير বললতে কি বুঝায়

تَسْخِير মানে কাউকে বিনীত ও অনুগত বানিয়ে কোনোরূপ পারিশ্রমিক ও বিনিময় ব্যতিরেকে কারো সেবায় নিয়োজিত করে দেয়া। মেঘমালাকে আসমান ও যমীনের মাঝে অনুগত করে দেয়ার অর্থ, এরা আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের অধীন সম্পূর্ণ বিনীত ও বাধ্যগত। প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্তে সম্পূর্ণ সদা-প্রস্তুত। যখন এবং যেখানকার উদ্দেশ্যে যে কোনো আকার ও প্রকারের নির্দেশই দেয়া হোক না কেন, সে নির্দেশই তারা পালন করবে। তারা বাধ্যগত আল্লাহর হুকুমের। তিনিই তাঁর রবুবিয়াত ও প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা রহমত কিংবা আযাবরূপে তাদের ব্যবহার করে থাকেন। কুরআন মাজীদে মানুষের সাথে সম্পর্কিত করে যখন মেঘ ও বায়ুকে অনুগত করে দেয়ার আলোচনা আসে, তখন তার অর্থ এটা হয় না যে, ঝড়-বাদল, অথবা সূর্য চাঁদ মানুষের অধীন কিংবা তারা এগুলোকে অধীনস্থ করতে পারে। বরঞ্চ তার মানে নিছক এতটুকুন যে, বিশ্বজাহানের পালনকর্তা এগুলোকে অনুগত ও বাধ্যগত করে এদেরকে মানুষের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। দিন-রাত সদা-সর্বদা এগুলো মানুষের সেবায় নিয়োজিত ও নিবেদিত থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রকার পারিশ্রমিক বা বিনিময়ের প্রত্যাশা করে না। এজন্যই যেখানেই এ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে, সেখানে سَخَّرَ لَكُمْ শব্দমালা প্রয়োগ করা হয়েছে। যার অর্থ হল, আল্লাহ এগুলোকে তোমাদের কল্যাণার্থে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। এর অর্থ এ নয় যে, এগুলোকে তোমাদের নির্দেশের অধীন ও অনুগত করে দিয়েছেন। এগুলো তো নির্দেশের অধীন একমাত্র আল্লাহর। মানুষ সর্বাধিক যেটুকুন করতে পারে তা নিছক এতটুকুন যে, আল্লাহ এগুলোকে যে প্রাকৃতিক আইনের অধীনে রেখেছেন, তন্মধ্যে কোনো কোনোটিকে বিজ্ঞানের কলা-কৌশল প্রয়োগ করে মানুষ সেগুলো থেকে উপকার ও কল্যাণ লাভ করবে। কিন্তু এ সর্বময় আইনের মূল

www.pathagar.com

চালিকাশক্তি আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। মানুষ চালিকা শক্তির ওপর কখনোই কর্তৃত্ব হাসিল করতে পারবে না।

বুদ্ধিবৃত্তির প্রশিক্ষণ

উল্লিখিত সমুদয় বিষয় পর্যালোচনার পর বলা হয়েছে, এসবের মাঝে নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য যারা বোধশক্তি দ্বারা কাজ নেয়। মূল শব্দ آيت -এর অর্থ- ইতিপূর্বেও আমরা যেমনটি অন্যত্র বিশ্লেষণ করে এসেছি—নিশানী ও নিদর্শন। যে জিনিস কোনো বস্তুর নিশানী ও নিদর্শন হয়, সেটি তার প্রাণ হয়ে থাকে। তাই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এখানে উল্লিখিত জিনিসগুলো কিসের ওপর এবং কি ধরনের প্রমাণ ? প্রশ্নটি এ কারণে সৃষ্টি হয় যে, এখানে তো বলা হয়েছে, এ জিনিসগুলোর মধ্যে প্রমাণাদি রয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, এসব প্রমাণ কোন্ সব জিনিসের ওপর এবং এদের প্রমাণ হওয়ার ধরনটা কি ? নিশানীসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে আমাদের বুদ্ধি বৃদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির ওপরই মূল প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা নিজেদের জ্ঞান ও বোধশক্তি দ্বারা কাজ নেবে, তারা এ প্রমাণগুলো আপনা থেকে বুঝবে—উপলব্ধি করতে পারবে। কুরআন মজীদে অধিকাংশ স্থানেই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রশিক্ষণ দানই এর উদ্দেশ্য। যেন আমরা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা দলিল-প্রমাণকে নিজেরাই উপলব্ধি করতে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হতে পারি।

কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতসমূহের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

এ ধরনের স্থানসমূহে কুরআনের ওপর চিন্তা ও গবেষণা করার পদ্ধতি হলো, সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতসমূহকে খোদ কুরআনের আলোকেই বিস্তারিত রূপ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বর্ণিত জিনিসগুলো দ্বারা উক্ত দাবির পক্ষে কিভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ করুন—ইতোপূর্বেও আমরা এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি—আসমান ও যমীনের সৃষ্টি দ্বারা কোথাও আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কোথাও তাঁর পালনকর্তা হওয়ার গুণ এবং পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু সত্তা হওয়ার পক্ষে দলিল দেয়া হয়েছে। কোথাও এতদুভয়ের লক্ষ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। কোথাও বা এগুলোর সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার দিকটিকে এদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বময় অধিকর্তার একত্ববাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাত ও দিনের পরিবর্তনকে কোথাও হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ও সত্যের বিজয়লাভের পক্ষে সাক্ষ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কোথাও রূপক দৃষ্টান্ত স্বরূপ এদ্বারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কোথাও এ দুয়ের মাঝে বর্তমান বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক মহৎ ও উচ্চতর উদ্দেশ্য যে

www.pathagar.com

সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্য নিহিত রয়েছে তাকে এক মহাসত্য প্রমাণের জন্য পেশ করা হয়েছে। আর তা হল এই যে, আলো ও অন্ধকার, উজ্জ্বলতা ও তমসাচ্ছন্নতা—এসব কিছুরই স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনিই এর পরস্পর বিরোধী বস্তু নিয়ে তার অসীম ক্ষমতা বলে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। তিনিই তাঁর প্রজ্ঞার সাহায্যে বৈপরীত্যের মাঝে ঐক্যতান সৃষ্টি করেছেন এবং গোটা বিশ্বজগতের সার্বিক সেবা ও কল্যাণে সেগুলোকে ব্যবহার করেছেন।

নৌযান ও সমুদ্রের আলোচনাও কুরআন মজীদে বিভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে। কোথাও এ দ্বারা মানব জীবনের উত্থান-পতনকে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ এমন এক সৃষ্টি নয়, সামান্যতেই অহংকারী ও উদ্ধত এবং সামান্যতেই নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নৌযান সুচারুরূপে চলমান ও প্রবমান হলে মানুষ তাকে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাফল্য বলে মনে করে। পক্ষান্তরে তার উত্তাল তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হলে তৎক্ষণাত সে তার স্বরে আল্লাহর নাম জপতে থাকে। অতপর এখান থেকেই তাওহীদের মানব-প্রকৃতি-নির্ভর প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্তরের নিভৃত কন্দরে নিহিত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যে মাবুদ, সে আল্লাহ তো একজনই। দুনিয়ার সমুদয় অবলম্বনের ওপর থেকে মানুষের নির্ভরতা যখন নিঃশেষে বিলোপ হয়, তখন তো মানুষ এ এক আল্লাহর সাহায্য ও অবলম্বনই অনুসন্ধান করে থাকে। কোনো কোনো স্থানে সমুদ্র ও নৌযানের মধ্যকার পার্থক্য ও এতদুভয়ের মাঝে বর্তমান বৈপরীত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এদ্বারা এ নিগূঢ় সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে যে, কিভাবে এক উচ্চতর সত্তার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা-সমৃদ্ধ আইন সমুদ্র ও নৌযানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে এরই সাহায্যে মানুষ তরঙ্গমালার স্কন্ধে আরোহণ করে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশ পর্যন্ত সাফল্য ও বিজয়মাল্য রচনা করে এবং সভ্যতা ও তমদ্দুনের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে এগিয়ে চলে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টিও বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর পালনকর্তা ও দয়ালু হওয়ার অন্যতম প্রধান সাক্ষ্য এটি। উপস্থাপন অত্যন্ত স্পষ্ট। আলোচ্য আয়াতেও তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এদ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদেরও প্রমাণ দেয়া হয়েছে। আসমান থেকে বর্ষিত বৃষ্টি যদি যমীনকে সঞ্জীবিত ও পত্র-পল্লবে সুশোভিত করে তুলতে পারে, তবে এটা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যে, আসমান ও যমীনের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন ? প্রত্যেকটি জিনিসের ওপরই এরূপ পৃথক পৃথক খোদায়িত্ব ও দেবত্ব বণ্টিত হয়ে থাকলে গোটা বিশ্বসংসারে এহেন অনুপম বিস্ময়কর শৃংখলা কিভাবে স্থাপিত হলো ? একদিকে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করছে তো অপরদিকে যমীন ঐ পানির সাহায্যে তার অভ্যন্তরস্থ সামগ্রিক ভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছে। অতপর মানুষ, খেচর-ভূচর সবাই তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। কোনো কোনো স্থানে রূপক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বৃষ্টি এবং তার প্রভাব ও ফলাফলের পার্থক্যকে ঐ বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য পেশ করা হয়েছে। যা ঐশী হেদায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায়। একই বৃষ্টি কোথাও সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজি ও

www.pathagar.com

লতা-গুল্মের শোভা মনোহর গালিচা বিছিয়ে দেয়। আবার কোথাও কন্টকাকীর্ণ গাছ-গাছালি ও ঝোঁপ-জঙ্গল উৎপন্ন করে। বলাবাহুল্য, ওই একই পানি কোথাও যমীনকে সম্পূর্ণ শূন্য প্রান্তর রূপেই ছেড়ে দেয়। অনুরূপ বলা হয়েছে, ঐশী হেদায়াতের যে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তদ্বারা সব মানুষ একইভাবে উপকৃত ও সুসমৃদ্ধ হয় না। কেউতো তার ছিটে ফোটার সংস্পর্শেই সুশোভিত পুষ্পোদ্যানের ন্যায় উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেউ লবণাক্ত যমীনের মত মৃতবৎ পড়ে থাকে। আবার কেউ শুধুই ভ্রষ্টতা ও শত্রুতার কাঁটাযুক্ত বিষাক্ত ঝোঁপ-জঙ্গল উৎপন্ন করে ।

বায়ু ও মেঘমালার ঘূর্ণন ও পরিবর্তনকেও বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর দ্বারা আল্লাহর রহমত ও রবুবিয়তের সাক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়। বিশেষ করে যে বিষয়টি কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে, তাহলো বায়ুর পরিবর্তনের আচ্ছাদনে আল্লাহর রহমত ও তাঁর শাস্তির আত্মপ্রকাশ। অবশেষে এরই ফলশ্রুতিতে একদা শাস্তি ও পুরস্কারের দিনটি যে অবধারিত হয়ে উঠবে তা প্রমাণিত হয়। এছাড়া কুরআন এ বিষয়টির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, আসমান ও যমীন, বায়ু, মেঘমালা এর প্রত্যেকটির পেছনেই যদি ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় থেকে থাকে, তবে বিভিন্ন উপায় উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ কে সৃষ্টি করে দেন ? বলাবাহুল্য, এ নিগূঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধ ভিন্ন এ পৃথিবীর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নিতান্তই অসম্ভব।

এখানে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে নিহিত দলিল-প্রমাণগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রমাণগুলো সঠিকভাবে বুঝা বা বর্ণনা করা ওইসব স্থানেই অধিকতর উপযোগী হবে, যেসব জায়গায় কুরআন বিশদভাবে এগুলোর বিবরণ তুলে ধরেছে। এখানে যে কিঞ্চিত আলোক সম্পাত করা হলো, এদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য নিছক এটা দেখানো যে, কুরআন যে বলেছে, এসবের মধ্যে রয়েছে আয়াত তথা প্রমাণ ও নিশানীসমূহ—তা এটা কোনো অবান্তর কথা নয়। বরং এটা এক বাস্তব সত্যের বিবৃতি বৈ নয়। আর এ সত্য কুরআনে সংক্ষিপ্তাকারে ও বিস্তারিতভাবে নানাভাবে বিবৃত হয়েছে। তাই এ সংক্ষিপ্ত বিবরণকে বিস্তারিত বিবরণের আর্শিতে অবলোকন করতে হবে।

১৬৪ আয়াতের ওপর একটি বিশেষ পর্যালোচনা

আয়াতের ওপরে তো একটা সাধারণ আলোচনা হলো। এক্ষণে আলোচ্য শিরোনামের আলোকে আমরা একটা বিশেষ পর্যালোচনা পেশ করব। ইতোপূর্বেই এটা আলোচিত হয়েছে, এখানকার মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ। আর তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্যই এ আয়াতটির অবতারণা। এ বিচারে আয়াতে আলোচিত যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম রহস্যাবলী প্রসঙ্গক্রমেই এসেছে। বাণী-ভঙ্গির দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য, তাহলো তাওহীদের প্রমাণ কি ? তাই আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তা পেশ করার চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

আয়াতটির ওপর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র বিশ্বজগতের পরস্পর বিরোধী বরং সম্পূর্ণ পরস্পর বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক বিষয় ও উপকরণাদির বরাত দেয়া হয়েছে। একই সাথে ওইসব জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান বিস্ময়কর ঐক্য ও সুসামঞ্জস্য এবং তাদের অতুলনীয় নিয়ম-শৃংখলা ও ভারসাম্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বিশ্বজাহানের সামগ্রিক সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এসবের মাঝে এ অপূর্ব শৃংখলা রেখে দেয়া হয়েছে। আসমানের সাথে যমীনের রাতের সাথে দিনের ও নৌযানের সাথে সমুদ্রের আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। বাহ্যত লক্ষ করলে দেখা যাবে, এগুলো পরস্পর বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, যদিও বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য বিদ্যমান, তথাপি এ বিশ্বকারখানাকে সচল ও কার্যকর করে রাখার বিচারে এগুলো পরস্পর একে অন্যের জুটির মতই সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রক্ষা করে চলেছে। এ আকাশ ও তাতে দীপ্যমান সূর্য ও চাঁদ না থাকলে, আমাদের এ পৃথিবীর সার্বিক শোভা ও সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যেত। বরং এর অস্তিত্বই ধ্বংস হয়ে যেত। অনুরূপভাবে এ যমীন ও পৃথিবী না থাকলে এ সীমাহীন দিগন্ত তথা মহাশূন্যের অসংখ্য-অগণিত নক্ষত্ররাজি ও গ্রহমণ্ডল হয়তো অথর্ব ও স্তব্ধ হয়ে যেত। এভাবেই অনুমান করুন, আমাদের ও আমাদের ন্যায় দুনিয়ার অন্য সকল প্রাণীর জীবন যেরূপ দিবাভাগের উষ্ণতা, প্রচণ্ড রোদের প্রখরতা, আলো এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রফুল্ল চিত্ততার মুখাপেক্ষী। তদ্রূপ রাতের শীতলতা, স্নিগ্ধময় কমনীয়তা, শান্তিময় পরিবেশ ও স্বপ্নময়তারও মুখাপেক্ষী। এ উভয় প্রকার সৌন্দর্যই একাকার হয়ে এ বিশ্বকারখানাকে বাসযোগ্য ও সুসমৃদ্ধ করে তুলেছে। তদ্রূপ সমুদ্রের প্রতি তাকিয়ে দেখুন তার বিশাল জলরাশি যতই কূলকিনারা হীন ও ভয়াল হোক, কিংবা তার উত্তাল তরঙ্গমালা যতই ভীতিপ্রদ ও ভয়ঙ্কর হোক, কিন্তু তথাপি তার এহেন উদ্ধত ও দুর্বিনীতি হওয়া সত্ত্বেও সে তার বক্ষদেশে আমাদের নৌযান ও জাহাজসমূহের জন্য কত মনোরম সমতল এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট নৌপথ নির্মাণ করে রেখেছে। এসব পথ দিয়ে আমাদের জাহাজগুলো দিনরাত সদা-সর্বদা চলাচল করছে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাহযীব-তমদ্দুন ও সামাজিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা—সর্বক্ষেত্রে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের সীমারেখাকে একাকার করে দিচ্ছে।

এরপরেই বৃষ্টি, বৃষ্টি দ্বারা যমীনের নতুনভাবে বাগ-বাগিচা ও ফল-শস্যের সঞ্জীবিত ও সুশোভিত হয়ে উঠার বিষয় আলোচিত হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, কোথায় যমীন আর কোথায় আসমান। কিন্তু এহেন দূরত্ব সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে কি গভীর ও নিগূঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধ বিদ্যমান। যমীন তার অভ্যন্তরে জীবন উর্বরতা ও বর্ধনশীলতার ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে তাকে জাগ্রত ও সমুন্নত করে না তুললে তার সমগ্র ভাণ্ডার তার অভ্যন্তরেই প্রচ্ছন্ন থেকে যাবে। একই ধরনের নিগূঢ় ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে মেঘমালা ও বায়ুর মাঝে। মেঘমালার জাহাজ বিপুল-বিশাল জলরাশি বহন করে পাল তুলে দণ্ডায়মান। কিন্তু বায়ু তাকে ধাক্কা দিয়ে স্থানান্তর না করা পর্যন্ত সে তার অবস্থান থেকে ইঞ্চি পরিমাণও নড়তে পারে না। বাতাসই তাকে নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

গন্তব্যের উদ্দেশ্য পরিচালিত করে। বাতাসই এ মেঘমালাকে পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যখন ইচ্ছা তাদের অদৃশ্য করে দেয়। আবার যখন ইচ্ছা দিক চক্রবালে উদ্ভাসিত করে তোলে।

প্রশ্ন হচ্ছে, গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি এ দুনিয়া সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত দেয় ? এটা কি পরস্পর বিপরীতধর্মী ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বস্তুসম্ভারের সংগ্রামক্ষেত্র ? যাতে বিভিন্ন ইচ্ছা ও শক্তির দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ? কিংবা একই প্রজ্ঞাময় মহান সত্তার ইচ্ছা সবার ও সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য করে চলেছে ? এবং বিভিন্ন বস্তুনিচয়কে স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এবং একটা সামগ্রিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে চলেছেন ? এটা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বসংসারের প্রতি তাকালে এই শেষোক্ত অবস্থাটিই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ থেকে আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। তাহলো এ জগত আপনা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেনি। এবং এতে যে ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে তাও নিজে থেকেই হয়নি। যদি তাই হতো, তাহলে বিভিন্ন বস্তু সম্ভারের মাঝে নিহিত এক উচ্চতর উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি-কৌশলের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্য কোথা থেকে সৃষ্টি হলো ?

চিন্তা করে দেখলে এ একটি মাত্র নিগূঢ় সত্যই শিরকের সকল সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করে দেয় এবং অপরদিকে ডারউইনবাদ সৃষ্ট সকল বিভ্রান্তিরও মূল উৎপাটন করে দেয়।

আয়াত ঃ ১৬৫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝

অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত তাওহীদের সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও পৃথিবীতে এমন সব লোকও বর্তমান রয়েছে যারা আল্লাহর শরীক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং ওসব সমকক্ষ ও শরীকদের ঐরূপ ভালবাসে, যেরূপ ভালবাসা উচিত খোদ আল্লাহকে। বাচনভঙ্গিটি বিস্ময়সূচক। অর্থাৎ এহেন নির্বোধ সুলভ ভূমিকা অবলম্বনের কোনো অবকাশই বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু যারা নিজেদের বোধশক্তিকে কাজেই লাগায় না তাদের চিকিৎসার কিই বা উপায় থাকতে পারে ? তাদের জন্য তো আসমান ও যমীনে ছড়িয়ে থাকা সকল প্রমাণাদিই নিষ্ফল।

ভালবাসা পাওয়ার প্রকৃত হকদার আল্লাহ

তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা এদের ধারণা প্রসূত আল্লাহর সমকক্ষ ও শরীকদের এরূপ ভালবাসে যেরূপ খোদ আল্লাহর ভালবাসা উচিত। অথচ ভালবাসা

www.pathagar.com

পাওয়ার প্রকৃত হকদার একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই হাতে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত। বিশ্বজাহানের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ছড়িয়ে থাকা রবুবিয়্যত ও রহমত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি করুণার আধার ও পরম দয়ালু। তাই তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সমতুল্য ভালবাসা পাওয়ার অধিকার কিভাবে পেতে পারে ? হ্যাঁ, অন্য কেউ অপর কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধের কারণে ভালবাসা পাওয়ার অধিকার যদিওবা পায় তথাপি তা অবশ্যি আল্লাহর ভালবাসার অধীনেই পেতে পারে। তা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে ভালবাসার সমান কিংবা আল্লাহ না করুন, তার চেয়ে বেশি হতে পারে না। এ থেকে একদিকে এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ভালবাসা আল্লাহর অধিকারের অন্তর্গত। এতে অন্য কাউকে শরীক করা শিরক। অপর দিকে এটাও প্রমাণিত হয়, অন্য কাউকে আদতেই ভালবাসা যাবে না তাও নয়। স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, জাতি, গোত্র, দেশ ও মাতৃভূমি বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তি বা উস্তাদ, দলপতি বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব—এঁদের প্রতিও ভালবাসা রাখা যেতে পারে। কিন্তু এ ভালবাসার জন্য এটা অপরিহার্য যে, এটা অবশ্যি আল্লাহর ভালবাসার অধীন হবে। অর্থাৎ যেখানেই কিংবা যখনি এ ভালবাসা ও আল্লাহর ভালবাসার দাবীর মধ্যে পরস্পর সংঘাত দেখা দেবে তখন অন্যান্যের ভালবাসার ওপর আল্লাহর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর অন্যসব ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিসন্দেহে তাওহীদের হক আদায়কারী বলেই সাব্যস্ত হবে। তাই প্রকৃত ঈমানদারের সম্যক মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ -(যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।) অর্থাৎ তাদের সামনে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ্র পরস্পর বিরোধী ভালবাসার দাবী সমুপস্থিত হলে তারা বরাবরই আল্লাহর ভালবাসার পাল্লা যেদিকে সেদিকেই ধাবিত হয়। এটাই বিশুদ্ধ তাওহীদের তত্ত্বকথা এবং এটাই প্রকৃত ঈমানের প্রাণসত্তা।

এতে বুঝা গেল, ভালবাসার ব্যাপারটি এমন যে, আল্লাহকে ভালবাসার সাথে সাথে অন্যদেরও ভালবাসা যেতে পারে। এটা ঈমান ও তাওহীদের পরিপন্থী নয়। শর্ত শুধু এতটুকুন যে, অন্যান্যের ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার অধীন হতে হবে ; তার সমান কিংবা বেশি হবে না।

وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا الاية এখানে আরবী ভাষায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী لَوْ শব্দটির জবাব উহ্য রয়েছে আর اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ও তার পরবর্তী শব্দগুচ্ছ উক্ত উহ্য জবাবের বিশ্লেষণ করছে। এর তাৎপর্য এই যে, নিজেদের প্রতি যুলুমকারীরা—যারা আল্লাহর সমকক্ষ ও শরীক সাব্যস্ত করে নিয়েছে এবং তাদের আল্লাহর ন্যায় ভালবেসে চলেছে, তারা তাদের প্রতি প্রতিশ্রুত আল্লাহর শাস্তি কার্যকর হতে যদি দেখতে পেত, তবে তাদের নিকট এ মহাসত্য উদ্ভাসিত হয়ে যেত যে, আল্লাহর কোনো সমকক্ষ ও শরীক নেই ; যে তাঁর মত ভালবাসার হকদার হতে পারে। বরং তিনি একাই সর্বময় ক্ষমতা ও এখতিয়ারের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীদের অত্যন্ত কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। এ থেকে তাদের রক্ষাকারী সেদিন কেউ থাকবে না।

www.pathagar.com

এ জাতীয় অনেক দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদে রয়েছে। সংক্ষেপকরনার্থে আমরা একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরছি। এরশাদ হচ্ছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَايَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِ هِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

"যদি কাফিররা আজ জানতে পারত সে সময়ের কথা, যখন তারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাৎদিক থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না। এবং তারা কোনো রকম সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৯

এ আয়াতেও لَوْ শব্দের জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তারা আখেরাতে যে আযাবের সম্মুখীন হবে, আজ যদি সে সম্পর্কে জানতে পারত, তবে যে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ তারা এখন করছে, তা কিছুতেই করতে পারত না। কিন্তু তারা উক্ত শাস্তি সম্পর্কে তখনই জানতে পারবে যখন তাদের এ জানা কিছুমাত্র উপকারে আসবে না। বরঞ্চ তা হবে কেবলই দুঃখ ও মর্মবেদনার কারণ। সূরা সাবাতেও এ ধারার আয়াতের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আয়াত ঃ ১৬৬

اِذْ تَبَرَّاَالَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○

বক্ষমান আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতের اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ এর بدل হয়েছে এবং উক্ত আযাবের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আর তা হচ্ছে এই যে, আজ যাদেরকে এরা আল্লাহর শরীক ও সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে এবং যাদেরকে এরা এরূপ ভালবাসে যেরূপ খোদ আল্লাহকেই ভালবাসা উচিত, পরকালের শাস্তি আত্মপ্রকাশ করার পর এরা ওসব প্রাণোৎসর্গকারী ও তাদের একান্ত অনুসরণকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে। তাদের ওপর আপতিত উক্ত শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তারা তাদের এতটুকুন কাজে আসবে না।

اسباب শব্দের অর্থ

اسباب শব্দটি سبب শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ–দড়ি বা রশি। অতপর এ থেকেই এর মধ্যে সম্পর্ক ও সহায়তা এবং উপায় ও মাধ্যমের অর্থ সঞ্চারিত হয়েছে। এরপর এতে আরো প্রশস্ততা এসে কোনো বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসসমূহ ও 'চতুর্সীমা'র অর্থেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তাই দেখা যায়, কুরআন মজীদে اسباب السماء এর বাকরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। بِهِمْ শব্দস্থিত ضمير বা বিশেষণটি الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا বাক্যাংশের প্রতি ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ ঐ মুশরিকরা যাদেরকে শরীক ও সুপারিশকারী মনে করে তাদের সাথে ভালবাসা ও নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে, একদিন তাদের এ সম্পর্ক-সম্বন্ধের যাবতীয় বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং পরস্পর একে অন্যের ওপর অভিসম্পাত করবে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৬৭

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ○

অনুসৃতগণ ও অনুসারীগণ

অনুসৃতদের আলোচনার পর এক্ষণে অনুসারীদের পাল্টা প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হচ্ছে। অনুসরণকারীরা যখন দেখতে পাবে, যাদেরকে তারা খোদায়ীর সম্মান দিয়েছিল এবং আজীবন যাদেরকে নিজেদের সার্বিক ভালবাসা ও নৈবেদ্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেছিল, তারাই সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে আজ সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বসেছে। তখন তারাও অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবস্থায় বলবে, হায়! আমরা যদি পুনরায় একবার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমরাও তাদের সাথে ঠিক সেরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেরূপ তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কিন্তু তাদের এ দুঃখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনাই থেকে যাবে। যে আযাবে তারা নিক্ষিপ্ত হবে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ কোনোদিনই তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা স্বরূপ নিম্নে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। এরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز ـ عنكبوت : ٢٥

"তোমরা যে আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ এটাতো নিছক পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য। অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে।"
–সূরা আনকাবূত ঃ ২৫

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا○ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا○ ـ الاحزاب : ٦٧ـ٦٨

"তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরাতো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতাদের ও আমাদের প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাই আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের প্রতি লা'নত করুন মহা লা'নত।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৬৭-৬৮

اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ○ ـ الزخرف : ٦٧

"দুনিয়ার বন্ধু ও বান্ধবরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে। কেবল মুত্তাকীরা ছাড়া।"-সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭

এখানে যে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের যাবতীয় আমলকে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার কারণ ও উপকরণে পরিণত করবেন, এর অর্থ কি ? আমাদের মতে এর অর্থ, এসব মুশরিকদের বাতিল উপাস্য ও তাদের বিভ্রান্তকারী নেতৃবৃন্দ ও দলপতিদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আনুগত্য বিশ্বস্ততা ও উৎসর্গীকৃত কর্মতৎপরতাসমূহ।

আয়াত ঃ ১৬৮

يَآيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

এ সম্বোধন আরবদের প্রতি, যাদের শিরকের প্রতি উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। প্রথমত, তাওহীদের ব্যাপারে তাদের বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করা হয়েছে। অতপর পরবর্তীতে আহলে কিতাবের বেদআতসমূহকে খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আরববাসীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।" শয়তানের পদাংক অনুসরণ করার অর্থ, তোমরা নিজেদের মনমত নিছক স্বীয় মুশরিকী খেয়াল-খুশীর অনুসরণে যে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছ তার কোনো শরীআতসম্মত প্রমাণ বর্তমান নেই। এ পথতো শয়তানই তোমাদেরকে প্রদর্শন করেছে। আর তোমরা কিনা তার অনুসরণে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছ ? আর এভাবে তোমরা আল্লাহর হালাল ও হারাম করার অধিকারের মধ্যে নিজেদের অনধিকার হস্তক্ষেপ করে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছ।

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছু হালাল ও হারাম করা শিরক

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো বস্তুকে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করা শিরক বিধায় কুরআন মাজীদে শিরক এবং হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা নহলে বলা হয়েছে ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ وَّلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ- "আর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করতো না, আর তাঁর আদেশ ছাড়া কোনো কিছু হারামও করতাম না।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৩৫)। অনুরূপ সূরা আল আনআমের ১৪৮ আয়াতে রয়েছে ঃ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍ -"অচিরেই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে না আমরা

www.pathagar.com

শিরক করতাম আর না আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করত এবং না আমরা কোনো কিছুকে হারাম করতাম।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪৮

এ থেকে জানা গেল, শিরক এবং হালাল ও হারাম করার বিষয়টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এ সম্পর্ক জনিত কারণেই আলোচ্য আয়াতেও শিরক খণ্ডন করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যাবতীয় বৈধ ও পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণে মুশরিকী ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর বৈধ করা বস্তুসমূহকে হারাম ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করো না। অনন্তর শয়তানের তাবেদারীতে আরবের মুশরিকরা তাদের মুশরিকী ধ্যান-ধারণা মতে কোন্ সব জিনিসকে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছিল ? এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে তুলে ধরছি। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا
لِشُرَكَآئِنَا ج فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ج وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى
شُرَكَآئِهِمْ ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ
وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ق لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا
وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ وَقَالُوْا مَا
فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ج وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ
شُرَكَآءُ ط سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

"আর তারা নির্দিষ্ট করে কিছু অংশ আল্লাহর জন্য তা থেকে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন শস্য ও গবাদি পশু থেকে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে ঃ এটা আল্লাহর অংশ এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। তারপর যে অংশ তাদের দেবতাদের জন্য তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না। কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌঁছে যায়। তারা যা ফায়সালা করে তা কত নিকৃষ্ট। এমনিভাবে তাদের দেবতারা অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের ধর্মকে তাদের জন্য গোলমেলে করে দিতে পারে। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা এ কাজ

www.pathagar.com

করতো না। সুতরাং আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া উক্তিসমূহকে। তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদি পশু এবং শস্যক্ষেত্র কারো জন্য বৈধ নয়। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া এগুলো কেউ পেতে পারবে না। কিছু সংখ্যক গৃহপালিত পশু রয়েছে যাদের ওপর আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর কতকগুলো পশু আছে যাদের তারা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। এসব কথা তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য বলে। অচিরেই তিনি তাদের মনগড়া উক্তির কারণে তাদেরকে প্রতিফল দেবেন। তারা আরো বলে ঃ এসব গবাদি পশুর পেটে যা আছে তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য হালাল এবং তা আমাদের নারীদের জন্য হারাম ; যদি তা মৃত হয় তবে তাতে সবই সমান হকদার। অচিরেই তিনি তাদেরকে এরূপ বলার প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা যারা নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করেছে বোকামীর দরুন ও অজ্ঞতাবশত এবং হারাম করে নিয়েছে তা যা আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা হিসেবে দিয়েছিলেন, কেবল আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় তারা বিপথগামী হয়েছে এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৬-১৪০

অনুরূপভাবে মুশরিকরা কোনো কোনো প্রকারের চতুষ্পদ জন্তুকে তাদের মুশরিকী খেয়াল-খুশীমত বা তাদের দেবতাদের সাথে সম্পর্কজনিত কারণে পবিত্রতার মর্যাদা দান করে রেখেছিল। উক্ত প্রাণীদের কোনোরূপ কাজে ব্যবহার করাকে তারা অবৈধ বিবেচনা করত। কুরআন এক জায়গায় এ বিবেচনাকে খণ্ডন করে বলেছে ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ ـ المائدة : ١٠٣

"আল্লাহ বাহীরা, সাইবা, ওসীলা এবং হাম-এর প্রচলন করেননি। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান রাখে না—বোধশক্তি দ্বারা কোনো কাজ নেয় না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৩

অন্য এক স্থানে তাদের মুশরিকী সুলভ হালাল ও হারাম করণের ওপর নিম্নোক্ত ভাষায় অভিযুক্ত করেছেন ঃ

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ

www.pathagar.com

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ ـ الانعام : ١٤١ـ١٤٥

"তিনি সৃষ্টি করেছেন গবাদি পশুর মধ্যে কতক বোঝা বহনকারী ও কতক ক্ষুদ্রাকার। আল্লাহ রিযিক হিসেবে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী, মেষের মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। বলুন, তিনি কি হারাম করেছেন নর দুটি কিংবা মাদী দুটি অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা ? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। বলুন, তিনি কি হারাম করেছেন নর দুটি কিংবা মাদী দুটি অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা ? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এ নির্দেশ তোমাদের দিয়েছিলেন ? সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে যে অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে ? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। বলুন, আমার কাছে যে অহী প্রেরণ করা হয়েছে তাতে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাই না কোনো ভক্ষণকারীর জন্য যা সে ভক্ষণ করে, মৃত অথবা বহমান রক্ত অথবা শূকরের গোশত ছাড়া। কেননা এটা অবশ্যই অপবিত্র, অথবা যা অবৈধ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪২-১৪৫

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করার অর্থ এ মুশরিকী ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীকে হারাম সাব্যস্তকরণ। এখানে এ নিগূঢ় তত্ত্বটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শয়তান ও তার চেলাদের হালাল-হারামকরণ সংশ্লিষ্ট এ বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ রয়েছে। মানুষকে তাওহীদের রাজপথ থেকে হটাবার জন্য এ পথটাকে সে অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর ধরে নিয়েছে। এজন্য সে প্রথম থেকেই বিষয়টিকে তার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। পূর্ণ সাহস ও স্পর্ধা সহকারে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সে এর ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ করুন ঃ

وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۝ ـ النساء : ١١٨ـ١١٩

www.pathagar.com

"এবং তাদের আমি পথভ্রষ্ট করবই। তাদের বৃথা আশ্বাস দেবই। আর আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দেব যেন তারা পশুর কান ছেদন করে, আর নিশ্চয় আমি তাদের নির্দেশ দেব যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি বিকৃত করে দেয়। আর যে কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে সে প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১৯

আয়াতে হালাল শব্দের সাথে পবিত্রতার গুণটি জুড়ে দেয়াতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে যেসব জিনিস বৈধ সেগুলো অপরিহার্যরূপে পবিত্রও। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের বৈধ ও অবৈধ হওয়ার জন্য যেমন শরঈ ও আইনগত মানদণ্ড রয়েছে, ঠিক তেমনি যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক মাপকাঠিও রয়েছে। যেসব বস্তু বাহ্যিক অপবিত্রতা এবং বুদ্ধি ও নৈতিক অনিষ্টকারিতা-দুষ্ট নয় তার সবই হালাল ও বৈধ। পক্ষান্তরে যেসব বস্তুতে কোনো বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা বর্তমান সেগুলোকেই অবৈধ করে দেয়া হয়েছে।

শয়তানের জন্য প্রকাশ্য দুশমনের ব্যবহার

শয়তানের জন্য عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ বা 'প্রকাশ্য শত্রু'-এর ব্যবহার এ সত্যকেই প্রকাশ করে যে, মানব প্রজাতির সাথে তার শত্রুতার বিষয়টি কোনো গোপন ও প্রচ্ছন্ন ব্যাপার নয়। সেতো প্রথম দিন থেকেই আদম ও তার বংশধরের শত্রু। কিয়ামত পর্যন্ত তার এ শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণাও সে যথারীতি দিয়ে রেখেছে। ইতোপূর্বে আমরা সূরা আনআমের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছি। যদ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সে খোদ আল্লাহর সম্মুখে পূর্ণ ঔদ্ধত্যের সাথে তার এ শত্রুতার ঘোষণা দিয়েছে। একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অপর একটি আয়াত লক্ষণীয় ঃ

قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ○ قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلاَّ قَلِيْلًا○ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَآءً
مَّوْفُوْرًا ○ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ
فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلاَّ غُرُوْرًا ○- بنى اسرائيل : ٦١-٦٤

"ইবলীস বলেছিল, আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ? সে বলল, ওকে যে আপনি আমার ওপর মর্যাদা দান করলেন, কেন ? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদের সমূলে ধ্বংস করে ছাড়ব। আল্লাহ বললেন, 'যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি—পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহবানে তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী

www.pathagar.com

ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদের আক্রমণ কর, তাদের ধনে ও সন্তান-সন্তুতিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির সবুজ উদ্যান দেখিয়ে দাও। আর শয়তানের এ সকল প্রতিশ্রুতি নিছক ছলনা বৈ নয়।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬১-৬৪

অপর এক জায়গায় শয়তানের দেয়া চরমপত্রের শব্দমালা লক্ষ করুন ঃ

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝ – الاعراف : ١٦-١٧

"সে বললো, যাদের উপলক্ষ্য করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, তাদের বিরুদ্ধে আমিও তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব। অতপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৬-১৭

যে শত্রু এহেন সুস্পষ্ট বাক্যে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে রেখেছে তার প্রকাশ্য শত্রু (Open Enemy) হওয়ার ব্যাপারে এতটুকুন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এজন্যই কুরআন তাকে عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ বা প্রকাশ্য শত্রু বলে অভিহিত করেছে। উদ্দেশ্য, আদম সন্তানকে একথা জানান দেয়া যে, এক প্রচ্ছন্ন শত্রু দ্বারা তো প্রতারিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এক প্রকাশ্য শত্রু দ্বারা প্রতারিত হওয়া তথা তাকে বন্ধু ও অভিভাবক মনে করে তার পরামর্শে জীবন পরিচালনা করা এমন এক নির্বুদ্ধিতা যার অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার ধারণাই করা যায় না।

আয়াত ঃ ১৬৯

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

امر শব্দের অর্থ

امـر (আদেশ) দ্বারা যেমন কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করা বুঝায় তদ্রূপ কোনো বিষয় বুঝানো বা পরামর্শ দেয়াও বুঝায়। যেমন ঃ

امرتهم امرى بمنعرج اللوى ٭ فلم يستبينوا الرشد الاضحى الغد

"আমি তাদেরকে প্রথম প্রহরেই আমার পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরের দিন ভোর বেলার আগে তাদের তা বুঝে আসেনি।"

অথবা—

اطعت لامريك بصرم حبلى

"তুমিতো অবশেষে তাদের কথাই শুনলে যারা তোমাকে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দাতা ছিল।"

www.pathagar.com

سُوْء শব্দের ব্যবহার ব্যাপক অর্থে

سُـوْء শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৈহিক ও বস্তুগত ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ - ال عمران : ١٧٤ "অতপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল ; কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৪। একই সাথে এর দ্বারা রোগ-ব্যাধিও বুঝায়। যেমন ঃ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ - نمل ١٢ : "তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্মল তথা নিরোগ অবস্থায়।"–সূরা আন নামল ঃ ১২। তদ্রূপ এটি গুনাহ ও পাপকার্যের জন্যও ব্যবহৃত হয়। চাই তা ছোট গুনাহ হোক কিংবা বড় গুনাহ্‌। যেমন ঃ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ - النساء : ١٧ "আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবা করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭

فَحْشَاء শব্দের অর্থ

فَحْشَاءَ শব্দটি প্রকাশ্য পাপাচার ও নির্লজ্জতার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এ দ্বারা ব্যভিচার, লাওয়াতাত ও উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন سُوْء ও فَحْشَاء একই সাথে ব্যবহৃত হয় তখন এদ্বারা শুধু ছোট বড় সকল মন্দ কর্মকেই বুঝায় না। বরঞ্চ সব রকম দৈহিক আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষতি ও বিপদাপদও এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

আল্লাহর ওপর কথা বলা ও আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা পরস্পর সমার্থক। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কোনো মিথ্যা ও মনগড়া কথা আরোপ করা। যেমন এরূপ বলা যে, আল্লাহ অমুক অমুককে নিজের সমকক্ষ ও অংশীদার সাব্যস্ত করেছেন। অথবা কোনোরূপ প্রমাণ ছাড়া এরূপ দাবি করা যে, আল্লাহ অমুক অমুক প্রকার বস্তু হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন।

শয়তানের নির্দেশ দেয়া দ্বারা এখানে অন্তরে খটকা সৃষ্টি করা, দৃষ্টিকে প্রতারিত করা বুঝানো হয়েছে। আর শয়তান বলতে তার সকল চেলা ও বংশধরও এতে শামিল। চাই তা জিন সম্প্রদায়ভুক্ত হোক বা মানুষ সম্প্রদায়ভুক্ত। একই বিষয়বস্তু অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ○ - الانعام : ١٢١ "যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না ; তা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চল, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২১

www.pathagar.com

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। দয়াময় আল্লাহর বিধান ও শয়তানের বিধানের মধ্যে এমন একটি সুস্পষ্ট যৌক্তিক ও স্বাভাবিক পার্থক্য বিদ্যমান যে কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক ও বিবেকবান মানুষই তাতে কোনোরূপ বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন না। পূর্ববর্তী আয়াতে যথার্থই বলা হয়েছে যে, যেসব বস্তু খাদ্য হিসেবে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার এবং গোপন ও প্রকাশ্য উভয় দিক থেকেই সেগুলো পবিত্র, সুস্বাদু, ভারসাম্যপূর্ণ, স্বাস্থ্যপ্রদ ও জীবন-দায়িনী। পক্ষান্তরে শয়তান যেসব জিনিস গ্রহণ করতে আহ্বান করে তার সবই দেহ ও আত্মা, জ্ঞান ও নৈতিকতার পক্ষে ক্ষতিকারক। এগুলো নির্লজ্জতা ও পাপচারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যের পরও যারা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে তারা যথার্থই দুর্ভাগা।

আয়াত ঃ ১৭০

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

যাচাই-বাছাই সহকারে পূর্ববর্তীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

অর্থাৎ এসব শিরকপূর্ণ রীতি-পদ্ধতির প্রতি তাদের এ ভক্তি ও বিশ্বাস কোনো দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তিশীল নয়। নিছক পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণ ও যুক্তি-প্রমাণহীন ঐতিহ্যই তাদের একমাত্র সম্বল। তাদের যখন এসব অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন জিনিসের পরিবর্তে অভ্রান্ত শরীআতের উদগাতা ও প্রবক্তা আসমানী গ্রন্থের অনুসরণ করতে বলা হয়—যা তাদের প্রতি নাযিল করা হচ্ছে—তখন তারা চরম ঔদ্ধত্যের সাথে জবাব দেয় যে, আমরাতো আমাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণে কৃতসংকল্প। এ প্রসঙ্গে কুরআন এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, বাপ-দাদার রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণে এদের এ জিদ ও হঠকারিতা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের পিতৃপুরুষের এসব ক্রিয়া-কলাপ জ্ঞান ও যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল নয়, নয় খোদায়ী শিক্ষার ওপর। বরং এরাতো নির্বোধের মত পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছে অথবা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও শয়তানের আনুগত্য করতে যেয়ে নতুন নতুন বেদআত আবিষ্কার করে নিয়েছে।

কুরআনের এ প্রশ্নের ধারা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 'পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে'—শুধু এতটুকুন কথাই কোনো বিষয়ের বিশুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ যাচাই-পর্যালোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখাও জরুরী। বিষয়টি নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক হলে তা যুক্তির মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় কিনা এবং দীনের সাথে সম্পৃক্ত হলে তার পক্ষে কোনো শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ আছে কিনা, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। অন্য কথায় কুরআন একদিকে নিছক অন্ধ অনুকরণের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে যাচাই-পরখের জন্য সর্বদা চোখ-কান খোলা রাখার আহ্বান

www.pathagar.com

জানায়। অপরদিকে অতীতের উত্তরাধিকারকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখারও আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে যাচাই-পর্যালোচনা ছাড়া তা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ারও অনুমতি দেয় না।

আয়াত ঃ ১৭১

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○

نَعَقَ يَنْعَقُ-এর অর্থ

نَعَقَ يَنْعَقُ -এর অর্থ চিৎকার করা, শব্দ করা। نعق المؤذن -এর অর্থ মুয়াজ্জিন আযান দিয়েছে। نعق الراعى بغنمه -এর অর্থ রাখাল তার পশুপালকে ডেকেছে।

উপমার উপমা

এটি একটি উপমা—যাতে একটি ঘটনার সাথে অপর একটি ঘটনার তুলনা প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের উপমা উদাহরণে উপমা ও উপমেয় উভয়ের প্রত্যেক অংশ পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরী নয়। যেমনটি আমরা ১৬-১৮ আয়াতের উপমাসমূহের বিশ্লেষণ করে এসেছি। এরূপ ক্ষেত্রে উপমা ও উপমেয়—এতদুভয়ের প্রতিটি অংশের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য হওয়া জরুরী নয়। বরং ঘটনা-চিত্রের সাথে ঘটনা-চিত্রের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে। উপরন্তু এটাও জরুরী নয় যে, যে জিনিসের উদাহরণ দেয়া হচ্ছে তার পূর্ণ চিত্র প্রোজ্জ্বল করে তোলা হবে। বরং ঐ ঘটনা-চিত্রের পরিস্ফুটনের অপরিহার্য যার সাথে উপমা দেয়া হচ্ছে। এরই আয়নাতে তার প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে নিতে হবে যার উপমা দেয়া উদ্দেশ্য।

যারা যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কাজ নেয়ার পরিবর্তে অন্ধ-বধিরের ন্যায় নিছক পূর্বপুরুষদের অনুকরণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মেষ ও ছাগ-পালের ন্যায় যারা জ্ঞান ও যুক্তি-বিবর্জিত এবং চিন্তা ও বিবেক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। রাখালের কণ্ঠধ্বনি ওদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে ঠিকই ; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রাখাল কি জন্য ডাকছে এবং কি বলছে, তার কিছুই ওরা বুঝতে পারে না। এ উপমার পর বলা হয়েছে ঃ 'এরা বধির, মূক ও অন্ধ।' এদ্বারা একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, ঐ উপমা তাদের যাবতীয় যৌক্তিক ও আত্মিক দেউলিয়াত্বেরই উপমা বা উদাহরণ। ১৮ আয়াতের অধীনও এ ধারার কতক অলংকার বর্ণিত হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৭২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

www.pathagar.com

মুসলমানদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীকরণ

এখানে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এ সকল অংশীবাদিরা যদি তাদের মুশ্‌রিকী দুষ্কৃতির ওপরই অটল থাকতে চায় তবে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং তোমরা যাবতীয় অবৈধ বিধি-নিষেধ বর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত পবিত্র বস্তু আহার কর। অতপর আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহরই দাসত্ব করতে কৃতসংকল্প হয়ে থাকলে তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহর দেয়া রিযক ও তার সৃষ্ট চতুষ্পদ প্রাণীসমূহকে অন্য কারো নির্দেশে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর কৃতজ্ঞতার পরিপন্থী।

মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে একথা বলার প্রয়োজন এ কারণে ছিল যে, পানাহার সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছিল একান্তই স্পর্শকাতর। বিশেষ করে ওসব পানাহারের বস্তু যেগুলো প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মীয় পবিত্রতার দোহাইতে নিষিদ্ধতার মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। এ জাতীয় ব্যাপারে মানুষ কিছুটা খেয়ালী ও সন্দেহবাদী হয়ে যায়। ঐতিহ্যের বিপরীত কোনো জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে নাক ছিঁটকায়। এমনকি অনেকে এটাকে তাকওয়া ও দীনদারীর পরিপন্থীও মনে করে। প্রথম প্রথম কতক মুসলমানেরও একই দশা হয়েছিল। এ কারণেই কুরআন এটাকে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তার বন্দেগীর পরিপন্থী বলে সতর্ক করে দিয়েছে।

সূরা আনআমের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুশরিকদের হারামকৃত জিনিসসমূহকে কুরআন যখন হালাল ও মুবাহ ঘোষণা করল এবং বলল, আল্লাহর নামে যবেহ কৃত প্রাণীসমূহ তোমরা আগ্রহভরে আহার কর তখন মুশরিকরা অপপ্রচার শুরু করল যে, আবহমানকাল থেকে হারাম ও নিষিদ্ধ জিনিসসমূহকেও মুসলমানরা হালাল সাব্যস্ত করে নিয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, এ জাতীয় ব্যাপারে মানবীয় মনস্তত্ত্ব সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়ে থাকে। কতক মুসলমানের ওপর এ প্রচারণার বেশ প্রভাব পড়ে। উক্ত প্রচারণাকে খণ্ডন করেই সূরা আনআমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয় ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ○ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ○ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ○ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ○ - الانعام : ١١٨-١٢١

www.pathagar.com

"তোমরা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা নিসংকোচে আহার কর। তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তোমরা তা থেকে আহার করবে না ? যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র। অনেকে অজ্ঞতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপদগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর। যারা পাপ করে তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না ; তা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয় ; যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১১৮-১২১

আমাদের মতে আলোচ্য আয়াতটিও এমন পরিস্থিতিতেই উপরিউক্ত সত্যকেই মুসলমানদের সামনে পরিষ্কার করে তোলার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াত ঃ ১৭৩

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

ইবরাহীমী শরীআতে হালাল ও হারাম

ইবরাহীমী শরীআতে যেসব জিনিস নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এখানে মূলত তার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ; হালাল ও হারামের বিশদ বিবরণ পেশ করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়। এটা মূলত মুশরিকদের ধারণার খণ্ডন বৈ নয় ; যারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে তাদের মুশরিকী ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কতক চতুষ্পদ জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল। কুরআন তাই বলছে, ইবরাহীমী শরীআতে আসলে এ এ জিনিসগুলো হারাম ছিল। সম্পূর্ণ একই ধারায়—একথাগুলো সূরা আনআমে বলা হয়েছে এভাবে ঃ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ - الانعام : ١٤٥ "বল আমার প্রতি যে অহী হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ছাড়া আমি আর কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি—কেননা এসব অবশ্যই অপবিত্র—অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৪৫

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ (বল, আমার প্রতি যে অহী হয়েছে)—শব্দাবলীর ওপর পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গীর আলোকে চিন্তা করলে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহানবী (স)-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে এটা পরিষ্কার জানান দেয়া হচ্ছে ঃ তোমরা ইবরাহীমী শরীআতের দোহাই দিয়ে যেসব চতুষ্পদ জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছ, তা সম্পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণহীন। ইবরাহীমী শরীআতে হালাল-হারামের নীতিমালা সংক্রান্ত যে অহী আমার নিকট এসেছে তাতো এই যে, চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে অমুক অমুক জিনিস ছাড়া আর কিছুই হারাম সাব্যস্ত করা হয়নি।

কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতটিকে সংশ্লিষ্ট স্থান-কাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে থাকেন যে, ইসলামে কেবলমাত্র একটি জিনিসই হারাম—যা এখানে উল্লিখিত হয়েছে ; এছাড়া আর কিছুই হারাম নয়। কিন্তু এ ধারণা স্পষ্টতই ভুল। এ শ্রেণীর লোকদের মতামত খণ্ডনের জন্য এটাই যথেষ্ট যে অত্র আয়াতের مَيْتَة শব্দের ব্যাখ্যায় সূরা আল মায়েদার ৩ আয়াতে পাঁচটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো কতিপয় বস্তুর নিষিদ্ধতাও বর্ণিত হয়েছে—যেগুলো সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে কোনো ইঙ্গিতই করা হয়নি।

প্রকাশ্য অপবিত্রতা ও প্রচ্ছন্ন অপবিত্রতা

ওপরে বর্ণিত বস্তুগুলোর মধ্যে মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশতের অবৈধতাতো এগুলোর বাহ্যিক অপবিত্রতার দরুনই সাব্যস্ত করা হয়েছে। ওপরে যেমনটি বলা হয়েছে যে, ইসলামে কেবলমাত্র পবিত্র জিনিসসমূহকেই হালাল করা হয়েছে। যেসব জিনিস বাহ্য-দৃষ্টিতেই অপরিচ্ছন্ন ও নাপাক বলে মনে হয়, সেগুলোকেই এ ফিতরাতের ধর্মে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণীর অবৈধতার কারণ তার প্রচ্ছন্ন ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা। ইসলামে এটা একান্তই সর্বসম্মত ও সুস্পষ্ট যে, শিরক হলো সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচ্ছন্ন নাপাকী ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা। কাজেই কোনো পবিত্র জিনিসকেও এর সংস্পর্শে আসলে তৎক্ষণাত তা নাপাক ও অপবিত্র হয়ে যায়। এ উভয় প্রকার নাপাকীর প্রতি খোদ কুরআনই ইঙ্গিত প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গেই সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতে মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশতের উল্লেখের পর বলা হয়েছে- فَاِنَّهٗ رِجْسٌ এগুলো নাপাক ও অপবিত্র বলেই হারাম করা হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণীর উল্লেখ করা হয়েছে اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ بِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ শব্দাবলী দ্বারা। এদ্বারা এটাই স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, এগুলোর অপবিত্রতা বাহ্যিক নয় ; যৌক্তিক ও আকীদাগত। সূরা আন'আমে এসব মাসয়ালা বর্ণনা প্রসঙ্গে দীনের এ গূঢ় তত্ত্বও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের দাবী তার প্রতিটি অনুসারীর কাছে শুধু প্রকাশ্য গুনাহ বর্জন করাই নয় ; বরং প্রচ্ছন্ন গুনাহও বর্জন করা। এজন্যই বাহ্যিক অপবিত্র জিনিসসমূহের সাথে সাথে আত্মিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্র জিনিসও বর্জন করা অপরিহার্য। وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ - الانعام -'তোমরা প্রকাশ্য পাপ ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জন কর।"-সূরা আল আনআম—এ নীতির ভিত্তিতেই মহানবী (স)ও কোনো কোনো জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

اضطرار -এর তাৎপর্য

اضطر শব্দটি ضـريـضـر থেকে باب افـتـعـال, আরবী ভাষারীতি অনুসারে ص -এর কারণে افتعال এর ت অক্ষরটি ط দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ضره الى كذا-এর অর্থ الجاء ه اليه। অর্থাৎ তাকে অমুক জিনিসের প্রতি ধাবিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। اضطره। -এর মানে احوجه والجاءه اليه তাকে অমুক জিনিসের প্রতি বাধ্য করা হয়েছে। بغى، يبغى -এর অর্থ এখানে চাওয়া ও অনুসন্ধান করা। غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ এখানে حال হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় اضطرار বা 'নিরুপায়'-এর সাথে مخمصه বা ক্ষুধার্ত হওয়ার শর্তও লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে যায়, তবে সে হারামকৃত জিনিসও জীবন বাঁচাবার জন্য ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রকৃতই নিরুপায় ও বাধ্য হওয়া জরুরী ; হারামের প্রতি তার কোনোই আকর্ষণ থাকতে পারবে না এবং জীবন বাঁচাবার জন্য অপরিহার্য পরিমাণের সীমাও সে অতিক্রম করতে পারবে না। এ সকল সাবধানতার সাথে সাথে প্রকৃতই নিরুপায় হয়ে কোনো হারাম বস্তু দ্বারা উপকৃত হলে তাতে কোনো পাপ হবে না। আর আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

অনুমতি বাধ্যবাধকতা

কুরআনের শব্দাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য দ্রব্য সহজলভ্য না হওয়া জনিত কারণে সৃষ্ট নিরুপায় অবস্থার জন্যই এটা একটা অনুমতি। এটার ওপর কিয়াস বা অনুমান করে এটাও বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি জোর জবরদস্তিমূলক পরিস্থিতির শিকার হবে, সেও এ অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো ফিকহ শাস্ত্রবিদ এ সীমা অতিক্রম করে এটাকে বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন। কাজেই হানাফীদের মতে, এমতাবস্থায় যে হারামের সুযোগ গ্রহণ না করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে সে আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আমাদের মতে, এতটুকুন সংক্ষিপ্ততার সাথে এটা সঠিক নয়। বরং তার সাথে আরেকটু বিস্তারিত বুঝার বিষয় রয়েছে, যা পরিষ্কার না হলে বিভিন্ন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে 'অনুমতি ও বাধ্যবাধকতা' এ শিরোনামে আলাদাভাবে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করব, যাতে এ বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আয়াত : ১৭৪

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا لا أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

www.pathagar.com

কিতাবধারীদের কতক হারামকৃত বস্তু

এখানে কিতাবধারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুশরিকরা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কতিপয় জিনিস হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। ইসলামের পক্ষ থেকে সেগুলোকে হালাল ঘোষণা করা হলে তারা এটাকে তাকওয়া ও পবিত্রতার পরিপন্থী মনে করতে লাগল। একইভাবে কিতাবধারীরাও নিজেদের মর্জিমত হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। এক্ষণে ইসলাম যখন খেয়াল-খুশী ও বেদআতের মাধ্যমে হালাল-হারাম নির্ধারণের পরিবর্তে ইবরাহিমী শরীআতের মৌল ভিত্তি ও খোদায়ী অহীর নির্দেশনার আলোকে ঐশী নীতিমালার দিকে লোকদের ফিরিয়ে আনছিল, তখন এরা তার সহযোগিতা করার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাবের বাণীকে গোপন করতে লাগল। এ ধরনের একাধিক জিনিসের প্রতি কুরআন ইঙ্গিত করেছে। যেমন উট সম্পর্কে ইহুদীরা দাবী করত, এটা ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকেই হারাম। অথচ তাওরাতে এর কোনোই প্রমাণ নেই। এজন্য কুরআন তাদের নিকট দাবি করেছে ঃ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ –"তাদের বল, তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হলে তাওরাত নিয়ে এসো। এরপরও যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তারাই প্রকৃতপক্ষে যালিম ও সীমালংঘনকারী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩

এমনিভাবে ইহুদীদের অবাধ্যতা ও উদ্ধত স্বভাবজনিত কারণে অথবা তাদের উপর্যোপরি প্রশ্নবাণের দরুন কতকগুলো জিনিস তাদের ওপর নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এসব নিষিদ্ধ জিনিসসমূহ সম্পর্কে তাদের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, শেষ নবীর আবির্ভাব হলে তিনি সব পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করে দেবেন। আজ তোমাদের ওপর যে সকল বিধি-নিষেধ আরোপিত রয়েছে তার সবই দূরীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও ইহুদীরা তাদের সত্য গোপন করার ও চরম অকৃতজ্ঞতার চিরাচরিত নীতিই গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী হারাম জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করাকে শেষ নবী (স)-এর অনুগ্রহ হিসেবে মেনে নিতেই শুধু ব্যর্থ হলো না ; বরং তারা এটাকে দীনদারী ও তাকওয়ার পরিপন্থী বলেও সাব্যস্ত করলো। একই সঙ্গে এর ছদ্মাবরণে কুরআন, ইসলাম ও মহানবী (স)-এর বিরোধিতার চরম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করে।

এ পর্যায়ে খৃস্টানদের কতক অপরাধিও অত্যন্ত গুরুতর। যদিও তাদের অপরাধ নিষিদ্ধ করণ অপেক্ষা হালাল ও সিদ্ধকরণের ক্ষেত্রেই বেশি। বর্তমান খৃস্টবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার 'পল'-এর দর্শন হলো, মূসা (আ) প্রদত্ত বিধানসমূহ বনী ইসরাঈল ভিন্ন অন্যদের ওপর অপরিহার্য নয়। অনুরূপ তিনি খৃস্টানদের জন্য মদ সরাসরি বৈধ করে দিয়েছেন। এছাড়া শূকর ও শ্বাসরোধে মৃত জন্তুকেও তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

এ সকল কিতাবধারীদের সম্পর্কে কুরআন বলেছে। যারা আজ সত্য গোপন করছে, নিজেদের পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার জন্য দীনকে বিক্রি করছে। তাদেরকে এর চড়া মূল্য দিতে হবে। দীন বিক্রি করার বিনিময়ে অর্জিত দুনিয়া এতো আগুন ভিন্ন কিছু নয় ; যা

www.pathagar.com

তারা নিজেদের উদরে পুরছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না। এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। সেদিন তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি ভিন্ন কিছুই থাকবে না।

কিতাবধারীদের প্রতি ধিক্কার

আল্লাহর কথা না বলার তাৎপর্যতো পরিষ্কার। অর্থাৎ কোনোরূপ দয়া বা অনুগ্রহমূলক কথা বলবেন না। যেমন কোনো কাজ না করার অর্থ হচ্ছে, প্রকৃত কাজ না করা। এ পর্যায়ে অন্যত্র وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ "তিনি তাদের প্রতি তাকাবেন না" শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও দয়ার্দ্রভাবে না তাকানো বুঝানো হয়েছে। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে কিতাব ও শরীআত দেন এবং নিজের বার্তা পৌঁছাবার জন্য তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করেন, তখন ঐ নবীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ যেন তাদেরকে স্বীয় কথোপকথনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে থাকেন। বিশেষ করে বনী ইসরাঈলকে তো সম্মানও দিয়েছেন যে, তিনি তাদের নবীকে সরাসরি সম্বোধনের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ সুমহান মর্যাদা দানের দাবিতো এটাই ছিল যে, ইহুদীরা জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর দেয়া শরীআত ও তার বাণীর সম্মান করতো এবং সমাজের সর্বত্র তার প্রচার ও প্রসার করতো। কিন্তু তারা এর মর্যাদা বুঝতে ও তার প্রচার প্রসার করতে ব্যর্থই হলো না। বরঞ্চ এটাকে অপমান জ্ঞানে গোপন করার প্রয়াস পেল। এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে আবার সম্বোধনের মর্যাদা দানে ধন্য করবেন, তা কি করে সম্ভব?

"এবং তাদের পবিত্রও করবেন না"—অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাদের পবিত্র করার জন্যই নবুওয়াত ও কিতাব দানে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু এ নেয়ামতে ধন্য হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা ভ্রষ্টতা ও পুঁতিগন্ধময়তার মধ্যে ডুবে থাকতে পসন্দ করল, তখন আল্লাহ পরকালে তাদের পবিত্র করবেন না। আখেরাতে পবিত্র না করার তাৎপর্য এও হতে পারে যে, আখেরাত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জায়গাই নয়; এটাতো শাস্তি ও পুরস্কারের জায়গা। কাজেই ওখানে কারো পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নই ওঠে না। আর এও তাৎপর্য হতে পারে যে, তাদের ওসব দুষ্কর্মের দরুন যেহেতু তাদের ঈমান লোপ পেয়ে গেছে। তাই দোযখে শাস্তি ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগই তাদের থাকবে না; তাদের জন্য থাকবে চিরন্তন শাস্তির ব্যবস্থা এবং চিরকালে তারা তাতেই থাকবে।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী (স) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ভিক্ষুককেও এ আয়াতের অধীন সাব্যস্ত করেছে। এ হাদীস উক্ত আয়াতের তাফসীর নয়। তবে কারণের ঐক্যের জন্য আয়াতের হুকুমের আওতায় সম্প্রসারণের পর্যায়ভুক্ত।

আয়াত ঃ ১৭৫

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

www.pathagar.com

فَمَا اَصْبَرَ-এর বাকরীতি مَا اَحْسَنَ -এর মত বিস্ময় প্রকাশার্থে। তাৎপর্য এই যে, এরা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ও ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ফলে জাহান্নামের ব্যাপারে তাদের স্পর্ধা ও সাহস সত্যিই বিস্ময়কর।

আয়াত ঃ ১৭৬

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝

অসন্তোষের কারণ

এখানে ওই অসন্তোষ ও ক্রোধের কারণ বর্ণিত হচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এরা এজন্যই মহান আল্লাহর ক্রোধ ভাজনে পরিণত হবে যে, তিনি তাদের সত্য-সঠিক পথে আমার জন্য এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করলেন, যা সর্বপ্রকার বিতর্ক ও মতভেদের চূড়ান্ত অবসানকারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা হেদায়াতের পরিবর্তে বিপথগামীতাকে অবলম্বন করেছে। ফলে তারা অনন্তকালের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ-দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে ঐ শাস্তিতে পতিত হয়েছে, যা থেকে তাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

এখানে بِالْحَقِّ বা 'সত্যসহ'[১] শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ এ কিতাব অকাট্য বাণীসহ অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ কিতাবধারীরা সত্য গোপন ও পরিবর্তন করে আল্লাহর দীনে রকমারী মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছিল ; যদ্দরুন কোন্‌টি হারাম, কোন্‌টি হালাল, কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তা সনাক্ত করা কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ কুরআনের সাহায্যে উক্ত মতভেদ ও বিতর্কের সম্পূর্ণ অবসান করে দিলেন। এক্ষণে সত্যের পথ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানীর নিকট দেদীপ্যমান এবং খোদায়ী বিধান তার নিজস্ব সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ অবয়বে সবার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে। এরপরও যারা ওসব ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবে, তারা চরম দুর্ভাগা, বৈ নয়।

شِقَاق মানে বিরোধিতা ও এক গুঁয়েমী। যেমন বলা হয়েছে ঃ يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ الاية - هود : ٨٩ "হে আমার সম্প্রদায়। আমার বিরোধিতা ও শত্রুতা যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এ পর্যায়ে ঠেলে না দেয়। যাতে তোমাদের ওপর সেই ধরনের বিপদ আপতিত হবে। যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের ওপর।"–সূরা হূদ ঃ ৮৯। شِقَاق এর সঙ্গে بَعِيْد এর গুণ বাচক শব্দ যুক্ত হলে তার অর্থ দাঁড়ায়—কোনো ব্যক্তি ও বস্তুর বিরোধিতা ও শত্রুতায় কারো এতোটা অগ্রসর হওয়া ও এতো দূরে চলে যাওয়া যে, সে তার নিজের লাভ-ক্ষতিরও তোয়াক্কা করবে না। এবং অতদূর থেকে ফিরে আসা এবং অতীত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করার কোনো

১. حَقّ শব্দের বিভিন্ন অর্থের বিশ্লেষণ ৭১ আয়াতে করা হয়েছে। এখানে এর অর্থ– অকাট্য বাণী।

www.pathagar.com

সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকবে না। উক্ত কিতাবধারীদের সম্পর্কে বলেছেন, তাওরাতের পরে কুরআনেও এরা যে মতভেদের সৃষ্টি করেছে এটা তাদের নিছক হঠকারিতা বৈ নয়। তাদের এ বিরোধিতা এতদূর গড়িয়েছে যে, তাদের প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই।

৫৪. অনুমতি ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিকোণ

১৭৩ আয়াত فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, এটা ওই ব্যক্তির জন্য কোনো হারাম বস্তু দ্বারা সামষ্টিকভাবে উপকৃত হওয়ার অনুমতি, যার ক্ষুধার তাড়নায় জীবনাবসানের আশংকা দেখা দেয় এবং হারাম খাওয়া ছাড়া জীবন রক্ষার জন্য তার সামনে আর কোনো উপায় বর্তমান না থাকে। কুরআনের শব্দ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ (এমতাবস্থায় তার জন্য কোনো গুনাহ নেই) এবং اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) পরিষ্কার জানান দিচ্ছে যে, এটা একান্ত নিরুপায় অবস্থার জন্য একটা অনুমতি। এজন্যই আমরা ঐ সকল ফিক্‌হ-শাস্ত্রবিদদের মতামত সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ যারা এ অনুমতিকে বাধ্যবাধকতার আসন দিয়ে থাকেন ; এবং যে অনন্যোপায় পরিস্থিতিতে হারাম দ্বারা উপকৃত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাকে আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন।

ইতোপূর্বে আমরা এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপরোক্ত ধারণাটি আমাদের মতে সঠিক বলে মনে হয় না। অনুমতি সর্বাবস্থায়ই অনুমতি। কোনো অনুমতি শর্তহীনভাবে বাধ্যবাধকতার আসন কিভাবে পেতে পারে ? কেউ যদি অনন্যোপায় হওয়া সত্ত্বেও হারাম দ্বারা উপকৃত না হয় এবং তার মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়, তবে কি তার এ মৃত্যুকে হারাম মৃত্যু বলে অভিহিত করা যাবে ?

এতে সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ স্বীয় দীনে যেসব অনুমতি ও অব্যাহতির সুযোগ রেখেছেন তার সবই তাঁর অপার রহমত ও উদারতার পরাকাষ্ঠা বৈ নয়। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। এ কারণে তিনি আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা বা দায়িত্ব চাপাননি যা আমাদের সাধ্যের অতীত। তিনি অযুর বিধান দিয়েছেন। একই সঙ্গে এ অনুমতিও দান করেছেন যে, ভ্রমণরত অবস্থায়, পানি দুষ্প্রাপ্য হলে কিংবা রোগজনিত কারণে অযু দ্বারা ক্ষতির আশংকা হলে—তায়াম্মুম করে নিলেই চলবে। তিনি নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে এ অনুমতিও দিয়েছেন, সফরাবস্থায় কসর করা যাবে। অনুরূপ তিনি রোযার নির্দেশ দিয়েছেন। তার সঙ্গে এ অনুমতিও দিয়েছেন যে, রোযার মাসে কেউ সফর করলে কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অন্য সময়ে ঐ রোযা পূর্ণ করে নেবে। এমনিভাবে দীনের ঐসব বিধানের বেলায়ও অনুমতি অব্যাহতির এ সুযোগ রাখা হয়েছে যেগুলোর অনুশীলনে কোনো না কোনো পর্যায়ে এরূপ অসুবিধা হতে পারে যা সাধারণ সহ্য-ক্ষমতার অতীত। ওসব বিধানের

www.pathagar.com

বেলায় এটাই সঠিক কর্মনীতি যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে যেন কেউ তা থেকে উপকৃত হতে এবং আবেগের বশে তাকে বাধ্যতামূলক বানিয়ে খামোখা নিজের জীবনকে কষ্ট ও দুর্ভোগের সম্মুখীন করে না দেয়। কেউ যদি ক্ষতির আশংকা সত্ত্বেও তায়াম্মুমের পরিবর্তে অযু করার ওপর জেদ ধরে, কষ্ট সত্ত্বেও সফরাবস্থায় পূর্ণ নামায পড়াকেই তাকওয়ার দাবি বলে বিবেচনা করে কিংবা কষ্ট হলেও মুসাফিরী অবস্থায় রোযা পূর্ণ করাকে বাধ্যতামূলক জ্ঞান করে। তবে আমাদের মতে এরূপ ব্যক্তি ইসলামের প্রকৃত প্রাণশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে অপারগ। এটাই দীনের ব্যাপারে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির নীতির অনুসরণ। যে দীনের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করবে এবং অনুমতিকে দীনের ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিপন্থী মনে করবে সেতো প্রকৃতপক্ষে দীনের সাথে লড়াই করছে। হাদীসে এসেছে, এরূপ লোক দীনের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য। মহানবী (স) সফর অবস্থায় রোযা রেখে নিজেকে কঠোর অবস্থায় নিক্ষেপকারী এক ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তবে সফরাবস্থায় সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকলে এবং বিশেষ কোনো কষ্ট না হলে কেউ পূর্ণ নামায পড়তে ও রোযা পালন করতে সক্ষম হলে সে পাপী ও গুনাগার হবে—এটা কিরূপে বলা যেতে পারে ?

একইভাবে কেউ নিরূপায় অবস্থার সম্মুখীন হলে এবং হারাম খাওয়া ভিন্ন জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়লে সাধারণভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর দাবি হলো, জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত হারাম বস্তু থেকে সে উপকৃত হতে পারবে। এটাকে তাকওয়ার পরিপন্থী বা দীনী দৃঢ়তার বিপরীত ভাবার কোনো কারণ নেই কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতি সর্বদা এক রকম নাও হতে পারে। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমানের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এমনও হতে পারে যে, সে জীবন বিপন্ন করে দেবে ঠিকই ; কিন্তু কোনো হারাম বস্তু স্পর্শ করাও পসন্দ করবে না। ধরা যাক, কোথাও পাপী অপরাধীদের ক্ষমতা-অধিপত্যের অধিকারী হওয়ার দরুন হালাল-হারামের বোধ ও বিবেচনা বিলোপ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে লোকদের হারাম বস্তু থেকে বাধ্য করা হলে দীনী দৃঢ়তার নীতি অবলম্বন করাই এবং অন্যান্যদের ঈমানকে সঞ্জীবিত করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়াই হবে তার ঈমানের দাবী। এ ত্যাগ ও কুরবানী করে সে গুনাহগার হবে না। বরং আল্লাহ চাহেতো নিজের ঈমানী মর্যাদাবোধ ও খোদায়ী শরীআতের অধিকারের প্রতি সম্মান দানের বিনিময়ে শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করবে। অন্ততপক্ষে উলামা ও সমাজ-সংস্কারকদের তো এমতপরিস্থিতিতে এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়। মক্কার প্রাথমিক দিনগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম কালেমায়ে তাওহীদের জন্য যে কষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তা কারো অজানা নয়। কত সাহাবীইতো তাওহীদের শত্রুদের হাতে শাহাদাতের পিয়ালায় চুমুক দিয়েছিলেন। সকলের জীবনই বিপন্ন ছিল। তাদের মধ্যে কোনো একজন সাহাবী সম্পর্কেও আমাদের নিকট এরূপ তথ্য পৌঁছেনি যে, জীবন রক্ষার জন্য তিনি কখনো কুফরী বাক্য উচ্চারণ করেছেন। অথচ পরিস্থিতি বাধ্য করলে জীবন বাঁচাবার জন্য মুখে কুফরীর বাণী উচ্চারণ করা যাবে বলে কুরআনে স্পষ্ট অনুমতি ছিল।

www.pathagar.com

এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, দীন প্রদত্ত অনুমতিগুলোকে হেয় জ্ঞান করার প্রবণতা যেমন সঠিক নয়, তেমনি অনুমতিসমূহকে বাধ্যবাধকতায় রূপান্তরিত করার প্রবণতাও যথার্থ নয়। বরঞ্চ সঠিক ও যথার্থ কর্মনীতি হলো, সাধারণ অবস্থায় 'অনুমতি'—এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যেমন শরঈ ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তেমনি বিশেষ অবস্থায় দীনি দৃঢ়তার চাহিদার ওপর আমল করাও দীনের দাবি।

৫৫. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭৭ আয়াত

দীন নিছক কতিপয় প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়

আমরা লক্ষ করেছি, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। পরের আয়াতে তাওহীদ সংক্রান্ত জরুরী উপাদান, ফলাফল তথা ঈমান, আল্লাহর পথে ব্যয়, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, প্রতিশ্রুতি পূরণ করা এবং সর্বাবস্থায় সত্যের ওপর টিকে থাকার বিষয়ে আলোচনা আসছে। সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের সূচনা হয়েছে এভাবে যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাবার দ্বারাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার হক আদায় হতে পারে না ; যেমনটি ইহুদী ও খৃস্টানরা ধরে নিয়েছে। ফলে এ নিয়েই তাদের মাঝে চলে আসছে এক দীর্ঘকালীন লড়াই-ঝগড়া। যেন তাদের দৃষ্টিতে এটাই প্রকৃত দীন। বরং প্রকৃতপক্ষে দীনের জন্য অমুক অমুক জিনিস অপরিহার্য। এ ভূমিকার দ্বারা মুসলমানদেরকে এটাই জানানো উদ্দেশ্য যে, দীন নিছক কতিপয় প্রথা-পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতারই নাম নয়। বরঞ্চ দীন হচ্ছে জীবনের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত কতিপয় কাজ ও চরিত্রের সমষ্টি। এ কারণে তাদের পূববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় নিছক প্রথা-পদ্ধতির অনুসারী হয়ে না পড়া উচিত। তাদের উচিত দীনের মূলতত্ত্ব ও প্রকৃত প্রাণ শক্তিকে গ্রহণ ও পালন করা, যা নিম্নে আলোচিত হচ্ছে। এগুলোকে জীবন দিয়ে গ্রহণ করার মাধ্যমেই তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার হক আদায় করতে সক্ষম হবে। এতদ্ভিন্ন মুহব্বত ও বিশ্বস্ততার দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এরই আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى
الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ

بَعْهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরালেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা দেখানো হবে না। বরং আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা দেখানো হবে তখনই যখন কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তা আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করে। নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করে। বিশেষ করে যারা অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই খাঁটি মুত্তাকী।

৫৬. শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ

بِرٌّ-এর অর্থ

আরবী অভিধানে بِرٌّ এর প্রকৃত অর্থ কারো হক বা অধিকার পূরণ করা, চাই তা আল্লাহর হক হোক বা আল্লাহর বান্দাদের হক হোক এ মৌল হক ও অধিকারসমূহ ছাড়াও ওইসব হক পূর্ণ করাও এর অর্থে শামিল রয়েছে যা পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, কথা দেয়া, শপথ এবং চুক্তি ও কসমের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। শব্দটির এ ব্যাপকতার কারণে সুবিচার ও পরোপকারের অধীন যাবতীয় সৎকর্মও এর মাঝে একত্রিত হয়ে যায়। بَارٌّ ও بَرٌّ এর গুণবাচক শব্দ। بَرٌّ بِوَالِدَيْهِ ওই সৌভাগ্যবান সন্তানের বেলায় বলা হয় যে তার পিতা-মাতার অনুগত এবং পূর্ণরূপে তাদের অধিকার আদায় করে থাকে। بَرَّ بِالْقَسَمِ -এর অর্থ সে তার শপথ পূর্ণ করে দিয়েছে।[১] মহান আল্লাহর জন্যও بَرٌّ -এর গুণাচক শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তার বান্দাদের যেসব অধিকার নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন বা যেসব প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছেন পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে পর্যায়ক্রমে তিনি তা পূর্ণ করবেন। এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, অধিকার ও কর্তব্য, ভালো ও সৎকর্ম সবই এ শব্দের তাৎপর্যে নিহিত আছে। শব্দের এ ব্যাপকতার দরুন শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ ও ব্যঞ্জনা-সম্বলিত প্রতি শব্দ আমাদের ভাষায় খুঁজে পাইনি। আমরা অনুবাদে যে শব্দটি ব্যবহার করছি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা তা আমাদের মতে শব্দের ব্যঞ্জনা অনেকটা ধারণ করতে সক্ষম।

১. بِرٌّ শব্দের এ বিশ্লেষণ প্রধানতঃ মাওলানা ফারাহী (র)-এর মুফরাদাতুল কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এখানকার মূল আলোচ্য বিষয়তো ঈমান, আল্লাহর পথে ব্যয়, নামায ও যাকাত। কিন্তু ভূমিকাতে আমরা যেমনটি বলে এসেছি—এসব বিধি-বিধানের পাশাপাশি ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বার্থে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানে কিতাবধারী ও অংশীবাদীদের সৃষ্ট যাবতীয় বেদআতের খণ্ডন ও মূলোৎপাটনও এ আলোচনার লক্ষ। যদ্দরুন গোটা শরীআত সম্পূর্ণ বিকৃত অথবা কতিপয় প্রথা-পদ্ধতি ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল। ইসলামের সংস্কার আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী মূল বিধি-বিধান আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের দাবি নিছক পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতেই পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃত জিনিসতো হলো আমল ও চরিত্র। খোদায়ী শরীআত এরই শিক্ষা দিয়েছে। এখানে ইহুদী ও খৃস্টানদের সমালোচনাই উদ্দেশ্য ; যারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাসমূহের পাট চুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিবলার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিমের ঝগড়ায় ছিল, সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। ইতোপূর্বে আমরা ১১৫ ও ১৪২ আয়াতে তার আলোচনা করেছি। তারা এ ব্যাপারে এতই মুখর ছিল, মনে হচ্ছিল যেন গোটা দীন এরই ওপর নির্ভরশীল।

এ উম্মতের জন্য একটি সতর্কবাণী

ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, এই ভূমিকাটুকু আসলে এ উম্মতের জন্য একটি সতর্কবাণী অর্থাৎ এ ধরনের ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করে মূল দীন থেকে যেন ছিটকে পড়ো না এবং ইহুদী-খৃস্টানদের ন্যায় মশা বাছতে গিয়ে হাতী গিলে বসো না। অন্যথায় তোমাদের খোদাভক্তিও তাদের ন্যায় অর্থহীন খোদাভক্তির দাবিতে পর্যবসিত হবে। ঠিক একই অর্থের সতর্কবাণী এসেছে পরবর্তী হজ্জ সম্পর্কিত আয়াতে وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى - البقرة : ١٨٩ "পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো কল্যাণ নেই কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহর দেয়া সীমাকে সম্মান করে সাবধান হয়ে চললে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৯। এ সকল সতর্কবাণীর একটাই উদ্দেশ্য আর তাহলো, ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের বেদআত ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা থেকে এ উম্মতকে উদ্ধার করে মূল দীনের প্রতি নিবিষ্ট করে দেয়া। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় হলো, এ উম্মতও ঠিক সেই উপত্যকায় ঘুরপাক খাচ্ছে—যেখানে পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

"وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ" বাক্যাংশে আরবী ভাষায় সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি সম্বন্ধবাচক শব্দ উহ্য আছে। যেমন বাক্যটি হবে এরূপ ঃ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ এরূপ সম্বন্ধবাচক শব্দ বিলোপ করার নজির ঠিক আলোচ্য আয়াতেই বর্তমান রয়েছে। وَفِى الرِّقَابِ বাক্যাংশটি মূলত وَفِى فَكِّ الرِّقَابِ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এটাতো জানা কথা।

www.pathagar.com

ঈমান ও তার অংশসমূহ

পূর্বাপর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ঈমান বলতে প্রকৃত ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত ঈমানের সাহায্যেই কেউ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততার হক আদায় করতে সক্ষম। শিরকের ন্যূনতম ছিটেফোটা ব্যতিরেকে নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সোর্পদ করে দেয়াই হল আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান। মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়কে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেয়াই আখিরাতের প্রতি খাঁটি ঈমান। নিজের প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং সকল মিথ্যা ও অলীক সুপারিশের ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে—এটাই পরোক্ষ বিশ্বাসের মূলকথা। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের অর্থ, তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, তাদের নিষ্পাপ ও পবিত্রাত্মা বলে জ্ঞান করা, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের বার্তাবাহক, বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য এবং ভাগ্য ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার ফায়সালা কার্যকর করার মাধ্যম বলে মেনে নেয়া। কিতাবের প্রতি ঈমানের অর্থ, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হেদায়াত গ্রন্থ ও সত্য-মিথ্যার মানদণ্ডরূপে মেনে নেয়া এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার পথনির্দেশনার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা। নবীদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, সত্য-সঠিক পথের দিশা দানকারী অবশ্য-মান্যরূপে মেনে নেয়া, তাদের জ্ঞানকে নির্ভুল জানা, তাদের কাজকে জীবনের জন্য আদর্শ নমুনা বলে স্বীকার ও তার আনুগত্য করা এবং তার অনুসরণ ও মুহাব্বতকে অবশ্য কর্তব্য মনে করা।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

এখানে একটি বিষয় কারো কারো মনে হয়তো কিছুটা খটকার সৃষ্টি করতে পারে। তাহলো ঈমানের শাখা-প্রশাখার মধ্যে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানকে কেন স্থান দেয়া হলো ? তাদের সম্পর্কিত ধারণা-অভিজ্ঞতা শুধু নবীদেরই রয়েছে এবং তাদের প্রতি ঈমান আনার কোনো বিশেষ জ্ঞান ও কর্মগত উপকারিতা একজন সাধারণ মানুষের বেলায় অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। এর জবাব হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা যেরূপ আখেরাত, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনা ভিন্ন পূর্ণাঙ্গ হয় না ; এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আমাদের জীবনে এক অনুভবযোগ্য, প্রভাবশীল ও কার্যকর সত্য হয়ে ওঠে। তদ্রূপ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানও কিতাবের প্রতি ঈমান ও রাসূলগণের প্রতি ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অংশ। ফেরেশতাদের স্বীকৃতি ভিন্ন আল্লাহ ও নবীদের মধ্যস্থ সূত্র অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট থেকে যায়। আর এটি অস্পষ্ট থাকলে জ্ঞান ও হেদায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ই শুধু চোখের আড়ালে থেকে যাবে না ; বরঞ্চ ঐশী হেদায়াতের ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হওয়ার রকমারী পথও খুলে যাবে। এটাতো চিরকালই মানুষ স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ আছেন আর এটাও সর্বদা অনুভূত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, তিনি যখন আছেন তখন তার ইচ্ছা-অভিপ্রায় তার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের অবগত করাতে হবে। তিনি যখন দৃশ্যমান হয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন না, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে,

www.pathagar.com

সে উপায় ও মাধ্যমটি কি যার সাহায্যে তিনি তার বিধান ও হেদায়াত জানিয়ে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে, অবশ্য তিনি তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের নবী ও রাসূলরূপে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ সকল নবী-রাসূলকে তাঁর ইলম ও হেদায়াত সম্পর্কে জানাবার কি উপায় অবলম্বন করেছেন ? তিনি কি নিজে সামনা-সামনি তাদের সাথে কথা বলে থাকেন ? নাকি অন্য কোনো মাধ্যম অবলম্বন করেন ? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর নবীদের মধ্যে ইলমের মাধ্যম হলো অহী, যা তিনি তার ফেরেশতাদের মাধ্যমে বিশেষ করে তার নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকেন। এ সকল ফেরেশতা তার সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাদেরকে এ যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে অহী গ্রহণ করতে সক্ষম। তারা সর্বদা তাদের পালনকর্তা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকেন। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর হুকুম পালন করেন। আল্লাহর হুকুম ও ক্ষমতার অধীনে এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে কাজ করার দরুন অন্য কোনো সৃষ্টি তাদের কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না এবং নিজেরাও তাতে কখনো কোনো ভুল ও বিস্মৃতির শিকার হন না। তাদের মধ্যকার এক অসাধারণ সত্তা হযরত জিবরাঈল (আ); যিনি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও নৈকট্য প্রাপ্ত। কুরআনে তাঁকে 'মহাশক্তিধর, 'সর্বজন-মান্য ও 'পরম বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা পালন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তার মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান। অন্যান্য শক্তি বা কুপ্রাসমূহ তাকে প্রভাবিত কিংবা পরাজিত করতে অক্ষম। তার ব্যবস্থাপনার অধীনে সবাই স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দে তার নির্দেশ মেনে চলে। তার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারো নেই। নবী ও রাসূলগণের কাছে পৌছাবার জন্য আল্লাহর অহীর যে আমানত তাদের নিকট অর্পণ করা হয় তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পৌছে দিয়ে থাকেন ; তাতে একটি জের যবর-এর পার্থক্য হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অহী ও রেসালাতের সাথে ফেরেশতাদের এ নিগূঢ় সম্পর্কের কারণে নবীগণ ও কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার জন্য তাদের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। তারা আল্লাহ এবং নবী ও রাসূলদের মধ্যে রেসালাত তথা বার্তাবাহকের গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন। এটা এদিক থেকেও অপরিহার্য যে, এঁরা এমন এক সৃষ্টি যারা এ জড়-জগত ও উর্ধজগতের সাথে সমান সম্পর্ক রাখেন। এঁরা নিজেরা জ্যোতির্ময় হওয়ার দরুন আল্লাহর জ্যোতি ও প্রতাপ বহন করার ক্ষমতা রাখেন। অপরদিকে আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি হওয়ার জন্য মানুষের সাথেও যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারেন। ফেরেশতা ভিন্ন আর কোনো সৃষ্টি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার এ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী নয়। এ কারণেই নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে ঐসব বার্তা-বাহকদের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলদের মধ্যে দৌত্যকাজের মাধ্যম।

এ প্রসঙ্গে এ গূঢ় তত্ত্বটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মানবীয় বিবেকবুদ্ধি উর্ধজগতের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন সব আত্মার অন্বেষণ সর্বদাই করে এসেছে। তারা এ জিনিসটির

প্রয়োজনীয়তা এতই প্রবলভাবে অনুভব কর এসেছে যে, এ পর্যায়ে কোনো সঠিক ও যথার্থ জিনিস হস্তগত না হয়ে একান্ত ভুল ও অবাস্তব জিনিস হস্তগত হলেও তারা সেটাকে আঁকড়ে ধরেছে। আরবের গণক যাদুকররা জিন, শয়তান ও অদৃশ্য আত্মাদেরকে ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম বা উপায় বলে মনে করত। ভারতের জ্যোতিষী ও গণকরা তারকারাজির আবর্তনের মধ্যে অদৃশ্যজগতের রহস্যবাণী অনুসন্ধান করে বেড়াত। চীনের মন্দিরের পূজারীরা তাদের পিতৃপুরুষের আত্মার মাধ্যমে অদৃশ্যজগতের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করত। কুরআন এ জাতীয় সকল মিথ্যা ও অলীক উপায় ও মাধ্যমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো এবং এ উপায়ে লব্ধ সকল তথ্যাবলীকে জগা-খিচুড়ি ও অনির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছে। একই সাথে এ তথ্যও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ঐশী জ্ঞানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হল ফেরেশতাকুল ; যারা নবীদের নিকট আগমন করেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তা ও বাণী অক্ষরে অক্ষরে তাদের নিকট পৌছে দিয়ে থাকেন।

এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, কিতাবের প্রতি ঈমান এবং নবীদের প্রতি ঈমান-এর প্রত্যেকটিই পরস্পর সম্পর্কশীল। কিতাবের প্রতি ঈমান ও নবীদের প্রতি ঈমান যেমন আমাদের জীবনের একান্ত অনুভবযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, তেমনি ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানও আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও বাস্তব সত্য।

عَلٰى حُبِّهٖ এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ঃ এর মধ্যে সম্বন্ধ বাচক অব্যয়টি (ہ) দ্বারা আল্লাহর দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর মহব্বতের পথে অর্থব্যয় করে। কিন্তু আমাদের মতে—যারা এদ্বারা মাল বা সম্পদকে বুঝিয়েছেন—বিভিন্ন কারণে তাদের বক্তব্যই অগ্রাধিকারযোগ্য। অর্থাৎ মানুষ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

'সম্পদের প্রতি ভালোবাসা'র বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সম্পদ মূলতই মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কারো নিকট সম্পদের প্রয়োজনটা এতই তীব্র হতে পারে যে, তাকে অন্যের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া তার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক। তৃতীয়ত, দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যের সময় হওয়া ; যখন একান্ত উদার ও দানশীল ব্যক্তিও সাবধানী ও মিতব্যয়ী হয়ে পড়ে। عَلٰى حُبِّهٖ শব্দদ্বয়, এ তিন অবস্থার সাথেই প্রযোজ্য। কয়েকটি কারণে আমরা এ অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি ঃ

একটি কারণ এই যে, কুরআনের অন্যান্য দৃষ্টান্তের আলোকে এ অর্থটিই অগ্রাধিকারযোগ্য বিবেচিত হয়। এটা তো স্পষ্ট, এখানে বলা হচ্ছে যে, بِرٌّ তথা আল্লাহর আনুগত্য ও তার প্রতি বিশ্বস্ততার সমুচ্চ মর্যাদা হাসিল করার জন্য কি ধরনের অর্থব্যয় করা কর্তব্য। এ বিষয়টি অন্যান্য যেসব জায়গায় আলোচিত হয়েছে, সেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটাও বলা হয়েছে যে, এ মর্যাদা প্রিয়তম সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমেই অর্জন

www.pathagar.com

করা সম্ভব। যেমন ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ - ال عمران : ٩٢ "তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের মমতার জিনিস ব্যয় কর, পূর্ণ বিশ্বস্ততার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২। অন্যত্র খাঁটি ঈমানদারের সংজ্ঞা ও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - الحشر : ٩। "তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"–সূরা হাশর ঃ ৯

দ্বিতীয়ত, মহানবী (স)-এর বাণী সম্ভারও এরই পোষকতা করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সর্বোৎকৃষ্ট দান কোন্‌টি ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কষ্টার্জিত উপার্জন তার এমন কোনো আপনজনকে দান করা, যে অন্তরে তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

তৃতীয়ত, আরববাসীদের দৃষ্টিতেও সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য দানশীল তাদেরকেই মনে করা হত যারা দুর্মূল্য দুর্ভিক্ষাবস্থায় দান করতো ; যখন ধনবানদের নিকটও ধন-সম্পদ অতিশয় প্রিয় হয়ে পড়তো। আরব কবিরা সর্বসম্মতভাবে এ গুণের প্রশংসা করেছে। অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতেও সাধারণভাবে এগুণটি প্রশংসনীয়।

চতুর্থত, এ জাতীয় ব্যয় প্রধানত আল্লাহর মুহাব্বত ও ভালোবাসা বশেই হয়ে থাকে। কারণ, এহেন শক্তিশালী উদ্বোধক ভিন্ন কারো পক্ষে এ জাতীয় উদারতা প্রদর্শন করা বড়ই সুকঠিন। এদিক থেকে এ তাৎপর্য প্রথমোক্ত তাৎপর্যকে আপনা-আপনি শামিল করে নেয়।

দানের খাতসমূহ

অর্থব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে নিকটাত্মীয়দের সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেল, কারো আপনজন ও আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্ত হলে, তারাই তার দান পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য হকদার। যদি তারা তাদের অন্তরে শত্রুতাও লুকিয়ে রাখে তবু তাদের জন্য ব্যয়িত অর্থই সর্বোৎকৃষ্ট দান রূপে গণ্য হবে—যেমনটি উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

নিকটাত্মীয়দের পর পর এতিমদের উল্লেখ দ্বারা ইসলামী সমাজে তাদের মর্যাদা ও স্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তা হলো, আপনজনদের পর কারো দৃষ্টি সর্বাগ্রে ওইসব শিশুদের প্রতি পড়া উচিত যারা পিতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে ; যাদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার সম্পূর্ণ গুরুদায়িত্ব সমাজের ওপর অর্পিত ও স্থানান্তরিত হয়েছে।

اِبْنَ السَّبِيْلِ বলতে মুসাফির বা পর্যটককে বুঝানো হয়েছে। মুসাফির তার পর্যটনরত থাকার জন্যই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য চাই সে সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল। যদি দান পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য অসচ্ছল হওয়া শর্ত হতো, তাহলে 'মিসকীন'-এর পর আলাদাভাবে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ত না।

www.pathagar.com

سَـآئِلِيۡنَ (সাহায্য প্রার্থী) বলতে যারা সাহায্যের জন্য যাচ্ঞা করে বসে তাদের বুঝানো হয়েছে। অভাবগ্রস্তদের পর আলাদাভাবে তাদের উল্লেখ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, কেউ যাচ্ঞা করে বসলে তার ব্যাপারে অতোটা খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন নেই, প্রকৃতই সে অভাবগ্রস্ত কিনা। অপ্রয়োজনে সাহায্যপ্রার্থী হলে আল্লাহর নিকট তাকেই তার জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকুন যে, সক্ষম হলে আমরা তাকে সাহায্য করব। আর অক্ষম হলে ভদ্রভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে দেব।

وَفِى الرِّقَـابِ -এতে رِقَـابِ শব্দটি رَقَبَـه -এর বহুবচন। অর্থ ঘাড়। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, এখানে সম্বন্ধবাচক একটি শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ : فِىۡ فَـكِّ الرِّقَـابِ ; ঘাড় বলতে এখানে ক্রীতদাসদের ঘাড় বুঝানো হয়েছে। তাদের দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করা ও স্বাধীন মানুষের কাতারে নিয়ে আসা মানবতার সর্বোচ্চ সেবা। এ কারণেই ইসলাম কল্যাণের ফল্গুধারায় এটিকেও শামিল করে নিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, দাসত্বের ব্যাপারটি ইসলামের কোনো অংশ ছিল না। সমসাময়িক সমর-আইনের অধীনে ইসলাম নিছক সাময়িকভাবে এটাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধবন্দী সমস্যার অপর কোনো সমাধান বর্তমান ছিল না। কিন্তু এটাকে মেনে নেয়ার সাথে সাথে ইসলাম তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের ক্রীতদাসদের বিভিন্ন উপায়ে দাসত্বের শৃংখল-মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে, ক্রীতদাসদের ক্রয় করে মুক্তিদান করা অথবা মুক্তির লক্ষে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ আদায়ের চুক্তি করাকে ইসলাম একটি সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করেছে।

এ যুগে আইনগতভাবে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে বলা বাহুল্য এটা মূলত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা—বিশেষত সুদী ঋণের অভিশাপে এমন সব বিধি বন্ধনের অক্টোপাশে জড়িয়ে পড়েছে। অথবা কারাগারে বন্দী রয়েছে যে, তাদেরকে ক্রীতদাস কিংবা প্রায় ক্রীতদাস আখ্যা দেয়া যায়। এ শ্রেণীর লোকদের এ অভিশাপ থেকে মুক্তিদান এবং তাদের বন্ধকী বাড়ী-ঘর ও ক্ষেত-খামারকে ছাড়িয়ে দেয়াও আল্লাহ চাহে তো দাস মুক্তির সওয়াব ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

নামায ও যাকাত

اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ : অর্থাৎ নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের উল্লেখের পর নামায ও যাকাতের উল্লেখ, আসলে এতদুভয়ের আইনগত ও কার্যত বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দান করে। ঈমানের সুমহান তত্ত্বের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ—নামায। অর্থব্যয়ের ব্যাপক ধারণার আইনগত বাস্তব রূপ হল যাকাত। উভয়টির উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, ঈমান ও অর্থ ব্যয়ের বাস্তব সাক্ষ্যদানের জন্য নূন্যতম যা প্রয়োজন তাহল নামায ও যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা। এ দুটি জিনিস অন্তর্হিত হওয়ার অর্থ হলো, ঈমান ও ইনফাকের দাবিই অসার। বলাবাহুল্য, এ দুটো জিনিসই স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে বান্দার সম্পর্ককে সঠিক মানে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

এখানে পৃথকভাবে যাকাতের উল্লেখ দ্বারা এ সত্যও প্রতিভাত হলো যে, ওপরে উল্লিখিত 'ইনফাক' এ আইনগত যাকাত-বহির্ভূত। আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততা ও তাকওয়ার মর্যাদা কেবলমাত্র যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয় না ; বরঞ্চ গোপনে ও প্রকাশ্যে (سِرًّا وَّعَلَانِيَةً) উদারভাবে অর্থব্যয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে।

বাক পদ্ধতির পরিবর্তন

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ঃ (এবং তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে থাকে) এখানে এসে আকস্মিকভাবে কথার ধরন পাল্টে গিয়েছে। ওপরে ঈমান, ইনফাক, নামায ও যাকাত কাজরূপে উল্লিখিত হয়েছিল। اَلْمُوفُونَ একই ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হলেও এটি কর্তৃবাচ্যে ও গুণবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। অতপর اَلصَّابِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ (সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণকারী) বাক্যটি আসছে। এটিও পূর্বানুরূপ কর্তৃবাচ্যে গুণবাচক শব্দ হলেও "مُوفُونَ" বাকরীতিতে صَابِرُوْنَ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়েছে- صَابِرِيْنَ অর্থাৎ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রমতে نَصَبْ -এর অবস্থায় তথা কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাকরীতির এ পরিবর্তন কেবল মাত্র বৈচিত্রের জন্য নয়। বরঞ্চ এর কিছু অর্থগত উপকারিতাও রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটির প্রতি আমরা ইঙ্গিত করব। আরবী ভাষার ছাত্রদের এটা জানা আছে যে, আরবীতে ক্রিয়াবাচক শব্দাবলী নিছক কোনো কাজ সংঘটিত হওয়াকে প্রকাশ করে। কিন্তু কর্তৃবাচ্যের সীগা বা শব্দ কোনো স্বতন্ত্র গুণ, কোনো স্বভাব-প্রকৃতি এবং কোনো নৈপুণ্যকে প্রকাশ করে। বরং তার মধ্যে একটা দৃঢ় সংকল্পের দিকও উহ্য থাকে। অধিকন্তু বিজ্ঞজনের নিকট এটাও অজানা নয় যে, কথার ধারাবাহিকতায় গুণবাচক কোনো শব্দের উল্লেখ যদি কোনো বাহ্য-কারণ ভিন্ন نَصَبْ -এর অবস্থায় আসে, তার তাৎপর্য হলো, বক্তা তার ওপর জোর দিতে চাচ্ছেন। আমাদের আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদরা এটাকে عَلَى سَبِيْلِ الْمَدْحِ (বা প্রশংসাচ্ছলে) এবং عَلَى سَبِيْلِ الْاِخْتِصَاص (বা বিশেষ করণার্থে) এর পরিভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন। যেমন এখানে مُوفُونَ এর পরে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ভিন্ন বাকরীতিতে اَلصَّابِرِيْنَ শব্দটি এসেছে। এতে এর অর্থে আধিক্য প্রযুক্ত হয়েছে। যেন বক্তা বলতে চাচ্ছেন ঃ اَنَا اَخُصُّ بِالذِّكْرِ اَلصَّابِرِيْنَ। অর্থাৎ আমি বিশেষভাবে ধৈর্যশীলদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

বাকরীতির এ বিশ্লেষণের পর এক্ষণে মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, ওপরে আকীদা ও ইবাদাতের বিষয় তো সরল-সহজ ক্রিয়া-বাচক শব্দে আলোচিত হলো। কিন্তু পরক্ষণে 'প্রতিশ্রুতি পূরণ' ও 'ধৈর্যধারণে' এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে, বাকরীতির পরিবর্তন করে করে এহেন গুরুত্ব বিশেষত্ব এবং জোর ও তাগিদ সহকারে বলা হলো ? এর জবাবে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

www.pathagar.com

দীনের ব্যাপারে চরিত্র ও কর্মের গুরুত্ব

প্রথমত, উপরিউক্ত দুটি জিনিসই চরিত্র ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। চরিত্র ও কর্ম সর্বদাই অতীব দৃঢ় সংকল্প এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও প্রশিক্ষণ দাবি করে। বাহ্যিক আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদাত বন্দেগীর ব্যাপারটাই এমন যে, দীনের অবনতি ও চরম অধঃপতনের পরও এর ওপর টিকে থাকার মত অনেক লোক খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু দীনের সার ও মূল প্রাণশক্তি যে চরিত্র এটা অনেক বড় ও মহৎ ব্যক্তিত্বের মাঝেও পাওয়া যায় না। ধার্মিক লোকদের এ দুর্বলতা বরাবরই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, আকীদা-বিশ্বাস ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা অনেক বড় বড় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কর্ম ও চরিত্র নির্মাণে তাঁরা খুব সামান্যই মনোযোগ দিয়েছেন। এখানে যেহেতু শেষ নবীর উম্মতকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের মর্যাদার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, এ কারণেই চরিত্র ও কর্মের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হচ্ছে যে, এ মর্যাদা উচ্চ স্তরের কর্মনৈপুণ্য ভিন্ন অর্জন করা সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পূরণ ও ধৈর্য্য ধারণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, চিন্তা করলে দেখা যাবে, উন্নত কর্ম ও চরিত্র নির্মাণই হচ্ছে সকল আকীদা ও ইবাদাতের মূল লক্ষ। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং নামায-রোযা পালনের উদ্দেশ্য তো শুধু কতিপয় বিষয়কে মেনে নেয়া এবং কতক রীতি প্রথাকে মান্য করে চলাই নয়। এ সবের আসল লক্ষ্যতো এটাই যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার ফলে মানুষের মধ্যে যে আলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে তাতে আমাদের অন্তরাত্মা যেন প্রোজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবং নামায রোযার দ্বারা যে একক ও সামষ্টিক বলিষ্ঠ চরিত্র গড়ে ওঠে তা যেন আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। এটা না হলে, জেনে রাখুন, আমাদের যাবতীয় আকীদা ও ইবাদাত একান্তই অসার ও প্রাণশক্তি বিবর্জিত। কুরআন মজীদে সর্বত্র আকীদা ও ইবাদাতের পাশাপাশি তাদের বাস্তব প্রভাব প্রতিক্রিয়ার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার পেছনে এটাই রহস্য; যেন এর প্রতি কোনোরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করা না হয়।

তৃতীয়ত, যাচাই ও পরীক্ষার ক্ষেত্র মূলত কর্ম ও চরিত্রেরই ক্ষেত্র। বলিষ্ঠ ও পবিত্র চরিত্রই মানুষের মূল সম্পদ—যা সে দীনের সাহায্যে অর্জন করে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে এটা তাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত হতে ও তাকওয়ার মর্যাদায় উন্নীত হতে সাহায্য করে থাকে। সমষ্টিগত জীবনেও পুণ্যবান, সৎকর্মপরায়ন, শহীদ এবং সিদ্দীক তথা পরম সত্যনিষ্ঠ মানব দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এজন্য সর্বপ্রকার পরীক্ষা ও বিপদ মুহূর্তে নিজের এ সম্পদের হেফাযতে সজাগ ও সদা সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

ধৈর্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণ

এখানে আরেকটি প্রশ্নেরও উদ্রেক হতে পারে। এখানে প্রতিশ্রুতি পূরণ ও ধৈর্য অবলম্বন—চরিত্র ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত মাত্র এ দুটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। এ তালিকায় তো আরো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কিন্তু সেগুলোর উল্লেখ না

www.pathagar.com

করার কারণ কি ? এর জবাব হলো, চরিত্র ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত যত গুণাবলী আছে তন্মধ্যে এ দুটি গুণই মূলত কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী। প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত ছোট বড় সর্বপ্রকার অধিকার ও কর্তব্য এসে যায়। তা কোনো লিখিত চুক্তিনামার মাধ্যমে অস্তিত্বে আসতে পারে, হতে পারে কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধ, আত্মীয়তার কারণেও। চাই তার প্রকাশ ও প্রচারণা হোক কিংবা কোনো উন্নত সমাজে তা এমনিতেই মেনে চলা হোক। আল্লাহ ও রাসূল, মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজন, বংশ ও গোষ্ঠী, প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসী, ছাত্র-শিক্ষক, প্রভু-ভৃত্য এবং রাজা-প্রজা প্রত্যেকের সাথেই আমরা কোনো না কোনো গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। আর এ সকল চুক্তির হক আদায় করা তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার একান্ত দাবী। যেন অধিকার পালনই প্রতিশ্রুতি পালনের মূলকথা। আর অধিকার পালন মানুষের ছোট-বড় সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বকে পরিবেষ্টন করে আছে।

তার সঙ্গে সবর-এর গুণটি যুক্ত করে আল্লাহ এটাই জানান দিলেন যে, অধিকার ও কর্তব্য পালনের পথে সমূহ প্রতিবন্ধকতা মু'মিন যেন দৃঢ় সংকল্প ও অনড় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মোকাবিলা করে। কোনো প্রকার লোভ-লালসা, কাপুরুষতা ও ভয়-ভীতিই যেন তাকে পরাস্ত করতে না পারে।

তিনটি ক্ষেত্রে সবর ও ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো بَأْسَاءِ -এর অর্থ ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট। দ্বিতীয়টি হলো ضَـــرَّاءِ -এ দ্বারা দৈহিক কষ্ট বোঝানো হয়েছে। এবং তৃতীয়টি হলো بَأْسَ -এর অর্থ যুদ্ধ সংকট জনিত অবস্থা। চিন্তা করলে দেখা যাবে, কারো মনোবল ও দৃঢ় সকল্প এ তিনটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ তিনটি পরিস্থিতিতে কেউ যদি সত্যের ওপর অটল ও অনড় থাকতে সফলকাম হয়, তাহলে তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে আর বাধা কোথায় ? তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَـدَقُـوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُـتَّـقُـونَ "এরাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার দাবিতে প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই খাঁটি মুত্তাকী বা খোদাভীরু।" এ থেকে স্বতঃই এটা প্রমাণিত হয়, যারা নিছক কতিপয় বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনকেই যথেষ্ট মনে করে তারা তাদের ঈমানের দাবিতে যেমন সত্যনিষ্ঠ নয়, তেমনি তাদের তাকওয়ার দাবিও অসার।

আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ও এখানে লক্ষণীয়। তাহলো وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ -এর সাথে إِذَا عَـاهَدُوا -এর যে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, এদ্বারাও ওসব অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত লোকদের মাঝে বর্তমান দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্যের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর যথার্থ তাৎপর্য হলো, তারা কোনো প্রতিশ্রুতি করে বসলে, যাই হোক না কেন, এ কারণে তাদের যত ক্ষতি ও বিপদ-ঝাঞ্ঝাই পোহাতে হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই তারা তার অন্যথা করে না। বরঞ্চ জীবন বিপন্ন করে হলেও তা তারা পূর্ণ করে। এক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর যে কর্মনীতি ছিল তা মানবেতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। বিশেষ করে হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে চুক্তির প্রতি তিনি যে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, ইতিহাস কোনোদিন তা বিস্মৃত হবে না।

www.pathagar.com

৫৭. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৭৮-১৭৯ আয়াত

শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার দুটি ভিত্তি

তাকওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল তত্ত্ব তুলে ধরার পর এ দুটি জিনিসের ওপর ভিত্তিশীল অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে, সমাজে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং তার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব বিধানের দৃষ্টিতেও যেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা করলে অতি সহজেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক মযবুত করার ভিত্তি মূলত দুটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। একটি হলো, একে অন্যের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দ্বিতীয়টি হলো, একজন আরেকজনের সম্পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এজন্যই জীবন ও সম্পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার বিধান চিরকালই অন্য সকল আইন ও বিধানের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন রয়েছে। সমগ্র মানব জাতির স্বভাব-প্রভৃতির ওপর ভিত্তিশীল এ মূলনীতির আলোকেই তাকওয়া ও স্রষ্টার প্রতি অকৃত্রিম দায়িত্বশীলতার বুনিয়াদ মযবুত করার পর সর্বাগ্রে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আইন বর্ণনা করেছে এবং কিসাসকে গোটা সমাজের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ কেউ নিহত হলে তার আপনজন ও নিকটাত্মীয়দের ওপরই কেবল তার হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করা ও তার শাস্তি বিধান করা দায়িত্ব নয়। বরঞ্চ হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন ও তার কৃতকর্মের প্রতিবিধান করা গোটা সমাজেরই দায়িত্ব। যেন এক ব্যক্তির নিহত হওয়া সকলেরই নিহত হওয়া এবং একজনের জীবিত হওয়া সকলেরই জীবিত হওয়ার নামান্তর।

কিসাসের এ বিধান কিতাবধারী ও আরববাসীদের মধ্যেও বর্তমান ছিল। কিন্তু তারা অন্য সব আইন ও বিধানকে যেরূপ ধ্বংস করেছে তদ্রূপ এ আইনের প্রাণ সত্তাকেও নিঃশেষিত করে ছেড়েছিল। এ বিধানের আসল প্রাণসত্তা হলো নিরংকুশ সুবিচার ও পরিপূর্ণ সাম্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ, আমীর-ফকির, আশরাফ-আতরাফ ও প্রভু-ভৃত্য—সবাইকে একই কাতারে রাখতে ও গণ্য করতে হবে। আইন ও আদালত প্রত্যেকের সাথে সমান আচরণ করবে। কিন্তু কিতাবধারী বা আরববাসী কারো মধ্যেই এ নীতি কার্যকর ছিল না। এটা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সভ্যতা ও তমদ্দুনের এ চরম উন্নতির যুগেও পৃথিবীর কোনো দেশে এবং কোনো আইনে কুরআন-প্রদত্ত মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় না। এরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ
فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ

www.pathagar.com

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৮. হে ঈমানদাররা ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান ফরয করে দেয়া হল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। অবশ্য তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সুষ্ঠুভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এতো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে ; যাতে তোমরা আল্লাহর দেয়া সীমার ব্যাপারে সাবধান হতে পার।

৫৮. শব্দের তাহকীক ও আয়াতের বিশ্লেষণ

'কিসাস'-এর অর্থ

قِصَاصٌ শব্দটি قصص থেকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ, কারো পশ্চাতে তার পদাংক অনুসরণ করে চলা। যেমন ঃ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ - قصص : ١١ -"সে মূসার ভগিনীকে বলল, এর পেছনে পেছনে যাও।' সে ওদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল।"-সূরা আল কাসাস ঃ ১১। قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا - كهف : ٦٤ -"মূসা বলল, 'আমরা তো এ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে পশ্চাতে ফিরে চলল।"-সূরা কাহ্ফ ঃ ৬৪। এজন্যই কিস্সাকে 'কিস্সা' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা যার কিস্সা বা কাহিনী বর্ণনা করা হয়, কাহিনীকার যেন পদে পদে তার পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। এ থেকে قصاص শব্দটি উদগত ; এতেও হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করা হয় ও তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অপরাধী কারো প্রতি যে ধরনের অপরাধমূলক কাজ করে, তার প্রতিও তদনুরূপ শাস্তি বিধানকে কিসাস বলা হয়ে থাকে। এ কিসাসের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি জীবনের বদলে জীবন অপরটি আর্থিক—যাকে রক্তমূল্যও বলা হয়ে থাকে। কিসাস শব্দটিও ব্যাপক অর্থের মধ্যে এ উভয় প্রথারই শামিল রয়েছে। কেননা রক্তমূল্যও প্রকৃতপক্ষে কিসাসেরই একটি রূপ। আসল বিধান তো জীবনের বদলে জীবনই হওয়ার কথা। কিন্তু নিহতের পরিজনদের কল্যাণে মহান আল্লাহ এতটুকুন অনুগ্রহ করেছেন যে, ইচ্ছে করলে তারা জীবনের বদলে রক্তমূল্যও গ্রহণ করতে পারে।

www.pathagar.com

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ঃ এতে كُتِبَ -এর পরে عَلٰى শব্দের ব্যবহার এর ফরয ও অপরিহার্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। قَتْلٰى শব্দটি قَتِيل -এর বহুবচন। এর অর্থ নিহত। শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, كُتِبَ عَلَيْكُمْ দ্বারা কিসাসের ফরয হওয়া প্রমাণিত হলেও এ নির্দেশ কার প্রতি ? এ প্রশ্নের উদ্রেক এজন্য হয় যে, কিসাসের ব্যাপারটি একটি পারস্পরিক সমঝোতা-পত্র বিশেষ—একথাটি ইসলামে সর্বজন সমর্থিত একটি বিষয়। নিহতের উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছে করলে হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারে, রক্ত মূল্যও গ্রহণ করতে পারে। এমনকি ইচ্ছে করলে কিছুটা ক্ষমাও করতে পারে। কাজেই যখন তারা এসবই করতে পারে তখন এটা বলার কি অর্থ হতে পারে যে 'তোমাদের ওপর কিসাস নেয়া ফরয করে দেয়া হলো ?'

কিসাসের দায়িত্ব সরকারের

এ প্রশ্নের জবাব হল, এ নির্দেশের সম্বোধিত প্রতিপক্ষ হল সমাজ। অন্য কথায় ব্যাপক অর্থে ইসলামী সরকার। তার ভূখণ্ডে কেউ নিহত হলে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা, তাকে গ্রেফতার করা, এবং আইন অনুযায়ী তার ওপর শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তানো হয়েছে। যে ব্যক্তি অন্য কাউকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হত্যা করে সে নিছক এক ব্যক্তিকেই হত্যা করে না সে বরং সকলেরই হত্যাকারী। কেননা সে অন্য সবার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদানকারী আইনকেই ধ্বংস করে দেয়। এজন্য তার কিসাস গ্রহণ করা গোটা সমাজ ও সামরিক ব্যবস্থাপনার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। এমনকি জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আইনকে সঞ্জীবিত করে সকলের জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করাও অনুচিত। এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ –"যদি কেউ কোনো খুনের পরিবর্তে অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করলে, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২

চিন্তা করলে এটাই প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, কিসাসের দায়িত্ব সরকারের ওপরই অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, নিহতের উত্তরাধিকারীদের ওপর নয়। কেননা, ধরা যাক কেউ নিহত হলো ; কিন্তু তার তো কোনো উত্তরাধিকারী নাও থাকতে পারে ! এমনও তো হতে পারে যে, কারো হয়তো কোনো উত্তরাধিকারী আছে বটে ; কিন্তু কোনো কারণে তারা নিহতের কিসাসের ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করে না। এমনকি এটাও সম্ভব যে,

www.pathagar.com

কোনো কারণবশত উত্তরাধিকারীদের প্রকৃত সহানুভূতি ও অনুরাগ নিহতের পরিবর্তে হত্যাকারী ও হত্যা-সহযোগীদের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে পড়বে। এছাড়া এ জাতীয় ঘটনায় তদন্ত ও যাচাই-পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করা ও শাস্তি কার্যকর করার জন্য বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োজন। এজন্য ইসলাম কিসাস গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের ওপর অর্পণ করেছে। কিন্তু একই সাথে সরকারের ওপর এ বাধ্যবাধকতাও আরোপ করেছে যে, সে নিজে থেকেই যেন কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দেয় ; বরং তার উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের অভিরুচি মোতাবেক ইসলামী আইনের আওতায় যে কোনো আচরণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। তারা ইচ্ছে করলে তাকে হত্যা করবে, ইচ্ছে করলে তার থেকে রক্তমূল্য গ্রহণ করবে। উত্তরাধিকারীদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া এবং তাদের ক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করার দ্বারা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى -এ আয়াত কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

কিসাসে নিহতের অভিভাবকদের ইচ্ছাকে মূল্য দেয়ার যুক্তি

কিসাসের ক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদের ইচ্ছা ও পসন্দকে যে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে, বিভিন্ন দিক থেকে এটা যথার্থই বিজ্ঞ-জনোচিত। হত্যাকারীর জীবনের ওপর নিহতের উত্তরাধিকারীদের সরাসরি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা একদিকে তাদের বড় রকমের যখমে কিছুটা উপশমের ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় অপরদিকে তারা যদি এমতাবস্থায় কিছুটা কোমল নীতি গ্রহণ করে তাহলে হত্যাকারী ও তার পরিবারের প্রতি সরাসরি তাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করা হয় ; যদ্বারা অত্যন্ত কার্যকর সুফলের আশা করা যায়। তৃতীয়ত, রক্তমূল্য আকারে নিহতের উত্তরাধিকারীদের—বিশেষ করে তারা অভাবগ্রস্থ হলে—বড় রকমের সহযোগিতা ও অবলম্বন অর্জিত হতে পারে। উত্তরাধিকারীদের এতে কোনোরূপ ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকৃত না হলে এবং সর্বময় ক্ষমতা পুলিশ ও আদালতের হাতে ছেড়ে দিলে ওপরে বর্ণিত যাবতীয় উপকারিতা ও কল্যাণ থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমনটি বর্তমানে প্রচলিত আইন-কানুনের বেলায় দেখা যায়। কিন্তু তাদের এ অধিকার মেনে নেয়ার পরও কিসাসের প্রকৃত দায়িত্ব ও তা বাস্তবায়ন করার কর্তৃত্ব সরকারের ওপরই ন্যস্ত। এ কারণে সরকার কোনো বিশেষ ঘটনায় উত্তরাধিকারীদের দুর্বল ভূমিকা অথবা হত্যাকারীদের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল হওয়ার দরুন কিসাসের হক পূর্ণ হচ্ছে না বলে মনে করলে আইনকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে জীবন-রক্ষার আইন প্রভাবিত হতে না পারে।

কিসাসে সাম্যের ব্যবস্থা

"স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।" এটা ঐ পূর্ণাঙ্গ সাম্যের বর্ণনা, যা কিসাসে উচ্চকিত রাখা অপরিহার্য। অর্থাৎ কোনো স্বাধীন ব্যক্তি অপর কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে النفس بالنفس -এর আইন

www.pathagar.com

মোতাবেক স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীনকেই হত্যা করতে হবে। আর রক্তমূল্যের বেলায় একজন স্বাধীন ব্যক্তির রক্ত মূল্যই তার বিনিময়ে অপরিহার্য হবে। আরবের অন্ধকার যুগের ন্যায় নিহতের উত্তরাধিকারীরা নিজেদের আভিজাত্যে ও উচ্চমর্যাদার অহমিকায় এ দাবি করতে পারবে না যে, তাদের একজন নিহতের বদলে হত্যাকারীর পরিবারের দুজন বা ততোধিক স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে। অথবা নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করবে। কিংবা ক্রীতদাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে। রক্তমূল্যের বেলায়ও নারীর রক্তমূল্য পুরুষের রক্তমূল্যের সমান বা ক্রীতদাসের রক্তমূল্য স্বাধীন ব্যক্তির রক্তমূল্য পরিমাণ আদায় করতে পারবে না। একইভাবে হত্যাকারী ও তার বংশ ও গোত্রের লোকদেরও নিজেদের আভিজাত্য ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে এ দাবী করতে পারবে না যে, আমাদের ক্রীতদাস অন্যদের স্বাধীন ব্যক্তির সমান বা আমাদের একজন নারী অন্যদের পুরুষের সমান ; কাজেই জীবন অথবা সম্পদের কিসাসে সে পরিপ্রেক্ষিতেই নিহতের উত্তরাধিকারীদের সাথে আচরণ করতে হবে। ইসলাম এ নিরংকুশ সাম্যের ঘোষণা দিয়ে অন্ধকার যুগের যাবতীয় কুপ্রথার অবসান ঘটিয়ে দেয়। ইহুদীরাও এক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ও ইসরাঈলী-অইসরাঈলী ইত্যাদি ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। এ ঘোষণার দ্বারা উক্ত ভেদাভেদও বিলুপ্ত হল। চৌদ্দশ বছর থেকে চলে আসা 'ইসলামের শাস্তি-বিধান' অধ্যায়ের প্রতি লক্ষ করুন। অপরদিকে আজ বিংশ শতাব্দীতেও সাম্য ও সুবিচারের প্রবক্তা আমেরিকার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগে সাদা-কালোর যে বিভাজন ও বৈষম্য, তার প্রতিও তাকিয়ে দেখুন ঃ

রক্তমূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতা

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ অর্থাৎ নিহতের উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে হত্যাকারীকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মূল্যায়ন করা কর্তব্য। কিছুটা ক্ষমা ও অব্যাহতির রূপ এমন হতে পারে যে, জীবনের বদলে জীবন নেয়ার পরিবর্তে আর্থিক বিনিময়ের ওপর তারা রাজী হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পরম সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতার ভাবধারা নিয়ে যথাযথ বিধি অনুসারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা পরিশোধ করা হত্যাকারী ও তার পরিবারস্থ লোকদের কর্তব্য। যথাযথ বিধি বলতে এখানে তৎকালীন আরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রীতি ও প্রথা বুঝানো হয়েছে—ইসলাম রক্তমূল্যের বেলায় যেটাকে আইনের মর্যাদা দান করেছে। সুন্দরভাবে পরিশোধ করার তাগিদ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, আরব দেশে সাধারণত নগদ অর্থে রক্তমূল্য পরিশোধ না করে বস্তু ও সম্পদের আকারে পরিশোধ করা হতো। এজন্য পরিশোধকারীদের উদ্দেশ্য সৎ না হলে তার মধ্যে তারা নানা প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারত। যেমন উট অথবা ছাগলের সংখ্যা, শস্য ও খেজুরের একটা পরিমাণ ও পরিমাপ দ্বারা হয়তো রক্তমূল্য পরিশোধ করে দেয়া হতো। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে তাতে হেরফের করার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে যেত। তার মানে তো এই দাঁড়াল যে, যারা শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে কারো জীবনের ওপর ক্ষমতা লাভের পর তাকে ক্ষমা করে দিল এবং তার পরিবর্তে অর্থ-বিনিময় গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেল, তার কোনোই

মূল্যায়নই করা হলো না। তাদের অনুগ্রহের বিনিময় তো অনুগ্রহই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অর্থাৎ রক্তমূল্য এরূপ সৌন্দর্য, উদারতা ও প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তি সহকারে পরিশোধ করা কর্তব্য যাতে তাদের একজন একান্ত আপনজনের রক্তের বিনিময়ে মেষ-বকরী গ্রহণ করতে গিয়ে নিজেদের ভ্রান্তি, লাঞ্ছনা ও অপমানের আঘাতে জর্জরিত হতে না হয়।

কিসাসের আলোচনার মধ্যে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে রক্তমূল্যের অবতারণা করার কারণ, মূলত কিসাস শব্দের মধ্যে সাধারণভাবে জীবনের বিনিময়ে জীবন ও জীবনের বিনিময়ে সম্পদ—এ উভয় অর্থই শামিল রয়েছে ; যার প্রতি ওপরে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। তাতে কিছুটা ক্ষমা পাওয়ার অর্থ নিহতের অভিভাবকদের জীবনের বিনিময়ে জীবন নেয়ার পরিবর্তে প্রচলিত নিয়মে রক্তমূল্য গ্রহণে রাজী হয়ে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। যেমনটি فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ -এর শব্দাবলী থেকে প্রতিভাত হয়। রক্তমূল্যের বিষয়টি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দয়া ও অনুগ্রহ বৈ নয়। ‘প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ গ্রহণ’ এটাই ছিল জীবনের প্রতি সঠিক ও যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের দাবি। কিন্তু মহান আল্লাহ নিছক তার অপার অনুগ্রহে তাতে অব্যাহতির সুযোগ প্রদান করেছেন। আল্লাহর এ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা উচিত এবং এ থেকে কোনো অন্যায় ফায়দা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যারা অনুগ্রহের এ সুযোগ থেকে ফায়দা গ্রহণ করে কোনোরূপ অবিচার ও সীমালংঘনমূলক কাজ করবে। মনে রাখবে আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তির ব্যবস্থা ; যার থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায় থাকবে না। এতে হত্যাকারী ও তার পরিজনদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, এ অনুগ্রহের সুবাদে নিহতের পরিবারের ওপর কোনোরূপ যুলুম ও অবিচারের পরিকল্পনা আঁটা হবে চরম পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা। যেমন হত্যাকারী ও তার আপনজন পরিকল্পনা করল যে, নিহতের উত্তরাধিকারীকে কোনো না কোনো প্রকারে রাজী করিয়ে প্রাণ-রক্ষার একটা ব্যবস্থা করে পরে সুযোগ মতো তাদের অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একইভাবে এতে নিহতের উত্তরাধিকারীদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে। তাদের এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা যেন না থাকে যে, প্রথমত রক্তমূল্য গ্রহণে রাজী হবে এবং হত্যাকারী থেকে যথারীতি তা হস্তগত করবে। অতপর সুযোগমতো তার জীবনলীলাও সাঙ্গ করে দেবে। আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের অধীনে পারস্পরিক সম্মতিতে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হলো উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ-চিত্তে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার পর যে পক্ষই সীমালংঘন করবে সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে।

আয়াত ঃ ১৭৯

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

আইন আবেগ অপেক্ষা উচ্চতর

এটা সমাজের প্রতি উপদেশ স্বরূপ। বলা হচ্ছে, কিসাসের ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্য, পক্ষপাতিত্ব, এড়িয়ে যাওয়া বা কোনোরূপ অন্যায় দয়া ও সৌজন্য যেন

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। যে কাউকে হত্যা করে সে নিছক এক ব্যক্তিকেই হত্যা করে না ; বরঞ্চ সকল মানুষের জীবন সুরক্ষার গ্যারান্টি—আইনকে হত্যা করে। ফলে সে যেন সকলকেই হত্যা করলো। এ কারণে তার থেকে এর কিসাস গ্রহণ করে উক্ত গ্যারান্টিকে পুনর্বহাল করা সকলের দায়িত্ব ; যাতে নিহিত রয়েছে সকলের জীবন। সমাজের মধ্যে যে কোনো হত্যাকারীকে পাকড়াও করে বা অনুসন্ধান করে অথবা তার অপরাধের প্রমাণ সরবরাহ করেও এভাবে নিহতের পক্ষে কিসাস গ্রহণের পথ সুগম করে দেয়, সে যেন ঐ নিহত ব্যক্তিকেও জীবিত করে তোলে এবং একই সাথে গোটা সমাজকেও প্রাণ দান করে। কেননা সে তার এ উদ্যোগের সাহায্যে সকলের প্রাণ রক্ষক আইনকে সঞ্জীবিত করে থাকে। কুরআন মজীদ সূরা আল মায়েদায় এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করেছে। বলাবাহুল্য, ইতোপূর্বেও আয়াতটির উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط ـ الامائدة : ٣٢

"আমি এ বিধান দিলাম যে, যদি কেউ খুনের পরিবর্তে অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২

এতে ওসব লোকের ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে, যারা অনেক সময় অন্যায় ও অযথা কসম রক্ষা ও পক্ষপাত, অন্যায় শপথের প্রতি শ্রদ্ধা, আভিজাত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহমিকাবশত নিহতের পরিবর্তে হত্যাকারীর প্রতিই সহানুভূতিকে ভাল জ্ঞান করে থাকে। অথচ প্রত্যেকের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি তো এটাই যে তাকে আল্লাহ ও তাঁর আইনের নিকট সোপর্দ করে দেয়া হবে ; আল্লাহর আইন থেকে ছাড়িয়ে শয়তানের হাতে অর্পণ করা কিছুতেই সহানুভূতির দাবি নয়। উপরন্তু আমীর ও ফকীর, উচ্চ ও নীচ, আপন ও পর কোনো ভেদাভেদ করা যাবে না। সূরা নিসার ১৩৫ আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ সত্য প্রত্যেকের বোধগম্য হবার কথা নয়, একমাত্র বোধশক্তিসম্পন্নরাই তা বুঝতে পারে। এজন্য আয়াতে বিশেষভাবে জ্ঞানবান ও বোধশক্তি সম্পন্নদের সম্বোধন করা হয়েছে।

শাস্তি-বিধান কি অযৌক্তিক ?

বোধশক্তি সম্পন্নদের বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার আরেকটি কারণ হলো, আবেগ-প্রবণতা যেরূপ কখনো কখনো কিসাসের আইন প্রয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তদ্রূপ আবেগ দ্বারা প্রভাবিত ও পরাস্ত বোধশক্তিও এ আইনের প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব নিরূপণে ব্যর্থ হয়ে থাকে। বিশেষত এ যুগে তো যুক্তি ও দর্শনের দোহাই দিয়ে সর্বপ্রকার দৈহিক শাস্তির বিরুদ্ধেই একটা স্বতন্ত্র দর্শন দাঁড় করানো হয়েছে। এ

তথাকথিত দার্শনিকতার যাচাই-পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এতেও প্রকৃত বোধ ও বুদ্ধির প্রাণশক্তি সক্রিয় নেই ; আছে নিছক আবেগ-প্রবণতা।

এক শ্রেণীর লোকের মতে, অপরাধীদের পক্ষ থেকে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, তা মূলত আবেগের ভারসাম্যহীনতা, জ্ঞান-বুদ্ধির বৈকল্য, মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও জটিলতার কারণেই হয়ে থাকে। আর এসব মূলত কারো অসুস্থতা-জনিত অবস্থা। এরূপ ব্যক্তি তো সাজা নয় ; সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও সযত্নে লালন-পালন এবং চিকৎসা ও পথ্যেরই যোগ্য। এজন্য তাদের দৃষ্টিতে কোনো খুনীকে হত্যার সাজা দেয়া কোনো রোগীকে তার রোগের দরুন চিকিৎসার পরিবর্তে কোনো শাস্তি দেয়ারই নামান্তর। তাই তাদের মতে এ ধরনের অপরাধী তথা-তাদের ভাষায় রোগীদের শূলে চড়ানো বা ফাঁসি দেয়া নয়, বরং তাদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং আত্মিক ও মানসিক সংশোধনের মাধ্যমে হওয়া উচিত।

দুনিয়ার একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে তো এ মতাদর্শ প্রথম থেকেই বর্তমান ছিল। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এটা কখনো গুরুত্ব পায়নি, সম্ভবত কখনো পাবেও না। তথাপি এ শেষ যুগে টলস্টয় ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ওকালতি করার দরুন বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মস্তিষ্ক এদ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এদের বিভ্রাট দূর করার জন্য কিসাস-বিধানের ঐ গূঢ় রহস্যের প্রতি দিক-নির্দেশ করা জরুরী। যার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে কুরআন বিশেষভাবে বোধশক্তি সম্পন্নদের সম্বোধন করে বলেছে যে, এতে রয়েছে জীবন।

এটা সুস্পষ্ট যে, এ জীবন ব্যক্তি বিশেষের প্রেক্ষিতে নয় ; বরং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। খুনের অপরাধে কাউকে হত্যা করা হলে দৃশ্যত একটি প্রাণের পর আরেকটি প্রাণের বিলোপ ঘটে সত্য ; কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, তাকে হত্যার মাধ্যমে গোটা সমাজের জন্য জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। তার থেকে কিসাস না নেয়া হলে, সে যে মানসিক অধঃপাতে পতিত হয়ে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুনের দায়ে দায়ী হল, ঐ অধোপতন ও নষ্টাচারে গোটা সমাজই সংক্রমিত হয়ে পড়বে। রোগে রোগে পার্থক্য আছে। যেসব রোগ হত্যা, ডাকাতি, চুরি ও ব্যভিচার ইত্যাদির ন্যায় ভয়ানক অপরাধের কারণ হয় তার ঐ সকল রোগের মত যাতে গোটা দেহকে রক্ষা করার জন্য অনেক সময় কোনো অঙ্গকে কেটে পৃথক করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যদিও একটি অঙ্গ কেটে ফেলা পাষাণ-হৃদয়ের কাজ বলে মনে হয়। কিন্তু একজন ডাক্তারকে এ পাষাণ-হৃদয়ের কাজটি করতে হয়। সে যদি সাধারণ স্বভাব-বিরুদ্ধ এ নিষ্ঠুরতার কাজটি না করে তাহলে সে একটি অঙ্গের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে রোগীর গোটা দেহকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

সমাজ সামগ্রিকভাবে একটি দেহের সাথে তুলনীয়। এ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনেক সময় এমন সব সমস্যা ও বিপত্তি দেখা দেয়, মলম ও প্লাস্টারে তার চিকিসা সম্ভব নয় ; বরং রোগাক্রান্ত অঙ্গটিকে অপারেশনের মাধ্যমে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে

www.pathagar.com

ফেলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি এটা মনে করা হয়, এ অঙ্গটি রোগাক্রান্ত। তাই এটি কোমলতা ও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। তবে এ কোমলতার পরিণতি এটাই দাঁড়াবে যে, এ অঙ্গটি গোটা দেহকেই ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন করে ছাড়বে।

কঠোর প্রকৃতির শাস্তিসমূহকে কুরআন نَكَال শব্দে ব্যক্ত করার পেছনে এটাই গূঢ় রহস্য। আরবীতে نَكَال ওই শাস্তিকে বলা হয় যা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় ; যা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্যরা শিক্ষাগ্রহণ করে এবং এরূপ অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অন্য কথায় এটা বলা যেতে পারে যে, এরূপ শাস্তি কার্যকর করে সমাজকে এমন টিকা লাগানো হয় যদ্বারা তা সংক্রমিত জীবাণুসমূহের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়। لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ শব্দদ্বয় দ্বারা কুরআন এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করেছে। এর অর্থ যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সীমালংঘন এবং অবিচার ও বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান হও—আত্মরক্ষা কর।

৫৯. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮০-১৮২ আয়াত

জীবনের নিরাপত্তাসম্পর্কিত আইনের পর সম্পদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছে। কুরআন[১] ও হাদীস উভয়টিতেই এ দুটি জিনিস সাধারণত এক সাথে আলোচিত হয়ে থাকে। যুক্তি ও স্বভাব-প্রকৃতিতেও এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অতি নিকট সম্পর্ক। সম্পদের নিরাপত্তা বিষয়ে মূলকথা হলো, একটি আইনের অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তির অতপর তার উত্তরাধিকারীদের অধিকার সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হবে এবং অন্যান্যরা এ অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। আরববাসীদের মধ্যে যদিও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা, আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার মোটামুটি নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্ট কদাচারের ন্যায় এক্ষেত্রেও বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছিল। তাদের শক্তিমান কর্তৃক দুর্বল উত্তরাধিকারী স্বত্বাধিকারীদের অধিকার গ্রাস করে নেয়ার প্রবণতা এত প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, তাদের নিকট প্রচলিত রীতিনীতির কোনো মূল্যই ছিল না। সূরা ফাজরে এ পরিস্থিতির দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا "এবং তোমরা উত্তরাধিকার জনিত সম্পদ নির্বিচারে ভক্ষণ করে ফেল।"–সূরা ফাজর ঃ ১৯। এ পরিস্থিতি আপনজন ও আত্মীয়-পরিজনের অধিকার সুনির্দিষ্টকরণ ও তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করার দাবী করছিল। কিন্তু এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত সমাজ এতটা সুসংগঠিত হয়ে ওঠেনি, যাতে উক্ত স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার আইন জারী ও কার্যকর হতে পারে যা সূরা নিসায় উক্ত হয়েছে। এজন্য প্রাচীন যুগের প্রচলিত রীতি মোতাবেক স্বত্বাধিকারীদেরকে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করার ও উত্তরাধিকারীদের তা মান্য করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতপর মহান আল্লাহ উত্তরাধিকারীদের অধিকার সুনির্দিষ্ট করণের উপদেশ সম্পর্কিত

১. দেখুন, সূরা আন নিসা আয়াত-২৯, এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ حرمة ماله كحرمة دمه অর্থাৎ তার সম্পদের মর্যাদা তার জীবনের মর্যাদার সমতুল্য।

www.pathagar.com

সূরা নিসার আয়াত অবতীর্ণ করলে বান্দার অসিয়ত রহিত হয়ে যায় এবং কেবল আল্লাহর আদেশ অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে বলার অসিয়তের অধিকার বহাল রাখা হয়েছে। সূরা আন নিসার উপরোক্ত আয়াতে তার আলোচনা আসবে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াত পাঠ করুন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَن
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথমত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হলো। সাবধানীদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়। ১৮১. অতপর এ বিধান শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, যে পরিবর্তন করবে তার ওপরেই এর দায় বর্তাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ১৮২. যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোনো অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬০. শব্দের পর্যালোচনা ও আয়াতের বিশ্লেষণ

আয়াত ঃ ১৮০

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ج نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

'অসিয়ত'-এর তাৎপর্য

كُتِبَ عَلَيْكُمْ কুরআন মজীদ ও আরবী ভাষা—উভয়টিতেই এর অর্থ ফরয করে দেয়া হলো। এটা সর্বজনবিদিত। 'অসিয়ত' শব্দের ব্যাখ্যা ইতোপূর্বেই করা হয়েছে যে,

আরবী ভাষায় এটি বড়দের কর্তৃক ছোটদের শিক্ষা ও উপদেশ দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা জীবনের শেষ মুহূর্তেও হতে পারে অথবা সাধারণ অবস্থায়ও হতে পারে। বান্দার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে, কুরআন মজীদে সেগুলোর ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে وصـيـت শব্দটি শব্দমূল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং ক্রিয়া থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থাকায় ক্রিয়া কিংবা তার পরবর্তী অব্যয়সমূহে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন পড়েনি।

অসিয়তের জন্য দুটি শর্ত

অসিয়ত ফরয হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একটি হল, অসিয়ত তখন করবে যখন দেখবে মৃত্যু সন্নিকটবর্তী। অপরটি হলো, যখন সে মৃত্যুপরবর্তী কিছু সম্পদ রেখে যাবে। প্রথম শর্তটিতে اذا শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ মৃত্যু সবাইর জন্য অনিবার্য। দ্বিতীয়টিতে ان ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সম্পদ প্রত্যেকের নিকট থাকা অপরিহার্য নয়। আরবী ভাষার ছাত্রদের নিকট ان ও اذا শব্দদ্বয়ের প্রয়োগের পার্থক্য অবিদিত নয়। অসিয়তে এ দুটি দিকই যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। যারা তাদের জীবদ্দশায় সবল থাকা অবস্থায় অসিয়ত করে বসে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রাট ও বিপত্তিতে পড়ে যায়। আর যারা সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত করে যেতে ব্যর্থ হয় তারা উত্তরকালে ঝগড়া ও বিবাদের বীজ বপন করে যায়।

সম্পদ বুঝাতে خير শব্দের ব্যবহার

خير শব্দের প্রকৃত অর্থ কাঙ্ক্ষিত ও পসন্দনীয় বস্তু। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, বোধ-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সুবিচার এবং নেক ও সৎকর্ম—এসব ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকেই এটি সম্পদের বেলাও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। কারণ সম্পদও একটি কাঙ্ক্ষিত ও সুপ্রিয় জিনিস। কুরআন মজীদে বেশ কয়েকটি জায়গায় এ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। কুরআন সম্পদের ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ করে প্রসঙ্গক্রমে সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদ প্রভাবিত লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান একটি ভুল বুঝাবুঝিরও সংস্কার সাধন করে দিয়েছে। তারা মনে করত, সম্পদ সততই একটি নাপাক ও অপবিত্র জিনিস। তাই আল্লাহ ওয়ালাদের এতে জড়িত হওয়া বৈধ নয়।

মা'রূফ ও শরীআতের মধ্যে সম্পর্ক

مَعْرُوْف শব্দের আভিধানিক অর্থ জানা-শুনা জিনিস বা পরিচিত জিনিস। অর্থাৎ যুক্তি ও বুদ্ধি যাকে স্বীকৃতি দেয়, সুবিচারের মানদণ্ডে যা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়, ভাল লোকেরা যা চেনে, সমাজের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যেও যে রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত—তাই মারূফ। এ মারূফ অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের মর্যাদা রাখে। পরিপ্রেক্ষিতেই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এর উদ্ধৃতিও ব্যবহার করা হয়েছে। ইতোপূর্বে রক্তমূল্যের আলোচনা প্রসঙ্গেও এটি উল্লিখিত হয়েছে। আইন দু প্রকার, একটি মা'রূফের ওপর

www.pathagar.com

ভিত্তিশীল ; অপরটি মহান আল্লাহর নির্দেশের ওপর ভিত্তিশীল। যে ব্যাপারে আল্লাহর আইন বিদ্যমান নেই সেক্ষেত্রে মা'রূফ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যে বিষয়ে আল্লাহর আইন অবতীর্ণ হয় সেক্ষেত্রে মা'রূফ-এর গ্রহণযোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায়। কেননা সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার পর নক্ষত্ররাজির সাহায্যে পথনির্দেশ লাভ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

অসিয়তের নির্দেশটি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন

এ আয়াতে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রদত্ত অসিয়ত করার নির্দেশটি ছিল প্রচলিত রীতির অধীন ও অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য। তখনো ইসলামী সমাজ এতটা মযবুত হয়ে উঠেনি যে, সূরা আন নিসায় অবতীর্ণ মীরাস বণ্টনের সর্বশেষ নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। এ নির্দেশ নাযিলের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরী হওয়ার পূর্বে এটা ছিল সাময়িক নির্দেশ। এতে দুটি উপকারিতা নিহিত ছিল। প্রথমত, নিকটাত্মীয়দের হাতে অংশীদারদের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষার তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, প্রাচীনকাল থেকে আরবের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ন্যায়ানুগ প্রথাকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করা। এ প্রথাগুলো ইতোমধ্যেই জাহিলিয়াতের আবর্জনা স্তূপের নীচে নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল। এ পর্যায়ে অদূর ভবিষ্যতে যে আইন ও বিধান নাযিল হতে যাচ্ছে তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই এ ন্যায়ানুগ প্রথার প্রবর্তন।

অসিয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ; حَقًّا শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার ওপর জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটা—আল্লাহকে ভয় করে এমন প্রতিটি ঈমানদারের ওপর জরুরী কর্তব্য ও অপরিহার্য। যারা এ কর্তব্য পালনকে এড়িয়ে যাবে তাদের অন্তর আল্লাহর ভয় শূন্য। তার মানে, উত্তরাধিকার আইন—পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপরিহার্য ছিল, জরুরী ছিল ; এটির নিছক একটি ভাল ও উত্তম কাজের মর্যাদাভুক্তই ছিল না।

আয়াত : ১৮১

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

সাক্ষীদের বিরাট দায়িত্ব

তখন পর্যন্ত ইসলামী শরীআতে উত্তরাধিকারীদের অধিকার সুনির্দিষ্ট হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন এ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা সম্পূর্ণরূপে সাক্ষী ও উপস্থিত লোকদের সততা ও বিশ্বস্ততার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এ কারণে সাক্ষীদের বিরাট দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অসিয়তকারীর অসিয়তে এতটুকুন রদ-বদল করলে সম্পূর্ণ পাপের বোঝা তাদেরই বহন করতে হবে। এর কোনো দায়-দায়িত্ব অসিয়তকারীর ওপর কিংবা তা প্রয়োগকারীদের ওপর বর্তাবে না। 'সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' গুণবাচক এ শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে রদ-বদলের দুঃসাহসকারীদের

www.pathagar.com

প্রতি সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অর্থাৎ তারা যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। তিনি এ মহা অপরাধের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

আয়াত ঃ ১৮২

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

خَوْفٌ শব্দের অর্থ

خوف শব্দের প্রকৃত অর্থ ধারণা করা, মনে করা, আশা করা ও সন্দেহ করা। এ থেকে ধীরে ধীরে এটি ভয় পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। হামাসার এক কবির কবিতার একটি পংক্তি লক্ষণীয় ঃ

ولو خفت انى ان كففت تحيتى

تنكب عنى رمت ان يتنكبا

"বার্ধক্যকে সাদর সম্ভাষণ না জানালেই তার আগমন রুদ্ধ হয়ে যাবে—এ আশা ও সম্ভাবনা থাকলে, আমি তাকে অভ্যর্থনা জানানো থেকে বিরত থেকে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতাম।"

এখানে আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি সন্দেহ, ধারণা ও জানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীরে কাশ্‌শাফের রচয়িতা এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করলেও তার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। আমরা তার প্রমাণ তুলে ধরলাম।

جنف -এর অর্থ

جَنَفٌ শব্দের প্রকৃত অর্থ ঝুঁকে যাওয়া, আসক্ত হওয়া। কিন্তু ভালো ও সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মন্দ ও অবিচারের প্রতি ঝুঁকে পড়া অর্থেই এটি অধিকতর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আয়াতে এটি অন্যায় সহযোগিতা ও অবৈধ পক্ষপাতিত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اِثْمٌ শব্দের অর্থ

اِثْمٌ শব্দের মধ্যে মূলত দেরী করা ও পশ্চাতে থেকে যাওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে। এজন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুন পশ্চাতে থেকে যাওয়া উটকে اثمه বলা হয়। পরবর্তীতে অধিকার পূরণে পশ্চাৎপদতার অর্থে শব্দটির ব্যবহৃত হয় ; সে অধিকার আল্লাহর হোক কিংবা বান্দার। এ তাৎপর্যের বিচারে এটি بِرٌّ শব্দের বিপরীত। ১৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, بِرٌّ -এর প্রকৃত অর্থ অধিকার পূরণ। এ শব্দটি عُدْوَانٌ শব্দের সাথেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা অধিকারের বেলায় দু ধরনের পাপ হয়ে থাকে। একটি হল, সংকীর্ণতা ও অধিকার নষ্ট করার আকারে অপরটি হল, হস্তক্ষেপ ও

www.pathagar.com

সীমালংঘনের আকারে। প্রথম প্রকারের জন্য প্রতিশব্দ إِثْم এবং দ্বিতীয় প্রকারের জন্য عُدْوَانٌ ; আলোচ্য আয়াতে এটি جَنَف -এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। جَنَف শব্দের অর্থ- আমরা বলে এসেছি—পক্ষপাতিত্ব। এর মুকাবিলায় إِثْم -এর যথার্থ মানে হল অধিকার-বঞ্চিত করা, একজন অন্যায়াচারী অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে এ উভয়বিধ অনাচারের যে কোনো একটির আশংকা থাকতে পারে। সে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারে কিংবা কারো অধিকার বিনষ্টও করতে পারে।

রদ-বদল করার নিষিদ্ধতা সংশোধনের নিষিদ্ধতার সমার্থক নয়

উপরোক্ত আয়াতে অসিয়তকারীর অসিয়তে কোনো প্রকার রদ-বদল পরিবর্তন করাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এক্ষণে এ আয়াতে বলা হয়েছে, পরিবর্তনের নিষিদ্ধতা সংশোধনের সমার্থক নয়। কোনো অসিয়তকারীর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা লক্ষ করা গেলে বা সততই তার অসিয়ত পক্ষপাতিত্ব ও অধিকার বঞ্চনা দোষে দুষ্ট হলে, অসিয়তের সাক্ষীদের পক্ষ থেকে উক্ত পক্ষপাতিত্ব ও অধিকার-বঞ্চনার সংশোধন প্রচেষ্টা রদ-বদল বা পরিবর্তনের সংজ্ঞায় পড়বে না। এটা নিষিদ্ধ নয়, এটা জায়েয ও বৈধ। অবশ্য নিজের থেকেই এর সংশোধন করে দেয়ার অধিকার তাদের নেই। এজন্য অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও বুঝাপড়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। অসিয়তকারীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সততা ও সুবিচারের পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত করা সম্ভব হলে তাই করতে হবে। অন্যথায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ -এর এটাই তাৎপর্য। কারণ, এ শব্দগুলোর পরিষ্কার অর্থ হল, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংশোধন ও মীমাংসা করিয়ে দেয়া ; নিজে থেকে কোনো সংশোধন করা নয়।

৬১. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮৩-১৮৭ আয়াত

আত্মশুদ্ধির জন্য রোযার বর্ণনা

জীবনের সুরক্ষা ও সম্পদের সুরক্ষা বিষয়ক উপরোক্ত আইন-বিধান বর্ণনার পর এক্ষণে রোযা ও রোযা সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হচ্ছে। আমাদের প্রসিদ্ধ ফিক্হী বিন্যাস-রীতি অনুযায়ী রোযা ইবাদাতের তালিকায় শ্রেণীবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে ওপরে বর্ণিত সালাত ও ইনফাক-এর আলোচনা সম্বলিত আয়াতের সাথে রোযার আলোচনা আসা বাঞ্চনীয় ছিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানময় কুরআনের বিধানসমূহ বর্ণনার বিন্যাস-পদ্ধতি ফিকহী গ্রন্থাবলীতে অনুসৃত পন্থায় করা হয় না। এতে ইসলামী শরীআতের বিশেষ দৃষ্টিকোণ, সমাজ সংস্কার, আত্মশুদ্ধি, অবস্থা ও পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেক একেকটি বিষয় আলোচিত হয়। এ দিকগুলোর ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার আইন ও বিধানের পর রোযার আলোচনা আসছে। এটি এমন একটি ইবাদাত, যা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যই ইসলাম

www.pathagar.com

বিধিবদ্ধ করেছে। যাতে লোভ-লালসা, ক্রোধ ও উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশোধ, যৌন-চাহিদা ও কামোত্তেজনার ন্যায় ভারসাম্যহীন প্রবণতা ও চাহিদার মুখে মানুষ লাগাম লাগাতে পারে এবং প্রবৃত্তি নামক অবাধ্য ও দুর্বিনীতি অশ্বকে তাকওয়ার পথে ধাবিত করতে পারে। রোযা ধৈর্য ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি করার বিশেষ ইবাদাত। এগুলোই সেই গুণাবলী যা মানুষকে সীমাতিক্রম ও অধিকার হরণ থেকে রক্ষা করে এবং মানুষের অধিকার পূরণ, সদাচার, সত্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, এখানে উল্লিখিত রোযার নির্দেশ একদিকে পূর্ববর্তী বিধানসমূহকে কার্যত বাস্তবায়ন করতে প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ কায়েম করে। অপরদিকে পরবর্তীতে আলোচ্য উৎকোচের লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এবং হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্যও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার ভিত্তি সরবরাহ করে। বিন্যাসের দিক থেকে রোযার অবস্থানই যেন এ সত্যকে উচ্চকিত করে তুলেছে যে, ইসলামে রোযাকে কেন ফরয করা হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা কি ? জীবন কোন্ কোন্ দিক থেকে এদ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের ওপর এর কোন্ সব প্রভাব পড়ে থাকে ? এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো পাঠ করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ؗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ
عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ

www.pathagar.com

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপরও রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। ১৮৪. নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তথাপি তোমাদের কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তি একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করতে সক্ষম তার জন্য একটি রোযার বিনিময় একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করা। তবে যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে রোযাব্রত পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ।

১৮৫. রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা রাখে। আর কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা করতে চান, তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা চান না। উদ্দেশ্য যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, তোমাদের সৎ পথে পরিচালিত করার জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

১৮৬. আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। তখন বল, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া

www.pathagar.com

দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক— যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছো। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন তা অন্বেষণ কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর ধারে কাছে যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।

৬২. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৮৩

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

'সাওম' শব্দের বিশ্লেষণ

صوم ও صيام শব্দমূল বা মাসদার। صوم শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো কিছু থেকে থেমে যাওয়া এবং তা বর্জন করা। যেমন, صام الفرس صوما -এর অর্থ ঘোড়া ঘাস খায়নি। কবি নাবেগার একটি পংক্তি লক্ষণীয় ঃ

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما

"বিপুলসংখ্যক ক্ষুধার্ত ও পরিতৃপ্ত অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলোবালির মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল এবং এছাড়া আরো বহুসংখ্যক অশ্ব ওদের লাগাম চিবাচ্ছিল।"

মাওলানা ফারাহী (র) صوم শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর اصول الشرائع নামক গ্রন্থে বলেন, "আরবরা তাদের ঘোড়া ও উটকে ক্ষুৎ-পিপাসায় অভ্যস্ত করে তোলার জন্য রীতিমত ওদের প্রশিক্ষণ দিত। যাতে কঠিন সময়গুলোতে তারা অধিকতর কঠোরতা সহ্য করতে পারে। একইভাবে তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রচণ্ড বাতাস মুকাবেলার জন্যও প্রশিক্ষণ দান করতো। সফর কিংবা যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটার সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় এটা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা বিবেচিত হতো। কবি জরীর তার কবিতার এক পংক্তিতে এ দুটো বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

ظللنا بمستن الحرور كاننا لدى فرس مستقبل الريح صائم

"আমরা লু হাওয়ার ঝাপটার মধ্যে অটল ও অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যেন আমরা এমন অশ্বরাজির সাথে দণ্ডায়মান যারা অগ্নি-বায়ুর মুকাবিলা করছে ও রোযাব্রত পালন করছে।"

পংক্তিটিতে কবি তার নিজের ও তার সঙ্গীদের অবস্থার তুলনা এমন ব্যক্তির সাথে দিয়েছেন যে তার ঘোড়ার সাথে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে ক্ষুধা ও লু-হাওয়ার মুকাবিলা করার জন্য প্রশিক্ষণ দান করছে। প্রকাশ থাকে যে, আরবরা সাধারণভাবে ব্যবহার্য ও পরিচিত জিনিসসমূহকেই উপমা হিসেবে ব্যবহার করতো। দুর্লভ জিনিসের প্রতি তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। .... যাই হোক ঘোড়ার রোযা রাখা বিষয়ে অনেক কাব্য-গাথা রয়েছে।

এ থেকেই صائم শব্দটি এসেছে। এর অর্থ, ঐ ব্যক্তি যে পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকে। এর জন্য বিশেষ কিছু শরঈ নিয়ম-বিধি রয়েছে—যার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।

রোযা আত্মপ্রশিক্ষণের প্রাচীনতম ইবাদত

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ঃ অর্থাৎ রোযার এ ইবাদাত প্রথমবারের মত কেবল তোমাদের ওপরই ফরয করা হয়নি ; বরঞ্চ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতিও ফরয করা হয়েছিল। খোদায়ী শরীআতগুলোতে প্রথম থেকেই আত্মপ্রশিক্ষণের জন্য এর বিশেষ অনুশীলন চলে এসেছে। এ প্রসঙ্গ টানার একমাত্র কারণ সাধারণ লোকদের ভীতি দূর করা যে, এটা কোনো নতুন জিনিস নয়। এটি খোদায়ী শরীআতগুলোর প্রাচীন উত্তরাধিকার যা তোমাদের প্রতি স্থানান্তরিত হচ্ছে। এটাকে গ্রহণ করার ও এ থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য তোমরাই।

রোযার উদ্দেশ্য

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ঃ "যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"—এখানে রোযার আসল উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। তাকওয়ার ওপরই সকল শরীআতের ভিত্তি। আবেগ ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারাই তাকওয়া অর্জিত হয়। আর রোযা দ্বারাই এ শক্তি ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে।

আয়াত ঃ ১৮৪

أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

www.pathagar.com

"নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য"—অর্থাৎ রোযার এ কষ্ট অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য তোমাদের ওপর চাপানো হয়নি। বরং বছরের হাতে গোনা মাত্র কতক দিন এজন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতাংশ যেরূপ মনোরঞ্জণের জন্য বলা হয়েছে তদ্রূপ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বাক্যাংশও মনঃতুষ্টির লক্ষ্যেই এরশাদ হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহভীতি ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণের এ কোর্স মাত্র স্বল্প দিনের জন্য। এতে সাহস হারাবার ও দুর্বল হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। দেহ ও মনের ওপর কষ্টদায়ক ইবাদাতের বর্ণনাকালে কুরআন মজীদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোরঞ্জনের এ রীতি অনুসরণ করেছে। ইনফাক ও যাকাতের আলোচনায় এর কিছু দিক আমরা তুলে ধরেছিলাম। পরে আরো কিছু স্পষ্ট উদাহরণ আলোচিত হবে।

اَيَّامٌ مَّعْدُوْدٰتٌ বলতে কি বুঝায় ?

"নির্দিষ্ট কয়েকদিন" দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে ? ব্যাখ্যাকারদের একদল বলেন, এর দ্বারা প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের মতে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে এ তিনদিনে রোযা ফরয করা হয়েছিল।

অপর দলের মতে, এদ্বারা রমযানের রোযাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, ইসলামে রমযানের রোযা ভিন্ন আর কোনো রোযাই ফরয ছিল বলে জানা যায় না। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে মহানবী (স) প্রত্যেক মাসে যে তিনটি রোযা রাখতেন, সেগুলো রাখতেন নফল হিসেবে—ফরয হিসেবে নয়।

ইমাম ইবনে জরীর উভয় দলের বক্তব্য উপস্থাপন করার পর দ্বিতীয় দলের পক্ষে তার মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতের সাথে আমাদের ঐকমত্য রয়েছে বিধায় আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন ঃ

"আমাদের মতে তাদের বক্তব্যই সত্যের অধিক নিকটতর যারা বলেছেন اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বলতে রমযান মাসের দিনসমূহই বুঝায়। তার কারণ, রযমান মাসের রোযা ভিন্ন অন্য কোনো রোযা মুসলমানদের ওপর ফরয ছিল এবং রমযানের রোযার দরুন তা রহিত হয়ে গিয়েছে—নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীও এটাই সপ্রমাণ করে যে, একমাত্র রমযানের রোযাই আমাদের ওপর ফরযকৃত রোযা ; অন্য কোনো রোযা নয়। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ বাক্যাংশও উক্ত দিনসমূহকে সন্দেহাতীতভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। অতএব, যারা রমযানের রোযা ভিন্ন অন্য কোনো রোযা মুসলমানদের ওপর ফরয ছিল এবং রমযানের রোযা দ্বারা তা রহিত হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেন, তাদেরকে তাদের এ দাবির সপক্ষে এমন কোনো বর্ণনা উপস্থাপন করতে হবে যা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হবে।"

বার মাসের মধ্যে মাত্র ত্রিশ বা উনত্রিশ দিনের রোযা। রোযার আত্মিক সুফল ও কল্যাণের বিচারে এটা মোটেই কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নয়, ; নিতান্তই হাতে গোনা ক'টি

দিন। এজন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির অনুসন্ধানকারী এটাকে এতটুকুন দীর্ঘ মেয়াদ মনে করবে না ; মনে করবে নেহায়েত স্বপ্ন ও নগণ্য কটা দিন। কুরআন এর এহেন সম্মান ও মর্যাদা ও মনোরঞ্জনের দিকটিকে সামনে রেখেই এটাকে اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ দ্বারা ব্যক্ত করেছে।

একটি ভুল ব্যাখ্যা

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ঃ এর অর্থ সাধারণভাবেই লোকেরা এটা ধরে নিয়েছে যে, প্রথমদিকে রোযার নির্দেশ অবতীর্ণ হলে আরববাসীদের পক্ষে এ কঠোর ইবাদাতে অনভ্যস্ত থাকার দরুন রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোযা না রেখে একটি রোযার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তক খাদ্যদান করার বিধান ছিল। এটা ছিল সহজতর উদ্দেশ্যে একটা সুযোগ। পরবর্তী পর্যায়ে এ অনুমতি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনোমতেই যথার্থ বলে মনে হয় না।

প্রথম কথা হলো, কেউ ইচ্ছে করলে রোযা রাখবে, ইচ্ছে না হলে রোযা রাখবে না ; তার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে খাবার খাইয়ে দেবে—ব্যাপার যদি তা-ই হবে, তাহলে রোযা ফরয করার যথার্থতা থাকল কোথায় ? রোযার প্রাথমিক নির্দেশের ধরন এরূপ হয়ে থাকলে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হলো)—এ ব্যাক্যাংশ তো একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। কারণ এমতাবস্থা তো রোযার অপরিহার্যতা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ আয়াতাংশ থেকে যেমনটি জানা যায় যে, অসুস্থ ও মুসাফিরদের জন্য তো অন্য সময়ে তাদের কাযা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, কিন্তু যারা রোযা রাখতে সক্ষম ও সামর্থবান তাদের বেলায় এ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হলো, যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা রাখবে না ; শুধু একজন অভাবগ্রস্তকে খাবার খাইয়ে দিলেই চলবে—এটা তো সত্যিই আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর! এর অর্থ তো এটাই দাঁড়ায় যে, অসুস্থ ও মুসাফিরকে তো অবশ্যই রোযা রাখতে হবে ; এমনকি সফর কিংবা অসুস্থতার দরুন নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখতে না পারলেও অন্য সময়ে ঐ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই রোযা রাখা অপরিহার্য নয়, একজন সুস্থ ও মুকিম ব্যক্তিও রোযার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে খানা খাইয়ে দিলেই চলবে।

কেউ কেউ এ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য يُطِيْقُوْنَهٗ -এর অর্থ করেন—"যারা কষ্টের সাথে সামর্থ রাখে।" এ অর্থ করলে উপরোক্ত অভিযোগসমূহ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় এবং كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ বাক্যাংশটিও মোটামুটি অর্থবহ থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত অভিযোগগুলো অপেক্ষা অধিক গুরুতর অভিযোগের উদ্ভব হয়। প্রশ্ন হচ্ছে يُطِيْقُوْنَهٗ-এর এ অর্থ অভিধান থেকে নেয়া হয়েছে নাকি নিজের মন থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে ? আমাদের মতে উক্ত শব্দের এ অর্থ সম্পূর্ণ অভিধান বহির্ভূত। কেউ কেউ

www.pathagar.com

এ দাবি করেন যে, باب افعال -এর মধ্যে বিপরীত অর্থ দানেরও একটা বিশেষত্ব রয়েছে। অতএব اطاقت-এর অর্থ সামর্থ না রাখাও হতে পারে। باب افعال-এর মধ্যে এ বিশেষত্ব থাকার ব্যাপারে আমাদের অস্বীকৃতি বা আপত্তি নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এটা অবিদিত নেই যে, বাবসমূহের এসব বিষয় আশয় ব্যাকরণের সূত্র মতে নয়, বরং শ্রবণ-প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে, শব্দের ব্যবহারটাই আসল কথা। আরবী ভাষাভাষীরা উক্ত শব্দকে উল্লিখিত অর্থে ব্যবহার করে থাকলে এবং তার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলে তবে তো নিসন্দেহে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আরবী সাহিত্যে এবং কুরআন ও হাদীসে উক্ত শব্দকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহারের কোনো দৃষ্টান্ত না থাকলে নিছক باب افعال-এর বিশেষত্বসমূহের মধ্যে নেতিবাচক অর্থ প্রদানের سلب ماخذ একটি বিশেষত্বও রয়েছে—শুধু এটুকুন যুক্তিতেই কোনো শব্দের অর্থ ইতিবাচকের পরিবর্তে নেতিবাচকে পরিণত করে নেয়া যায় না। এটা হবে আরবী ভাষার প্রতি চরম অবিচার এবং দীন ইসলামের মধ্যেও এক মহাফিতনা। যদি কেউ নির্বিচারে এ সূত্রের ব্যবহার করতে আত্মনিয়োগ করেন তবে তিনি দীনের এক বিরাট অংশকে অতি সহজেই হুকুম ও নির্দেশের স্থলে নিষেধ ও অবাঞ্ছনীয় রূপে পরিবর্তিত করে দিতে পারেন।

কোনো কোনো স্বল্প বিদ্যাধারী এও বলেন যে, 'অমুক ব্যক্তি অমুক কাজের সামর্থ রাখে'—এর মানেই হলো, সে কষ্টের সাথে উক্ত কাজের সামর্থ রাখেন। এটা একান্তই শিশুসুলভ বক্তব্য। কাজেই এটা খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই। আমরা কিছুক্ষণের জন্য এটা মেনে নিচ্ছি যে, 'সামর্থ রাখা'-এর মাঝে 'কষ্টের সাথে'—তাৎপর্যও নিহিত আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ সামর্থ কাউকে শরঈ দায়-দায়িত্ব ও দীনী বিধি-বিধান পালনে দায়িত্বশীল করে তোলে নাকি তাকে শরীআতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলে সাব্যস্ত করে ? এটা সর্বজন বিদিত যে, এই সামর্থ মানুষকে বিধান পালনে দায়িত্ববানই করে তোলে, তা থেকে মুক্ত বলে সাব্যস্ত করে না। আপনি যখন বলবেন, আমি অমুক কাজটি করার সামর্থ রাখি, তার পরিষ্কার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, উক্ত কাজটি এমন যে, তার দায়িত্ব আপনার ওপর চাপাবার মর্যাদা রাখে ; এটা নয় যে, তা থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। এটা কোনো ধর্তব্য ব্যাপার নয় যে, আপনি সহজে তা করার সামর্থ রাখেন কিংবা কষ্টের সাথে।

উপরন্তু এদিকটিও বিবেচনার দাবি রাখে যে, 'যারা কষ্টের সাথে রোযা রাখার সামর্থ রাখে'—এ ভাবার্থ বুঝাবার জন্য আরবী ভাষায় বহুসংখ্যক বাকপদ্ধতি ও শব্দ-সম্ভার আরবী ভাষাভাষীদের নিকট জ্ঞাত ও পরিচিত। প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন মজীদ ঐ সকল শব্দ পরিহার করে এমন একটি শব্দ কেন ব্যবহার করল যার ব্যবহার উক্ত অর্থের জন্য কারো জানা নেই ? কেউ যদি বলে ঃ انا اطيق حمل السلاح তাহলে যে কেউ এর অর্থ এটাই বুঝবে যে, সে অস্ত্র বহন করার সামর্থ রাখে। কেউই এটা বুঝবে না যে, সে কষ্টের সাথে অস্ত্র বহন করার সামর্থ রাখে, তাই তাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

www.pathagar.com

দেয়া হোক। অনুরূপ ধরা যাক, কেউ বলল, لنا طاقة بجالوت وجنوده -তবে তার পরিষ্কার অর্থ এটাই হতে পারে যে, জালুত ও তার বাহিনীর সাথে আমাদের মুকাবেলা করার সামর্থ আছে। যদি ধরে নেয়া হয় তার অর্থ এও হতে পারে যে, 'আমাদের সামর্থ নেই বা কষ্টের সাথে আমরা সামর্থ রাখি'—সেক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের যে কথা কুরআনে উক্ত হয়েছে, لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ তাতে না-বাচক 'لا' শব্দটির তো কোনো প্রয়োজনই ছিল না ; বরঞ্চ হ্যাঁ-বাচক অবস্থায়ই সঠিকভাবে তার অর্থ প্রকাশ পেয়ে যেত।

প্রকৃত সমস্যা ও তার সমাধান

যাই হোক, যারা يطيقون শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা নিতান্তই ভুল অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ অর্থ ভুল হলে তার পরিচিত অর্থ গ্রহণের বেলায় আয়াতের ব্যাখ্যা কি হবে ? তার জবাব হলো, এখানে যে সমস্যা তা يطيقون শব্দের মধ্যে নয় ; তার অর্থ তো তা-ই যা সকলের নিকট পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তা ভিন্ন উক্ত শব্দের অন্য কোনো অর্থের সামান্যতম অবকাশও নেই। প্রকৃতপক্ষে এখানে মূল সমস্যা হল يُطِيْقُوْنَهٗ শব্দের শেষে যুক্ত কর্মবাচ্যের অব্যয়টি নিয়ে। অর্থাৎ এটা দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে ? সাধারণভাবে লোকেরা এটা দ্বারা صوم বা রোযা বুঝেছেন। এখান থেকেই ওপরে উল্লিখিত যাবতীয় সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি। কিন্তু এটার অর্থ صوم নয়, বরং طعام বা খাদ্য। তার আলোচনা পরে আসছে। এ ব্যাখ্যা আমাদের পূর্বসূরী ব্যাখ্যাকারদেরও অনেকে গ্রহণ করেছেন। যতদূর মনে পড়ে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর ব্যাখ্যাও এটাই। এ ব্যাখ্যা আমাদের নিকট একেবারে সুস্পষ্ট। কিন্তু কারো কারো মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, طعام শব্দটি ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়নি বিধায় এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত সূচক অব্যয় ব্যবহার করাটা 'পূর্বোল্লেখ ছাড়াই অব্যয় ব্যবহার'—জনিত দোষে দুষ্ট। আর এটা বাক্যের বা বাক-রীতির ত্রুটি বিশেষ ; যা থেকে কুরআনের মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

পূর্বোল্লেখ ছাড়া অব্যয় ব্যবহার বাক্যের একটা ত্রুটি, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা ঐ অবস্থায় ত্রুটি বলে গণ্য, যখন অব্যয় দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুটি বক্তার নিয়তে পূর্বাহ্নে না থাকে এবং তার জন্য সে অব্যয় ব্যবহার করে। কিন্তু উদ্দিষ্ট বিষয়টি বক্তার নিয়তে পূর্বাহ্নে থেকে থাকলে এবং নিছক পুনরুক্তি পরিহার করার বা অলংকার শাস্ত্রের অন্য কোনো প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট বিষয়কে পরে উল্লেখ করতে বাধ্য হলে 'পূর্বোল্লেখ ছাড়া অব্যয় ব্যবহার'—ত্রুটি তো নয়ই ; বরং বাক্যের একটি সৌন্দর্য। আরবী ভাষায় এর প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের মতে, আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় বর্ণিত 'যমীরে শান' (ضمير شان) এ প্রকৃতির অব্যয়। এতেও বক্তা প্রকৃতপক্ষে তার মনের গভীরে নিহিত বস্তু বা বিষয়ের জন্যই অব্যয় ব্যবহার করে থাকে।

এখানে পূর্ণ ব্যাক্যটি এরূপ ছিল ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَ طَعَامَ مِسْكِيْنٍ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (আর যারা একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতে পারবে, তাদের জন্য বিনিময়

স্বরূপ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করলে চলবে।) কিন্তু সে অবস্থায় বাক্য অতিশয় ভারাক্রান্ত হয়ে যেতো। এ কারণে বাক্যের গতিময়তা, সংক্ষিপ্ততা ও অলংকারিত্বের দাবি এটাই ছিল যে, একটি স্থানে طَعَامُ مِسْكِيْنٍ কে বিলোপ করে দিয়ে তার পরিবর্তে অব্যয় বসিয়ে দেয়া হবে। এবং অন্যত্র, যেখানে তার উল্লেখ অপরিহার্য, সেখানে উল্লেখ করা হবে ; যাতে বাক্য অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তির দোষ থেকে মুক্ত থাকে। এতে সন্দেহ নেই যে, এদ্বারা 'পূর্বোল্লেখ ছাড়া অব্যয় ব্যবহার'-এর পরিস্থিতির উদ্ভব অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু লক্ষ করুন, প্রকৃতপক্ষে যার পরিবর্তে অব্যয় নেয়া হয়েছে তা বাক্যে পরে এসেছে সত্য কিন্তু বক্তার নিয়তে তা পরে নয়।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেয়ার পর সমস্যার যে চিত্র আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তা এ নয় যে, যে রোযা ফরয করা হয়েছিল তাতে এ অবকাশ ছিল যে, যারা রোযা রাখতে অনিচ্ছুক, তারা বিনিময়ে একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করেই তা পূরণ করে নিতে পারবে। বরঞ্চ কুরআনের বাণী থেকে তার প্রকৃত চিত্র এটাই ফুটে ওঠে, যারা অসুস্থতা বা সফর জনিত কারণে রমযানের রোযা পালন করতে পারত না তাদের জন্য এ অনুমতি ছিল, অন্য সময়ে রোযা রেখে তারা ঐ পরিত্যক্ত রোযার ক্ষতিপূরণ করে নেবে অথবা একটি রোযার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে তার বিনিময় পূর্ণ করবে। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করেও কাযা রোযার ক্ষতিপূরণ করা যেতো। পরবর্তীতে এ অনুমতি রহিত হয়ে যায়। সামনের আয়াত থেকে এটা আরো পরিষ্কারভাবে জানা যাবে। অর্থাৎ কাযা রোযার পরিবর্তেও রোযা রাখাকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে।

"তবে যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর রোযা ব্রত পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ"-এর অর্থ হচ্ছে, উল্লেখিত কাযা রোযার বিনিময় মূল্য একজন সামর্থবান লোকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন দাবি—যা পূরণ করা অপরিহার্য। কেউ একাধিক অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করলে অথবা তার সাথে অন্য কোনো সদাচার করলে তা অধিকতর কল্যাণকর। উপরন্তু বিনিময় মূল্য প্রদানের এ পদ্ধতি নিছক একটি অনুমতি ও সহানুভূতিমূলক ব্যবস্থাপত্র। আল্লাহর নিকট তো এটাই অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যে, বিনিময় মূল্যের পরিবর্তে অন্য সময়ে রোযা রেখেই তা পূরণ করে দেবে। অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে এটা বলার দ্বারা যেন একথার প্রতিই ইঙ্গিত দিয়ে দেয়া হলো যে, এ অনুমতি একান্তই অস্থায়ী ও সাময়িক—যা অচিরেই রহিত হয়ে যাবে। রোযার সংখ্যা পূরণ করে দেয়াই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট পসন্দনীয়। অতএব, ওপরে যেমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এবং পরেও বলা হবে, কিছুকাল পরেই বিনিময় মূল্য প্রদানের অনুমতি রহিত হয়ে যায় এবং فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ অন্য সময়ে সংখ্যা পূরণ করে নেয়ার নির্দেশই বহাল থাকে।

আয়াত ঃ ১৮৫

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

বাক্যস্থিত ইঙ্গিত থেকে বুঝা যায়, এ আয়াত উপরোক্ত আয়াতের কিছুকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে দুটি জিনিস ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি হলো, রমযান মাসকে মহান আল্লাহ কেন রোযার জন্য নির্বাচন করেছেন। অপরটি হলো, এ যাবত অসুস্থতা ও সফরজনিত কারণে কাযা রোযার জন্য বিনিময় মূল্যের যে অনুমতি ছিল, তা রহিত হলো। এখন থেকে রোযা দ্বারাই রোযার ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হলো।

রোযার জন্য রমযান মাসকে নির্বাচন করার রহস্য

প্রথম রহস্য এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এটাই সে কল্যাণময় মাস যাতে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। হেদায়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা একদিকে যেমন হেদায়াত অপর দিকে তেমনি হেদায়াত ও ফুরকানের সুস্পষ্ট বিবরণও। অর্থাৎ এটি সরল সঠিক পথের দিশা দেয়ার সাথে সাথে জ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণেরও সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দলিল-প্রমাণের সমাহার, যা কখনো পুরাতন বা অচল হবার নয়। هُدًى শব্দের বিশ্লেষণ এ সূরার ২ আয়াত ও فُرْقَانٌ শব্দের বিশ্লেষণ অত্র সূরার ৫৩ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। بَيِّنَات শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও সকল জটিলতা বিদূরণকারী যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ। কুরআন শুধু হালাল-হারাম নির্দেশক আইন-কানুনই নয় ; বরং যুক্তি-প্রমাণ এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট দলিলও। এটি এমন এক অফুরন্ত ভাণ্ডার যা পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানব-বুদ্ধির সঠিক পথ-নির্দেশনার জন্য যথেষ্ট।

এ মহা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় হিসেবে মহান আল্লাহ এ মাসকেই রোযার জন্য নির্ধারণ করেছেন। যাতে বান্দা এতে প্রবৃত্তির তাড়না ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে আপন প্রভুর অধিক থেকে অধিকতর নিকটবর্তী হতে পারে। নিজের কথা ও কাজ, ভেতর ও বাহির এবং দিবস ও রজনী তথা প্রতিটি জিনিসের সাহায্যে এ মহাসত্যের প্রকাশ ও প্রচার করবে যে, তার কাছে আল্লাহ ও তার নির্দেশ ভিন্ন মহত্তর পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

চিন্তাশীলদের পক্ষে এটা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হবার কথা নয় যে, আল্লাহর নেয়ামতরাজির মধ্যে বিবেকবুদ্ধি হল শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত। আর বিবেকবুদ্ধি অপেক্ষা বড় নেয়ামত কুরআন মজীদ। কারণ বিবেকও সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করে কুরআন থেকেই। কুরআন ছাড়া বিবেক বিজ্ঞানের সমূদয় দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাবার

পরও অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে মরে। এ কারণে যে মাসে পৃথিবী এ মহান নেয়ামত পেয়ে ধন্য হলো, সে মাসটিকেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ মাস হিসেবে নির্ধারণ করা শোভন ছিল। যাতে চিরকাল সে অনন্য নেয়ামতের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অব্যাহত থাকে। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার জন্য মহান আল্লাহ রোযার ইবাদাত নির্ধারণ করেছেন, যা মূলত ওই তাকওয়ার প্রশিক্ষণের বিশেষ ইবাদাত ; যার ওপর সমগ্র দীন ও শরীআতের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। আর এ তাকওয়ার অধিকারী তথা মুত্তাকীদের জন্যই মূলত কুরআন পথের দিশারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল বাকারার একেবারে শুরুতেও কুরআন ঠিক এ সত্যটিই তুলে ধরেছে। বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (এটি ঐশী গ্রন্থ। ঐশী গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে এতটুকুন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য সঠিক পথের দিশারী হিসেবে নাযিল হয়েছে।) যেন কুরআনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিন্যাস এভাবে করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানময় কুরআনের প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট, যাদের মধ্যে তাকওয়ার প্রাণশক্তি বিদ্যমান। আর তাকওয়ার প্রশিক্ষণের বিশেষ উপায় হলো রোযার ইবাদাত। এজন্য মহামহিম ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ওই মাসকে রোযার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন যাতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। অন্য কথায়, এভাবেও বলা যেতে পারে যে, কুরআন এ পৃথিবীর জন্য বসন্ত তুল্য। আর রমযান মাস হলো বসন্তকাল। আর এ বসন্তকাল যে ফসলের লালন ও বিকাশ সাধন করে তা তাকওয়ার ফসল বৈ নয়।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-

পূর্ববর্তী বাক্যটি ছিল উদ্দেশ্য (বা مبتداء), এটি তার বিধেয় (বা خبر)। অর্থাৎ এ মাসটি তার উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে রোযার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অতএব যে এ মাসটিতে উপস্থিত থাকবে, সে যেন এ পুরো মাসে রোযা রাখে। উপস্থিত থাকার তাৎপর্য একটু পরেই আগত বাক্য থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ সে যদি পর্যটনরত বা অসুস্থ অবস্থায় না থাকে। আর فَلْيَصُمْهُ -এর অর্থ সে যেন পুরো মাসের রোযা রাখে, তাতে কোনোরূপ কম-বেশী না করে। আর অসুস্থ কিংবা সফররত থাকার দরুন রোযা পুরো করতে না পারলে, অন্য সময়ে রোযা রেখে এ অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে দেবে। এরপর পূর্ববর্তী বাক্যাংশ ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ، وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। তার মানে, মূল বিধানে এ অংশ পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে। সফর বা অসুস্থতার সময় ছুটে যাওয়া রোযার জন্য এ যাবত চলে আসা বিনিময় মূল্য প্রদানের অনুমতি বাতিল হয়ে গেল। কারণ উপরোক্ত আয়াতে যেমনটি বলা হয়েছিল, এক্ষণে তা যথারীতি বিলোপ করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

রোযার বিধানের গূঢ়তত্ত্ব

একটু পরেই يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত আরোহ পদ্ধতিতে ওপরের সকল বিধানের গূঢ়তত্ত্ব ও উপযোগিতা ব্যক্ত করা হয়েছে। ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো আরেকবার স্মরণ করে নিন। প্রথমত, বর্ণিত হয়েছে, রোযার জন্য রমযান মাস কেন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিনিময় মূল্য বা ফিদ্‌ইয়া রহিত করে দেয়া হয়েছে ; এখন থেকে সফর বা অসুস্থতাকালীন রোযার সংখ্যাও পূর্ণ করতে হবে। এবং তৃতীয়ত, সফর অথবা অসুস্থতাজনিত কারণে অন্য সময়ের জন্য রোযা স্থগিত করা যাবে।

এ তিনটিরও গূঢ়তত্ত্ব ও কারণ নীচে থেকে ওপরের দিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সফর ও অসুস্থতাকালীন রোযাকে মূলতবী রাখার অনুমতি তোমাদেরকে এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা করতে চান। তিনি তোমাদের কোনোরূপ কষ্টে ফেলতে চান না। রোযার বিনিময় প্রদান প্রথার অনুমতি রহিত করে দেয়ার কারণ ঃ তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ কর এবং ঐ কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থেকো না। যা এর মাঝে নিহিত আছে। আর রমযান মাসকে রোযার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার কারণ এটাই যে, তোমরা এ মহা নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ; যা তোমাদেরকে এ মহা কল্যাণময় মাসে কুরআনের আকারে প্রদান করা হয়েছে। এরূপ আরোহ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত সূরা কাসাসের ৭৩ আয়াত ও সূরা আনফালের ১১ আয়াতেও রয়েছে।

لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ -এতে তাকবীর দ্বারা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে আল্লাহ যে মহিয়ান ও গরিয়ান এবং তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতির ঐ অবস্থা যা একজন রোযাদারের ওপর রোযার অবস্থায় কার্যত প্রতিভাত হয়। যার কারণে বান্দা একমাত্র তার প্রতিপালকের রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির জন্যই তার একান্ত বৈধ চাহিদাসমূহও বর্জন করে। মুসলিম শরীফের একখানি হাদীস থেকে এ সত্যই প্রতিভাত হয়ে ওঠে ঃ

كل عمل ابن ادم يضاعف، الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف، قال اللّٰه تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به، يدع شهوته وطعامه من اجلى، -"বনী আদমের প্রত্যেকটি সৎকাজ দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, একমাত্র রোযার ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। এটা একান্তভাবে আমারই জন্য এবং আমি নিজ হাতে এর বিনিময় দেব। কারণ, বান্দা শুধু আমারই জন্য তার সকল চাহিদা তথা কামনা-বাসনা পানাহার বর্জন করে।"

এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, গর্ভবর্তী, স্তন্যদায়িনী ও নিরতিশয় বৃদ্ধ ইত্যাদির বেলায় হাদীসে যে অনুমতি বা অব্যাহতির কথা বলা হয়েছে তা প্রধানত يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -এর নীতি বা অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য বর্ণিত অব্যাহতির ওপর ভিত্তিশীল। বিজ্ঞানময় কুরআনের জ্ঞানময়তাকে নবী (স) তার গভীর মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রশস্ততা দান করেছেন। যারা يُطِيْقُوْنَ শব্দ থেকে গর্ভবতী বা

www.pathagar.com

স্তন্যদায়িনী ইত্যাদির বিধান নির্গত করার চেষ্টা করেছেন তারা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন দুটি জিনিস জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ইতোপূর্বে অমরা এর খণ্ডন করে এসেছি।

আয়াত ঃ ১৮৬

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ط أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

সন্দেহ ও সংকটে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ

এ আয়াত ওই সকল প্রশ্নের জবাবের ভূমিকা, যা রোযার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর রমযান মাসের সম্মান ও রোযার বিধান ও আদব-সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছিল অথবা তাদের কথায় প্রকাশ পেয়েছিল এবং মহান আল্লাহ তা ব্যক্ত করেছিলেন। এদেরকে কুরআন এ পথনির্দেশ দান করেছে যে, নিজেদের এ জাতীয় সন্দেহ ও আপত্তিসমূহকে তারা যেন আল্লাহ ও তার শরীআতের বিরুদ্ধাচরণ বা তার সমালোচনা ও হাসি-ঠাট্টার হাতিয়ার বানিয়ে না নেয়। বরং এক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশনা লাভের জন্য আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। যে নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজের কোনো সত্যিকার প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তার চাহিদা অবশ্যই পূরণ করে থাকেন ; চাই তা পার্থিব প্রয়োজন হোক কিংবা পারলৌকিক, মানসিক ও জ্ঞানগত জটিলতা সম্পর্কিত হোক বিধানের উপকারিতা ও উপযোগিতা বিষয়ক।

মুনাফিকদের অভ্যাস ছিল, দীন সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যা অনুভব করলেই তারা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার পরিবর্তে ঐ উক্ত বিষয়কে আপত্তি ও হাসি-ঠাট্টার লক্ষস্থলে পরিণত করতো এবং মুসলমানদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির এক অভিযান শুরু করত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ স্বভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা মুযাদালায় এর কতক গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে ওঠেছে। কুরআন মজীদ ঈমানদারদের প্রশংসনীয় গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে। তারা নিজেদের সমস্যা-সংকটের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ তাদের সংকট দূরীভূত করে দেন।

এ ভূমিকা একটি সর্বাত্মক ভূমিকা যা সর্ববিধ বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত। কিন্তু এখানে এর সম্পর্ক—যেমনটি ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে—বিশেষ করে রমযান মাস ও তার রোযা পর্যায়ে কতক প্রশ্নও তার জবাবের সাথে সম্পর্কিত। মুসলমানদের মনে এসব প্রশ্নের সৃষ্টি হলে কুরআন তার উত্তর প্রদান করে এবং একই সাথে তাদের উৎসাহ প্রদান করে যে, আল্লাহ ও তার শরীআত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হলে আল্লাহর প্রতিই তাদের প্রত্যাবর্তন করা কর্তব্য ; আল্লাহই সর্বপেক্ষা নিকটতম এবং তিনিই সকলের সংকট মোচন করেন।

www.pathagar.com

إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ঃ 'আমার সম্পর্কে প্রশ্ন'-এর অর্থ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন হওয়াই জরুরী নয়। এ প্রশ্ন তাঁর সত্তা ও গুণাবলী। তাঁর পসন্দ-অপসন্দ এবং তাঁর বিধান ও শরীআত সবকিছুকেই শামিল করতে পারে। এখানকার বাচনভঙ্গি এটাই প্রমাণ করে যে, রমযান সম্পর্কিত মূল বিধান নাযিল হওয়ার পর সৃষ্ট রমযান মাসের রোযা এবং রোযার আদব ও শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধানসমূহের সাথেই এ প্রশ্নের সম্পর্ক। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নাবলী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন প্রদত্ত জবাব থেকেই প্রশ্নের ধরন বুঝা যায়। প্রশ্ন সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার একটি কারণ হল, বাণীকে অপ্রয়োজনীয় দৈর্ঘাকৃতি থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, কুরআন মজীদে প্রদত্ত জবাবগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরঞ্চ যখন তার কল্যাণ বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তখন শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুকেই সিক্ত ও পরিতৃপ্ত করে দিয়েছে। জবাবের এ প্রশস্ততা ও সর্বাত্মকতার দাবি এটাই ছিল যে, প্রশ্ন অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা হবে। যাতে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্যহীনতা পরিলক্ষিত না হয়। এ বিষয়ের ওপর পরে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তাই এখানে শুধু ইঙ্গিত প্রদান করাই যথেষ্ট মনে করছি।

আল্লাহ ও বান্দাহর সম্পর্ক

فَإِنِّي قَرِيبٌ ঃ এটি একটি বাস্তব সত্যের প্রকাশ বৈ নয়। কারণ আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্য ও দূরত্ব নির্ভর করে বান্দার অন্তরের অবস্থার ওপর। বান্দা যদি আল্লাহ থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী থাকে তাহলে তার থেকে দূরবর্তী আর কিছুই নেই। কিন্তু সে যদি আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকে, তাঁর স্মরণে অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখে, তাঁর নেয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষায় তাঁরই কাছে ধৈর্য ও স্থৈর্যের জন্য কান্নাকাটি করে, তবে আল্লাহ ভিন্ন কোনো কিছুই বান্দার এতটা নিকটবর্তী নয়। তিনি তো তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা নিকটতর।

এ নৈকট্য বান্দার জন্য সর্বত্র ও সর্বাবস্থায়ই রয়েছে। কিন্তু, এখানে যেমনটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, নবীর আবির্ভাবের যুগ সাধারণতই আল্লাহর সাথে নৈকট্য ও সম্পর্কের বিশেষ যুগ হয়ে থাকে। নবী আল্লাহর প্রতিনিধি ও বান্দার মুখপাত্র হয়ে থাকেন। আল্লাহর ফেরেশতা প্রতিনিয়ত তার নিকট গমনাগমন করেন। তাঁর ও আল্লাহর মাঝে অহীর ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকে। বান্দা নিজেদের যেসব সমস্যা ও প্রশ্নাবলী নবীর সামনে উপস্থাপন করে। যেন তা তাঁর মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের কাছেই উপস্থাপিত করে। অহীর যুগ হওয়ার দরুন প্রতি মুহূর্তে তার নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নের জবাব নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সূরা মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াতটি এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করেছে ঃ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ - "কুরআন অবতরণের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হবে।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্যাপার এটা নয়। আসল কথা হলো, প্রাথমিক নির্দেশে এরূপ কোনো স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ছিল না বিধায় মুসলমানদের অনেকেই সাবধানতা ও তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ধরে নিয়েছিল যে, রোযা অবস্থায় দিনের বেলা যেরূপ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অনুমতি নেই, তদ্রূপ রাতের বেলাও হয়তো তার অনুমতি থাকবে না। এ থেকেও এ ধারণা প্রবল হয়ে থাকতে পারে যে, ইহুদীদের মধ্যে রোযার ইফতার করার পরপরই আবার রোযা শুরু হয়ে যাওয়ার প্রচলন ছিল। যার জন্য তারা দিনের বেলা রোযার জন্য যেসব বাধ্যবাধকতা মেনে চলত রাতের বেলাও তাদের একই বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হতো। মুসলমানদের সামনে কিতাবধারীদের রোযাই ছিল এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। কুরআনেও এর বরাত দেয়া হয়েছিল। এ কারণে তারা আপনা থেকেই দিবাভাগের ন্যায় রাতের বেলাও নিজেদের ওপর স্ত্রীসহবাস বর্জনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা না আসার দরুণ ব্যাপারটি ছিল সন্দেহপূর্ণ। এ সন্দেহের কারণে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ যৌন উত্তেজনা বশতঃ স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়ত। এটা তাদের নিজেদের কাছেও সন্দেহপূর্ণ ঠেকত। সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে হাদীসের দিকনির্দেশনা হলো ঃ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ অর্থাৎ 'সন্দেহপূর্ণ জিনিস বর্জন করে, যা সন্দেহ মুক্ত তা গ্রহণ কর।' এর বিপরীতে সন্দেহপূর্ণ কোনো জিনিস গ্রহণ করা মানেই নিজের সাথেই নিজের এক প্রকার বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এজন্য কুরআন এটাকে 'আত্মপ্রতারণা' বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু এ সাবধানতা যেহেতু শরীআতের উদ্দেশ্যের বিপরীত ছিল—যা মুসলমানরা আপনা থেকেই নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিল—এ কারণে মহান আল্লাহ এ বিশ্বাস ভঙ্গকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে রাতের বেলা স্ত্রীসহবাসের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য পোশাক হওয়ার রূপক উপমার অলংকার

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ঃ (তারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, এখানে তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ইঙ্গিত দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য, তাদের মধ্যে যে ধরনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং পরস্পর এমন সব অন্যান্য প্রাকৃতিক বন্ধনে তারা আবদ্ধ যে, কোনো অবস্থাতেই তাদের একজনকে অপরজন থেকে পৃথক রাখার অবকাশ নেই। এজন্য স্বভাবধর্ম ইসলাম তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি যা তাদের পরস্পরের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ অবস্থায় সীমিত পর্যায়ের কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলেও তা নিছক আত্ম-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পর্যন্ত সীমিত, এর চেয়ে এতটুকুন বেশী নয়।

স্বামী ও স্ত্রীর জন্য পোশাকের রূপক উপমা একটি অতি উঁচু পর্যায়ের উপমা। তার কিছু দিকের ওপর আমরা এখানে আলোকপাত করছি। পোশাকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটা মানুষের দেহকে ঢেকে রাখে। এদ্বারা তার লজ্জাস্থানের গোপনীয়তা

www.pathagar.com

সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয়। এটা না হলে মানুষ উলঙ্গ হয়ে পশুর কাতারে নেমে যেত। তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের মধ্যে বর্তমান দৈহিক আকর্ষণ ও চাহিদার দরুন একজন অপরজনের জন্য আবরণ স্বরূপ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে আকর্ষণ উভয়ের মধ্যে জাগ্রত হয় তা তাদের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্য সততই নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এ কারণে তাদের কখনো উলঙ্গ ও অনাবৃত হওয়ার সুযোগ বা উপলক্ষ আসে না। এটা না হলে যৌন উত্তেজনার প্রাবল্য এমন এক যৌন স্বেচ্ছাচারিতার জোয়ার সৃষ্টি করত যা নৈতিক পবিত্রতার বাঁধনকে ছিন্নভিন্ন করে দিত। দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতঃই আকর্ষণীয় সেগুলো উলঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হতো। জিহ্বা ও কলম অশ্লীলতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হতে ও যথেচ্ছা প্রলাপ বকতে শুরু করত। মন-প্রাণ সর্বত্র ঘুরে বেড়াতো ও দৃষ্টি ভবঘুরে হয়ে পড়ত। আমাদের দেহ সত্তাকে এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষার একমাত্র উপায় স্ত্রীর জন্য স্বামী এবং স্বামীর জন্য স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এজন্যই নবী করীম (স) বিবাহকেই দৃষ্টিকে নির্লজ্জতার হাত থেকে হিফাযত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বলে অভিহিতো করেছেন। লজ্জা সম্পর্কে এটা সর্বজন বিদিত সত্য যে, লজ্জা স্বতঃই একটি প্রচ্ছন্ন পোশাক। আরো সত্য কথা হলো, আসল পোশাক মূলত এটাই। আভ্যন্তরীণ এ পোশাকের তাগিদেই আমরা বাহ্যিক পোশাক ধারণ করে থাকি। আর লজ্জা ধরে রাখার জন্য স্বামী স্ত্রীর দ্বারা এবং স্ত্রী স্বামীর দ্বারা যে সাহায্য পেয়ে থাকে এটা অন্য কিছুর দ্বারাই সম্ভব নয়।

এর অপর দিক হলো এটা সৌন্দর্য। এটার স্থান লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার উর্ধে। মানুষ পোশাকের সাহায্যে সাজ-সজ্জা, শোভা-সৌন্দর্য এবং ভদ্রতা ও পরিমিত বোধ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে এবং কৃষ্টি ও সমৃদ্ধির ময়দানে পা রাখে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটাই উচ্চতর পর্যায়ে স্ত্রী স্বামীর সাহায্যে এবং স্বামী স্ত্রীর সাহায্যে লাভ করে থাকে। আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন, যেদিন থেকে পুরুষ ও নারীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন থেকেই মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভীত স্থাপিত হয়েছে। এটা স্বতঃই এক মহাসত্য, বৈ নয়।

এটা বাস্তব সত্য যে, পুরুষের মধ্যে ঘর-বাড়ীর আকাঙ্ক্ষা, শোভা-সৌন্দর্যের প্রবণতা ও ধন-সম্পদ আহরণের উদ্দীপনা মূলত নারীর সাথে সম্পর্কের দরুনই সৃষ্টি হয়েছে। পরে অন্যান্য উপায়-উপাদানের যোগান দ্বারা এতে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। একইভাবে নারীর সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা, তার সুশিক্ষা ও সদাচার, ঘরকন্নার প্রতি উৎসাহ ও একাগ্রতার জন্য মূলত পুরুষকে জয় করার আকাঙ্ক্ষাই দায়ী। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কেউ নিজের এ স্বাভাবিক প্রেরণার উৎস থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়লে তাদের উপরোল্লিখিত যাবতীয় উদ্যম-উৎসাহ নির্বাপিত হয়ে পড়তে বাধ্য। পুরুষ স্ত্রী-বঞ্চিত হয়ে পড়লে একজন মুসাফির তথা রীতিমত ভবঘুরে হয়ে পড়ে। অনুরূপ নারী স্বামী থেকে আলাদা বা বঞ্চিত হয়ে পড়লে তার সমস্ত অনুভূতি মৃত এবং তার সমস্ত কলকব্জা মরিচা-ভারাক্রান্ত ও ভোঁতা হয়ে যায়। নারী ও পুরুষের এ জুড়ি ও সম্পর্কের কল্যাণেই পারিবারিক জীবনের ঐ সকল সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি আমাদের ভাগ্যে জোটে যদ্বারা পৃথিবীতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পোশাকের তৃতীয় উপকারিতা হলো, ঠাণ্ডা ও গরমের অপকারিতা এবং শত্রুর অনেক অনিষ্ট ও বিপদ থেকে মানুষকে এটি রক্ষা করে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদেও উক্ত হয়েছে যে, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ -(আমরা তাকে এমন পোশাক তৈরীর কৌশল শিক্ষা দিয়েছি যা তোমাদেরকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।) নৈতিক দিক থেকে স্বামীর জন্য স্ত্রী ও স্ত্রীর জন্য স্বামীও ঠিকই একই রূপ রক্ষা কবচ। স্ত্রী স্বামীর জন্য বর্ম স্বরূপ এবং স্বামীও স্ত্রীর জন্য বর্ম স্বরূপ। উভয়ই যদি তাদের নিজ নিজ বর্ম ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার নিয়ে সজ্জিত থাকে তাহলে শয়তানের আক্রমণ তাদের কারো ওপরই কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে তারা এ পোশাক-বর্জিত বা উলঙ্গ হলে উভয়েই শয়তানের হামলায় আক্রান্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বাণী হলো ঃ "তোমরা সফরে কিংবা নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে—সর্বাবস্থায় স্ত্রীকে গলার তাবিজ বানিয়ে রেখ, তাহলে শয়তানের আক্রমণ থেকে তোমরা সুরক্ষিত থাকতে পারবে।"

পোশাকের এ তিনটি উদ্দেশ্যই পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে এবং এ তিনটি দিকের বিচারেই নারী পুরুষের জন্য এবং পরুষ নারীর জন্য পোশাকের মর্যাদা রাখে। এ কারণে ফিতরাতের ধর্ম ইসলাম তাদের সম্পর্কের এ স্বাভাবিক গুরুত্বকে মেনে নিয়েছে এবং এটাকে শুধু তাকওয়া পরিপন্থী বলে আখ্যা দেয়নি তা নয় ; বরং ওপরের বিবরণ থেকে যেমনটি জানা গেল, এটাকে বিভিন্ন বিচারে তাকওয়ার সহায়ক বলে আখ্যা দিয়েছে। অতএব, প্রথম প্রথম মুসলমানরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বা কিতাবধারীদের প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ব্যাপারে নিজেদের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করে নিয়েছিল এ আয়াত দ্বারা তা দূর করে দেয়া হয়েছে।

'খিয়ানত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ?

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ ঃ (আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত তথা আত্মপ্রতারণা করছ।) কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ছিল, রমযান মাসে দিনের বেলা যেরূপ স্ত্রীসম্ভোগ অবৈধ তদ্রূপ রাতের বেলায়ও তা অবৈধ। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করে। এটাকে কুরআন আত্মপ্রতারণা বলে অভিহিত করেছে। এটার কারণ তা-ই যে সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। তাহলো, সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে তার ওপরই আমল করা কর্তব্য যাতে সাবধানতা নিহিত রয়েছে এবং সেটাই আঁকড়ে থাকা উচিত। তার বিরুদ্ধাচারণ করলে তার মানে এই দাঁড়ায় যে, তার ইজতেহাদ ও ধারণামতে যা শরীআতের নির্দেশ (যদিও তা প্রকৃতপক্ষে শরীআতের নির্দেশ নয়), সে তার বিরুদ্ধাচারণ করল। আর এটা স্পষ্টতই আত্মপ্রতারণা, বৈ নয়। আমাদের মতে, এ থেকেই এ মূলনীতি প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদের পক্ষে তার ইজতেহাদের ওপর আমল করা কর্তব্য। কোনো বিষয় তার ইজতিহাদ অনুযায়ী সঠিক বলে মনে হলে তার বিরুদ্ধাচারণ করা তার পক্ষে বৈধ নয়। তবে দীনের দাবিই যদি তা হয়ে থাকে তবে তা স্বতন্ত্র। কিন্তু লোকদের নিজেদের ওপর

উপরোক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করে নেয়াটা আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীত ছিল বিধায় আত্মপ্রতারণার জন্য মহান আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেননি বরং সাথে সাথে তাদের ক্ষমাও করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীসহবাসের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

দাম্পত্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ঃ (এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন তা অন্বেষণ কর।) অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের আসল উদ্দেশ্য—সন্তান কামনা কর। এবং মনে রেখ, এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্ধারিত লিখনীর ওপর নির্ভরশীল ; তোমাদের ইচ্ছা ক্ষমতা বা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো কর্মকুশলতার ওপর নয়। একথার বরাত দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য নিছক ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করাই নয় বরং এর আসল লক্ষ বংশ রক্ষা করা। আর এটাই আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য। মানুষ শুধু ইন্দ্রিয় সুখের প্রত্যাশী হয়ে পড়লে মানুষের ওপর তার মন্দ প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ থাকলে এটাও ইবাদাতের মধ্যেই শামিল। বর্তমান যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যের মূলোচ্ছেদ করে দিচ্ছে এবং ইন্দ্রিয় সুখকেই আসল উদ্দেশ্যের মূল্য ও গুরুত্ব দিচ্ছে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ঃ (আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।) এটা আমাদের রোযাকে কিতাবধারীদের রোযা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়। তাদের মধ্যে রাতের বেলা উঠে পানাহার বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করার অনুমতি ছিল না। ইসলাম কেবল এর অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এর ওপর বেশ জোরও দিয়েছে। কুরআনের ভাষা থেকে এটাও বুঝা যায় যে, পানাহারের এ অনুমতি সুবহে সাদেক ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত। হাদীস ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর আমল থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এজন্য নিছক সাবধানতার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম হওয়ার দরুন নিজের অথবা অন্যদের রোযাকে সামান্য আগপিছ হওয়ার জন্য সন্দেহপূর্ণ বলে আখ্যা দেয়া কিছুতেই সঠিক নয়।

কুরআনের এ বাণী এতটা সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুদের যুগে কারো কারো পক্ষে এ তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হওয়ার কারণ কি তা ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে। আদী ইবনে হাতেম (রা)-এর বর্ণনা—যা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থেও উক্ত হয়েছে যে, তিনি ফজরের সময় নির্ধারণের জন্য সাদা ও কালো দুটি সূতা বেঁধে নিয়েছিলেন। বর্ণনাটি প্রকৃতই যদি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে একে নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সাধারণভাবে বিরাজমান কঠোর সাবধানতা হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

www.pathagar.com

এ'তেকাফ বলতে কি বুঝায় ?

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ঃ (তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সংগম করো না। عَكْفٌ এর মূল অর্থ নিজেকে কোনো জিনিস থেকে বিরত রাখা, বাধা দেয়া বা আটকে দেয়া। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ প্রত্যেক জিনিস থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর স্মরণের জন্য নির্জনবাসী হয়ে যাওয়াকেই এ'তেকাফ বলা হয়। কুরআনের ভাষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, রমযান মাস ও মসজিদের সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। মহানবী (স)-এর আমল ও তাঁর বাণী থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

এ'তেকাফের উদ্দেশ্য تَبَتُّلْ اِلَى اللّٰه তথা আল্লাহর স্মরণে একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হওয়া ও তাতে অন্তরের একাগ্রতা অর্জিত হওয়া। মসজিদে অবস্থানও তার জন্য অপরিহার্য শর্ত। এ কারণে এ'তেকাফকালীন সময়ে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ঃ এর অর্থ এই যে, আল্লাহ প্রবৃত্তির স্বাধীনতার জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন পূর্ণ সতর্কতার সাথে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এমনকি নিজেকে তা থেকে রক্ষা করার জন্য ঐ সীমা থেকে দূরে দূরেই রাখতে হবে। কারণ, যে চতুষ্পদ জন্তু কোনো চারণ ক্ষেত্রের একেবারে কাছাকাছি বিচরণ করে, তার পক্ষে উক্ত চারণভূমিতে ঢুকে পড়ারই সমূহ আশংকা থাকে।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ঃ (এভাবে আল্লাহ মানব জাতির জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।) ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, কোনো বিধান নাযিল হওয়ার পর লোকদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বা নিছক অবস্থার চাহিদার আলোকে উক্ত বিধান সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হলেই সাধারণত এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ সূরাতেই এর কতক উদাহরণ সামনে আসছে। এজন্য এখানে আমরা তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার কোনোই প্রয়োজন মনে করছি না। এ ধরনের বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা তাকওয়া অন্বেষণকারীদের জন্য তাকওয়ার নতুন নতুন পথ খুলে যায় বিধায় বলা হয়েছে- لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ –অর্থাৎ যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।

৬৩. মানুষের কর্মক্ষমতার ওপর রোযার প্রভাব

বর্তমান যুগে যারা পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত তারা রোযা সম্পর্কে এ আপত্তি উত্থাপন করে থাকে যে, এদ্বারা মানুষের কাজ করার যোগ্যতা ও কর্মশক্তি দারুণভাবে কমে যায়। যদ্দরুন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মতে এ আপত্তিকারীরা দুটি মৌলিক সত্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমত, তাদের দৃষ্টিতে মানুষের যা কিছু মূল্য ও মর্যাদা তা নিছক তার জড় অস্তিত্বের। তাদের দৃষ্টিতে মানুষের আত্মিক অস্তিত্বের কোনোই মূল্য ও মর্যাদা নেই। তাদের মতে একটি মোটা তাজা ষাঁড় যেরূপ অধিক হাল চাষ করতে সক্ষম তদ্রূপ একজন পেট-ভর্তি ও পরিতৃপ্ত ব্যক্তি অধিক কাজ করতে সক্ষম। এরা আমাদের অন্যতম সেরা নবী হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর সে প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিতো যাতে তিনি বলেছেন ঃ মানুষ কেবল ভাত-রুটিতেই বাঁচে না, বরং ঐ বাণী দ্বারা বেঁচে থাকে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। অনুরূপ তারা ঐ মহাসত্য সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ যা নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ انى ابيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى –"আমি এমতাবস্থায় রাত কাটিয়ে দিই যে, একজন খাবার পরিবেশনকারী আমাকে খাইয়ে দেয় এবং এক পানীয় পরিবেশনকারী আমাকে পান করিয়ে দেয়।"

মানুষকে যদি শুধু অস্থি ও রক্ত মাংসের সমন্বয়ে গড়া একটি সত্তা মাত্র মনে করা হয়, তবে তো নিসন্দেহে আপত্তিকারীদের আপত্তির কিছুটা সারবত্তা রয়েছে বলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের ভেতর আত্মা বলে কোনো পদার্থ আছে কিনা ? আর থেকে থাকলে তার জন্য কোনো খাদ্য ও পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা আছে কিনা ? যদি তার প্রয়োজন থেকেই থাকে, তাহলে প্রশ্ন হলো, এই দুধ-মাখন—যদ্বারা আমাদের এ দেহ পিঞ্জর পরিপুষ্ট হয়।—তাই তার জন্য যথেষ্ট নাকি তার জন্য এছাড়া অন্য কোনো পরিচালন-ব্যবস্থা ও খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে ? ধর্ম এ প্রশ্নের জবাবে বলে, মানুষের অভ্যন্তরস্থ আত্মা নামক মহামূল্য পদার্থটি পার্থিব নয়। এটি একটি অপার্থিব আল্লাহপ্রদত্ত জিনিস। এজন্য তার খাদ্য এ পৃথবী থেকে নয়, বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ এবং তার বাণী ও প্রত্যাদেশের সাহায্যে অর্জিত হয়ে থাকে। আত্মার বাহন মূল্যহীন এ দেহ পিঞ্জর যখন মোটামুটিভাবে তার সকল দৈহিক চাহিদা ও দাবী-দাওয়া, আবেগ ও ঝোঁক-প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়। তখনই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নিকটতর ও সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা এসব নিচ বাধ্য-বাধকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে তার স্বভাব জনিত মূল বিচরণ ক্ষেত্রে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পারে না। সে তো তার জন্য নির্ধারিত বিচরণ ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দে বিচরণ ও উড্ডয়নের দ্বারাই তার প্রকৃতিতে নিহিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে এবং বাজপাখী সদৃশ উন্নতি ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে।

রোযা আত্মাকে এ স্বাধীনতা দেয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এর সাহয্যে মানবাত্মার যে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে তার সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এতে আত্মার ওপর কামনা-বাসনা ও যৌন-উত্তেজনার প্রাধান্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। এতে করে সে কামনা-বাসনার একান্ত অনুগত দাস হয়ে তার পেছনে পেছনে চলার পরিবর্তে এক সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানের অধিকারী হয়ে ওঠে। তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ঝোঁক-প্রবণতাকে আপন প্রভুর সন্তুষ্টি ও তার বিধি-নিষেধের পেছনে নিয়োজিত করে দেয়।

www.pathagar.com

চিন্তা করলে এখান থেকেই এ মহাসত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার মূল ভাণ্ডার তার দেহাভ্যন্তরে নয় ; বরং তার অন্তঃকরণ ও আত্মার মাঝে নিহিত। অন্তর দুর্বল ও আত্মা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে অত্যন্ত আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগের মাঝে লালিত-পালিত দেহের অবস্থান সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক দ্বারা সজ্জিত নিছক স্থূল কাষ্ঠখণ্ড সদৃশ। কুরআন এ ধরনের লোকদের خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ বলে অভিহিত করেছে। এবং এদের রীতি ও কাপুরুষতার চিত্র অংকন করেছে। يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ শব্দগুচ্ছ দ্বারা। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কোনো ভয় ও বিপদ দেখা দিলে তাদের অন্তরাত্মা কাঁপতে থাকে যে, বুঝি আমাদেরই গোলাঘরে এ বজ্রপাত হবে। পক্ষান্তরে যাদের আত্মা জাগ্রত, যাদের অন্তঃকরণ দৃঢ় মনোবল এবং যাদের উদ্যম-আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর লক্ষ্যাভিসারী তারা যবের রুটি খেয়ে দিন গুযরান করলেও আলী হায়দারের বাহুর কৃতিত্বের ইতিহাস রচনা করে। এ সত্যের প্রতিই কুরআন ইঙ্গিত করেছে এভাবে ঃ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ -"কতনা ছোট ছোট দল আল্লাহর অনুমতিক্রমে বড় বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। একই জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে কবি বলেছেন ঃ

"আমার তো ভয় শুধু মরে যায় কিনা যিন্দা দিল,
তোমার বেঁচে থাকাতেই তো পৃথিবীর বাঁচা নির্ভরশীল।"

আপত্তিকারীরা দ্বিতীয় যে সত্যটি সম্পর্কে উদাসীন, তাহলো, কোনো জিনিসের সাময়িক প্রভাব ও ফলাফল দ্বারা তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করা যায় না জীবনের ওপর তার সঠিক ও স্থায়ী যে প্রভাব পড়ে বা পড়ার সম্ভাবনা থাকে তদ্বারাই নিরূপণ করা যায়। তবে শর্ত হলো, কাজটি সঠিকভাবে পালন করতে হবে। হতে পারে, কোনো ঔষধ মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত পরীক্ষিত ও উপকারী তার প্রভাব ও ফলাফলও অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া অলসতা, অবসাদ বা নিদ্রালুতার আকারে দেখা দেয়। এটা স্পষ্ট যে, এ ওষুধের তাৎক্ষণিক প্রভাবকে প্রমাণ সাব্যস্ত করে তাকে একটি ক্ষতিকর ও মূল্যহীন ওষুধ বলে সিদ্ধান্ত নেয়া কিছুতেই সঠিক নয়।

রোযার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এর তাৎক্ষণিক প্রভাব—বিশেষ করে অপরিপক্ক ও নবাগতদের ওপর—অবশ্যই অলসতা ও অবসাদ আকারে প্রকাশ পায়। যদ্দরুন সাময়িকভাবে তাদের কর্মক্ষমতার ওপরও প্রভাব পড়ে থাকে। কিন্তু এ সাময়িক প্রভাবটা ধর্তব্য নয়। ধর্তব্য তো হলো, ঐ স্থায়ী প্রভাব যা মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জীবনের ওপর পড়ে থাকে (এখানেও শর্ত হলো, যদি তা সঠিকভাবে পালন করা হয়।

উপরে আমরা পড়ে এসেছি, রোযার আরবী প্রতিশব্দ صوم ; এর আভিধানিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম, প্রথম দিকে এ শব্দটি ওই সকল ঘোড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, যেগুলোকে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হতো। 'আর

www.pathagar.com

এ প্রস্তুতির জন্য ওদের খাদ্য-পানীয় কমিয়ে দেয়া হতো। যাতে ওরা দৌড়-ঝাঁপ করার মত হালকা-পাতলা গড়নের হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের ময়দানের বিভীষিকা ও ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট স্বীকার করতে বিশেষভাবে সক্ষম ও সমর্থ হয়। এটা স্পষ্ট যে, ঘোড়ার ওপর এসব ক্রিয়া-কর্মের অনুশীলন তার কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তার কর্মক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলার জন্যই করা হতো। যাতে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিপূরণে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে। সযত্নে লালিত একটি ঘোড়ার ওপর যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশিক্ষণের প্রভাব ভাল হয় না ; সে দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রশিক্ষণ দানকারীদের দৃষ্টি তার স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী প্রভাবের ওপরই নিবদ্ধ থাকে ; যা ঘোড়াকে সর্বপ্রকার কঠোর ও কোমল পরিস্থিতিকে সহ্য করার যোগ্য বানিয়ে দেয়। ফলে আস্তাবলে বাঁধা একটি ভোজন-বিলাসী ঘোড়ার পরিবর্তে সে হয়ে ওঠে সমর-ক্ষেত্রের এক দুর্ধষ দিগ্বিজয়ী জানবায সৈনিক।

এরি নাম 'সাওম' বা রোযা। ইসলাম এটাকে মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য বিধিবদ্ধ করেছে। এর উদ্দেশ্য মানুষের কর্মক্ষমতাকে দুর্বল করা নয়, বরং উক্ত কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাকে ধৈর্য ও তাকওয়ার ভিত্তিতে উত্তরোত্তর মযবুত ও সুদৃঢ় করে তোলা। যাতে মানুষ শয়তান ও মানব রচিত যাবতীয় বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যারা জ্ঞাত তারা ভাল করেই জানেন, রোযার দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে—তাকওয়া ও সবর তথা আল্লাহভীতি ও ধৈর্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে অটল থাকার নাম তাকওয়া। সবর বা ধৈর্য হলো—এ পথে ভেতর ও বাহির থেকে উদ্ভূত সর্বপ্রকার সংকট ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে পূর্ণ দৃঢ়তা ও মনোবলের সাথে মুকাবিলা করা এবং এর সাথে কোনোরূপ আপোষ না করা। এ জিহাদ গোটা জীবনের জিহাদ। রমযান মাসে প্রত্যেক মুসলমান এ জিহাদেরই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। যদিও এ প্রশিক্ষণ দ্বারা নতুন নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশিক্ষণের প্রভাব অবসাদ ও দুর্বলতার আকারে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তা ধর্তব্য বিষয় নয়। তার স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী প্রভাবই হলো আসল ধর্তব্য ব্যাপার। সঠিকভাবে রোযা পালনের যথার্থ ফলাফল নিশ্চিতভাবে এটাই হওয়ার কথা যে, এতে মানুষের স্থূলতা কমে আসবে, তার আত্মা শক্তিশালী হবে, অন্তর বলিষ্ঠ হবে, ইচ্ছাশক্তি মযবুত হবে, তার সহ্যশক্তি বেড়ে যাবে এবং জীবন-সংগ্রাম ও আল্লাহর পথে সংগ্রামের জন্য সে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ভেবে দেখুন, এটা কি মানুষের কর্মশক্তির ঘাটতি হওয়া না তার আরো বেড়ে যাওয়া? আমাদের মতে, যাদের মধ্যে এসব গুণাবলীর সামবেশ ঘটবে, তারাইতো প্রকৃতপক্ষে বাগানের সর্বোৎকৃষ্ট ফুল। আর যাদের মধ্যে এসব গুণ নেই, তারাতো মানুষ নয়, তারা গৃহপালিত স্থূলকায় ষাঁড়, বৈ নয়।

www.pathagar.com

৬৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮৮ আয়াত

রোযার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, রোযার বিধানের পূর্বে যেমন পরেও তেমনি আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার এবং অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে ইসলামী শরীআতে রোযার স্থান পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ উক্ত ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য লোভ-লালসা, কৃপণতা ও অর্থ গৃধ্নুতা এবং এ জাতীয় অন্যান্য চারিত্রিক দোষসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এসব রোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মানুষের মধ্যে ঐ তাকওয়া ও আল্লাহভীতির সৃষ্টি হয় যা অধিকার আদায়কারী সার্বিক জীবনাচারে তাকে সুবিচারক ও সাবধানী করে তোলে। অর্থাৎ যেসব জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে পথনির্দেশনা নেয়া হয়েছে তা থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায় কি হতে পারে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

আরো গভীরভাবে ভেবে দেখলে এ সত্যও প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, রোযার বর্ণনার পূর্বে প্রাপ্য লোকদের জন্য অসিয়ত করার, অসিয়তে ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষা করার এবং ঈমানদারীর সাথে উক্ত অসিয়ত কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর রোযার বর্ণনার পর উৎকোচ দ্বারা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাত করা এবং এটাকে অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের যা কিছু মূল্য ও মর্যাদা তা সর্বতোভাবে শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকার ওপরই নির্ভরশীল। শিরকের মিশ্রণ হওয়া মাত্রই জীবনের জন্য তার সার্বিক উপকারিতা নিঃশেষ হয়ে যায়। একইভাবে আইনের কল্যাণকারিতা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আইন কার্যকর করার জন্য বিশ্বস্ত কর্মকর্তা বর্তমান থাকে এবং সমাজ উৎকোচরূপী রোগ থেকে মুক্ত থাকে। যে সমাজে উৎকোচের প্রচলন জারী হয়ে যায়, সেখানে আইনের উপকারিতা ও কল্যাণকারিতার জানাযারও ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ ব্যাখ্যার আলোকে ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, যেন একই নির্দেশের দুটি দিক এখানে আলোচিত হয়েছে। একটির উল্লেখ রোযার পূর্বে করা হয়েছে। অপরটির পরে। আর রোযার আলোচনা উভয়টির মাঝখানে রেখে দেয়া হয়েছে। যাতে বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে নিজে এসব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার ওপর জয়ী করতে চায় সে রোযার সাহায্যে আত্মপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে উত্তরোত্তর সাফল্যের শিখরে আরোহণ করতে পারে। এরি আলোকে এক্ষণে পরবর্তী আয়াতটি তিলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রশাসকদের উৎকোচ দিও না।

৬৫. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

اكل اموال بالباطل -এর উদ্দেশ্য

وَلاَ تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ঃ (তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না—গ্রাস করো না।) সম্পদ খাওয়া মানে নিছক খাওয়া নয় বরং তার অন্যায় ও অবৈধ ব্যবহার ও প্রয়োগ। আয়াতে ব্যবহৃত 'বাতিল' শব্দটি 'হক'-এর বিপরীত। ওপরে যেমনটি বলা হয়েছে, 'হক' শব্দটি যেরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ তার বিপরীত শব্দ 'বাতিল'ও বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে। 'বাতিল' শব্দের এক অর্থ নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন। যেমন ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً - ال عمران : ١٩١ "হে আমাদের পালনকর্তা ! তুমি এ সৃষ্টিসম্ভার নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১। এর আরেক অর্থ এমন কোনো জিনিস যুক্তি-বুদ্ধি, স্বভাব-প্রকৃতি ও শরীআতে যার কোনো ভিত্তি নেই। যেমন ঃ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ - المؤمن : ٥ -"এবং সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য তারা বাতিল ও অন্যায়ের সাহায্যে বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।"–সূরা মু'মিন ৫। একইভাবে সমতা, সুবিচার, শরীআত, প্রচলিত রীতিনীতি ও সত্যবাদিতার বিপরীত নিয়ম-পদ্ধতিকেও বাতিল বলা হয়। এর অধীনে মিথ্যা, বিশ্বাসভঙ্গ, আত্মসাৎ, উৎকোচ, সুদ, জুয়া-হাউজি, চুরি এবং শরীআত কর্তৃক অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সর্বপ্রকার ক্রিয়া-কলাপ এসে যায়। এখানে কথা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে আরো বিস্তারিত আলোচনা হাদীসে রয়েছে। ইসলামের যাবতীয় কার্যকলাপ এ নীতিমালার ওপরই ভিত্তিশীল।

ادلاء শব্দের তাৎপর্য

وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ ঃ ادْلَاء শব্দের মূল অর্থ কূপের মধ্যে বালতি নিক্ষেপ করা। যেমন বলা হয়েছে ঃ فَاَدْلٰى دَلْوَه - يوسف –"সে তার বালতি নিক্ষেপ করল।"–সূরা ইউসুফ। এ থেকেই এতে পৌছা ও নৈকট্য অর্জন করার অর্থ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রশির সাহায্যে বালতি যেমন পানি পর্যন্ত পৌছে যায় তেমনি ধন-সম্পদ ঘুষখোর প্রশাসক ও কর্মচারীদের পর্যন্ত পৌছার উপায় হতে পারে। বলা হয়েছে, অন্যদের সম্পদ গ্রাস করার জন্য ধন-সম্পদকে প্রশাসকদের পর্যন্ত পৌছার উপায় বা মাধ্যম বানিও না, কারণ উৎকোচ ধন-সম্পদ উপার্জনের বৈধ উপায় নয়, বরং এটা اثم বা গুনাহ, পরস্বাপহরণ ও অন্যের অধিকার আত্মসাতের পন্থা। وَاَنْتُمْ

www.pathagar.com

تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এটা যে গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎজনিত পাপ তাতো তোমরা জান। দুনিয়ার সকল প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রত্যেক দীন ও শরীআতের দৃষ্টিতে এর পাপ হওয়া সর্বস্বীকৃত। জ্ঞান ও যুক্তির বিচারেও এটা সুস্পষ্ট গুনাহ।

এ বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের সাথেই সংযুক্ত এবং এটি পূর্বোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যামূলক বাক্য বিধায় এতে না সূচক لَا শব্দটির পুনরুক্তির প্রয়োজন পড়েনি। এ সূরারই ৪২ আয়াতের অধীন আমরা এ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে এসেছি।

উৎকোচ নিষিদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন দিক

এ আয়াতটি উৎকোচের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে।

প্রথমত, এটি অবৈধ উপায়ে অন্যের অধিকার গ্রাস করার সবচেয়ে বড় পন্থা। অতএব এখানে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার নিষিদ্ধতা বিষয়ে আলোচনার পর বিশেষভাবে এরই উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট মানুষের অধিকার সুরক্ষার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি—আইনের সুফল ও কল্যাণকারিতা সর্বতোভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের সততা ও সুবিচারের ওপর নির্ভরশীল। এ অনুচ্ছেদের শুরুতেও আমরা এর ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। তারাই আইনের মূল রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। এ কারণে তাদেরকে কোনো না কোনো উপায়ে অসৎ বানিয়ে দেয়ার মানে হলো, এক্ষণে মানবাধিকার বিক্রয়-যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। যার নিকটই অর্থ থাকবে সে-ই তা ক্রয় করতে পারবে আর এটা সুস্পষ্ট যে, উৎকোচ সরকারী কর্মকর্তাদের অসৎ বানাবার শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার।

দ্বিতীয়ত, যেখানে উৎকোচ লেনদেনের বাজার রমরমা, সেখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী উপকরণ খোদ সমাজ। মানুষের মধ্যে যখন অন্যের অধিকার গ্রাস করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তখন সে তার নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উৎকোচের আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এভাবে সে বিচারক-প্রশাসকদের উৎকোচের নেশা ধরিয়ে দেয়। আর তাদের উৎকোচের নেশা একবার পেয়ে বসলে তারা এতটাই লোভাতুর হয়ে পড়ে যে, তারা উৎকোচ ভিন্ন মানুষের একান্ত অপরিহার্য অধিকারও দেয় না। এজন্য ইসলাম সর্বাগ্রে সমাজকে এ পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে যে, নিজেদেরই রক্ষক পাহারাদারদের নিজেদের অপকর্মের দ্বারা যেন তোমরা চোর-তস্কর বানিও না। আর এ ব্যাপারে ইসলাম এতটা সাবধানতা অবলম্বন করেছে যে, তাদের উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান করাকেও পসন্দ করেনি। কেননা এটাও উৎকোচেরই পেছন দরজা।

তৃতীয়ত, উৎকোচ যে একটি ঘৃণ্য পাপ এটা সর্বজন বিধিত সত্য। বিবেক এটার সাক্ষী, মানব-প্রকৃতি এর স্বীকৃতি দেয়, দুনিয়ার প্রচলিত রীতিনীতি এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ সরবরাহ করে। এবং সকল ধর্ম ও মতবাদ এর নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত। অতএব আল্লাহ বলেন ঃ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (আর তোমরা তো এটা জান)।

www.pathagar.com

৬৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ১৮৯-২০৩ আয়াত

ওপরে রোযার আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস করা ও এ উদ্দেশ্যে উৎকোচের আশ্রয় গ্রহণ করার নিষিদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। আমরা বিশদভাবে তার আলোচনা করেছি। এরপর হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা আসছে। বলা বাহুল্য, রোযার সাথে এগুলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ রাখে না।

হজ্জও মূলত এক প্রকার জিহাদ। আর জিহাদ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার যেসব গুণাবলী দাবি করে রোযার দ্বারাই তা সর্বোচ্চ পরিমাণে অর্জিত হয়ে থাকে। হজ্জের বর্ণনা প্রসঙ্গে হজ্জ ও ওমরার সম্মানিত মাসগুলোর বিধান ও আদব সম্পর্কে লোকদের প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে—যা এ মাসগুলোর সাথেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আর এ মাসগুলো اشهر حرم বা 'সম্মানিত মাস' হিসেবেই পরিচিত। লোকদের মনে এ প্রশ্নের উদয় সম্ভবত এ কারণেই হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যখন বায়তুল্লাহকে মুসলিম জাতির কিবলা নির্ধারণ ও কাফেরদের কব্জা থেকে তাকে মুক্ত করানো অত্যাবশ্যক ঘোষণা করলেন তখন এটাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল যে, হজ্জের জন্য জিহাদের ঘাঁটিও অতিক্রম করতে হবে। ১৪২ থেকে ১৬২ আয়াতে কিবলা সম্পর্কিত আলোচনায় তা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অতপর জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ে কতক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সম্মানিত মাসগুলোতে জিহাদের ডঙ্কা বেজে ওঠলে তার নির্দেশ কি ? এ প্রশ্ন উদয় হওয়ার কারণ হল, এ সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ সর্বদাই নিষিদ্ধ ছিল। অন্ধকার যুগে আরবরা তার যথাযথ সম্মান বজায় রাখত এবং ইসলামও এগুলোকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে। একইভাবে এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, খোদ হারাম শরীফ ও হারামের সীমারেখার মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠলে তারই বা হুকুম নির্দেশ কিঁ হবে ? এ প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার পেছনে কারণ হলো, হারাম শরীফে যুদ্ধ করাতো দূরের কথা কোনো প্রাণীকে বিরক্ত করাও প্রাচীনকাল থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। অনুরূপ জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের প্রশ্নটিও সামনে আসল। কারণ জীবন দেয়ার সাথে সাথে পরিপূর্ণ উদারতার সাথে নিজের ধন-সম্পদও আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন জিহাদ করা সম্ভব নয়। এটা স্পষ্ট যে, এ ব্যয়ে ওপরে বর্ণিত ব্যয়ের অতিরিক্ত। একইভাবে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়টি যেন তার মধ্যে হজ্জের প্রশ্নাবলী ও বিধিবিধান তথা সময়ের বিশেষ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নানা প্রশ্ন যেমন জিহাদ, সম্মানিত মাসসমূহও আল্লাহর পথে ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও শামিল করে নিয়েছে। একজন বাহ্য দৃষ্টিধারী যখন এ বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও বিষয়াদি একটি অপরটির সাথে পরস্পর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পায় তখন তার দৃষ্টিতে বাণী সমষ্টির মধ্যে সম্পর্কহীনতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে সময়কালে এ সকল বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে তার পটভূমি সামনে রেখে এ পুরো বাণী-সমষ্টিকে কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তার নিকট এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, এ সকল বিষয় একটি মুক্তার হারেরই বিভিন্ন গুটি মাত্র। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তিলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَیْسَ
الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰی ۚ وَ اْتُوا
الْبُیُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾ وَ قَاتِلُوْا فِیْ
سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ
الْمُعْتَدِیْنَ ﴿۱۹۰﴾ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَیْثُ
اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتّٰی یُقٰتِلُوْكُمْ فِیْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ
الْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۹۱﴾ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۹۲﴾ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰی
لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ یَكُوْنَ الدِّیْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا
عَلَی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۹۳﴾ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰی عَلَیْكُمْ ۪
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ ﴿۱۹۴﴾ وَ اَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
وَ لَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَی التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَ اَحْسِنُوْا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ
الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۹۵﴾ وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ
مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِیْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًی مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْیَةٌ

www.pathagar.com

مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن
لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن
رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ
فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ
اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

১৮৯. তারা তোমাকে সম্মানিত মাসসমূহ সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও, এগুলো মানুষের উপকারের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় বিশেষ। আর পেছনের দরজাটা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো নেকী নেই। অবশ্য নেকী আছে তাদের তাকওয়ায় যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে। সুতরাং তোমরা সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৯০. আর তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ; অবশ্য বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। ১৯১. আর যেখানে তাদের পাবে হত্যা করবে এবং যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছে তোমরা তাদের সেখান থেকে বের করবে। ফিতনা-ফাসাদ হলো হত্যার চেয়েও গুরুতর। আর তোমরা তাদের সাথে মাসজিদুল হারামের কাছে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। তবে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করবে। এ হলো কাফিরদের পরিণাম। ১৯২. আর তারা যদি বিরত থাকে, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন শুধু আল্লাহর জন্য হয়। তারপর তারা যদি নিবৃত হয়ে যায়, তবে সীমালংঘনকারীদের ছাড়া কাউকে জবরদস্তি করা চলবে না।

১৯৪. পবিত্র মাসই হলো পবিত্র মাসের বদলা। আর যাবতীয় পবিত্র বিষয় যার অবমাননা করা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস। কাজেই যে কেউ তোমাদের ওপর জবরদস্তি করবে তোমরাও তাদের ওপর জবরদস্তি করবে। যেমন জবরদস্তি তারা তোমাদের ওপর করেছে। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখো, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

১৯৫. আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজের হাতে নিজেদের তোমরা ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

১৯৬. তোমরা পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য তা-ই কুরবানী কর। কুরবানীর

www.pathagar.com

পশু যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় কোনো কষ্ট থাকে তবে রোযা কিংবা সদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্‌য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ হজ্জ ও উমরা একত্রে পালন করতে চায়, সে যাকিছু সহজ লভ্য তা দিয়ে কুরবানী করবে। তবে যদি কেউ তা না পায় তাহলে সে হজ্জের সময় তিনদিন এবং ঘরে ফিরে যাবার পর সাতদিন, মোট দশদিন রোযা রাখবে। এ নির্দেশ তাদের জন্য যাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।

১৯৭. হজ্জের আছে কয়েকটি সুবিদিত মাস। এসব মাসে যে কেউ হজ্জ করা স্থির করবে, তার জন্য হজ্জের সময়ে যৌন বিষয়ক কোনো তৎপরতা, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। আর তোমরা যাকিছু উত্তম কাজ কর আল্লাহ তা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় সাথে নিও। তবে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। হে জ্ঞানবানরা! তোমরা আমাকেই ভয় কর।

১৯৮. তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তারপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মাশ্‌আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাকে ঠিক সেভাবে স্মরণ করবে যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ; যদিও ইতোপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

১৯৯. তারপর তোমরা দ্রুতগতিতে সেখান থেকে রওয়ানা হও যেখান থেকে সবাই রওয়ানা হয় এবং আল্লাহরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২০০. আর যখন তোমরা হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে, বরং তার চেয়েও অধিক স্মরণ করবে। আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে ঃ হে আমাদের রব! এ দুনিয়াতেই আমাদের দাও ; বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

২০১. এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে বলে ঃ হে আমাদের রব ! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর। ২০২. এদেরই জন্য অংশ রয়েছে এরা যা অর্জন করেছে তাতে। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

২০৩. আর স্মরণ করবে আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনে। তবে যদি কেউ তাড়াহুড়া করে দুদিনের মধ্যে চলে আসে তবে তার কোনো গুনাহ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব

করে তাহলে তারও কোনো গুনাহ নেই। এ হলো তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, তাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

৬৭. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ১৮৯

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ج وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

اَهِلَّة শব্দের অর্থ ঃ প্রশ্ন উদ্ধৃত করার কুরআনী পদ্ধতি

اَهِلَّةٌ শব্দটি هِلَالٌ -এর বহুবচন। হেলাল মাস শুরুর চাঁদকেও বলা হয় এবং এ দ্বারা মাসকেও বুঝান হয়ে থাকে। বিশেষ করে বহুবচনের অবস্থায় মাস বুঝানোর জন্যই এর ব্যবহার প্রসিদ্ধ। اهله শব্দের শুরুতে الف، لام -এর ব্যবহার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্ন ছিল নির্দিষ্ট বিশেষ কতক মাস সম্পর্কে। আর পূর্বাপর আলোচনা ভঙ্গীর ওপর দৃষ্টিপাত করলেও বুঝা যায়, প্রশ্ন ছিল পবিত্র মাসসমূহ এবং তার বিধান ও আদব সম্পর্কিত। ইতোপূর্বে আমরা যেমনটি ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি, কুরআন মজীদে প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নগুলো সাধারণতই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশিত হয়েছে। এ কারণে সাধারণ তাফসীরকারদের ধারণা, এ প্রশ্ন ছিল চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। সঠিক না হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু দিকের ওপর আলোকপাত করছি ঃ

প্রথমত, এ ধরনের বৈজ্ঞানিক ও সৌরমণ্ডল বিষয়ক জিজ্ঞাসা আরবদের রুচি ও তাদের সাধারণ স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী। আরবরা সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তার প্রাকৃতিক আইনের অনুগত ও বশীভূত বলে জ্ঞান করত। অতএব, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কেন এ ধরনের অযৌক্তিক প্রশ্ন করার অবকাশ কোথায়? তারা নিজেরাই জানত যে, এ প্রশ্ন নবীকে জব্দ করার উপযোগী কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। তিনি তো অতি সাবলীল ভঙ্গিতেই এর জবাব দিতে সক্ষম যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমেই এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং এটা তার অনুগত ও বশীভূত হওয়ার এক মস্তবড় প্রমাণ। আর এ জবাব ইতোপূর্বে মক্কী সূরাগুলোতে বিভিন্ন আকার ও প্রকারে দেয়াও হয়েছিল। তাদের সামনে ওইসব দলীল প্রমাণও বিদ্যমান ছিল, যা হযরত ইবরাহীম (আ) তাওহীদের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে চাঁদের উদয়াস্ত সম্পর্কে উপস্থাপন করেছিলেন অতপর এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ ছিল কোথায়?

দ্বিতীয়ত, এখানে পূর্বাপর আলোচনার ধারা এটাই প্রমাণ করে যে, সাধারণ আরব বা কিতাবধারীদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন ছিল না ; প্রশ্ন ছিল মুসলমানদের পক্ষ থেকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সম্পূর্ণতই অযৌক্তিক। তারাতো মাসের বিধি-বিধান ও আদব সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারতেন ; এহেন এ প্রয়োজনীয় ও অবান্তর প্রশ্ন নয়।

তৃতীয়ত, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত প্রশ্নই যদি হতো, তবে প্রশ্নের ধরন হতো এরূপ ঃ يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْـهِـلَالِ (তারা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে), তখন প্রশ্নের ধরন يَسْـــئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ -এরূপ হতো না। কারণ, যেমনটি আমরা ওপরেও ইঙ্গিত করে এসেছি। এর সর্বজন পরিচিত মানে হলো, তারা তোমাকে বিশেষ কতক মাস সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।

চতুর্থত, প্রশ্ন পরবর্তী আয়াতগুলো পাঠ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, কুরআন উপরোক্ত প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে তা সম্পূর্ণতই সম্মানিত বা পবিত্র মাসসমূহ তার বিধি-বিধান ও আদব সম্পর্কিত। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে তাতে সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। আমরা যদি ধরেও নিই যে, তাদের প্রশ্নটিকে কুরআন মনোযোগ দেয়ার যোগ্য বলেই বিবেচনা করেনি। তাই তার প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে তাদেরকে মাসসমূহ সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে তো কমপক্ষে, লোকদের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা উচিত নয়—এরূপ কোনো ইঙ্গিত এখানে থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। বলাবাহুল্য, অন্যান্য স্থানেও লোকদের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ভর্ৎসনা যথারীতি উচ্চারিত হয়েছে।

প্রশ্ন ছিল 'সম্মানিত মাস' সম্পর্কে

যাইহোক, আমাদের দৃষ্টিতে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে প্রশ্নের কোনো সম্পর্কই নেই। আমরা ওপরেও নিবেদন করেছি যে, মূলত প্রশ্ন ছিল ওসব সম্মানিত মাস সম্পর্কেই যেগুলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকেই সম্মানিত বিবেচিত হয়ে আসছিল। যাতে লড়াই-ঝগড়া করা জাহেলী যুগেও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ মনে করা হতো। কা'বাঘরের কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হওয়া ও কাফেরদের কবল থেকে তাকে মুক্ত করা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর, এ মাসগুলোর সম্মান বজায় রাখার সীমা-সরহদ কি হবে—এটাই ছিল মূল প্রশ্ন। প্রশ্নটিকে কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করে জবাব দিয়েছে বিস্তারিতভাবে। ১৮৬ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, কুরআনে সাধারণত লোকদের প্রশ্ন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। আর অলংকারিত্বের দাবিও এটাই। কারণ প্রশ্নের প্রকৃত ধরনতো পরবর্তীতে দেয়া জবাব থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতপর প্রশ্ন উদ্ধৃত করে বাণীর দীর্ঘসূত্রীতার প্রয়োজনই বা কি ? আরবী ভাষায় কথনপদ্ধতিই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। অন্যান্য ভাষায় ও ভাষা-বিশেষজ্ঞদের নিকট এটাই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। কিন্তু এটা সত্যি

www.pathagar.com

বিস্ময়কর যে, কুরআনে এ ধরনের সংক্ষিপ্ততার দরুন তাফসীরকারদের ব্যাখ্যায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই জবাব দ্বারা প্রশ্নের ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণের পরিবর্তে খোদ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত শব্দসমূহ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। এভাবে তারা প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে "আব্বাস ও গাবগাছ"—তুল্য আকাশ-পাতাল সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এটা কুরআনের কোনো ক্রটি নয়, ক্রটি মূলত তাফসীরকারদের!

قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ঃ "বলে দাও, এগুলো মানুষের উপকারের জন্য ও হজ্জের জন্য সময় বিশেষ" এটা প্রশ্নের উত্তরের একটা অংশ। এর মানে হলো, এ সম্মানিত মাসগুলো জনগণের সাধারণ কল্যাণ এবং বিশেষ করে হজ্জ ও উমরাকে আরামদায়ক ও সহজতর করার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে কিবলার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলে এসেছি যে, সম্মানিত মাসগুলো শুধু যে ইবাদাতের দৃষ্টিকোণ থেকেই আরবদের নিকট গুরুত্বের দাবিদার ছিল তা নয়, বরং তাদের সামগ্রিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক তৎপরতাও এ মাসগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরবরা জাহেলী যুগে সারা বছর যুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়ে দিতো। ফলে ব্যবসায়িক তৎপরতা বলতে এক রকম বন্ধই থাকতো। এটা 'সম্মানিত মাস'—এরই আশীর্বাদ ছিল যে, গোটা বছরের মধ্যে পুরো চারটি মাস নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে অতিবাহিত হতো। আর এ মাসগুলোতে দেশবাসী হজ্জ ও উমরার কল্যাণধারায় যেমন স্নাত হতো তেমনি দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও হাট-বাজারগুলোতেও নির্ভয়ে চলাচল করতো এবং পরস্পর লেনদেন করতো। বিশেষ করে কুরাইশদের ব্যবসায়িক তৎপরতার জন্য তো যেন এ মাসগুলো ছিল বসন্তকাল। সমগ্র আরব এ মাসগুলোতে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো এবং এ শস্য-দানা বিহীন উপত্যাকা গোটা দেশের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হতো। কা'বাঘর ও সম্মানিত মাসসমূহের আধ্যাত্মিক কল্যাণের সাথে সাথে কুরআন এর বস্তুগত বা বৈষয়িক কল্যাণকারিতার কথাও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে এবং কুরাইশদেরকে তাদের প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ শব্দদ্বয় এখানে এ সত্যের দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে। অর্থাৎ এ সম্মানিত মাসগুলোতে মানুষের জন্য অসীম কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে। তাই সর্বাবস্থায় এর সম্মান বজায় রাখা কর্তব্য। এ সাধারণ উপকারিতার বিষয় আলোচনার পর বিশেষ উপকারিতা—হজ্জেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলোই সে মাস যাতে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে উক্ত ইবরাহীমি সুন্নতের কল্যাণধারায় সুষমা-মণ্ডিত হয়ে থাকে। এ দিকটাও বিশেষভাবে এর সম্মানের দাবির অন্তর্ভুক্ত।

একটি সংস্কারমূলক সংশোধনী ঃ
আরববাসীদের হজ্জকালীন বিদআতসমূহ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ ঃ "আর পেছনের দরোজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো নেকী নেই" হজ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে এটি একটি সংস্কারমূলক সংশোধনী ও উপদেশ বিশেষ। যেমন ইতোপূর্বে দীনের মৌলিক বিষয়াদি আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭৭

আয়াতে সংশোধনী সংস্কারমূলক উপদেশ ও সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোনো তাকওয়া নেই ; প্রকৃত তাকওয়া তো তাদেরই তাকওয়া যারা ঈমান আনয়ন করে ....।" এখানে বলা হচ্ছে যে, "পেছনের দরোজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো তাকওয়া নেই। প্রকৃত তাকওয়াতো তাদেরই তাকওয়া যারা আল্লাহর দেয়া সীমারখা বজায় রাখে।" সকল উম্মত ও জাতির মধ্যে সাধারণভাবে যে রোগটির প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় তাহলো, ধীরে ধীরে মানুষ দীনের মৌলিক বিধান ও অলংঘনীয় ফরয কাজগুলো অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করে নানারকম বেদআত ও তথাকথিত নিয়ম প্রথার সাহায্যে তার শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করে থাকে। আরববাসীদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এরা জাহেলী যুগেও হজ্জ করতো। কিন্তু এর প্রাণসত্তা থেকে তাকে সম্পূর্ণ উজাড় করে নানা রকম নিয়ম-প্রথা ও ভোঁজভাজির এক গোলক ধাঁধায় পরিণত করে নিয়েছিল। মোটকথা, হজ্জের ব্যাপারে তারা এ বেদআত উদ্ভাবন করে নিয়েছিল যে, ইহরাম বেঁধে ফেলার পর তাদের ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন পড়লে অথবা হজ্জ শেষে যখন তারা বাড়ী প্রত্যাবর্তন করতো তখন তারা যে দরোজা দিয়ে বের হয়েছিল সে দরোজা দিয়ে প্রবেশ করত না। বরং ঘরের পিছনের দরোজা দিয়ে অন্য কোনো পথে প্রবেশ করতো। এ চরম বিস্ময়কর ক্রিয়া-কলাপের একমাত্র কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, যে দরোজা দিয়ে গুনাহর বোঝা বহন করে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম, পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর ঐ একই দরোজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা তাকওয়ার পরিপন্থী হবে। এটি ছিল তাদের একটি ভুল ধারণা। ঠিক এমনি ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল তারা তাওয়াফের ব্যাপারেও। আরববাসীদের অনেকেই জাহেলী যুগে উলঙ্গ হয়ে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করতো। তাদের ধারণা সম্ভবত এটাই ছিল যে, আধ্যাত্মিকতা ও দুনিয়া ত্যাগের এ ইবাদাতে নিরত থাকাবস্থায় সাজ-সজ্জার উপকরণ পোশাক পরিচ্ছদের এক চিলতে কাপড়ও দেহে থাকবে তা কি করে হতে পারে আর কেনই বা থাকবে ?

কুরআন এ বেদআত খণ্ডন করেছে এবং বলেছে সদর দরোজা দিয়েই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর। এতে তাকওয়ার ক্ষেত্রে কোনোই ব্যাত্যয় ঘটে না। অবশ্য আখেরাতের সফলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তাঁর বেঁধে দেয়া সীমারেখা মেনে চল এবং সর্বদা তাঁকেই ভয় করে জীবন যাপন কর। হজ্জের মূল উদ্দেশ্যও এ তাকওয়াই।

আয়াত ঃ ১৯০

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

www.pathagar.com

সম্মানিত মাসে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বৈধ

আর তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, অবশ্য বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। এটা মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি। অর্থাৎ হজ্জ ব্যাপদেশে তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা জায়েয। অবশ্য সীমালংঘন করা আল্লাহর পসন্দ নয়। অর্থাৎ পবিত্র মাসে প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করা অথবা আত্মরক্ষার জন্য যতদূর প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য আত্মরক্ষা করার পূর্ণ অধিকার ও অনুমতি তোমাদের জন্য রয়েছে। সম্মানিত মাস বা খোদ এ হারাম শরীফের সম্মান কোনোভাবেই এর প্রতিবন্ধক নয়, বরং এটাই তার সম্মানের দাবি। এ সূক্ষ্ম বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হবে।

হজ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি পরিষ্কার করা এজন্য অত্যাবশ্যক মনে করা হয়েছে যে, তখন পর্যন্ত মসজিদে হারাম মুশরিকদের কুক্ষিগত ছিল। এ কারণে এ আশংকা অত্যন্ত প্রবল ছিল যে, মুসলমানরা হজ্জ করতে গেলে কাফেররা বাধা দেবে এবং এতে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। বিশেষ করে ইতিমধ্যেই যখন মুশরিকদের নিকট এ সত্য রীতিমত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুসলমানরা বায়তুল্লাহকে নিজেদের কেবলা ঘোষণা করেছে এবং তাদের দাবি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মিত এ ঘরের তত্ত্বাবধানের মূল উত্তরাধিকারী তারাই। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে হারাম ও পবিত্র মাসের বিধিবিধান ও আদব-কায়দা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করা জরুরী ছিল, যা পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে তাদের জন্য দিশারীর কাজ দিতে পারে। এখানে এ সত্যটিও লক্ষযোগ্য যে, হারাম মাসের সম্মান রক্ষা বিষয়ে সমগ্র আরব জাতির অনুভূতি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ওখানে লড়াই ঝগড়া করা তাদের নিকট ছিল সবচেয়ে বড় গুনাহ। এজন্য মুসলমানরাও এমনকি আত্মরক্ষামূলক হলেও—কুরআনের সরাসরি অনুমতি ভিন্ন তাতে তখনো পর্যন্ত কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

আয়াত ঃ ১৯১

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلاَ تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র হজ্জ তোমাদের ওপর ফরয আর ইবরাহীমি আদর্শের উত্তরাধিকারী হিসেবে এটা তোমাদের অধিকার বরং তোমরাই এর সত্যিকার অধিকারী। কাজেই তোমাদের এ অধিকারও ফরয আদায়ের পথে কুরাইশরা প্রতিবন্ধক হলে তাদের মুকাবিলা কর এবং যেখানেই তাদের সাথে সংঘর্ষ হবে তাদের হত্যা কর ; যদিও এ লড়াই খোদ হারাম ও হারামের সীমার মধ্যেই সংঘটিত হোক না কেন। আর তারা

তোমাদেরকে যে মক্কাভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিল তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার কর। কারণ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর উত্তরাধিকার নিছক বংশ ও রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে কেউ অর্জন করতে পারে না। খোদ ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি অনুযায়ী-ই এর সত্যিকার হকদার তারাই যারা তার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ মর্যাদা তো তোমাদেরই রয়েছে। তাদের নয়। ফলে এখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য তারা, তোমরা নও।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ঃ "আর ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" এখানে ফিতনা অর্থ কাউকে জোর-জবরদস্তি করে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে দেয়ার চেষ্টা। ইংরেজীতে এটাকে বলা হয় (Persecution)। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ـ بروج : ١٠ "যারা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অত্যাচার-নির্যাতন চালায়, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।"-সূরা আল বুরূজ ঃ ১০। عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ـ يونس : ٨٣ -"ফিরাউন ও তার সরদাররা নির্যাতন করবে। এ আশংকায় মূসার প্রতি তার কওমের কতিপয় লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনল না।"-সূরা ইউনুস ঃ ৮৩। ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ـ نحل : ١١٠ -"নিশ্চয় যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর হিজরত করেছে আপনার রব এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"-সূরা নাহল ঃ ১১০

উপরোক্ত অনুমতির প্রমাণ

ওপরে কুরাইশ মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে—এমনকি হারাম মাসে ওরা যুদ্ধ করলে ওদের হত্যা করা ও মক্কা থেকে বহিষ্কৃত করাও বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে—এখানে তার প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত হারামের সীমায় ও সম্মানিত মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা বড়ই জঘন্য কাজ—এ ক্ষুদ্র বাক্যাংশের তাৎপর্য এটাই। কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করার অপরাধে ঐ ঘরে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের অত্যাচার-নির্যাতনের লক্ষবস্তুতে পরিণত করা উক্ত হত্যাযজ্ঞ থেকেও কঠিন অপরাধ। এ জঘন্যতর ফিতনা নির্মূল করার জন্যই তোমাদের এ অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েই যায়, তাহলে তোমরা তার সমুচিত জবাব দেবে, আর যেখানেই তারা তোমাদের মোকাবিলায় আসবে তাদের হত্যা করবে। এটা হারামের সম্মানের বিপরীত নয় এবং সম্মানিত মাসের মর্যাদারও পরিপন্থী নয়।

www.pathagar.com

সাবধানতার প্রতি গুরুত্বারোপ

وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوكُمْ فِيهِ ঃ "আর তোমরা তাদের সাথে মাসজিদুল হারামের কাছে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে।" এটা একথার ওপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট প্রথমেই যুদ্ধের সূচনা না করে। হ্যাঁ তাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়ার জন্য কাফেরদের পক্ষ থেকে যদি আক্রমণ করা হয়, তাহলে যেন তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়। মাসজিদুল হারামের সম্মান রক্ষা একটা যৌথ দায়িত্ব। কাফেররা যদি মুসলমানদের শত্রুতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে তার সম্মান রক্ষার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়, তাহলে তারা নিজেরাও এর সম্মানেরও দোহাই দিয়ে কোনোরূপ ছাড় পাওয়ার যোগ্য থাকবে না। এটা মূলত তাদের নিজেদের কৃতকর্মেরই শাস্তি, বৈ নয়। كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ, এরূপ কাফেরদের বদলা এরূপই হয়ে থাকে।

আয়াত ঃ ১৯২

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

فَاِنِ انْتَهَوْا-এর তাৎপর্য

"আর তারা যদি ফিরে আসে তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" ফিরে আসার মানে শুধু যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াই নয়। এখানে 'ফিরে আসার' প্রতিদান বলা হয়েছে—'অতপর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এটা স্পষ্ট যে, কাফেররা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করলে তার সর্বোচ্চ প্রতিদান বা বদলা তো এতটুকুন হতে পারে যে, মুসলমানরাও তাদেরকে অবকাশ দেবে এবং কার্যত তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ তাদের যাবতীয় কুফরী ও পাপাচারকে ক্ষমা করে দেবেন—এ প্রতিদান তো কিছুতেই হতে পারে না। এখানে ফিরে আসা বা বিরত থাকার মানে কুরাইশদের ওই সকল একগুঁয়েমী ও বিরোধিতা এবং জোর যুলুম (Persecution) থেকে বিরত থাকা যাতে কুরাইশরা নিমজ্জিত ছিল। এবং যদ্বারা তারা মুসলমানদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল। একই সঙ্গে আল্লাহর ঘর থেকে মুসলমানদেরকে বাধা দেয়া থেকেও ফিরে আসা যার কোনো অধিকারই তাদের অবশিষ্ট ছিল না।

কুরাইশ কাফের ও মুসলমানদের বিতর্ক

এ সূরার কিবলা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পাঠকের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, এ পুরো আলোচনা সাধারণ কাফেরদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং কুরাইশ কাফেরদের সাথেই তার সম্পর্ক। তাদের ও মুসলমানদের মধ্যকার বিতর্ক নিছক কোনো ছোটখাট বা আংশিক বিষয়ে সাময়িক বিতর্ক ছিল না ; বরঞ্চ মূলত এ বিতর্ক ছিল বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে। কুরআনের দাবি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মিত এ

www.pathagar.com

ঘরের তত্ত্বাবধানের প্রকৃত অধিকার মুসলমানদের ; যারা এ ঘরকে তার মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত শিরক ও কুফরীর দুর্গ বানিয়ে রেখেছে সে কাফের ও মুশরিকদের নয়। কুরআনের দাবি এটাও ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া ও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি মুতাবেক যে শেষ নবীর হাতে এ ঘরের উদ্দেশ্যের সংস্কার ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হওয়ার কথা ছিল মুহাম্মাদ মোস্তফা (স)-এর পূণ্যময় আবির্ভাবের দ্বারা উক্ত প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। ফলে এক্ষণে এ ঘর কাফের-মুশরিকদের আধিপত্য মুক্ত ও কুফর ও শিরকের আবর্জনা থেকে পবিত্র হয়ে ইবরাহীমি আদর্শ—ইসলামের কেন্দ্র ও গোটা মু'মিন সম্প্রদায়ের কিবলা নির্ধারিত হবে—এটাই ছিল সময়ের অপরিহার্য দাবি। এ দাবি যেসব দলীল-প্রমাণ ও যেরূপ বলিষ্ঠভাবে এ গোটা সূরাতে বর্ণিত হয়েছে তাতে কোথাও এতটুকুন দুর্বলতা ও শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। বরং স্পষ্ট ভাষায় এটা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর ঘরকে কাফিরদের কবল থেকে মুক্ত করা এবং শিরক ও কুফরীর সার্বিক মালিন্য থেকে পবিত্র করে নতুনভাবে তাকে তাওহীদ ও ইসলাম এবং মুসলিম জাতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা মুহাম্মাদ মোস্তফা (স)-এর রেসালাতের কেন্দ্রীয় লক্ষ ছিল এবং এ লক্ষ অর্জনই যেন প্রিয়নবী (স)-এর পবিত্র মিশনের সর্বশেষ কাজ ছিল। এর আলোকে গভীরভাবে চিন্তা করলে এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে যে, فَإِنِ انْتَهَوْا -এর অর্থ শুধু কুরাইশ কাফেরদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাই নয় বরং তার অর্থ, ইসলামী দাওয়াতের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার যেসব তৎপরতায় তারা নিয়োজিত আছে, নিজেদের ওসব বিরোধিতা ও বৈরী তৎপরতা থেকে ফিরে এসে তার সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। তারা এ পথ অবলম্বন করলে মহান আল্লাহ এ যাবত কৃত তাদের সকল গুনাহখাতা ক্ষমা করে দেবেন। ঠিক একই কথা এ কুরাইশ কাফেরদেরই উদ্দেশ্যে সূরা আল আনফালে বলা হয়েছে এভাবে ঃ

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ج وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ج فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ - الانفال : ٣٨-٣٩

"যারা কুফরী করেছে অপনি তাদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে তাদের মার্জনা করে দেয়া হবে যা অতীতে তাদের দ্বারা হয়ে গিয়েছে তা। কিন্তু যদি তারা পুনরায় তাই করে যা পূর্বে করত তবে তো পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত রয়েছেই। আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৩৮-৩৯

একই সত্য সূরা আত তাওবাতে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধানে কুরাইশ কাফেরদের কোনোই অংশ নেই ; এটা একান্তই মুসলমানদের অধিকার। এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰئِكَ
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ج وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ قف فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ
يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ○ ـ توبه : ١٨-١٧

"মুশরিকদের এ অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর ঘরের কার্য নির্বাহক ও পরিচালক হবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের কর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে। আর এরা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহরই মসজিদসমূহের পরিচালকতো কেবল তারাই হতে পারে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্তুত এদেরই সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১৭-১৮

এটাই সে বিশেষ কারণ যে জন্য সাধারণ কাফেরদের বিপরীত কুরাইশ কাফেরদের জন্য এ নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে যে, তাওবা করে নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের প্রতি কোনো প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করা হবে না। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ
وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ج فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ ـ التوبة : ٥

"যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরুদ্ধ করে রাখবে তাদেরকে এবং প্রত্যেক গোপন ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করবে। অতপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৫

এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান করেই ক্ষান্ত হব। কাফের কুরাইশদের ব্যাপারে এ বিষয়ের ওপর আমরা ইনশাআল্লাহ সূরা তাওবাতে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব।

আয়াত ঃ ১৯৩

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا
عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

হারাম এলাকায় ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো দীনের স্থান নেই

এ আয়াত দ্বারা উপরোক্ত আয়াতের আলোচ্য বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুরাইশ কাফেরদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না হারাম এলাকায় ফিতনার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যায় এবং আল্লাহর দীন ভিন্ন অন্য কোনো দীন এখানে কায়েম থাকে। এ ঘর নিছক আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। অতএব এখানে আল্লাহর দীন ভিন্ন অন্য কোনো দীনের এখানে স্থান নেই অবকাশ নেই। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া ও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এর বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী ; কাফেরদের তা পসন্দ হোক বা না হোক। একথাটিকেই সূরা সাফ-এ এভাবে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ - الصف : ٩

"তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে, যাতে তিনি সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"–সূরা সাফ ঃ ৯

রাসূলদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ঃ এর সঠিক অবস্থান ও গুরুত্ব এবং এর প্রকৃত ধার উপলব্ধি করতে হলে রাসূলদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নীতি কার্যকর রয়েছে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা নেয়া অত্যাবশ্যক। আল্লাহর সে নীতি হলো, মহান আল্লাহ যখন কোনো জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেন তখন সে রাসূলই ঐ জাতির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ হয়ে থাকেন। যার পরে ওই জাতির আর কোনো দলিল ও প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। এরপরও ওই জাতি ঈমান গ্রহণ না করলে তথা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে ও সত্যদ্রোহিতায় অটল থাকলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাদের এ ধ্বংস মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ কোনো শাস্তি দ্বারাও হতে পারে। অথবা সত্যের সহায়ক-সাহায্যকারী ও রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের হাতেও হতে পারে। রাসূলের জীবদ্দশায় যেমন এটা সংঘটিত হতে পারে, হতে পারে তাঁর মৃত্যুর পরেও। আল্লাহর ঘোষণা ঃ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - "আমি ও আমার রাসূল অবশ্য বিজয়ী হব। সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।" এ ধরনের অন্যান্য আয়াতেও মহান আল্লাহর এ নীতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা প্রকাশ পাওয়ার জন্যও কুরআন মজীদে একটা বিশেষ রীতি-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আমাদের এ গ্রন্থে যথাস্থানে তার বিবরণ আসবে।[১]

১. আমি এখানে আল্লাহর শাস্তি বিধানের যে নীতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছি তা বিশেষভাবে রাসূলদের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেসব নবীদের সাথে নয় যারা কেবল নবী, রাসূল নন। নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর সে নীতির প্রতিই আয়াতটি ইঙ্গিত করছে। আর তাহলো, এ সর্বশেষ রেসালাতের যে উদ্দেশ্য তার পরিপূর্ণতা এর ওপরই নির্ভরশীল যে, এ আরব ভূমিতে সত্যদীন ভিন্ন অন্য কোনো দীন অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব, এ নীতির ভিত্তিতেই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সরাসরি আবির্ভাব স্থল ও আল্লাহর ঘরের ওপর অবৈধ দখলদার আরবের কাফেরদের সামনে মাত্র দুটি পথই খোলা রাখা হলো। হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা তরবারী ফায়সালা দেবে। অন্যান্য কাফেরদের ন্যায় তাদের জন্য 'জিযিয়া'-এর সুযোগ রাখা হয়নি। অতপর প্রমাণের সম্পূর্ণতার দাবি পূর্ণ হয়ে গেলে নবী (স) মক্কায় সেনা অভিযান পরিচালনা করেন এবং বায়তুল্লাহর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে কুফরী ও শিরকের কদর্যতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে দেন এবং جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ -এর ঘোষণা শুনিয়ে দেন।

পবিত্র ভূমির সুরক্ষায় মুসলমানদের দায়িত্ব

যে পবিত্র ভূমিতে হারাম শরীফ অবস্থিত সে পবিত্র ভূমিকে স্থায়ীভাবে কুফরী ও শিরকের প্রাধান্য মুক্ত রাখার লক্ষে তার সমগ্র এলাকায় অনৈসলামী কর্তৃত্ব ও সর্বপ্রকার অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ল। তাই মহানবী (স) গোটা আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে এ ফরমান জারী করে দিলেন ঃ لَا يَجْتَمِعُ فِيْهِ دِيْنَانِ - "এখানে সত্য দীনের সাথে অন্য (বাতিল) দীন একত্রিত হতে পারে না।" আর শেষ দিকে তিনি এখান থেকে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরও বের করে দেয়ার অন্তিম উপদেশ দিয়ে যান। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে এ উপদেশ বাস্তবায়ন করেন। ইসলামের এ কেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক সুরক্ষার জন্য এ পদক্ষেপ জরুরী ছিল। এ ঘরের হিফাযতের জন্য সার্বক্ষণিক সচেতনতা ও কোনো অনৈসলামী শক্তিকে এ পবিত্র ভূমিতে এতটুকুন আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না দেয়া প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব।

আরবী ভাষার একটা নিয়ম

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ঃ انْتَهَوْا এর অর্থ তা-ই, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। عُدْوَانَ শব্দের প্রকৃত অর্থতো সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি। কিন্তু এখানে এ শব্দটি স্রেফ পদক্ষেপ (Action) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় কখনো কখনো কোনো কোনো শব্দ বাক্যস্থ কোনো শব্দের সাথে নিছক সাদৃশ্য ও সাহায্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেগুলোর অর্থ নিরূপতি হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوْا (তারা আমার সাথে যেরূপ আচরণ করেছে, আমি তাদের তদ্রূপ বদলাই দিয়েছি)। এটা স্পষ্ট যে, এখানে دَانُوْا শব্দটি নিছক دِنَّا শব্দের সাথে সাযুজ্যের কারণেই নেয়া হয়েছে। অন্যথায় এখানে فَعَلُوْا বা এর সমার্থক কোনো শব্দই ব্যবহৃত হওয়ার কথা। কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দই)। এটা সর্বজন বিদিত যে, কোনো মন্দের বদলা মন্দ হয় না। কিন্তু নিছক পূর্বোক্ত শব্দের সাথে সাদৃশ্য রক্ষার জন্য অপরাধের

সাথে তার শাস্তিকেও سَيِّئَةٌ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তেমনি পরবর্তী আয়াতেও লক্ষণীয় ঃ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ (তোমাদের প্রতি যে বাড়াবাড়ি করবে, তোমরাও তাঁর বাড়াবাড়ি পরিমাণ তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কর।) এ আয়াতে কারো বাড়াবাড়ির জবাবে গৃহীত পদক্ষেপকেও اعْتِدَاءٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ অর্থের দিক থেকে এটা নিছক পদক্ষেপ, বৈ নয়। শুধু পূর্বোক্ত শব্দের সাথে সাযুজ্যের কারণেই এরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার এ সর্বজন পরিচিত নিয়মানুসারেই আলোচ্য আয়াতে عُدْوَانَ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তার মানে স্রেফ ঐ পদক্ষেপ যা জবাবী কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য এই যে, এরা নিজেদের অন্যায় তৎপরতা থেকে ফিরে এসে ইসলামের পথ অবলম্বন করলে তাদের অতীত অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। অতপর কেবল তাদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নেয়া হবে যারা নিজেদের কুফরী ও শিরক এবং পাপাচার ও সীমালংঘনের ওপর অটল থেকে যাবে।

আয়াত ঃ ১৯৪

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

যেসব বিষয়ে অবমাননা করা নিষিদ্ধতার কিসাস

ওপরে বর্ণিত বিধানের সপক্ষে দলীল বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহে অথবা হারাম শরীফের চৌহদ্দীতে লড়াই ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত গুরুতর গুনাহ। কিন্তু কাফেররা তোমাদের জন্য এর সম্মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে কিসাস হিসেবে তোমাদেরও তাদেরকে এর সম্মান থেকে বঞ্চিত করার অধিকার রয়েছে। প্রতিটি মানুষের জীবন ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য। কিন্তু যখন কেউ অন্যের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তাকে খুন করে বসে, তখন তার কিসাস হিসেবে তাকেও তার জীবনের প্রতি সম্মানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ মাস ও মাসজিদুল হারামের পরিসীমার সম্মান সর্বজন স্বীকৃত। শর্ত হলো, কাফেরদেরও এর সম্মান বজায় রাখতে হবে এবং এতে অন্যদেরকে যুলুম-নির্যাতনের লক্ষবস্তুতে পরিণত করা যাবে না। কিন্তু এ মাসগুলোতে এ নিরাপত্তার নগরীতে তাদের তরবারীগুলো কোষমুক্ত হয়ে পড়লে এর কিসাস হিসেবে তাদেরকেও এর নিরাপত্তা ও সম্মানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শোভন ও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আরো বলা হয়েছে, এ নিষিদ্ধ মাসগুলোর কিসাস যেমন জরুরী, অনুরূপ অন্যান্য পবিত্র জিনিস, যার অবমাননা করা নিষিদ্ধ তার জন্যও কিসাস অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ যেসব সম্মানযোগ্য জিনিসের সম্মান বজায় রাখার অধিকার থেকে তারা তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে, কিসাস হিসেবে তোমরাও তাদেরকে সম্মান পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার

www.pathagar.com

অধিকার লাভ করবে। হারাম ও নিষিদ্ধ মাসসমূহের নিষিদ্ধতা ধ্বংস করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তোমরাও তার সমুচিত ও যথাযথ জবাব দেবে। অবশ্য তাকওয়ার সীমা বজায় রাখবে। তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো সীমালংঘন বা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীতা যেন না হয় এবং কোনো পদক্ষেপ যেন প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম না করে। সর্বাবস্থায় যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা তো তারাই লাভ করে থাকে।

আয়াত ঃ ১৯৫

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ

ব্যয় করার এ নির্দেশ যেমনটি আমরা ওপরে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি, এখানে উল্লিখিত জিহাদের জন্যই দেয়া হয়েছে। জিহাদ জীবন ও সম্পদ উভয়েরই কুরবানী দাবি করে। এজন্যই কুরআন মজীদের যেখানেই জিহাদ ও যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেই আবশ্যিকভাবে অর্থ ব্যয়েরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ –"তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে।"

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ঃ এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। بِاَيْدِيْكُمْ বাক্যাংশটি এমন এক ব্যক্তির চিত্র চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে, যে তার উভয় হাত ওপর থেকে নীচের দিকে প্রসারিত করে কোনো নদী-সমুদ্রে বা গভীর গর্তে ঝাঁপ দিচ্ছে। কোনো কোনো আরব কবিও এ রীতির ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, যারা আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করে, বাহ্যত তারা নিজেদেরকে বিপদ-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে বলে মনে করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের অগ্নি গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। মানুষের জন্য অনন্ত জীবন ও চিরস্থায়ীত্বের প্রকৃত-ভাণ্ডার আল্লাহর পথে নিঃশেষে ধন ও প্রাণের কুরবানীর মাঝেই নিহিত ; এগুলোকে আগলে রাখা ও বাঁচিয়ে রাখার মাঝে নয়। কুরআন বিভিন্ন স্থানেই এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে। সূরা আত তাওবাতে মুনাফিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন বলেছে ঃ

وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○ - التوبة : ٤٢

www.pathagar.com

"শীঘ্রই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে। আল্লাহ জানেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৪২

উক্ত আয়াতে يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ শব্দগুলো দ্বারা ঐ কার্পণ্য ও কাপুরুষতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ -এ বাক্যাংশ দ্বারা যার থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জোর দেয়া হয়েছিল। এ থেকে বুঝা গেল যে, যাকে সাধারণত মানুষ জীবন বলে ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তি সফলতা বলে মনে করে, তা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে মৃত্যু ও ধ্বংস, বৈ নয়।

অর্থ ব্যয় ও ইহ্সান-এর অর্থ

وَاَحْسِنُوْا শব্দটি اَنْفِقُوْا শব্দের সাথে সম্পর্কিত ও তার ওপরই عطف ; এখানে اِحْسَانٌ মানে কোনো কাজ সুন্দরভাবে করা। অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রিয় ও আকর্ষণীয় যে সম্পদ তা তোমরা উদারভাবে প্রফুল্লচিত্তে আল্লাহর পথে ব্যয় কর। ইনফাকের বেলায় কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানেই ইহ্সানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ব্যবসায় ইত্যাদির মাধ্যমে যা উপার্জন কর এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করি তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। আর তার নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে চেও না। অথচ তোমরা তা কখনও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও যদি না চক্ষু বন্ধ করে থাক। জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর জন্য এহেন আবেগ-উদ্দীপনা ও সাবধানতা যুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ইহ্সানের মর্যাদায় উন্নীত হবে না। মহান আল্লাহর আমাদের সম্পদের কোনোই প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বাধিক অভাবমুক্ত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। অবশ্য আমরা নিজেরাই সর্বদা তার অপার দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। তিনি যে আমাদের কাছে অর্থ দানের দাবি জানিয়ে থাকেন, তা তার জন্য নয় ; তা আমাদের জন্যই করে থাকেন। তিনি তো এভাবে আমাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং আমাদের তুচ্ছ মৃৎপাত্রের টুকরোগুলো গ্রহণ করে ওগুলোকে চিরন্তন শাশ্বত ভাণ্ডারে পরিণত করে আমাদের ফেরত দিতে পারেন।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ১৯৬

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ٚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

উমরার ধরন ও প্রকৃতি

ফরয নামাযসমূহের সাথে সুন্নত ও নফল নামাযেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মূল নামাযের জন্য যাতে মানসিক সচেতনতা ও প্রস্তুতি চাঙ্গা থাকে এবং ফরযে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তারও ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়—এজন্যই এ ব্যবস্থা। ঠিক তদ্রূপ হজ্জের জন্য উমরাও একটা অনুশীলন স্বরূপ। এদ্বারা হজ্জের জন্য মানসিক প্রস্তুতিরও সৃষ্টি হয় আর ক্ষেত্রবিশেষে হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতিরও ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আভিধানিক অর্থের দিক থেকেও শব্দটি নির্মাণ, শোভা-সৌন্দর্য, চাষাবাদ ও জনবসতির অর্থ প্রদান করে থাকে। এ থেকে এর তাৎপর্য দাঁড়ায় এদ্বারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য যেমন ঘরের শোভা-সৌন্দর্য, তেমনি অন্তরের সজীবতাও সচেতনতাও। আর এ দুটি জিনিসই পরস্পর পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য।

১৯৬ আয়াতের প্রকৃত অর্থ

اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ঃ বাক্যাংশে আসল জোর لِلّٰهِ শব্দটির ওপর। অর্থাৎ, যুদ্ধ ও জিহাদের ওপর অত্যধিক জোর দেয়া ও গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজন এজন্যই দেখা দিয়েছে যে, আরবরা তো ইসলামপূর্বকালেও হজ্জ ও উমরা পালন করতো। কিন্তু এ হজ্জ ও উমরা নিছক একক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হতো না। তাতে তাদের ওসব বাতিল উপাস্যরাও শরীক ছিল যাদের মূর্তি বা প্রতীমা তারা খোদ আল্লাহর ঘরে এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের অন্যান্য জায়গাগুলোতেও স্থাপন করে রেখেছিল। ফলে তারা মাসজিদুল হারামে নামাযের জন্য গেলে বা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছলে, তাদের লক্ষ শুধু আল্লাহর ইবাদাতই হতো না ; বরং ওসব মূর্তি-প্রতীমার সন্তুষ্টি ও তাদের পূজা-উপাসনাই হতো প্রধান উদ্দেশ্য। তারা ওদের পূজাও করতো, ওদের উদ্দেশ্যে নযর-নিয়াজ পেশ করতো এবং কুরবানীও করতো। আলোচ্য আয়াতটি নাযিলের সময় মক্কায় এ অবস্থা বিরাজ করছিল বিধায় মুসলমানদের এ ব্যাপারে জোর

দেয়া হয় যে, তোমরা যখন হজ্জ ও উমরা পালন করবে তখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তা করবে। শিরক ও বেদআতের সামান্যতম ছোঁয়াও যেন তাতে যুক্ত না থাকে। এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটির ওপর সূরা কাউসারেও আলোকপাত করা হয়েছে : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ–"আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। কাজেই তুমি একমাত্র তোমার রবের উদ্দেশ্যেই নামায পড় এবং কুরবানী কর।" মাওলানা ফারাহী (র) সূরা কাউসারের তাফসীর করতে গিয়ে বিশদভাবে এটা প্রমাণ করেছেন যে, এখানে 'কাউসার' দ্বারা কা'বাঘরকে বুঝানো হয়েছে। যা পৃথিবীতে পরকালীন কাউসারের বিকল্প। আর একমাত্র আল্লাহরই জন্য নামায ও কুরবানীর ওপর জোর দেয়া হয়েছে এজন্য যে, ইসলামপূর্বকালে নামায ও কুরবানী প্রধানত গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতো।

এছাড়া لِلّٰهِ-এর ওপর জোর দেয়ার আরেকটি কারণও রয়েছে। তাহলো, আরববাসীদের নিকট হজ্জ ও উমরা ইবাদাত অপেক্ষা ব্যবসায়ের উপায় ও মাধ্যমরূপে গণ্য হয়ে পড়েছিল। তাদের কাছে এর মর্যাদা একটা ব্যবসায়িক মেলায় পর্যবসতি হয়েছিল। কালের ব্যবধানে ওইসব মহান উদ্দেশ্য তাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গিয়েছিল, যেজন্য হযরত ইবরাহীম (আ) এ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। অতএব এ ব্যবসায়িক লক্ষকে সামনে রেখেই তারা নাসী বা মাসসমূহকে আগপিছ করে নেয়ার রীতি আবিষ্কার করে নিয়েছিল। এ রীতির ভিত্তিতে তারা হজ্জের মাসকে চান্দ্র বর্ষের পরিবর্তে সৌর বর্ষে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল ; যাতে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মাসটি তাদের সুবিধাজনক সময়ে পড়ে। এখানে لِلّٰهِ দ্বারা হজ্জ ও উমার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যেই এ ইবাদাতগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে ; মেলা অনুষ্ঠান বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নয়। 'তাই তোমরা কাফের ও মুশরিকদের বিপরীত একমাত্র আল্লাহকেই উদ্দেশ্য নিরূপণ কর।' এ প্রসঙ্গে মুসলমানদেরকে ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের যে সীমিত অনুমতি দেয়া হয় তার আলোচনা পরে আসছে।

সম্ভাব্য বিপদাপদ সম্পর্কে পথনির্দেশ

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : إِحْصَارٌ মানে ঘেরাও বা পরিবেষ্টন করে নেয়া। এখানে পরিবেষ্টিত হওয়ার মানে শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়া। পরবর্তী فَإِذَا أَمِنْتُمْ শব্দদ্বয়ও এ অর্থের ইঙ্গিতবহ। আর সময়ের নাজুকতাও এরি পোষকতা করে। কারণ এ আয়াতগুলো নাযিলের সময় মক্কার ওপর কুরাইশ মুশরিকদের আধিপত্য ছিল। আর তারা মুসলমানদেরকে সেখান থেকে শুধু তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ; বরং যে কোনো মূল্যে তাদের পুনঃ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি না দিতেও তারা ছিল বদ্ধপরিকর। মুসলমানরা হজ্জ ও উমরা আদায়ের জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাদের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে পূর্ণ শক্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিরও প্রবল আশংকা ছিল। আর বাস্তবে হয়েছিলও তাই। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে নবী (স) ও তাঁর সহচররা উমরা আদায়ের সংকল্প করলে কাফেররা কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এ পরিস্থিতির দাবী এটাই ছিল যে, এ সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে পূর্বাহ্নে দিকনির্দেশনা দিয়ে দেয়া হবে। অতএব তাদেরকে এ হেদায়াত দিয়ে দেয়া হল যে, তোমরা শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর না হলে পরিবেষ্টিত স্থানে তোমাদের পক্ষে সহজলভ্য যে কোনো কুরবানী করে দিলেই চলবে। এ হেদায়াতেরই অনুসরণে মহানবী (স) হুদাইবিয়াতেই কুরবানী সম্পন্ন করে ইহরাম ভঙ্গ করেছিলেন।

مَحِلٌّ শব্দের অর্থ

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ঃ "কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না।" এখানে مَحِلٌّ অর্থ সময় ও স্থান উভয়ই। لِسَانُ الْعَرَب -এর গ্রন্থকারও তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, حَلَّ يَحِلُّ থেকে এটি اسم ظرف এবং সময় ও স্থান উভয় অর্থবোধক। অর্থ দাঁড়াল এই যে, কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছা ও মানত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না। এটা স্পষ্ট যে, নিরাপদ ও বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার দুটি পৃথক অবস্থায় কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছারও দুটি পৃথক রূপ হবে। আর নবী (স)-এর আমল থেকে উভয় প্রকারের প্রমাণই বিদ্যমান আছে। হুদাইবিয়ার ঘটনায় তিনি নিরুপায় অবস্থানকালীন আমলের অনুমতির ওপর আমল করেন। আর পরবর্তীকালে হজ্জ ও উমরা উভয়টি পালনকালে ওই পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এখানে যে নিরাপত্তা ও পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা মূলত শত্রুর সাথে সংশিষ্ট। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা—যেমন অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো নিরুপায় অবস্থাজনিত কারণের সম্মুখীন হলে তার বিধান এখানে মূলত বলা হয়নি। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা হয়েছে এবং তার সম্পর্ক ইজতিহাদের সাথে।

কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করার কাফফারা

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ঃ কোনো অসুস্থতা বা কষ্টের কারণে কেউ কুরবানীর পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য হলে, তার জন্য কাফফারা আদায় করা কর্তব্য। কুরআন মজীদে সংক্ষেপে তার তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ; রোযা বা সদকা অথবা কুরবানী। নবী (স) এ সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তা হচ্ছে, হয় তিনদিন রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে কিংবা কমপক্ষে একটি ছাগল কুরবানী করে দেবে।

www.pathagar.com

বহিরাগত হাজীদের জন্য একটি সুবিধা

فَاذَا اَمِنْتُمْ وقفه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط ঃ এখানে বহিরাগত হাজী অর্থাৎ মাসজিদুল হারামের সীমার বাইরে থেকে হজ্জ গমনেচ্ছুদের জন্য একটি রুখসত বা অনুমতি বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী যুগে একই সফরে হজ্জ ও উমরা উভয়টি করা গুনাহ বলে গণ্য করা হতো। হেরেমের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের বেলায় এটাতো সঠিক ছিল। কারণ হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক সফর করা তাদের জন্য কোনো কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু দূর থেকে আগত হাজীদের জন্য এতে কষ্ট ছিল। এজন্য ইসলামী শরীআত সদয় অব্যাহতির ব্যবস্থা করেছে যে, তারা একই সফরে হজ্জ ও উমরা উভয়টাই পালন করতে পারবে। তা এভাবে যে তারা প্রথমে উমরা করে ইহরামের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে নেবে। অতপর হজ্জের দিনগুলোতে হজ্জের জন্য নতুনভাবে ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে। অবশ্য এমতাবস্থায় তাদের জন্য কুরবানী অত্যাবশ্যক। কুরবানীর প্রাণী সহজলভ্য না হলে দশ দিনের রোযা রাখা অপরিহার্য তিনটি রোযা হজ্জের দিনসমূহে এবং সাতটি রোযা হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ঃ বিধিবিধান ও প্রয়োজনীয় হেদায়াতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর বিধানের মূল প্রাণ সত্তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ সকল বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া। এটাই এসবের সার নির্যাস। আর এরি সাহায্যে এসবের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়ে থাকে। মানুষ এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখলে যথাযথভাবে এসব বিধান পালনে সমর্থ হবে না এবং এ থেকে কোনো কোনো সুফল লাভেও সক্ষম হবে না। বরঞ্চ তার গোটা জীবন আল্লাহর নিকট মিথ্যা আশাবাদ ও আত্মপ্রবঞ্চনায় অতিবাহিত হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইন যেরূপ তার ফলদানে অলংঘনীয়। তদ্রূপ তাঁর শরঈ ও নৈতিক আইনও তার ফলদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আয়াত ঃ ১৯৭

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ○

www.pathagar.com

হজ্জ শব্দের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার

এটা প্রামাণ্য স্থান। অর্থাৎ হজ্জ শব্দটি এখানে 'হজ্জে আকবর' 'হজ্জে আসগর' অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। 'কিসাস' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শব্দের এ বিশেষ ব্যবহার বিধির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছিলাম।

مَعْلُوْمٰتٌ শব্দের অর্থ

اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ দ্বারা اَيَّامٌ مَّعْدُوْدٰتٌ এর ন্যায় এর নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এটা এমন কোনো অনির্ধারিত ও অনির্দিষ্ট সময়কাল নয় যে, হজ্জ বা উমরার সংকল্পকারী তাদের বাধ্যবাধকতার বিষয় চিন্তা করে ঘাবড়ে যাবে। এতো কতক সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট মাস। যে কেউ এতে হজ্জ কিংবা উমরার সংকল্প করবে। সে এর নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলবে। যৌনাচার, পাপাচার ও লড়াই ঝগড়া থেকে আত্মরক্ষা করবে, বেশি বেশি ভাল কাজ ও তাকওয়া অর্জন করার চেষ্টা করবে। যদিও মানুষকে এ জিহাদে আবশ্যিকভাবে নিজের আবেগ-অনুভূতি ও কামপ্রবৃত্তির কুরবানী করতে হয়। কিন্তু এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মানুষের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাল কাজ করে সে সম্পর্কেও আল্লাহ সম্যক অবহিত। তিনি একদিন এর পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

হজ্জকালে স্ত্রীসহবাস, গুনাহ ও ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া নিষেধ কেন ?

এখানে رفث، فسوق ও جدال -এ তিনটি কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। رفث মানে যৌন-উত্তেজক কার্যকলাপ। এ শব্দের ব্যাখ্যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। فسوق মানে আল্লাহর অবাধ্যতা। আর جدال অর্থ পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করা।

এ তিনটি বিষয়ের নিষিদ্ধতার দ্বারা প্রবৃত্তির ঐ সকল কপাট বন্ধ হয়ে যায় যদ্দারা মানুষ গুনায় লিপ্ত হয়। হজ্জে এগুলোর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ার কতক বিশেষ কারণ রয়েছে ঃ

এক ঃ ইসলামে এ ইবাদাতটি মানুষকে দুনিয়া বর্জন ও সংসার ত্যাগের ওই শেষ সীমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যার সাথে পরিচিত হওয়া ইসলামে কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত এবং যা প্রশিক্ষণ ও আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরী। এর পরেই সন্ন্যাসব্রতের সোপান শুরু হয়ে যায়—যাতে প্রবেশ করতে ইসলাম নিষেধ করে দিয়েছে।

দুই ঃ ইহরামের বিধিনিষেধের কারণে নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর প্রতি মনের ভেতরে আগ্রহ-উত্তেজনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। মানুষের মধ্যে এ দুর্বলতা রয়েছে যে, যে জিনিস থেকে বাধা প্রদান করা হয়, তার প্রতি তার আকর্ষণ দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায়। আর শয়তান তার এ দুর্বলতা থেকে সুযোগ নিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তিন ঃ সফর অবস্থায় থাকার দরুন এসব ব্যাপারে পদস্খলনের অনেক সুযোগ আসে। মানুষ সদা-সচেতন না থাকলে প্রতিটি পদক্ষেপেই সে ফেতনায় জড়িয়ে পড়তে পারে।

ভাষার এক বিশেষ রীতি

وَتَزَوَّدُوا فَانَّ خَيْرَ الزَّدِ التَّقْوٰى ঃ আমাদের মতে এতে বাক্যের প্রকৃত গঠন প্রণালী এরূপ ঃ تَزَوَّدُوا التَّقْوٰى فَانَّ خَيْرَ الزَّاد التَّقْوٰى –অর্থাৎ হজ্জের সফরে বের হলে তাকওয়ার পথের সম্বল সাথে নিয়ে বের হবে। কারণ সর্বোৎকৃষ্ট পথের সম্বল বা পাথেয় হলো তাকওয়া। প্রথম স্থানে সংক্ষিপ্তকরণ ও অলংকরণের দাবী অনুযায়ী تَقْوٰى শব্দটি বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। কারণ পরে তার প্রয়োগ ও প্রকাশ জরুরী ছিল—প্রথম স্থানেও যদি তা প্রকাশ করা হতো তাতে বাক্যে দ্বিরুক্তিজনিত ত্রুটি দেখা দিতো। অথচ কুরআন সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে تقوى শব্দ বিলোপ করা হয়েছে—এটা স্বীকার করেন না। তাদের মতে تَزَوَّدُوا শব্দের দ্বারা লোকদেরকে হজ্জের জন্য বৈষয়িক পাথেয় সাথে নিয়ে বের হওয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাঁদের ধারণা মতে এ তাগিদ দেয়ার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছিল যে, আরববাসীদের অধিকাংশই কোনোরূপ পাথেয় ব্যতিরেকেই হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বসত। এভাবে নিজেরাও কষ্ট পেত এবং অন্যদের জন্যও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ কারণে তাদের এ উপদেশ দেয়া হয় যে, যখন তোমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন পথের সম্বল তথা পাথেয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করেই বের হবে।

যদিও এটা আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সঠিক যে, হজ্জের জন্য পথের সম্বলের ব্যবস্থা করা অগ্রগণ্য। বরং প্রকৃত ব্যাপার তো এটাই যে, শরীআত হজ্জ ফরযই করেছে তাদের ওপর, যারা সবদিক থেকে এর সামর্থ রাখে। কিন্তু এখানে এর এ অর্থ গ্রহণ আরবী ভাষা-রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। তার কারণ এই যে, আরবীতে فَاِنَّ শব্দটি এ আয়াতে যেভাবে এসেছে সেভাবে আসলে তার পূর্বোক্ত কথার কারণ ও ইল্লতের জন্যই এসে থাকে। تَزَوَّدُوا শব্দের অর্থ পথের সম্বলই যদি হতো, পরবর্তীতে তার কারণ ও ইল্লতেও তারই রহস্য বর্ণিত হতো যে, কেন এ সফরে পথের সম্বলের ব্যবস্থা করা জরুরী? কিন্তু এখানে যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে তাকওয়ার পথের সম্বলের।

উক্ত উপদেশ ও পথনির্দেশের স্থান-কাল-পাত্র থেকেও উক্ত বিষয়েরই সমর্থন মেলে, যার প্রতি আমরা ইঙ্গিত প্রদান করেছি। ওপরের বাক্যাংশে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে বের হবে সে যেন যৌন বিষয়ক ক্রিয়া-কলাপ, পাপাচারমূলক তৎপরতা ও লড়াই-ঝগড়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। এ বিষয়ের সাথে সবচেয়ে নিকটবর্তী মিল হলে একথারই হতে পারে যে, এ পবিত্র সফরের জন্য কারো পক্ষে যৌনলীলা, আল্লাহর অবাধ্যতা ও ঝগড়া-বিবাদের পরিবর্তে তাকওয়ার পাথেয় নিয়েই বের হওয়া কর্তব্য। কারণ সর্বোত্তম পাথেয়তো তাকওয়ার পাথেয়ই।

আয়াত ঃ ১৯৮

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

فَضْلٌ দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে

অর্থাৎ হজ্জের মূল উদ্দেশ্য তো তাকওয়া। তাই তার জন্য প্রকৃত পাথেয় তাকওয়া হওয়া উচিত। কিন্তু এ সফর ব্যাপদেশে কেউ ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো ব্যবসায়িক ফায়দা অর্জন করলে তাতে কোনো দোষ নেই। এখানে فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ মানে ব্যবসায়িক ফায়দা। এ ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে থেকে এবং তার অধিকারসমূহ আদায় করে দিয়ে বান্দা যে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে তার সবই আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে, জাহেলী যুগে হজ্জের সম্মেলন এক বিরাট ব্যবসায়িক মেলার আসরের রূপ ধারণ করেছিল। ফলে হজ্জের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কুরআন এখানে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, হজ্জের মূল উদ্দেশ্য ইবাদাত, ব্যবসায় নয়। তাই এ সফরে তার জন্য যথাযোগ্য পাথেয় সংগ্রহ কর, আর তা হচ্ছে তাকওয়া। কিন্তু কেউ যদি এর আসল উদ্দেশ্য পরিপূরণের সাথে সাথে কোনো লাভজনক কাজ কারবার করে তাতে ইবাদাতের কোনো ক্ষতি হবে না ; এটা জায়েয।

জাহেলী প্রথার বিরুদ্ধাচরণ

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ঃ এখানে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মাশ্আরে হারাম তথা মুযদালিফায় রাত কাটানো এবং সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্মরণ করা সম্পর্কে এ পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এটা আল্লাহর দেখানো ও শেখানো পথ ও পন্থায়ই তোমাদেরকে করতে হবে। অর্থাৎ তাসবীহ তাহলীল এবং যিকির ও ইবাদাতের মাধ্যমে তা করতে হবে। অবশ্যই ওই পন্থায় নয় যা তোমরা জাহেলী যুগে অবলম্বন করেছিলে। যেমন এ যুগেও মানুষ ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষে আলোক-সজ্জা করে, বনভোজনের আয়োজন করে, কবিতা পাঠের আসর জমায়। এমনকি কোথাও কোথাও নৃত্য-গীতের আসরও জমজমাট হয়ে ওঠে। অনুরূপ জাহেলী যুগেও লোকেরা মুযদালিফায় বিভিন্ন জায়গায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতো, কবিতা পাঠ, গল্প বলা ও আত্মপ্রচারের আচারণ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠতো। কুরআন এ সবের পরিবর্তে তাসবীহ-

তাহলীল করার উপদেশ দিয়েছে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এসব স্থানে উপস্থিতির আসল উদ্দেশ্য এটা।

وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ঃ "আর ইতোপূর্বেতো তোমরা ছিলে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত।"– বাক্যটি দয়া ও অনুগ্রহস্থলে বলা হয়েছে। যেমন সূরা জুমুআতে রয়েছে ঃ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -"নিশ্চয়ই এরা ইতোপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।" অর্থাৎ এসব জায়গার বিধান ও শিষ্টাচার সম্পর্কে তোমাদেরকে যে পথনির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার মূল্যায়ন কর। কেননা এ পর্যন্ত তোমরা এ স্থানগুলোকে ক্রীড়া-কৌতুকের স্থানই বানিয়ে রেখেছিলে। অথচ এ জায়গাগুলো আধ্যাত্মিক সাধনার পীঠস্থান। কিন্তু তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন মণি-মুক্তার খনিকে কয়লার খনি মনে করে বসে আছ।

আয়াত ঃ ১৯৯

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

কুরাইশী কৌলিন্যের ওপর একটি আঘাত

বর্ণনাভঙ্গী প্রমাণ করে যে, এখানে কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে অন্যান্যদের বেলায় যেসব বিধিনিষেধ রয়েছে, তোমাদের বেলাও হুবহু তদ্রূপ বিধিনিষেধই প্রযোজ্য। তাই অন্যান্য লোক যেমন আরাফাত গমন করে ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও ঠিক তদ্রূপ আরাফাত গিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর। এ পথনির্দেশের প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছিল যে, কুরাইশরা জাহেলী যুগে হজ্জ পালনকালে বিশেষ করে নিজেদের জন্য আরাফাতে উপস্থিতিকে জরুরী মনে করত না। তারা শুধু মুযদালিফায় গিয়ে সেখান থেকেই ফিরে আসত। তাদের ধারণামতে তারা ছিল আল্লাহর ঘরের পুরোহিত ও তার প্রতিবেশী।

তাই তাদের জন্য হেরেমের সীমার বাইরে যাওয়া শোভন নয়। আল্লাহর ইবাদাতের বেলাও তারা নিজেদের জন্য একটা বিশেষ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র কায়েম করে নিয়েছিল। কুরআন তাদের এ স্বনির্ধারিত ও স্বকপোলকল্পিত স্বাতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সবাইকে একই সমতলে এনে দিয়েছে।

আয়াত ঃ ২০০

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

www.pathagar.com

একটি অনর্থক কাজের সংস্কার

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে ওপরেও আমরা যেমনটি বলেছি, লোকজন আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠতো। কবিতা ও কাব্য গাথা এবং আত্মপ্রশংসা ও প্রচারণার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। বিশেষ করে মিনায় অবস্থানের দিনগুলো তো যেন এরি জন্য নির্ধারিত হয়ে পড়েছিল। কবি ও বাগ্মীরা নিজ নিজ গোত্র ও পূর্বপুরুষদের যশ-গাথা গদ্য ও পদ্যে বর্ণনা করতো এবং ভাষা শৈলী ও বাক্যালংকারে একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতো কুরআন এ বাজে ও অনর্থক কাজেরও সংস্কার করেছে এবং এর পরিবর্তে এর চেয়ে অধিক যত্ন ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আল্লাহর যিকির ও স্মরণে নিবিষ্ট থাকার পথনির্দেশ দিয়েছে।

দুনিয়া লোভীদের সতর্কীকরণ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا الاية-এতে ওসব লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাদের সমগ্র মন-মস্তিষ্ক জুড়ে রয়েছে দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসার জয়জয়কার। আর এ ভালোবাসার আতিশয্যে তারা তাদের নিকট সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অর্জনের প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এমনকি হজ্জের ন্যায় মহান ইবাদাতের সুযোগ ভাগ্যে জুটলে এতেও দোয়া কবুলের প্রতিটি সুযোগ ও স্থানে তারা আল্লাহর নিকট তাদের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্যই দোয়া করে, যদিও তাদের আখেরাতের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য থাকে। বহুলোক এমনও রয়েছে যারা হজ্জ পালন করে শুধুই পার্থিব উদ্দেশ্যে। তারা যেটাকেই দোয়া কবুলের স্থান বলে মনে করে সেখানেই তাদের অন্তরের সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তুটির জন্যই আবেদন পেশ করে বসে। তারা এর সঙ্গে পরকালীন কামিয়াবীর বিষয়টি উল্লেখ করাও পসন্দ করে না। পাছে এটা আল্লাহর সামনে তাদের মূল কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

যারা দীনের প্রতিটি জিনিসকে পার্থিব লাভালাভের নিক্তিতে পরিমাপ করে থাকে তারাই দীনের মূল কাঠামোকে বিগড়ে দিয়েছে। এ চরিত্রের দুনিয়ার পূজারী লোকেরাই হজ্জের ন্যায় সুমহান ইবাদাতকেও জাহেলী যুগে ব্যবসায়িক মেলায় রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। একই ধারাবাহিকতা ও প্রবণতা এ যুগেও লক্ষণীয়। এক শ্রেণীর লোক হজ্জকে বার্ষিক মহাসম্মেলন রূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। অথচ হজ্জের মূল ইবরাহীমি প্রাণসত্তা (Spirit) আল্লাহর পথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত। এর পার্থিব উপকারিতা একান্তই আনুসঙ্গিক।

আয়াত ঃ ২০১

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

www.pathagar.com

সঠিক কর্মপদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত

এখানে ওসব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাদের মন-মানসিকতা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের ব্যাপারেই একেবারে ভারসাম্যপূর্ণ ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানের কল্যাণই তাদের রবের নিকট কামনা করে। প্রথমোক্ত দলের পর এ শেষোক্ত দলের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য একথা জানান দেয়া যে, এ শেষোক্ত দলের আবেদন আল্লাহর দৃষ্টিতে পসন্দনীয়। আর ঈমানদারদের এ নীতিই অবলম্বন করা উচিত। এ দোয়া থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বান্দার পক্ষে তার রবের সমীপে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণই কামনা করা কর্তব্য। আর উক্ত কল্যাণের ফায়সালা ও নির্বাচন (Selection) তারই হাতে ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের জন্য প্রকৃত কল্যাণ কিসে নিহিত এটা তো তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। বিশেষ করে পার্থিব বস্তুনিচয়ের মধ্যে কোনো জিনিসের কল্যাণকর হওয়া তো এরই ওপর নির্ভরশীল যে উক্ত জিনিসটি আমাদের পরকালীন সাফল্যের উপায় ও মাধ্যম হবে। আর কোন্ জিনিসের এদিকটি সম্পর্কে জানা একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। কাজেই এ বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই ছেড়ে দেয়া বান্দার জন্য উত্তম। সে যেন নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব পেশ না করে। অবশ্য জাহান্নামের শাস্তি থেকে অব্যাহতভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এটা বড়ই কঠিন জিনিস। মহান আল্লাহ কাউকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিলে, বান্দার জন্য এটাই সর্বোচ্চ সফলতা।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ঃ "এরাই ওসব লোক, যারা নিজেদের উপার্জনের অংশ লাভ করবে" প্রথম দল অর্থাৎ যারা স্রেফ দুনিয়া প্রত্যাশী, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, "পরকালে তাদের কোনোই অংশ নেই।" কিন্তু এ দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের উপার্জনের অংশ পাবে। এবং আল্লাহ তার নেক বান্দাদের নেকী ও ভাল কাজের বদলা দেয়ার যে নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে মৌল নীতির ভিত্তিতেই তাদের অংশ লাভ করবে।

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ - এর তাৎপর্য

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ঃ "এবং আল্লাহ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী" ভীতি প্রদর্শন ও সান্ত্বনা প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং কুরআন মজীদে এ উভয় ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে। যারা আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারকে অনেক দূরবর্তী জিনিস মনে করে নিজেদের দুষ্কর্মে বিভোর থাকে আর ভাবে, যে জিনিস এতদূরে, এখনি তার চিন্তায় বিভোর হয়ে ভোগ-বিলাসময় জীবনকে মাটি করবো কেন ? তাদেরকে একথার দ্বারা এটাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, আজ তোমরা যে হিসাব-কিতাবকে অনেক দূরবর্তী কিছু মনে কর, যখন তোমরা তার সম্মুখীন হয়ে পড়বে, তখন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, এতো দেখছি একটি সকাল-সন্ধ্যাও পার হয়নি।

অনুরূপ যারা আল্লাহর ভাল ভাল প্রতিশ্রুতিগুলোকে স্রেফ ভবিতব্যের প্রতিশ্রুতি মনে করে এবং ধারণা করে যে, তা প্রকাশ পেতে সুদীর্ঘকাল বাকী রয়েছে, তাদেরকে একথার

www.pathagar.com

সাহায্যে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে বিলম্ব হবে না। যখন তোমরা প্রতিদান পাবে তখন অনুভব করবে যে, ঘাম শুকোবার আগেই তোমরা তোমাদের পারিশ্রমিক পেয়ে গিয়েছ।

প্রমাণের জন্য আলোচ্য আয়াতটিই লক্ষণীয়। এখানকার বর্ণনাভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, ভীতি প্রদর্শন নয় বরং সান্ত্বনা প্রদানই এর উদ্দেশ্য। এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এসব ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব ওই অনুভূতিরই, যা শাস্তি কিংবা পুরস্কারের সময় কেউ অনুভব করবে। শাস্তি ও পুরস্কারকালী অনুভূতি যদি এটাই হয় যে, আমল ও প্রতিফলের মধ্যেকার দূরত্ব এক্ষণে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে, তাহলে তো এ দূরত্ব হিসাবেরই যোগ্য নয়। অতএব সঠিক কর্মনীতি এটাই যে, পাপী তার শাস্তিকে সামনে রাখবে এবং মু'মিন তার পুরস্কারকে সামনে রাখবে। পাপী তার অবকাশের জন্য উদ্ধত হবে না এবং মু'মিন বিলম্বের জন্য ধৈর্যহারা হবে না। আর কেউ যদি তার নির্বুদ্ধিতার জন্য এ দূরত্বকে গুরুত্ব দেয়ও, তার পক্ষে এ মহাসত্যকে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, من مات فقد قامت قيامته "যে মৃত্যুবরণ করলো, তার তো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েই গেল।" যে মু'মিন, দুচোখ বন্ধ হবার সাথে সাথেই তার সৎকার্যাবলীর স্বরূপ প্রকাশ পেতে শুরু করে। কাফেরের বেলায়ও তার পাপ কর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেতে শুরু করে। অতপর আমল ও প্রতিফলের মধ্যে দূরত্বটা থাকল কোথায় ? এদিকে মানুষ জীবনের বোঝা নামাল আর ওদিকে শাস্তি ও পুরস্কারের ডালি এসে দাঁড়াল।

আয়াত ঃ ২০৩

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

হজ্জের মহাসম্মেলন হাশরের দিনের মহাসম্মেলনের স্মারক

اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ-শব্দদ্বয় রোযা প্রসঙ্গে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল এখানেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এদ্বারা বুঝানো হয়েছে আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ মিনায় অবস্থানের দিনসমূহ। উদ্দেশ্য এই যে, এতো হাতেগোণা কয়টি দিন মাত্র। এতে আল্লাহর যিকির ও স্মরণের ভাণ্ডার যতটা সমৃদ্ধ করতে পারো করে নাও। এ সামান্য সময়কে কঠিন ও দুর্বিসহ মনে করে ওখান থেকে পালাতে চেষ্টা করো না। যার কোনো তাড়াহুড়ো থাকবে তার জন্য ১২ যিলহজ্জেই ফিরে আসার অনুমতি রয়েছে। অন্যথায় ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থানের সওয়াব হাসিল করে নেবে। উভয় পন্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, এ তাড়াহুড়ার কারণ যেন এ দিনগুলোর কাঠিন্য ও দীর্ঘ হওয়ার অনুভূতি সঞ্জাত না হয়, বরং প্রকৃতই কোনো প্রয়োজন এর পেছনে সক্রিয় থাকে। এ সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা এজন্য দেখা দিয়েছে, অনেক লোক আরাফাত থেকে ফিরে আসা মাত্রই অতি দ্রুত হজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো সেরে

www.pathagar.com

নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছুতে চায়। এটা একটা সীমা পর্যন্ত তো প্রকৃতি ও স্বভাব সম্মত। কিন্তু এতে অসন্তোষ ও ঘাবড়ানো জনিত অবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে, তা তাকওয়ার পরিপন্থী হবে। মানুষের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একদিন তাকে আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে। আর সেদিন তার নির্দেশ ভিন্ন তার সম্মুখ থেকে নড়বার কোনোই সুযাগ থাকবে না। وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ -এর বাক্যাংশ এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করছে। হজ্জের এ সম্মেলন হাশরের দিনেরই স্মারক। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বাস্তবতা থেকে উদাসীনতা প্রদর্শন কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

৬৮. পরবর্তী আলোচনা : ২০৪-২১৪ আয়াত

ইতোপূর্বে হজ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে শেষ দিকে একথাও আলোচিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক হজ্জকে নিছক তাদের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের মাধ্যম বানিয়ে থাকে। আখেরাত অন্বেষণ থেকে তাদের অন্তর সম্পূর্ণ শূন্য থাকে। ওখান থেকেই আলোচনার মোড় মুনাফিকদের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। কারণ যারা এতটাই দুনিয়া পূজারী ও অর্থগৃধ্নু হবে যে হজ্জের হেদায়াতেও নিজেদের দুনিয়া কামাবার চেষ্টা করবে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই তো মুনাফিক। কাজেই তাদের আলোচনার সাথে সাথে কতক আয়াত মুনাফিকদের ক্রিয়া-কলাপের ওপর পর্যালোচনা ও বিশদ আলোচনা করা হলো। একই সাথে খাঁটি ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য কিরূপ হওয়া উচিত তারও আলোচনা করে দেয়া হল। তাদেরকে কতক স্থানে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণও করে দেয়া হয়, যাতে মুনাফিকদের মুনাফিকী আচরণ তাদের জন্য কোনো প্রকার হোচট খাওয়ার কারণ না হয়ে পড়ে। এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ
عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ
وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي
ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن
يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم
مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

www.pathagar.com

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, এ পার্থিব জীবনে যার কথাবার্তা তোমাদের চমৎকৃত করবে এবং সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে তার মনে যা আছে সে ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে সে কট্টর শত্রু। ২০৫. আর যখন সে তোমাদের কাছ থেকে ফিরে যায়, তখন তার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে যাতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশ করতে পারে। আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মভিমান তাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং জাহান্নামই তার যথাযোগ্য স্থান। নিশ্চয় তাহলো নিকৃষ্ট আবাস।

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

২০৮. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্যে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ২০৯. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২১০. তারা তো এখন শুধু এর প্রতীক্ষায়ই রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতারা মেঘের আড়ালে তাদের কাছে আবির্ভূত হবেন। তারপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে! সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। ২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদের কত স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করেছি। আর আল্লাহর অনুগ্রহ পৌঁছে যাওয়ার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো কঠিন শাস্তিদাতা। ২১২. পার্থিব জীবনকে কাফেরদের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। তারা মু'মিনদের উপহাস করে। পক্ষান্তরে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা সে কাফিরদের চেয়ে কিয়ামতের দিন উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ সীমাহীন জীবিকা দান করেন।

২১৩. সকল মানুষ একই উম্মত ছিল। তারা যখন মতভেদ সৃষ্টি করল তখন আল্লাহ নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন অকাট্য বাণী সহকারে। যাতে মানুষের মাঝে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তারা তার মীমাংসা করে দেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; বরং স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারাই করেছে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল। মু'মিনরা যে সত্য সম্বন্ধে মতভেদ করতো, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সে ব্যাপারে হেদায়াত প্রদান করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, যদিও এখনো তোমরা তাদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে? তাদের ওপর পতিত হয়েছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ। তারা এমনভাবে ভীত-শিহরিত হয়েছিল যে, রাসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের বলতে হয়েছিল, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? সুসংবাদ নাও যে, আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

www.pathagar.com

৬৯. শব্দ-বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২০৪

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ لا وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

মুনাফিকরা কাজে দুর্বল ও কথায় পটু হয়ে থাকে

এখানে মুনাফিকরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা কাজে দুর্বল হয় সাধারণতই কথায় তারা বড়ই পটু হয়ে থাকে। এরা বাকপটুতা ও কথার কারুকার্য দ্বারা নিজেদের কাজের দুর্বলতাকে ঢাকার ও শ্রোতার সদিচ্ছা ও সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে নিজের কর্মনীতির ওপর আস্থাশীল করে তোলার চেষ্টা করে থাকে। মদীনার মুনাফিকদের মধ্যেও এরূপ একদল লোক ছিল। পানাহার ইত্যাদিতে এরা ছিল সহজ ও স্বচ্ছন্দ, চলাফেরায় অনাড়ম্বর ও প্রাঞ্জলভাষী। এরা আকার-আকৃতিতে সুন্দর, পোশাক-আশাকে পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত এবং বৈঠকী শিষ্টাচারে ছিল নিপুণ। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে ছিল কাপুরুষ ও কাজেকর্মে রীতিমত চোর বা তস্কর সদৃশ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তারা ইসলামের সমর্থনে আকাশ-পাতাল একাকার করে দিত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আড়ালে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনাই ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হতো। সূরা মুনাফিকূনে এদেরই চিত্র অংকিত হয়েছে এভাবে ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ط يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

"যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের দৈহিক গঠন আপনাকে চমৎকৃত করবে। আর যদি তারা কথা বলতে থাকে, তাদের প্রাঞ্জল ভাষীতার জন্য আপনি তাদের কথা শোনবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দেয়ালে ঠেস লাগানো কাঠ সদৃশ। এরা প্রত্যেকটি শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই প্রকৃত শত্রু। আপনি এদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ এদেরকে বিনাশ করুক। এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছে ?"–সূরা মুনাফিকূন ঃ ৪

অর্থাৎ এদের সযত্নে লালিত দেহ কান্তি ও সুসজ্জিত আকার-আকৃতি বাহ্যত খুবই আকর্ষণীয়। তোমাদেরকে খুশী করার জন্য তাদের মনোহর কথাবার্তা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দীপনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এজন্য তোমাদের কাছে তা মনোমুগ্ধকর মনে হয়। তাই তোমরা এসব কথা আগ্রহভরে শুনে থাক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। তাদের বক্ষে না আছে অন্তর না আছে ঈমান ও ইসলাম। এরা একেবারে অন্তঃসারশূন্য কাষ্ঠখণ্ড সদৃশ ; যাদেরকে পোশাক-আশাক পরিয়ে

www.pathagar.com

দেয়ালের সাথে ঠেস লাগিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। ঈমানরূপ সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন এরা নিদারুণ কাপুরুষ। এজন্য এরা যে কোনো বিপদ-ঝঞ্ঝাকেই নিজেদের ওপর আপতিত হচ্ছে বলে সদা সন্ত্রস্ত থাকে। এবং তাদের এ কাপুরুষতাকে কারুকার্যময় বাকপটুতার আড়ালে গোপন করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। তোমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাবার জন্য এরা অন্যান্যদের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলে ঃ 'ওরা ইসলামের জন্য ভয়ানক বিপদ।' কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কপটতা ও কাপুরুষতাই ইসলামের জন্য আসল বিপদের কারণ। তাই তাদের ব্যাপারে সার্বিক সতর্কতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য আয়াতে ঠিক একথাটিই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের কথাবার্তা তো একেবারে প্রাণ কেড়ে নেয়ার মত। কিন্তু তাদের সব কথাবার্তাই গিল্টি করা। আর এ গিল্টি করা কৃত্রিম চাকচিক্য একান্তই সাময়িক। দুনিয়ার জীবনে নিশ্চয়ই তারা এ ভাল মুক্তো দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু অচিরেই সেদিন আসবে যেদিন সত্য ও মিথ্যা এবং খাঁটি ও ভেজাল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। আর সেদিন তাদের মুখমণ্ডলের প্রতারণাময় অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়ে যাবে।

وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ঃ (আর তারা তাদের অন্তরের নিয়তের ওপর আল্লাহকে সাক্ষী বানায়) আল্লাহকে সাক্ষী বানানোর মানে আল্লাহর কসম করা। আল্লাহর নামে শপথ করা। এটা মুনাফিকদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, নিজেদের কথাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার জন্য তারা কথায় কথায় শপথ করে থাকে। তাদের নিকট কাজের প্রমাণ নেই বিধায় প্রতি পদক্ষেপেই তারা শপথকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকে। মিথ্যাবাদী লোক নিজের মানসিক দুর্বলতার দরুন মনে করে যে, কোনো বিষয়ে শপথ করে নিশ্চয়তা বিধান না করা পর্যন্ত শ্রোতাকে সে তা বিশ্বাস করাতে ও আশ্বস্ত করতে পারবে না। একজন সৎ ও করিৎকর্মা মানুষ নিজের কাজের ওপর নির্ভর করে থাকে। কোনো প্রকার জবাবদিহির সম্মুখীন হলে সে তার বাস্তব কাজের প্রমাণ দ্বারাই তার মুকাবিলা করে। কিন্তু একজন মুনাফিক যেহেতু কাজের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে না, এ কারণে সে কোনো প্রকার জবাবদিহির সম্মুখীন হলে সে শপথকেই নিজের বর্ম বানিয়ে নেয় এবং এরি সহায্যে মানুষের পাকড়াও থেকেও আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে। সূরা মুনাফিকূনে মুনাফিকদের এ আচরণের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ
يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ
سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ - المنافقون : ١-٢

"মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর

www.pathagar.com

রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতপর তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কত মন্দ!"–সূরা মুনাফিকূন ঃ ১-২

وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ঃ এতে خصام শব্দটি خصم-এর বহুবচন আর اَلَدُّ মানে কট্টর ঝগড়াটে। অর্থাৎ বাহ্যত তোমাদের সামনে তাদের কথাবার্তা অত্যন্ত কোমল ও মধুর মনে হলেও তাদের অন্তরে রয়েছে তোমাদের ও ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর হিংসা ও বিদ্বেষ। এর প্রতিই সূরা মুনাফিকূনে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ -(প্রকৃত শত্রু এরাই এদের থেকে আত্মরক্ষা কর)।

আয়াত ঃ ২০৫

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর

অর্থাৎ তোমাদের সামনে তো তাদের কথাবার্তা অতিশয় আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু তোমাদের সামনে থেকে সরে গেলে তাদের সকল তৎপরতা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির পথে নিয়োজিত হয়। ১১ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও আমরা বলেছিলাম, فساد فى الارض। মানে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের যে দাওয়াত মহানবী (স) দিচ্ছেলেন, তার বিরোধিতাই فساد فى الارض তথা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি। আল্লাহর বান্দার কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যে প্রবেশ করার ওপরই পৃথিবীতে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা সর্বোতোভাবে নির্ভরশীল। যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে ঃ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ –"তোমরা সকলে আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।" এ দাসত্ব ও আনুগত্যে দাখিল হয়ে যাওয়ার পর শয়তানের জন্য কোনোরূপ বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর বিপরীত পরিস্থিতিতে গোটা মানবপ্রজাতি শয়তানের বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। সে অব্যাহতভাবে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে থাকে। যা কিনা শস্য ক্ষেত্র এবং প্রাণী বংশ উভয়েরই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে আরববাসীরা খুব ভালভাবেই এহেন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এজন্য তাদের পক্ষে এটা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না যে, ধ্বংসের এ অগ্নি-গহ্বর থেকে আল্লাহর সৃষ্টিকে উদ্ধার করার জন্য শান্তি ও আনুগত্যের ঐ দাওয়াত কতবড় রহমত ও কল্যাণের বাহক ছিল—যা কুরআন পেশ করেছিল। আর ওরা মানবতার কতবড় শত্রু ছিল যারা উক্ত দাওয়াতের বিরোধিতা করছিল এবং চাচ্ছিল যে, দুনিয়া ওই জাহান্নামের আগ্নি-গহ্বরেই নিমজ্জিত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকুক।

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ঃ অর্থাৎ ওরা বাহ্যত যতই মধুর ও চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলুক এবং ইসলাম ও পয়গাম্বরের যতই বন্ধুত্বের ভান করুক না কেন, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো মর্যাদাই লাভ করতে পারবে না। তারা নিজেদের কর্মনীতির দ্বারা ওই বিশৃংখলা ও দুষ্কর্মকেই ষোলকলায় পূর্ণ করে চলেছে যার অনিবার্য ফল সমগ্র মানবতার ধ্বংস। এতদসত্ত্বেও তারা কোনোরূপ মর্যাদা কিভাবে লাভ করতে পারে ? মহান আল্লাহই এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এর কল্যাণ ও সাফল্যই পসন্দ করেন। এতে বিপর্যয় ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের তিনি পসন্দ করেন না।

আয়াত ঃ ২০৬

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

দীনদারীর মিথ্যা দাবীদারদের আত্মম্ভরিতা

ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও দীনদারীর এসব মিথ্যা দাবীদারদের এও একটা বৈশিষ্ট্য যে, যখন তাদের কোনো ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের ওপর সমালোচনা করা হয় ও তাওবা ও সংশোধনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন তাদের আত্মমর্যাদায় ভীষণ আঘাত লাগে। তারা তাদের দুর্বলতা, অবিশ্বস্ততা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতির দরুন মনে করে যে, যদি একবার তারা নিজেদের দুর্বলতার স্বীকৃতি দিয়ে দেয় তবে তো তাদের সকল যশ-খ্যাতিই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তারা তাদের অবস্থানে এতটুকুন চিড় ধরতে দেয় না। মুনাফিকদের এ বিশেষ দিকটির প্রতি সূরা মুনাফিকূনে নিম্নোক্ত ভাষায় ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○ سَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদের দেখবেন, তারা অহংকারের সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী পাপাচারী লোকদেরকে হেদায়াতের তাওফীক দান করেন না।"-সূরা মুনাফিকূন ঃ ৫-৬

একই সত্যের প্রতি সূরা আন নিসার নিম্নোক্ত আয়াতটিও ইঙ্গিত করছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○ فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَاۤءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ق بِاللّٰهِ اِنْ

www.pathagar.com

اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ق فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغًا ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝ - النساء : ٦١-٦٤

"আর যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছে। তাদের কি দশা হবে যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো মসিবত আপতিত হবে ? তারপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাইনি। তারা এমন লোক যাদের অন্তরের বিষয়ে আল্লাহ জানেন। সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং তাদের সদুপদেশ দিন আর এমন কথা তাদের বলুন যা তাদের মর্ম স্পর্শ করে। আমি তো রাসূল শুধু এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে। আর যদি তারা নিজেদের ওপর যুলুম করার পর অপনার কাছে আসতো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু পেত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬১-৬৪

فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ (অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।) এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি সাধারণত ওসব জায়গায় এসে থাকে যেখানে এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় যে, যাদেরকে পৃথিবীতে এহেন কঠিন পাপাচার ও দুষ্কর্ম সত্ত্বেও অবকাশ দেয়া হচ্ছে, এ অবকাশ তাদের জন্য কোনো অনুগ্রহ নয়। এটা কেবল এজন্যই দেয়া হচ্ছে যে, এসব লোকের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর এ জাহান্নামই তাদের সকল পাওনা কড়ায় গণ্ডায় পূর্ণ করে দেবে। জাহান্নামের ব্যবস্থা থাকতে দুনিয়ায় তাদের কোনো শাস্তিরই প্রয়োজন নেই। وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ আর নিশ্চয়ই তা হল নিকৃষ্ট আবাস।

আয়াত ঃ ২০৭

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

নিষ্ঠাবানদের উৎসাহ প্রদান

يشرى – شرى -এর অর্থ বিক্রয় করা। এখানে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা আল্লাহর খুশী ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিজের সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছে। দুটি দিকের বিচারেই এখানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, উপরোক্ত আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের কথা শুনে মুনাফিকদের যেন এ

www.pathagar.com

আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় যে, সবাই তাদের মতই সুবিধাভোগী ও সুযোগ-সন্ধানী নয়। যেন তাদেরকে বলা হচ্ছে দেখ, তোমাদেরই চোখের সামনে আল্লাহর এমন বান্দাও রয়েছে, যারা নিজেদের দেহ-মন ও জীবনের সর্বস্ব আল্লাহর পথে কুরবানী করার শপথ গ্রহণ করেছে। যারা আল্লাহর সন্তোষ ভিন্ন অন্য কিছুকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করে না। দ্বিতীয়ত, মু'মিনদেরকে উৎসাহ প্রদান করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যারা এ মুনাফিকদের বিপরীতে একমাত্র আল্লাহরই জন্য বেঁচে থাকতে এবং একমাত্র আল্লাহরই জন্য জীবন দিতে ছিল বদ্ধপরিকর। মুনাফিকদের বিষয় আলোচনার পাশাপাশি মহান আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি আলোকপাত করে এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ ও পরম বিশ্বস্ত বান্দাও তাঁর রয়েছে। আর এরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য।

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, এটা চিরন্তন সত্য, মহান আল্লাহর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সমগ্র জীবনকে বিসর্জন দেয়া এক সুমহান জিহাদ। আর এ জিহাদের দাবিও সবর ও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান। তিনি তাদের ওপর সাধ্যের অতীত কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে, তিনি তা ক্ষমা করে দেন। পদস্খলন ও তার সর্বময় সীমাবদ্ধতার জন্য তিনি তাওবা ও সংশোধনের পথ সদাই উন্মুক্ত রেখে দিয়েছেন।

আয়াত ঃ ২০৮

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ، اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

سِلْم-এর তাৎপর্য

سِلْم -এর অর্থ আনুগত্য, আর এটা দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, এর অর্থ ইসলাম। কিন্তু এটা নেহায়েত বাহ্যিক পার্থক্য মাত্র। কারণ ইসলামের মূলকথা তো আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্যই! শব্দটি حرب (যুদ্ধ) শব্দের বিপরীতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে অবস্থায় এর মানে সন্ধি ও নিরাপত্তা হয়ে থাকে। এ অর্থের মধ্যেও ইসলাম-এর ব্যঞ্জনা নিহিত রয়েছে। কেননা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যই তো সন্ধি ও নিরাপত্তার মূল পথ ও পন্থা।

كَآفَّةً বলতে কি বুঝায় ?

كَآفَّةً অর্থ জামায়াত বা দল। এখানে আরবী ব্যাকরণ অনুসারে শব্দটি حال হয়েছে। অর্থাৎ জামায়াতবদ্ধ বা দলবদ্ধভাবে। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এটি এরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

মুনাফিকদের নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের প্রতি আহ্বান

শব্দ বা বাক্যানুসারে সম্বোধন সাধারণ, অর্থাৎ সমগ্র মুসলমানদের প্রতি। কিন্তু বাক্যস্থিত ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, বক্তব্যের লক্ষ ঐসব মুনাফিক যাদের আলোচনা উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে করা হয়েছে। তাদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, খাঁটি ও সাচ্চা ঈমানদারদের ন্যায় তোমরাও পুরোপুরি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে প্রবেশ কর। এরূপ হেদায়াত দানের কারণ হলো, তাদের বিশ্বস্ততা ও দায়বদ্ধতা ছিল খণ্ডিত ও বিভক্ত। তারা একদিকে মহানবী (স)-এর প্রতি ঈমানের দাবিদার ছিল ও ইসলামের সাহায্যে একনিষ্ঠ বলে প্রচার করত। অপরদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও তাদের যোগসাজস ছিল। কুরআন বিভিন্ন স্থানে তাদের এ দ্বিমুখীপনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে। যেমন সূরা মুহাম্মাদে এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ○ـ محمد : ٢٦

"তা এজন্য যে মুনাফিকরা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপসন্দ করে, আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করব। আর আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শসমূহ সম্পর্কে খুব অবগত আছেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৬

এটা স্পষ্ট যে, এখানে لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا এর দ্বারা ইঙ্গিত ইহুদী ও খৃস্টান নেতৃবৃন্দের প্রতিই হতে পারে। সূরা আন নিসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোও এ কর্মনীতির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○ـ النساء : ٦٠-٦١

"আপনি তাদের প্রতি লক্ষ করুন যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাসী। অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় তাগুতের কাছে, যদিও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করতে। আর শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। আর যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন অপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬০-৬১

www.pathagar.com

এটা স্বতঃই প্রমাণিত যে, এখানে তাগুত বলতে ইহুদীদের বিচারালয়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ ওসব আদালত থেকে উৎকোচ ইত্যাদির বিনিময়ে অতিসহজেই সততা ও ন্যায়বিচার পরিপন্থী ফায়সালা করানো সম্ভবপর ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহুদী উলামারা নিজেদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাটছাট পদ্ধতির প্রয়োগে শরীআতের অনেক বিধানকেই নিজেদের খেয়াল-খুশী মোতাবেক পরিবর্তন করে নিয়েছিল। এজন্য মুনাফিকরা নিজেদের অনেক বিষয়-আশয়কেই তাদের আদালতে নিয়ে যেতে চাইত। যখন তাদের বলা হতো, ঈমান ও ইসলামের দাবিতো হলো, তাদের মামলা-মোকদ্দমাগুলো কুরআন ও নবী (স)-এর খেদমতে পেশ করা। তখন তারা নানা প্রকার বাহানা ও অজুহাত দেখিয়ে তা থেকে পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করত।

খণ্ডিত আনুগত্য শিরক

বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের এ বিভাজন ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী ; বরং সঠিক বিচারে এটা শিরক। সূরা নিসার পূর্বোক্ত আয়াতের আলোকেও এটা প্রমাণিত যে, এর মাধ্যমে শয়তানের পক্ষে মানুষকে বিপথগামী করার এক প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এজন্য কুরআন এ ফিতনার দরোজা বন্ধ করে দেয়ার হেদায়াত দান করেছে। কোনো একজন মানুষ এবং জীবনের কোনো একটি দিককেও বাদ না দিয়ে সবাইকে সর্বতোভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আনুগত্যে প্রবেশ করার নির্দেশ প্রদান করেছে। পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের এ পথই শান্তি ও সুবিচারের পথ। আর এ পথের পথিকদের জন্যই কামিয়াবী ও সফলতা। যারা এ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করতে চায় এবং একই সাথে কুফরী ও ইসলাম উভয়টির সাথেই সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক, তারা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করছে। আর শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। কারণ সেতো প্রথম দিন থেকেই তার পথে ওঁৎ পেতে থাকার ও তাকে বিপথগামী করার চরমপত্র দিয়ে রেখেছে।

আয়াত ঃ ২০৯

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

بَيِّنٰتٌ-এর অর্থ

بَيِّنٰتٌ বলতে ওই সকল সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনও হতে পারে যা শয়তানের চক্রান্ত জাল ও তার ফিতনা থেকে সাবধান করার জন্য অত্যন্ত সবিস্তারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর ওসব উজ্জ্বল ও অকাট্য হিদায়াতও হতে পারে যা ঈমান ও ইসলামের দাবিসমূহকে বর্ণনা করার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হেদায়াত ও ভীতি প্রদর্শনের পরও—হে মুনাফিকরা! তোমরা যদি তোমাদের চিরন্তন ও প্রকাশ্য শত্রুরই পদাংক অনুসরণ কর তাহলে এটা ভাল করে জেনে নাও যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা কিছুতেই রেহাই পাবে না। আর আল্লাহ হচ্ছেন আযীয ও হাকীম তথা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

عَزِيْزٌ ও حَكِيْمٌ -এর ব্যাখ্যা

عَـــزِيْزٌ এ গুণবাচক শব্দ দ্বারা দুটি সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। একটি হলো, আল্লাহ কোনো দুর্বল ও শক্তিহীন সত্তা নন। তিনি তো পরাক্রমশালী মহাশক্তিধর সত্তা। অতপর তাঁর ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও কেউ যদি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে তাহলে তিনি শয়তানের পদাংক অনুসারীদের জন্য তাঁর নির্ধারিত ও পূর্বাহ্নেই ঘোষিত শাস্তি দ্বারা অবশ্যই পাকড়াও করবেন। অপরটি হল, যারা এহেন সুস্পষ্ট হেদায়াতের পরও সত্য-ন্যায়ের পথকে বর্জন করে শয়তানেরই পদাংক অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি করবে নিজেদেরই। কারণ আল্লাহ হচ্ছেন—'আযীয' অর্থাৎ সর্বপ্রকার লাভ-ক্ষতির উর্ধে, উচ্চতর মহান।

অপরদিকে حَكِيْمٌ আল্লাহর এ গুণবাচক শব্দটিও দুটি সত্যকে উচ্চকিত করে তোলে। প্রথমত, এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা 'হাকীম'–প্রজ্ঞাময়। আর তাঁর প্রজ্ঞাময় হওয়ার একেবারে প্রাথমিক ও স্বতঃস্ফূর্ত দাবিই হল তাঁর প্রদত্ত হেদায়াতের ওপর যারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তথা হেদায়াত বঞ্চিত—এ উভয়ের মধ্যে পরিণাম-পরিণতির দিক থেকে তিনি অবশ্যই পার্থক্য করবেন। যদিও তিনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য না করেন ও উভয়কে একই পরিণতিতে নিক্ষেপ করেন বা উভয়কে একই লাঠি দ্বারা তাড়িয়ে নিয়ে যান, তার মানে এই দাঁড়াবে যে, তিনি হাকীম বা প্রজ্ঞাময় নন, তিনি একজন খেলোয়াড় মাত্র। আর এ দুনিয়া কোনো প্রজ্ঞাময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি কৌশল নয়, বরঞ্চ এক খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। দ্বিতীয়ত, ভাল ও মন্দের ফলাফল প্রকাশে যে বিলম্ব হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তিশীল। অধিকাংশ সময় মহান আল্লাহ শয়তানের পদাংক অনুসারীদের অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যানুসারীদের কোনো না কোনো পরীক্ষায় নিমজ্জিত করা হয়ে থাকে। এজন্য বাতিল পন্থীদের উদ্ধৃত ও গর্বিত হওয়ার এবং সত্যপন্থীদের হতাশ ও নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। বরং এ অবকাশ ও পরীক্ষা উভয়ই প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ আল্লাহর প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তিশীল এবং উক্ত প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী তাঁর আইন-কানুন ও তার ফলাফল সম্পূর্ণ, অকাট্য ও অলংঘনীয়। তাতে কণামাত্র পার্থক্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আয়াত ঃ ২১০

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

نَظَرَ يَنْظُرُ -এর অর্থ যেমন দেখা, তেমনি অপেক্ষা করাও। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, এসব দলীল প্রমাণ এবং সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পরও যারা সরল-সঠিক ও ঋজু পথে প্রতিষ্ঠিত ও একাত্ম হতে ব্যর্থ হবে এবং শয়তানের পশ্চাদানুসরণে বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করবে। আল্লাহর শাশ্বত বিধান অনুযায়ী তাদের ওপর আল্লাহর আযাব কার্যকর হওয়ার পথে আর কোনো বাধাই অবশিষ্ট থাকবে না। এরপরও তাদের কোনো কিছুর

www.pathagar.com

জন্য অপেক্ষমান থাকার মানে তারা আসলে পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর মহাশক্তি ও পরাক্রমই দেখতে আগ্রহী। তারা যেন এটাই দেখতে ইচ্ছুক যে, মেঘমালার অভ্যন্তরে তাদের জন্য কোনো আযাব এসে উপস্থিত হোক এবং তার ঘনঘটার মধ্যে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ফেরেশতাবাহিনীর আবির্ভাব হোক এবং সত্য ও মিথ্যার এ দ্বন্দ্বে সর্বশেষ চূড়ান্ত ফায়সালা কার্যকর করে দেয়া হোক। তবে এ ফায়সালা কার্যকর করা নবীর দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব সরাসরি মহান আল্লাহ্‌র ওপরই ন্যস্ত। তিনিই জানেন কোন্ জাতির ফায়সালা কবে হওয়া উচিত এবং কিভাবে হওয়া উচিত।

নির্ভরযোগ্য ঈমান

এ আয়াত থেকে জানা গেল, আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনা ও বুঝার ফলস্বরূপ অর্জিত ঈমান ও হেদায়াতই প্রকৃতপক্ষে নির্ভরযোগ্য। ওসব লোকের ঈমান গ্রহণ ও নির্ভরযোগ্য নয় যারা আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রম এবং তাঁর ক্রোধ প্রকাশ পাওয়া ও তা প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষমান থাকে। যারা এর জন্য অপেক্ষা করে তারা তো নিছক নিজেদের দুর্ভাগ্য প্রকাশ পাওয়ারই অপেক্ষা করে থাকে। কারণ তারা মূল তত্ত্ব দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তবেই বিশ্বাস করতে চায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ চান, মানুষ যেন নিজের জ্ঞান ও বোধশক্তিকে কাজে লাগায় এবং তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের পথনির্দেশ কবুল করে নেয়।

আয়াত ঃ ২১১

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য ঈমানের পথ উন্মুক্ত হয়

ايات بينات-এর অর্থ বনী ইসরাঈলদেরকে প্রদত্ত সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান মু'জিযা-সমূহ। তাদের বরাত দেয়ার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে যারা জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের কাছেই ঈমান ও হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত হয়। যারা নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, তারা বিশ্বজাহানের সকল মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পরও অতিশয় দোদুল্যমান মানসিকতা ও আস্থাহীনতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বনী ইসরাঈল কত-শত মু'জিযাই না স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল! মিসর ভূমিতে হযরত মূসা (আ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহের কথা না হয় বাদই দিলাম। খোদ বনী ইসরাঈলের জন্যই তো সমুদ্র শুষ্ক হলো, তূর পর্বত বিদূরিত হলো, একটি শুষ্ক ও রুক্ষ পাহাড় থেকে একই সঙ্গে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, তৃণ-পানিহীন বিজন প্রান্তরে তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া'-নামক নেয়ামতের দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হলো— এক কথায় পদে পদে তাদের জন্য মু'জিযা প্রকাশ পেল। কিন্তু যে বিশ্বাসহীনতা প্রথম দিন থেকেই তাদের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, তা যথারীতি বহালই রইল। অতপর তাদেরই পদচিহ্নের অনুসারীদের কাছ থেকে এটা কিভাবে আশা করা

www.pathagar.com

যেতে পারে যে, তাদের দাবি মোতাবেক তাদের সম্মুখে কোনো মু'জিযা প্রকাশিত হওয়া মাত্র তাদের চোখ খুলে যাবে ? এটা একান্তই ভুল। আসলে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের চোখ বন্ধই থেকে যাবে।

বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের বরাত দেয়ার বিশেষ কারণ এটাই যে, যে মুনাফিকদের অবস্থার পর্যালোচনা এখানে করা হচ্ছে, তারা প্রধানত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের সাথেই সম্পর্ক রাখতো। কাজেই তাদের সামনে তাদেরই অতীত ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরার মধ্যে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

نِعْمَةَ اللّٰه বলতে কি বুঝায় ?

نِعْمَةَ اللّٰه ؛ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ বলতে এখানে আল্লাহর হেদায়াত ও শরীআত বুঝানো হয়েছে। আর তা পরিবর্তন করার মানে, তার যথাযথ মূল্যায়ন করে তাকে ঈমান ও হেদায়াতের উপায় ও মাধ্যম বানানোর পরিবর্তে তার অবমূল্যায়ন করে তাকে কুফরীর উপায় বানানো। কোনো কোনো জায়গায় পরিবর্তনের এ ধরন ও চরিত্রের বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا - ابراهيم : ٢٨ -"লক্ষ কর ঐ সকল লোকদের প্রতি যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছিল।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৮। অর্থাৎ যারা আল্লাহর এ মহা নেয়ামতকে পাওয়ার পরও তা থেকে উপকার ও কল্যাণ নেয়ার পরিবর্তে এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকে, যা জোর করে তাদের ঘাড় সত্যের সম্মুখে নত করিয়ে দেবে, তবে বুঝতে হবে, তারা মূলত হেদায়াতকে গোমরাহীর দ্বারা এবং নেয়ামতকে দুর্ভাগ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে চলেছে। আর এ জাতীয় লোকদের আল্লাহর শাশ্বত বিধান অনুযায়ী মহান আল্লাহর কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আয়াত ঃ ২১২

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا م وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

বাতিলপন্থীদের দৃষ্টি বিভ্রম

এ আয়াতে বাতিলপন্থীদের ওই দৃষ্টি বিভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে নিমজ্জিত থাকার দরুন বাতিলের ধারক-বাহকরা নিজেদের বাতিল পূজায় বিভোর থেকেই জীবন অতিবাহিত করে থাকে। তাদেরকে নবী ও তাঁর সহচরদের পক্ষ থেকে যখন এ চরম উদাসিনতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তারা তাদের সাথে বিদ্রূপ করার ও তাদেরকে জব্দ করার জন্য আযাব নাযিলের দাবি জানিয়ে থাকে। উপরোক্ত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হক ও বাতিল উভয়ের জন্য অবকাশ দানের বিধি

এ পার্থিব জীবনে দেখা যায়, সত্য ও মিথ্যা এবং কুফরী ও ঈমান উভটিকেই অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে। দৃষ্টি বিভ্রমের এটাই কারণ। কেউ ভাল ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করলে তাকে পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তো তার ঈমানের তুলনায় তার পরীক্ষা কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে থাকে। অপর দিকে কেউ কুফরী ও খোদাদ্রোহী জীবন যাপনের সংকল্প করলেও আল্লাহর বিধান এমন হয় না যে, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর ফেরেশতা অবতরণ করে তার ঘাড় মটকে দেবে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে উপর্যুপরি এমন অবকাশ দিয়ে যাওয়া হয় যে, দিন দিন তার ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। এ দৃষ্টি বিভ্রমকেই এখানে زُيِّنَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এ ধোঁকা তাদের দৃষ্টিতে এমনই সুশোভন করে দেয়া হয় যে, তারা মুদ্রার এ পিঠ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ওপিঠে তাকাতে মাত্রই প্রস্তুত হয় না। এটা স্পষ্ট যে, জীবনের এ বিশেষ দিকটিকে শয়তানই তাদের নিকট সুশোভন করে দিয়ে থাকে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এর আরো স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর এটাও জানা কথা যে, মানুষের ত্বরা প্রবণতা ও ভোগ-লালসার মোহই শয়তানকে এ সুশোভন করে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে।

দৃষ্টি বিভ্রমে নিমজ্জিত লোকদেরকে ঈমানদাররা যখন তাদের কর্মকাণ্ড ও আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো প্রকার পাকড়াও বা শাস্তি সম্পর্কে স্মরণ ও সাবধান করিয়ে দেয়, তখন তারা তাদের প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসে এবং তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করে। তারা বলে, আচ্ছা বল দেখি, তোমাদের অবস্থা ভাল না আমাদের অবস্থা ভাল ? আমাদের অবস্থা তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে ভাল—তাহলে কেন আমরা ধরে নেব না যে, আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতিও ভাল এবং সঠিক ? অতপর তারা যখন দেখতে পায়, একদিকে ঈমানদাররা তাদেরকে অব্যাহত সাবধান বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তাদের সর্বপ্রকার প্রগলতা ও পাপচার সত্ত্বেও তাদেরকে পাকড়াও করা হচ্ছে না, তখন নিজেদের জীবনাচার সম্পর্কে তাদের আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বাণ বর্ষণে অধিকতর দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ঃ "তাকওয়ার অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন কাফেরদের চেয়ে উচ্চমর্যাদায় থাকবে।" অর্থাৎ এ পার্থিব জগতে তো নিসন্দেহে পরিস্থিতি এরূপই যে, বস্তুবাদীরা ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারছে। কারণ দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চ শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান মতে চলছে না। এটাতো চলছে পরীক্ষার রীতি-পদ্ধতি অনুসারে। কিন্তু এ জীবনের পরে আরেকটি জীবন ও জগত অবশ্যম্ভাবীরূপে আসবে। সেখানেই পার্থিব যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফলাফল প্রকাশিত হবে। যেসব ঈমানদার দুনিয়ার এ দৃষ্টি বিভ্রমে নিমজ্জিত না হয়ে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি মূলক জীবন অতিবাহিত করবে তারা সেদিন উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

এখানে শুধু বলা হয়েছে 'তারা উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। ঠাট্ট-বিদ্রূপকারীরা কোথায় থাকবে তা বলা হয়নি। এর কারণ, এ ব্যাপারটি একেবারেই সুনির্ধারিত ছিল। পয়গাম্বর

www.pathagar.com

ও ঈমানদারদের সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে এ ব্যপারে যথারীতি অবহিত করে দেয়া হয়েছিল। এজন্য এটা ব্যক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চমর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমেয় রিযিক দিয়ে থাকেন। 'রিযিক' শব্দটি মহান আল্লাহর ফসল ও অনুগ্রহের ব্যাখ্যা—সমার্থক। আর 'ফসল' সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তা হবে অপরিমেয়। অর্থাৎ আশা ও পরিমাণ এবং ধারণাও অনুমানের সর্বপ্রকার বাটখারাই তা পরিমাপ করতে সর্বপ্রযত্নে ব্যর্থ হবে। বিভিন্ন হাদীসে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে এর রূপক দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র আলোচনা করা হবে।

আয়াত ঃ ২১৩

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

ঈমানদারদের উৎসাহিত করণ

পূর্বোক্ত আয়াতে ঈমানদারদের প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বক্ষমান আয়াতে ঈমানদারদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে যে, তোমরা আত্মবিশ্বাস রাখ, তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ। মতভেদ ও মতবিরোধসমূহের মধ্যে মীমাংসাকারী নিক্তি ও মানদণ্ড তোমাদেরই নিকট রয়েছে। কুফরী ও ভ্রষ্টতার এ নিকষ কালো অন্ধকারে একমাত্র তোমরাই সরল-সঠিক মযবুত পথের সন্ধান লাভে ধন্য। তোমাদের চরম বিরুদ্ধাচারী ও ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এ সকল কাফির ও মুনাফিকদের দল তাদের ওই পারস্পরিক এক গুঁয়েমী ও হঠকারিতারই ফসল, যাতে তারা বরাবরই নিমজ্জিত। আর এতে নিমজ্জিত থাকার দরুন এরা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের এমনি শত্রু হয়ে পড়েছে যে, না তারা নিজেরা এটা পেতে আগ্রহী আর না অন্যদের হেদায়াত প্রাপ্তিতে এতটুকুন উৎসাহী। কাজেই হে মু'মিনরা! তোমরা তাদের এ ইসলাম বিরোধী তৎপরতা সত্ত্বেও নিজেদের অবস্থানে সুদৃঢ় ও অটল হয়ে থাক। মহান আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী চলমান এ পরীক্ষাকালের নিশ্চয়ই অবসান হবে। পরিণামে সফলতা ও কামিয়াবী তোমাদেরই পদ চুম্বন করবে।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ঃ এতে كَانَ শব্দটি আমাদের মতে সম্পূর্ণতা সূচক এবং এটি চিরস্থায়িত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ঠিক তদ্রূপ যেরূপ ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত বাক্যাংশে- كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ মহান আল্লাহ মানুষকে দীন প্রদান করেছেন তা একই দীন, উম্মতও সৃষ্টি করেছেন তা একই উম্মত। যেমন তিনি বলেছেন ঃ اِنَّ الدِّيْنَ

عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -“আল্লাহর দীন তো চিরকালের জন্য একমাত্র ইসলামই।” আরো এরশাদ হয়েছে ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا -“এটিই সেই স্বভাব ধর্ম—যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন।” এবং এটিই সেই দীন যা তিনি তাঁর নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো দীনকে মনোনীত করেননি এবং মুসলিম জাতি ভিন্ন অন্য কোনো জাতিকে সৃষ্টি করতে চাননি। তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম এবং গ্রহণযোগ্য জাতি একমাত্র মুসলিম জাতি।

২১৩ আয়াতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গতি

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً -এর পরে فَاخْتَلَفُوْا শব্দটি উহ্য রয়েছে। একটু পরেই উক্ত উহ্য শব্দটিকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ। আরবী বাকরীতি অনুসারে পুনরুক্তি পরিহার করার উদ্দেশ্যেই এটিকে উহ্য করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তো একটি মাত্র দীনই প্রদান করেছেন এবং একটিমাত্র উম্মতই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ উক্ত দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। ফলে তারা বিশৃংখলা ও উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। অতপর আল্লাহ তাদের পারস্পরিক বিভেদ ও মতবিরোধের কুফল সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এবং সত্যের ওপর যারা অবিচল রয়েছে, তাদের সফলতা ও নাজাতের সুসংবাদ প্রদানের জন্য নবীদের পাঠালেন। আল্লাহ নবীদেরকে কিতাব দিলেন। এ কিতাবসমূহ পরম সত্য তথা অকাট্যবাণী সহ অবতীর্ণ হলো। যাতে সত্য দীনের ব্যাপারে সৃষ্ট যাবতীয় মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে নতুনভাবে সত্যকে উদ্ভাসিত করে তোলা যায়। কিন্তু যে জাতিকে এ মহান সত্য প্রদান করা হল তারা অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে সত্যকে উপলব্ধি করার পর নিছক পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও একগুঁয়েমীর দরুন নিজেরাই উক্ত সত্যের মধ্যে মতভেদ করলো। আর এভাবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বারংবার সত্যকে উচ্চকিত করে তুলে ধরা সত্ত্বেও মতভেদ অব্যাহতই রয়ে গেল। আর ভাগ্যের পরিহাস! মতভেদও অব্যাহত থাকল তাদের হাতে, যাদেরকে উক্ত মহাসত্যের পরম বিশ্বস্ত আমানতদার ও নিশানবরদার নিয়োগ করা হয়েছিল।

এক্ষণে মহান আল্লাহ উক্ত দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে ঈমানদার তথা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের ওপর পুনরায় কুরআনের মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর আল্লাহই সে মহান সত্তা যিনি তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

মুসলিম জাতির সুমহান দায়িত্ব

আয়াতের এ সর্বশেষ অংশটিতে এ উম্মতের ওপর সত্যদীনের যে আমানত অর্পিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যস্ত সুমহান দায়িত্বের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা

www.pathagar.com

ওই সত্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার পর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় এতে আবার মতভেদ ও মতবিরোধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ো না এবং এতে এটাও বুঝানো হয়েছে যে, এ গুরুদায়িত্ব যেনতেন দায়িত্ব নয় ; এ এক প্রাণ ওষ্ঠাগত করা কাজ। এ কাজ পালনের পথে বাধা হয়ে আসবে দীনদারী ও সত্যপূজারীদের খান্দানী ঠিকাদার ও সোল এজেন্টরা। যাদের কায়-কারবারের সার্বিক সফলতা সত্যের অবলুপ্তির ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল। এরা তোমাদের সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। এরা কন্টকাকীর্ণ বুনো লতা-গুল্মের ন্যায় তোমাদের আঁকড়ে ধরার জন্য তোমাদের পিছু পিছু তাড়া করে ফিরবে।

আয়াত ঃ ২১৪

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

সত্যের ধারক বাহকদের পরীক্ষার কষ্টিপাথর

এখানে ওই কষ্টিপাথর বা মানদণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাদ্বারা প্রকৃত সত্যের ধারক বাহকদের পরীক্ষা করা হয় ; পরীক্ষা করা হয় প্রতিটি সত্যের পতাকাবাহী দলকে। অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিরদের এ বিরুদ্ধাচরণ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে তোমরা ঘাবড়ে যেয়ো না। প্রেমের পথের এটাতো সূচনা মাত্র। এরপর রয়েছে এর চেয়েও কঠিন থেকে কঠিনতর মঞ্জিলসমূহ। তোমাদের পূর্বসূরী প্রতিটি সত্যের পাতাকাবাহী দলকে এ মঞ্জিলগুলো অতিক্রম করতে হয়েছিল ; তাদের ন্যায় তোমাদেরকেও এ মঞ্জিলগুলো অতিক্রম করতে হবে। তোমাদের পূর্বে যারা এ পথের পথিক ছিল তাদেরকে এহেন বিপদ মসিবত ও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবং এমন সব পরীক্ষার দ্বারা তাদেরকে নিষ্পেষিত করা হয়েছিল যে, খোদ রাসূল ও তাঁর সহচররা مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ। (আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ?) বলে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

حَتّٰى يَقُوْلَ আমাদের মতে حال এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর দ্বারা পরিস্থিতির চিত্রাংকনই উদ্দেশ্য। আর مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ -এর বাকরীতি আশা-আকাঙ্ক্ষার দরোজায় সর্বশেষ ও চূড়ান্ত করাঘাত সূচক ফরিয়াদেরই বহিঃপ্রকাশ। বলা হয়েছে, আল্লাহর সাহায্যের দরোজা এ করাঘাতের চাবির সাহায্যেই খোলা যায়– اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ –(জেনে রেখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।) কবি বলেন ঃ

শুষ্ক অধর পথিক ওহে ঘাবড়ে যেওনা তুমি যেন ;
ধারণ করেছ এবারে তুমি চিরঞ্জীবী হওয়ার প্রস্রবন।

www.pathagar.com

৭০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২১৫-২২১ আয়াত

পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয় ছিল হজ্জ প্রসঙ্গ। এ থেকেই সৃষ্ট একটা সুযোগ মুনাফিকদের জন্য একটা সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শন এবং মু'মিনদের জন্য একটা উপদেশ প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। মূল আলোচনার ধারা ছিল হজ্জ, জিহাদ ও ইনফাক সম্পর্কিত। অতএব এ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর পূর্ববর্তী আলোচনার ধারা আবার ফিরে এসেছে যা উপরোল্লিখিত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব প্রশ্ন ইতোমধ্যে লোকদের মনে উদয় হয়েছিল, তারও জবাব দেয়া হয়েছে।

আরবের জাহেলী সমাজে জুয়া ও মাদকের সংযুক্তি

এ সমস্যা ও প্রশ্নগুলো মূলত পূর্বোক্ত আলোচ্য বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী আলোচনা থেকেও এটা প্রতিভাত হবে। অবশ্য মাদক ও জুয়া সংক্রান্ত যে প্রশ্ন, কারো কারো কাছে এখানে এ প্রসঙ্গের অবতারণা হয়তো বেখাপ্পা মনে হতে পারে। অবশ্য এটা তাদের কাছে বেমানান ঠেকবে যারা এ আয়াতগুলোর অবতারণকালীন আরবের সামাজিক ও তামদ্দুনিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এ প্রশ্ন মূলত ওই ইনফাকের সাথে সম্পর্কজনিত কারণে সৃষ্টি হয়েছে, যার আলোচনা ইতোপূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে।

আরববাসীদের এক সুপ্রিয় ঐতিহ্য

আমরা পরবর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটা অবশ্য বলবো যে, জাহেলী আরব সমাজে প্রচলিত জুয়া ও মাদকের ক্ষতিকর দিক যেমন ছিল, তদ্রূপ তার কিছু কল্যাণকর দিকও ছিল। আরবে দানশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকদের মধ্যে একটা ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ করে শীতকালে তারা বিভিন্ন স্থানে সমবেত হতো। প্রচুর মদপান করতো। অতপর মদপান জনিত মাতাল অবস্থায় যে কোনো লোকের নর অথবা মাদী উট জবাই করে দিতো। মালিককে নামকাওয়াস্তে দাম চুকিয়ে দিত। উটের গোশত দিয়ে জুয়া খেলত। এরপর জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত সমুদয় গোশত তারা সব গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করতো। যারা এ জুয়া-অনুষ্ঠানের সংবাদ শুনে পূর্বাহ্নেই এ আসরে জমায়েত হতো। এটা ছিল আরবদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ঐতিহ্য। যখন উত্তরের শৈত্য প্রবাহ শুরু হতো এবং দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করতো, তখন যারা এ জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো বা তাতে অংশগ্রহণ করতো, তাদেরকে বিরাট দানশীল মনে করা হতো। সমাজে তাদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। প্রক্ষান্তরে যারা এসব থেকে গা বাঁচিয়ে চলতো, তাদেরকে একটি বিশেষ শব্দ— 'বরম' অভিধায় অভিহিত করা হতো। এর মানে হলো কৃপণ।

আরবীয় কাব্য রসিকরা তাদের কবিতা ও কাব্যগাথায় অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জুয়া ও মাদক নিয়ে চর্চা করতো। আমি এখানে কতক প্রসিদ্ধ কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ ধরনের নিছক ইলমি বিষয়ের আলোচনা দ্বারা সাধারণ পাঠকরা তেমন একটা উপকৃত হন না। এ কারণে আমরা তা পরিহার করলাম।

www.pathagar.com

যাই হোক, জুয়া ও মাদকের এটা একটা দিক ছিল যদ্দরুন আরবের জাহেলী সমাজে তাদেরকে বড়ই উদার ও দানশীল বলে গণ্য করা হতো। তাদের এ দানশীলতা ও উদারতার বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টির সেবা এবং গরীব ও দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হত।

অতএব যখন ইনফাক তথা দান-সদকা ও দুস্থদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হলো, তখন কারো কারো মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হলো যে, ইসলাম যখন দুঃস্থ গরীব ও এতিমদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সাহায্যার্থে অর্থব্যয়ের ওপর এতই গুরুত্বারোপ করে, তখন জুয়া ও মাদকের মধ্যে এতটা দোষের কি-ইবা আছে ? এটাতো দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে গরীব-অসহায়দের একটা সাহায্যের মাধ্যম বা উপায় বটে। কুরআন এখানে ওই প্রশ্ন উদ্ধৃত করে তারই জবাব প্রদান করেছে। কুরআন বলছে, এতে সন্দেহ নেই যে, এসবের দ্বারা বিভিন্নভাবে সমাজের কিছুটা উপকার হয় বটে, কিন্তু এদ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের যে বৈষয়িক ও নৈতিক অবক্ষয় ও ধ্বস নামে তা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বেশী। এজন্য ইসলাম এগুলোকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ প্রশ্নটি ঠিক ওই প্রশ্নের মতই যেমনটি আজকাল অনেকেই উথাপন করে থাকে। দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও বন্যা ও মহাপ্লাবন ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত ও দুর্গত লোকদের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের জন্য যেমন আজকাল নাচ-গানের আসর জমানো হয় বা সিনেমা-শো দেখানো হয় কিংবা চিত্রতারকাদের প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করানো হয়। সন্দেহ নেই, কিছুটা ভাল উদ্দেশ্যেই তারা এ পন্থা অবলম্বন করছে। যাই হোক, এদেরকে এ ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করার জন্য ভর্ৎসনা করা হলে এরা বলে আমরাতো মানবসেবার মহান লক্ষ্যেই এটা করছি। তা এতে ক্ষতির বা দোষের কি আছে ? প্রকৃতপক্ষে এরাও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের ন্যায় নিজেদের নিবুদ্ধিতা ও বোকামীর ওই দিকগুলোই শুধু দেখে থাকে যা তাদের দৃষ্টিতে দৃশ্যত জনকল্যাণমূলক। গোটা সমাজের ওপর এর যে ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তার প্রতি এদের দৃষ্টি পতিত হয় না। এখানে আমরা কেবল ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি মাত্র। সামনে আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

একইভাবে এ প্রসঙ্গে এতিমদের সম্পর্কেও একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ইতোপূর্বে অর্থব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে এতিমদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিল যে, তারাও এ অর্থব্যয়ের অন্যতম খাত বা অধিকারী। তাদের ব্যাপারে এ প্রশ্ন উথাপিত হয়েছিল যে, যদি কেউ নিজের রক্ত সম্পর্কের কোনো এতিমের ব্যাপারাদি যার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়—নিজের সাথে শামিল করে নেয় এবং তার মাতাকে বিবাহ করে নেয়, তাতে কোনো দোষ নেই তো ? এখানে কুরআন এ প্রশ্নেরও বিভিন্ন আঙ্গিকে জবাব দান করেছে। এক্ষণে এরি আলোকে সামনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। দেখতে পাবেন মুক্তোর হারের মতোই সাজানো রয়েছে প্রতিটি দানা।

www.pathagar.com

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۚ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ
وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا
شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ
عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ
اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ
حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ
يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۘ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ

www.pathagar.com

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ
وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚۖ وَاللّٰهُ
يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

২১৫. তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে কি পরিমাণ ব্যয় করবে? বলে দাও, যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ করো না কেন, আল্লাহ তা সম্যক অবহিত।

২১৬. কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তোমাদের ওপর অবধারিত করা হলো, যদিও তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়। আর হয়তো কোনো একটা বিষয় তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হয়, অথচ আসলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হয়তো বা কোনো বিষয় তোমাদের কাছে প্রিয় মনে হয়, আসলে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন। তোমরা জান না।

২১৭. তারা আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ গুনাহ। আর আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, কুফরী করা, মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়া এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জোরজবরদস্তি সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে তার চেয়ে বড় গুনাহ। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে বড় গুনাহ। তারা সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যাতে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তাতে তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত

www.pathagar.com

হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরাই জাহান্নামের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২১৯. তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক গুনাহ। তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে। কিন্তু এগুলোর গুনাহ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি তারা ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে তা। এভাবে আল্লাহ তার নির্দশনসমূহ সুস্পষ্টরূপে তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে।

২২০. তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, যাতে তাদের কল্যাণ হয়, তাই ভাল। তবে যদি তোমরা তাদেরকে নিজেদের সাথে শামিল করে নাও—তথা মিলেমিশে একত্রে থাক। তবে তো তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে হিতাকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২২১. তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম যদিও মুশরিক নারী তোমাদের ভাল লাগে। তোমরা বিয়ে দিও না তোমাদের নারীদের মুশরিক পুরুষদের সাথে যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন মু'মিন ক্রীতদাস একজন মুশরিকের চেয়ে অবশ্যই উত্তম যদিও সে তোমাদের মোহিত করে। তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। আর তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৭১. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২১৫

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

প্রশ্নকারীদের গোপন মানসিকতা

এ সূরাটিতে প্রথম থেকেই বারবার অর্থব্যয় ও যাকাত সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। বিশেষ করে ৯৫ আয়াতে আল্লাহর ঘরের মুক্তির লক্ষে জিহাদের জন্য অত্যন্ত জোরের

www.pathagar.com

সাথে অর্থব্যয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ওখানে আমরা বলেছিলাম, শাব্দিক দিক থেকে সম্বোধন যদিও সাধারণ, কিন্তু বাকভঙ্গি মূলত এ সকল মুসলমানদের প্রতি যারা জীবন ও সম্পদ কুরবানী করার ব্যাপারে ছিল দুর্বল। নিয়ম হল, কোনো বিষয়ে কারো মনে যদি দুর্বলতা থাকে এবং ওই কাজটি করার সাহস তার না থাকে, তাহলে সে নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য বারবার প্রশ্ন করতে থাকে। এতে সে এটাই বুঝাতে চায় যে, প্রকৃত কাজ যেটি, তাতো জান-প্রাণ দিয়ে করার জন্যই সে প্রস্তুত। কিন্তু কিবা করা যায় ? আসলে প্রকৃত ব্যাপারটি তো এখনো আমার বুঝে আসেনি। যারা খাঁটি ও প্রকৃত মুসলমান তাদের পক্ষ থেকে খুব কমই প্রশ্ন এসেছে এটাই তার মূল রহস্য। সর্বাধিক প্রশ্ন এসেছে ওসব লোকের পক্ষ থেকে, যারা ছিল দুর্বলচেতা ও কৃপণ এবং প্রশ্নবাণে যারা নিজেদের দুর্বলতাকে আড়াল করতে চাইত তাদের। এ জাতীয় লোকেরাই আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলেছিল। আলোচ্য আয়াতে উক্ত প্রশ্নের অবতারণা করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন থেকে স্বতঃই এটা প্রকাশ পাচ্ছে যে, অর্থব্যয়ের প্রশ্নে তারা যেন পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাদের এটা বুঝেই আসছিল না যে, অর্থব্যয়ের এ চাহিদা কোন্ সীমা পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই কুরআন প্রশ্নকারীদের মানসিকতাকে সামনে রেখে জবাব দিয়েছে। আর এ প্রশ্নের রয়েছে দুটি অংশ।

জবাবের দুটি দিক

জবাবের একটি দিক হল এই যে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়কারীদের এ বিষয়টি দৃষ্টি সমুক্ষে রাখা কর্তব্য, তারা যা কিছুই ব্যয় করুক না কেন তার কোনো অংশ আল্লাহর পকেটে যায় না। তিনি কারো ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তো বরং একহাতে যা গ্রহণ করেন, অপর হাতে তা আমাদেরকেই ফিরিয়ে দেন। আমাদেরই পিতা-মাতা, আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন, আমাদের এতিম অভাবগ্রস্ত এবং আমাদেরই মুসাফির এ গুলো দ্বারা উপকৃত হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর পথে আমরা যা কিছু ব্যয় করি, তা অন্যের পরিচর্যায় নয়, বরং নিজেরই পরিচর্যায় ব্যয় করে থাকি। পার্থক্য শুধু এতটুকুন যে, উক্ত ব্যয়ের ধরনটা একটু আলাদা। এ ক্ষেত্রে সামষ্টিক পদ্ধতিতে ব্যয় করা হয়—যার উপকারিতা সমষ্টিগতভাবে সকলেই পেয়ে থাকে। এ মহাসত্যটিই মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে বিধৃত হয়েছে تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم -"তাদের সম্পদশালীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।" একই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা সাবার নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ - "বলুন, যে পারিশ্রমিকই আমি তোমাদের কাছে চেয়ে থাকি না কেন, তাতো তোমাদেরই জন্য।"—সূরা সাবা ঃ ৪৭

জবাবের অপর দিকটি হলো, মানুষের এ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, সে যে কোনো ভাল কাজই করুক না কেন, তার প্রতিটি অণুকণা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই এবং কোনো কিছুই তিনি ভুলে যান না। আর তিনি যখন সবই জানেন, তার অনিবার্য ও অপরিহার্য ফল এটাই দাঁড়ায় যে, তিনি তার

www.pathagar.com

পুরোপুরি প্রতিদানও দেবেন। অতপর প্রতিটি জিনিসের বিনিময় যেহেতু অবশ্যম্ভাবী এবং তাও আবার দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেয়া হবে। সে ক্ষেত্রে এহেন লাভজনক ব্যবসায়ে পুঁজি খাটাতে মানুষের ঘাবড়াবার কি কারণ থাকতে পারে ? মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - التوبة : ١٢١ -"আর তারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যা কিছু ব্যয় করে এবং যে কোনো প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লিখিত হয়—যেন তারা যা করে আল্লাহ তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১২১

অনিবার্য পরিস্থিতিতে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্'র শেষ সীমা

উপরোক্ত জবাব যদিও একান্তই স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ছিল, তবু অনুমিত হয়, এরপরও কেউ কেউ দুর্বলতা হেতু প্রশ্ন উত্থাপন করা অব্যাহত রাখে। বলাবাহুল্য, দুর্বলতা বিষয়ে ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। কাজেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ -"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে তা।"–সূরা আল বাকাবা ঃ ২১৯। এ জবাব আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের সর্বশেষ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, এ ইনফাক হচ্ছে এ উম্মতের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার সংগ্রামে নিয়োজিত ইনফাক। এজন্য এতে দীনের দাবি হলো, মানুষ তার অনিবার্য ও অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর যা কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তার সবটাই আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

মাওলানা ফারাহী (র) এ আয়াতটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা হল, এ যুদ্ধটি ছিল কা'বা ঘরকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত করণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধ বা জিহাদ। তাই এ জিহাদ মুসলমানদের সমগ্র মনোযোগ নিজের দিকে নিবদ্ধ ও আকর্ষণ করে নিয়েছিল। এবং এ জিহাদের প্রস্তুতিতে তারা এতটাই নিবিষ্ট ও নিবেদিত প্রাণ হয়ে যায় যে, ইনফাকের অন্যান্য ব্যয়ক্ষেত্র, যেমন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম অভাবগ্রস্ত ইত্যাদির প্রতি তাদের সে মনোযোগ ছিল না—যা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এ কারণে লোকদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হলো, ইনফাকের পরিমাণ কি হবে ? এর জবাবে এরশাদ হলো, আল্লাহর পথে যা কিছুই ব্যয় করা হবে, তার প্রথম হকদার ওই সকল লোক যাদের উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে। অতপর অতিরিক্ত যা কিছু খরচ করা হবে, তার সবই আল্লাহর জ্ঞানে থাকবে। তিনি তার পুরোপুরি বিনিময় দেবেন। এখানে পরিমাণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে মানুষ নিজের জ্ঞান দ্বারা কাজ নেবে এবং বিভিন্ন দীনি প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। অনুমিত হয় যে, এরপরও কারো কারো মনে পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। তাই তারা পুনরায় প্রশ্ন করে। তাদের জবাবে এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, প্রাপকদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়ার পর যা বেঁচে যাবে তাই ব্যয় করবে। প্রাপকদের বিষয় ওপরেই উল্লিখিত হওয়ায় এ সংক্ষিপ্ত জবাবকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২১৬

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج
وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

সম্পদ দ্বারা যুদ্ধ ও জীবন দিয়ে যুদ্ধ

এ অর্থব্যয় ও এ যুদ্ধ উভয়টিই একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। এটা একটু পূর্বেই সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। কারণ জিহাদ জীবন ও সম্পদ এ উভয়টি দ্বারাই হয়ে থাকে। কারো কারো মনে আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ পূর্ববর্তী আয়াতে অপনোদন করা হচ্ছে। আর এ আয়াতে জীবন উৎসর্গ করার ব্যাপারে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে। এ সন্দেহকে দূরীভূত করার জন্য এখানে একটি মৌলিক সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তাহল, মানুষ নিজের সফলতা ও কামিয়াবী এবং উন্নতি ও চরমোৎকর্ষের পথ নিজেই নির্ধারণ করতে পারে না। এটা একমাত্র সেই মহান সত্তা নির্ধারণ করতে পারেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। এর কারণ, এটা একমাত্র তিনিই জানেন যে, মানব প্রকৃতিতে কোন্ সব সম্ভাবনা ও যোগ্যতা নিহিত আছে। এবং কোন্ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত যোগ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটাতে পারে—তাও একমাত্র তাঁরই নখদর্পণে। স্রষ্টার অমোঘ নিয়মেই মানুষের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করার সামগ্রিক বিষয়াদি তার নিজেরই কামনা-বাসনা ও নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। যদি তাই দেয়া হত, তাহলে সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণে স্বীয় জীবনের কর্মসূচী থেকে তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরমোৎকর্ষের উপাদানগুলোর প্রত্যেকটিকেই একে একে নির্বাসিত করে দিলেও তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকত না। কারণ এ জিনিসগুলোর কোনো একটিও এমন নেই যা তার সত্তার নিকট পসন্দনীয়। বরং একটির চেয়ে আরেকটি তার সত্তার নিকট অধিকতর কষ্টকর ও অসহনীয়। অপরদিকে এমন আশংকাও প্রবল ছিল যে, সে নিজের মধ্যে এমন সব নিকৃষ্ট গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাতো যা তাকে সর্বাধিক অধঃপতিত ও হীনতম পদার্থে পরিণত করত। কারণ এ নিকৃষ্ট কাজগুলোর প্রতিটিই অত্যন্ত সহজ ও সুস্বাদু। মানব প্রকৃতির এ এক বিস্ময়কর রহস্য, যেসব জিনিস তার নিকট পসন্দনীয় ও আকর্ষণীয়, সেগুলোই অধোপতন ও ধ্বংসের কারণ। আর যেসব কাজ তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক, সেগুলো সাধারণত তার নিকট বড়ই কষ্টকর ও বিস্বাদ। এজন্যই তা সফলতা ও কামিয়াবীর পন্থা বাতলে দেয়ার দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁর পয়গাম্বরগণ ও ঐশী গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে এ পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জিহাদের একটি বিশেষ দিক

যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যাপারটিও হুবহু তদ্রূপ। এর বাহ্যিক দিকের ওপর দৃষ্টিপাত করলে এর চেয়ে ভয়াবহ বিষয় আর কি হতে পারে ? কিন্তু অধিকাংশ সময় এ ভয়াবহ

www.pathagar.com

বিষয়টিকেই সর্বাধিক প্রিয়তম বানিয়ে নিতে হয়। কারণ তার থেকে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করলে গোটা মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

কুরআন যে বলছে 'আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না'–এর মানে এ নয় যে, মানুষ কোনো ব্যাপারে ভাল ও মন্দের দিক নির্ধারণই করতে পারে না। এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এ ব্যাপারে মানুষ প্রচুর ভুল-ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ কারণে অধিকাংশ সময় সে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। আল্লাহই একমাত্র এমন সত্তা যার জ্ঞান গুপ্ত ও ব্যক্ত, অতীত ও ভবিষ্যত সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করতে পারে। এজন্যই মানবজাতির সার্বিক ও সামগ্রিক জীবন বিধান তিনি নিজেই রচনা করে নাযিল করে দিয়েছেন। আর এটি এমন পূর্ণাঙ্গ যে, মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জাহানের উন্নতি ও চূড়ান্ত সফলতার গ্যারান্টি এ জীবন বিধানেই নিহিত।

আয়াত ঃ ২১৭

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

পবিত্র মাসসমূহ সম্পর্কে আরো প্রশ্ন ও তার জবাব

১৯০-১৯৫ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মুশরিকরা তোমাদের হজ্জব্রত পালনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে এবং তাদের প্রতিবন্ধকতার দরুন যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাদেরকে হত্যা কর, যদিও এ যুদ্ধ তোমাদেরকে পবিত্র মাসসমূহে এমনকি মূল হেরেমের সীমার মধ্যেও করতে হয়। বিষয়টি একান্ত স্পষ্টই ছিল। কিন্তু পবিত্র মাসের ব্যাপারে জাহেলী যুগ থেকেই আরবদের ঐতিহ্য এতটাই কঠোর ছিল যে, এ মাসগুলোতে যুদ্ধ ও রক্তপাত করাকে তারা অত্যন্ত জঘন্য পাপ বলে মনে করতো। এতই জঘন্য যে, অনেকেই এটাকে সহজে গ্রহণ করতে পারছিল না। এ ধরনের ব্যাপারসমূহে মানুষের আবেগ বড়ই শানিত হয়ে যায়। এজন্য বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারেও একটা বিরাট সুযোগ এসে গেল। তাই এ সম্পর্কে লোকদের পক্ষ থেকে প্রশ্নের অবতারণা করা হলো এবং কুরআন সবিস্তারে তার জবাব দিয়েছে।

পবিত্র মাসসমূহের সম্মান রক্ষার কিসাস

কুরআন মজীদ উপরোক্ত আয়াতসমূহে এ সত্য তুলে ধরেছে যে, পবিত্র মাসগুলোতে হত্যা ও রক্তপাত করা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। অনুরূপ এখানেও একই সত্য ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেঃ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ –“বলে দিন, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায়।” কিন্তু একই সাথে কুরআন এটাও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়া, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে আল্লাহর বান্দাদের বঞ্চিত করা এবং নিজেদের কাজ ও আকীদা-বিশ্বাসের বিচারে এ মসজিদুল হারামের সর্বাধিক হকদার যারা তাদেরকে এখান থেকে হিজরত করতে বাধ্য করা পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করার চেয়ে বড় অপরাধ। কাজেই এ সকল গুরুতর অপরাধের পথ বন্ধ করার জন্য পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা যদি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে এটা হবে পবিত্র মাসের মর্যাদা রক্ষার কিসাস। আর এটা গুনাহ নয়, এটা বরং অনেক বড়ো নেকী ও ভাল কাজ।

ফিতনার মূলোৎপাটন

এরপর বিশেষ করে ফিতনার বরাত দেয়া হয়েছে ঃ اَلْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ। অর্থাৎ মক্কাতে চলমান এই যে ফিতনা-ফাসাদ—এতো হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। ফিতনার ব্যাখ্যা আমরা ইতোপূর্বে করে এসেছি। মুসলমানদেরকে ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্য কাফির ও মুশরিকরা যে কঠোর ও অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন করত তাই ছিল ফিতনা। বলা হয়েছে, এ ফিতনা তো হত্যার চেয়েও কঠিন গুনাহ। অতপর এ ফিতনা তো আজ মূল নিরাপত্তার শহর ও পবিত্র নগরীতেই বিদ্যমান। পবিত্র ভূমির মর্যাদা এ যালেমদেরকে বাধা দিতে পারছে না, পবিত্র মাসের সম্মানও পারছে না এদের প্রতিরোধ করতে। অবশেষে মযলুম ও অত্যাচারিতদের আত্মরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অপরাধ সাব্যস্ত হবে কোন্ যুক্তিতে ?

অতপর এ ফিতনার ভয়াবহতা তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে, কাফির ও মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সত্যদীন থেকে বাধা দেয়ার জন্য যে অত্যাচার নির্যাতন পরিচালনা করছিল তা আকারে-প্রকারে ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর পর্যায়েই সীমিত ছিল না। এমন ছিল না যে সাময়িক উত্তেজনা বশত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়ে গিয়েছে বরঞ্চ এরা মুসলমানদেরকে দীন থেকে বাধা দেয়ার জন্য এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আঁটছিল। এদের পরিকল্পনায় (সম্ভব হলে) তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে সম্পূর্ণ বাধাদানে কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না বলেও তারা ছিল বদ্ধপরিকর। প্রশ্ন হচ্ছে, এহেন কঠিন ও প্রচণ্ড ফিতনা সত্ত্বেও পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা কি গুনাহ থেকে যাবে ?

একটি যথোচিত ভীতিপ্রদর্শনের স্থান

এ পর্যন্ত তো মূল প্রশ্নের উত্তর ছিল। এরপর ধর্মত্যাগের আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমানদেরকেও একটি প্রাসঙ্গিক সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের যুলুম-নির্যাতনে ভীত হয়ে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বীয় দীন পরিত্যাগ করে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষ্ফল হয়ে যাবে আর সে জাহান্নামে পতিত হবে এবং চিরকাল সেখানেই

www.pathagar.com

থাকবে। এখানে 'নিষ্ফল হয়ে যাবে'—এর জন্য حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মকাণ্ড বলতে বাহ্যত যা ভাল কাজ বলে অনুমিত হয় তা বুঝানো হয়েছে। আর حَبِطَ মানে তাদের সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও প্রভাবহীন হওয়া। অর্থাৎ কুফরী অবলম্বন করার পর সে ইসলামের যতকাজই করেছে তার সবই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

ধর্মত্যাগের শাস্তি

উক্ত আয়াতে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ও লক্ষণীয়। আমল ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষ্ফল হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে। যেমন বলা হয়েছে حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ আখেরাতে ধর্মত্যাগীর আমল বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টি তো পরিষ্কার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়াতে তাদের কাজ বিনষ্ট হওয়ার রূপটা কি ? আমাদের মতে এর জবাব হলো, যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়, সে মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। রাষ্ট্রের ওপর তার জীবন ও সম্পদের হিফাযতের দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে না। এ মূলনীতির ওপরই মুরতাদের সাজা সংক্রান্ত ইসলামী দণ্ড বিধির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

আয়াত ঃ ২১৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সত্যের ওপর অটল থাকার মর্যাদা

কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যারা মুরতাদ হয়ে যায় তাদের পরিণাম বর্ণনা করার পরও কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও যারা নিজেদের ঈমানের ওপর অবিচল থাকবে, হিজরত ও জিহাদের বিভীষিকার মোকাবিলা করবে তাদের অবস্থান তথা মার্যাদাও বলে দেয়া হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এরাই ওসব লোক যারা তাদের পালনকর্তার রহমত ও অনুগ্রহ লাভে আশাবাদী হওয়ার যোগ্য। স্থান-কাল প্রমাণ করে যে, এখানে اٰمَنُوْا শব্দটি তার পূর্ণাঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য আমরা এর অর্থ "নিজেদের ঈমানের ওপর যারা অটল থাকবে" করেছি।

সেকালে হিজরত ও জিহাদ মুসলমানদের ওপর একই সাথে ফরয ছিল। একদিকে আল্লাহর ঘরকে মুক্তকরণ ও ফিতনা নির্মূল করার জন্য জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অপরদিকে নবী (স)-এর সাহায্য ও ঈমানের সুরক্ষার জন্য হিজরতেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। দুটি যুদ্ধই ছিল অত্যন্ত সুকঠিন। এজন্য উভয়টিরই উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের জন্য এ পথনির্দেশও ছিল যে, কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনের জবাব ধর্মত্যাগ নয় এবং হিজরত ও জিহাদই এর প্রকৃষ্ট জবাব।

যারা এহেন কঠিন কঠোর মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করতে পারবে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হতে পারে। অর্থাৎ এ সমস্ত ঘাঁটি অতিক্রম

www.pathagar.com

করার পরও কারো নিশ্চিত বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ, নিজের আমল দ্বারা কেউই নাজাত পাবে না। বরং যে কেউ নাজাত অর্জন করে না কেন, তা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমা এবং কৃপা ও অনুগ্রহেই অর্জন করবে। তাই সর্বশেষ বলে দেয়া হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –"আর আল্লাহ হচ্ছেন পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত ঃ ২১৯

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۵ قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

জুয়া ও মাদক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ধরন

এ অনুচ্ছেদের ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, সেকালে আরবের অভিজাত সমাজের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মাদক ও জুয়ার মধ্যে বর্তমান কিছু উপকারিতার দিককে সামনে রেখেই এ সম্পর্কে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছিল। আমরা এও বলেছি যে, আরবের জাহেলিয়াত যুগের সমাজে প্রচলিত জুয়া ও মাদকের ধরণ বর্তমান জুয়াবাজী ও নেশাখোরী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত জুয়া নিছক ভাগ্য পরীক্ষা ও দেউলিয়া হওয়ার সমার্থক। আর মদ পান নিছক ভোগ বিলাস ও আনন্দোল্লাস মাত্র। কিন্তু জাহেলী আরবে এগুলোর মধ্যে মানব সেবার এমন কিছু দিকও ছিল, যদ্দরুন আরবরা এসব কাজকে নিম্ন কৃষ্টির নয়, বরং উঁচুস্তরের মর্যাদা পূর্ণ কাজ বলে গণ্য করতো। এদিক থেকেই এখানে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় ও জিহাদ প্রসঙ্গে এগুলো সম্পর্কেও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হলো, দুর্ভিক্ষের সময় সম্পদশালী লোকেরা মাদক পান করে ও জুয়া খেলে এতে তারা যে অর্থ-কড়ি আয় করে তা গরীব ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করে দেয়। তা এ সম্পর্কে কুআনের পথনির্দেশ কি ?

ক্ষতিকর জিনিস সম্পর্কে ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিকোণ

কুরআন এর জবাব দিয়েছে। কুরআন বলেছে, মেনে নিলাম, এতে কিয়ৎ পরিমাণে উপকারিতা আছে বটে, কিন্তু এতে সমাজের যে ক্ষতি ও অপকার সাধিত হয়, তা উপকারের তুলনায় বহুগুণে বেশি। তাই নৈতিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নাজায়েয ও অবৈধ। যেন কুরআন এখানে ইসলামী শরীআতের এ মানদণ্ডই তুলে ধরেছে যে, যেসব জিনিসের অপকারিতা তার উপকারিতার চেয়ে বেশি ইসলামী শরীআতে তা-ই নিষিদ্ধ।

একটি ভুল ধারণা

কারো কারো ধারণা কুরআন এখানে জুয়া ও মাদকের যেসব উপকারিতা ও সুফলের স্বীকৃতি দিয়েছে তার অর্থ বৈষয়িক ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল।

প্রথমত, দ্রব্য ও কর্মের চিকিৎসা এবং বস্তুগত উপকারিতা ও লাভালাভের সরাসরি কোনো সম্পর্ক কুরআনের সাথে নেই। ধরে নিলাম, কোনো না কোনো দিক থেকে আছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বলুন তো পৃথিবীতে এমন কোন্ নিকৃষ্টতম ও অপবিত্রতম জিনিস রয়েছে, যার মধ্যে ক্ষতিকর দিকগুলোর সাথে সাথে কিছু না কিছু উপকারিতার দিকও বর্তমান নেই ? তাহলে জুয়া ও মাদকের এমন কি বিশেষত্ব রয়েছে যে, কুরআন এগুলোর উপকারিতা ও কল্যাণকারিতার স্বীকৃতি দিল ? চুরি, ব্যভিচার, সুদ ও শূকর ইত্যাদির মধ্যেও তো কিছু উপকারিতার দিক রয়েছে। কুরআন সেগুলোর উল্লেখ করলো না কেন ?

ভুল ধারণার কারণসমূহ

আমাদের মতে এ ভুল ধারণার কারণ তিনটি। প্রথমত, লোকেরা এ জুয়া ও মাদককে সম্পূর্ণই আমাদের সমাজে প্রচলিত জুয়া ও মাদকের ওপর অনুমান বা তুলনা করছে। এ জন্য তারা এতে কোনো নৈতিক ও মানবিক মূল্যমান খুঁজে পাওয়ার ধারণাই করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, জাহেলী যুগের আরবদের কথা ও ভাষা, তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং তাদের ভাল ও মন্দের ধারণা সম্পর্কে এসব লোকের জ্ঞান নিতান্তই অস্বচ্ছ ও অগভীর। তাই কুরআনের এ ধরনের ইঙ্গিতসমূহের গভীরে তাদের দৃষ্টি পৌঁছে না।

তৃতীয়ত, এরা কুরআনের ভাষা ও বাণী-ভঙ্গীর ওপরও যথাযথ চিন্তা-গবেষণা করার কষ্ট স্বীকারে প্রবৃত্ত হন না। ভাসাভাসাভাবে যা কিছু সম্মুখে আসে, তাই নিয়ে তারা বিভোর হয়ে পড়েন। লক্ষ করুন, সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে نفع শব্দের বিপরীতে اثم। শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে আলোচ্য বিষয় মদ-জুয়ার বস্তুগত ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপকারিতা নয় ; বরং আলোচ্য বিষয় এগুলোর নৈতিক উপকারিতা। এটা জানা কথা যে, اثم। শব্দটি চিকিৎসা বিষয়ক ক্ষতির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। এটি ব্যবহৃত হয় নৈতিক অনাচার ও গুনাহর ক্ষেত্রে। মাদকের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ক্ষতি বা উপকারের সাথেই যদি প্রশ্নটি জড়িত থাকত, তবে তো نفع শব্দের বিপরীতে اثم। শব্দ ব্যবহার হতো না ; ব্যবহৃত হতো ضرر শব্দটি।

সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ইসলামী শরীআতের একটি মূলনীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাহলো, যেসব জিনিস নৈতিক ও চারিত্রিক প্রেক্ষাপটে ক্ষতিকর, সেগুলো থেকে বাহ্যত মানবজাতির কোনো উপকার হলেও বা উপকার করা সম্ভবপর বিবেচিত হলেও—যদি তার ক্ষতির দিকটিই প্রবলতর হয়, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা পরিহার করাই অপরিহার্য তথা ওয়াজিব। যেমন, ধরা যাক, কোথাও লটারীর আয়োজন করা হলো। উদ্দেশ্য, এর আয় দ্বারা একটি অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করা। অথবা চিত্রতারকাদের একটি সাহায্য বা সেবামূলক প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলো। উদ্দেশ্য, এর টিকিট বিক্রি করে অর্জিত টাকা কোনো বিপর্যয় ও দুর্যোগ কবলিত এলাকার মুসলমানদের সাহায্য করা। বাহ্যত এ কাজগুলো ভাল ও সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত। কিন্তু ইসলাম এই 'ভাল' ও 'সৎকাজ'কে বৈধ করেনি। কারণ এ

www.pathagar.com

ভালোর অন্তরালে যে মন্দ ও পাপ লালিত ও বিকশিত হয় তা ওই ভাল ও সৎকাজের তুলনায় বহুগুণে বেশি।

ক্রমান্বয়ে জবাব দানের যৌক্তিকতা

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ঃ একই বিষয় সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন করার কারণ সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করে এসেছি। এসব প্রশ্ন ওই সকল দুর্বলচেতা লোকদের পক্ষ থেকেই উত্থাপিত হচ্ছিল যাদের আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করতে অতিশয় কষ্ট অনুভূত হতো। তাদের এ দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতেই কুরআন ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে জবাব দান করেছে— যেন তাদের ওপর বেশি কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে না পড়ে। ওষুধ দেখে আতংকগ্রস্ত রুগীকে পূর্ণ ডোজ একবারেই খাওয়ানো সম্ভবপর না হলে দু' তিনবারে তা সেবন করিয়ে দেয়াই যুক্তি ও প্রজ্ঞার দাবি। এ যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থব্যয় সম্পর্কে বারবার প্রশ্নকর্তাদেরকেও কুরআন সর্বশেষ ও সিদ্ধান্তকর জবাব দিয়েছে তৃতীয়বারে। প্রথমবারেই এ জবাব দিয়ে দেয়া হলে দুর্বল প্রকৃতির ঈমানদারদের ঈমানের জন্য তা মহাপরীক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

এখানে প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, "যা বেঁচে যাবে তাই দান করবে।" জবাব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু একই সঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্য। বলা হয়েছে। قُلِ الْعَفْوَ অর্থ অতিরিক্ত। এর তাৎপর্য পরিষ্কার ; নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদের অপরিহার্য প্রয়োজনাদি পূরণের পর যা বেঁচে যাবে তা। এটা জেনে রাখা জরুরী যে, এখানে অর্থ-ব্যয় বলতে সাধারণভাবে প্রাপকদের জন্য যেসব ওয়াজিব দান-সদকা ও যাকাত আকারে প্রত্যেক (সক্ষম) মুসলমানের ওপর অপরিহার্য, তা বুঝানো হয়নি। এটা ওই ইনফাক যার সম্পর্ক রয়েছে জিহাদ, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করা এবং দেশ ও জাতির হিফাযত ও সুরক্ষার সাথে। এসব উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানের ওপর যে অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তার সর্বশেষ সীমা এখানে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দেশ ও জাতির হিফাযত ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়লে নিজের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণের পর যা বাঁচাতে পারবে তার সবই উক্ত জিহাদের জন্য কুরবান করে দেবে। জাতীয় জীবনে এমন সময় ও পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়ে থাকে যখন জাতি ও ধর্মের জন্য সর্বস্ব কুরবানী করার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আর দুনিয়ার যে কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতিই— চাই তারা মু'মিন হোক অথবা কাফির—এহেন আত্মোৎসর্গের জন্য উদগ্রীব থাকে। ইসলাম এক্ষেত্রে এটুকুন চেয়েছে যে, আমরা যেন এ ধরনের কুরবানী ও আত্মোৎসর্গের প্রশ্নে স্বেচ্ছায় ও স্বানন্দে প্রস্তুত থাকি।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ এটা উপরোক্ত সমগ্র প্রশ্নোত্তরের উপর পর্যালোচনা। আমরা নিবেদন করে এসেছি যে, এসব প্রশ্নমালা ওসব সমস্যাবলীর সাথে জড়িত যা পবিত্র মাসসমূহ, জিহাদ ও ইনফাকের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এসবই উল্লিখিত

www.pathagar.com

হয়েছিল হজ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে। এ সমস্যাগুলোর সাথে জড়িত আরো কিছু প্রশ্ন পরবর্তীকালে সৃষ্টি হলে তারও জবাব প্রদান করা হয়। এটা ছিল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহের স্মারক হিসেবেই এরশাদ হয়েছে যে, এটা হচ্ছে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিধানের বিশদ বিবরণ এবং সূরা কিয়ামায় প্রদত্ত মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির পরিপূরণ ؁ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝ ঃ - "নিশ্চয় এর একত্রিকরণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর এর বিশদ বিবরণের দায়িত্ব তো আমারই।"–সূরা কিয়ামা ঃ ১৭-১৯

এখানে বিশদভাবে বর্ণনা করার উপকারিতা বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। কুরআন মজীদ সমস্যাদি বর্ণনা করার এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, কোনো বিষয়ের সার্বিক দিক একই সাথে পেশ করেনি। কোনো কোনো দিককে সে সংক্ষিপ্তাকারে ছেড়ে দিয়েছে। অতপর যখন মানুষের মনে সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে, তখন ক্রমান্বয়ে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছে। মানুষ যাতে চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে এবং দীনের ব্যাপারে মানুষ নেহায়েত অন্ধ অনুসারী হয়ে না থাকে। উপরন্তু দীনের তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য এবং কল্যাণকারিতা ও যৌক্তিকতা পর্যন্ত পৌঁছাতে ও তা অনুধাবন করতে যেন মানুষ নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সংযোজন

প্রকাশ্যত لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ পর্যন্ত আয়াত সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এখানে এরপরে فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এ অংশটুকুর সংযোজনও রয়েছে। চিন্তা করলে বুঝা যায়, এ সংযোজন ও বৃদ্ধি অত্যন্ত মূল্যবান। পূর্ববর্তী সবগুলো জিজ্ঞাসার ওপর চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, উদ্ভূত প্রশ্নগুলো নিছক এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞানসীমায় সাধারণভাবেই এ পরিমাণ ভারসাম্য বর্তমান থাকে না যা দীন ও দুনিয়া উভয়টিরই উপকারিতা ও যৌক্তিকতা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম। এ ভারসাম্যহীনতার ফল এটাই দাঁড়ায়, কেউ যখন দীনদারীর দিকে ঝুঁকে যায় তখন সে দীনকে সন্ন্যাসতন্ত্রে পরিণত করে ছাড়ে। এমনকি যে কোনো জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, যুদ্ধ ও জিহাদ তাদের অভিধানে তাকওয়া পরিপন্থী বলে সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারীর দিকে ঝুঁকে পড়লে জুয়া ও মাদকের ন্যায় গর্হিত বিষয়াদিকেও নেকী ও ভাল কাজ বলে নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে। তাও নিছক এ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ চেষ্টা করবে যে, হাঁ, এতেও তো কিছু না কিছু কল্যাণের দিক রয়েছে! তাই কুরআন মানুষের চিন্তা শক্তির প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণের এমন পন্থা সে গ্রহণ করেছে যেন সে উপরোক্ত ভারসাম্যহীনতাকে দূরীভূত করে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিকে সঠিক ও যথার্থভাবে অনুধাবন করার যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে।

www.pathagar.com

عفو শব্দ থেকে সমাজতন্ত্রের প্রমাণ গ্রহণের ভ্রান্ত ধারণা

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোকেরা عفو শব্দ থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেছে যে, জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের পর যা কিছু বেঁচে যাবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য ইসলামী সরকার তা হস্তগত করে নেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। প্রথমত, এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তার সম্পর্ক সরকারের সাথে নয়, এর সম্পর্ক সাধারণ ব্যক্তি মানুষের সাথে। অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা মোতাবেক এ সীমা পর্যন্ত সম্পদের কুরবানী করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, ওপরেও যেমনটি বলা হয়েছে, এর সম্পর্ক সাধারণ অবস্থার সাথে নয় বরং জরুরী অবস্থার সাথেই এর সম্পর্ক যখন দেশ ও জাতির হিফাযত ও সুরক্ষার প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে, এমতাবস্থায় প্রথমত, জনগণ নিজে থেকেই সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অপরদিকে সরকার যদি কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা অত্যাবশ্যক মনে করে, তবে তাতেও ইসলামী শরীআত দূষণীয় মনে করে না। যদিও ব্যক্তি মানুষের প্রশিক্ষণ দান এমনভাবে করাই ইসলামের প্রকৃত চাহিদা ও লক্ষ যাতে তাদের মধ্যে ইচ্ছা ও পসন্দের স্বাধীনতার সাথে সাথে সর্বাধিক নেকী অর্জন করার উদ্দীপনাও জাগ্রত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে এবং বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে ভাল কাজ করা অপেক্ষা স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দভাবে ভালকাজ করার মূল্য অনেক বেশি।

আয়াত ঃ ২২০

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

এতিমদের ব্যাপারে সমাজের দায়িত্ব

এতিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ প্রশ্নটিও ঐ সামাজিক সেবা ও সাহায্য সম্পর্কিত বিষয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে, ২১৫ আয়াতে যে সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। ইসলাম প্রতিটি মানুষের ওপর আর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাথে এতিম—বিশেষ করে বংশীয় এতিমদের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অর্থাৎ, ইসলামের নির্দেশ হলো, তারা যদি অভাবগ্রস্ত ও সহায়-সম্বলহীন হয়, তাহলে তাদের জন্য ব্যয় কর। আর তাদের নিকট ধন-সম্পদ থাকলে পূর্ণ সাবধানতা সহকারে (যথা সম্ভব কোনোরূপ প্রতিদান ও বিনিময় ব্যতিরেকে) তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ধিত করণের চেষ্টা কর। এসব নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই লোকদের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিল, কেউ যদি ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে কোনো এতিমের ধন-সম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, নিজের ধন-সম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে একীভূত করে নেয় এবং তার অধিকারসমূহের সুরক্ষার লক্ষে এরূপ

www.pathagar.com

এতিমের মাতাকে বিয়ে করে নেয়, তাতে কোনো ক্ষতি অপরাধ নেই তো ? এ প্রশ্ন বিশেষ করে এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম এতিমের হক ও ধন-সম্পদের সুরক্ষা বিষয়ে যেসব সাবধানতা অবলম্বনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, তা যারপরনাই কঠোর। কুরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সদুদ্দেশ্য ভিন্ন এতিমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না। যারা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের উদরে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করেছে, কুরআনে এরূপ ভীতিপ্রদর্শনও করা হয়েছে। এহেন ভীতিকর সাবধান বাণীসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও একজন আল্লাহভীরু মানুষ কুরআনের অনুমতি ভিন্ন এতিমদের বিষয় আশয়কে নিজের বিষয় আশয়ের সঙ্গে একীভূত করে নেয়ার দুঃসাহস কিভাবেই বা করতে পারে ?

এ প্রশ্নের জবাবে কুরআন যে মৌলিক নীতিগত বক্তব্য প্রদান করেছে তাহলো ঃ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ। (তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।) বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো, সর্বাবস্থায় এতিমের কল্যার্ণ ও মঙ্গলই লক্ষ হতে হবে। যাতে তাদের কল্যাণ হয় তাই ভাল। তোমাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিষয় আশয়কে আলাদা ও পৃথক রেখে দেখা-শোনা করাই যদি অধিকতর ভাল হয়, তাহলে তাই করবে। আর যদি নিজের সাথে একীভূত করেই অধিকতর উত্তম পন্থায় এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে বলে মনে কর, তোমাদের জন্য তারও অনুমতি রয়েছে। মোটকথা তারা তো তোমাদেরই ভাই-বন্ধু বৈ নয়। তাই, আলাদা রাখাকে অপরিহার্যই বা ঘোষণা করা হবে কেন ? কিন্তু এ অনুমতির সাথে এ সাবধান বাণীও বলে দেয়া হয়েছে যে ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ। –"আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকেই স্মরণ রাখতে হবে, মহান আল্লাহর নিকট এটা মোটেই প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না যে, এ একীভূত করার পেছনে এতিমের কল্যাণ কার লক্ষ, আর কার লক্ষ এর ছদ্মাবরণে তার ধন-সম্পদ গ্রাস করা। কেউ এ অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে অন্যায় ফায়দা লুটে নিলে তার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ আযীয ও হাকীম তথা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার কারো কোনো উপায় নেই। একই সাথে এ অনুগ্রহের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা নিছক মহান আল্লাহর সদয় অনুগ্রহ ও দয়া বৈ নয়। অন্যথায় তিনি এ একীভূত করাকে বারণ করে দিতেন এবং একই সাথে এতিমের মাল ও সহায় সম্পদের হিফাযতের বাধ্য-বাধকতামূলক নির্দেশ দিতে পারতেন। এমনটি হলে তোমরা বড়ই কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে। কিন্তু মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবানী করেছেন। তোমাদেরকে কোনোরূপ কষ্টে না ফেলে তিনি তোমাদের জন্য সেবা ও ভাল কাজের এক পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব তাঁর এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এ অনুমতি থেকে কোনোরূপ অন্যায় সুযোগ ও ফায়দা গ্রহণের চেষ্টা না করা তোমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

عنت শব্দের অর্থ ঃ ইসলামী শরীআতের প্রকৃতি

عنت শব্দের অর্থ দুঃখ ও কষ্ট। আর اعنات মানে কষ্টে ফেলা। এতে ইসলামী শরীআতের প্রকৃতি জানতে পারা যায়। অর্থাৎ ইসলামী শরীআত কষ্টে ফেলার নয়, কষ্ট থেকে বাঁচাবার পথ খুলে দিয়েছে।

আয়াত ঃ ২২১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

মুশরিক নারীদের বিয়ে করার নিষিদ্ধতা

এতিমদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদ ইত্যাদি একীভূত করে নেয়ার যে অনুমতি পূর্বোক্ত আয়াতে দেয়া হয়েছে তার আরেকটি দিকও রয়েছে। তা হল, যদি কোনো এতিমের অভিভাবক এতিমের অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখেই তার মাকে বিয়ে করে নেয়, যাতে একজন বিধবা নারীর লালন-পালন ও তার হিফাযত এবং সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অপরদিকে এতিমের অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার ঘরেই একজন জাগ্রত দৃষ্টিদানকারীর আগমন ঘটে। তা এ ব্যাপারেই বা নির্দেশ কি ? কুরআন এর জবাব দিয়েছে এটা যে, যুক্তিটি আপন জায়গায় গুরুত্বের দাবিদার এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে এতিম জননীদের বিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু শর্ত হলো, সে নারীকে অবশ্য মু'মিন হতে হবে। শর্তটি আরোপ করার কারণ তখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন ছিল যে, বিপুলসংখ্যক এতিম এমনও ছিল যাদের মায়েরা ইসলামে প্রবেশ করেনি। এ কারণে পথনির্দেশ এভাবে আসল যে, এরূপ যুক্তি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনো অবস্থাতেই মুশরিক নারীদের বিবাহ করার অনুমতি নেই। কেননা তাতে অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। সামনে তার আলোচনা আসছে।

مُشْرِكَاتْ ও مُشْرِكِيْنَ-এর পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনে مُشْرِكِيْنَ ও مُشْرِكَاتْ শব্দদ্বয় বিশেষত আরবের মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের উপাধি ও পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য যেসব জাতির মধ্যে শিরক পাওয়া যেত—চাই তারা কিতাবধারী হোক কিংবা সম-কিতাব-ধারীদের অন্তর্গত—তারা সরাসরি এ শব্দের অধীনে আসতো না। এজন্য তাদের বিধানের বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র যথাস্থানে আসবে।

www.pathagar.com

পসন্দ ও অপসন্দের ইসলামী মাপকাঠি

এখানে বনী ইসরাঈলের মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের ব্যাপারে এ বিধান ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের নারীদেরকে যেমন তোমাদের বিবাহাধীনে আনা জায়েয নয়, তেমনি তোমাদের কন্যাদেরও তাদের বিবাহাধীনে অর্পণ করা বৈধ নয়। এ নিষিদ্ধতার সাথে এটাও অত্যন্ত জোরের সাথে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, একজন মুসলমান ক্রীতদাসী একজন স্বাধীন মুশরিক নারী অপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য ; যদিও সে মুশরিক নারী তোমাদের নিকট আকর্ষণীয় ও মনোহর মনে হোক। অনুরূপ একজন মু'মিন ক্রীতদাস একজন স্বাধীন মুশরিক অপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য। উক্ত স্বাধীন মুশরিক তোমাদের কাছে যতই ভাল লাগুক না কেন। অতপর এর কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে পসন্দ-অপসন্দের মাপকাঠি বাহ্যিক রূপ ও আকার-আকৃতি, বংশ ও রক্ত এবং আযাদী ও গোলামী নয় ; বরং মাপকাঠি ঈমান ও সৎকাজ। ফলে এক্ষণে তোমাদের আত্মীয়তা ও সম্বন্ধবাদ, জাত-পাত ও ভ্রাতৃত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকেনি, বরং তা আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক অনুসারে নির্ধারিত হবে। ঈমানের অলংকারে সজ্জিতা না হলে কুরাইশ বংশের অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যাকেও তোমাদের মনে হবে এক চল্লিশোর্ধ বৃদ্ধা রমণী। পক্ষান্তরে হৃদয়-মনে ঈমান ও ইসলামের আলোক-আভায় উদ্ভাসিত আফ্রিকার উপকূলবাসী কোনো কালো-কুৎসিত ক্রীতদাসীকেও মনে হবে জান্নাতের হুর। অনুরূপ কোনো ক্রীতদাস পুত্র যদি ঈমান রূপ সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়, তার সাথে তোমরা তোমাদের কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়ে দাও। পক্ষান্তরে ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত কুরাইশ বংশের কোনো অমিত প্রতাপশালী নেতার কাছেও নিজেদের কন্যা সমর্পণ করতে অস্বীকার করে বস।

জীবনের ওপর আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্বন্ধের প্রভাব

এছাড়া কুরআন এ দর্শনও উপস্থাপন করেছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক-সম্বন্ধ জীবনের ওপর কোনো সাধারণ ও ভাসাভাসা ছাপ রাখে না, বরং মানব জীবনের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী। কেউ যদি এসব ব্যাপারে আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের কোনো গুরুত্ব প্রদান না করে, কেবলই সৌন্দর্য ও সম্পদ কিংবা কোনো যুক্তি বিচার বা বংশ গৌরব ইত্যাদিকেই মূল্য প্রদান করে, তাহলে অসম্ভব নয় যে, নিজেরই অর্থ-কড়ি ব্যয় করে নিজের ঘরে কোনো বিপদ ডেকে আনবে। অতপর আপন ঘরে সযত্নে লালিত সে বিপদ শুধু তারই নয়। বরং তার ভবিষ্যত বংশধরদের ইসলামের মূলকেও ভূমিস্মাত করে দেবে। বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক ধর্ম-কর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে যেসব মহাপরিবর্তন সাধিত করেছে তার অজস্র বাস্তব দৃষ্টান্তে ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, অন্যান্য মূর্তি-পূজারী জাতিসমূহ থেকে বিবাহ সূত্রে আগত নারীদের দ্বারাই তাদের মধ্যে অসংখ্য আকীদাগত ভ্রষ্টতা বিপথগামিতা বিস্তার লাভ করেছিল। একইভাবে আমাদের পূর্বসূরী মোগল সম্রাটরা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে হিন্দু রাজাদের সাথে যেসব বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাতে তারা শুধু তাদের কন্যাদেরই নিজেদের ঘরে

এনেছিলেন, তা নয়। কন্যাদের সাথে তারা আরো যা এনেছিলেন তাহলো তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ভ্রান্ত-ধারণা, রসম-রেওয়াজ ও পূজা-উপাসনার প্রথা-পদ্ধতি। বর্তমান যুগেও যারা দেশ ও জাতির এবং দীন ও ধর্মের স্বাতন্ত্রের স্মারক চিহ্ন ও ঐতিহ্য মুছে ফেলতে কৃতসংকল্প, তারা এর সবচেয়ে কার্যকর ও ধন্বন্তরী ব্যবস্থা—এ পারস্পরিক অসম বিবাহকেই মনে করে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই নিঃশংক ও সহজ-পাচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাকে সর্বদা ঐ মহাসত্যকে দৃষ্টি-সমক্ষে রাখতে হবে যে, যে মহান রবের প্রতি সে ঈমান পোষণ করে, তিনি তাকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন। আর যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত, তারা তো তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতেই বদ্ধপরিকর—হোক সে নারী কিংবা পুরুষ তাতে কিছু এসে যায় না।

এ আয়াতটিও পূর্বোক্ত আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ হিসেবেই নাযিল হয়েছে। এজন্য শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে ঃ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ– "আর আল্লাহ মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

ওপরের দুটি আয়াতে এতিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাকিছু বলা হয়েছে, সূরা আন নিসাতেও এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যাতে উভয় আয়াত গুচ্ছ সম্মুখে রাখলে বিষয়টির বিভিন্ন দিক আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ط
اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ
اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ
فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج
فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ
يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○ – النساء : ٢-٦

"আর দিয়ে দাও এতিমদের সম্পদ এবং বদল করো না ভাল মালের সাথে খারাপ মালের। আর গ্রাস করো না তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশিয়ে। নিশ্চয় এরূপ করা গুরুতর গুনাহ। আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের ব্যাপারে

সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করে নাও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমার মনঃপুত হয়—দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। কিন্তু যদি আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীকে। এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আর তোমরা দিয়ে দাও তোমাদের স্ত্রীদের তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে। তবে তারা খুশী হয়ে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর। আর তুলে দিও না নির্বোধের হাতে তোমাদের ঐ সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জীবন নির্বাহের অবলম্বন করেছেন। বরং তা থেকে তাদের খাওয়াও, পরাও এবং শোনাও তাদের সান্ত্বনার বাণী। আর তোমরা এতিমদের পরীক্ষা করে নেবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে। এতিমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না এবং তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে সচ্ছল সে যেন এতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। যখন তোমরা তাদের হাতে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।"—সূরা নিসা ঃ ২-৬

৭২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২২২-২৩১ আয়াত

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, কিভাবে একের পর এক প্রথমে হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট জিহাদ, জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ইনফাক, ইনফাকের সাথে সংশ্লিষ্ট জুয়া ও মাদক এবং তার সাথে এতিমদের প্রতি সহানুভূতি বিষয়ক সমস্যাগুলো একাধিক্রমে উদ্ভূত হয়েছে। অনুরূপ এতিম জননীদের বিয়ে করার প্রসঙ্গটি তৎকালীন বিবাহ-তালাক সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত বা উপলক্ষ সৃষ্টি করে দিয়েছে। অপরদিকে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের দাবীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও হেদায়াত নাযিল হওয়ার অত্যন্ত উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখন কোনো বর্ণনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন কোনো বাণী সমষ্টি অবতারণ এমনভাবে হয় যেন ব্যাপক আকারে অঝোর ধারায় এক পশলা বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে গেল। অতএব, এখানেও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। মহিলাদের রজঃস্রাবের দিনগুলো সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে এসব বিষয়ের আলোচনার সূচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ বিশেষ প্রশ্নটির গুরুত্ব এ কারণে যে, পরবর্তী আলোচনায় আরো স্পষ্ট হবে—বিবাহ-তালাক সংক্রান্ত বহু বিষয়ের সীমারেখা এরি দ্বারা নিরূপিত হয়ে থাকে। এজন্য মূল সমস্যাগুলোর পূর্বেই খোদ এ বিষয়টি সম্পর্কে শরীআতের বিধি-বিধান ও পথনির্দেশ জেনে নেয়া ছিল অত্যন্ত জরুরী। আসুন, এরই আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো আমরা তেলাওয়াত করি ঃ

www.pathagar.com

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

www.pathagar.com

مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا
افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ
مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا
تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ
وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۫ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

২২২. তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে রজঃস্রাব সম্পর্কে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র অবস্থা। কাজেই রজঃস্রাব অবস্থায় তোমরা স্ত্রীগণ থেকে বিরত থাকবে, সুতরাং যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তোমরা তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন। ২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্র। যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন করতে পার। তবে তোমরা নিজেদের জন্য কিছু অগ্রিম ব্যবস্থা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। আর

www.pathagar.com

জেনে রেখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবেই এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।

২২৪. তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষবস্তু বানিও না সৎকাজ থেকে, আত্মসংযম থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের ধরবেন না ; কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম ধৈর্যশীল। ২২৬. যারা স্ত্রীগমন না করার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। তারপর তারা যদি আপোষে মিটমাট করে নেয় তবে তো আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২২৭. আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তো আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে। তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে, তাদের পক্ষে বৈধ নয় গোপন রাখা যা আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি তারা আপোষ-মীমাংসা করতে চায় তবে ওই সময়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে তাদের স্বামীরা বেশি হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে তাদের ওপর। আর নারীদের ওপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২২৯. তালাক দু'বার পর্যন্ত। তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি ভয় কর যে, তারা উভয়ে আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো গুনাহ নেই। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। তোমরা তা লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম। ২৩০. তারপর যদি স্বামী স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিয়ে না করবে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোনো গুনাহ নেই। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। জ্ঞানীদের জন্য তিনি এসব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

২৩১. আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়। তখন তোমরা তাদের হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা যথাবিধি মুক্ত করে দেবে। কিন্তু জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না। আর যে এরূপ করে সে তো নিজের প্রতি যুলুম করে। আল্লাহর

www.pathagar.com

নির্দেশাবলীকে তোমরা হাসি-তামাশার বস্তু করো না। আর স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা যা তোমাদের ওপর রয়েছে এবং স্মরণ কর কিতাব ও হিকমতের কথা যা তোমাদের প্রতি তিনি নাযিল করেছেন এবং যা দিয়ে তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৭৩. শব্দ বিশ্লেষণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২২২

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

রজঃস্রাবকালীন দিনগুলোর বিধান

রজঃস্রাবকালীন দিনসমূহ সম্পর্কে নিছক এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্নের উদয় হয়নি যে, এ সময়টাতে স্ত্রীগমন বৈধ কি অবৈধ। এ সময়ে স্ত্রী গমন শুধু ঐশী ধর্ম ও বিধিমতেই নিষিদ্ধ ছিল তা নয়, বরঞ্চ জাহেলী যুগের আরবরাও একে অবৈধ মনে করতো। তাদের কাব্যগাথার মধ্যে বিভিন্নভাবে এর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এমন অনেক সমস্যা ও প্রশ্নও জড়িত ছিল, যেসব বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি বিদ্যমান ছিল। যেমন রজঃস্রাবকালীন সময়ে স্ত্রী বর্জনের সীমা কি ? এ থেকে পবিত্র হওয়ার আদব ও শর্তাবলী কি এবং তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির ব্যাপারে এর গুরুত্ব কতখানি ?

বিশেষত শেষোক্ত প্রশ্নটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল এ কারণে যে, এর প্রভাব পড়তো বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, উত্তরাধিকার এবং অন্যান্য প্রায় সকল পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর। এ কারণে বিয়ে ও তালাকের এ আলোচনায় কুরআন সর্বাগ্রে এ প্রশ্নটিকেই নির্বাচন করেছে ও এর জবাব দিয়েছে।

স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার সীমা

রজঃস্রাবকালে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার (বা স্ত্রী বর্জন করার) যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সঠিক সীমা পরবর্তী বাক্য থেকে স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ– "আর তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। সুতরাং যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হবে তখন তোমরা তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।" এ থেকে জানা যায়, এ বিচ্ছিন্নতা স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ

সম্পর্কের সীমা পর্যন্তই কাঙ্ক্ষিত। এর অর্থ এ নয় যে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য বানিয়ে রাখতে হবে—যেমনটি অন্যান্য ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন হাদীস ও নবী (স)-এর বাস্তব জীবনাচার থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আয়াতটিতে طهر ও تطهر দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। طهر -এর অর্থ মহিলাদের অপবিত্রাবস্থা শেষ হয়ে যাওয়া ও রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। আর تطهر অর্থ গোসলের মাধ্যমে মহিলাদের পবিত্রাবস্থায় এসে যাওয়া। আয়াতে স্ত্রীর সাহচর্যের জন্য 'তোহর'কে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং একই সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন পবিত্রতা (তাতাহ্হুর) অর্জন করবে, তখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর। এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, রক্তস্রাবই যেহেতু স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ, তাই স্রাব বন্ধ হওয়ার পর এ নিষেধাজ্ঞা বিদূরিত হয়ে যায়। কিন্তু সঠিক পদ্ধতি হলো মহিলারা যখন গোসল করে পবিত্র-পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখনই তোমরা তাদের সাথে মিলিত হবে।

সকল প্রাকৃতিক বিধান শরীআতেরই অংশ বিশেষ

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ-"তোমরা তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।" এ থেকে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সকল প্রাকৃতিক বিধানই আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্যে শামিল। আর এদিক থেকে এগুলো খোদায়ী শরীআতেরই অংশ ; চাই তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হোক কিংবা নাই দেয়া হোক। যেমন, যদিও কোথাও এ নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, খাবার মুখ দিয়েই গ্রহণ করতে হবে, নাক কিংবা চোখ দিয়ে গ্রহণ করা চলবে না—তথাপি মূলত এটা আল্লাহরই নির্দেশ। কারণ আল্লাহ আমাদের 'ফিতরাত' বা প্রকৃতি এটাই নির্ধারণ করেছেন। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহরই একটি স্পষ্ট—বরং স্পষ্টতর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর তজ্জন্য সে আল্লাহ্র নিকট শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। আমরা এটাকে স্পষ্ট বলার পরিবর্তে স্পষ্টতর বলেছি। এজন্য যে, মহান আল্লাহ এ জাতীয় ব্যাপারগুলোকে সম্পূর্ণ আমাদের ফিতরাতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, এগুলো এতই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে, মানব-প্রকৃতি এগুলোর ব্যাপারে কোনো পথনির্দেশের প্রয়োজনই অনুভব করে না। স্ত্রী গমনের ব্যাপারটিও ঠিক তদ্রূপ। এ ব্যাপারে কেউ অজ্ঞতার প্রমাণ দিলে সে নিসন্দেহে ইতর প্রাণীরও অধম বিবেচিত হবে। কারণ ইতর প্রাণীরাও এতে ভুল করে না। যদি বা তাদের কুরআন-কিতাবের সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই।

'তাওবা' ও 'তাতাহ্হুর'-এর তাৎপর্য

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ঃ 'তাওবা'ও 'তাতাহ্হুর' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও মূলতত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, নিজের অভ্যন্তর ভাগকে গুনাহ ও পাপাচার থেকে পবিত্র করার নাম তাওবা। আর স্বীয় বাহ্যদেশকে অপবিত্রতা ও

www.pathagar.com

পুঁতিগন্ধময়তা থেকে পবিত্র করার নাম 'তাতাহ্হুর' (تطهـــر)। এ হিসেবে উভয়টির মূলতত্ত্ব একই। আর মু'মিনের এ দুটি গুণই মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। পক্ষান্তরে এ গুণ থেকে যারা বঞ্চিত তারা আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ও তাঁর বিরাগভাজন। বাচনভঙ্গী থেকে এখানে এটাই প্রতীয়মান হয় এবং এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যারা মহিলাদের অপবিত্রতার দিনগুলোতে তাদের সাথে সংগম পরিহার করে চলে না বা যৌন-চাহিদা পূরণের ব্যাপারে প্রকৃতির সীমা ও বিধানকে লংঘন করে, তারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। হাদীসসমূহেও এ বিশদ বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে ঃ

আয়াত ঃ ২২৩

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

নারীদের বেলা শস্যক্ষেত্রের উপমা

আরবীতে حـــرث শব্দের মানে শস্যক্ষেত্র। তা বাগান বা উদ্যান জাতীয় হতে পারে, হতে পারে অন্যান্য ফসল ইত্যাদিরও। মহিলাদের জন্য শস্যক্ষেত্রের উপমার একটি সরল-সহজ দিক হলো, শস্যক্ষেত্রের জন্য কুশলী স্রষ্টা যেরূপ বীজ বপনের নির্দিষ্ট মওসুম ও যথোপযুক্ত সময় ও যথাবিহিত নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ ছাড়া বীজ ক্ষেতেই বপন করা হয়, ক্ষেতের বাইরে নিক্ষেপ করা হয় না। কোনো কৃষকই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। ঠিক মহিলাদের জন্য প্রকৃতির বিধান এই যে, রজঃস্রাব চলাকালীন দিনগুলোতে কিংবা যোনিদেশ বহির্ভূত কোনো ক্ষেত্রে তার সাথে যৌন চাহিদা পূরণ করবে না। কারণ রজঃস্রাবকালীন সময় মহিলাদের বন্ধাত্ব ও ফসলহীনতার কাল। আর অপাত্রে যৌন মিলন কষ্টের কারণ এবং অর্থহীন ও বাজে খরচের শামিল। কাজেই কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে এটা জায়েয নয়। এদিক থেকে এ আয়াতটি যেন পূর্বোক্ত আয়াতেরই অধিকতর ব্যাখ্যা।

স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতার সীমা

فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ঃ"অতএব নিজেদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা তোমরা গমন কর।" এতে একই সাথে দুটি দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। একটি ইঙ্গিত হলো ঐ স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ ও যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতি যা কোনো শস্যক্ষেত্র বা উদ্যান মালিকের নিজের ক্ষেত বা বাগানের ব্যাপারে স্বতঃই অর্জিত হয়ে থাকে। অপরদিকে ওইসব বাধ্যবাধকতা, দায়িত্বশীলতা ও সাবধানতার প্রতিও এতে ইঙ্গিত রয়েছে। একজন শস্যক্ষেত বা বাগান-মালিক নিজের ক্ষেত বা বাগানের ব্যাপারে যা সে বিশেষভাবে লক্ষ রেখে থাকে। এ দ্বিতীয় দিকটির প্রতি حرث শব্দটি ইঙ্গিত প্রদান করছে। আর প্রথম দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করছে اَنّٰى شِئْتُمْ শব্দদ্বয়। একজন স্বামীর পক্ষে তার স্ত্রীর প্রতি কি

www.pathagar.com

ধরনের আচরণ করা কর্তব্য, স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতা এতদুভয়ের সুসমন্বিত রূপই তা যথার্থভাবে নির্ধারণ করে দেয়।

এটা সর্বজন বিদিত যে, স্বামী স্ত্রীর একান্ত ও শর্ত ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ফিতরাত, কতক সাদামাটা শর্ত ও সীমারেখা ছাড়া কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখেনি। আর এতেই নিহিত রয়েছে পারিবরিক জীবনে উভয়ের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তির নিশ্চয়তা। স্বাধীনতার এ অনুভূতির মাঝে রয়েছে পরম সুখ ও আনন্দ। মানুষ যখন তার এ সুখ ও স্বাচ্ছন্দের উদ্যানে প্রবেশ করে তখন সে সুখ ও আনন্দে মদ-মত্ত হোক, এটা আল্লাহ চান। কিন্তু একই সাথে তিনি তার সামনে এ মহাসত্যও রেখে দিয়েছেন যে, এটা কোনো বন-জঙ্গল নয়, বরং নিজের বাগান। এটা কোনো উজাড় বন-প্রান্তর নয়, এটা তার নিজেরই শস্যক্ষেত্র। নিজস্ব বাগান হিসেবে এতে সে ইচ্ছে হলে শতবার আসতে পারে। যখন ইচ্ছা তখন আসতে পারে, যেদিক থেকে বা যে কোনোভাবে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু এটি যে একটি বাগান ও শস্যক্ষেত, এটা স্মরণ রাখতে হবে। যে কোনো আগমনের ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তাকে এ মহাসত্যটি ভুলে গেলে চলবে না।

নিজের শস্যক্ষেতের বেলা প্রত্যেক কৃষকের আন্তরিক ইচ্ছা এটাই হয়ে থাকে যে, এ থেকে তার যেন অব্যাহতভাবে অত্যন্ত ভাল ফসল অর্জন হতে থাকে। যথাসময়ে জমিতে হালচাষ হোক, প্রয়োজন মোতাবেক পানি ও সার প্রয়োগ করা হোক, মওসুমী দৈব-দুর্বিপাক থেকে নিরাপদ থাকুক, পদদলিত ও পোকা-মাকড় কবলিত না হোক, শত্রু ও চোর-তস্কর তার কোনো ক্ষতি সাধন না করুক—একজন কৃষকের এটাই হয়ে থাকে ঐকান্তিক কামনা। সবুজ শ্যামল তরতাজা শস্যরাজি তার অন্তরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেবে আর সময় হলে ফল-ফুলের দ্বারা সে তার ডালি ভরে নেবে, এটাই তো হয়ে থাকে কৃষকের একান্ত কাম্য।

'পরিবার পরিকল্পনা'—দর্শনের অসারতা

কুরআন নারী জাতির জন্য শস্যক্ষেত্রের যে উপমা উপস্থাপন করেছে এতে পূর্বোক্ত তাৎপর্যগুলো সবই নিহিত রয়েছে। তবে এ উপমা তথাকথিত পরিবার পরিকল্পনা নামক দর্শনের প্রবক্তাদের মূল উৎপাটিত করে দিয়েছে। কারণ শস্যক্ষেতের বেলায় এটা যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, এ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণে ও সবচেয়ে উন্নত মানের ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু মানুষের বেলায় এটা একান্তই অযৌক্তিক যে, তাদের এ তালিম ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যে, বীজ তো ফেলা হবে সর্বোচ্চ পরিমাণে, কিন্তু ফসল উৎপন্ন করা হবে সর্বনিম্ন পরিমাণে। এ জাতীয় অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দর্শন কেবল বোকাদেরকেই গেলানো যেতে পারে।

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ঃ "তোমরা নিজেদের জন্য আগে কিছু পাঠাও।" এর অর্থ এই যে, শস্য ফলানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, এদ্বারা নিজেদের ভবিষ্যত জীবন

www.pathagar.com

-জীবিকার ব্যবস্থা করা। অনুরূপ নারীরূপ শস্যক্ষেতেরও আসল উদ্দেশ্য হলো, মানব বংশের ভবিষ্যতের গর্ভে নিজেদের স্থান সংরক্ষণ এবং তার স্থিতি ও স্থায়িত্ব বিধানে নিজের ভূমিকা ও অবদান রাখা। فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -এর পরে এ শব্দগুলো যোগ করে দিয়ে এ সত্যকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান দেয়া হয়েছে যে, নারীর সাথে মিলনের আসল উদ্দেশ্য হলো মানব বংশের স্থিতি ও স্থায়িত্ব। যৌন-সুখ ও স্বাদ আস্বাদন তার একটি আনুসঙ্গিক উপকারিতা মাত্র। তাই এ উদ্দেশ্যকে বিনষ্টকারী বা ক্ষতিগ্রস্থকারী যে কোনো পদ্ধতি স্রষ্টার প্রবর্তিত ফিতরাত ও তার দাবির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যদিও তাদ্বারা যৌন-সুখ ও পরিতৃপ্তির দাবি পূরণ হয়ে যায়।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, মানুষ যেরূপ তার সন্তান-সন্তুতি দ্বারা মানব প্রজাতির মধ্যে নিজের একটা স্থান সংরক্ষতি করে নেয়, তদ্রূপ তাদের সুশিক্ষিত ও ভালকাজে প্রশিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে আখেরাতেও তার পুঁজিকে সুসমৃদ্ধ করতে থাকে। কারণ সৎ সন্তানের ভাল কাজ একটি নিরবচ্ছিন্ন ও অব্যাহত কল্যাণ ধারা ; যা মানুষের মৃত্যুর পরও জারী থাকে। হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে ঃ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ শব্দগুলোতে এ দুটি দিকই রয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার এর ভিন্নতর বাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে এ ব্যাখাই সঠিক। কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরাতেই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَالْئٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - "অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭ বলা বাহুল্য, এ আয়াতের ব্যাখ্যা ইতোপূর্বেই করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلٰقُوهُ –ঃআর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখো, অবশেষে তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবেই"-এর তাৎপর্য হলো, যদিও তোমরা প্রকৃতির এ আইন ও বিধান এবং আল্লাহর দেয়া সীমারেখাকে আজ প্রকাশ্যে ও নিভৃতে ভঙ্গ করতে পার এবং তোমাদেরকে স্বতঃই এর অবকাশ দিয়ে রাখা হয়েছে, তথাপি তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, একদিন তোমাদেরকে আল্লাহর মুখোমুখী হতে হবে। তিনি তো এমন এক সত্তা যার দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যার পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করারও কেউ থাকবে না। এ ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে ঈমানদারদেরও সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা সত্ত্বেও যেসব মু'মিন এটা স্মরণ রাখে যে, একদিন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে তাদের জন্যই বলা হয়েছে ঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ "আর হে রাসূল! আপনি মু'মিনদের সুসংবাদ দিন।"

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২২৪

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

আল্লাহর কসম লক্ষবস্তু নির্ধারণের অর্থ

عُرْضَةً শব্দের অর্থ নিশানা বা লক্ষবস্তু। আল্লাহর কসমকে লক্ষবস্তু বানাবার অর্থ হলো তাঁর নামে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক কসম করা। অথবা এমন কসম করা যা সৎকাজ, তাকওয়া ও সংশোধনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আল্লাহর মহান নামটিকে অহেতুক কসমের জন্য ব্যবহার করা ঠিক তেমনি যেমন কোনো ব্যক্তি মশা মারার জন্য কামান দাগালো। আর সৎকাজ ও তাকওয়ার বিরুদ্ধে কসমের ক্ষেত্রে আল্লাহর পবিত্র নাম ব্যবহার করা যেনো তাঁর নাম নিয়েই নেককাজ ও তাকওয়ার শিকড় কেটে দেয়া— যিনি যাবতীয় নেক ও কল্যাণের উৎস।

আরবী ভাষায় কখনো اَنْ শব্দটির পূর্বে مضاف (সম্বন্ধ পদ) আবার কোথাও শব্দটির পরে لَا অক্ষরটি লোপ করা হয়। বর্ণনার ধারা পরম্পরায় এটা বুঝতে পারা যায়, এখানে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, اَنْ শব্দটির পরে لَا অক্ষর বিলোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এর উদাহরণ অনেক রয়েছে। উস্তাদ ইমাম ফারাহী তাঁর "আল-আসালীব" নামক গ্রন্থে এর বহু প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

বির্, তাকওয়া ও ইসলাহ্ বলতে কি বুঝায়

বির্, তাকওয়া ও ইসলাহ্ এ শব্দ তিনটি দ্বারা যাবতীয় প্রকারের নেক ও কল্যাণমূলক কাজকে একসাথে বুঝানো হয়েছে। 'বির' সেসব নেককাজের সমষ্টি যা মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, দুঃস্থ, ইয়াতীম এবং অন্যান্য বান্দাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত। 'তাকওয়া' সেসব নেক আমলের সমষ্টি যা আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত আর 'ইসলাহ' দ্বারা সে সমস্ত সৎকাজকে বুঝানো হয়েছে যা সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২২৪ আয়াতটি হচ্ছে বিভিন্ন মাসয়ালার ভূমিকা

এ আয়াতটি পরবর্তীতে বর্ণিত বিভিন্ন মাসয়ালার ভূমিকা স্বরূপ। পরবর্তীতে ঈলা এবং তারপর বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বা বিধির বর্ণনা আসছে। 'ঈলা' সেই কসমকে বলে যা কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় না রাখার জন্য করে থাকে। কসম (শপথ) যেহেতু পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সন্ধি চুক্তির সকল ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার একটি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী প্রক্রিয়া এবং এদ্বারা মানব সভ্যতার বিরাট উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এ কারণেই ঈলা, বিয়ে ও তালাকের মাসয়ালা বর্ণনার পূর্বে কসমের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হলো যে, আল্লাহর নামকে কখনো এমন কসমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ নয়—যা

www.pathagar.com

নেক আমল, আল্লাহভীতি ও সংশোধনের পরিপন্থী। আল্লাহর নামে কসম করার অর্থ হলো তাঁকে সাক্ষী বানানো। যদি কোনো ব্যক্তি সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়ের বিরোধিতা করার জন্য আল্লাহর নাম নিয়ে কসম করে তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, সে আল্লাহকে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে এবং শয়তানের পক্ষে সাক্ষী বানাতে চায়। এ ধরনের যাবতীয় কসম আল্লাহর সাথে উপহাস করার নামান্তর। সুতরাং এ জাতীয় কসম করা প্রথমতো বৈধই নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কেউ করে বসে তবে ইসলাম তা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছে।

আয়াতের শেষে سَمِيْعٌ এবং عَلِيْمٌ বলার মধ্যে কিছুটা ধমকের সুর প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পবিত্র নামকে এভাবে অন্যায় কাজে অহরহ ব্যবহার করবে তারা এ সত্যটিকে যেনো ভুলে না যায় যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। তিনি এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

আয়াত ঃ ২২৫

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অনিচ্ছাকৃত কসমসমূহ

অর্থাৎ একমাত্র সেসব কসম আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে যা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। অন্তরের সাথে যার কোনো সম্পর্ক থাকে না বরং সম্পর্কে থাকে শুধু মুখের সাথে। যা কোনো লাভ-লোকসানকে সামনে রেখে করা হয় না বরং শুধুমাত্র অভ্যাসবশত কথার ফাঁকে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যেসব কসম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে এবং মানুষের নিজের কিংবা অপরের অধিকার ও স্বার্থে যার কোনো নিকটবর্তী বা দূরবর্তী প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি তাতে অন্যায়ভাবে আল্লাহর নাম ব্যবহার করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা এসব কসমের ব্যাপারে অবশ্যই পাকড়াও করবেন।

لَغْـوٌ বা অহেতুক তথা লক্ষহীন, উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক কসমকে যদিও পাকড়াও থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। কিন্তু 'অহেতুক' শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান লোকদের এ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। কুরআন মজীদে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে একথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নিরর্থক ও অহেতুক বিষয় থেকে দূরে থাকে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২২৬-২২৭

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ج فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

'ঈলা'র হুকুম

কসম সম্পর্কে উপরোল্লিখিত ভূমিকা প্রদানের পর এবার এমন একটি শরয়ী বিধি বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে কসমের কার্যকরভূমিকা রয়েছে। আর তা হচ্ছে ঈলা' সংক্রান্ত বিধি। ঈলা' (ايلاء) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কসম খাওয়া। এটা জাহেলী যুগের আরবদের একটি পরিভাষা। যার অর্থ স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় না রাখার কসম করা। যেহেতু এ শব্দটির মধ্যেই ত্যাগ করার অর্থটি বিদ্যমান, এ কারণে সম্পর্কচ্ছেদের অর্থ প্রকাশ করার জন্য এর সাথে অন্য কোনো শব্দ জুড়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

এ ধরনের কসম যেহেতু বৈবাহিক উদ্দেশ্যের বিরোধী এবং তাকওয়া ও সততার পরিপন্থী, এর ফলে স্ত্রী সম্পূর্ণ ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায়। এ কারণে ইসলাম এ ধরনের কসমকারী লোকদের জন্য চার মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এরি মধ্যে হয় স্বামী স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে বহাল করবে অথবা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত থেকে থাকলে তাকে তালাক দিয়ে দেবে। যারা প্রথম পন্থা অবলম্বন করবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। অর্থাৎ যদিও তাদের এই কসম একটি হক নষ্টের ভিত রচনা করেছিল আর কোনো হক নষ্ট করার জন্য কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কিন্তু অবস্থা শুধরে নেয়ার পর আল্লাহ তাআলা এ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে যদিও এ কসম ভঙ্গের জন্য কোনো কাফ্‌ফারার উল্লেখ নেই, কিন্তু কসম ভঙ্গের ব্যাপারে কুরআন অন্যত্র যে বিধি-বিধান ঘোষণা করেছে এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ চোখে পড়ে না। তাই আমরা সেই ফকীহগণের রায়কে অধিক শক্তিশালী মনে করি যারা এক্ষেত্রেও কাফ্‌ফারার প্রবক্তা।

দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তবে এ পন্থা তারা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ যে সীমা ও শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখতে হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠতে পারে এই যে, যদি চার মাসের উল্লেখিত মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে যায় আর এ সময়ের মধ্যে এক ব্যক্তি রুজুও করলো না (অর্থাৎ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করলো না) এবং তালাকও দিল না, তখন কি হবে ? কিছু সংখ্যক ফকীহ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, চার মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক তালাক হয়ে যাবে। কারো মতে এটি এক তালাক বায়েন হবে।

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে বিয়ে নবায়ন করার সুযোগ থাকবে। আর কারো মতে রিজঈ। অর্থাৎ বিয়ে নবায়ন ছাড়াই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যাবে। ফকীহদের অপর একটি দলের মতে চার মাসের মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর বিষয়টি কাজীর আদালতে পেশ করা হবে। কাজী স্বামীকে নির্দেশ দেবে, হয় সে রুজু করবে নইলে তালাক দেবে। কুরআনের শব্দসমূহ থেকে যে কথাটি প্রকাশ পায় তাহলো চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামীকে অবশ্যই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, হয় সে রুজু' করবে নতুবা তালাক দেবে। যদি এ দুটো পন্থার কোনোটাই সে অবলম্বন না করে তবে এরূপ স্বামী থেকে স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে তালাক নিয়ে নেবে।

কুরআনের ভাষ্য থেকে একথাটিও প্রকাশ পায় যে, স্ত্রী তালাক গ্রহণের এ অধিকার শুধু তখন লাভ করবে যখন স্বামী ঘৃণা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা না করার কসম খেয়ে থাকে। উদ্দেশ্য শুধু তাকে ঝুলিয়ে রাখা। যদি তা না হয় বরং অন্য কোনো সাময়িক কিংবা আকস্মিক প্রয়োজনে তা স্বাস্থ্যগত কারণে হোক অথবা সতর্ক করার মানসে হোক—কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সাথে বিশেষ দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে তা উপরোক্ত নির্দেশের আওতায় পড়ে না, যদিও এ বিচ্ছিন্নতার মেয়াদ চার মাসের অধিক হোক না কেন।

আয়াত ঃ ২২৮

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلاَحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

قروء (কুরূ') শব্দের অর্থ

قروء قرء (কারউন) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে ভাষাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ এর অর্থ গ্রহণ করেছেন হায়েয (ঋতুকালীন সময়) আর কেউ তোহর (পবিত্র কালীন সময়)। শব্দটির মূল উৎস এবং উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে আমরা যতটা চিন্তা-ভাবনা করেছি তাতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এর প্রকৃত অর্থ হায়েযই হবে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক হায়েযের সাথে তোহরও অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থাকে তাই সাধারণ কথাবার্তায় এর দ্বারা তোহরকেও বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন রাত শব্দ দ্বারা তার সাথে সংশ্লিষ্ট দিনকে এবং দিন শব্দ দ্বারা তার সাথে যুক্ত রাতকে বুঝানো হয়। এরূপ ব্যবহারের উদাহরণ প্রত্যেক ভাষায় পাওয়া যেতে পারে।

এখানে যে মাসয়ালাটি বর্ণিত হয়েছে তার বাহ্যিক বাচনভঙ্গিও একথাটি প্রমাণ করে যে, 'কুরূ' শব্দ দ্বারা হায়েযকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে

www.pathagar.com

যে বিরাম বা অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার প্রকৃত হিকমাত বা যৌক্তিকতা যেমন উক্ত আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়—এটা নিশ্চিত হওয়া যে, সে গর্ভবর্তী না। মূলত গর্ভবতী হওয়া না হওয়ার প্রমাণ স্পষ্টত হায়েয দ্বারাই হয়ে থাকে। তোহর দ্বারা নয়। তাই একে হায়েয অর্থে গ্রহণ করাটাই অধিক সমীচীন। অর্থের এ বিভিন্নতার কারণে ইদ্দতের সময়সীমা নির্ধারণে ক্ষেত্রেও হানাফী ও শাফেঈ মতাবলম্বীদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। ফিক্‌হ-এর কিতাবসমূহে যার উল্লেখ রয়েছে।

তালাকের ইদ্দত পালনের যৌক্তিতা

তিন হায়েযের সময়সীমা নির্ধারণের আসল উদ্দেশ্য যেহেতু স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী কিনা তা নির্ণয় করা। কারণ এ সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। তাই তালাকপ্রাপ্ত নারীর ঈমান ও ইসলামের অনিবার্য দাবি হচ্ছে যদি গর্ভসূলভ কোনো কিছু সে অনুভব করে তবে তা যেনো গোপন করার চেষ্টা না করে। নচেৎ এর ফলে সেসব কল্যাণকর দিকগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা ইসলামী শরীআত এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্য বিবেচনায় রেখেছেন।

এ সময়সীমার মধ্যে স্বামীর অধিকার রয়েছে, যদি সে সম্পর্ক অটুট রাখা ও পুনর্বহাল করার আকাঙ্ক্ষা হয় তবে সে প্রত্যাবর্তন করতে পারে (অর্থাৎ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।) শরীআতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একে ছিন্ন করার অনুমতি কেবলমাত্র তখনি দেয়া হয়েছে, যখন অটুট রাখার কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এতে অন্যান্য কল্যাণকর দিকগুলোর সাথে এ সুযোগটিও রয়েছে যে, তালাক যদি সাময়িক কোনো অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে তবে উভয় পক্ষই শান্তচিত্তে ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। কিন্তু কুরআন স্বামীকে এ প্রত্যাবর্তনের অধিকার দেয়ার সাথে সাথে এ শর্তটি জুড়ে দিয়েছে যে, এ কাজটি শুধুমাত্র মিল-মহব্বতের সাথে মধুময় দাম্পত্য জীবনযাপনের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। এর উদ্দেশ্য স্ত্রীকে জ্বালাতন করা এবং নির্যাতন চালানো যেনো কিছুটা না হয়। নচেৎ এটা হবে এ অধিকারের অত্যন্ত নিপীড়ন মূলক অপব্যবহার যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার রয়েছে

এর অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ বাক্য দ্বার নারী এবং পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক অধিকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বামীদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, অধিকার শুধু তাদেরই রয়েছে। স্ত্রীদের কোনো অধিকারই নেই। বরং স্বামীদের ব্যাপারে যেমন স্ত্রীদের বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তেমনি বিধান মুতাবিক তাদের অনেক অধিকারও রয়েছে স্বামীদের ওপর। আর এ কর্তব্য এবং এ অধিকার উভয়ই অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য, সে নিজ অধিকার দাবী করার সাথে সাথে স্ত্রীর অধিকারের প্রতিও লক্ষ রাখবে। এ লক্ষ রাখার ওপরই নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তাদের দাম্পত্য জীবনের মধুময়তা।

www.pathagar.com

গৃহের কর্তৃত্বশীল হবে পুরুষ :

অবশ্য একথাও ঠিক যে, পারিবারিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও মজবুতির দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম পুরুষকে নারীর ওপর এক ধাপ প্রাধান্য দিয়েছে। এই প্রাধান্য দেয়ার অর্থ—যেমন কুরআনের অন্যান্য স্থানের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়—পরিবারের কর্তা ও অভিভাবক ইসলাম নারীকে নয় বরং পুরুষকেই বানিয়েছে। যেমন একটি রাজ্যের নিয়ম-শৃংখলা একজন পরিচালকের পরিচালনার মুখোপেক্ষী, তেমনি ক্ষুদ্র পরিসরে একটি গৃহের নিয়ম-শৃংখলাও একজন কর্তার কর্তৃত্বের মুখাপেক্ষী। আর স্বীয় প্রকৃতি ও নানামুখী যোগ্যতার দিক থেকে পুরুষই এ কর্তৃত্বের জন্য উপযুক্ত—নারী নয়।

পুরুষের প্রাধান্য পাওয়ার বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে কুরআন অন্যত্র যুক্তিপ্রমাণ পেশ করেছে। তাই এ আলোচনা সংশ্লিষ্ট স্থানে করাটাই সমীচীন হবে।[১] এখানে যে বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে কুরআনের এই ভাষ্য ঃ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর অর্থ তো এটাই হতে পারে যে, নারীদের ওপর পুরুষদের এক ধাপ প্রাধান্য রয়েছে। কুরআনের এ সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান থাকার পর একজন মুসলমানের পক্ষে "নারী পুরুষের সমানাধিকার" এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করার তো কোনো অবকাশই গোচরীভূত হয় না—যা পাশ্চাত্য থেকে আমাদের এখানে আমদানী করা হয়েছে। কুরআন এটা তো স্বীকার করে যে, নারীদের ওপর যে পরিমাণ দায়িত্ব রয়েছে তার সমপরিমাণ অধিকারও তার রয়েছে। কিন্তু নারী ও পুরুষ উভয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান এটা সে স্বীকার করে না। বরং পরিষ্কার ভাষায় পুরুষকে নারীর ওপর এক ধাপ অগ্রাধিকার দেয়। আর এ বিষয়টিও খেয়াল রাখা দরকার। কুরআন যে বলেছে ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ একথাটির অর্থও কখনো এ নয় যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার সমান বরং এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নারীর ওপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তার অধিকারও রয়েছে।

কুরআন لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এ নীতিকে ভিত্তি করে পরিবারের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের মর্যাদা পুরুষকেই দিয়েছে—যেমনটা আমি ওপরে ইংগিত করেছি এবং এর ওপরই সে পারিবারিক যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ভিত রচনা করেছে। এ ভিতকে ধ্বংস করে পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত "সমান অধিকার" নীতির ভিত্তিতে —যা নারী ও পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে সমান অবস্থানে রাখার দাবীদার—যদি ইসলামের পারিবারিক আইন-কানুনকে বুঝার এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় তবে এর একমাত্র ফল দাঁড়াবে এই যে, গোটা দীনই বিকৃত হয়ে যাবে।

১. যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, তারা আমার লেখা "ইসলামী সমাজে নারীর স্থান" বইটি পড়বেন। তাতে আমি এ বিষয়টির প্রতিটি দিকের ওপর কুরআন ও আধুনিক দর্শনের আলোকে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

'আযীয' ও 'হাকীম'-এর ব্যাখ্যা

আয়াতের শেষে 'আজীজ' ও 'হাকীম' বলে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন 'আযীয' (পরাক্রমশালী)। তাই হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই এবং তিনি 'হাকীম' (বিজ্ঞানময়)। তাই যে হুকুমই তিনি দিয়েছেন তা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ। বান্দার কাজ হলো বিনা বাক্য ব্যয়ে তার হুকুমের আনুগত্য করা। যদি সে তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে তবে সে তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদাবোধকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং তাঁর শাস্তিকে ডেকে আনবে। আর যদি আল্লাহর চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ও পারদর্শী হওয়ার পাগলামীতে আক্রান্ত হয় তবে স্বয়ং নিজ হাতে নিজেদের আইন-শৃংখলা ও সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

আয়াত ঃ ২২৯

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

তালাক দেয়ার সঠিক পন্থা

এখানে তালাকের সঠিক পন্থা বলে দেয়া হয়েছে। গোটা সমাজ জীবনের ভিত্তি যেহেতু বিয়ের পবিত্র বন্ধনের ওপরই স্থাপিত। তাই যদি কোনো অনন্যোপায় অবস্থার কারণে তা ছিন্ন করার অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে এমন হওয়া উচিত নয় যে, মানুষ হুট করে এ পবিত্র বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। বরং তালাকপ্রাপ্তা নারীকে যেমন বলা হয়েছে যে, সে যেনো তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তেমনি তালাক দাতার জন্যেও এ নির্দেশ রয়েছে, সে যেনো ভিন্নভিন্ন দুই তোহরে দুই বারে তালাক দেয়। অতপর তৃতীয় তোহরে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করবে, যদি পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছা তার থাকে। অথবা তাকে বিদায় করে দেবে, যদি বিদায় করে দেয়াই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। পুনরায় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাকে প্রচলিত নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ পুনরায় গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হবে স্ত্রীকে এমনভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রাখা যেমন একজন খোদাভীরু, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক রেখে থাকে এবং ভালো মানুষদের সমাজে যা প্রচলিত আছে। স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রেখে কষ্ট দেয়া এ উদ্দেশ্য হবে না। বিদায় করে দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে সদয় হবার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে যদিও স্ত্রী হিসেবে এখন তার কোনো অধিকার অবশিষ্ট নেই তবুও একজন পুরুষের পৌরুষ ও মহানুভবতার দাবি এটাই যে, যার সাথে প্রীতি ও ভালবাসার একটা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো এবং যে নারী হিসেবে দুর্বলও বটে তাকে সামর্থ অনুযায়ী কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করবে।

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করার মধ্যে যেমন বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে, তেমনি তালাকদাতার জন্যও উপরোক্ত নিয়মে তালাক দেয়ার মধ্যে রয়েছে অশেষ বরকত—যা থেকে সেসব লোক বঞ্চিত থেকে যায় যারা ক্রোধ ও আবেগ বশবর্তী হয়ে শরীআতের এ উপদেশের অনুসরণ করে না এবং এক নিঃশ্বাসে তিন বা তারও অধিক তালাক প্রয়োগ করে বসে। এ ধরনের লোক সাধারণত সারাটা জীবন তার কৃতকর্মের জন্যও অনুশোচনা করে। কিন্তু এ অনুশোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শরীআত এ পন্থাটি এজন্যই দিয়েছে যে, দাম্পত্য সম্পর্ক এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তা ছিন্ন করা নয় বরং যথাসম্ভব তা অটুট রাখাই শরীআতের উদ্দেশ্য। তাই এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ক্রোধ বা তাড়াহুড়োর মাধ্যমে হওয়া উচিত নয় বরং অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে হওয়া উচিত। আর এটা তখনি সম্ভব যখন উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হবে।[১]

পুরুষের মহানুভবতার দাবী

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ঃ "এবং তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছ তা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেবে।" এটা পরিষ্কার যে, এর দ্বারা ভরণ-পোষণ, মোহরানা ইত্যাদি ধরনের জিনিস বুঝানো হতে পারে না। কারণ এসব তো স্ত্রীর প্রাপ্য। এসবের ফেরত নেয়া বা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এর দ্বারা অবশ্যই সেসব জিনিসই বুঝায় যা উপঢৌকন (GIFT) ইত্যাদি হিসেবে দেয়া হয়েছে। এসব জিনিসের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তালাক হয়ে যাওয়ার পর পুরুষের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, সে (কি কি জিনিস দিয়েছে) তার হিসেব-নিকেশ করতে বসে যাবে। এই নিষেধের কারণ—যেমনটা ওপরে আমি উল্লেখ করেছি এই যে, এ ধরনের নীরবতা সেই মহানুভবতার ও উঁচু মন-মানসিকতার পরিপন্থী যা একজন পুরুষের মধ্যে থাকা উচিত। তাই কুরআন মজীদ একাধিক স্থানে নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের এ মহানুভবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার ক্ষেত্রে। যেমন وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ –"এবং তাদেরকে এ উদ্দেশ্যে জ্বালাতন করো না যাতে যাকিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছ তা ফেরত নিতে পার।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا - نساء : ١٢ –"আর তোমরা তাদের কাছ থেকে কিভাবে ফেরত নেবে যখন তোমরা একে অন্যের প্রতি ভালবাসার সাথে অগ্রসর হয়েছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।"-সূরা আন নিসা ঃ ২১। আর এ সূরা আল বাকারাতেই পুরুষদেরকে সম্বোধন

১. এটা মনে রাখতে হবে যে, আমরা একথার প্রবক্তা নই যে, যদি এ নির্দেশের বিপরীত তালাক প্রদান করে তবে তালাকই হবে না। এ সম্পর্কে আমি আমার লেখা "পারিবারিক কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা" নামক বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিশদভাবে জানতে হলে তা পড়ুন।

www.pathagar.com

করে সামনে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ - البقرة : ২৩৭ –"স্ত্রীর পক্ষ থেকে ক্ষমার প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে তুমি নিজের হক ত্যাগ কর। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তোমাদের একজনের ওপর অপর জনের যে অগ্রাধিকার রয়েছে তা ভুলে যেও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

খুল্'আ তালাকের বিধান

এরপর সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত। পদ্ধতিটি হলো, যখন স্বামীর সাথে স্ত্রীর মতবিরোধ এতটা প্রকট আকার ধারণ করে যাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্য যেসব শর্ত-সীমার সংরক্ষণ জরুরী তা উভয়পক্ষই রক্ষা করতে পারছে না, তখন স্ত্রী কিছু মাল বা নগদ অর্থ ফিদিয়া (মুক্তিপণ) হিসেবে প্রদান করে এমন স্বামী থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চাইলে তাতে কোনো দোষ নেই, শরীআতের পরিভাষায় একে খুল'আ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে যেহেতু প্রধান স্বার্থ নারীদের। এ কারণে দুর্বল পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে এ বিনিময়কে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কুরআনের ভাষ্য থেকে এই খুল'আ সম্পর্কে দুটো বিষয় জানা যায় ঃ

এক ঃ যদি স্বামী-স্ত্রী আপোস-রফার মাধ্যমে কোনোরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম না হয় তবে স্ত্রী অবশ্যই এ বিষয়টি আদালতে পেশ করতে পারে এবং আদালত খুল'আ ও বিনিময় দুটোরই ফায়সালা করবে। فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ (যদি তোমাদের ভয় হয় যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমা কায়েম রাখতে পারবে না তবে............) আয়াত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে خِفْتُمْ শব্দ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলামী সমাজকে সামষ্টিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর লেনদেন ও ঝগড়া-বিবাদ সমাজের হস্তক্ষেপ আদালতের মাধ্যমেই সম্ভব।

দুই ঃ খুল্'আ অথবা বিয়ে বাতিলের দাবি করার অধিকার নারী তখনি লাভ করে যখন এটা প্রমাণিত হয় যে, দাম্পত্য জীবনে পুরুষটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা কায়েম রাখতে অক্ষম কিংবা কায়েম রাখতে চায় না। আর এ সীমরেখা কায়েম না রাখা ছাড়া নারীর পক্ষে আল্লাহর সীমার মধ্যে অবস্থান করা অসম্ভব ও দুষ্কর। اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ। কথাটি থেকে এর প্রমাণ মেলে। যদি মতপার্থক্যটা শুধুমাত্র রুচিগত এবং সমতার ক্ষেত্রে হয়, যার সুরাহা সম্ভব। তাহলে এমতাবস্থায় নারীর খুল'আ অথবা বিয়ে বাতিলের দাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়া উচিত নয়। যদি ছোটখাটো কারণেও নারীর জন্য এ অধিকার ব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে এতে করে পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত সম্পূর্ণরূপে নড়বড়ে হয়ে পড়বে। অথচ পরিবারের এ ব্যবস্থাকেই ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিষয়টির এ গুরুত্বের কারণে খুল'আ অথবা বিয়ে বাতিলের দাবির ক্ষেত্রে আদালত এটা দেখবে যে, বাস্তবে বিষয়টা কি এমন যে, দু'পক্ষের জন্যই সম্পর্ক অব্যাহত রাখাটা অসম্ভব কিংবা কষ্টকর হয়ে পড়েছে ? নাকি

www.pathagar.com

শুধুমাত্র স্বন্ধ পরিবর্তন অথবা রুচী বদলানোর অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যই স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে আদালতে টেনে এনেছে ?

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ الاية এটি ২২২ আয়াত থেকে এ পর্যন্ত বর্ণিত বিভিন্ন হুকুম ও নির্দেশাবলীর সাথে সম্পর্কিত। বলা হয়েছে, এটা তোমাদের দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর সীমারেখা। যেমন করে তুমি নিজের জমি ও স্বীয় চারণ ভূমিগুলোর চারদিকে সীমারেখা টেনে দাও এবং এ সীমারেখা কেউ লংঘন করুক তা তুমি চাও না। আর যদি কেউ এ সীমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তবে একে তুমি তোমার মালিকানায় হস্তক্ষেপ এবং তোমার সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ মনে কর। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর চারদিকে এ সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। এর বাইরে তুমি স্বাধীন। কিন্তু এর ভেতরে অনুপ্রবেশের অনুমতি তোমার নেই, যদি কেউ এ সীমারেখা লংঘন অথবা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখায় তবে সে যেনো মনে রাখে যে, সেই লোকেরাই হচ্ছে যালেম। অর্থাৎ এ সীমালংঘনের ফলশ্রুতিতে দুনিয়া কিংবা আখেরাতে যেসব ভোগান্তির সম্মুখীন তারা হবে তার পুরো দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে, আল্লাহর ওপর নয়। এতে করে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করবে। আল্লাহর কিছু তাতে যায় আসে না, আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান মানব প্রকৃতির চাহিদা ও বান্দার কল্যাণের নিমিত্তে প্রণীত, সুতরাং যারা এটা লংঘন করে তারা নিজেদের সহজাত কল্যাণের উৎসকে নিজ হাতেই ধ্বংস করে ছাড়ে।

আয়াত ঃ ২৩০

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

একটি যুক্তিসংগত বাধ্যবাধকতা

শেষ তালাক দেয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি পুনরায় ওই মহিলাকে বিয়ে করতে চায় তবে তার বিধান হলো, যে পর্যন্ত ওই মহিলা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ না করে এবং সে তাকে তালাক না দেয় সে পর্যন্ত এ মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হতে পারে না। যেমনিভাবে ওপরে বর্ণিত নির্দেশ (অর্থাৎ তিন তোহরে তিন তালাক) এজন্য দেয়া হয়েছিলো, যেনো রাগের মাথায় কিংবা হুট করে তালাকের সিদ্ধান্ত না নেয়া হয়, তেমনি এ বাধ্যবাধকতা আরোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তালাককে একটি সস্তা তামাশা বানানোর হাত থেকে রক্ষা করা। যদি তালাক প্রদানের পরও তালাকদাতার জন্য এ মহিলাকে বিয়ে করার অবাধ স্বাধীনতা অবশিষ্ট থাকতো তাহলে অনেকেই তালাকের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো না কিন্তু এ বাধ্যবাধকতা আরোপের ফলে তালাক দেয়া স্ত্রীকে একমাত্র এ পদ্ধতিতেই পুনরায় লাভ করা যেতে পারে যে, সে

www.pathagar.com

অন্য কারো স্ত্রী হবে তারপর কোনো কারণে সে তাকে ত্যাগ করবে এবং স্ত্রীলোকটি একে পুনরায় বিয়ে করতে রাজী হবে। এর অর্থ মাঝপথে এক বিরাট দীর্ঘসূত্রিতা প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো। বস্তুত এ বাধ্যবাধকতা আরোপের পর এখন যেই তালাক দেবে সে শতবার চিন্তা-ভাবনা করেই তালাক দেবে। আর ইসলামের উদ্দেশ্য এটাই যে, যে ব্যক্তিই তালাক দেবে সে যেনো সুন্দর ভবিষ্যতের সকল পরিণামকে সামনে রেখে খুব ভেবে-চিন্তে তালাক দেয়।

'নিকাহ' শব্দের অর্থ বিবাহ বন্ধন

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ আমাদের মতে এখানে 'নিকাহ' শব্দটি বিবাহ বন্ধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা একে সঙ্গম অর্থে গ্রহণ করেছে তারা একটি অনাবশ্যক কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছে। তদুপরি এ অর্থ গ্রহণ করলেও সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না যা তারা অর্জন করতে চায়। এক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহারবিধি এ অর্থ গ্রহণে বাধা দেয়। এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, تَنْكِحَ শব্দটির কর্তা فَاعِل হচ্ছে স্ত্রীলোক। যদি এর অর্থ সঙ্গম হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে, "যতক্ষণ না সে স্ত্রীলোকটি কোনো দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সঙ্গম করে।" সঙ্গম করা হচ্ছে পুরুষের কাজ—স্ত্রীলোকের নয়। আর যদি এ অর্থ করা হয় "যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামী দ্বারা সঙ্গম করায়" তবে এ বিরল অর্থ গ্রহণের জন্য প্রমাণ কোথায়?

বিয়ের মূল উদ্দেশ্য

বস্তুত নিকাহ শব্দটি ইসলামী শরীআতের একটি পরিচিত পরিভাষা। একজন নারী ও পুরুষের বৈবাহিক চুক্তির ক্ষেত্রে যার প্রয়োগ হয়ে থাকে। যা করা হয় জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে। যদি এ উদ্দেশ্য কোনো বিয়েতে বর্তমান না থাকে তবে মূলত তা বিয়েই নয়। বরং তা হচ্ছে একজন নারী আর একজন পুরুষের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র। ইসলামী শরীআত বিয়ের সাথে তালাকের যে সুযোগ রেখেছে তা মূল পরিকল্পনার কোনো অংশ নয়। বরং এটি হচ্ছে কোনো আকস্মিক সংঘটিত দুর্ঘটনার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিকার। এ কারণে বিয়ের মূল প্রকৃতি হচ্ছে এটাই যে, গোটা জীবন এক সাথে থাকার যে সংকল্প নিয়েছে তা কার্যকর হবে। যদি কোনো বিয়ে দৃশ্যত শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ মেয়াদের জন্য হয় তবে তাকে মুতা'আ বলা হয়। আর মুতা'আ ইসলামে অকাট্যভাবে হারাম। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি একজন নারীকে এ নিয়তে বিয়ে করে যে, এ বিয়ের পর তালাক দিয়ে সে এ স্ত্রীলোকটিকে তার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবার সুযোগ করে দেবে তবে শরীআতের পরিভাষায় এটি হচ্ছে হালালাহ। এটাও ইসলামে মুতা'আর ন্যায়ই হারাম। যে ব্যক্তি কারো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এ নিকৃষ্ট কাজটি করে সে মূলত হাদীসের ভাষায় "ভাড়াটে ষাঁড়"-এর ভূমিকা পালন করে। এরূপ যে করে এবং এরূপ যে করায় উভয়ের প্রতিই আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাত।

মুতা'আ ও হালালার মধ্যে পার্থক্য

অবশ্য মুতা'আ ও হালালার মধ্যে অনেকটা মিল থাকা সত্ত্বেও কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। আর তাহলো, মুতা'আ স্পষ্টভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। তাই এ সম্পর্কে একজন ফকীহ্ পরিষ্কার বলে দিতে পারে যে, এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু হালালার ধরন হচ্ছে পর্দার আড়ালে একটি ষড়যন্ত্র। বিয়ের নামে এতে যে আল্লাহর শরীআতের সাথে উপহাস করা হলো তার কোনো বাহ্যিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকে না। তাই আল্লাহর নিকট তো এ বিয়ে এবং এ তালাক সবই বাতিল বলে গণ্য কিন্তু একজন ফকীহ (ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ) যিনি শুধু বাহ্যিক অবস্থাকে সামনে রেখে ফাতওয়া দিতে বাধ্য। তিনি এটা বলতে পারেন না যে, এ পদ্ধতির বিয়ে আদৌ অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো ফকীহ্ এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে স্বীকার করে এবং আমার নিকট তাদের এমত শক্তিশালী মনে হয়।

একটি দলীল বিহীন কথা

এই যে বলা হয়, এরূপ নারী তার প্রথম স্বামীর জন্য কেবলমাত্র তখন বৈধ হবে যখন তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে দৈহিক মিলনের পর তালাক দেবে। এ দৈহিক মিলনের জন্য কুরআন থেকে অন্তত কোনো প্রমাণ মেলে না। تَنْكِحَ শব্দ দ্বারা যে দলিল পেশ করা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। তারপর এটিও দেখার বিষয় যে, এ দৈহিক মিলন সংঘটিত হওয়ার ফলে হালালাহ্র নিকৃষ্টতা ও অভিশপ্ততা কতটুকু হ্রাস পাবে? যদি একটি বিয়ে হালালাহ্র ষড়যন্ত্রের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাতে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়া আর সঙ্গমের পরে তালাক দেয়ার মধ্যে চরিত্রগত দিক থেকে কি কোনো পার্থক্য সূচিত হয়? যদি সঙ্গম ছাড়া তালাক দেয়া হয়ে থাকে তবে তা হবে দালালী। আর যদি সঙ্গমের পর দেয়া হয়ে থাকে তবে এমন ব্যক্তিকে হাদীসের ভাষায় "ভাড়াটে ষাঁড়" মনে করতে হবে। মোটকথা উভয় অবস্থাতেই এ বিয়ে ও তালাকের নাটক আল্লাহর শরীআতের সাথে নিছক একটি তামাশা! এ আয়াতে আমাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাহলো এই যে, স্ত্রীলোকটি মূলত সারা জীবন বসবাস করার ইচ্ছা নিয়েই অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় স্বামী এমন কোনো কারণে বাধ্য হয়ে তাকে তালাক দেবে, যে কারণে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় নিসন্দেহে এ স্ত্রীলোকটি তার প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু এ বিয়ে ও তালাকের মধ্যে যদি কোনোরূপ ষড়যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে তবে এ বিয়ে ও তালাক এবং এর সাথে সংশিষ্ট সবাই হবে আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত ও ক্রোধের কারণ। এসব কিছু সঙ্গমের পরে হয়েছে অথবা সঙ্গম ছাড়া এটা আলোচনার বিষয় নয়।

মূলত একটি হাদীসের প্রেক্ষিতে এ বিষয়টির উদ্ভব ঘটেছে। কুরআন থেকে এর পক্ষে দলীল পেশ করা একটি হাস্যকর ব্যাপার বৈ কিছু নয়। কিন্তু হাদীস থেকে যে প্রমাণ পেশ করা হয় আমাদের মতে তাও নিতান্ত দুর্বল, হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাকে একত্র করলে যে সারবস্তু পাওয়া যায় তাতে আমি দেখেছি যে, তা কুরআনের সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

অনুরূপ। আমি যদি আমার এ গ্রন্থে ফিক্‌হ বিষয়ক আলোচনার ব্যাপারে একটা বিশেষ সীমারেখা নির্ধারণ না করতাম তবে এ হাদীসটি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করে আমি দেখতাম যে, হাদীসে মূলত কি বলা হয়েছে, আর মানুষ তার কি অর্থ করেছে। কিন্তু এ আলোচনা আমার গণ্ডি বহির্ভূত।

এরপর আল্লাহ বলেন, দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে তালাক পাওয়ার পর সাবেক স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো দোষ নেই—যদি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে তারা আশা করে। এ সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন এজন্য ছিলো যে, বিয়ে ও তালাক মোটেই ছেলেখেলা নয়। এটা যখন অনুষ্ঠিত হবে, সদিচ্ছা ও স্থায়ী সম্পর্ক বজায় রাখার একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা নিয়েই অনুষ্ঠিত হবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ উভয় পন্থায় লোকদের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে করে যেসব লোক আল্লাহর সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রত্যাশী তারা তার মূল্যায়ন করে এবং তা লংঘন করার পরিণাম থেকে বেঁচে থাকে।

আয়াত ঃ ২৩১

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

আল্লাহর শরীআতের সাথে উপহাসের পরিণাম

একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য অপেক্ষার যে সময়সীমা শরীআত নির্ধারণ করেছে ২২৮ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। আর ২২৯ আয়াতে তালাক প্রদানের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও বলে দেয়া হয়েছে। এবং এটাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তৃতীয় তোহরে হয় বিধি মোতাবেক বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল করবে নতুবা উত্তম পন্থায় তাকে বিদায় করে দেবে। এ আয়াতে বিষয়টিকে আরো অধিক স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো ঃ "বিধি মোতাবেক রাখা" কথাটি দ্বারা শরীআতের উদ্দেশ্য কি ? এ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে যে, এই রাখার অর্থ কখনো এটা হবে না যে, স্ত্রী তোমার নির্যাতনের ষ্টীম রোলারে পিষ্ট হবে এবং তুমি তাকে যথেচ্ছাভাবে কষ্ট দেবে। ইতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনার পর নেতিবাচক দিক থেকেও এজন্য তার ব্যাখ্যা করা হলো যে, যালিম স্বামী কর্তৃক তালাক দেয়া এবং তালাকের পর পুনরায় গ্রহণের অধিকারকে এ যুলুমের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিলো, অথচ এটা হচ্ছে আল্লাহর সীমার

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট লংঘন এবং তার শরীআতকে উপহাসের পাত্র বানানোর নামান্তর। বলা হলো, যে ব্যক্তি এ ধরনের ধৃষ্টতা বা দুঃসাহস দেখায় বাহ্যত যদিও সে একজন স্ত্রীলোককে যুলুমের লক্ষবস্তুতে পরিণত করে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে সে নিজের ওপরই সবচেয়ে বড় যুলুম করে। কারণ আল্লাহর সীমাসমূহের লংঘন এবং তার শরীআতকে তামাশায় পরিণত করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

অবশেষে বলা হলো, আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ রেখো। তিনি তোমাদেরকে তাঁর মনোনীত উম্মতের আসনে সমাসীন করেছেন। তোমাদের হেদায়াতের জন্য তোমাদের মধ্যে স্বীয় নবী পাঠিয়েছেন। তোমাদেরকে ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন—যা বিধি-বিধান ও হিকমত সম্বলিত। আল্লাহর এ মহান নেয়ামতসমূহ লাভ করার পর তোমরা যদি তাঁর হক এভাবে আদায় কর যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা, তার শরীআতকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করো তবে ভেবে দেখ, এমন লোকদের পরিণাম কি হতে পারে। তারপর বলা হলো, আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং ভাল করে জেনে নাও, তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে অবগত। অর্থাৎ মানুষের অন্যায় অপরাধ সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দেন ঠিকই ; কিন্তু তিনি যখন পাকড়াও করবেন তখন তার পাকড়াও থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

এখানে এ সূক্ষ্ম দিকটাও লক্ষণীয় যে, শরীআতকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার অর্থ শুধু যে প্রকাশ্যে তার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা নয়, বরং এও তার একটি অতিশয় মারাত্মক রূপ যে, বাহ্যত কাজটি এমনভাবে করা হয় যার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা যায় না, কিন্তু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের দিক থেকে সে কাজটি শরীআতের উদ্দেশ্য ও লক্ষের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন তৃতীয় তোহরে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে তবে শরীআতের দৃষ্টিতে এ অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য যদি হয় স্ত্রীকে জ্বালাতন করা, তবে তার মানে হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহর আয়াতের আড়ালে আল্লাহরই বিরোধিতা করলো। আর এটি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর শরীআতের সাথে প্রকাশ্য বিদ্রূপ।

৭৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৩২-২৩৭ আয়াত

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ
لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ
فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ
اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا
قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ
اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْۤا
اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ

تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩২. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল (অপেক্ষার মেয়াদ) পূর্ণ করে তখন তোমরা তাদের হবু স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িও না যদি তারা পরস্পর বিধিসম্মতভাবে বিষয়টি সম্পাদন করে। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকেই এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটাই তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম পদ্ধতি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

২৩৩. যারা পূর্ণ মেয়াদ সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চায় তাদের ক্ষেত্রে মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে। পিতার দায়িত্ব যথাবিধি সন্তানের মায়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো বাপকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। উত্তরাধিকারীদের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে। আর যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে (নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই) দুধ ছাড়াতে চায় তবে এতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। যদি তোমরা নিজ সন্তানদেরকে অন্য কারো দুধ পান করাতে চাও তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, যদি তোমরা যথাযথভাবে তাদের প্রতিশ্রুত পাওনা আদায় করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখ তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তাআলা তা দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের (জীবিত) রেখে যায়, এমতাবস্থায় স্ত্রীরা তাদের (বিয়ের) ব্যাপারে চার মাস দশ দিন বিরত থাকবে। অতপর যখন তারা নিজেদের ইদ্দতকাল (বিরতির মেয়াদ) পূর্ণ করবে তখন তারা যথাবিধি নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তোমরা যা কিছুই কর না কেন সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সবিশেষ অবহিত। ২৩৫. যদি তোমরা এই

www.pathagar.com

স্ত্রীদের নিকট ইশারা-ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও অথবা তোমাদের অন্তরে তা গোপন রাখ তাতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদেরকে স্মরণ করবে। কিন্তু (সাবধান) গোপনে তাদেরকে বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসো না। অবশ্য বিধিমত কথাবার্তা বলতে পার। আর নির্ধারিত ইদ্দতকাল সমাপ্তি পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত বিয়ে সম্পন্ন করার সংকল্প করো না এবং জেনে রাখ, তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই জানেন। অতএব তাকে ভয় করো এবং জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল।

২৩৬. যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এমতাবস্থায় তালাক দাও যে, না তাদেরকে তোমরা স্পর্শ করেছ না তাদের জন্য মোহরানা নির্ধারণ করেছ, এতে তাদের মোহরানার বিষয়ে তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই। অবশ্য বিধিমত তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করবে। বিত্তবান তার সাধ্যমত আর বিত্তহীন তার অবস্থানুযায়ী। সৎলোকদের ওপর এটি (স্ত্রীদের) একটি অধিকার। ২৩৭. আর যদি (এমন হয় যে,) তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়েছ, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অংকের মোহরানা তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছ। এমতাবস্থায় নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক আদায় করে দাও। তবে যদি সে (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী) তার অধিকার ত্যাগ করে কিংবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে (অর্থাৎ স্বামী) সে তার পাওনা মাফ করে দেয় (অর্থাৎ পুরো মোহরানা দিয়ে দেয়) তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা নিজেদের পাওনা মাফ করে দেয়াটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমাদের মধ্যে একজনের অপরজনের ওপর যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা ভুলে যেও না। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তা দেখছেন।

৭৫. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৩২

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ○

عضل শব্দের অর্থ

عـضـل শব্দের অর্থ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বাধা দান করা। اَزْوَاجَـهُنَّ শব্দে ازواج বলতে তাদের সেই হবু স্বামীকে বুঝানো হয়েছে যার সাথে সে ভবিষ্যতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক।

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা নারীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না

যে স্ত্রীলোকটি তালাকপ্রাপ্ত হয়ে তার ইদ্দত (অপেক্ষার মেয়াদ) পূর্ণ করেছে সে স্বাধীন। যেখানে তার পসন্দ সেখানে সে বিয়ে করতে পারে। তার এ ইচ্ছার পথে তালাক প্রদানকারী স্বামীর বা তার পরিবারের কারো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। এ প্রতিবন্ধকতা চাই সরাসরি নিষেধ করার মাধ্যমে হোক কিংবা গোপন ষড়যন্ত্র বা চাপ সৃষ্টি করে হোক। কোনো কোনো বংশ ও পরিবারে এমন মূর্খতা বা গোঁড়ামীও পরিলক্ষিত হয় যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোকের বিয়ে হয়ে যায় তখন তার তালাকপ্রাপ্তার কিংবা তার স্বামী মারা যাওয়ার পরও এ স্ত্রীলোকটি কোথাও আরেক বিয়ে করুক তা তারা বরদাশ্‌ত করতে পারে না। একে তারা নিজেদের জন্য মর্যাদা হানিকর মনে করে এবং তার পথে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করে। এমন কি এর ফলে অনেক সময় তুমুল ফাসাদ ও হত্যার মত নৃশংস ঘটনাও ঘটে যায়। এ ধরনের মূর্খতা যেমনভাবে আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হয় তেমনি তৎকালে আরব দেশেও বর্তমান ছিলো। কুরআন এ অন্যায় রীতি প্রথমে নিষিদ্ধ করেছে এবং বলেছে ঃ যে ব্যক্তি একজন স্ত্রীলোককে তালাক দিয়ে দিলো, তার পক্ষে স্ত্রীলোকটির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকার কোনো অধিকার নেই। সে যেখানে চায় এবং যার সাথে তার ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয়ে যায়, যদি বিষয়টা বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত হয়ে থাকে তবে এ সম্পর্কে কারো আপত্তি তোলার অধিকার নেই।

"বিধি মোতাবেক" কথাটি দ্বারা এখানে আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সেইসব রেওয়াজ ও বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে। যাকে ইসলাম বিভিন্ন কু-প্রথা থেকে পবিত্র করে ইসলামী শরীআতের অংশে পরিণত করেছিলো এবং অনেক ব্যাপারে লোকদেরকে তার ওপর হয়ত আমল করার নির্দেশ দিয়েছে কিংবা আমলের স্বাধীনতা দিয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে এখানে মারুফ বা বিধি মোতাবেক হওয়ার যে শর্তটি আরোপ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এটা জরুরী যে, বিষয়টি চূড়ান্ত করতে গিয়ে যেনো এমন কিছু না করা হয় যা একটি শরীফ খান্দানের রীতিনীতি বিরুদ্ধ এবং যার কারণে পূর্ব স্বামী কিংবা হবু স্বামী অথবা স্বয়ং স্ত্রীলোকটির বংশীয় মান-মর্যাদা ও যশ-খ্যাতি নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

এরপর বলা হলো, এসব নসিহত তাদেরকে করা হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে। অর্থাৎ যাদের মধ্যে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান বর্তমান রয়েছে তাদের ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, তারা এসব নসিহত অনুযায়ী আমল করবে। তারপর বলা হয়েছে, এটাই তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম পদ্ধতি। অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির পসন্দ অনুযায়ী বিয়ের পথে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তবে এর ফলে পরিবার এবং এমন কি সমাজের মধ্যেও বহুবিধ অন্যায় ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এখান থেকেই গোপন সম্পর্ক অতপর জ্বেনা, তারপর অপহরণ ও পালায়নের চোরা পথ উন্মুক্ত হয় এবং একদিন তাদের সকলের নাককাটা পড়ে যারা নাক উঁচু রাখার ধারণা নিয়েই সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অর্থহীন রসম-রেওয়াযের নানারূপ অন্তরায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। আয়াতের শেষাংশে বলা হলো। "আল্লাহ

www.pathagar.com

জানেন, তোমরা জান না।" অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান ও তোমাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই সীমিত। জীবনের যাবতীয় চড়াই-উৎরাই উপলব্ধি করা তোমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। তাই যা কিছু তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে সে অনুযায়ী আমল কর।

আয়াত ঃ ২৩৩

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَتُضَارَّ
وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

দুধ পান সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসয়ালা

এ আয়াতে দুধ পান সম্পর্কিত অনেকগুলো মাসয়ালা এক সাথে বর্ণিত হয়েছে যার ধারাবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. তালাকপ্রাপ্তার দায়িত্ব নিজ সন্তানকে পুরো দু'বছর দুধ পান করানো। যদি তালাক দাতা স্বামী এটা চায় যে, স্ত্রী দুধ পান করানোর এ মেয়াদ পূর্ণ করুক।

২. এ মেয়াদকালে তালাকপ্রাপ্তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানের পিতার ওপর এবং এ ব্যাপারে প্রচলিত বিধির আনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ স্বামীর সামর্থ বা মর্যাদা, স্ত্রীর প্রয়োজন এবং স্থানীয় অবস্থাকে সামনে রেখে দু পক্ষ ফায়সালা করবে যে, স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ বাবদ কি দেয়া যায়।

৩. উভয়পক্ষের কারো ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। সন্তানের দোহাই দিয়ে মাকে যেমন কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা যাবে না। তেমনি সন্তানকে ঢালরূপে ব্যবহার করে বাপের ওপরও কোনোরূপ অবৈধ চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

৪. যদি সন্তানের পিতা মারা গিয়ে থাকে তবে উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে ঠিক অনুরূপ ভূমিকা হবে তার ওয়ারিসদের।

৫. যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দু'বছর মেয়াদের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রী সন্তানের দুধ ছাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা তারা করতে পারে।

৬. যদি পিতা বা সন্তানের ওয়ারিস সন্তানের মায়ের পরিবর্তে অন্য কোনো মহিলা দ্বারা দুধ পান করাতে চায় তবে এমনটা তারা করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, সন্তানের মাকে যা দেয়ার চুক্তি হয়েছে তা পূর্ণ করতে হবে।

www.pathagar.com

সবশেষে এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং এটা জেনে রাখ, যা কিছু তোমরা করে থাকো আল্লাহর সামনেই করে থাকো। কোনো কিছুই তার কাছ থেকে গোপন থাকে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর মীমাংসা সাধারণ অবস্থায় নারী ও পুরুষ এবং পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা নিজেরাই করবে। আর যদি কোনোরূপ বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে উল্লেখিত মূলনীতিকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত ও আদালত মীমাংসা করে দেবে।

আয়াত ঃ ২৩৪

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

বিধবার ইদ্দত

যদি কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় তবে এরূপ স্ত্রীলোকের ইদ্দত (অপেক্ষার মেয়াদ) চার মাস দশ দিন (আর গর্ভবতী অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত)। সাধারণ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার তুলনায় বিধবার ইদ্দতের এ বর্ধিতকরণ নানা কারণে। যেমন গর্ভাশয় নিরাপদ করা। স্ত্রীলোকটির সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া। শোক পালন ইত্যাদি। নারী দুর্বল, কোমলমতি ও প্রবল অনুভূতি প্রবণ হওয়ার কারণে স্বামীর বিয়োগ ব্যাথা খুব বেশী অনুভব করে এবং বৈধব্য অবস্থায় সে সহানুভূতির খুব বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এ কারণে তার ইদ্দতকাল বেশী রাখা হয়েছে। যাতে করে স্বামীর বিয়োগ ব্যাথার সাথে একই সময়ে স্বামীর ভিটে মাটি ত্যাগ করার কষ্ট তাকে সইতে না হয়। তাই এ দিকটি বিবেচনায় রেখেই এ আয়াতেরই অতিরিক্ত ব্যাখ্যা স্বরূপ একটি আনুষঙ্গিক নির্দেশনা এও দেয়া হলো ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ج وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ج فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ـ البقرة : ٢٤٠ –"আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে তারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এ মর্মে অসিয়ত করে যাবে যে, তাদেরকে ঘর থেকে বের না করে যেনো এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণ দেয়া হয়। আর যদি তারা নিজ থেকেই বেরিয়ে যায় তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা কিছু করবে তাতে তোমাদের ওপর কোনো দোষ আরোপিত হবে না, আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞময়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪০

উল্লেখিত ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর সে স্বাধীন। নিজের ব্যাপারে বিধিসম্মত পন্থায় যে পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন মনে করে তা নিতে পারে। তারপর অভিভাবকদের

www.pathagar.com

ওপর যেমন কোনো দোষ আরোপ করা যাবে না। তেমনি তাদের ওপরও কোনো অভিযোগ চাপানো যাবে না—যদি তারা বিধিবদ্ধ নিয়মের বরখেলাফ কিছু না করে থাকে, অর্থাৎ শরীআত বিরোধী রীতিনীতিকে শরীআতের মর্যাদা দিয়ে খামাখা একে অপরকে তিরস্কার ও অপবাদের লক্ষস্থলে পরিণত করা উচিত নয়। স্বামীর ওয়ারিস ও স্ত্রীর অভিভাবকদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করা উচিত নয় যে, স্ত্রীলোকটি এখনো স্বামী শোক পালন করে সারেনি। এরি মধ্যে তারা ওর ব্যাপারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছে। আর স্ত্রীলোকটিকেও এ বলে তিরস্কার করা উচিত হবে না যে, স্বামীর কাফনটাও এখনো ময়লা হয়ে সারেনি। এরি মধ্যে সে বিয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আল্লাহ যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করা উচিত এবং একথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বান্দাহর প্রতিটি কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

স্ত্রীলোকটির মা'রূপ বা বিধিসম্মত পন্থা অনুসরণের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাতে একথাটিও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বিয়ের ব্যাপারে কুফু' বা সমকক্ষতার দিকটাও লক্ষ রাখতে হবে। যাতে করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের মর্যাদা বা আভিজাত্য ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।

আয়াত ঃ ২৩৫

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ط وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

ইসলামী সমাজে আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

ইসলামী সমাজে একজন অপরজনের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। তাই নিষেধ করে দেয়া হলো যে, কোনো লোক মৃত্যুবরণ করার পর তার বিধবা স্ত্রীকে তার ইদ্দত পালনকালেই বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ শুরু করা কারো পক্ষে বৈধ নয়। নিজের একজন মৃত ভাইয়ের জন্য একজন সহধর্মী ও সহানুভূতিশীল ভাইয়ের মধ্যে যে আবেগ-অনুভূতি থাকা উচিত এটা যেমন তার পরিপন্থী তেমনি একজন শোকার্ত বিধবার আবেগ-অনুভূতির প্রতি একজন ভদ্র লোকের যে ধরনের সম্মান দেখানো কর্তব্য এটা তারও বিরোধী। মুসলমানদের সমাজ পারস্পরিক সহমর্মিতার সমাজ (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) পশুপাল নয়। তাই বলে দেয়া হলো, যদি কোনো ব্যক্তি বিধবাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয় তবে সে বড়জোর এতটুকু করতে পারে যে, ইংগিতবহ কোনো বাক্য মুখে উচ্চারণ করবে কিংবা অন্তরে বিয়ের ইচ্ছে পোষণ করবে। কিন্তু গোপনে বিয়ের প্রস্তাব করা মোটেই বৈধ নয়। মোটকথা, শোক ও

www.pathagar.com

সহানুভূতি পর্যন্তই কথা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত—যা এরূপ ক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বা বিধিসম্মত। সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে যদি এমন কোনো বাক্য নিঃসৃত হয়ে পড়ে যা (বিয়ের) ইংগিতবহ তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ ঃ এটি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বাক্য। (جملہ معترضہ)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, অন্তরের গোপন ইচ্ছাগুলো সম্পর্কে তোমরা এ ধারণা পোষণ করো না যে, তা আল্লাহর নিকট গোপন থাকে। আল্লাহ খুব ভালোভাবে জানেন। তোমরা এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। অতএব প্রকাশ করলেও এমনভাবে করো না যে, তা প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির রূপ নেয়। বরং এমনভাবে করবে যা এরূপ ক্ষেত্রে শোভনীয় ও বিধিসম্মত।

'কিতাব' শব্দটি সম্পর্কে আমি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি যে, কুরআনে বিশেষ কোনো শরয়ী বিধানের জন্যও এটি ব্যবহার হয়। এখানে এ শব্দ দ্বারা চার মাস দশদিন ইদ্দত পালনের সেই বিধানকে বুঝানো হয়েছে। যা একজন বিধবার ব্যাপারে ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কোনো বিশেষ বিধানকে 'কিতাব' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হলে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বলা হলো যে, আইনানুগ মেয়াদপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করো না।

অবশেষে তাঁর 'সর্বজ্ঞ' গুণটির উল্লেখ করলেন। যা স্মরণ রাখার মধ্যেই আল্লাহর বিধানের সঠিক মর্যাদা নিহিত। সাথে সাথে এও বলে দিলেন, আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তার অবকাশ পেয়ে ধোঁকায় পড়ো না। তিনি ক্ষমাশীল ও সহনশীল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর জানার বাইরে নয়।

আয়াত ঃ ২৩৬

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○

সদাচারণকারীর ওপর একটি হক

এ আয়াতে لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ এর সম্পর্ক একটি উহ্য বিষয়ের সাথে। পুরো কথাটি হচ্ছে এই যে, যদি এমনটা হয় যে, এক ব্যক্তি তার বিবাহিতা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় তালাক দিলো যে, সে তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও স্থাপন করেনি এবং তার জন্য মোহরানাও নির্ধারণ করেনি। এরূপ অবস্থায় মোহরানার ব্যাপারে তার কোনো গুনাহ নেই। বরং মোহরানার পরিবর্তে তার উচিত বিধি মোতাবেক তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করা। বিধি মোতাবেক অর্থ হচ্ছে এই, তার জন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং এটা নির্ভর করবে ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানের ওপর। একজন গরীব তার সামর্থ অনুসারে দেবে।

www.pathagar.com

আর ধনী তার সামর্থ অনুসারে। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, যারা নিজেদের জীবনকে গঠন করতে ও পরিপাটি করতে আকাঙ্ক্ষী এবং সৎলোকদের দলভুক্ত হতে আগ্রহী তাদের ওপর এটি একটি হক বা অধিকার।

আয়াত ঃ ২৩৭

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

পুরুষের মহানুভবতার দাবি

এখানে ওপরে বর্ণিত অবস্থা থেকে ভিন্ন একটি অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। আর তা হলো, মোহরানা নির্ধারিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাক্ষাতের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক প্রদান করতে হবে। অবশ্য স্ত্রী যদি তার অধিকার ত্যাগ করে তবে তা স্বতন্ত্র কথা, অথবা পুরুষ তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় অর্থাৎ অর্ধেকের পরিবর্তে পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেয়। স্ত্রীর যদিও মোহরানা ত্যাগ করার যুক্তি আছে, কারণ স্বামীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন পুরুষকে উৎসাহিত করেছে এই বলে যে, তার মহানুভবতা ও উচ্চমর্যাদার দাবি হলো, সে যেনো এমন আকাঙ্ক্ষা না করে যে, স্ত্রী তার অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। বরং আত্মত্যাগের এ ময়দানে সেই এগিয়ে থাকবে। এ আত্মত্যাগের জন্য কুরআন এখানে পুরুষকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসাহিত করেছে। এক হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা পুরুষকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, সে যেমন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার এখতিয়ার রাখে তেমনি তা খুলতেও পারবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ আত্মত্যাগ ও কুরবানী যা তাকওয়ার উচ্চতম গুণাবলীর অন্যতম তা দুর্বল শ্রেণীর তুলনায় সবল শ্রেণীর ক্ষেত্রেই অধিকতর উপযোগী। তৃতীয় হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা পুরুষকে তার নানাবিধ যোগ্যতার দিক থেকে যে স্ত্রীর ওপর এক ধাপ প্রাধান্য দিয়েছেন এবং যার কারণে তাকে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্বশীল ও নেতৃত্বশীল করেছেন এটি একটি বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। স্ত্রীর সাথে যে কোনো আচরণ করতে গিয়ে যা পুরুষের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ মর্যাদার স্বাভাবিক দাবি হলো, পুরুষ স্ত্রীর কাছ থেকে গ্রহীতা হবে না বরং সে হবে দাতা।

হাল যমানার সমাজবিদদের জন্য একটি সতর্কবাণী

এখানে بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ শব্দগুলোর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যা বর্তমান যুগের সমাজবিদ ও সংস্কারবাদীদের বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত। আর তা হচ্ছে, পুরুষের কবুলের মাধ্যমে যেমন বিয়ের বন্ধন নিবন্ধিত হয় তেমনি তারই তালাক দ্বারা এ বন্ধন টুটে যায়। বলতে গেলে মূলত শরীআত এ বিষয়টি আগাগোড়া পুরুষেরই

www.pathagar.com

এখতিয়ারভুক্ত রেখেছেন। তাই তালাকের ব্যাপারে নারীকে পুরুষের সমঅধিকার দানের প্রবণতা—যা পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের মুসলিম দেশসমূহে বৃদ্ধি পাচ্ছে, শরীআতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এতে করে পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে।

৭৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৩৮-২৪২ আয়াত

বিভিন্ন আইন ও নির্দেশাবলী সম্পর্কিত অধ্যায় যা ১৬৩ আয়াত থেকে তাওহীদ অতপর নামায ও যাকাতের উল্লেখ দ্বারা আরম্ভ হয়েছিল, এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে তা সমাপ্ত হচ্ছে। আয়াতসমূহের সামষ্টিক বিন্যাস এরূপ ঃ একটি আয়াত যা মূলত অধ্যায়ের সমাপ্তি বলা চলে—ভয় ও নিরাপদ প্রতিটি অবস্থায় নামাযের সংরক্ষণ সম্পর্কিত। অপর দু'টি আয়াতে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে যার উল্লেখ ওপরে বর্ণিত আয়াতসমূহে করা হয়েছে—কিছু আনুষঙ্গিক হেদায়াত দেয়া হয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতদ্বয় অধ্যায়ের শেষে যোগ করে দেয়া হলো, যাতে বাক্যের বিন্যাস থেকেই বুঝা যায় যে, মূল নির্দেশাবলী প্রদানের পর এ আয়াতগুলো ব্যাখ্যা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এর সাথে كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ অংশটি জুড়ে দিয়ে আয়াতগুলো যে ব্যাখ্যামূলক সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। যাতে করে একজন ভাষাবিদের পক্ষে বাক্যের যোগসূত্র বুঝতে অসুবিধা না হয়।

নামায গোটা দীনের জন্য দুর্গ স্বরূপ

বলা যায় حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতটিই অধ্যায়ের সমাপ্তির মূল আয়াত। এবার অত্র অধ্যায়ের শুরুতে দৃষ্টি দিন। তাহলে দেখা যাবে যে, শুরুতে তাওহীদের উল্লেখ করার পর শরীআতের বিভিন্ন হুকুম বর্ণনা প্রসংগে সবার আগে ১৭৭ আয়াতে নামায এবং সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে লক্ষ করলেও দেখা যাবে যে, নামাযের উল্লেখের মাধ্যমেই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে। এটা একথারই ইংগিত বহন করে যে, এ দীনের মধ্যে নামাযের যে গুরুত্ব রয়েছে অন্য কোনো জিনিসেরই সেই গুরুত্ব নেই। গোটা শরীআতের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা একে শরীআতের প্রতিষ্ঠা ও তার হিফাযতের জন্য একটি দুর্গ ও প্রাচীর তুল্য করেছেন। যে ব্যক্তি এর হিফাযত করে সে যেনো গোটা শরীআতের হেফাযত করলো। আর যে ব্যক্তি এতে বাধা-সৃষ্টি করে, হযরত উমর (রা) এর ভাষায় সে অবশিষ্ট দীনকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার যে, অধ্যায়ের শুরুতে যে নামাযের উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সুপরিচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আবার এখানে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার নামায ছাড়াও ভীতিকালীন নামাযেরও উল্লেখ রয়েছে। এটি নামাযের হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে একটি ক্রমবিন্যাস। অধ্যায়ের শুরুর আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন যুদ্ধাবস্থা ছিলো না। কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের পর থেকে যুদ্ধ

বিগ্রহের বিভিন্ন নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বরং যথার্থ কথা এই যে, মূল আলোচনার ধারা তো জিহাদ ও ইনফাক (আল্লাহর পথে ব্যয়) সম্পর্কেই চলছিলো। অন্যান্য বিষয়গুলো তো প্রসংগত এসে গেছে যেমনটা আমি ওপরে ইংগিত করেছি। অবস্থার এ পরিবর্তন দাবি করছিলো যে, নিরাপদ সময়ের নামাযের সাথে ভয়-ভীতিকালীন নামাযেরও উল্লেখ করা হোক। তাই প্রথম অবস্থার নামাযের উল্লেখ "ইকামাতে সালাত" বা নামায কায়েম শব্দ দ্বারা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অবস্থার নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। "হেফাযাতে সালাত" বা নামাযের সংরক্ষণ শব্দ দ্বারা। বর্ণনার এ দ্বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের দিক থেকে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের থেকে গোপন থাকতে পারে না।

নামায গোটা দীনের জন্য দুর্গ ও শহর রক্ষাকারী প্রাচীর সদৃশ একথাটি কুরআন গবেষকদের নিকট যদিও অজানা নয়। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ কুরআনে যদিও অনেক রয়েছে। কিন্তু সম্ভবত একজন সাধারণ পাঠকের এই সন্দেহ জাগতে পারে যে, আমি এখানে বাক্যের যোগসূত্র বজায় রাখতে গিয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছি। এ কারণে আমি সূরা মু'মিনূন-এর উদ্ধৃতি দিচ্ছি যার মধ্যে বাক্যের এই যোগসূত্রের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ ـ المؤمنون : ١ـ٩

"সেসব ঈমানদার লোকেরা সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনায়বনত হয়। যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায় করে। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, নিজেদের স্ত্রীদের কিংবা দাসীদের ছাড়া। এদের ব্যাপারে (হেফাযত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে যারা এ থেকে সামনে এগুবে (অর্থাৎ এর বাইরে কিছু কামনা করবে) তারা হবে সীমালংঘনকারী। যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। যারা নিজেদের নামাযসমূহের যথাযথ হেফাযত করে।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ১-৯

উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে। এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং তারপর দীন ও চরিত্র সম্পর্কিত কিছু মৌলিক কথা বলার পর তার সমাপ্তিও টানা হয়েছে নামায দিয়ে। এ ছাড়া প্রথম নামাযের সাথে খুশু বা বিনয়াবনত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে যা হচ্ছে নামাযের প্রকৃত রূহ বা প্রাণশক্তি। আর দ্বিতীয় নামাযের সাথে হেফাযত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা তার যাবতীয় বাহ্যিক নিয়মের প্রতি যত্নশীল হওয়ার এক ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে এবং যাদ্বার এ

www.pathagar.com

ইংগিতও পাওয়া যায় যে, নামাযের হেফাযত করার মধ্যেই দীনের অন্যান্য বিষয়ের হেফাযত নিহিত।

ঠিক একই ধরনের বর্ণনাভঙ্গি সূরা মাআরিজ-এর নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতেও লক্ষণীয় ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۗ ـ معارج : ١٩ـ٣٤

“নিসন্দেহে মানুষকে অস্থির চিত্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়। আর সচ্ছলতার মুখ দেখলে কৃপণ বনে যায়। তবে সেসব নামাযী ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম যারা তাদের নামায আদায়ের ব্যাপারে সদা নিষ্ঠাবান। যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের। যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য মনে করে। যারা তাদের রবের আযাবের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আপন স্ত্রীর ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া। এদের ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না। যারা এ সীমা থেকে সামনে কদম বাড়াবে তারা হবে সীমালংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। যারা সাক্ষ দানের ক্ষেত্রে অটল থাকে। এবং যারা তাদের নামাযের যথাযথ হেফাযত করে।”

–সূরা মা'আরিজ ঃ ১৯-৩৪

এখানেও দেখুন, নামায দিয়েই শুরু এবং নামায দিয়েই সমাপ্ত। যেমনিভাবে শহর রক্ষাকারী একটি প্রাচীর গোটা শহরকে নিজ হেফাযতে নিয়ে নেয় তেমনিভাবে নামায অন্যান্য যাবতীয় নেকসমূহকে আপন হেফাযতে নিয়ে নেয়। এর উদ্দেশ্য যেমনটা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। এ মূল তত্ত্বের দিকে ইংগিত করা যে, গোটা দীনের সংরক্ষক হচ্ছে নামায। যে তার হেফাযত করলো, সে গোটা দীনের হেফাযত করলো। আর যে নামায ত্যাগ করলো সে গোটা দীনকে বরবাদ করে দিলো।

ঠিক একই মূলনীতি অনুসৃত হয়েছে সূরা বাকারায়ও। বিভিন্ন বিধিবিধান ও হুকুম-আহকাম সম্বলিত গোটা অধ্যায়টিকে সামনে ও পেছনে উভয় দিক থেকে নামাযের হুকুম দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে।

এ আলোকে এবার পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

حَٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوَٰتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٣٩ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
ءَايَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٤٢

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের হেফাযত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের এবং নামাযে আল্লাহর সামনে অবনত হয়ে দাঁড়াও। ২৩৯. যদি আশংকাজনক পরিস্থিতি হয় তবে হেঁটে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই হোক নামায আদায় করো। অতপর যখন আশংকা কেটে যায় তখন আল্লাহকে সে পন্থায় স্মরণ করো যা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যা (ইতিপূর্বে) তোমরা জানতে না।

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় তারা যেনো (মরণকালে) তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বহিষ্কার না করে এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়ত করে যায়। যদি তারা স্বেচ্ছায় ঘর ত্যাগ করে তবে বিধি মোতাবেক তারা নিজেদের ব্যাপারে যা কিছু করুক তাতে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ দোষ আরোপিত হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২৪১. অনুরূপভাবে তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকেও বিধি মোতাবেক কিছু দিয়ে দেয়া উচিত। এটা আল্লাহভীরুদের ওপর আরোপতি কর্তব্য।

২৪২. এমনিভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধানসমূহকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

www.pathagar.com

৭৭. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৩৮

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

নামাযের সংরক্ষণ

নামাযের হেফাযত বা সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে তার আরকান শর্তসমূহ ও নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ প্রতিপালন করা ও তার প্রতি যত্নবান হওয়া। নামায কায়েমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্রন্থের শুরুতে আমি এসব বিষয়ের উল্লেখ করেছি। এখানে নামায কায়েমের স্থলে 'সংরক্ষণ' শব্দের ব্যবহার যে নতুন দিকটির প্রতি ইংগিত করেছে তাহলো, কঠিন ও আশংকাজনক অবস্থায়ও সব ভয়-ভীতির মুকাবিলা করে নামাযের হেফাযত করতে হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে "সালাতুল খাওফ" বা ভীতিকালীন নামাযের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তরবারীর ছায়াতলেও যে জিনিসটিকে মু'মিন ভুলে থাকতে পারে না তা হচ্ছে নামায।

گو میں رہا ہیں ستمہائے روز گار
لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا

"যদিও কালের নিষ্পেষণে আমি বন্দী ছিলাম চিরদিন।
কিন্তু তোমার স্মরণ থেকে গাফিল থাকিনি কোনো দিন।"

'সালাতুল উস্‌তা' বলতে কি বুঝায়

اَلصَّلٰوةَ الْوُسْطٰى ঃ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মধ্যবর্তী নামায। এবং বাচনভঙ্গি পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, এটা হচ্ছে আ'মের পর খাছের উল্লেখ। অর্থাৎ সাধারণভাবে নামাযের উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে সালাতুল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিশেষভাবে উল্লেখ করার অর্থ কি। এর জবাবে বিশ্লেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ লোকের মতে এদ্বারা আসর নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। আমরাও এ মতের সমর্থক। রাত ও দিনকে ভাগ করলে দেখা যায় এটি এমন একটি নামায যা রাত ও দিন উভয়ের সীমান্তবর্তী স্থলে অবস্থিত। বলা যেতে পারে, সীমান্তবর্তী স্থানে তো ফজরের নামাযও রয়েছে। কিন্তু যে সীমান্ত স্থলে আসরের নামায অবস্থিত তা স্বাভাবিক অবস্থায়ও বিপজ্জনক। আর যদি যুদ্ধাবস্থা হয় তবে তো তা খুবই আশংকাজনক অবস্থার রূপ নেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় লক্ষ করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, আসরের সময় দিনের যাবতীয় কর্মতৎপরতা তার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করে। এ কারণে দুনিয়ার লোকের জন্য এটি অত্যন্ত ব্যস্ততম সময়। পথিক রাত আসার পূর্বে গন্তব্যে পৌঁছুতে চায়। দোকানদার দোকান বন্ধের পূর্বে কিছু কামাই করার ধাঁন্দায় মেতে ওঠে। চাকুরীজীবী তার নির্দিষ্ট ডিউটি শেষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি ময়দানে খোলায়াড়রাও নিজেদের শেষ আক্রমণ রচনার

www.pathagar.com

মাধ্যমে বাজিমাত করার নেশায় এতটা ডুবে যায় যে, কারো অন্য কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল থাকে না।

এবার এর ওপর অনুমান করুন। যদি আল্লাহ্ না করুন। যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে তবে এ ব্যস্ততা কতগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে দিনের সেই অংশে যে অংশে আসর নামাযের সময় হয়। তাই কুরআন সাধারণভাবে সব নামায সংরক্ষণেরও আদেশ দিয়েছে এবং সাথে সাথে আসর নামাযের হেফাযতের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আসর নামাযই বুঝানো হয়ে থাকে। তাহলে পরিষ্কারভাবে আসর শব্দ দ্বারাই কেন প্রকাশ করা হলো না। এর জবাব হচ্ছে এই (উস্‌তা) শব্দটির ব্যবহারের ফলে এ নামাযের সেই নাজুক অবস্থানটা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, যে কারণে এ নামাযটি বিশেষ হেফাযতের মুখাপেক্ষী।

একথাটিও স্মরণ যোগ্য যে, এটাই সেই নামায যে নামাযের ব্যাপারে নবীগণের মধ্যে দু'জন নবীকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়ছিলো। এক ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-কে সৈন্যদের প্যারেড অনুষ্ঠানের সময়। দ্বিতীয় ঃ আমাদের নবী করীম (স)-কে আহযাব যুদ্ধের সময়।

قٰنِتِيْنَ -এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও দীনতা প্রকাশ। এখানে শব্দটির উল্লেখ স্থল একথা প্রমাণ করে যে, নামায সংরক্ষণের আদেশের মধ্যে নামাযের এ আদব বা শিষ্টাচারও শামিল রয়েছে।

আয়াত ঃ ২৩৯

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ○

'সালাতুল খাওফ' বলতে কি বুঝায়

رِجَال শব্দটি رَاجِل এবং رُكْبَانٌ শব্দটি رَاكِبٌ এর বহুবচন বলা হচ্ছে, যদি শত্রুপক্ষ ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে রাখে, নামায তার যাবতীয় শর্ত পূরণ করে আদায় করা সম্ভব না হয় তবে বাহনে চড়ে কিংবা হেঁটে হেঁটে যে অবস্থায় হোক সেই অবস্থায় নামায আদায় করে নাও। ভীতিজনক পরিস্থিতিতে এটাই হচ্ছে নামাযের সংরক্ষণ। ভীতিকালীন অবস্থায় যদি জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করা সম্ভব হয় তবে তার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে কুরআন অন্যত্র তাও বলে দিয়েছে।

অতপর বলা হলো, যখন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসবে তখন আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহকে স্মরণ কর। এর অর্থ হচ্ছে নামায আদায় করা। যিক্‌র শব্দটি নামায অর্থে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার হয়েছে। যেহেতু যিক্‌রই (আল্লাহর স্মরণ) হচ্ছে নামাযের প্রকৃত তাৎপর্য। তাই

www.pathagar.com

কখনো কখনো মূল তাৎপর্যের উল্লেখ দ্বারা তার পদ্ধতিকেও বুঝানো হয়ে থাকে। যাতে করে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করার সময় মানুষের লক্ষ (নামাযের) মূল প্রাণশক্তির প্রতি নিবিষ্ট থাকে শুধুমাত্র পদ্ধতির ওপর নিবদ্ধ না থাকে।

নবী করীম (স)-এর শিক্ষা হুবহু আল্লাহর শিক্ষা

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ বাক্য দ্বারা একথাটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী করীম (স)-এর শিক্ষা হুবহু আল্লাহ তাআলার শিক্ষা। কেননা কুরআন মজীদে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা আদায় করার পদ্ধতি কোথাও বলা হয়নি। বিষয়টি একমাত্র নবী করীম (স)-এর শিক্ষার মাধ্যমেই উম্মত জানতে পেরেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলা হলো ঃ "যেভাবে তিনি (আল্লাহ) শিক্ষা দিয়েছেন।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পয়গাম্বরের শিক্ষা যদি হুবহু আল্লাহর শিক্ষা না হয় তবে সেটা কি জিনিস যাকে এখানে আল্লাহ তাআলা নিজের শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবার وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছি, নবী করীম (স) সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি শুধু কুরআন শোনাবার জন্য তাশরীফ এনেছিলেন—সম্পূর্ণ ভুল। কুরআন শুনাবার সাথে সাথে তিনি লোকদের কুরআন পড়াবেন ও শেখাবেন এবং তার সুপ্ত ও ইংগিতবহ বিষয়গুলো তার তাৎপর্য ও তার গোপন রহস্যাবলী বর্ণনা করবেন—এ কাজের জন্যও তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন, যেহেতু একাজে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই নিয়োজিত ছিলেন। তাই একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি উম্মতকে যা কিছু বলেছেন, শিখিয়েছেন এর সবটুকুই তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। বিস্ময়ের ব্যাপার এসব সুস্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক নামাযের সময় ও তার রাকায়াত ইত্যাদি সম্পর্কে অযথা বিতর্কের সৃষ্টি করে।

مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ এ শব্দগুলো করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশার্থে বলা হয়েছে। নিরক্ষর আরবদের প্রতি আল্লাহ তাআলার এটি ছিলো বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের সামনে দীন ও শরীআতের সেসব গোপন রহস্য উন্মোচিত করেন যা না তাদের নিকট উন্মোচিত ছিলো, না তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট, না অপর কারো নিকট। আর এ দয়া ও অনুগ্রহের স্বাভাবিক দাবি এটাই যে, তারা তার বিশেষ মূল্যায়ন করবে। বনী ইসরাঈলের ন্যায় এর অবমূল্যায়ন করবে না।

আয়াত ঃ ২৪০

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ج وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ج فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

বিধবার জন্য অসিয়তের সাময়িক নির্দেশ

ওপরে ২৩৪ আয়াতে বিধবা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এতদসংশ্লিষ্ট এ বাড়তি নির্দেশটি উপরোক্ত আয়াতেরই অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্ত্রীদের রেখে যেসব স্বামী মারা যায় তারা তাদের বিধবাদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণ এবং নিজেদের গৃহে বসবাসের অনুমতি দানের জন্য অসিয়ত করে যাবে। এর মধ্যে যদি বিধবা স্বেচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করে এবং নিজের দ্বিতীয় বিয়ে কিংবা বসবাসের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে এ অধিকার তার রয়েছে। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের অসিয়ত-পরিপন্থী কিছু করার অধিকার নেই।

এ অসিয়তের নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতগুলো যে সময় নাযিল হয় তখন পর্যন্ত মীরাসের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ অধ্যায়ের শুরুতে (আয়াত ঃ ১৮০) পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যও অসিয়তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে আমি বলেছি। এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিলো সাময়িকভাবে—যতদিন না সূরা নিসার উত্তরাধিকার আইন সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ আইনের অধীনেই বিধবাদের সম্পর্কেও এ হেদায়াত দেয়া হলো যে, তাদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণ ও বসবাসের অসিয়ত করে যাবে। পরবর্তীতে উত্তরাধিকার আইন যখন চালু হয়ে গেলো এবং মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিসদের ন্যায় বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীদের অংশও শরীআত কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়ে গেলো, তখন পিতামাতা ও অন্যান্য ওয়ারিসদের ব্যাপারে যেমন অসিয়তের উপরোক্ত নির্দেশ রহিত হয়ে যায় তেমনি বিধবাদের ক্ষেত্রেও তা বাতিল হয়ে যায় এবং উত্তরাধিকারের স্বতন্ত্র বিধান তার স্থান দখল করে নেয়।

যদি এ আয়াতটি ওপরে উল্লেখিত ২৩৪ আয়াতের সাথে হতো যাতে বিধবার ইদ্দতকাল উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে বর্ণনার ধারাবাহিকতা বুঝতে কারো অসুবিধা হতো না। কিন্তু তখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হতো না যে, এ আয়াত প্রথম নির্দেশের পরে সেই নির্দেশেরই ব্যাখ্যা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ বিভিন্ন নির্দেশের ক্রমধারা ও তার যৌক্তিকতা বুঝার জন্য এ জিনিসটি আবশ্যক। এই যৌক্তিকতার কারণে এ আয়াত ও তার সাথের আয়াতকে অধ্যায়ের শেষে স্থান দেয়া হয়েছে। এবং এটা ইংগিত করা হয়েছে যে, এটি পরবর্তীতে নাযিলকৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ।

عَزِيْزٌ وَحَكِيْمٌ -“আযীয এবং হাকীম” এ গুণবাচক নাম দুটো আইন তৈরীর অধিকার আল্লাহর এবং তার আইন বিজ্ঞানময় এর প্রতি ইংগিত করছে এবং এ আইনের বিরোধিতাকারীর পরিণাম সম্পর্কেও। ইসলামে গোটা দীন ও শরীআত এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধের ভিত্তি আল্লাহর গুণাবলীর ওপরই। সুতরাং কোনো ক্ষেত্রেই একে শুধুমাত্র কবিতার পংক্তি হিসেবে মনে করা উচিত নয় বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর ওপর ইসলামের আইন দর্শন ও নৈতিক দর্শনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২৪১-২৪২

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত অধিকারের মর্যাদা

ওপরে বর্ণিত ২৩৬ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর শেষে এখানে তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। এবং একে মুত্তাকীদের ওপর একটি অধিকার বলে ঘোষণা করা হলো। যেসব অধিকার বিভিন্ন গুণ ও কর্মতৎপরতার সাথে সম্পর্কিত দুনিয়ার জীবনে তা কখনো কখনো আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। কিন্তু আল্লাহর নিকট এসব গুণের জন্য সেই অধিকারই মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি একটি বিষয় মু'মিন, মুহসিন (সদাচারণকারী) ও মুত্তাকীদের ওপর হক বা অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। হতে পারে ইসলামী আইন এ দুনিয়ায় এর বিরুদ্ধাচারণকারীদের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করলো না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, পরকালেও এর বিরোধিতার জন্য কোনো পরিণাম ভোগ করতে হবে না। আখেরাতে এসব অধিকার আদায় অথবা অনাদায়ের ভিত্তিতেই লোকদের ঈমান অথবা ইহসান কিংবা তাকওয়া মূল্যবান অথবা মূল্যহীন হিসেবে বিবেচিত হবে।

শেষ আয়াতে كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الاية অংশটি অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা—যেমন আমি অন্যান্য স্থানেও বলে এসেছি—এসব আয়াতের ধরন বা প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যার প্রতি كَذٰلِكَ শব্দটি ইংগিত করে। আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, এ ধরনের আয়াতাংশ সেসব আয়াতের শেষে যোগ হয় যা বিস্তৃত ব্যাখ্যা হিসেবে এবং যা সংশিষ্ট অধ্যায়ের মূল নির্দেশ বর্ণনা করার পর মানুষের মধ্যে প্রশ্ন অথবা অধিক অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি যারা বুঝতে চায় তারা বহুক্ষেত্রে এর দ্বারা মূল্যবান পথনির্দেশ লাভ করতে পারে। তাই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা উচিত।

কুরআন মজীদ (বর্ণনার ক্ষেত্রে) সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিস্তারিত, সংক্ষেপে বলার পর ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার পর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এই যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এতে শিক্ষণীয় অনেকগুলো দিক রয়েছে। তন্মধ্যে এটাও একটি দিক যে, এর ফলে দীন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা এর উপকারিতা ও উপযোগিতা এবং এর নির্দেশ ও বিভিন্ন অস্পষ্ট বিষয় বুঝার জন্য আমাদের বিবেক-বুদ্ধির লালন ঘটে। আল্লাহ তাআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে এ স্তরবিন্যাসের বিকাশ ঘটিয়ে আমাদেরকে সেই মূলতত্ত্বের প্রতি দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, দীনের ব্যাপারে আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি এবং আগামীতে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয় ও নানা পরিস্থিতিতে সেই মূলনীতিসমূহ থেকে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ উদ্ভাবন করতে পারি। এ মূলতত্ত্বের দিকেই ইংগিত করছে لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ শব্দগুলো।

www.pathagar.com

৭৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৪৩-২৫৩ আয়াত

পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু পরম্পরার প্রতি ইংগিত

এখানে খানিকটা পেছনে ফিরে বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে আবার নতুন করে স্মরণ করুন। ওপরে ৭৪ অনুচ্ছেদে আমি ইংগিত দিয়ে এসেছি যে, মূল আলোচনা হচ্ছিল বায়তুল্লাহর প্রসঙ্গ থেকে জিহাদ ও আল্লাহর পথে ব্যয় সম্পর্কে। কিন্তু আল্লাহর পথে ব্যয়ের আলোচনা সামনে এনে দিলো ইয়াতীমদের সুযোগ-সুবিধা এবং তাদের মায়েদের বিয়ের প্রশ্নটি। এমনি করে বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত কিছু সময়োপযোগী মাসয়ালা বর্ণনারও একটি উপলক্ষ সৃষ্টি হয়ে গেলো। কুরআনের নীতি হচ্ছে এটাই যে, যখন কোনো মাসয়ালা বর্ণনা করার উপলক্ষ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন মূল আলোচনার ধারা স্থগিত করে উক্ত মাসয়ালার সাথে সম্পর্কিত এতটুকুন কথা বলে দেয় যতটুকুন তখনকার অবস্থা দাবি করে। অতপর মূল আলোচনার ধারা শুরু হয়ে যায়। সুতরাং এখানেও একই রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। বিয়ে ও তালাকের সাথে সম্পর্কিত কিছু সময়োপযোগী মাসয়ালা বর্ণনা করার পর পুনরায় জিহাদ ও আল্লাহর পথে ব্যয় সম্পর্কিত মূল আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।

পরবর্তী বিষয়বস্তুসমূহের সারসংক্ষেপ ও তার বিন্যাস

পরবর্তী আলোচ্য বিসয়সমূহের বিন্যাস এরূপ ঃ প্রথমে বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা সংখ্যায় অনেক হওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের ভয়ে স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। আর এভাবে তারা নিজেদের জন্য চারিত্রিক ও রাজনৈতিক মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। এ ঘটনার দিকে ইংগিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা যে, তারা মক্কা থেকে মদীনায় যে হিজরত করেছে তা মৃত্যু এবং শত্রু থেকে পলায়ন নয় বরং কুফর ও ফিৎনা (শিরক) থেকে পলায়ন। এর মূল উদ্দেশ্য প্রাণ রক্ষা করা নয় বরং আল্লাহর দীনের সাহায্য ও তার পথে জিহাদের জন্য সংগঠিত হওয়া।

এ ভূমিকা প্রদানের পর মুসলমানদেরকে জিহাদ ও ইনফাক অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের সেই লড়াই সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আকারে আলোকপাত করা হয়েছে। যা তাদের সেখানে হুবহু সেই উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো যে উদ্দেশ্যে এখানে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরাও এ যুদ্ধে লড়েছিলো তাদের কিবলাকে মুক্ত করার জন্য। আর মুসলমানরাও নিজেদের কিবলাকে মুক্ত করার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

বনী ইসরাঈলগণ নিজেদের সেই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো তা ছিলো অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তাই মুসলমানদেরকে—যারা ঠিক একই পর্যায় অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো—তাদের অতীত কাহিনীর এ অংশটি শুনিয়ে দেয়া জরুরী ছিলো, যাতে করে মুসলমানরা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং

সেসব বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মুখে আসতে পারে।

তারপর কয়েকটি আয়াতে নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করে একথাটি বলে দেয়া হয়েছে যে, এ অতীত ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য কাহিনীর অবতারণা করা নয় বরং ঠিক এমন ধরনের কিছু ঘটনা তোমার সামনেও ঘটবে এবং এর মাধ্যমে তোমার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু বনী ইসরাঈল স্বয়ং নিজেদের আয়নায় তোমার ছবি প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও একইভাবে নিজেদের হঠকারিতা ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে অটল থাকবে। সুতরাং তাদের বিরোধিতার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা তোমার সাহায্য করবেন। এবার এ আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَّن ذَا الَّذِي
يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ
مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا
مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ

www.pathagar.com

لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنّٰى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ
مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ
اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ
مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ
قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ
لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهٗ مِنِّيْٓ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ
إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ
كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ مَعَ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ
بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ

الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾ تِلْكَ
الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَأَيَّدْنٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
مَا اقْتَتَلُوا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা সংখ্যায় হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন, যাও। মরো গিয়ে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করলেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. এবং তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো। আর একথা ভালভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। ২৪৫. কে আছে তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? আল্লাহ তাকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলাই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। এবং তার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. তুমি কি বনী ইসরাঈলের নেতাদের দেখনি যখন মূসার পরে তারা তাদের এক নবীকে বলেছিলো, আপনি আমাদের জন্য একজন আমীর (বাদশাহ) নিযুক্ত করুন যাতে আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি। নবী বললেন, এমনটি হবে না তো যে, তোমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে দেয়া হলো, তখন আর তোমরা জিহাদ করবে না। তারা বললো, এটা কেমন কথা। কেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবো না অথচ আমাদেরকে নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ঘরবাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তারপর যখন তাদের ওপর জিহাদ ফরয করে দেয়া হলো, তখন তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লাহ যালিমদেরকে খুব ভালোভাবে জানেন। ২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে আমীর নিযুক্ত

www.pathagar.com

করেছেন। তারা বললো, আমাদের ওপর তার কর্তৃত্ব কেমন করে হতে পারে? যখন আমরা তার চেয়ে এ কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং সম্পদের প্রাচুর্যও তার নেই। নবী বললেন, আল্লাহ তোমাদের নেতা হিসেবে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও দেহ উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে যাকে চান কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ বিরাট প্রাচুর্যের অধিকারী এবং মহাজ্ঞানী। ২৪৮. তাদের নবী তাদেরকে (আরো) বললেন, তার কর্তৃত্বের নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে, যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রশান্তির সামগ্রী এবং মূসা পরিবার ও হারুন পরিবারের পরিত্যক্ত স্মৃতিচিহ্ন। সিন্দুকটি ফেরেশতারা বহন করে আনবে। এতে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

২৪৯. তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো তখন সে বললো, আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন যে তা থেকে (পানি) পান করবে সে আমার সাথী নয়। আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে নিসন্দেহে আমার সাথী হবে। তবে কেউ নিজের হাতে এক-আধ চুমুক পানি পান করতে চাইলে করতে পারে। তখন তারা তা থেকে খুব করে (পানি) পান করলো তদের মধ্যে শুধু সামান্য কিছু লোক এ থেকে বেঁচে থাকলো। তারপর তালুত এবং তার সাথী যারা ঈমানের ওপর অবিচল ছিলো যখন নদী পার হয়ে গেলো তখন এরা বললো, এ মুহূর্তে যালুত ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই? যারা এ ধারণা পোষণ করতো যে, আমাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে তারা উৎসাহের সাথে বললো, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রয়েছে যারা আল্লাহর হুকুমে বড় বড় দলের ওপর জয়লাভ করেছে। আল্লাহ তো দৃঢ়ভাবে অবস্থানকারীদের সাথে থাকেন। ২৫০. যখন যালুত ও তার সেনা দলের সাথে তাদের মোকাবেলা হলো তখন তারা দোয়া করলো হে আমাদের রব! আমাদের ঢালাওভাবে ধৈর্য দান করো। আমাদের কদম সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। ২৫১. তখন আল্লাহর হুকুমে তারা তাদেরকে পরাজিত করলো এবং দাউদ যালুতকে হত্যা করলো। আল্লাহ তাঁকে বাদশাহী এবং প্রজ্ঞা দান করলেন এবং যা কিছু তিনি তাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ তাআলা যদি এভাবে একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে গোটা পৃথিবী ফিতনা-ফাসাদে ভরে যেতো। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

২৫২. এসব আল্লাহর আয়াত যা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। আর নিসন্দেহে তুমি আল্লাহর রাসূলদের অন্তরভুক্ত। ২৫৩. এ রাসূলগণের মধ্যে আমি একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তাদের পরবর্তীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন লাভ করার পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু তারা বিরোধে লিপ্ত হলো। ফলে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান আনলো আর কিছু কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হতো না। কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

৭৯. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৪৩

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

اَلَمْ تَرَ শব্দ দ্বারা সম্বোধনের ধরন

اَلَمْ تَرَ শব্দের সম্বোধন একবচনের জন্য হওয়া জরুরী নয়। বরং এটা সাধারণত বহুবচনের জন্য ব্যবহার হয়। যেমনটা উস্তাদ ইমাম ফারাহী সূরা ফিলের তাফসীর করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এদ্বারা সম্বোধিত গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক করে সম্বোধন করা বুঝায়। অতপর যে ঘটনার উল্লেখ করা হয় তা হয়ত সম্বোধনকৃত লোকদের চোখের দেখা হবে কিংবা ঘটনাটি এতটা প্রসিদ্ধ যে, ধারণা করা যায়, যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা সে সম্পর্কে অবগত অথবা তাদের অবগত থাকা উচিত। কিংবা বক্তার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, ঘটনাটির সত্যতা এতটা স্বীকৃত যে, এ সম্পর্কে কারো সন্দেহের অবকাশ নেই।

'মউত ও হায়াত' শব্দদ্বয়ের মর্মার্থ

মউত শব্দটি সম্পর্কে এ সূরার ৫৬ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি লিখেছি যে, কুরআন মজীদে এ শব্দটি যেমন জীবনাবসান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি নিদ্রা, অচৈতন্য এবং চারিত্রিক ও ঈমানী মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে আমি লিসানুল আরব (আরবী অভিধান)-এর উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এখানে কুরআনের কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন ঃ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا - زمر : ٤٢– "আল্লাহ প্রাণগুলোকে হরণ করেন, তাদের নিদ্রাকালীন সময়ে।"–সূরা আয যুমার ঃ ৪২ ; ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - البقرة : ٥٦– "অতপর তোমরা অচেতন হয়ে পড়ার পর আমি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত (সচেতন) করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো "–সূরা

www.pathagar.com

আল বাকারা ঃ ৫৬ ; اِنَّكَ لَاتَسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ - نمل : ٨٠ -"তুমি তোমার আহবান মৃতমনা ও বধিরদেরকে শোনাতে পারবে না।"–সূরা আন নামল ঃ ৮০ ; اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ - الانعام : ١٢٢ –"যে ছিলো মৃতমনা অতপর আমি তাকে ঈমানী জীবন দান করেছি এবং তাকে হেদায়াতের আলো প্রদান করেছি। যাকে সম্বল করে সে লোকদের মাঝে চলাফেরা করে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১২২।

এমনিভাবে 'হায়াত' শব্দটিও পার্থিব জীবন থেকে নিয়ে নিদ্রা থেকে জাগরণ, ঈমানী ও আখলাকী জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত তো সূরা আন'আমের পূর্বোক্ত আয়াতেই বর্তমান রয়েছে। দ্বিতীয় স্পষ্ট দৃষ্টান্ত সূরা আনফালে লক্ষ করুন ঃ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ - الانفال : ٢٤ -"আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে সেই জিনিসটির দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২৪

"যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলো"-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার স্বরূপ

এ আয়াতে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হচ্ছে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের সেই অধ্যায় যার উল্লেখ রয়েছে হযরত সামুয়েল নবীর সহীফায়।[১] সামুয়েল নবীর আগমনের প্রাথমিক যুগে বনী ইসরাঈলরা দারুণ বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যে নিপতিত ছিলো, সামুয়েল পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে যদিও সে সময় তারা সংখ্যার দিক থেকে তিন লাখেরও অধিক ছিলো। কিন্তু বেদআত ও শিরকের সর্বব্যাপী প্রভাবের কারণে তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো এবং সামাজিক সংগঠনের অনুপস্থিতির দরুন রাজনৈতিক অবস্থাও ছিলো চরমভাবে বিপর্যস্ত। চারদিক থেকে চলছিল শত্রুদের হামলা। শত্রুর ভয়ে তারা এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলো যে, কারো সাথে মোকাবেলা করার সাহস তারা পেতো না। বিশেষ করে ফিলিস্তিনীরা তাদেরকে ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিলো। তারা তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাইকারীভাবে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহর সেই সিন্ধুকটি ছিনিয়ে নেয়। যার মর্যাদা ছিলো তাদের নিকট কিবলার সমতুল্য। যাকে তারা তাদের সমস্ত ইবাদাত ও যাবতীয় অভিযানে অগ্রভাগে স্থান দিতো। তাদের ভয়ে বনী ইসরাঈলরা 'আকরুন' থেকে 'জাত' পর্যন্ত তাদের সবক'টি শহরও খালি করে দিয়েছিলো।[২] ভয় ও কাপুরুষতার এ মৃত্যু তাদের ওপর বিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো।[৩] এরপর সামুয়েল নবী তাদের মধ্যে সংশোধন ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন। তাদেরকে শিরক্ ও বেদআত থেকে তাওবা করে এবং নিজেদের বিশৃংখল অবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন করে সংঘটিত ও ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। তার এ

১. শমূয়েল, অধ্যায় ১১ ঃ ৯ ২. শমূয়েল, অধ্যায় ৭ ঃ ১৪ ৩. শমূয়েল অধ্যায় ৭ ঃ ২।

www.pathagar.com

আহ্বানকে আল্লাহ্ তাআলা সফলতা দান করেন। বিশ বছরে মৃত প্রায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে নতুন করে ঈমানী ও রাজনৈতিক জীবনের গতি সঞ্চারিত হলো। ফিলিস্তিনীদের মোকাবেলায় দাঁড়াবার এবং যে শহরগুলোকে তারা নিজেরা খালি করে দিয়ে পালিয়েছিলো তা পুনরুদ্ধার করার-যোগ্যতা তারা অর্জন করলো।

সামুয়েল পুস্তিকায় এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখানে আমি তার কিছু প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি। এতে আমার উল্লিখিত ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

ফিলিস্তিনীদের কর্তৃক বনী ইসরাঈলের আতংকগ্রস্ত থাকা। তাদের হাতে বনী ইসরাঈলদের গণহত্যা এবং আল্লাহর সিন্দুক ছিনতাই হওয়ার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

"তখন পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিলেন, এবং ইস্রায়েল আহত হইয়া প্রত্যেক জন আপন আপন তাম্বুতে পলায়ন করিল। আর মহাসংহার হইল, কেননা ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ সহস্র পদাতিক মারা পড়িল। আর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইল, এবং এলির দুই পুত্র, হফ্নি ও পীনহস, মারা পড়িল।"–শমূয়েল পুস্তিকা, অধ্যায় ঃ ৪ ঃ ১০-১১

আল্লাহর সিন্দুক ছিনতাইয়ের যে প্রভাব বনী ইসরাঈলের ওপর পড়েছিলো তার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

"যে সংবাদ আনিয়াছিল, সে উত্তর করিল, ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে, আবার লোকদের মধ্যে মহাসংহার হইয়াছে ; আবার আপনার দুই পুত্র হফ্নি ও পীনহসও মরিয়াছে, এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছে। তখন সে ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবামাত্র এলি দ্বারের পার্শ্বে আসন হইতে পশ্চাতে পতিত হইলেন ; এবং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি মরিয়া গেলেন, কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্রবধূ, পীনহসের স্ত্রী, গর্ভবতী ছিল, প্রসবকাল সন্নিকট হইয়াছিল ; ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছে, এবং তাহার শ্বশুর ও স্বামী মরিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া সে নত হইয়া প্রসব করিল ; কারণ তাহার প্রসব বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাহার মরণ সময়ে যে স্ত্রীলোকেরা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কহিল, ভয় নাই, তুমি ত পুত্র প্রসব করিলে। কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, কিছুই মনোযোগ করিল না। পরে সে বালকটীর নাম ঈখাবোদ [হীনপ্রতাপ] রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল হইতে প্রতাপ গেল ; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছিল, এবং তাহার শ্বশুরের ও স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। সে কহিল, ইস্রায়েল হইতে প্রতাপ গেল, কারণ ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছে।"–শমূয়েল, অধ্যায় ৪ ঃ ১৭-২২

এ ঘটনার পর দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের ওপর যে ভীতি, কাপুরুষতা এবং শোক ও মাতমের যে মৃতবৎ অবস্থা ছেয়ে গিয়েছিলো এবং তারপর সামুয়েল নবী তাদের মাঝে সংশোধন ও সংস্কারের যে আওয়াজ তুলেছিলেন তার উল্লেখ এভাবে এসেছে ঃ

www.pathagar.com

"সদাপ্রভুর সিন্দুক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে স্থাপন দিনাবধি দীর্ঘকাল গেল, বিংশতি বৎসর গেল, আর সমস্ত ইস্রায়েল-কুল সদাপ্রভুর পশ্চাতে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাতে শমূয়েল সমস্ত ইস্রায়েল-কুলকে কহিলেন, তোমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস, তবে আপনাদের মধ্য হইতে বিজাতীয় দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর কর, ও সদাপ্রভুর দিকে আপন আপন অন্তঃকরণ সুস্থির কর, কেবল তাঁহারই সেবা কর ; তাহা হইলে তিনি পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। তখন ইস্রায়েল সন্তানগণ বাল দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর করিয়া কেবল সদাপ্রভুর সেবা করিতে লাগিল। পরে শমূয়েল কহিলেন, তোমরা সমস্ত ইস্রায়েলকে মিস্পাতে একত্র কর ; আমি তোমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব। তাহাতে তাহারা মিস্পাতে একত্র হইয়া জল তুলিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে ঢালিল, এবং সেই দিবস উপবাস করিয়া সে স্থানে কহিল, আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আর শমূয়েল মিস্পাতে ইস্রায়েল সন্তানগণের বিচার করিতে লাগিলেন।"-শমূয়েল, অধ্যায় ৭ ঃ ২-৬

এভাবে সম্মিলিত তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনার এবং সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনীদের মুকাবিলায় দাঁড়াবার এবং তাদেরকে পরাজিত করে তাদের থেকে নিজেদের ছিনিয়ে নেয়া শহর ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার যোগ্যতা লাভ করলো। বনি ইসরাঈলদের এই নব জীবন লাভের উল্লেখ এভাবে এসেছে ঃ

"এবং শমূয়েল ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলেন ; আর সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর দিলেন। যে সময়ে শমূয়েল ঐ হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিলেন, তখন পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিকটবর্তী হইল। কিন্তু ঐ দিবসে সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের উপরে মহাবজ্রনাদে গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন ; তাহাতে তাহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে আহত হইহল। আর ইস্রায়েল লোকেরা মিস্পা হইতে বাহির হইয়া পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া বৈৎ-করের নীচে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল। তখন শমূয়েল একখানা প্রস্তর লইয়া মিস্পার ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিলেন, এবং এ পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহার নাম এবন-এষর [সাহায্যের প্রস্তর] রাখিলেন। এই প্রকারে পলেষ্টীয়েরা নত হইল, এবং ইস্রায়েলের অঞ্চলে আর আসিল না। আর শমূয়েলের সমস্ত কালে সদাপ্রভুর হস্ত পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ছিল। আর পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল হইতে যে সমস্ত নগর হরণ করিয়াছিল, ইক্রোণ অবধি গাৎ পর্য্যন্ত সেই সকল পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের হাতে ফিরিয়া আসিল ; এবং ইস্রায়েল সেই সমস্তের অঞ্চল পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল।"

–শমূয়েল, অধ্যায় ৭ ঃ ৯-১৪

আমাদের মতে বনী ইসরাঈলে ইতিহাসের এ অংশটির দিকেই আলোচ্য আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য ভীত ও কাপুরুষোচিত জীবন বেছে নিলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমানী ও আখলাকী মৃত্যুর হাতে সোপর্দ

করে দিলেন—যা তিনি প্রকাশ করলেন مُوتُوا (যাও মর গিয়ে) শব্দটির মাধ্যমে। এ ব্যাপারটি হুবহু আল্লাহর সেই শাশ্বত নীতি মোতাবেক ঘটেছে যা فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে অর্থাৎ যখন তারা গোমরাহীকে পসন্দ করলো তখন আল্লাহ তাদেরকে বিপথগামী করে দিলেন। অতপর যখন তাদের মধ্যে সংস্কার ও দীনের পুনর্জাগরণের দাওয়াত উত্থিত হলো এবং তারা নতুন করে ঈমান ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নিলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে নতুন জীবন ও চেতনাবোধ জাগ্রত করলেন। এ বিষয়টিকে এখানে ثُمَّ اَحْيَاهُمْ (অতপর তাদেরকে জীবন দান করলেন) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতির সাথে আল্লাহর আচরণ এ মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। যখন কোনো জাতি অবমাননা ও ব্যর্থতাকে নিজেদের জন্য পসন্দ করে তখন আল্লাহ তাদেরকে অপমান ও ব্যর্থতার হাতে সোপর্দ করে দেন। আর যদি কোনো জাতি উন্নতি ও উচ্চমর্যাদা লাভের আকাজ্ক্ষা হয় এবং সে আকাজ্ক্ষার যা দাবী তা পূরণ করার সাহস দেখায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং এ মর্যাদা দানের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করেন।

ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য

এ ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের বিশেষ করে দুর্বল মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদ ও অর্থব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করা। বস্তুত এটি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ভূমিকা, আমরা ভূমিকা অনুচ্ছেদে ইংগিত দিয়ে এসেছি যে, বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটিও তাদের কিবলাহর যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। আর মুসলমানদেরকেও এখানে যে যুদ্ধ ও যে ব্যয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে তার সম্পর্কও মূলত কিবলাহকে মুক্ত করার সাথেই, উভয়ের মাঝে মর্যাদার অভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বস্তুত মুসলমানদের সামনেও এ সময় জীবন মৃত্যু উভয় পথ উন্মুক্ত রয়েছে। যদি তারা মৃত্যুকে ভয় পায় তবে মনে রাখতে হবে কোনো কিছুই তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অপমান, লাঞ্ছনা ও মুনাফিকীর মৃত্যু তাদের ওপর এসে পড়বেই। আর যদি তারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জীবনের পথে অগ্রসর হবার জন্য উঠে দাঁড়ায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় ঈমান ও ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ জীবন এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সফলতার জীবন দানে ভূষিত করবেন।

আয়াত ঃ ২৪৪

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

জিহাদের জন্য দুটি প্রেরণাদায়ক বিষয়

ওপরের ঐতিহাসিক ভূমিকার পর এখানে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং এ উদ্বুদ্ধ করণের জন্য দুটি প্রেরণাদায়ক বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হচ্ছে, এ জিহাদ আল্লাহর পথে। প্রবৃত্তি বা শয়তানের পথে নয়। সুতরাং এতে

www.pathagar.com

প্রতিটি পদক্ষেপে বান্দাহর সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ততা থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। তোমাদের বীরত্ব ও কুরবানী, তোমাদের আবেদন ও ফরিয়াদ, তোমাদের শত্রুদের চালবাজী ও ষড়যন্ত্র সব তাঁর জানা। সুতরাং এমনটা ভাববার কোনো অবকাশ নেই যে,

مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی

(আমরা মরে গেলাম তারা জানতেই পারলো না।)

উল্লেখ্য যে, এসব গুণবাচক নামের উদ্ধৃতি দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ যখন শোনেন এবং জানেন তখন এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাদের ডাক শুনে তোমাদেরকে প্রদান করবেন।

আয়াত ঃ ২৪৫

مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

আল্লাহর পথে ব্যয়ের অর্থে ঋণ শব্দের ব্যবহার

জান কুরবানীর আহবানের পর এটি হচ্ছে মাল কুরবানীর আহ্বান। এবং এজন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা অতীব মর্মস্পর্শী। প্রথমত, প্রশ্নের এ ধরনটাই "কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণ দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে।" অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। আবার এখানে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে "ঋণ দান" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধ করা ঋণ গ্রহীতার ওপর ওয়াজিব। আর পরম দয়ালু প্রতিপালকের এটা কত বড় অনুগ্রহ যে, যে মাল তিনি স্বয়ং বান্দাহদেরকে দান করেছেন সে মালই যখন তাঁর পথে ব্যয় করতে বলেন তখন তাকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে আখ্যা দেন। অর্থাৎ তা ফেরত দেয়াটা নিজের ওপর ওয়াজিব করে নেন, অতপর অন্তরাত্মাকে হতচকিত করে দেয়ার মত আরো বড় একটি কথা বলা হলো যে, মহান রাব্বুল আলামীন এ ঋণ এ উদ্দেশ্যে চাচ্ছেন যে, তিনি বান্দাহর দেয়া নগণ্য বস্তুকে অনেক গুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তাকে বৃদ্ধি করে এক চিরস্থায়ী কোষাগারের আকারে ফেরত দেবেন। অর্থাৎ এ ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন এজন্যে পড়েনি যে, আল্লাহর কোষাগারে কোনোরূপ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তার ধনভাণ্ডার সদা ভরপুর এবং তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া। অবশ্য তাঁর অপার কৃপায় স্বীয় বান্দাহদের জন্য এ পথটি খুলে দিয়েছেন যে, বান্দাহ ইচ্ছা করলে একটি ব্যয় করে দশ থেকে এক শ' গুণ পর্যন্ত তার বিনিময় লাভ করতে পারে।

'কর্জে হাসান'-এর মর্মার্থ

এ কর্জ সম্পর্কে শুধু একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর তাহলো এ কর্জ "কর্জে হাসান" হতে হবে। কর্জে হাসান-এর মর্মার্থ কুরআনের অন্যান্য স্থান থেকে যা পাওয়া

www.pathagar.com

যায় তা হচ্ছে সংকীর্ণ মন নিয়ে শুধুমাত্র দুর্নাম ঘুচাবার জন্যে যেনো এটা না দেয়া হয় বরং পুরো প্রশস্ত হৃদয়ে উৎসাহের সাথে যেনো দেয়া হয়। লোক দেখানো এবং প্রদর্শনীর জন্য যেনো না দেয়া হয়। বরং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেনো দেয়া হয়। কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দ্যেশকে সামনে রেখে যেনো না দেয়া হয়। বরং একমাত্র পরকালের প্রতিদান লাভের আশায় দেয়া হয়। তারপর সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিকৃষ্ট, নিম্নমানের ও অবৈধ পন্থায় অর্জিত মাল থেকে যেনো না দেয়া হয়। বরং পসন্দনীয়, মানসম্পন্ন ও পবিত্র (হালাল) রোজগার থেকে যেনো দেয়া হয়। এ সূরাতেই পরবর্তীতে এসব কথা বিস্তারিত আসবে এবং বিভিন্ন হাদীসেও এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

অবশেষে প্রকৃত সূক্ষ্ম বিষয়টি আল্লাহ বলে দিলেন যে, অসচ্ছলতা এবং সচ্চলতা মানুষের নিজ চেষ্টা-তদবীরের উপর সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সুতারং যদি সে তার ধন-সম্পদ আল্লাহ থেকে বাঁচাতে এবং লুকোতে চায় তবে তার অর্থ হচ্ছে, সে তাঁর কাছ থেকেই লুকোতে চায়, দান করার পর ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতাও যার রয়েছে।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ঃ এতে এ দিকটিও বুঝানো হয়েছে যে, আজ যে লোকটি আল্লাহ থেকে মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে সে যেনো একথাটি ভুলে না যায় যে, কাল আল্লাহকে তো মুখ দেখাতেও হবে এবং এ দিকেও ইংগিত করা হয়েছে, যে পার্থিব জীবনের জন্য সে আল্লাহর সাথে কৃপণতা করছে, এ জীবন তো কয়েক দিনের। প্রকৃত জীবন তো হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সেই জীবনের জন্যই আসল ভাবনা হওয়া উচিত।

আয়াত ঃ ২৪৬

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

مَلَاءٌ শব্দের বিশ্লেষণ

مَلَاءٌ মূল আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পূর্ণ করা। এ অর্থ থেকে ক্রমে এ শব্দটি কোনো জাতির ভদ্র, সম্মানিত, প্রবীণ ও নেতৃতস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কারণ এটা হতে পারে যে, জাতির ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিরাই তো তাদের বৈঠকখানা, মজলিস, কাউন্সিল এবং তাদের দরবারসমূহকে পূর্ণ করে।

www.pathagar.com

مَلِكْ শব্দের মর্মার্থ

مَلِكْ শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একচ্ছত্র ও হতে পারে, যেরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকে স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহগণ। আবার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ধরনেরও হতে পারে। যেমন একজন আইন-কানুনের অনুবর্তী কিংবা শরীআতের অনুসারী বাদশাহ অথবা কোনো বাহিনী প্রধান অথবা সিপাহসালার যা লাভ করে থাকে। কুরআনে এ শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে পারিপার্শিকতা প্রমাণ করে যে, শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তার নিযুক্তির জন্য বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই আবেদন করেছিলো সে যুগের নবীর (সামুয়েল) নিকট এবং তাঁরই অনুমোদনক্রমে তার (তালুতের) নিযুক্তি হয়েছিলো, তাওরাতের ব্যাপক ও বিস্তারিত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁরই নির্দেশাবলীর অধীনে[১] এবং তাঁরই আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে সে তার যাবতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতো। কুরআন এ শব্দটি (অর্থাৎ مَلِكْ) প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। সেও একজন বাদশাহ ছিলো যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে এবং যে জীবন ও মৃত্যু উভয়ের ওপর ক্ষমতার দাবি করে কুরআন তার নিন্দা করেছে। পক্ষান্তরে যুলকারনাইন, হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)ও বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু কুরআন তাঁদের প্রশংসা করেছে। এতে বুঝা যায়, কুরআনের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আসল গুরুত্ব তার আকৃতির নয় বরং তার প্রকৃতি ও চরিত্রের। যদি সে ব্যবস্থার চরিত্র আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের অধীন হয়ে থাকে তবে তা প্রশংসার যোগ্য—তার আকৃতি যাই হোক। যদি তার চরিত্র আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী হয়ে থাকে তবে তা নিন্দার যোগ্য—হোক তা রাজতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র।

২৪৬ আয়াতের শিক্ষা এবং ঘটনার ধরন

যেমনিভাবে ওপরের আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঈমানী ও আখলাকী মৃত্যু ও জীবন লাভের একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করে মুসলমানদেরকে জীবনের পথ অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, একজন আল্লাহর রাহে জান-মাল কুরবানী করার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। তেমনিভাবে এ আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে এ ধারারই কিছু ঘটনার দিকে ইংগিত করে মুসলমানদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে যেসব ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে তাওরাত অধ্যয়নে তা বিস্তারিত জানা যায়। সামুয়েল নবী[২] বনী ইসরাঈলের মাঝে সংস্কার ও সংশোধন ও তাদেরকে সংঘটিত করার যে কাজ শুরু করলেন, তাতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুটা হলেও প্রাণের সঞ্চার ঘটে এবং তারা ফিলিস্তিনীদের মুকাবিলায় দাঁড়াবার এবং তাদের হাত থেকে নিজেদের কিছু হারানো শহর পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয় ; কিন্তু বনী ইসরাঈল ছিলো সবদিক থেকে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাদের অনেকগুলো শহর তখনো ছিলো বিরোধী পক্ষের করতলগত।

১. শামূয়েল, অধ্যায় ঃ ১০ ঃ ২৫। ২. খৃষ্টপূর্ব ৮৮৯ সন।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনীদের ছাড়াও মু'আবনী 'আমুন, আদুম ও যুবাহ্-এর বাদশাহদের পক্ষ থেকেও সর্বদা তাদের ভয় ছিলো। এদিকে সামুয়েল নবী তখন বার্ধক্যে উপনীত। তিনি বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব ও তাদের সংগঠিত করার যে দায়িত্ব স্বীয় পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন সে বনী ইসরাঈলের আশানুরূপ তা সম্পাদন করতে সক্ষম হলো না। তাই তারা সামুয়েল নবীর কাছে এ আবেদন জানালো যে, তিনি যেনো তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন আমীর নিযুক্ত করেন যাতে করে তারা তার নেতৃত্বাধীন থেকে জিহাদ করতে পারে এবং নিজের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়।[১]

সামুয়েল নবী স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন, বনী ইসরাঈলের আসল দুর্বলতা এ নয় যে, যুদ্ধের ময়দানে দিকনির্দেশনা দেয়ার মত কোনো নেতা তাদের নিকট নেই। বরং তাদের প্রকৃত দুর্বলতা হচ্ছে যুদ্ধের ভয়াবহতা মুকাবিলা করার মত ঈমান ও সংকল্পের দৃঢ়তা তাদের মধ্যে নেই। যেমন তাওরাত থেকে জানা যায়—এ কারণে তিনি তাদের আবেদনের বিরোধিতা করলেন এবং তাদের প্রকৃত দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এমন হবে না তো যে, জিহাদও ফরয হয়ে গেলো, আমীরও নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু তোমরা জিহাদে অংশ নিতে অস্বীকার করে বসলে ? একথা শুনে তারা প্রচণ্ড আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললো, আমরা নিজেদের বাড়ী-ঘর ও পরিবার-পরিজন থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখনো যদি আমরা যুদ্ধ না করি তবে আর কখন করবো। কিন্তু সামুয়েল নবীর অনুমান সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হলো। তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাদের নেতৃত্ব দানের জন্য আমীরও নিযুক্ত করলেন এবং জিহাদেরও নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথা নুইয়ে দিলো। পরবর্তী বিশদ বর্ণনা থেকে জানা যাবে যে, প্রথমত নির্বাচিত নেতার নেতৃত্বের ব্যাপারেই তারা আপত্তি উথাপন করলো। অতপর আমীরের সাথে তার বাহিনীতে যোগ দিলেও পরীক্ষার শুরুতেই ব্যর্থতার প্রমাণ দিল।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ঃ "এবং আল্লাহ যালিমদেরকে খুব ভালো করে জানেন" দ্বারা এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যখন ভালোভাবেই জানেন তখন তাদের সাথে আচরণটাও তাঁর জানার ভিত্তিতেই করবেন।

আয়াত ঃ ২৪৭

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ط قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

১. শামুয়েল পুস্তিকা, অধ্যায় ঃ ৮ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

بَعَثَ শব্দের মর্মার্থ

بَعَثَ শব্দের অর্থ উত্থিত করা, উৎসাহিত করা, প্রেরণ করা। অতপর এ মর্মার্থ থেকেই শব্দটির মধ্যে "নিযুক্তি দান" অর্থটিও পাওয়া যাচ্ছে। এ সেনাপতির মনোনয়ন সামুয়েল নবী যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে করেছিলেন—যেমনটা তাওরাত থেকেও প্রমাণিত হয় এবং কুরআনের শব্দ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তার ক্ষেত্রে بَعَثَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

তালুত ও সাউল

'তালুত' হচ্ছে সেই মনোনীত সেনাপতির নাম। তাওরাতে তার নাম এসেছে শৌল এবং তার অস্বাভাবিক দৈহিক উচ্চতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "আর তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলে অন্য সকল লোক অপেক্ষা এক মস্তক দীর্ঘ হইলেন।"[১] হতে পারে তার এ অস্বাভাবিক উচ্চ গড়নের কারণে সে জনসাধারণের মাঝে এ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। তালুত শব্দের অর্থ হচ্ছে "অতিশয় লম্বা"। আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষা কাছাকাছি। এ কারণে উভয় ভাষায় অনেক শব্দের মূল ধাতু অভিন্ন। মনে হয় তাওরাত তাকে তার নামে উল্লেখ করেছে। আর কুরআন উল্লেখ করেছে উপাধি দিয়ে। নতুবা এটা মেনে নিতে হবে যে, তার নামের ব্যাপারে তাওরাতের বর্ণনা ভুল। তালুতই হচ্ছে তার প্রকৃত নাম। কুরআন এখানে অন্যান্য আরো কিছু ঘটনার ব্যাপারেও তাওরাতের বর্ণনার প্রতিবাদ করেছে। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে ইংগিত দেবো এবং এটাও স্পষ্ট করবো যে, এ ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা কেন প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

তালুতের মনোনয়ন ও এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের আপত্তি

বনী ইসরাঈলের দাবির প্রেক্ষিতে সামুয়েল নবী যখন একজন সেনাপতি মনোনীত করলেন এবং তাকে তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন তারা সানন্দে তাকে গ্রহণ করার পরিবর্তে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এ মনোনয়নের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললো এই বলে ঃ "আচ্ছা বলতো, এ লোকটি কি করে আমাদের নেতা হতে পারে, আমরাই তো হচ্ছি তার চেয়ে অধিকতর যোগ্য এ পদের?" তাদের আপত্তির ভিত্তি ছিলো এই যে, তালুত কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি নয়। তাছাড়া তালুত ছিলো বিন্ ইয়ামিনের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একে তো বিন ইয়ামিনের গোত্র ছিলো বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র গোত্র। আবার তালুত ছিলো এ গোত্রের পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পরিবারভুক্ত। তাওরাত থেকে জানা যায়, তালুত নিজেই তার গোত্রীয় দুর্বলতার দিকটা অনুভব করতো। তাই সামুয়েল নবী তার মনোনয়নের বিষয়টা যখন তাকে বললেন তখন সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ কথাগুলো উচ্চারণ করলো ঃ

১. শামুয়েল-১, অধ্যায় ১০ ঃ ২৪

"শৌল উত্তর করিলেন, আমি কি ইস্রায়েল বংশ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম বিন্যামীন বংশীয় নহি ? আবার বিন্যামীন বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী কি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নয়?"১-শামূয়েল অধ্যায় ৯ ঃ ২১

এটা পরিষ্কার যে, জনবল ও অর্থ-সম্পদ উভয় দিক থেকে দুর্বল একজন লোককে বনি ইসরাঈলের মত একটি গোত্র কিভাবে মেনে নিতে পারে যাদের ছিলো দোর্দন্ড গোত্রীয় আভিজাত্য ও অঢেল সম্পদের অহংকার। সুতরাং তারা এ মনোনয়নের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললো, তাওরাতে এ বিষয়ে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

"কিন্তু পাষণ্ডেরা কেহ কেহ বলিল, এই ব্যক্তি আমাদিগকে কিরূপে নিস্তার করিবে ? তাহারা তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দর্শনীয় দিল না ; তথাপি তিনি বধিরের ন্যায় থাকিলেন।"[২]

"পরে লোকেরা শমূয়েলকে কহিল, কে বলিয়াছে শৌল কি আমাদের উপরে রাজা হইবে ?"[৩]

আপত্তির জবাব

এ আপত্তির জবাব সামুয়েল নবী এভাবে দিয়েছেন যে, এ মনোনয়ন আল্লাহর মনোনয়ন। তিনিই তাকে তোমাদের নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা নেতৃত্বকে সংখ্যা ও সম্পদের পাল্লায় পরিমাপ কর। কিন্তু আল্লাহ ইল্‌ম ও আমলের পাল্লায় পরিমাপ করেন। তালুতের নিকট যদিও বংশীয় আভিজাত্য ও সম্পদের প্রাচুর্য নেই। কিন্তু জ্ঞানের প্রাচুর্য ও আমলের শক্তিতে সে পরিপূর্ণ। আর আল্লাহর মনোনয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোই প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ—বংশ বা সম্পদ নয়।

তারপর বলা হয়েছে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর উপহার। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে দান করেন, যৌক্তিক কারণেই দান করেন। তার ক্ষমতা আবেষ্টন করে আছে সব ক্ষমতাকে এবং তার জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। দান করার জন্য তার নিকট না কোনো কমতি রয়েছে, না দান করার পর ফেরত নিতে কোনো বাধা আছে, না কোনো বিষয়ের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অথবা তার অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো দিক তার কাছ থেকে গোপন আছে।

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ বাক্যটিতে একথার প্রতিও ইংগিত রয়েছে যে, তোমরা প্রতিটি বস্তুকে নিজেদের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে থাক। কিন্তু আল্লাহ তার ফায়সালা স্বীয় কুদরত ও জ্ঞানের আলোকে ঘোষণা করে থাকেন।

আয়াত ঃ ২৪৮

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১. শামূয়েল-১, ৯ ঃ ২১। ২. শামূয়েল, অধ্যায়, ১০ ঃ ২৭। ৩. শামূয়েল, অধ্যায় ১১ ঃ ১২

www.pathagar.com

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

তাবুতের মূল তত্ত্ব

"তাবুত" শব্দের অর্থ হচ্ছে সিন্দুক। এখানে এর অর্থ বনী ইসরাঈলের সেই সিন্দুক যাকে তাওরাতে আল্লাহর সিন্দুক অথবা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সিন্দুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগের সময় থেকে বাইতুল মাকদাসের নির্মাণ পর্যন্ত এ সিন্দুকটি বনী ইসরাঈলের কিবলার মর্যাদা লাভ করেছিলো, তারা একে নিজেদের ইবাদাতখানায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ যত্নের সাথে পর্দার মাঝখানে রাখতো এবং যাবতীয় উপাসনা ও আরাধনায় তারই দিকে নিবিষ্ট হতো। তাদের পুরোহিতরা অদৃশ্য পথ নির্দেশলাভের জন্যও তাকেই আশ্রয় স্থল মনে করতো। সমস্যার সমাধান, জাতীয় সংকট ও যুদ্ধের ময়দানেও বনী ইসরাঈলের মনোবল টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এ সিন্দুকটির বিরাট কার্যকর ভূমিকা ছিলো। হযরত মূসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত তো এতে তাওরাত এবং মরুভূমির জীবনকালীন সময়ের কিছু স্মৃতিগাঁথা সংরক্ষিত ছিলো। অতপর মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর আরো কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুও তাতে সংরক্ষণ করা হয়।

سَكِيْنَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ

سَكِيْنَةٌ-এর অর্থ হচ্ছে, প্রশান্ত, স্থিরতা ও মনোবল। বিশেষ করে সেই প্রশান্তি ও মনোবল যা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের কঠিন সময়ে লোকদেরকে সিদ্ধান্তের ওপর অটল রাখে। যেমন هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا ـ الفتح : ٤। –"তিনিই সেই সত্তা যিনি মু'মিনদের অন্তরে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি নাযিল করেন যাতে তারা নিজেদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি করতে পারেন।"–সূরা আল ফাতহ ঃ ৪ ; فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ الفتح : ١٨ –"তাদের অন্তরে যে দুর্বলতা ছিলো আল্লাহ তা বুঝে ফেললেন। তখন তাদের ওপর নাযিল করলেন দৃঢ়তা ও প্রশান্তি এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে ভূষিত করলেন।"–আল ফাতাহ ঃ ১৮। এ তাবুতের সাথে বনী ইসরাঈলের যে অন্ধ বিশ্বাস জড়িত ছিলো তার একটি বিশেষ দিক—যেমনটা আমিও পরে ইংগিত করেছি—এটাও ছিলো যে, বিপদ মুসিবত ও যুদ্ধের ময়দানে তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে অধিক। فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ দ্বারা এ বিশেষ দিকটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের মাঝে তাবুতের প্রত্যাবর্তন

ওপরে ফিলিস্তিনীদের কর্তৃক এ তাবুত ছিনতাই হওয়ার উল্লেখ আমি করেছি এবং এটাও বলেছি যে, এর ছিনতাই হওয়াকে বনী ইসরাঈলের প্রধান ব্যক্তিরা ইসরাঈল থেকে যাবতীয় মর্যাদা ও ঐশ্বর্য ছিনতাই হয়ে গেছে বলে মনে করেছে এবং গোটা জাতি এ বিরাট দুর্ঘটনার জন্য বিলাপ করেছে। তাই এ সময়ে এ তাবুতকে শত্রুদের কাছ থেকে ফেরত নেয়াটাই ছিলো বনী ইসরাঈলের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এ কারণেই সামুয়েল নবী বললেন, তালুতের মনোনয়ন যে খোদায়ী মনোনয়ন তার নিদর্শন হচ্ছে এই যে, এরপর সিন্দুকটি (তাবুত) ফেরেশতাদের সাহায্যে আপনা আপনিই তোমাদের নিকট চলে আসবে। অবশেষে তার এ ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হলো এবং ফিলিস্তিনীরা এ সিন্দুকটিকে একটি গাড়ীর ওপর রেখে বনী ইসরাঈলের এলাকার দিকে হাঁকিয়ে দিলো, সামুয়েল পুস্তিকায় তার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

"অতএব সম্প্রতি [কাষ্ঠ] লইয়া এক নূতন শকট নির্ম্মাণ কর, এবং কখনও যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমন দুইটী দুগ্ধবতী গাভী লইয়া সেই শকটে যুড়, কিন্তু তাহাদের বৎস, তাহাদের নিকট হইতে ঘরে লইয়া আইস। আর সদাপ্রভুর সিন্দুক লইয়া সেই শকটের উপরে রাখ, এবং ঐ যে স্বর্ণময় বস্তুগুলি দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহাকে দিবে, তাহা তাহার পার্শ্বে আধারে রাখ ; পরে বিদায় কর, তাহা যাউক। আর দেখিও, সিন্দুক যদি নিজ সীমার পথ দিয়া বৈৎ-শেমশে যায়, তবে তিনিই আমাদের এই মহৎ অমঙ্গল ঘটাইয়াছেন ; নতুবা জানিব, আমাদিগকে যে হস্ত আঘাত করিয়াছে সে তাঁহার নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি আকস্মিক ঘটনা হইয়াছে। লোকেরা সেইরূপ করিল; দুগ্ধবতী দুইটী গাভী লইয়া শকটে যুড়িল, ও তাহাদের বৎস দুইটী ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পরে সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং ঐ স্বর্ণময় মূষিক ও স্ফোটক প্রতিমাধারী আধার লইয়া শকটের উপরে স্থাপন করিল। আর সেই দুই গাভী বৈৎ-শেমশের সোজা পথ ধরিয়া চলিল, রাজপথ দিয়া হাম্বারব করিতে করিতে চলিল, দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না ; এবং পলেষ্টীয়দের ভূপালগণ বৈৎ-শেমশের অঞ্চল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন। ঐ সময়ে বৈৎ-শেমশ-নিবাসীরা তলভূমিতে গোম কাটিতেছিল ; তাহারা চক্ষু তুলিয়া সিন্দুকটী দেখিল, দেখিয়া আহলাদিত হইল।"

–শামূয়েল, অধ্যায় ৬ ঃ ৭-১৩

তাবুত বাহী গাড়িটি কোনো গাড়োয়ান ছাড়া এবং কোনো তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া, তাও আবার এমন গাভীর সাহায্যে যাদের দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাগুলো ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিলো, এমনিভাবে ডানে বামে মোড় না নিয়ে সোজা গন্তব্যে পৌছে যাওয়াটা এমন একটি ঘটনা যা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাদের সাহায্য ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই হতে পারে। এটাকে تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ শব্দদ্বয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

তাবুতের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনার বিভিন্নতা

তাবুতের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কুরআনের আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাবুতের প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি তখন সংঘটিত হয় যখন তালুত আল্লাহর নিযুক্ত বাদশাহ হিসেবে ঘোষিত হয়। আর এ ঘটনাটি ছিলো মূলত তালুতের আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার একটি নিদর্শন। সামুয়েল নবী আল্লাহর নির্দেশে তাকে মাসেহ করে বরকতময় করেন। তার নিযুক্তি হচ্ছে বনী ইসরাঈলের মাঝে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগ আর বিজয় ও সফলতার এক নব ইতিহাসের সূচনা।

তাওরাতের বর্ণনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা হচ্ছে এই যে, তালুত বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার অনেক আগেই তাবুতকে একটি গাড়ীর ওপর রেখে—যেমনটি ওপরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ রয়েছে—ফিলিস্তিনীরা গাড়ীটিকে বনী ইসরাঈলের এলাকার দিকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলো এবং তাবুত সম্পূর্ণ নিরাপদে তাদের নিকট পৌঁছে গিয়েছিলো। এভাবে ফেরত দেয়ার কারণ হিসেবে তাওরাতে বলা হয়েছে ফিলিস্তিনীরা তাবুত ছিনিয়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা একে যেখানেই রাখে সেখানেই ব্যাপক আকারে মহামারী দেখা দেয়। যার ফলে তাদের হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অবশেষে এতে বিরক্ত হয়ে তারা সাত মাস পর তাদের জ্যোতিষীদের পরামর্শক্রমে এ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ওপরে বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করে।

কুরআনের বর্ণনা সঠিক হওয়ার কারণসমূহ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ বর্ণনা দুটোর মধ্যে বর্ণনাগত দিক থেকে ও বিবেক-বুদ্ধির মাপকাঠিতে কোন্‌টি সঠিক ? আমাদের মতে নিম্নলিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে কুরআনের বর্ণনা সঠিক এবং তাওরাতের বর্ণনা ভুল।

প্রথম কারণ ঃ এসব ঘটনার বর্ণনা শেষে কুরআন বলেছে ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۭ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ البقرة : ٢٥٢ -“এসব আল্লাহর নিদর্শন যা আমি ঠিক ঠিকভাবে তোমাকে শোনাচ্ছি এবং নিসন্দেহে তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।”–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫২

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এ ঘটনাটি যে আঙ্গিকে সে পেশ করছে তা তাওরাতের বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। কিন্তু ঘটনার সঠিক রূপ তাই যেরূপে কুরআন পেশ করছে। তা নয়, যা তাওরাত পেশ করছে। তারপর এ বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রেসালাতের একটি প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন আসমানী কিতাবসমূহের যেসব কাহিনী জানার কোনো মাধ্যম তোমার কাছে নেই এবং এসব কাহিনী যে কোনো উদ্দেশ্যহীন গল্পগাঁথা নয় বরং অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও কল্যাণকর একথাগুলো সত্যতা সহকারে উপস্থাপন করা তোমার পক্ষে

www.pathagar.com

কোনো মতেই সম্ভব হতো না। যদি আল্লাহ তোমাকে রাসূল না বানাতেন এবং অহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত না করতেন।

একজন হঠকারী ব্যক্তি এটা বলতে পারে যে, এসব ঘটনা পেশ করতে গিয়ে কুরআনের বর্ণনা তাওরাতের বর্ণনা থেকে ভিন্নতর হওয়ার কারণ হচ্ছে তাওরাত সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর সরাসরি কোনো জ্ঞান ছিলো না। সে তো (নাউজুবিল্লাহ) শোনা কথা বলে বেড়াতো। এ কারণে তার বর্ণনা তাওরাত থেকে ভিন্নতর হতো। কিন্তু এ ধরনের কথা বলা কোনো মতেই সঠিক নয়। প্রথমত, যে শোনা কথা বলে তার কথা সাধারণ এবং প্রসিদ্ধ বর্ণনার অনুরূপ হয়ে থাকে। তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি শোনা কথা প্রচার করে সে কখনো পূর্ণ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে এ দাবি করে না যে, অমুক কথাটি যে তোমরা বলছো, এরূপ নয় বরং এরূপ বলার এ ভঙ্গি তো সেই অবলম্বন করে থাকে এবং সেই অবলম্বন করতে পারে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভিত্তিতে একটি বিষয়কে জানে এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা কিংবা তার পরিশুদ্ধি করতে চায়। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, বিষয়টি এমনই কুরআন সাউলের নামটিও শুদ্ধ করেছে। তাবুতের প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটিও আসল রূপে পেশ করেছে। আপনি লক্ষ করুন, নদী সংক্রান্ত পরীক্ষার সঠিক স্থানটিও নির্ণয় করেছে এবং তারপর বলে দিল, কুরআন যা বর্ণনা করেছে তা সঠিক। তাওরাতের বর্ণনা নয়।

দ্বিতীয় কারণ ঃ জ্ঞান ও যুক্তির নিরিখেও তাই সঠিক মনে হয় যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাওরাতের বর্ণনা থেকে তো এটা বুঝা যায় যে, তাবুতের প্রত্যাবর্তনটা ছিলো সম্পূর্ণরূপে খোদ তাবুতের অলৌকিক শক্তির ফল। ফিলিস্তিনীরা একে ছিনিয়ে নেয়ার পর থেকেই ক্রমাগত বিপদ-মুসিবতের শিকার হয়। তারা এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এটি যাদের জিনিস তাদরেকে ফেরত দেয়াই কল্যাণকর মনে করলো, তাই তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থেই ওপরে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বনী ইসরাঈলের মত দুর্বল আকীদা ও অলৌকিকত্বের পূজারী জাতির মানসিকতার সাথে এ বিষয়টি যেহেতু খুব কাছাকাছি ছিলো, তাই এটাকে তারা কাহিনী আকারে তৈরী করলো এবং এ জনবহুল বর্ণনাটি তাওরাত গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত করে দিলো। কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে এই যে, এত বড় বড় ঘটনা কি একটি জাতির জীবনে শুধু ছেলেখেলার মত ঘটতেই থাকে ? তাবুতের মর্যাদা ছিলো বনী ইসরাঈলের কিবলার ন্যায় তার ছিনতাই হওয়াটা যেমন কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা হতে পারে না তেমনি তার প্রত্যাবর্তনটাও কোনো সাধারণ ঘটনা হতে পারে না। এ ধরনের দুর্ঘটনা যদি ঘটে থাকে তবে তার কারণ এটাই হতে পারে যে, বনী ইসরাঈল তখন আমল ও আকীদাগত দিক থেকে এতটা গোমরাহীতে ডুবে ছিলো, যার ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছিলো, আর তারা যদি সিন্দুকটিকে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে সফল হয়ে থাকে তবে সে সফলতার পথও এভাবে উন্মুক্ত হয়ে থাকবে যে, তারা তাদের অবস্থা ও আচার-আচরণ অনেকটা শুধরে নিয়েছিলো। ফলে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি তাদের প্রতি নিবদ্ধ হলো এবং তাদের শত্রু তাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো।

www.pathagar.com

তাওরাত থেকে পরিষ্কার জানা যায়, যে যুগে কিবলা (তাবুত) ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে সে যুগে বনী ইসরাঈল বিশ্বাস ও আমলের দিক থেকে যেমন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলো তেমনি রাজনৈতিক দিক থেকেও ছিলো ভীষণ অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্ততার শিকার। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা ওপরে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। সামুয়েল নবী এ অবস্থার সংশোধনের চেষ্টা চালান এবং এ চেষ্টায় তিনি কিছুটা সফলতাও অর্জন করেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলের বিশৃংখলতা এতটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো যে, বৃদ্ধ বয়সে একা তার পক্ষে তা সামাল দেয়া অত্যন্ত কঠিন ছিলো। কিন্তু তালুতের নিযুক্তির পর থেকে অবস্থার লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। সামুয়েল ও তালুত উভয়ে মিলে বনী ইসরাঈলের মাঝে এক নতুন আশার সঞ্চার করেন। তালুতের নিযুক্তিকালে সামুয়েল বনী ইসরাঈলের গোটা জাতিকে সম্বোধন করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকে অনুমান করা যাবে, তালুতের নিযুক্তির পূর্বের অবস্থা কি ছিলো এবং পরবর্তীতে কি অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশা জেগেছিলো।

"পরে শামূয়েল লোকদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভুই মোশি ও হারোণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। তোমরা এখন দাঁড়াও ; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি সদাপ্রভু যে সমস্ত সাধু কার্য্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের সহিত আলোচনা করিব। যাকোব মিসরে গেলে পর যখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়াছিল, তখন সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে প্রেরণ করেন ; আর তাঁহারা মিসর হইতে তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, এবং এই স্থানে তাহাদিগকে বাস করাইলেন। কিন্তু লোকেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গেল, আর তিনি হাৎসোরের সেনাপতি সীষরার হস্তে, পলেষ্টীয়দের হস্তে ও মোয়াবরাজের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, এবং ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল। তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা পাপ করিয়াছি, আমরা সদাপ্রভুর ত্যাগ করিয়া বালদেবগণের ও অষ্টারোৎ দেবীগণের সেবা করিয়াছি ; কিন্তু এখন তুমি শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, আমরা তোমার সেবা করিব। পরে সদাপ্রভু যিরুব্বাল, বদান, যিপ্তহ ও শামূয়েলকে প্রেরণ করিয়া তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুদের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন ; তাহাতে তোমরা নির্ভয়ে বাস করিলে। পরে যখন তোমরা দেখিলে অম্মোন-সন্তানদের রাজা নাহশ তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের রাজা থাকিতেও তোমরা আমাকে কহিলে, না, আমাদের উপরে একজন রাজা রাজত্ব করুন। অতএব এই দেখ, সেই রাজা, যাঁহাকে তোমরা মনোনীত করিয়াছ ও যাচ্ঞা করিয়াছ ; দেখ, সদাপ্রভু তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহার রবে কর্ণপাত কর, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, আর তোমরা ও তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপ্রাপ্ত রাজা, উভয়ে যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুবর্ত্তী হও, [তবে ভাল]। কিন্তু তোমরা যদি সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, এবং

সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধ ছিল, তদ্রূপ তোমাদেরও বিরুদ্ধ হইবে। অতএব তোমরা দাঁড়াও ; সদাপ্রভু তোমাদের সাক্ষাতে যে মহৎ কর্ম্ম করিবেন, তাহা দেখ।"–শামূয়েল, অধ্যায় ১২ ঃ ৬-১৬

একদিকে ছিলো সামুয়েল নবীর এ সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতা। অপরদিকে তালুত তার আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জাতিকে সুসংগঠিত করা ও তাদের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করার কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু করে দিলেন। তিনি আমুনিয়াদের মুকাবিলা করার জন্য বনী ইসরাঈলের পুরুষদের আদম শুমারী করালেন। তাতে দেখা গেলো বনী ইসরাঈল তিন লাখ আর ইহুদার পুরুষদের সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ হাজার। তারপর আমুনীয়াদের ওপর এমন প্রবল আক্রমণ চালালো যে, তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো এবং শত্রু-মিত্র উভয়ের সাথে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়লো। এ ধরনের পরিস্থিতি নিসন্দেহে তাদের বিরোধী পক্ষের জন্য আতংকজনক প্রমাণিত হয়ে থাকবে। আর এ আতংকের কারণেই ফিলিস্তিরা তাবুতকে ফেরত দিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধের আশংকা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করাই সমীচীন মনে করে থাকবে। ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে এ ঘটনাটি নিসন্দেহে এমন ছিলো যা তালুতের সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া ও আল্লাহ কর্তৃক তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিদর্শন হতে পারতো। সুতরাং কুরআন একথাই বলেছে। (অর্থাৎ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ)। আর সবদিক বিবেচনায় এটাই বিবেক ও অনুমানের কাছাকাছি মনে হয়।

তৃতীয় কারণ ঃ তাওরাতের উক্ত বর্ণনা খোদ তাওরাতের বর্ণনা দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। যদি ঘটনা এটাই হয়ে থাকে যে, ফিলিস্তিনীরা সাত মাস পরেই তাবুতকে তার অলৌকিক ও অস্বাভাবিক শক্তিতে ভয় পেয়ে ফেরত দিয়েছিলো তবে তাওরাতের এ বর্ণনার অর্থ কি হবে ঃ

"সদাপ্রভুর সিন্দুক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে স্থাপন দিনাবধি দীর্ঘকাল গেল, বিংশতি বৎসর গেল, আর সমস্ত ইস্রায়েল-কুল সদাপ্রভুর পশ্চাতে বিলাপ করিতে লাগিল।"–শামূয়েল, অধ্যায় ৭ ঃ ২

প্রশ্ন হচ্ছে, ই'আরীম গ্রামটি যদি বনী ইসরাঈলেরই এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে আর তাবুত তাদেরই হেফাযতে থেকে থাকে তবে বনী ইসরাঈলের পুরো গোত্র আল্লাহর নিকট বিলাপ করেছিলো কেন ? আর "আল্লাহর নিকট" একথাটির অর্থ কি ?

প্রকৃতপক্ষে শমূয়েল গ্রন্থে ইহুদীরা পরস্পর বিরোধী বর্ণনার এত বিশাল স্তুপ গড়ে তুলেছে যে, তাতে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা অসম্ভব। এটা কুরআনের অনুগ্রহ যে, সে কোনো কোনো ঘটনার সঠিক দিকগুলো উন্মোচিত করেছে।

আয়াত ঃ ২৪৯

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ

فَلَيْسَ مِنِّى ج وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْٓ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ج فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ لا قَالُوْا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ لا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

বদর যুদ্ধের ছবি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে

فَصَلَ فَصُوْلاً এর অর্থ কোথাও থেকে চলা, বের হওয়া ও রওনা করা। অর্থাৎ তালুত তার সৈন্যদের নিয়ে অভিযানের উদ্দেশ্য রওনা করলেন। তাওরাত থেকে জানা যায়, এ অভিযান ছিলো ফিলিস্তিনীদের মোকাবেলা করার জন্য। যাদের নেতা ছিলো জাটি জুলিয়েট, কুরআন যাকে জালুত নামে উল্লেখ করেছে। এ যুদ্ধে জালুত ও তালুত বাহিনীর পরস্পর মোকাবেলায় সৈন্য সমাবেশের যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের নবীর যুগে কাফির ও মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত বদর যুদ্ধের চিত্রের সাথে হুবহু মিলে যায়। শমূয়েল গ্রন্থে তার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

"পরে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া যিহূদার অধিকারস্থ সোখোতে একত্র হইল, এবং সোখোর ও অসেকার মধ্যে এফস্‌দম্মীমে শিবির স্থাপন করিল। আর শৌল ও ইস্রায়েল লোকেরা একত্র হইয়া এলা তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া পলেষ্টীয়দের প্রতিকূলে সৈন্য রচনা করিলেন। এইরূপে পলেষ্টীয়েরা এক দিকে এক পর্ব্বতে, ও ইস্রায়েল অন্য দিকে অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইল ; উভয়ের মধ্যে একটী উপত্যকা ছিল।"–শামূয়েল, অধ্যায় ১৭ ঃ ১-৩

ওপরে বর্ণিত চিত্রটির প্রতি লক্ষ করুন তারপর সেই চিত্রটির প্রতি নজর দিন যা আঁকা হয়েছে সূরা আনফালে বদর প্রান্তরে কাফের ও মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে, এ যেনো হুবহু বদর যুদ্ধের ছবি। কিবলা পরিবর্তনের পর প্রথম যুদ্ধ যা কমবেশী দু' মাসের মাথায় সংঘটিত হয়েছিলো তা এ বদরের যুদ্ধ। এভাবে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই যেনো তার একটা চিত্র আল্লাহ তাআলা তালুতের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে দেখিয়ে দিলেন। আমরা সূরা আনফালে এটা স্পষ্ট করবো যে, বদরের চিত্র দেখে ইহুদীরা এ মূলতত্ত্বটি বুঝে ফেলেছিলো কিন্তু তারা মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করার ব্যাপারে শয়তানের নীতি অবলম্বন করলো, এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ যুদ্ধে তালুতের সাথীদের সংখ্যাও কম-বেশী তাই ছিলো যা ছিলো বদরে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথীদের।

সৈন্যদের আনুগত্যের পরীক্ষা

اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ঃ সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়ার আগে তালুত তার সৈন্যদের শৃংখলা, আনুগত্য ও বিশ্বস্তর্তার পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিলেন যে, সামনে

আমাদের চলার পথে অমুক নদী পড়বে। তার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের যাচাই করবেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার পানি পান করবে সে আমার সাথী হতে পারবে না। যে তা মোটেই পান করবে না সে আমার সাথী হবে। তবে কেউ যদি হাত দ্বারা এক আধ চুমুক পান করে তবে সে ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ পরীক্ষায় সৈন্যদের অধিকাংশই অকৃতকার্য হয়ে গেলো। লোকেরা খুব তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলো। শুধু মাত্র সামান্য সংখ্যক লোক এ পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

বনী ইসরাঈলরা সেনাপতি নির্বাচন তো খুব তোড়জোড় সহকারে করালো । কিন্তু এ লোকেরা নিয়ম ও শৃংখলার ব্যাপারে বিশেষ করে জান-মাল কুরবানীর প্রশ্নে ছিলো খুবই অপরিপক্ক। এর বহিঃপ্রকাশ যেমনটা ওপরে বলা হয়েছে। শমূয়েল নবী প্রথম দিনই করে দিয়েছিলেন। তাই মনে হয় তাঁর নির্দেশেই তালুত এ পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যাতে করে আগে থেকেই তাদের খাঁটি ও কৃত্রিমের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায় এবং একেবারেই যুদ্ধের ময়দানে তাদের হাতে প্রতারিত না হতে হয়, যারা খাঁটি বা সত্যবাদী তারা প্রথম চোটেই যেনো পৃথক হয়ে যায়। এ পরীক্ষাটি যেহেতু শমূয়েল নবীর নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাই তালুত একে স্বয়ং আল্লাহর পরীক্ষা বলে অভিহিত করেন। যে নদীটির মাধ্যমে এ পরীক্ষা নেয়া হয় এখানে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা কোনো নদীর নয়। সম্ভবত এটি হচ্ছে জর্দান নদী। আর এটাও হতে পারে যে উক্ত ময়দানের মধ্যবর্তী কোনো ঝর্ণা বা নালা যা দু'পক্ষের সৈন্যদের মাঝে প্রতিবন্ধক ছিলো।

এ পরীক্ষায় শতকরা একশ' ভাগ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত ছিলো এর পানি মোটেই কেউ আস্বাদন করবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ তবে এক আধ চুমক পান করাকে ক্ষমার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু তার সাথেও بِيَدِهٖ শব্দের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ছিলো। যাতে এ অনুমতির সুযোগে কৌটা, গ্লাস কিংবা বড় চামচ ব্যবহার না করা হয়। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ দ্বারা সত্যের পতাকাবাহী ও পূর্ণাংগ ঈমানের অধিকারী সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা এ পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। এখানে اٰمَنُوْا ক্রিয়া পদটি ঈমানের পূর্ণতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেসব লোক যারা নিজেদের ঈমানের ওপর অনঢ় ও অবিচল ছিলো। এ থেকে একথাটি স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে তারা ছিলো তাদের ঈমানের দাবীতে মুনাফিক।

قَالُوْا لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ঃ স্পষ্টত বুঝা যায় যে, একথাগুলো হচ্ছে তাদের, যারা অধিক পরিমাণে পানি পান করে সেখানেই কাবু হয়ে পড়েছিলো। বর্ণনার ধরন থেকে মনে হয় তারা নদী পার হওয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করেনি। বরং এ পারেই দাঁড়িয়ে থেকে তারা সামনে অগ্রসরমান সাথীদেরকে ডাক দিয়ে শুনিয়ে দিলো, জালুত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত সাহস এখন আমাদের নেই। এখানে

www.pathagar.com

জালুতের নাম উচ্চারণ করার ফলে একথাটি বুঝা গেলো যে, তার ভয় তাদেরকে ভীষণভাবে পেয়ে বসেছিলো।

বিজয় আধিক্য ও স্বল্পতার মধ্যে নিহিত নয় বরং ঈমান ও মনোবলের ওপর

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ الاية ঃ শব্দটির বিশ্লেষণ ৪৬ আয়াতের আনুষংগির্ক ব্যাখ্যায় আমরা করে এসেছি। এটি ওপরে বর্ণিত ভীরু লোকদের জবাবে তালুত ও তার ঈমানদার সাথীদের উক্তি। তাদের একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার ধারণা পোষণ করতো। এ বিশেষ গুণটি উল্লেখের কারণ যেমনটা ১৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি—এই যে, যে প্রকৃত বীরত্ব আল্লাহর পথে মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় করে তুলে তা মু'মিনের এ বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি মরে না। বরং প্রকৃত জীবন লাভ করে এবং স্বীয় প্রভুর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়। তারা তাদের সাহস হারা সাথীদের এই বলে উদ্বুদ্ধ করলো। ফিলিস্তিনীদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তোমরা সাহস হারিও না। আসল ব্যাপার সংখ্যা নয় বরং আল্লাহর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। ইতিহাসে এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র বাহিনী শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম ও তাঁর সাহায্যে বিশাল বাহিনীর ওপর জয় লাভ করেছে। আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা, মনোবল ও সাহসিকতা—সংখ্যার আধিক্য বা স্বল্পতা নয়। তালুতের পুত্র ইয়ন্টন হয়ত বা এ ক্ষেত্রেই এ উক্তিটি করে থাকবে যা শমূয়েল গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

> "আর যোনাথন আপন অস্ত্রবাহক যুবককে কহিলেন, চল, আমরা ঐ দিকে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের প্রহরি দলের নিকটে যাই ; হয় ত সদাপ্রভু আমাদের জন্য কর্ম্ম করিবেন ; কেননা অনেকের দ্বারা হউক বা অল্পের দ্বারা হউক, নিস্তার করিতে সদাপ্রভুর কোন প্রতিবন্ধক নাই।"—শামূয়েল, অধ্যায় ১৪ ঃ ৬

সৈন্যদের পরীক্ষা সম্পর্কে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনাসমূহের পার্থক্য

তাওরাতে এ পরীক্ষার উল্লেখ নেই। তবে এর কাছাকাছি একটি পরীক্ষার উল্লেখ রয়েছে ঃ

> "ঐ দিবসে ইস্রায়েল লোকেরা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু শৌল লোকদিগকে এই দিব্য করাইয়াছিলেন, সায়ংকালের পূর্ব্বে, আমি যে পর্য্যন্ত আমার শত্রুগণকে প্রতিফল না দিই, সে পর্য্যন্ত যে কেহ খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক। এই জন্য লোকদের মধ্যে কেহই খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিল না। পরে সকলে বনমধ্যে গেল, সেখানে ভূমির উপরে মধু ছিল। আর লোকেরা যখন বনে উপস্থিত হইল, দেখ, মধু ক্ষরিতেছে, কিন্তু কেহ মুখে হস্ত তুলিল না, কারণ লোকেরা ঐ দিব্যে ভীত হইয়াছিল;

www.pathagar.com

কিন্তু যোনাথনের পিতা লোকদিগকে যে দিব্য করাইয়াছিলেন, যোনাথন তাহা শুনেন নাই, তাই তিনি আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ বাড়াইয়া দিয়া এক মধুর চাকে ডুবাইয়া হাতে করিয়া মুখে দিলেন ; তাহাতে তাঁহার চক্ষু সতেজ হইল। তখন লোকদের মধ্যে একজন কহিল, তোমার পিতা শপথ সহকারে লোকদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি অদ্য খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক ; কিন্তু লোক সকল ক্লান্ত হইয়াছে। যোনাথন কহিলেন, আমার পিতা লোকদিগকে ব্যাকুল করিয়াছেন ; বিনয় করি, দেখ, এই যৎকিঞ্চিৎ মধু আস্বাদন করাতে আমার চক্ষু কেমন সতেজ হইল। অদ্য যদি লোকেরা শত্রুদের হইতে প্রাপ্ত লুটদ্রব্য হইতে যথেষ্ট আহার করিতে পাইত, তবে আরও সতেজ হইত। কেননা এখন পলেষ্টীয়দের মধ্যে মহাহত্যা হয় নাই। ঐ দিবসে তাহারা মিক্‌মস অবধি অয়ালোন পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিল ; আর লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পরে লোকেরা লুট-দ্রব্যের দিকে দৌড়িয়া মেষ, গোরু ও বাছুর ধরিয়া ভূমিতে বধ করিতে ও রক্ত শুদ্ধ খাইতে লাগিল।"–শামূয়েল, অ্যধ্যায় ঃ ১৪ ঃ ২৪-৩২

এ ঘটনা থেকে অন্তত একথা প্রমাণিত হয় যে, ফিলিস্তিনীদের সাথে যুদ্ধের প্রাক্কালে তালুত তার সৈন্যদের পরীক্ষা নিয়েছিলো এবং এ পরীক্ষায় তার গোটা বাহিনী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলো এমন কি তালুতের পুত্র ইয়ন্টনও যার অত্যন্ত উঁচুমানের কর্মতৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাওরাতের অন্যান্য বর্ণনা থেকে। এ পরীক্ষায় শুধুমাত্র সে ব্যর্থ হয়নি বরং তার ভুল পথনির্দেশের ফলে তার পিতার গোটা বাহিনীও বিপথগামী হয়ে পড়ে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক থেকে কুরআনের বর্ণনা তাওরাতের বর্ণনা থেকে ভিন্নতর

এক ঃ তাওরাত থেকে প্রমাণিত হয়। তালুত এ পরীক্ষা নিয়েছে শত্রুর সাথে কার্যত মুকাবিলা শুরু হওয়ার পর আর এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো শুধু এতটুকু যে, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয় লোকেরা খানাপিনায় লিপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়, তালুত এ পরীক্ষা নিয়েছে শত্রুর সাথে মোকাবিলায় উপনীত হওয়ার পূর্বে। আর এর উদ্দেশ্য ছিলো স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে যাচাই করা যে, এদের মধ্যে এমন কতজন আছে যারা কঠিন পরিস্থিতিতেও অনঢ় ও অবিচল থাকতে পারবে আর কতজন কেবল লোক দেখানো প্রেমিক যাদের প্রেমের দাবি পরীক্ষার প্রথম আঘাতেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

দুই ঃ তাওরাত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তালুত খাওয়া দাওয়া করতে নিষেধ করেছিলো। পক্ষান্তরে কুরআন থকে প্রমাণ হয় যে, এ নিষেধাজ্ঞা ছিলো সৈন্যদের অগ্রযাত্রার পথে একটি বিশেষ নদী বা ঝর্ণার পানির ব্যাপারে।

তিন ঃ তাওরাত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তালুতের গোটা বাহিনী এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। এমনকি খোদ তার সন্তানও ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বরং সে-ই গোটা বাহিনীর

জন্য ব্যর্থতার পথ উন্মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কুরআন থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, তাদের মধ্য থেকে একটি দল নিজেদের ঈমান ও সিদ্ধান্তের ওপর অনঢ় ও অবিচল থাকে এবং তাদেরই ঈমান ও অটুট সিদ্ধান্তের ফলে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিনীদের ওপর বিজয় দান করেন।

কুরআনের বর্ণনা সঠিক, সঙ্গতিপূর্ণ ও সার্থক

এখন হয় এটা মেনে নিতে হবে যে, তাওরাতে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা আলাদা আর কুরআনে যে বর্ণনা এসেছে তা আলাদা। অথবা এটা স্বীকার করতে হবে যে, ঘটনা একটাই। তাওরাতে একে অসতর্ক বর্ণনাকারীগণ একেবারে বিকৃত ও নিষ্ফল বানিয়ে ছেড়েছে। কুরআন ঘটনাটিকে সত্যতা সহকারে অর্থাৎ একেবারে যথাযথভাবে এবং তার সুফল ও কল্যাণ সহকারে জানিয়ে দিয়েছে। এতদোভয়ের মধ্যে যে কথাটিই সঠিক হোক, প্রত্যেক রুচিশীল ব্যক্তি এটা স্বীকার করবে যে, কুরআনের বর্ণনাই সকল দিক থেকে সার্থক, ফলপ্রসূ ও হেকমতপূর্ণ। পক্ষান্তরে তাওরাতের বর্ণনা হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন কল্পকাহিনী।

আয়াত ঃ ২৫০-২৫১

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ
اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْ لَادَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

জালুত

জালুত ছিলো ফিলিস্তিনীদের সেনা নায়ক। তাওরাতে তার নাম এসেছে জাটি জুলিয়েট (ZATE ZULIET)। সে ছিলো বিরাটকায় দেহাবয়ব ও দৈত্য আকৃতির এবং একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ক। শত্রুদের ওপর তার ভয়ংকর প্রভাব ছিলো, বিশেষ করে বনী ইসরাঈলরা তার ব্যাপারে খুবই আতংকগ্রস্ত ছিলো।

হযরত দাউদ (আ)-এর জীবনের সূচনা

দাউদ হচ্ছেন সেই হযরত দাউদ (আ) যাকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং যার ঔরসে হযরত সুলাইমান (আ) জন্মলাভ করেন। তাঁর জীবনের সূচনা হয় নিঃস্ব অবস্থায় কিন্তু শেষ হয় খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ। তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে ভেড়ার খোঁয়াড় থেকে বের করেছেন এবং ইসরাঈলের সিংহাসনে এনে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি তালুতের উল্লেখিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে তাওরাতে দুটি ভিন্ন ধরনের বর্ণনা

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তিনি তালুতের অস্ত্র বহনকারী হিসেবে তার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে তিনি সামুয়েল নবীর মাসেহকৃত এবং ভবিষ্যত বাদশাহও ছিলেন। অপর বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি একেবারে সঙ্গীন মুহূর্তে তার বকরীগুলোকে চারণ ভূমিতে রেখে পিতার আদেশে আপন বড় ভাইকে—যিনি ঐ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কিছু আহার্য দ্রব্য পৌঁছে দেয়ার জন্য এসেছিলেন। এখানে এসে তিনি দেখলেন যে, জালুত মুকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। কিন্তু কেউ তার মুকাবিলার জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছে না। এটা দেখে তার মর্যাদাবোধ চাঙ্গা হয়ে ওঠলো। তিনি তার মোকাবিলা করার জন্য তালুতের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন তখন রক্ত বর্ণের সুঠাম দেহী এক অনভিজ্ঞ যুবক। তালুত তার অল্প বয়োসি ও অনভিজ্ঞতার কারণে অনুমতি দিতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বললেন, আমি আমার বকরীর পালের ওপর হামলাকারী বাঘ-ভাল্লুকের চোয়াল ভেংগে ফেলি। আর খাতনাবিহীন এ ফিলিস্তিনীরা কোন্ ছার! এরা কি করে আল্লাহর এ দুরন্ত সৈন্যকে লাঞ্ছিত করতে পারে। তালুত তার এ অসাধারণ মনোবল ও সাহস দেখে তাকে অনুমতি দিলেন এবং নিজের যুদ্ধের পোশাক পরিয়ে দিয়ে বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রে তাকে সুসজ্জিত করলেন। এ যাবত তার দিন কেটেছিলো ভেড়া-বকরীর রাখাল হিসেবে। এসব সামরিক পোশাক ও অস্ত্রসস্ত্রের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। এগুলো পরিধান করে তিনি কিছুটা আটশাট বোধ করলেন। অবেশেষে তালুতের অনুমতি নিয়ে এ বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন এবং রাখালদের ন্যায় তার রশির তৈরী ফাঁদ হাতে তুলে নিলেন। চাদরের এক কোণে কিছু পাথর রাখলেন এবং যুগের সবচাইতে বড় দৈত্যের মুকাবিলায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রথমে তো জালুত তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো। কিন্তু তার পক্ষ থেকে যখন পাল্টা জবাব এলো তখন তাকে বললো ঃ "ঠিক আছে। এসো, তোমার গোশত আজ কাক-চিলকে খাওয়াচ্ছি।" এমন সময় হযরত দাউদ (আ) রশির তৈরী ফাঁদে পাথর রেখে যেইনা তাকে লক্ষ করে ছুঁড়লেন অমনি পাথরটি তার মাথা ভেদ করে চলে গেলো এবং সেখানেই সে ধড়াস করে পড়ে স্তুপে পরিণত হলো। একটি অর্বাচীন রাখাল বালকের পাথর নিক্ষেপে এত বড় সেনা নায়কের এভাবে মারা যাওয়া বস্তুত এ ছিলো একটি বিরাট ঘটনা। তাই ফিলিস্তিনী সৈন্যদের মাঝে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেলো এবং অন্যদিকে ইসরাঈলী নারীদের কণ্ঠ বেজে ওঠলো এ গানের কলি ঃ

"সাউল তো মেরেছে হাজার হাজার আর দাউদ মেরেছে লাখ লাখকে।"

এ ঘটনা থেকেই হযরত দাউদ (আ)-এর জীবনের সূচনা হয়, অতপর তিনি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে সেই মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করেন যা তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিলো।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ঃ এখানে এ মূল তত্ত্বটি বলে দেয়া হলো যে, জয় কিংবা পরাজয় যা কিছুই হোক, তার মূল সম্পর্ক সংখ্যার কমবেশী এবং উপায়-উপকরণ ও চেষ্টা-তদবীরের সাথে নয় বরং আল্লাহ তাআলার সাথে। তাই মূল ভরসা আল্লাহ তাআলার ওপর হওয়া উচিত। বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ওপর নয়। এর অর্থ উপায়-

www.pathagar.com

উপকরণ অবলম্বনের ওপর নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং কেবলমাত্র তাকেই বিজয়ের কারণ মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) যিনি দৈত্য আকৃতির এক বীর পুরুষকে একটি পাথরের আঘাতে খতম করে ফেলেন যদিও তখন পর্যন্ত নবী হননি কিন্তু এ মূল তত্ত্বটি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি জালুতকে সম্বোধন করে একথাটি বলেছিলেন ঃ

> "ইহা সমস্ত পৃথিবী জানিতে পারিবে। আর সদাপ্রভু খড়্গ ও বড়শা দ্বারা নিস্তার করেন না, ইহাও এই সমস্ত সমাজ জানিবে ; কেননা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর, আর তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন।"–শামূয়েল, অধ্যায় ১৭ ঃ ৪৮

আর একথাটিই কুরআন মজিদের আয়াত وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ - وَلٰكِنَّ اللّٰهَ থেকে প্রমাণিত হয়।

وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ঃ এটি হচ্ছে সেসব অনুগ্রহের বর্ণনা যা এ ঘটনার পর হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি করা হয়েছে। এরপর তিনি তালুতের জামাতাও হয়েছেন এবং অবশেষে হলেন বনী ইসরাঈলের বাদশাহও। এছাড়াও তাকে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সেই ভাণ্ডার দান করা হয়। যার বাস্তব প্রকাশ হচ্ছে জাবুর গ্রন্থ। মূলত বাদশাহীর সাথে যখন এ হেকমত বা বুদ্ধিমত্তার সংযোগ ঘটে তখন সে বাদশাহী যমীনের বুকে আল্লাহর খিলাফতের মর্যাদা লাভ করে। এমন না হলে বাদশাহী চেঙ্গীছ ফ্যাসিবাদের রূপ ধারণ করে। বাদশাহী ও দরবেশীর এ সংমিশ্রিত রূপই আল্লাহর নিকট পসন্দনীয়। হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয যথার্থই দরবেশ বাদশাহ ছিলেন। কেননা তাদের রাজ সিংহাসন ও মুকুট স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নয় বরং হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার মনি-মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত ছিলো।

এখানে ছোট একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আর তা হচ্ছে কুরআন عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ না বলে عَلَّمَهٗ مِمَّا شَآءَ বলেছে। অর্থাৎ অতীত ক্রিয়ার পরিবর্তে বর্তমান বা ভবিষ্যত ক্রিয়া ব্যবহার করেছে। আমার মতে এ পদ্ধতি এ কারণে অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে বিষয়টি কেবলমাত্র হযরত দাউদ (আ)-এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট না থেকে যায়। বরং এটি একটি সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর স্থায়ী নীতির বর্ণনা-পদ্ধতি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেসব বিষয় শিখিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যা তিনি তাঁর এ ধরনের বান্দাহদেরকে জানাতে ও শেখাতে চান।

জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও তার যৌক্তিকতা

وَلَوْ لَادَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ الاية ঃ এ আয়াতে জিহাদের দর্শন ও প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তাআলা জিহাদের নির্দেশ না দিতেন এবং তার নেক বান্দাহগণ যমীনকে ফিতনা-ফাসাদ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে তরবারী উত্তোলন না করতেন তাহলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলো দুনিয়াটাকে

www.pathagar.com

দুষ্কৃতি ও ফিতনা-ফাসাদে ভরে দিতো এবং আল্লাহর যমীন তাকওয়া ও সততার যাবতীয় নিদর্শন থেকে শূন্য হয়ে পড়তো। কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেমন সূরা হজ্জে ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ـ الحج : ٤٠ - "যদি আল্লাহ তাআলা মানব জাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে গির্জা, উপাসনালয়, ইবাদাতখানা ও মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতো, যেগুলোতে আল্লাহর নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয়।"–সূরা হজ্জ ঃ ৪০

এ হাকীকত বা মূল তত্ত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন এজন্য ছিলো যে, ধর্মীয় বৈরাগ্যবাদী যোগী-সন্ন্যাসীসুলভ ধ্যান-ধারণার প্রভাবের ফলে সাধারণভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহকে তাকওয়া ও দীনদারীর পরিপন্থী মনে করা হতো। আর এ কারণেই বদরের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত কুরাইশরা মুসলমানদের দুর্বলতাকে তাদের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে পেশ করতো। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর তাদের জিহাদী প্রেরণাকে তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করলো। এর বিস্তারিত আলোচনা সংশ্লিষ্ট স্থানে করা হবে। এখানে কুরআন শুরু থেকেই এ ধরনের যাবতীয় আপত্তির জবাব দিয়েছে এই বলে যে, নবী ও সৎব্যক্তিগণ যে জিহাদ করে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং দুষ্কৃতি ও ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন। নচেৎ আল্লাহর যমীন ন্যায় ও কল্যাণের দিক থেকে সম্পূর্ণ অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হতো। তাই সৎলোকদের জিহাদ দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর বিরাট রহমত।

আয়াত ঃ ২৫২

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

নবী করীম (স)-এর প্রসংগ ও তাঁর রিসালাতের প্রমাণ

এ আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াত—এ আয়াত দুটো ধারাবাহিক বর্ণনার মাঝখানে আনুসংগিক বাক্য হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ আলোচনার মূলধারাকে থামিয়ে দিয়ে নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, বনী ইসরাঈল তার ইতিহাসের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে একেবারে নিষ্ফল ও অর্থহীন করে দিয়েছিলো। বর্তমানে আমি তা তোমাকে সঠিকভাবে জানিয়ে দিলাম তার পরিণতি ও ফলাফলসহ যাতে করে তুমি ও তোমার সাথীরা তাদের ভবিষ্যত কর্মসূচীর চিত্র এ আয়ানায় দেখতে পায় এবং এটি এরও এক অত্যুজ্জল প্রমাণ যে, নবী-রাসূলদের পবিত্র ক্রমধারার তুমিও একজন। নতুবা যে বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো উৎস ও উপায় উপকরণ তোমার নিকট ছিলো না তা কিভাবে তুমি জানতে পারতে। তাও এতটা সঠিক ও সত্যতা সহকারে যে, সর্বপ্রকার অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিকতার মিশ্রণ থেকে পবিত্র হয়ে প্রকৃত ঘটনা লোকদের সামনে এসে গেলো। যদি আহলে কিতাব (বনী ইসরাঈল) শুধু ঘটনার এ একটি দিকের প্রতি

www.pathagar.com

চিন্তা করতো, তবে তোমার নবুওয়াতের প্রমাণের জন্য এ দলিলটিই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তাদের অন্ধ-বধির বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব তাদের নবী ছাড়া অন্য কোনো রাসূলের রিসালাত ও তার মযাদাকে মেনে নেয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। অথচ আল্লাহর নবী ও রাসূলদের কারো জন্য একচেটিয়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মোটেই সঠিক নয়। আল্লাহ তাঁর সব নবী-রাসূলকে কোনো না কোনো মর্যাদা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু আহলে কিতাব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের নবী ছাড়া অন্য সকলকে মিথ্যা ও তাদের বিরোধিতা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ করো এবং তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়ায় পাপিষ্ঠকেও অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। নিসন্দেহে যদি তিনি চাইতেন তবে এসব কিছু তারা করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু তিনি এটাই চেয়েছেন। আর তিনি যা চেয়েছেন তাতেই রয়েছে যৌক্তিকতা ও পরিণামদর্শিতা।

আয়াত ঃ ২৫৩

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

تِلْكَ দ্বারা সেসব রাসূলদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, ওপরে وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এর শব্দসমূহ দ্বারা যাদের কথা বুঝানো হয়েছে।

রাসূলদের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহর রাসূলদের ব্যাপারে তাঁর উম্মতদের যে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা উচিত ছিলো এ আয়াতে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা তা অবলম্বন করেনি। বরং তার স্থলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে। ফলে তাদের মাঝে গোঁড়ামী বা পক্ষপাতিত্বের দেয়াল দাঁড়িয়ে যায় এবং একে অপরের শত্রু ও বিরোধী হয়ে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এখানে এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী করীম (স)-এর নিকট একথাটি স্পষ্ট করে দেয়া যে, বর্তমানে এ আহলে কিতাব তোমার বিরোধিতায় যে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে তাদের এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিই তার বড় কারণ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে প্রত্যেক রাসূলকে কোনো না কোনো দিক থেকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। আর এ বিশিষ্টতার দিক দিয়েই এক রাসূল অন্যান্যদের ওপর মর্যাদার অধিকারী। যেমন মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। এটা তার বিশিষ্টতার একটি দিক। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে বেশ কিছু সুস্পষ্ট মো'জেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন এবং পবিত্র আত্মা বা জিবরাঈল (আ)-

এর বিশেষ সাহায্য দ্বারা তাকে ভূষিত করেছেন। এটা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে অন্যান্য রাসূলদেরকেও বিভিন্ন সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। যা কেবল তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। নবী-রাসূলদের মর্যাদার ব্যাপারে এ দৃষ্টিভঙ্গিই মৌলিকভাবে সঠিক। কিন্তু সেসব নবীর উম্মতরা যে দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা যে নবী ও রাসূলের অনুসারী তারা সমস্ত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রবিন্দু একা তাকেই বানিয়ে রেখেছে এবং অন্য কোনো নবী-রাসূলের কোনোরূপ মর্যাদার স্বীকৃতি দান তাদের নিকট ঈমানের পরিপন্থী বলে অভিহিত হয়েছে। এ গোঁড়ামী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফল এই দাঁড়ালো যে অতীত উম্মতদের মধ্যে প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলো এবং অন্যান্য নবী-রাসূলদের বরকত লাভের পথ তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেলো। যদি তারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতো তবে প্রত্যেক রাসূল তাদের রাসূল এবং প্রতিটি হেদায়াত তাদের জন্যও হেদায়াত হতো এবং তারা এ হেদায়াত থেকেও অংশ লাভ করতো যা বর্তমানে কুরআন মজীদের আকারে সর্বশেষ হেদায়াতের মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ার সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ মূলতত্ত্বের প্রতিই সূরা বনী ইসরাঈলেও ইংগিত করা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا - ٥٥ "এবং আমি নবীদের মধ্যে থেকে কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং দাউদকে যাবুর দান করেছি।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫

হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই সুন্নত বা চিরন্তন নীতির প্রতি ইংগিত করেছেন যা হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং কুরআন মজীদের স্থানে স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে যার বর্ণনা এসেছে। আল্লাহর সেই সুন্নাত বা নীতি হচ্ছে এই যে, হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে তিনি জোর-জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করেননি। যদি তিনি এরূপ করতেন তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কারো পক্ষেই ঈমানকে বাদ দিয়ে কুফরের পথ অবলম্বন করার কোনো সুযোগই বাকী থাকতো না। কিন্তু তিনি এরূপ করেননি। বরং বান্দাহদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে করে তারা নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধিকে স্বাধীন নির্বাচনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছা করলে কুফরী পথ অবলম্বন করতে পারে। ইচ্ছা করলে ঈমানের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদি ঈমানের পথ অবলম্বন করে তবে তার পুরস্কার পাবে আর যদি কুফরীর পথ অবলম্বন করে তবে তার পরণিতি ভোগ করবে। অবশেষে বলা হলো। وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (আল্লাহ তাই করেন যা তিনি চান।) সুতরাং তিনি এটাই চেয়েছেন ও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে বান্দাহদের ওপর জোর-জবরদস্তি করা হবে না। আর যখন তিনি এটাই চেয়েছেন তখন এ থেকে একথটি স্বতই প্রকাশ পায় যে, এর মধ্যেই রয়েছে যৌক্তিকতা ও কল্যাণ। কারণ আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত অনুপযোগী ও অযৌক্তিক হতে পারে না।

এখানে এ নীতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, আপনি লোকদের নিকট সুস্পষ্ট ভাষায় সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দেবেন। তা কবুল করা কিংবা প্রত্যাখ্যান

করার ব্যাপারটা তাদের ওপরে ছেড়ে দিন। এটা আপনার দায়িত্বও নয় আর এজন্যে আপনি পেরেশানও হবেন না।

আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বর্ণিত وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ বাক্যটির তাৎপর্য এ সূরার ৮৭ আয়াতের অধীনে আমি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছি। হযরত মূসা (আ)-এর সাথে যে কথাবার্তার উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সেই সরাসরি কথোপকথন যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এ কথোপকথনের উল্লেখ তাওরাতেও বার বার এসেছে এবং কুরআন মজীদও বিভিন্ন স্থানে এ দিকে ইংগিত করেছে।

৮০. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৫৪-২৫৬ আয়াত

ইতিপূর্বে জিহাদ ও আল্লাহর পথে ব্যয় (ইনফাক) সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছিলো। মাঝে প্রসংগত মনোযোগ আকর্ষণ মূলক দুটি আয়াত এসেছে সতর্কীকরণ ও উপদেশ প্রদান হিসেবে। একে "জুম্‌লা মু'তারাযা" বা পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাক্য বলা হয়। তারপর নতুন করে পুনরায় ইনফাক সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য যে প্রমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাতে একথাই প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর নিকট যে মূল বস্তুটি কাজে আসবে তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী। কিন্তু শেষ নবীকে অস্বীকারকারী লোকেরা তো এটা করার জন্য প্রস্তুত নয়। বরঞ্চ তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের মনগড়া অনেক শরীক ও সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে এবং তাদের সুপারিশ ও সাহায্যের ওপর ভরসা করে বসে আছে। অথচ এ মিথ্যা ভরসা ও সাহায্য কোনোই কাজে আসবে না, যারা এ ধরনের বোকামীর মধ্যে ডুবে আছে তারা নিজেদের ওপর বিরাট যুলুম করছে।

অতপর অতি সংক্ষেপে অথচ ব্যাপক অর্থবহ ভাষায় তাওহীদের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে এবং শিরকের প্রতিবাদ করা হয়েছে। যাতে করে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যে লোকগুলো বেঁচে আছে তারা যেনো সতর্ক হয়ে যায় এবং খোদা-পুরস্তির সঠিক পথ অবলম্বন করে।

এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূলের মাধ্যমে হক ও বাতিল এবং হেদায়াত ও গোমরাহীকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাবলীগ ও তা'লীম এবং সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দানের যে দায়িত্ব ছিলো তাও পালন করা হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা সে গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে আর যার মন চায় সে ভ্রান্ত আশ্বাসের ওপর ভরসা করে তার আখেরাত বরবাদ করবে। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের কোনো তোয়াক্কা করেন না। আল্লাহ চান যে, মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বুঝে-শুনে ঈমান আনুক। যদি তিনি সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইতেন তবে তা তিনি করতে পারতেন। কিন্তু হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে এরূপ বাধ্যবাধকতা তিনি পসন্দ করেননি।

www.pathagar.com

অবশেষে একথাটি পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, কাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত লাভের তাওফিক দান করেন। আর কারা সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও গোমরাহীর ময়দানে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

এবার এ আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ
فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ
ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن
يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ
لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা কিছু (ধন-সম্পদ) দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, সেদিনটি আসার আগে যেদিন কেনা-বেচাও চলবে না, বন্ধুত্বও কাজে আসবে না এবং কারো কোনো সুপারিশও ফলদায়ক হবে না। আর যারা অস্বীকারকারী তারাই হচ্ছে নিজেদের ওপর প্রকৃত যুলুমকারী।

২৫৫. আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব। সবকিছুর রক্ষক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই মালিকানাভুক্ত। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে রয়েছে সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন ততটুকু আয়ত্ব করতে পারে।

www.pathagar.com

তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনব্যাপী। আর এগুলোর সংরক্ষণ তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সুমহান।

২৫৬. দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। হেদায়াত গোমরাহী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে মযবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরেছে যা টুটবার নয়। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৮১. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৫৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

আল্লাহর পথে ব্যয়ের যুক্তি

ওপরে ২৪৫ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে আহ্বান জানানো হয়েছে এখানে তা আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ বাক্য দ্বারা ইনফাকের যৌক্তিকতা এবং এটা যে একটি সহজ কাজ তা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করার যে দাবি করেছেন তা তো তোমাদের জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। তিনি তো তোমাদের নিকট তোমাদের নিজস্ব কোনো জিনিস দাবি করছেন না বরং তাঁর দেয়া জিনিসই চাচ্ছেন। আবার ব্যাপারটা এমনও নয় যে, যা তিনি দিয়েছেন তার পুরোটাই তিনি দাবি করছেন বরং তা থেকে কেবলমাত্র একটি অংশ ব্যয় করার দাবিই তিনি করছেন।

তারপর বলা হলো, এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক ফায়দা কেবলমাত্র তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন একে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে একটি স্থায়ী কোষাগারে পরিবর্তিত করতে পারবে। কেননা যেদিনটি সামনে আসছে (পরকাল) সেদিন উপকারে আসার মতো যদি কিছু থাকে তবে তা শুধুমাত্র সেই নেক আমলগুলো, যা দুনিয়াতে করা হয়েছে। এ ছাড়া সে জগতে কোনো কিছুই কাজে আসবে না। এ দুনিয়ায় কেনা-বেচার মাধ্যমেও কাজ হাসিল হয়, বন্ধুত্বও কাজে আসে এবং সুপারিশও অনেক সময় উপকার দেয়। কিন্তু সে জগতে এর সব পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। তা হবে একমাত্র ঈমান ও নেক আমলের ফলাফল প্রকাশের জগত।

بَيْعٌ শব্দের অর্থ আমরা এখানে কেনা-বেচা উভয় করেছি। তার কারণ হচ্ছে এই যে, যখন বস্তুর সাথে বস্তুর বিনিময় হয় তখন ক্রয়-বিক্রয় উভয় অর্থই তাতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

الـكافــــرون। শব্দ দ্বারা আমাদের মতে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা এমনি একটি দিনের আগমনকে অস্বীকার করে যে দিনটি সম্পর্কে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে। যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কালকের বাকীর জন্য আজকের নগদকে হাতছাড়া করবে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে, যদিও এরা এদের ধারণা অনুযায়ী নিজেরা নিজেদেরকে বাস্তববাদী বলে মনে করে এবং তাদের ধারণা, এরা নিজেদের কল্যাণ করছে কিন্তু বস্তুত পক্ষে এরা নিজেদের জীবনের ওপর সবচেয়ে বড় যুলুম করছে।

আয়াত ঃ ২৫৫

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ط لَـهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَ يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

قَيُّوْمٌ শব্দের অর্থ

قَيُّوْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই সত্তা যিনি স্বয়ং নিজ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যদের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের মাধ্যম ও উসিলা।

سِنَةٌ শব্দের অর্থ

سِنَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে তন্দ্রা আর نوم শব্দের অর্থ নিদ্রা। এর কোনোটাই আল্লাহকে স্পর্শ করে না বলায় বুঝা গেলো। নিদ্রার প্রথম ও শেষ উভয় অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত। যার অর্থ হচ্ছে এই, শৈথিল্য ও উদাসীনতা বা অবসাদগ্রস্ততার যাবতীয় প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

مَـا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَـا خَلْفَـهُمْ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর জ্ঞান লোকদের সামনের এবং পেছনের, তাদের অতীত ও ভবিষ্যত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। পক্ষান্তরে অন্যদের জ্ঞানের পরিধি শুধু মাত্র অতটুকু, যতটুকু আল্লাহ তাঁর জ্ঞান থেকে তাদেরকে দান করেছেন। তার চেয়ে সামনে বাড়ার ক্ষমতা কারো নেই। وَلاَ يُحِـيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ

كرسى শব্দের অর্থ

আরবী অভিধানে كُرْسٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসের জমাট বাঁধা স্তর, ভাঁজ বা গদী। এ থেকেই কুরসী শব্দের উৎপত্তি যা বসার স্থান বা জিনিস যেমন আসন ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বসার স্থান বা জিনিস যখন তা কোনো ক্ষমতাবান

www.pathagar.com

ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয় তখন তা তার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ কারণে কুরসী শব্দটি ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ। এর অর্থ দাঁড়ালো, আসমান ও যমীনের সর্বদিকে ও সকল প্রান্তে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিরাজমান। কোনো আনাচকানাচ প্রত্যন্ত কোণ তাঁর ক্ষমতার প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত নয়।

اَوْدًا يَئُوْدُ-এর অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তুর এতটা ভারী বা ওজনযুক্ত হওয়া যার উত্তোলন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا -এর অর্থ দাঁড়ালো, আসমান ও যমীনের দেখাশোনার ব্যাপারটা আল্লাহর জন্যে মোটেও কঠিন কোনো বিষয় নয় যে, তাঁর অন্য কোনো সহযোগী কিংবা সাহায্যকারীর প্রয়োজন পড়তে পারে।

আয়াতুল কুরসী একত্ববাদের এক বিরাট নিদর্শন

ওপরে আয়াতে একথাটি বলা হয়েছে যে ঃ "সেদিন আসার আগেই আল্লাহর পথে ব্যয় কর যেদিন কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে না। বন্ধুত্ব কোনো কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ কোনো উপকারে লাগবে না।" আয়াতুল কুরসী সে কথাগুলোরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। শির্ক ও সুপারিশের প্রত্যাখ্যান সম্বলিত এ আলোচনা যেন নির্ভেজাল তাওহীদের ব্যাখ্যার জন্য একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো আর অমনি তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত এরূপ একটি আয়াত নাযিল হয়ে গেলো যার সৌন্দর্য, নৈপুণ্য ও ভাষাগত মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব।

সর্বাগ্রে বলা হলো, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতপর তার এমন সব গুণাবলী বর্ণনা করা হলো যা তার একমাত্র উপাস্য হওয়ার অনিবার্য দাবি যা অস্বীকার করলে তার উপাস্য হওয়াকেই অস্বীকার করা হয়। সাথে সাথে এমন কিছু বিষয় থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে যা মেনে নিলেও তাঁর উপাস্যত্ব বা উলুহিয়্যাতকে কলুষিত করা হয়। যেসব গুণাবলী তাঁর জন্য আরোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি حَيٌّ وَقَيُّوْمٌ। حَيٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিরঞ্জীব আর قَيُّوْمٌ শব্দের অর্থ এমন সত্তা যিনি নিজ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এবং সকলকে অস্তিত্ব দানকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। বস্তুত যে স্বয়ং জীবিত নয় সে সমগ্র দুনিয়ার জন্য জীবনদাতা কেমন করে হতে পারে, যে নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না সে আসমান ও যমীনের প্রতিষ্ঠাকারী কিভাবে হতে পারে এবং যে সত্তা এসব গুণের অধিকারী নয় তাকে খোদা মানার কি অর্থ থাকতে পারে ? আর খোদা যখন এসব গুণের অধিকারী এবং অবশ্যই তাকে এসব গুণের অধিকারী হওয়া উচিত তখন অন্য কাউকে তার শরীক ও অংশীদার মনে করা সম্পূর্ণ একটি অযৌক্তিক ব্যাপার।

এভাবে কুরআন সে সমস্ত যাবতীয় উপাস্যকে অস্বীকার করেছে যারা না জীবিত না জীবনের উৎস। যারা না নিজ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত না অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। বরং খোদ নিজের জীবন এবং নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য একজন চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তার মুখাপেক্ষী।

www.pathagar.com

তারপর বলা হলো, তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। একথাটি বলে নিদ্রার প্রাথমিক ও প্রান্তিক উভয় অবস্থা থেকে তাঁকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আর এটা তাঁর চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী হওয়ার অনিবার্য দাবি। নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর ছায়া ও চিহ্ন এবং তার দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য ও সূচনা। নিদ্রা আল্লাহর শান বা মর্যাদার পরিপন্থী। আবার এটা তাঁর চিরস্থায়ী হওয়ারও পরিপন্থী। যে স্বয়ং ঘুমের কাছে পরাজিত হয়ে নিজকে সচল রাখতে অক্ষম সে বিশ্বজগতকে কিভাবে সচল রাখবে ? আর তিনি যখন খোদ সর্বক্ষণ জাগ্রত এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের নজরদারী করে যাচ্ছেন, তখন একথা মনে করার অবকাশ কোথায় যে, এ মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা রক্ষায় তিনি অন্য কারো মুখাপেক্ষী।

শাফাআতের তাৎপর্য

তারপর এরশাদ হয়েছে যে, لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই মালিকানাভুক্ত এবং তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। এটি এরূপ একটি মৌলিক তত্ত্ব যে ব্যাপারে কুরআন যাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেছে তাদের কারো আপত্তি বা অস্বীকৃতি ছিলো না এবং কারো পক্ষে এ ব্যাপারটিকে অস্বীকার করার সুযোগও ছিলো না। কেননা একে অস্বীকার করার অর্থ ছিলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা। তাই এ স্বীকৃতি বাস্তবতার আলোকে শাফা'আত বা সুপারিশ সম্পর্কিত সেসব আকীদা-বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করা হলো যার সাথে আরবের মুশরিক ও আহলে কিতাবগণ কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিলো। বলা হলো, مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ সবকিছু যখন আল্লাহর অধীন এবং তার হুকুমের অনুগত তখন কার এমন শক্তি বা প্রভাব আছে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে কারো পক্ষে সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারে। শাফা'আত সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো, শরীকদের কারো কারো আল্লাহর দরবারে এতটা মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা রয়েছে যে, তারা স্বয়ং আল্লাহর সামনে এসে তাঁর নিকট কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে এবং তাদের সন্তুষ্টির খাতিরে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সুপারিশ কবুলও করবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের এ ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহর দরবারে না কারো এরূপ বিশেষ কোনো মর্যাদা রয়েছে। না কেউ তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়া মুখ খোলার সাহস পাবে। এ বাস্তব সত্যটিকে অন্যত্র এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۝ الانبياء : ٢٦_٢٧ –"এবং মুশরিকরা বলে আল্লাহর সন্তান রয়েছে। আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র এবং এসবের উর্ধে। ফেরেশতা আল্লাহর সন্তান নয় বরং তার সম্মানিত বান্দাহ। তারা তার সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না। তারা তো শুধু তাঁর আদেশ মুতাবিকই কাজ করে থাকে।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৬-২৭

তারপর বলা হলো ঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে কারো ব্যাপারে কথা বলার সাহস তো সে ব্যক্তিই

করতে পারে, যে আল্লাহর জানা তথ্যাবলীর ওপর কিছু সংযোজন করতে সক্ষম এবং যে একথা বলার ক্ষমতা রাখে যে, অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহর পুরোপুরি জানা নেই তার রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন অবস্থা কার আছে ? আল্লাহ তাআলা সবার সামনের ও পেছনের এবং তার অতীত ও ভবিষ্যত সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। পক্ষান্তরে অন্য কারোই এমন মর্যাদা ও মর্তবা নেই যে, সে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের কোনো অংশও আয়ত্ব করতে পারে। অন্যদের জন্য তার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শুধু অতটুকু বরাদ্দ রয়েছে যতটুকু তিনি স্বেচ্ছায় তার কোনো বান্দাহর কাছে প্রকাশ করেন। আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের এ প্রশস্ততা এবং অন্যদের জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা মুশরিকদের শাফাআতের ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়। তাই কুরআন মজীদ শাফাআতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর জ্ঞানের এ প্রশস্ততা ও অন্যদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ○ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○ - الانبياء : ٢٨ "আল্লাহ জানেন যা তাদের সামনে রয়েছে আর যা তাদের অন্তরালে রয়েছে এবং তারা সুপারিশ করবে শুধু তাদের জন্য যাদের ব্যাপারে আল্লাহ পসন্দ করেন এবং তারা তাঁর ভয়ে শংকিত থাকবে।"–সূরা আম্বিয়া ঃ ২৮ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ○ - طه : ١٠٩-١١٠ (এবং সেদিন কারো জন্য কারো সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না। তবে যার জন্য দয়াময় খোদা সুপারিশের অনুমতি দেন এবং তার পক্ষে কোনো কিছু বলাটাকে তিনি পসন্দ করেন। তাদের সামনে ও আড়ালে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তাদের জ্ঞান সে জ্ঞানকে আয়ত্ব করতে অক্ষম।

শাফাআতের এ ধারণা মৌখিকভাবে ভ্রান্ত। কেননা এর ফলে বান্দাহ আল্লাহর পরিবর্তে বান্দাহর ওপর নির্ভরশীল হয়। এভাবে এ ধারণা শিরকের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। তার পরিবর্তে কুরআন শাফাআতের যে ধারণা পেশ করেছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের মধ্যে যাকে চাইবেন এবং যার জন্য চাইবেন সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং সে আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে একমাত্র হক কথাটিই মুখ থেকে বের করবে। এ সুপারিশ যেহেতু আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হবে এবং শুধু তার জন্য হবে যার ব্যাপারে আল্লাহ পসন্দ করবেন এবং এ সুপারিশ ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করবে না। বরং সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যের অনুরূপ হবে। তাই এটি আল্লাহর ওপর বান্দাহর বিশ্বাস ও ভরসাকে সুদৃঢ় করবে এবং এটি হবে তাওহীদের দাবির অনুবর্তী। কেননা এ সুপারিশের সুযোগ তিনিই রেখেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত বান্দাহদেরকে সম্মানিত করবেন। এ বিষয়ে আমি সূরা আল আনআম-এ বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে এতটুকু ইংগিতই যথেষ্ট মনে করছি।

শাফাআতের বাপারে যেমন ব্যতিক্রম রয়েছে। তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যতিক্রম রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো বান্দাহকে ততটুকু দান

www.pathagar.com

করেন যতটুকু তিনি চান। অর্থাৎ আল্লাহর বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারকে আয়ত্ব করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁর নবী, রাসূল ও তাঁর ফেরেশতাগণ যে জ্ঞানের অধিকারী হয় তা শুধু ততটুকু যতটুকু তিনি কাউকে দান করে থাকেন।

তারপর বলা হয়েছে وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا – "তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি আনাচ-কানাচ পর্যন্ত বিস্তৃত।" তাঁর ব্যাপক-বিস্তৃত রাজত্বের দূরবর্তী কোনো প্রান্তও এমন নয় যেখানে তিনি তাঁর কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হচ্ছেন না এবং তিনি সেখানে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য উপাস্যদেরকে নিজের ক্ষমতার অংশীদার বানাতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়ার বাদশাহদের মত নন যারা নিজেদের রাজত্ব সামাল দেয়ার জন্য বহুসংখ্যক সহকারী ও সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাদের ছাড়া রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বরং তিনি অসীম জ্ঞান, অশেষ ক্ষমতা ও সীমাহীন শক্তি প্রয়োগের অধিকারী। সুতরাং যেভাবে আমরা আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনকে দেখাশোনা করি তার চেয়েও লাখো গুণ সহজতরভাবে তিনি তাঁর আসমান ও যমীনব্যাপী রাজত্বের শৃংখলা রক্ষা করেন এবং এটা তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃসাধ্য ব্যাপার নয় যে, কারো পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন পড়তে পারে।

পরিশেষে বলা হলো, আল্লাহ হচ্ছেন, 'আলী' এবং 'আযীম'। অর্থাৎ তাঁর সত্তা বিশালতম ও শ্রেষ্ঠতম। তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা ও তার ব্যাপকতাকে নিজেদের সীমিত পাল্লায় পরিমাপ করো না। এখান থেকেই তার সম্পর্কে বিভ্রান্তি বা পথচ্যুতির সৃষ্টি হয় এবং শিরকের বিভিন্ন পথ উন্মুক্ত হয়। তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তিনি স্বয়ং যা কিছু বলেন তার ওপর ঈমান আনো। ধারণা ও অনুমান এবং সাদৃশ্য ও উপমার খেয়ালীপনা থেকে দূরে থাকো।

আয়াত ঃ ২৫৬

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

طاغوت শব্দের বিশ্লেষণ

طاغوت শব্দটি ملكوت ও جبروت শব্দদ্বয়ের অনুরূপ। طغى মূলধাতু থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ হচ্ছে সীমা লংঘন করা। যে বস্তু তার বৈধ সীমা অতিক্রম করে যায় তাকে আরবী ভাষায় বলা হয় طَغٰى। যেমন طَغَى الْمَاءُ "পানি সীমা অতিক্রম করেছে।" সামুদ জাতি যে দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে তার জন্য طَاغِيَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে 'সীমা অতিক্রমকারী দুর্যোগ'। এখান থেকেই এ শব্দটি দাসত্ব ও বন্দেগীর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি বন্দেগীর বৃত্ত

www.pathagar.com

থেকে বেরিয়ে যায় তাকে তাগুত বলা হয়েছে। এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে সেসব বস্তুকেও বুঝায় যা দাসত্বের সীমালংঘনের কারণ ও মাধ্যম হয়ে থাকে। এ কারণেই ভাষাবিদগণ এর ব্যাখ্যা সাধারণত এভাবে করে থাকেন ঃ اَلطَّاغُوْتُ عِبَادَةٌ عَنْ كُلِّ مُعْتَدٍ وَكُلِّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ –"তাগুত মানে হচ্ছে এমন প্রতিটি সত্তা যা দাসত্বের বন্ধন থেকে বের হয়ে যায় এবং এমন প্রতিটি উপাস্য, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয়।"

কুরআন মজীদ শব্দটিকে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছে এবং প্রত্যেক স্থানে তার প্রতিপক্ষের উল্লেখ করে বিভিন্ন অর্থে তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। যেমন আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ এখানে আল্লাহকে প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করায় বুঝা যাচ্ছে যে, তাগুত মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু। সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ তারপর সাথে সাথেই বলা হলো فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ যার ফলে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাগুত মানে হচ্ছে শয়তান। আর শয়তান বলতে মানুষ শয়তান ও জ্বীন শয়তান উভয়কে বুঝায়। এমনিভাবে অপর একটি স্থানে এ শব্দটিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর পরিপন্থী জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً ۢ بَعِيْدًا ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا - النساء : ٦٠-٦١ এ আয়াতে يَتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ এর মুকাবিলায় تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ বলে এটা বুঝানো হয়েছে যে, এখানে তাগুত অর্থ হচ্ছে সেসব বিধি-ব্যবস্থা যা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর পরিপন্থী।

ওপরের বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, যা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে কিংবা অতিক্রম করার কারণ ও মাধ্যম হয় তা সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ –এর মর্মার্থ

ওপরে বর্ণিত ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۲۵۳ আয়াতে রাসূল (স)-এর সান্ত্বনার জন্যে আল্লাহ যে সুন্নাত বা নীতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছিলো এখানে তা আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের মূল দায়িত্ব হচ্ছে শুধু সত্যকে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। আর এ কাজটি যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে, হক বাতিল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যখন সামনে এসে গেছে তখন রাসূলের যে দায়িত্ব তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন দায়িত্ব হচ্ছে সেসব লোকের, যাদের কাছে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে এখন ইচ্ছা হলে তারা ঈমান কবুল করবে আর ইচ্ছা হলে কুফুরী নীতিতে অটল থাকবে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা স্বভাবজাত বা জন্মগতভাবে বাধ্যবাধকতা আরোপের নীতি অবলম্বন করেননি। বরং লোকদেরকে গ্রহণ ও নির্বাচনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তো গোটা দুনিয়াকে সৎপথে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথ অবলম্বনের ব্যাপারে তিনি লোকদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঈমান আনবে সে তার প্রতিদান পাবে। আর যে কুফরীর পন্থা অবলম্বন করবে সে তার জন্য শাস্তি ভোগ করবে। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○- النحل ٣٥-٣٧ "এবং এ মুশরিকরা বলে, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কারো উপাসনা করতাম না। আমরাও করতাম না আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা কোনো বস্তুকে হারামও গণ্য করতাম না, অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এদের পূর্ববর্তীরাও। তাহলে রাসূলদের ওপর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া কি আরো কোনো দায়িত্ব আছে ? আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এ আহ্বান সহকারে যে, হে লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো। অতপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, আবার তাদের কিছু লোক পথভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে। অতপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফিরা করো এবং দেখ, রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে ! (হে মোহাম্মাদ!) যদি তুমি এদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য আগ্রহী হয়ে থাক তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ সেসব লোককে সঠিক পথ দেখান না যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট হবার উপযুক্ত বলে স্থির করেন এবং এদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও নেই।

এটা স্বভাবগত বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি ঘোষণা আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আমরা দীর্ঘসূত্রিতা থেকে বাঁচার জন্য শুধুমাত্র একটি আয়াত উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ বাক্যাংশে যে বাধ্যবাধকতা ও জবরদস্তির বিলোপ ঘোষণা করা হয়েছে তা দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে এ পন্থা অবলম্বন করেননি যে, তাঁর প্রত্যক্ষ ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক নিয়মের শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন কিংবা ভ্রান্ত পথের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন। যদি তিনি এরূপ করতেন তবে কেউ তাকে বাধা দিতে পারতো না। কিন্তু এমনটি করা

www.pathagar.com

হলে তা হতো যৌক্তিকতা ও ইনসাফের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছেন যে, তাঁর নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে তিনি লোকদের সামনে হক ও বাতিল সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। অতপর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করতে চায় তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনের তাওফিক দান করেন। আর যারা ভ্রান্তপথে চলতে চায় তাদেরকে সে পথে চলার অবকাশ দিয়ে দেন।

এ তত্ত্বটি সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো একদিকে সেসব কাফির মুশরিকদের জবাব দেয়া, যারা এ বাধ্যবাধকতার আড়ালে নিজেদের কুফর ও শিরককে নেক কাজ বলে মনে করতো এবং বলতো, তাদের আকীদা ও আমল যদি ভ্রান্তই হয় তবে সবকিছুই তো আল্লাহরই ক্ষমতার অধীন। তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে ঠিক করে দিচ্ছেন না কেন। অপরদিকে নবী করীম (স)-এর নিকট এটা স্পষ্ট করে দেয়া যে, নবী ও রাসূল হিসেবে তাঁর দায়িত্ব শুধু সত্য দীনকে লোকদের সামনে সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। জনগণের ঈমান ও হেদায়াতের পথ অবলম্বন নিশ্চিত ও বাধ্যতামূলক করা তাঁর দায়িত্ব নয়।

এ যুগে কিছু জ্ঞানপাপী এ আয়াতটিকে তার সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে আইনগত বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি অর্থে গ্রহণ করে থাকে এবং একে দলীল হিসেবে পেশ করে বলে যে, ইসলামের মধ্যে যেহেতু কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপের সুযোগ নেই। অতএব ইসলামের নামে অমুক অমুক কাজকে যে শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয় তা স্রেফ মৌলবীদের মনগড়া বুলি ছাড়া আর কিছু না। মূলত ইসলামের সাথে এদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এদের এ যুক্তিকে যদি সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, ইসলামী শরীআত শাস্তি ও দণ্ডমুক্ত একটি শরীআত। এখানে প্রত্যেকের যা ইচ্ছে তাই করার অনুমতি রয়েছে। ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ ও চুরির জন্য যেমন সাজা নেই, তেমনি ডাকাতি, রাহাজানী, যমীনের বুকে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও বিদ্রোহের জন্যও কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, ইসলামে বিভিন্ন অপরাধ দমনের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি রয়েছে যার বাস্তবায়ন দীনের অপরিহার্য অংগ। যদি কেউ নামায না পড়ে, রোযা না রাখে তবে ইসলামী রাষ্ট্র তাকেও শাস্তি দিতে পারে। এটি لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ এর পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে যদি কোনো মুসলমান ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ করে তবে তার জন্যেও ইসলামী আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। এটাও لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -এর খেলাফ নয়। আল্লাহর যমীন থেকে ফিতনা-ফাসাদ দূর করার জন্য ইসলাম ঈমানদারদের ওপর জিহাদ ফরয করেছে এটাও لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -এর বিরোধী নয়।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। কিন্তু সাথে সাথে এ অনুমতিও দেয় না যে, এক ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করার পর যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে, আর সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। বরং ইসলামের সীমা সংরক্ষণ ও নিয়ম-কানুন পালনে সে তাকে বাধ্য করবে। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত মনে করা হয়।

www.pathagar.com

তাই সেখানে রাষ্ট্রের অবাধ্য ব্যক্তিদের জন্যে যদিও বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার স্বাধীনতা তারা লাভ করে থাকে। ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বা নির্দিষ্ট এ রকম ধারণা পোষণের অবকাশ ইসলামে নেই। বরং ইসলামী হুকুমাত হচ্ছে মূলত আল্লাহরই হুকুমাত এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যালয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর আইন-কানুন চালু ও কার্যকর করার একটি মাধ্যম। সেখানে আল্লাহর যাবতীয় নাফরমানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে নাফরমানি গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুক যে গোপন নাফরমানির জন্য আল্লাহ আখেরাতের আদালাত পাকড়াও করবেন। আর প্রকাশ্য নাফরমানির জন্য ইসলামের দুনিয়াবী আদালত গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। ধর্ম ত্যাগ করাও এ ধরনের একটি অপরাধ, বরং গুরুতর অপরাধ। আর এর জন্য ইসলামী ব্যবস্থায় যে শাস্তি দেয়া হয় তা এজন্যে নয় যে, একটি লোককে ইসলাম কবুল করার জন্য বাধ্য করা হোক, বরং এ কারণে শাস্তি দেয়া হয় যে, যে লোকটি রাষ্ট্র ও তার আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছে। এমনিভাবে আমরা একথাও স্বীকার করি যে, একটি জাতির মধ্যে কুফরীর অস্তিত্ব রয়েছে, কেবলমাত্র এ কারণেই ইসলামের পতাকাবাহীরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে পারবে না এবং তরবারীর জোরে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। কাফির জাতির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে শত্রুতামূলক হবে তা অবশ্যই নয়, বরং সন্ধিমূলকও হতে পারে। জিহাদের সূচনা হয়েছে মূলত যমীনের বুক থেকে ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে। যদি এ জিনিসটি (ফিতনা-ফাসাদ) কোথাও দেখা দেয় তবে ঈমানদারদের ওপর এটা কর্তব্য হয়ে পড়ে যে, সামর্থ থাকলে যমীনের বুক থেকে ফিতনা-ফাসাদ নিমূর্ল করার জন্য তারা জিহাদে অবতীর্ণ হবে। বিশেষ করে সেই ফিতনাকে নিমূর্ল করার জন্য যা কুফরী শক্তির পক্ষ থেকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়, যাতে ঈমানদারগণকে তাদের দীন থেকে ফেরানো যায় কিংবা ইসলামী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যায়। ফিতনা সমূলে উৎপাটিত হওয়ার পর ইসলাম এ বিষয়ে অনুমতি দেয় না যে, লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হোক, বরং ইসলামী ব্যবস্থা এ বিষয়ে পূর্ণ অবকাশ রেখেছে যে, কাফিররা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থেকেও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা থাকতে পারে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। কেবলমাত্র বনী ইসমাঈলের মুশরিকদের ব্যাপারটা এ নীতির ব্যতিক্রম। এর কারণসমূহ এ সূরায় ১৯২-১৯৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সূরা বারা'আতের (তাওবা) তাফসীরে আরো অধিক ব্যাখ্যা সহকারে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ঃ "সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে"- এখানে উল্লেখিত বাধ্যবাধকতা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিতর্কের অবসানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে হক ও বাতিলকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। তারপর এখন লোকদের নিজেদেরই এখতিয়ার। যার ইচ্ছা সত্যকে গ্রহণ করবে আর যার মন চায় বাতিলকে আঁকড়ে ধরে

www.pathagar.com

থাকবে। অবশ্য একথাটি মনে রাখা দরকার। এতটা সুস্পষ্ট করে দেয়ার পরও যে ব্যক্তি বাতিলকে আঁকড়ে ধরে থাকবে একদিন আসবে যেদিন এই বাতিল স্বয়ং তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। অটুট রজ্জু একমাত্র তার হাতে থাকবে যে গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু) থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হয়ে যাবে।

অবশেষ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ গুণের উল্লেখ এ তাৎপর্যটিকে তুলে ধরছে যে, যারা গায়রুল্লাহকে ত্যাগ করে আল্লাহর রজ্জুকেই আঁকড়ে ধরে তারা এমন এক সত্তার রজ্জু আঁকড়ে ধরে যিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। তাই প্রতিটি কদমে এবং প্রত্যেক মঞ্জিলে তিনিই হচ্ছেন তাদের ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল। পক্ষান্তরে যারা গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করছে। তারা এমন সব অথর্ব মাবুদের ওপর ভরসা করে বেঁচে আছে যারা এদের সূচনা ও পরিণাম দূরে থাকুক খোদ নিজেদের সূচনা ও পরিণামের খবরও তাদের জানা নেই। এমনকি তাদের এ খবরও নেই যে, কিছু অজ্ঞ লোক তাদের উপাসনা করছে সুতরাং তারা তাদের এ অজ্ঞতা থাকার কথা পরকালে প্রকাশ করবে এবং তাদের সেই উপাসকদের প্রতি অভিসম্পাত করবে।

৮২. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৫৭-২৬০ আয়াত

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ الاية আয়াতে হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পর্কিত আল্লাহর যে সুন্নাত বা নীতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে তার আরো অতিরিক্ত কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অতপর আলোচনার মূল বর্ণনা ধারা অর্থাৎ ইনফাক-এর সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে, এ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা তিনটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। কেননা তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেয়া না হলে তা মনের মাঝে ভালোভাবে বদ্ধমূল হয় না। কুরআন মজীদের সাধারণ বর্ণনাভঙ্গি হচ্ছে, সে প্রথমে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে প্রাকৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করে। তারপর ঐতিহাসিক ও বাস্তবধর্মী উদাহরণের মাধ্যমে তাকে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাই এখানেও সে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। হেদায়াত ও গোমরাহীর সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর মৌলিক বিধান মূলনীতি আকারে পেশ করার পর তিনটি উদাহরণ পেশ করেছে। তন্মধ্যে একটি থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায়, কোন্ ধরনের লোক শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে এবং যাদের গোমরাহী থেকে বেরিয়ে হেদায়াতের পথে আসার সৌভাগ্য হয় না। অপর দুটো দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন্ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা সহায়তা করেন এবং সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত করে ঈমান ও ইয়াকীনের আলো ও হৃদয়ের প্রশস্ততা দান করেন।

এ আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ
اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ
يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ
كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ
وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٥٩﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ
تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ
قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ
مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

www.pathagar.com

২৫৭. যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে।

২৫৮. তুমি কি তাকে দেখোনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রব সম্পর্কে এ কারণে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললো, আমার রব তো তিনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। সে বললো, আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু দেই। ইবরাহীম বললো, যদি একথা ঠিক হয় তাহলে আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে ওঠান। তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেলো। আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ দেখান না।

২৫৯. অথবা যেমন সেই ব্যক্তি যে এমন একটি জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলো যার ঘর-বাড়ীর ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিলো। সে বললো, আল্লাহ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতিকে কিভাবে জীবিত করবেন। তখন আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। অতপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কতকাল এ অবস্থায় ছিলে? বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ। বললেন, না, বরং তুমি পুরো একশ বছর এ অবস্থায় ছিলে। এবার তুমি নিজের খাদ্য ও পানীয় বস্তুর দিকে তাকাও। তার কোনো কিছুই বাসী পর্যন্ত হয়নি। এবং তোমার গাধাটির দিকে দেখো, কিভাবে আমি তাকে জীবিত করি, যাতে করে পুনরুত্থানের ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস জন্মে এবং যাতে করে আমি তোমাকে লোকদের জন্য নিদর্শন বানাতে পারি। এবং হাড়গুলোর দিকে দেখো। আমি কেমন করে তার কাঠামো (কঙ্কাল) দাঁড় করাই, তারপর তাতে গোশ্‌ত লাগিয়ে দেই। এভাবে সত্য যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেলো সে বলে ওঠলো, আমি জানি (মেনে নিলাম) আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

২৬০. এবং স্মরণ করো যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার রব! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন ঃ তুমি কি এটা বিশ্বাস করো না? বললো, বিশ্বাস অবশ্যই করি। কিন্তু আমি চাই যে, আমার অন্তরটা পুরোপুরি প্রশান্তি লাভ করুক (নিশ্চিত হোক)। বললেন, তাহলে চারটি পাখী নাও এবং সেগুলোকে নিজের পোষ মানাও। অতপর তাদেরকে টুকরো করে একেকটি অংশ একেকটি পাহাড়ে রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও অতি জ্ঞানসম্পন্ন।

www.pathagar.com

৮৩. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৫৭

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

وَلِيٌّ শব্দের অর্থ

'ওলী' শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী, কর্ম সম্পাদনকারী, সাথী ও সহযোগী।

نُوْرٌ ও ظُلُمٰتٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ এবং তার প্রকৃতি

'নূর' শব্দের অর্থ এখানে ঈমানী, আমলী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক আলো বা জ্যোতি। এমনিভাবে 'যুলুমাত' শব্দের অর্থ এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক অন্ধকার। যেহেতু হকের আলোর উৎস একটাই অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা। তদুপরি হকের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা নেই বরং আছে একত্ব। এ কারণে "নূর" শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'যুলুমাত' শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এর বহিঃপ্রকাশের পথও বিভিন্ন এবং এর মেযাজ বা ধরন-ধারণেও রয়েছে বিক্ষিপ্ততা ও মতদ্বৈততা।

'তাগুত' শব্দের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে মৌলিক তত্ত্ব

অর্থাৎ হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, বান্দাহ তার পালনকর্তার অনুগত থাকবে অথবা অন্য কারো। যদি আল্লাহর অনুগত থাকে তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাহর অভিভাবক ও সাহায্যকারী হয়ে যায় এবং নিজ অনুগ্রহে ধাপে ধাপে তাকে অসৎ প্রবৃত্তির যাবতীয় কালিমা ও কুফর, শির্ক ও মুনাফেকীর সর্বপ্রকার অন্ধকার থেকে বের করে পাকাপোক্ত ঈমান ও স্বচ্ছ তাওহীদের রাজপথে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর বান্দাহ যদি স্বীয় পালনকর্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য পথে চলতে শুরু করে তখন সে শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের শিকার হয় এবং শয়তান তার লাগাম নিজের হাতে নিয়ে বিবেক-বুদ্ধির সকল আলো থেকে দূরে সরিয়ে তাকে গোমরাহীর গর্তে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে خانه خالى را ديو ميگيرد -"যে ঘরে মানুষ থাকে না তা শয়তানের আবাসস্থলে পরিণত হয়।" এমনিভাবে যে অন্তরে ঈমান থাকে না তা শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। শয়তান এ ধরনের লোককে গোমরাহীর ময়দানে বিভ্রান্ত ও দিশাহারা করে রাখে। সূরা আল

www.pathagar.com

আনআমে এ তাত্ত্বিক দিকটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে ঃ قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ - ٧١ -"বলে দাও, [হে নবী] আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাকে ডাকবো যে আমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে এবং আল্লাহর হেদায়াত লাভ করার পর আমরা কি উল্টো পেছনে ফিরে যাবো, সে ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান প্রলোভন দেখিয়ে বিপথগামী করে কোনো ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে ?"–সূরা আল আনআম ঃ ৭১। সূরা আল আ'রাফেও এর উল্লেখ রয়েছে ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ - ١٧٥ "আর তুমি তাদেরকে সে লোকের ঘটনা শুনিয়ে দাও যাকে আমি আমার নিদর্শন দান করেছিলাম। তারপর সে তা পরিহার করে বেরিয়ে যায়। অবশেষে শয়তান তার পেছনে লেগে যায়। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৫। একথাটিই সূরা যুখরুফেও বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ - ٣٦ -"যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে বেপরোয়া হয়ে যায় আমি তার ওপর একটি শয়তানকে বিজয়ী করে দেই। তখন সে তার সাথী হয়ে যায়।"–সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬

আয়াত ঃ ২৫৮

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

اَلَمْ تَرَ শব্দ দ্বারা সম্বোধনের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

২৫৮ আয়াতে اَلَّذِىْ বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে

اَلَّذِىْ শব্দ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে তা যদিও এখানে সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু আমাদের মুফাস্সিরগণ সাধারণত এর দ্বারা নমরূদকে বুঝিয়েছেন। এটাই সঠিক বলে মনে হয়। নমরূদ ইবরাহীম (আ)-এর সমকালীন যুগের বাদশাহ ছিলো এবং তালমুদে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তার সেই বিতর্কেরও উল্লেখ রয়েছে। যার দিকে কুরআন এখানে ইংগিত করেছে।

অবতার বাদশাহর ধারণা

فِىْ رَبِّهٖ রব সম্পর্কে বিতর্কের কারণ এ হতে পারে যে, সে যুগে যে ব্যক্তি বাদশাহ হতো সাধারণত সে-ই স্বঘোষিত অবতার বাদশাহ (GOD KINGS) হিসেবে নিজেকে

জাহির করতো। অর্থাৎ তার জাতির লোকেরা যেসব দেবতার উপাসনা করতো বাদশাহকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবতার প্রতিভূ মনে করা হতো। এভাবে বাদশাহ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় ধরনের কর্তৃত্ব লাভ করতো। ভারতবর্ষ, চীন, মিসর প্রভৃতির প্রাচীন বাদশাহদের অধিকাংশরই অনুরূপ মর্যাদা ছিলো। প্রাচীন সহীফাসমূহ ও কুরআন উভয় থেকে একথা জানা যায়। নমরূদের জাতি যেসব দেবতার উপাসনা করতো তাদের মধ্যে সূর্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতার আসন লাভ করেছিলো। সুতরাং নমরূদকে অবশ্যই সূর্য দেবতার অবতার হিসেবেই মান্য করা হতো। এ ধারণার ফলে স্বভাবতই তার রাজত্বে অন্য কোনো খোদার আনুগত্যের দাওয়াত তার জন্য একেবারেই অসহনীয় ব্যাপার ছিলো। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) যখন একথা ঘোষণা দিলেন যে, প্রকৃত প্রভু তো কেবলমাত্র এক আল্লাহই। তিনি ছাড়া কোনো পালনকর্তা নেই, তখন এ দাওয়াতকে সে তার কর্তৃত্বের ওপর হয়ত একটা বিরাট আঘাত মনে করে থাকবে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ডেকে এনে হয়ত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকবে, সে আবার কোন্ রব তুমি যার দাওয়াত দিচ্ছো ? রবতো আমিই। আমিই তো সূর্য দেবতার প্রতিভূ এবং তার অবতার।

গোমরাহীর সবচেয়ে বড় কারণ অহংকার

أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ঃ অর্থাৎ খোদায়ী দাবির এ অহংকারে সে এজন্যে মেতে ওঠেছে যে, আল্লাহ তাকে শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছে। উচিত তো ছিলো আল্লাহর দেয়া এ অনুগ্রহ লাভ করার পর সে আল্লাহর কৃতজ্ঞ ও অনুগত বান্দাহ হিসেবে নিজেকে পেশ করবে। কিন্তু সংকীর্ণমনা ও স্বল্প বুদ্ধির লোকদের জন্য নিয়ামত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোমরাহীর কারণ হয়েছে এবং তারা একে কৃতজ্ঞতার স্থলে অকৃতজ্ঞতার কারণ বানিয়েছে। ক্ষমতা লাভ করার পর যারা এ ক্ষমতাকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান মনে না করে স্বীয় যোগ্যতায় জ্ঞান-গরিমা ও প্রচেষ্টার ফল বলে মনে করে বসে, তারা একথাটি সম্পূর্ণ ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করছেন। বরং অহংকারে মত্ত হয়ে তারা স্বয়ং খোদার আসনে সমাসীন করার চেষ্টায় মেতে ওঠে এবং এজন্যে খোদার অবতার অথবা প্রতিভূ কিংবা আল্লাহর ছায়া ইত্যাদি পরিচয়ে নিজদেরকে পেশ করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। তাই ধন-দৌলত নিয়ামত এবং ক্ষমতার অহংকার যুগে যুগে গোমরাহীর অন্যতম বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। খুব কম সংখ্যক সৌভাগ্যবান এমন পাওয়া যাবে যে নিজেকে এ ফিতনা থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

নবীদের বিতর্ক পদ্ধতি

নমরূদের প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর রবের পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে সে কথাটিই বললেন যা ছিলো একেবারে সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তিনিই আমার রব যার হাতে আমার জীবন ও মৃত্যু। যে ব্যক্তিই জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনা করে, যদি তার মস্তিষ্কে কোনোরূপ গোলোযোগ না থাকে তবে এ প্রশ্নই খোদাকে স্বীকার করতে

www.pathagar.com

তাকে বাধ্য করে। কিন্তু নমরূদের মাথায় ক্ষমতার ভূত ঢুকেছিলো। তাই এ সুস্পষ্ট বাস্তবতার বিরুদ্ধেও সে প্রতিবাদ করে বললো, জীবন ও মৃত্যু দেয়ার ক্ষমতা তো আমিও রাখি। যাকে ইচ্ছা শিরোচ্ছেদ করে দেবো। যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবো। বস্তুত নমরূদের এ প্রতিবাদ ছিলো সম্পূর্ণ বোকামী পূর্ণ ও হাস্যকর। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কথা। আর এটি ছিলো সম্পূর্ণ অন্য কথা। হযরত ইবরাহীম (আ) ইচ্ছা করলে উভয় ধরনের কথার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে স্পষ্ট করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন। তার স্পষ্ট বক্তব্য পেশের পর এ ধরনের প্রতিবাদ সে-ই করতে পারে যে নিরেট গোয়াতুর্মীতে লিপ্ত হতে চায়। এ কারণে তিনি তাকে আর অধিক বিতর্কের সুযোগ দেয়াটা পসন্দ করলেন না। নবীগণ বিতর্ককারী বা বচসাকারী নন। বরং তারা হচ্ছেন দা'য়ী বা আহ্বানকারী। তাই তিনি এ বিশেষ দিকটিকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর রবের অপর একটি গুণ বর্ণনা করলেন। যে ব্যাপারে বিতর্ক করার পথ নমরূদের জন্য পুরোপুরি বন্ধ ছিলো। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি তাই হয় তবে আমার রব প্রতিদিন সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন। তুমি একটি দিন শুধু তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তির এ আঘাত এতটা জোরদার ছিলো যে, সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। এখানে বাগ্মীতা বা ভাষা শৈলীর একটি সূক্ষ্ম দিক লক্ষণীয় আর তা হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ) বিশেষ করে সূর্যকে করায়ত্ব করার কথা উল্লেখ করেছেন, যা নমরূদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ উপাস্যের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলো এবং সে স্বঘোষিতভাবে নিজেকে এ শ্রেষ্ঠ উপাস্যের প্রতিভূরূপে আসীন করে রেখেছিলো। অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন সূক্ষ্মতর ভর্ৎসনার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যালিমদেরকে হেদায়াত দান করেন না।" হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে সংক্ষেপে এটাই মূলনীতি। একে সুস্পষ্ট করার জন্য উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে "যালিম" শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কুরআন মজীদের পরিভাষায় যালিম বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে যারা আল্লাহর নেয়ামত ও তাঁর দেয়া ক্ষমতা ও যোগ্যতার অর্থ ব্যবহার করে। যারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে তাঁর অনুগ্রহ মনে করার পরিবর্তে নিজের হক বা অধিকার বলে মনে করে। যারা নিয়ামত লাভ করার পর নিয়ামত দাতা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে গর্ব ও অহংকারে মেতে ওঠে এবং ইবলিসের ন্যায় দম্ভ প্রকাশ করে, যে খোদার বন্দেগী ও আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করার পরিবর্তে নিজে খোদার আসনে সমাসীন হয় এবং নিজেকে প্রভু ও মনিব বলে মনে করে, তাদের ব্যাপারে বলা হলো, যারা এ যুলুমের পথ অবলম্বন করে তাদের জন্য হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত হয় না। এদের সামনে সত্য যতই প্রকটভাবে উন্মোচিত হোক না কেন তারা তা কবুল করার পরিবর্তে বিতর্ক ও বচসার কোনো না কোনো পথ খুঁজে বের করবেই। এমনকি এরূপ কোনো পথ যদি তারা খুঁজে নাও পায় তবে নমরূদের ন্যায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও সত্যকে কবুল করবে না।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২৫৯

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ قف وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

اَوْ অব্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্র

اَوْ অব্যয়টি মূলত বিভিন্নতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে সেসব লোকের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, ওপরে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ বাক্য দ্বারা যাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এবার এখানে সে সমস্ত লোকের উপমা দেয়া হচ্ছে, اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ বাক্য দ্বারা যাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন মু'মিন বান্দাহ যিনি দৃঢ় বিশ্বাস লাভে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন

এ শ্রেণী ভাগের উদাহরণ এ সূরারই ১৭-২০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে আমাদের মতে কাশ্‌শাফ প্রণেতার এ ধারণা সঠিক নয় যে, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিটি কাফের ছিলো। বরং এমন একজন মু'মিন বান্দাহ বলে বুঝা যায় যিনি মূলত ঈমানদার ছিলেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন ঈমানের ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রশান্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে যাকে বলা হয় হাক্কুল ইয়াকিন তথা অটল বা ধ্রুব বিশ্বাস। "এভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া একটি জনপদকে কেমন করে আল্লাহ জীবিত করবেন" তার এ প্রশ্নটি অস্বীকার করার অর্থে নয়, বরং বিস্ময় প্রকাশার্থে। অনেক সময় মানুষ একটি বিষয়কে এজন্যে মেনে নেয় যে, সহজাত বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি তার পক্ষে সাক্ষী দেয়। কিন্তু মূলত বিষয়টি এতটা বিস্ময়কর লাগে যে, বার বার সে সম্পর্কে মনের মধ্যে এ প্রশ্ন উঁকি দিতে থাকে যে, কিভাবে এটি সংঘটিত হবে ? এ প্রশ্ন অস্বীকৃতি মনোভাব থেকে নয়। বরং প্রকৃত সত্য অন্বেষণের ইচ্ছা ও আবেগ থেকে উত্থিত হয়। বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালীভাবে উত্থিত হয় যখন সামনে এরূপ কোনো দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যা অন্তর্লোককে আলোড়িত করে তুলে। এ অবস্থা ঈমানের পরিপন্থী নয়। বরং সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর যে ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত এ অবস্থায় হওয়া তার অন্যতম দাবি। এটি আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদের সাধনা একটি স্তর, যা প্রতিটি তত্ত্ব

www.pathagar.com

অনুসন্ধানীকে অতিক্রম করতে হয় এবং এ যাত্রা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না দৃষ্টি ও অন্তর গভীর বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। এ সফরের প্রতিটি মঞ্জিল যদিও উন্নত থেকে উন্নতর অবস্থার দিকে পা বাড়াবার শামিল। কিন্তু একজন আরিফ বা আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তার প্রতিটি আজ তার গতকালের চেয়ে এত অধিক আলোকময় হয় যে, সেই গতকালটি তার নিকট আজকের তুলনায় রাত মনে হয়।

২৫৯ আয়াতে اَلَّذِىْ শব্দ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে ?

اَلَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ দ্বারা এখানে কার দিকে ইংগিত করা হয়েছে ? এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব দেয়া কঠিন। তাফসীরকারকদের কেউ খিযির (আ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, উযাইর (আ)। কিন্তু প্রাচীন সহীফাসমূহে এ দু বুযুর্গ সম্পর্কে এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না যার প্রতি কুরআন এখানে ইংগিত করেছে। অবশ্য যিহিস্কেল নবীর সহীফায় একটি বিষয় পাওয়া যায় যা এর সাথে প্রায় মিলে যায়। যার ধরনটা একটি অলৌকিক দৃশ্য অবলোকনের মত। লক্ষ করুন ঃ

হিযকীঈল নবীর একটি অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন

"সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল, এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন ; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন ; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে বিস্তর অস্থি ছিল ; এবং দেখ, সে সকল অতিশয় শুষ্ক। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে ? আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু। তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম, তদনুসারে ভাববাণী বলিলাম ; আর আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ হইল, আর দেখ, মড়মড়ধ্বনি হইল, এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, তাহাদের উপরে শিরা হইল, ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং চর্ম্ম তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা ছিল না। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, আত্মার উদ্দেশে ভাববাণী বল, হে মনুষ্য-সন্তান, ভাববাণী বল, এবং আত্মাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আত্মন্ ; চারি বায়ু হইতে আইস, এবং এই নিহত লোকদের উপরে বহ, যেন তাহারা জীবিত হয়। তখন, তিনি আমাকে যে আজ্ঞা দিলেন, তদনুসারে আমি ভাববাণী বলিলাম ; তাহাতে আত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহারা

www.pathagar.com

জীবিত হইল, ও আপন আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল ; সে অতিশয় মহতী বাহিনী।"–যিহিষ্কেল, অধ্যায় ৩৭ ঃ ১-১০

কুরআন ও তাওরাতের মধ্যে মতভেদের ধরন

যদিও কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এ পার্থক্য বিপরীতধর্মী নয় বরং এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতের পার্থক্য। একই বিষয়ের দ্বিবিধ বর্ণনায় এ ধরনের পার্থক্য অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়। যাকে পরস্পর বিরোধী বলা যায় না। বরং কোনোটি সংক্ষিপ্ত ও কোনোটি বিস্তারিত এটাই ধরে নেয়া হয়। কুরআন মজীদে কোনো কথা অতিরিক্ত রয়েছে যা তাওরাতে নেই। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ এটি সরাসরি আল্লাহর বাণী এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। যেমন তাওরাতে একথার উল্লেখ নেই যে, খোদ যিহিষ্কেলকেও একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে তার খাদ্যদ্রব্য বাসী না হওয়া ও গাধার পুনর্জীবিত হওয়ারও কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এসবের উল্লেখ না করার অর্থ কিছুতেই এ নয় যে, যিহিষ্কেল এসব কিছু প্রত্যক্ষ করেননি। বরং তাকে যাকিছু প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে তার মধ্যে এগুলোও ছিলো। কিন্তু তাওরাতে হয়ত এগুলোর উল্লেখ করা হয়নি কিংবা উল্লেখ ঠিকই করা হয়েছে কিন্তু তাওরাতের অনুসারীরা তা নষ্ট করে দিয়েছে।

আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য অদৃশ্য জগত ভ্রমণ

কুরআনে উদ্ধৃত ঘটনাটি যদি যিহিষ্কেল নবীর অদৃশ্য জগত অবলোকনের উপরোক্ত ঘটনাটির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া হয় তবে তার অর্থ হবে এই যে, আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য এই অদৃশ্য জগত ভ্রমণের এটি ঠিক তেমনি একটি ঘটনা ছিলো যেমনি অদৃশ্য জগত ভ্রমণের আরো শ্রেষ্ঠতর উদাহরণ হচ্ছে আমাদের নিকট মে'রাজের ঘটনা। এ সমস্ত ঘটনা যেহেতু এমন এক জগতে সংঘটিত হয় যা আমাদের এ জড় জগতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন এবং স্থান ও কালের গণ্ডি বহির্ভূত। তাই এক জগতের হুকুম-আহকাম বা নিয়ম-নীতিকে অন্য জগতের সদৃশ্য বলে অনুমান করা ঠিক নয়। সে জগতে শত শত বছর ও যুগ-যুগের ঘটনা কয়েক মিনিট এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়।

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا ঃ এটি হচ্ছে বিধ্বস্ত জনপদটির একটি চিত্র। সাধারণত এটাই হয় যে, পুরনো দালান-কোঠা যখন বিধ্বস্ত হয় তখন তার কঙ্কর, মিনারা এবং তার ছাদ থেকেই ধ্বংসের সূচনা হয়। প্রথমে ওপরের দিকটাই নীচের দিকে ধ্বসে পড়ে। তারপরই আসে দেয়ালগুলোর পালা।

أَنَّى يُحْيِ هٰذِهِ প্রশ্নটির ধরন

أَنَّى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ঃ এ প্রশ্নটি অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার অর্থে নয়, যেমনটা ইতিপূর্বে আমি ইংগিত করেছি। বরং এটি বিস্ময়সূচক প্রশ্ন। এর উদ্দেশ্য ছিলো হাক্কুল ইয়াকীন বা সুদৃঢ় প্রত্যয় বা ধ্রুব বিশ্বাস হাসিল করা। সুতরাং এটি ঈমানের

www.pathagar.com

পরিপন্থী নয়। বরং তার অন্যতম ও উচ্চতম স্তর। ইয়াকীনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাই এর উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক স্তরের লোকদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি নবীগণও যাঁরা ঈমান ও ইয়াকীনের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন—এর ব্যতিক্রম নন। বরং ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধির জন্য সদা-সর্বদা দোয়া করতে থাকেন। এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন একজন তত্ত্ব-অনুসন্ধানীর স্বীয় অন্তর্লোক বা আধ্যাত্মিক অবস্থান থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। এ প্রশ্ন সে অন্যদেরকে নয় বরং নিজকেই করে থাকে এবং এর জবাব অন্যদের নিকট নয় বরং সেই অদৃশ্য পথ প্রদর্শকের নিকটই চায় যাঁর জ্যোতি তার অন্তর্লোকের উচ্চ দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। মনে হয় এ ধরনেরই এক কৌতুহল বা ব্যাকুলতা যিহিস্কেল তার মধ্যে অনুভব করছিলেন তাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করানোর মাধ্যমে তার এ ব্যাকুলতা দূর করে দিলেন। এভাবে মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তার হৃদয় প্রশান্তির শীতলতা লাভ করেছে শুধু তাই নয়, বরং বনী ইসরাঈলকে জাগ্রত করার সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যও তার অন্তর পূর্ণরূপে শক্তিশালী হয়ে গেলো যে জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এটাই সুন্নাতে ইলাহী বা আল্লাহর শাশ্বত নীতি যে, হেদায়াত লাভে আগ্রহীদের জন্য তিনি তাঁর পথসমূহ উন্মুক্ত করে দেন। তাদের দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন এবং তাদেরকে আলো দান করেন।

كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ঃ এ প্রশ্ন ও উত্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলমে বরযখ অর্থাৎ মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানে মানুষের যে কালটা অতিবাহিত হবে তার হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা। কিয়ামতের দিন কবর থেকে উত্থিত হবার পর তাদের কবরের মধ্যকার কোনো অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে না। এরূপ মনে হবে যে, এ মাত্র ঘুমিয়েছিলো, এখন জেগে ওঠেছে। আজ মনে হচ্ছে যে, দুনিয়ার জীবন, তারপর মৃত্যু, তারপর বরযখ, তারপর কিয়ামত—এসব অনেক দূরের ব্যাপার। তার জন্য এখন থেকেই নিজের জীবন-জীবিকাকে বিস্তারিত করার কি প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন ওঠবে তখন মনে হবে যা কিছু গত হয়েছে তা মোটেই দূরের ব্যাপার নয় বরং একেবারে সকাল-সন্ধ্যার ঘটনা।

وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ ঃ এখানে كَيْفَ اَنْظُرْ এরপর نُحْيِيْهِ শব্দগুলো উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ দেখ, কিভাবে আমি এ গাধাটিকে জীবিত করে দিচ্ছি। এ উহ্য রাখার কারণ হচ্ছে এই যে, পরবর্তীতে গাধাটিকে জীবিত করার চেয়েও অধিক বিস্ময়ের ঘটনা—তার পঁচে-গলে যাওয়া হাড়গুলো জুড়ে দেয়ার ও তার ওপর গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দেয়ার বর্ণনা আসছে। সেই উল্লেখের মধ্যে এ উহ্য কথাটি স্বতঃই বিদ্যমান রয়েছে।

وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ এখানে (و) সংযোজনকারী অব্যয় (حرف عطف) অথচ এখানে এমন কোনো শব্দ বর্তমান নেই এর معطوف عليه (যার সাথে সংযোজিত) হতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে معطوف عليه উহ্য রয়েছে। এ ধরনের উহ্য

www.pathagar.com

থাকার উদাহরণ কুরআন মজীদে অনেক রয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হবে। এ উহ্য রাখার উপকারিতা এই যে, শব্দ অনেক কম ব্যবহৃত হয়। অথচ কথা অনেক বেশী সন্নিবেশিত করা যায়। কারণ যে কথাগুলো তা এরূপ বর্ণনা পরম্পরা দ্বারাই বুঝতে পারা যায়, তা এরূপ জায়গায় উহ্য রাখা যায়। সুতরাং এখানে পুরো কথাগুলো হবে এরূপ ঃ "এবং তুমি তোমার গাধাকে দেখ, কিভাবে আমি তাকে জীবিত করে দিচ্ছি, যাতে করে মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমার ঈমান পাকাপোক্ত হয়ে যায় এবং যাতে করে তোমাকে আমি লোকদের জন্য নিদর্শন বানাতে পারি।"

বনী ইসরাঈলের জন্য জীবনের পয়গাম

"এবং যাতে করে আমি তোমাকে জনগণের জন্যে নিদর্শন বানাতে পারি।" অর্থাৎ আমি তোমাকে আল্লাহর নিদর্শনের এই পর্যবেক্ষণ এজন্যেও করিয়েছি, যাতে তুমি বনী ইসরাঈলের জন্য এ ব্যাপারে নিদর্শন হতে পারো যে, আল্লাহর জন্য এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, তিনি নতুন করে তাদেরকে গোলামী ও পরাধীনতার লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন এবং শক্তি ও সম্মানজনক জীবন দান করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যিহিস্কেল নবী অবিশ্বাসীদের প্রতি নয়, বরং বনী ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে নতুন করে জীবিত করাই ছিলো তার বিশেষ উদ্দেশ্য। তাওরাত থেকে জানা যায়, সে যুগে বনী ইসরাঈল নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলো। যেমন ওপরে আমি যিহিস্কেলের সহীফা থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত করেছি তার সমাপ্তি টানা হয়েছে নিম্নোক্ত শব্দগুলো দিয়ে ঃ

"পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি সমস্ত ইস্রায়েলকুল ; দেখ, তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়াছে ; আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইলাম। এই জন্য তুমি ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে ইস্রায়েল দেশে লইয়া যাইব। তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, কেননা আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, এবং হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব। আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে ; এবং আমি তোমাদের দেশে তোমাদিগকে বসাইব, তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছি, এবং ইহা সিদ্ধ করিয়াছি ; সদাপ্রভু এই বাক্য বলেন।"–যিহিস্কেল, অধ্যায় ৩৭ ঃ ১১-১৪

এ থেকে বুঝা যায়, যিহিস্কেল নবীকে এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করানোর উদ্দেশ্য ছিলো একদিকে মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যেনো তার অন্তর্চক্ষু খুলে যায়। অপর দিকে তার এ পর্যবেক্ষণ যাতে বনী ইসরাঈলের জন্য নব জীবনের বার্তা বয়ে আনে এবং তাদের মধ্যে এ মনোবল স্থাপিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও আবার একটি নতুন জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে لَمْ يَتَسَنَّهْ অর্থাৎ তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পক্ষান্তরে গাধার সবকিছু পঁচে-গলে একাকার হয়ে গেছে। সম্ভবত কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একই ধরনের অবস্থায় দু'টি ভিন্ন প্রভাব কেন প্রকাশ পেলো ? তার জবাব হচ্ছে ঃ প্রশ্নকারীর প্রকৃত কৌতুহল ও ব্যাকুলতা যে বিষয়ে ছিলো তা এই ছিলো যে, একটি জিনিস মরে-পঁচে মাটির সাথে মিশে যাবার পর নতুন করে কিভাবে জীবন লাভ করতে পারে ? এ পর্যবেক্ষণ তার এ ব্যাকুলতাকে দূর করে দিলো। একই সময়ে পানাহারের দ্রব্যগুলোতে কোনোরূপ পরিবর্তন না আসাটা একথা প্রমাণ করলো যে, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোনো একটি বস্তু পঁচে-গলে যাওয়ার পরও তাতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন। আবার তিনি চাইলে কোনো বস্তুকে যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের কার্যকারিতার উর্ধেও রাখতে পারেন। কুরআন মজীদে আসহাবে কাহ্ফের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে এর উদাহরণ।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ এ পর্যবেক্ষণের পর যখন তার নিকট মৃত্যু পরবর্তী জীবনের রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেলো তখন সে চীৎকার করে বলে ওঠলো, এবার আমি মেনে নিচ্ছি যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। এখানে اَعْلَمُ। শব্দের অর্থ পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল জ্ঞান। অর্থাৎ এমন জ্ঞান যাকে কুরআন মজীদ ইলমুল ইয়াকীন নামে অভিহিত করেছে। এ পূর্ণ জ্ঞান তিনি কিয়ামত সম্পর্কেও লাভ করলেন এবং বনী ইসরাঈলের ভবিষ্যত সম্পর্কেও। অর্থাৎ এ পর্যায় তিনি বনী ইসরাঈলের শুকনো হাড়গুলোতে প্রাণের সঞ্চার এবং তাদের দেহে চামড়া ও গোশ্ত আচ্ছাদিত করার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। সাথে সাথে তার মিশনের সফলতার ব্যাপারেও তিনি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে গেলেন। এ দিক থেকেই তাকে তার জাতির জন্য একটি নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আয়াত ঃ ২৬০

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

اطمينان শব্দের মর্মার্থ

اطمينان -এর অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তু তার নিজস্ব স্থানে এমনভাবে স্থির ও অনঢ় থাকা যে, এদিক ওদিক ঝুঁকে পড়ার কিংবা নড়বড়ে হওয়ার কোনোরূপ আশংকা থাকে না। বাসন বা পাত্র যখন স্বস্থানে ঠিক স্থির হয়ে বসে যায় তখন বলা হয় اطمان। বাতির

www.pathagar.com

শিখা যদি একেবারে সোজা থাকে, বাতাসের দোলায় কোনো দিকে নুয়ে পড়ছে না, তখন এর জন্যেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখান থেকেই এ শব্দটি মনের অবস্থা প্রকাশের জন্যও ব্যবহার হতে থাকে। যে নফ্স, আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে যথাস্থানে স্থির থাকে অবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে তার স্থিরতা ও দৃঢ়তায় কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না, তাকে বলে "নফসে মুতমাইন্নাহ" (স্থির চিত্ত বা প্রশান্ত অন্তর)। এ প্রশান্ত বা স্থিরতা ঈমানের অন্যতম উচ্চ সোপান। কুরআন মজীদে একে শরহে সদর (চক্ষের প্রশস্ততা) শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়েছে। নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -"আমি কি তোমার বক্ষদেশকে প্রশস্ত করে দেইনি ?" আধ্যাত্মিক জগতের সোপান ও মাকামসমূহ স্তরে স্তরে অতিক্রম করতে হয়। তাই অন্তর্লোক সফরের এক পর্যায়ে নবীগণও এ সোপানে উন্নীত হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়। অথচ ঈমান বলতে যা বুঝায়, তা তাঁরা প্রথম দিন থেকেই লাভ করে থাকেন। এ আকাঙ্ক্ষা ঈমানের পরিপন্থী নয় বরং এটি হচ্ছে ঈমানের পরিপূর্ণতা।

فَصُرْهُنَّ শব্দের বিশ্লেষণ

صَوْرٌ -এর অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, ঝুঁকে পড়া। صُرْتُ الشَّيْءَ অথবা أَصَرْتُ الشَّيْءَ -এর অর্থ হবে আমি তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছি। নুইয়ে ফেলেছি। তাকে পোষ মানিয়েছি। এ থেকেই فَصُرْهُنَّ শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ সেই প্রাণীগুলোকে পোষ মানিয়ে নাও।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আবেদন বক্ষদেশ প্রশস্তের উদ্দেশ্যে ছিলো

যেভাবে উপরোক্ত ঘটনায় একজন মু'মিন বান্দাহ তার একটি মানসিক ব্যাকুলতার কথা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করলে তিনি তার জন্য তাঁর অদৃশ্য জগতের কিয়দংশ উন্মোচিত করে তার ব্যাকুলতা প্রশমিত করেন, তেমনি হযরত ইবরাহীম (আ) আধ্যাত্মিক চিন্তা-গবেষণার এক পর্যায়ে (এ পর্যায়টি তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ই হওয়ার কথা) এ বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা কিভাবে মৃতদেরকে জীবিত করবেন তা তাকে প্রত্যক্ষ করানো হোক। এ বাসনা হচ্ছে ঠিক তেমনি একটি কামনা যেভাবের কামনা হযরত মূসা (আ)-এর মাঝে সৃষ্টি হয়েছিলো আল্লাহকে দেখার জন্য। এ বাসনার কারণ এই ছিলো না যে, নাউজুবিল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস ছিলো না। বিশ্বাস অবশ্যই ছিলো। কিন্তু একটি তত্ত্ব বিবেকের নিকট যতই স্পষ্ট ও সপ্রমাণিত হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত তা অদৃশ থেকে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মেনে নেয়া সত্ত্বেও মানুষ সে বিষয়ে "শরহে সদর" বা বক্ষদেশ উন্মুক্ত করতে আকাঙ্ক্ষী থাকে। এ আকাঙ্ক্ষা নবীদের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। আমাদের নবী করীম (স)-কেও কুরআনে এ দোয়া শেখানো হয়েছে ঃ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا - "দোয়া করতে থাকো যে, হে রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" এ তৃষ্ণা তো কেবল তখন দূর হবে যখন জাগতিক কার্যকারণের যাবতীয় পর্দা মাঝ থেকে অপসারিত করা হবে এবং

www.pathagar.com

প্রকৃত তত্ত্ব (হাকীকত) সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়ে সামনে এসে যাবে। কিন্তু এ জিনিসটি এ জগতে নয় বরং পরকালে অর্জিত হবে। অবশ্য হৃদয়ের প্রশান্তি এবং শরহে সদর বলতে যা বুঝায় তা থেকে তিনি তাঁর সেসব বান্দাহকে বঞ্চিত রাখেন না যারা খাঁটি অন্তরে তার আকাঙ্ক্ষী হয়। এমন কি এ উদ্দেশ্য পূরণার্থে যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন তবে তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাহদেরকে স্বীয় কুদরতের বিশেষ দিকসমূহও প্রত্যক্ষ করান। এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ। তিনি হচ্ছেন তাঁর ওপর ঈমান পোষণকারীদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক। তিনি কখনো তাদেরকে অস্থিরতা ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ফেলেন না। বরং সবসময় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলো এবং ব্যাকুলতা থেকে প্রশান্তির দিকে এগিয়ে নিতে থাকেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ব্যাকুলতা দূর করার জন্য তাকে বলা হলো, চারটি পাখি নিয়ে প্রথমে তাদেরকে নিজের পোষ মানাও। অতপর তাদেরকে টুকরো টুকেরা করে তাদের গোশতের এক একটি অংশ তোমার আশপাশের পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। তারপর তাদেরকে তোমার দিকে ডাক। তারা তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে।

চারটি পাখির নির্দেশ সম্ভবত এজন্যে দেয়া হয়েছিল যে, চতুর্দিক থেকে তাদের একত্রিত হওয়ার দৃশ্যটা যেনো তাকে প্রত্যক্ষ করানো যায়। যাতে করে এ ব্যাপারে তার বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, কিয়ামতের দিন শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর সমগ্র সৃষ্টি এভাবে চারদিক থেকে নিজেদের রবের দিকে দৌড়ে আসতে থাকবে।

নিজ থেকে পোষ মানিয়ে নেয়ার কথাটি সম্ভবত এ কারণে বলা হয়েছে যে, সে যেনো ভালোভাবে তাদেরকে চিনে রাখে। যাতে করে তার এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহের সৃষ্টি না হয় যে, যে পাখিগুলো জীবিত হয়ে এসেছে সেগুলোই যাদেরকে সে টুকরো টুকরো করেছিলো। অন্য পাখি নয়। সাথে সাথে এ মূল তত্ত্বটিও যেনো তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বিতীয়বার যে জীবন লাভ করবে তাতে দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় স্মৃতিও জীবিত হয়ে যাবে। এমনকি পোষা পাখিগুলো তাদের মালিকদের কণ্ঠ পর্যন্ত চিনতে পারবে।

যদিও এখানে পাখিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলার অর্থে কোনো বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু এ থেকে এ অর্থ গ্রহণে কোনোরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই। প্রথমত, এখানে جُزْءًا (অংশ) বলে যে শব্দটি এসেছে তা একথারই স্পষ্ট ইংগিত বহন করে যে, টুকরো টুকরো করেই পাহাড়ে রেখে আসার জন্য তাকে বলা হয়েছিলো। যদি এক একটি পাখিকে জীবিত অবস্থায় পৃথক পৃথক পাহাড়ে রেখে দেয়াটাই বুঝানো হতো তবে সে অর্থ প্রকাশের জন্য ভাষার এ ধরনের বাচনভঙ্গি সঠিক নয়। আরবী ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য বাচনভঙ্গি এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। দ্বিতীয়ত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ব্যাকুলতা তো ছিলো মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে। এ ব্যাকুলতা ও কৌতুহল এভাবে তো দূর হতে পারে না যে, কয়েকটি পোষা পাখি তার ডাকে তার নিকট চলে আসলো। এ ধরনের পরীক্ষা তো তিত্তর, ঘুঘু, কবুতর ও বাজ পাখি যারা

www.pathagar.com

পোষে তারা প্রতিদিনই করে থাকে। যদি এ পরীক্ষাই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দিয়ে করানো হতো তবে তাতে তার সে ব্যাকুলতা কিভাবে দূর হতে পারতো যা তিনি তার পালনকর্তার নিকট পেশ করেছিলেন। এটা দূর হতে হলে শুধু এ পদ্ধতিতেই দূর হওয়া সম্ভব ছিলো যখন একটি বস্তুর বিভিন্ন অংশ ধ্বংস ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর নতুন করে বিভিন্ন দিক থেকে একত্রিত হয়ে নব জীবন লাভ করবে।

পাখির ঘটনাটি ছিলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ পর্যবেক্ষণ

অবশ্য এ বিষয়টি এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ ঘটনা সেসব মোজেযার অংশ নয় যা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষ থেকে তার জাতির সামনে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বরং এটি হচ্ছে সেসব পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত যা ব্যক্তিগতভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে এজন্য করানো হয়েছে, যাতে করে তিনি অন্তরে প্রশান্তি লাভ করেন এবং তার বক্ষদেশ প্রসারিত হয়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ নবীদেরকে এজন্য করানো হয় যাতে করে এর মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ হয়ে যায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিরাট দায়িত্বের বোঝা তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয় তা বহন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। অন্যান্য সত্যানুসন্ধানীগণও এ থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। তবে তাদের প্রাপ্তি তাদের যোগ্যতা এবং তাদের স্তর ও মর্যাদার অনুপাতে হয়ে থাকে। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক জগতেও হতে পারে এবং আত্মিক জগতেও। তবে যার হয়ে থাকে তার জন্য এ পর্যবেক্ষণ গভীর প্রত্যয় ও মানসিক প্রশান্তির কারণ হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

অবশেষে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ। 'আযীয' ও 'হাকীম'-এর প্রতি দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। এ কারণে যে, এই গুণাবলীর স্মরণের মাধ্যমে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, আল্লাহ তাআলা লোকদেরকে অবশ্যই পুনরায় ওঠাবেন। কেননা তিনি এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান এবং এরূপ করা তার হেকমত ও যৌক্তিকতার দাবি।

৮৪. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৬১-২৭৪ আয়াত

আমি ওপরে এ ইংগিত দিয়ে এসেছি যে, এখানে মূল আলোচনার ধারা ছিলো জিহাদ ও ইনফাক সম্পর্কে কিন্তু لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ আয়াতে হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পর্কিত আল্লাহর একটি নীতির আলোচনা এসে গেলো। যার ব্যাখ্যার জন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত-সমূহের উল্লেখ জরুরী হয়ে পড়ে। আর এতে করে এ আলোচনার ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। এবার এ আনুসঙ্গিক আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ইনফাকের বিষয়টি যা মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো আবার শুরু হয়েছে এবং ইনফাক অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযিলত ও বরকত, তার বৈশিষ্ট্যাবলী ও আপদসমূহ অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

www.pathagar.com

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا
يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ
بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ
فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ
اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ
فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ

www.pathagar.com

أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ الشَّيْطَانُ
يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَمَا أَنفَقْتُم
مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾
إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾
لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদের উদাহরণ সে বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং তার প্রত্যেকটি শীষে

একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে চান প্রাচুর্য দান করেন। আল্লাহ বিশাল ধারণ ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ। ২৬২. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর মনোকষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এর পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। ২৬৩. আন্তরিকতাপূর্ণ একটি কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা সেই দান-খায়রাত অপেক্ষা উত্তম যার পরে মনোকষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও সহিষ্ণু। ২৬৪. হে ঈমানদারগণ! অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং মনোকষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাতকে বরবাদ করে দিও না। সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সে বিশ্বাস রাখে না। এ লোকটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ। যেমন একটি মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু মাটি জমেছিলো। অতপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে রয়ে গেলো নিরেট মসৃণ পাথরটি। এদের উপার্জনের কিছুই এদের ভাগে পড়বে না। আল্লাহ অকৃতজ্ঞদের সফলতা দান করবেন না।

২৬৫. আর যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে ব্যয় করে তাদের আমলের উপমা হচ্ছে সে বাগানের মত যা উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে হাল্কা বর্ষণই তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা দেখছেন।

২৬৬. তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে। তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। তাতে তার জন্য থাকবে সব রকমের ফল, এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হবে। আর তার সন্তান-সন্তুতি এখনো দুর্বল। এমতাবস্থায় বাগানটির ওপর দিয়ে প্রবল অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হবে এবং তা জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তার কথাগুলো তোমাদের নিকট বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের উপার্জিত পবিত্র সম্পদ থেকে ব্যয় কর এবং সেসব বস্তু থেকে ব্যয় কর যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি। এবং তা থেকে সেই মাল খরচ করার চিন্তাও করো না যা আল্লাহর পথে খরচ করার তুমি মনস্থ করেছ, অথচ সে মালই যদি তোমাকে গ্রহণ করতে হয় তবে চোখ বন্ধ না করে তুমি তা গ্রহণ করবে না। একথাটি ভালোভাবে মনে রেখো, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসাময় গুণের অধিকারী।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার পথে প্রলুব্ধ কর। আর আল্লাহ তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন। আল্লাহ বড়ই উদার হস্ত ও মহাজ্ঞানী। ২৬৯. তিনি যাকে চান হেকমত দান করেন। আর যাকে

www.pathagar.com

হেকমত দান করা হয়েছে, সে প্রভূত কল্যাণ ভাণ্ডার লাভ করেছে। তবে উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান।

২৭০. আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে এবং যা কিছু মানত করবে। মনে রেখো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। এবং সেসব লোকদের কোনো সাহায্যকারী হবে না যারা নিজেদের ওপর যুলুম করে। ২৭১. যদি তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতগুলো প্রকাশ্যে কর তবে তাও ভাল। আর যদি তোমরা তা গোপন কর এবং চুপিচুপি অভাবীদেরকে দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। এতে আল্লাহ তোমাদের অনেক গুনাহ নির্মূল করে দেবেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

২৭২. তাদেরকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তার ফল তোমরাই লাভ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থই ব্যয় করবে তার প্রতিদান পুরোপুরি তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের প্রাপ্য বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।

২৭৩. এ দান সেসব গরীব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে। কায়-কারবার (অর্থোপার্জন) করার জন্য যমীনে ঘোরাফিরা করতে পারে না। তাদের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের আকৃতি ও বেশভূষা দেখেই চিনতে পার। তারা লোকদের নিকট ইনিয়েবিনিয়ে ভিক্ষা চায় না। আর তোমরা যে অর্থই ব্যয় করবে তা আল্লাহ তাআলা খুব ভালোভাবে জানেন। ২৭৪. যারা নিজেদের সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই, আর তারা চিন্তিতও হবে না।

৮৫. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৬১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর মর্মার্থ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ কুরআনের একটি পরিভাষা। ইসলাম ও মুসলমানদের সফলতা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে যেসব কাজ করা হয় তার সবটাই এর অন্তর্ভুক্ত। অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো কাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোনোটি কম হতে পারে। কিন্তু যে কাজই আল্লাহর

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং শরীআতের বিধিবিধান অনুসারে করা হবে সেটাই হবে ফীসাবীলিল্লাহ।

আল্লাহর পথে ব্যয়ের দৃষ্টান্ত

আল্লাহর পথে ব্যয়িত অর্থের সাওয়াব ও প্রতিদান যে বহুগুণ পাওয়া যাবে এটা তার একটি দৃষ্টান্ত। বলা হয়েছে, যেভাবে একটি শস্যবীজ থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশ'টি দানা। তেমনিভাবে একটি নেক কাজের প্রতিদান বান্দাহ সাতশ'গুণ পর্যন্ত পাবে আখেরাতে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা বিভিন্ন হাদীসেও এসেছে। নবী করীম (স) বলেছেন, একটি নেক আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এ পার্থক্য সাধারণত আমলের ধরন, আমলের সময় ও আমলকারীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। একটি নেক কাজ যদি প্রতিকূল অবস্থা ও সীমিত উপকরণ নিয়ে করা হয় তবে তার প্রতিদান হবে অধিক। আর একটি নেক কাজ যদি অনুকূল অবস্থা ও প্রভূত উপায়-উপকরণ লাভের মাধ্যমে করা হয় তবে তার প্রতিদান হবে কম। আবার নেক কাজটি সম্পাদনকারীর আবেগ অনুভূতিরও প্রভাব পড়বে তার ওপর। একটি উত্তম কাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ও পূর্ণ আবেগ-উদ্যমের সাথে করা হলো আর অপরটি অসন্তুষ্ট চিত্তে ও শৈথিল্যের সাথে। উভয়ের সওয়াব ও প্রতিদানের ক্ষেত্রেও যে পার্থক্য হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আয়াতে সর্বোচ্চ প্রতিদানের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাআলা যার জন্য চান বৃদ্ধি করেন।" এর দ্বারা (প্রতিদানের ব্যাপারে) সেই নীতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যা আমি ওপরে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তাআলার কোনো চাওয়াই ইনসাফ ও যৌক্তিকতার পরিপন্থী হয় না। তাই এ বহুগুণ বৃদ্ধি তাদের জন্যই তিনি চান যারা তাঁর নির্ধারিত নীতি মোতাবিক তা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ বলতে কি বুঝানো হয়েছে

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ বলে একদিকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এত ব্যাপক প্রতিদানের ঘোষণায় বান্দাহ তার সীমিত সামর্থের ওপর অনুমান করে বিস্মিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সীমাহীন প্রাচুর্যের অধিকারী। অপরদিকে একথাটিও বলে দেয়া হলো, আল্লাহর পথে ছোট অথবা বড়, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে যে কোনো উত্তম কাজ সম্পাদন করা হোক সব তাঁর জানা রয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিদানের ব্যাপারে যেনো নিশ্চিন্ত থাকে। দাতার ধন-ভাণ্ডারও যখন অফুরন্ত এবং তাঁর জ্ঞানও যখন দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে তখন দুশ্চিন্তার কারণ অবশিষ্ট থাকলো কোথায় ?

আয়াত ঃ ২৬২

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

www.pathagar.com

اَذًى শব্দটি এমন প্রতিটি ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় যা কোনোরূপ দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়। এ দুঃখ ও কষ্ট দৈহিক হোক কিংবা মানসিক ও আত্মিক। এখানে এর অর্থ হচ্ছে বিদ্রূপ ও গালমন্দ এবং অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। যা সাধারণত সংকীর্ণমনাদের পক্ষ থেকে সেসব লোকদের প্রতি প্রকাশ পায় যাদের প্রতি সে কখনো কোনোরূপ ইহ্সান বা করুণা করেছে।

আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রতিদান লাভের প্রকৃত হকদার

বলা হয়েছে, এ বিরাট প্রতিদান যা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব ব্যয়কারীদের জন্য যারা ব্যয় করার পর যাদের জন্য ব্যয় করেছে তাদেরকে না কোনোরূপ খোঁটা দেয়, না অন্য কোনোভাবে তাদের অন্তরে কোনো ব্যথা দেয়। উল্লেখ্য যে, এ খোঁটা দেয়া ও মনে কষ্ট দেয়া একই অনিষ্টকর কাজের দুটো দিক। নিকৃষ্ট ও হীনমনা ব্যক্তি যদি কারো জন্য কিছু ব্যয় করে বসে তখন তার বিনিময়ে সে এটা চায় যে, এ লোকটি সারা জীবন তার প্রতি কৃতজ্ঞ বরং তার কেনা গোলাম হয়ে থাকুক। যদি সে অনুভব করে যে, তার সে বাসনা পূরণ হচ্ছে না তখনই সে তাকে নানা বিদ্রূপ ও কটাক্ষের লক্ষবস্তুতে পরিণত করে এবং যেখানেই সে সুযোগ পায় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। বলা হলো, এরূপ লোকদের জন্য কোনো প্রতিদান নেই। প্রতিদান তাদের জন্য রয়েছে যাদের দান উপদ্রব থেকে মুক্ত।

لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ঃ অন্যত্র আমি বলেছি যে, এটি জান্নাতের ব্যাখ্যা। (অর্থাৎ এরা হবে জান্নাতী)। কেননা জান্নাতই হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে না ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো আংশকা থাকবে, না অতীতের কোনো অনুশোচনা। এখানে জান্নাতের পরিচয় এ শব্দগুলো দ্বারা করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত এটাও রয়েছে যে, (আল্লাহর পথে) ব্যয়কারীগণ এ জান্নাতের উপযোগী এজন্যই বিবেচিত হবে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার পর না তারা কখনো এ চিন্তা করেছে যে, কেনো ব্যয় করলাম। আর না কখনো শয়তানের ভয় দেখানোর কারণে প্রভাবিত হয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা করেছে যে, আগামীকাল কি খাবো। তাদের এ মনোবলের বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রতিদানও দেবেন এবং এমন জান্নাত দান করবেন যা তাদেরকে অতীত ও ভবিষ্যত উভয় দিক থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত করবে।

আয়াত ঃ ২৬৩

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ○

এখানে যদিও শুধু اَذًى (মনে কষ্ট দেয়া) শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, খোঁটা দেয়ার উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বস্তুতপক্ষে দুটোকেই বুঝানো হয়েছে। একটিকে বিলোপ করার কারণ সেটিই যা আমি ওপরে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ এটি মূলত একই কার্যক্রমের দুটি দিক। যেখানে খোঁটা আছে সেখানে কষ্ট আছে। যেখানে কষ্ট আছে সেখানে খোঁটাও রয়েছে।

www.pathagar.com

আন্তরিকতাপূর্ণ একটি বাক্য সেই দান অপেক্ষা উত্তম যার সাথে মনোকষ্ট বিদ্যমান

বলা হলো, আন্তরিকতাপূর্ণ একটি কথা এবং ক্ষমা করা সেই দান-খয়রাত থেকে উত্তম যার সাথে মনে কষ্টদায়ক আচরণ যুক্ত থাকে। ভিক্ষুক ও অভাবী লোকদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা এবং ত্রুটিপূর্ণ আচরণ ক্ষমা করে দেয়ার আদেশ কুরআনে বার বার এসেছে। এর বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আমরা এ সূরার ৮৩ আয়াতের অধীন কুরআনের দৃষ্টান্তসমূহের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মানুষে মধ্যে ধনাঢ্য হওয়ার সাথে যদি সহিষ্ণুতা না থাকে তবে সে ইনফাক বা ব্যয়ের হক আদায় করতে পারে না। যদি সে ব্যয় করেও তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নেক অর্জনের পরিবর্তে উল্টো গুনাহ্ কামাই করে থাকে। যাদের নিকট সম্পদ থাকে তাদের মধ্যে সাধারণত এক ধরণের গর্ববোধ সৃষ্টি হয়। এ কারণে তারা অভাবী ও ভিক্ষুকদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ভিক্ষুকদেরকে ধমক দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিক্ষুকদের আচরণও অসৌজন্যমূলক হয়ে থাকে, যা ঠুনকো মেযাজী বিত্তশালীদেরকে আরো উত্তপ্ত করে তুলে। এমনও হয় যে এরা কোনো সত্য কিংবা মিথ্যা অভিযোগকে ভিত্তি করে প্রকৃত হকদারগণকেও বঞ্চিত করে। এ জাতীয় যাবতীয় অনাহার এ কারণে সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ বিত্তশালীদের সম্পদ থাকে ঠিকই ; কিন্তু তাদের সম্পদের তুলনায় তাদের মধ্যে ক্ষমা ও অনুকম্পার গুণ থাকে না। এরই ভিত্তিতে কুরআন মজীদ যেখানেই ইনফাকের জন্য তাকীদ করেছে সেখানেই এ গুণটির প্রতি জোর দিয়েছে। এটা ছাড়া কোনো ব্যয়ই ইহসানের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াত লক্ষ্য করুন। اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○- ال عمران : ١٣٤ -"যারা ব্যয় করে সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও লোকদেরকে ক্ষমাকারী। এরাই সৎকার্য সম্পাদনকারী,। আল্লাহ সৎকার্য সম্পদানকারীদেরকে ভালোবাসেন।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪

'গনী' এবং 'হালীম' গুণের দাবি

এখানে 'গনী' (অমুখাপেক্ষী) এবং 'হালীম' (সহনশীল) গুণ দুটো উল্লেখ করার মাধ্যমে দুটি দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। একটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু সহনশীলও তাই বান্দাহগণের যাবতীয় দুর্বলতা ও নাফরমানী সত্ত্বেও তাদেরকে স্বীয় দান ও অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করেন। বান্দার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তিনি যদি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে দেন, তবে এমন কে আছে যে কোনো অনুগ্রহলাভের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এটা সেই অভাবমুক্ত সত্তার সহনশীলতাই বটে। যার বদৌলতে নেককার ও গুনাহগার সবাই তার ভাণ্ডার থেকে রিযিক লাভ করছে। তিনি যখন এসব গুণের অধিকারী তখন তিনি চান যে, তার বান্দাহদের মধ্যেও এসব গুণের প্রতিফলন ঘটুক। অর্থাৎ যাকে তিনি বিত্তশালী করেছেন তার মধ্যে প্রাচুর্যের অনুপাতে সহনশীলতাও থাকুক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, গরীবদের আস্তিনের ভেতর থেকে যে হাতটি বিত্তবানদের সামনে প্রসারিত হয় প্রসিদ্ধ হাদীসে কুদসীর ভাষায় তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই হাত। সুতরাং এ হাতের অবজ্ঞাকারীদের একথাটি স্মরণ রাখা উচিত, যে হাতটি তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে তা হচ্ছে মূলত সে অভাবমুক্ত সত্তার গোপন হাত যার হাত থেকে তারা সবকিছু পেয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ সত্ত্বেও তিনি যে তাদেরকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন তার কারণ শুধু এই যে, তিনি হচ্ছেন সহনশীল। নতুবা এরূপ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের আল্লাহর সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়াই সমীচীন ছিল।

আয়াত ঃ ২৬৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

صَفْوَانٌ শব্দের অর্থ

صَفْوَانٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে মসৃণ পাথর কিংবা তৈলাক্ত বড় প্রস্তর খণ্ড।

وَابِلٌ শব্দের অর্থ

وَابِلٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, প্রবল বর্ষণ, মুষলধারে বৃষ্টি।

صَلْدٌ শব্দের অর্থ

صَلْدٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কঠিন ও মসৃণ বস্তু। 'আরদে সাল্দ' অথবা 'মাকানে সাল্দ' সেই যমীনকে বলা হয় যেখানে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। 'রা'ছে সাল্দ' সে মাথাকে বলা হয় যাতে কোনো চুল গজায় না।

উপমাটিতে অংকিত চিত্র

পাহাড়সমূহের অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো বিশাল প্রস্তর খণ্ডের ওপর এদিক-ওদিক থেকে মাটি এসে জমাট বাঁধে। যার ফলে একটি পুরু স্তরের সৃষ্টি হয়। কৃষকরা কোনো কোনো সময় একে উর্বর মনে করে ফসল বুনতে শুরু কর। এ ধরনের ভূমিতে মাঝে মাঝে এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য নজরে পড়ে যে, পাহাড়ের উপরিভাগে বর্ষিত প্রবল বৃষ্টির ঢল নেমে এসে তার উপরিভাগের সমস্ত মাটি ধুয়ে মুছে সমতল ভূমিতে নিয়ে ফেলে দেয়। নীচে শুধু কঠিন প্রস্তর খণ্ডটি থেকে যায়। পাহাড়ী এলাকায় এরূপ অনেক দুর্ঘটনার খবরাখবর পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় দেখতে পাওয়া যায়। একে Landslide বা ভূমি ধ্বস বলা হয়। এখানে যে উপমা দেয়া হয়েছে তাতে এ চিত্রটি অংকিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বলা হলো, যারা ব্যয় করে খোঁটা দেয় অথবা মনে ব্যথা দেয় তাদের দান-খয়রাত সম্পূর্ণ বৃথা যায়। আখেরাতে এর সওয়াব ও প্রতিদান তারা পাবে না। ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ আমল এমনিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে যেমনিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তির আমল যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। এর দ্বারা খোঁটা দেয়া ও মনে কষ্ট দেয়া যে নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুর কাজ, তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ইনফাক বা আল্লাহর পথে ব্যয়কে বরবাদ করে দেয়ার ব্যাপারে এ কাজগুলো সম্পূর্ণ কুফরের সমতুল্য।

এ ধরনের লোকের উপমা দেয়া হয়েছে সেই কৃষকের সাথে যে এমন এক যমীনে তার ফসল বুনেছে যার নীচে ছিলো কঠিন ও মসৃণ পাথর। বৃষ্টি যখন প্রবলভাবে বর্ষিত হলো ওপরের সব মাটি ফসলসহ সমতল ভূমির দিকে ধসে পড়লো আর নীচ থেকে বেরিয়ে এলো টাকমাথার ন্যায় বিশাল এক প্রস্তর খণ্ড। আল্লাহ বলেন ঃ এ ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষকটির সমস্ত শ্রম যেভাবে পণ্ড হয়ে যায় তেমনিভাবে সেই দান-খয়রাতকারীর সমস্ত দানও বরবাদ হয়ে যায় যে দান করার পর খোঁটা দেয় এবং অন্তরে আঘাত দেয়। বলা হলো, এরূপ লোক নিজের সমস্ত দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করে দেয়। তার সামান্যতম অংশও সে নিজের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে না।

হেদায়াতের প্রকারভেদ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِىْ الاية ঃ এখানে যে হেদায়াতের উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য ও গন্তব্যে পৌঁছার পথ প্রদর্শন। আমি তাফসীরের শুরুতে বর্ণনা করে এসেছি যে, হেদায়াত বা পথপ্রদর্শন কয়েক প্রকারের। এক হেদায়াত হচ্ছে জন্মগত ও স্বভাবজাত। যা সব শ্রেণীর প্রাণী ও মানুষকে দেয়া হয়েছে। এক হেদায়াত হচ্ছে, যা আল্লাহ তাআলা বান্দাহদেরকে তাদের চেষ্টা ও তদবীরের ক্ষেত্রে দান করেন। যার ফলে সে কোনো চেষ্টা করে সফল হয়। এক হেদায়াত হচ্ছে যা নবীগণ ও শরীআতসমূহের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যার ফলে বান্দাহ হক বা সত্যকে কবুল করার তাওফিক লাভ করে। এ ছাড়াও এক প্রকার হেদায়াত আছে যা আখেরাতে লাভ করা যাবে। যার মাধ্যমে বান্দাহ তার চেষ্টার চূড়ান্ত ফলাফল ও পরিণামের দিকে পথ খুঁজে পাবে। কুরআন মজীদে হেদায়াত শব্দটি উপরোক্ত সব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি আমাদের মতে এই শেষোক্ত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ যারা কাফির ও অকৃতজ্ঞ তারা নিজেদের আমলে ব্যর্থ মনোরথ হবে। এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড (আমল) নিষ্ফল হয়ে যাবে।

আয়াত ঃ ২৬৫

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ۢبِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

www.pathagar.com

تَثْبِيتً শব্দের অর্থ

تَثْبِيتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ ঃ তাছবীত শব্দের অর্থ হচ্ছে মযবুত করা, সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করা। অর্থাৎ তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে এ উদ্দেশ্যেও ব্যয় করে যেনো এর ফলে স্বীয় নফ্স বা প্রবৃত্তির প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। যাতে করে নফস দীনের যাবতীয় আদেশ পালনে ভালোভাবে শক্তিশালী হয়।

ইনফাক হচ্ছে নফসের প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং-এর জন্য একটি সাধনা

যেভাবে রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে নফস বা প্রবৃত্তির প্রশিক্ষণ—যাতে করে মানুষ তাকওয়ার দাবিসমূহ পূরণ করার জন্য ভালোভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তেমনিভাবে ইনফাক বা আল্লাহর পথে ব্যয়ও একটি চেষ্টা ও সাধনা, যার ফলে মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে আনতে সক্ষম হয়। এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ তার জন্য সুগম হয়ে যায়। এ থেকে একদিকে একথাটি জানা গেলো যে, অন্যান্য যাবতীয় ইবাদাতের ন্যায় ইনফাকের প্রকৃত সুফলও আল্লাহ নয় বরং বান্দাহই পায়। অপরদিকে এটা বুঝা গেলো যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ইনফাক হচ্ছে তা-ই যা দুর্ভিক্ষের সময় করা হয়। যা দাতার অসচ্ছলতা সত্ত্বেও করা হয়। যা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে করা হয়। যা প্রিয় ও পসন্দনীয় মাল থেকে করা হয় এবং বিশেষ করে যা সেসব হকদারের জন্য করা হয় যাদের প্রতি দাতার অন্তর সন্তুষ্ট নয়। কেননা এ ইনফাকের মাধ্যমেই নফসকে হকের ওপর সুদৃঢ় রাখার সত্যিকার প্রশিক্ষণ লাভ করা যায়। মানুষ নিজেকে নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালনা করায় যতটা নিপুণভাবে অভ্যস্ত হতে থাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা তার জন্য ততটা সহজ হয়ে যায়।

رَبْوَةٍ শব্দের বিশ্লেষণ

رَبْوَةٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে উচ্চ ভূমি। ব্যবহারের দিক থেকে বুঝা যায় উঁচু হওয়ার সাথে সাথে সমতল ও মসৃণ হওয়াও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজীদে অন্য এক স্থানে এর বিশেষণ এসেছে ঃ ৫০ : ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ - مؤمنون যাতে বুঝা যায় উচ্চতার সাথে সমতল হওয়াটাও তার জন্য অপরিহার্য। উঁচু ও সমতল ভূমির আবহাওয়া যে মনোরম হয়ে থাকে তা একটি স্বীকৃত বিষয়। এরূপ ভূমির ওপর যদি বাগান থাকে তবে তার উচ্চতা একদিকে তো তাকে উপহার দেয় মনোরম দৃশ্য অপরদিকে তাকে প্লাবন ইত্যাদি থেকেও রক্ষা করে। উপরন্তু সমতল ভূমির ওপর অবস্থিত হওয়ার কারণে তার জন্যে এভাবে পিছলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকাও থাকে না যেমনটা থাকে ঢালু ভূমির ওপর অবস্থিত বাগান ও ফসলের। তাছাড়া আবহাওয়ার স্নিগ্ধতা তার ফসল ফলানোর দায়িত্ব নেয়। যদি মওসুম অনুকূল থাকে তবে তো কথাই নেই। যদি অনুকূল না হয় তবুও সে ফল দিতে থাকে।

www.pathagar.com

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করা হয় তার উপমা

উপরোক্ত শ্রেণীর বিপরীতে এটা হচ্ছে সেসব লোকের ব্যয়ের উপমা, যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আত্মগঠনের জন্য ব্যয় করে থাকে। বলা হলো, এরা নিসন্দেহে নিজেদের ইনফাক বা ব্যয়ের প্রতিদান পাবে। তারা প্রবহমান ভূমির ওপর বাগান রচনার পরিবর্তে এরূপ উঁচু, সমতল ও মনোরম আবহাওয়া সম্পন্ন ভূমিতে নিজেদের বাগান রচনা করেছে যে, বৃষ্টি হলে তা তাকে ধ্বংস করার পরিবর্তে তার ফলন দ্বিগুণ করে দেয়। আর যদি বৃষ্টি না হয় তবে স্নিগ্ধ ও মনোরম আবহাওয়ার কারণে হালকা সামান্য বৃষ্টিতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ঃ কথাটি প্রবোধ ও সান্ত্বনা দানের জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নেক বান্দাগণ তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদের আত্মগঠনের জন্য যে চেষ্টা-সাধনা করে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে বেখবর নন। তিনি সবকিছু দেখছেন। তিনি তাঁর প্রত্যেক বান্দাহকে তার শ্রম এবং তার ত্যাগ-তিতিক্ষার পূর্ণ বিনিময় দান করবেন।

আয়াত ঃ ২৬৬

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ لا وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ص فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

উদ্যান সম্পর্কে আরববাসীর কল্পনা বা অনুভূতি

جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ঃ এটি আবরদের কল্পনা অনুযায়ী একটি মনোরম উদ্যানের চিত্র। তাদের নিকট একটি মনোরম উদ্যানের চিত্র হচ্ছে এই যে, তার বিভিন্ন কিনারায় থাকবে খেজুরের বৃক্ষরাজি। মধ্যভাগে থাকবে আংগুরের লতাগুল্ম, বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য থাকবে চাষোপোযগী খণ্ড খণ্ড ভূমি। বানাগটি হবে উঁচুস্থানে। তার তলদেশে থাকবে প্রবহমান প্রস্রবণ। যার নালাসমূহ প্রবাহিত করা হবে বাগানের অভ্যন্তর ভাগ দিয়ে। কুরআন মজীদ অন্যত্র একটি বাগানের চিত্র এভাবে এঁকেছে جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا○ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا لا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا - ٣٢-٣٤ "তাদের একজনের জন্য আমি দুটি আংগুরের বাগান তৈরী করেছি এবং উভয়কে পরিবেষ্টিত করেছি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা। উভয়ের মাঝখানে শস্যক্ষেত্রের ব্যবস্থাও রেখেছি। দুটো বাগানই প্রচুর ফল উৎপন্ন করলো। বিন্দুমাত্রও কম হয়নি। এবং তার মাঝ দিয়ে আমি একটি নহর প্রবাহিত করেছি।"–সূরা কাহ্ফ ঃ ৩৪-৩৫। এ থেকে বুঝা গেল, বাগানের চারদিকে প্রান্তসীমায় খেজুর বৃক্ষ

লাগানো হতো। যাতে করে তা থেকে ফলও লাভ করা যায়। উত্তাপ, অগ্নিবায়ু, ঝড়োহাওয়া ও সূর্যের তেজ থেকেও বাগানটি যাতে রক্ষা পায় এবং বাগানের শোভা-সৌন্দর্যও বর্ধিত হয়। আবার ফাঁকে ফাঁকে আংগুর ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষও লাগানো হতো এবং চাষোপযোগী অংশগুলোতে ফসলের চাষও করা হতো। আলোচ্য আয়াতে لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ বাক্যে এ শেষোক্ত বিষয়টির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আমি অন্যত্র একথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, আরবী ভাষায় ثَمَرٰت শব্দটি শুধু ফল জাতীয় ফসলের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং শস্য জাতীয় ফসলও এর অন্তর্ভুক্ত।

اعصار শব্দের বিশ্লেষণ

اعصار : اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ। শব্দের অর্থ হচ্ছে ধূলিঝড় ও ঘূর্ণিবায়ু। তার সাথে যে আগুনের উল্লেখ রয়েছে তা আমাদের পরিচিত আগুন নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে উষ্ণবায়ু ও লূ-হাওয়া। যা অনেক সময় ধূলিঝড়ের সাথে প্রবাহিত হয় এবং তার প্রভাব এমন যে, যে বাগানটি এর ছোবলের শিকার হয় তা সম্পূর্ণরূপে ঝলসে যায়।

উপরোক্ত উপমার আরো ব্যাখ্যা

ওপরে লোক দেখানো, খোঁটা দান ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে যারা নিজেদের ইনফাক বা দান সদকাকে নিষ্ফল করে দেয় তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ উপমাটি হচ্ছে তার আরো অতিরিক্ত কিছু ব্যাখ্যা। এতে এটি দেখানো হয়েছে যে, এ ধরনের দানকারী যারা, তারা তাদের আশার বাগানটির ধ্বংসলীলার বেদনাদায়ক দৃশ্য ঠিক তখন দেখবে যখন সে সবচেয়ে বেশী তার মুখাপেক্ষী হবে। কারণ তখন তার জন্য চেষ্টা ও আমলের সব দরজা বন্ধ থাকবে।

এ দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির যে আংগুর ও খেজুরের বাগান তৈরী করলো। সেই বাগানের তলদেশে স্রোতস্বিণী প্রবাহিত ছিলো, যা ছিলো বাগানটির শ্যামলতা ও সজীবতার উৎস। বাগানে ছিলো আরো নানা ধরনের ফলমূল এবং তা থেকে হরেক রকমের পণ্য দ্রব্যও পাওয়া যেতো। বাগানের মালিক বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার সন্তানরাও ছিলো ছোট ছোট। এমতাবস্থায় একদিন উত্তপ্ত এক ঘূর্ণিবায়ু সে বাগানটির ওপর দিয়ে বয়ে গেলো এবং গোটা বাগানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেলো। আল্লাহ বলেন, পরকালে এমন অবস্থাই হবে সেসব লোকের, যারা নিজেদের কৃত দান-সদকাকে ধ্বংসকারী আপদ থেকে রক্ষা করে না। তাদের শস্যাগারের জন্য বজ্র খোদ তাদের আস্তিনের মাঝেই লুক্কায়িত থাকে এবং তা ঠিক এমন সময় প্রকাশ পাবে যখন তাদের জন্য হারাবার পর পুনরায় পাবার কোনো সম্ভাবনা বাকী থাকবে না।

আয়াত ঃ ২৬৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ○

طَيِّبٰتِ শব্দের মর্মার্থ

مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ঃ "স্বীয় উপার্জনের পবিত্র অংশ থেকে" এখানে 'তায়্যিবাত' শব্দটি একই সময় দুটো বিষয় প্রকাশ করছে। একটি হচ্ছে, নিজের উপার্জন থেকে সে মাল খরচ কর যা পবিত্র পন্থায় এসেছে—অন্যায় বা সন্দেহজনক পন্থায় নয়। দ্বিতীয়ত, মালটি গুণগত দিক থেকে হবে উৎকৃষ্ট। মূল্যহীন, নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের হবে না। অবৈধ পন্থায় অর্জিত কিংবা নিকৃষ্ট মাল খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ করা যায় না এবং আত্মগঠনের কাজও তাতে হয় না। ওপরে 'তাস্‌বীত' শব্দ দ্বারা যার উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ঃ কথাটির স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ এটা প্রমাণ করে যে, مِمَّا كَسَبْتُمْ বাক্যাংশ দ্বারা সেসব মালকে বুঝানো হয়েছে যা ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত হয়। যমীনের উৎপাদিত ফসল সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, যমীন থেকে উৎপন্ন দ্রবের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান অন্যান্য মাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অপবিত্র মাল ব্যয় করলে কবুল হয় না

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ ঃ এখানে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট মাল (আল্লাহর পথে) ব্যয় করা থেকে বিরত থাকার কঠোর তাকিদ রয়েছে। যেমন لَاتَقْرَبُوْا শব্দটি। অর্থাৎ অমুক বস্তুর কাছেও ঘোষণা। এমনিভাবে لَاتَيَمَّمُوْا শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, নিকৃষ্ট মাল দানের ইচ্ছাও তুমি করো না। অতপর নিকৃষ্ট মালের ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। অর্থাৎ যে মালটি তুমি আল্লাহর পথে দান করতে চাচ্ছো তা এমন (নিকৃষ্ট) যে, যদি ঐ মালই তোমাকে দেয়া হয় তবে চোখ বন্ধ করে এবং মনের ওপর চাপ সৃষ্টি ছাড়া তুমি তা গ্রহণ করতে পারবে না। যে জিনিসটি মানুষ নিজের জন্য পসন্দ করতে পারে না তা আল্লাহর জন্য পেশ করা—অথচ সবকছিু তারই দেয়া—নিতান্তই মূর্খতা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ। এতে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কিংবা আত্মার প্রশিক্ষণ লাভ করা তো দূরের কথা, এর ফলে (আল্লাহর সাথে) দূরত্ব ও ব্যবধান আরো বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

غَنِىٌّ ও حَمِيْدٌ-এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ হচ্ছেন 'অমুখাপেক্ষী' এবং 'প্রশংসিত' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কারো সম্পদ এবং কারো দানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি যদি লোকদের নিকট এটা চান যে, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করুক তবে তা এজন্যে নয় যে, তার ধনভাণ্ডার হ্রাস পেয়েছে। বরঞ্চ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদের কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নেয়া। তিনি দেখতে চান। তার দেয়া সম্পদ লোকেরা—যখন তাদের দেয়ার পালা আসে, কিভাবে দেয়। তারপর এখানে 'গণী' শব্দের সাথে 'হামীদ' গুণটিও যোগ করা হয়েছে। 'হামীদ' মানে সেই সত্ত্বা যিনি

গুণকীর্তন ও প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডের উৎস। অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সাথে সাথে তাঁর সত্ত্বা প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। তার দয়া ও বদান্যতা সর্বদা প্রবহমান। তা থেকে কল্যাণ লাভ করে ভালো ও মন্দ সকলেই।

আয়াত ঃ ২৬৮

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

فَحْشَاۤءِ বলতে কি বুঝায়

فَحْشَاۤءِ শব্দের অর্থ প্রকাশ্য অশ্লীলতা বা নির্লজ্জতা এবং বদকাজ। কুরআন মজীদে এর দ্বারা জ্বেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ও উলঙ্গপনা ইত্যাদি প্রকাশ্য অপরাধকে বুঝানো হয়েছে। امــر (আমর) শব্দটি যেমন আদেশ দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি পরামর্শ দেয়া, বুঝানো ও প্ররোচনা দেয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়। এর বিশ্লেষণ আমি অন্যত্র করে এসেছি।

ইনফাকের পথে বাধাসমূহ

শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের পক্ষ থেকে ইনফাকের পথে যেসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা এসে থাকে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। মানুষ যখন কোনো ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করতে চায় তখন শয়তান এবং তার এজেন্টরা দুভাবে তাকে তার ইচ্ছা থেকে হঠাবার চেষ্টা করে। প্রথমত, ভবিষ্যতের কাল্পনিক আশংকা সম্পর্কে এই বলে তাকে ভয় দেখায় যে, অমুক অমুক কঠিন কাজ তার সামনে রয়েছে। তাই সে যেনো তার হাত গুটিয়ে রাখে। নতুবা নানা জটিল সমস্যায় সে জড়িয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, তাকে ভোগ-বিলাস, মদপান, সিনেমা দেখা এবং অপচয় ও অপব্যয়ের অন্যান্য কু-অভ্যাসে ফাঁসিয়ে দেয়। যাতে করে কোনো মহান উদ্দেশ্য জয় করার কোনো অবকাশ বা সুযোগই তার বাকী না থাকে। শয়তানের আক্রমণ খুবই প্রচণ্ড ও তীব্র হয়। যারা এর শিকারে পরিণত হয় তারা তাদের গর্হিত নেশায় এমনভাবে বুঁদ হয়ে যায় যে, আল্লাহ ও তার বান্দাদের কারো হক আদায় করার যোগ্যতাই তারা হারিয়ে ফেলে। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের যেখানে ইনফাকের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে শয়তানের এ ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْاۤ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝ - بنى اسرائيل : ٢٦-٢٧

"নিকটাত্মীয়, অভাবী ও মুসাফিরকে তার হক প্রদান কর এবং নিজের অর্থ-সম্পদকে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে উড়িয়ে দিও না। নিসন্দেহে যারা এভাবে নিজেদের ধন-

সম্পদ উড়িয়ে দেয় তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭

•

ঠিক একথাটিই একই আঙ্গিকে বলা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ ও ১৩৫ আয়াতে। وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ এখানে 'মাগফিরাত' (ক্ষমা) শব্দটি 'ফাহ্‌শা' (অশ্লীলতা)-এর মুকাবিলায় এবং 'ফযল (অনুগ্রহ) শব্দটি 'ফাক্‌র' (অভাব)-এর বিপরীতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তো তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার পরিবর্তে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে অপচয় ও ভোগ-বিলাসের পথে ব্যয় করতে উৎসাহ যোগায়। যাতে করে সরাসরি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর পথে ব্যয় করার আহ্বানের মাধ্যমে তোমাদেরকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ডাকেন। এমনিভাবে শয়তান তোমাদেরকে অসচ্ছলতার কাল্পনিক ভয় দেখিয়ে তোমাদেরকে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু আল্লাহ এ ব্যয়ের বিনিময়ে তোমাদের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ বিরাট প্রাচুর্যের অধিকারী এবং তোমাদের প্রতিটি আমল সম্পর্কে অবহিত। দেয়ার জন্য তার নিকট কোনো কিছুর কমতি নেই এবং আল্লাহর পথে তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর সে সম্পর্কেও তিনি বেখবর নন।

আয়াত ঃ ২৬৯

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

ইনফাক হেকমতের কোষাগারের চাবিকাঠি

'হেকমত' শব্দের ব্যাখ্যা এ সূরার ১৫১ আয়াতের অধীনে আমি করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি দীর্ঘ সূত্রিতার কারণ হবে, অবশ্য এতটুকু কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এর মূল প্রাণশক্তি হচ্ছে ঈমান ও আমলের এমন দৃঢ়তা যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত গভীর অন্তর্দৃষ্টির ওপর। যে ব্যক্তি এ জিনিসটি (হেকমত) লাভ করে সে তার ধন-সম্পদ এ ধ্বংসশীল দুনিয়ায় জমা করে না। বরং আল্লাহর নিকট জমা করে। সে শয়তানের ভয় দেখানোর কারণে ভীত হয় না। বরং স্বীয় প্রতিপালকের ওয়াদার ওপর ভরসা করে এবং এ দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ সে সঞ্চয় করে না। বরং হেকমতের ভাণ্ডার লাভের প্রত্যাশী হয়। আর এ হেকমতের ভাণ্ডার হচ্ছে মস্তবড় জিনিস যে, দুনিয়ার যে কোনো ধনভাণ্ডার তার তুলনায় মূল্যহীন। হেকমতের এ কোষাগার আল্লাহ যাকে চান দান করেন। অর্থাৎ তাকে দান করেন যে এ ভাণ্ডার পাওয়ার অধিকার বা যোগ্যতা অর্জন করে। কেননা আল্লাহ তাআলার কোনো চাওয়াই যুক্তিহীন হতে পারে না। তাই তাঁর নীতি হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এ ধ্বংসশীল দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত না হয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও তার অনুগ্রহ লাভের জন্য নিজের ধন-সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেয়। সে তার বিনিময়ে স্বীয় অন্তরের কোষাগারকে হেকমতের মণিমুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

www.pathagar.com

অবশেষে বলা হলো, একথাটি প্রত্যেকের বুঝার ব্যাপার নয়। তারাই এটা বুঝতে সক্ষম যারা বিবেকবান। অর্থাৎ যাদের বিবেক হেকমতের আলোয় আলোকিত। এ দুনিয়ার নগদ ভোগ-বিলাসকে পরিত্যাগ করে একটি অদৃশ্য জগতের সফলতার জন্য স্বীয় আয়-উপার্জনকে উজাড় করে দেয়ার মত মনোবল তাদেরই থাকতে পারে যারা হেকমতের ভাণ্ডার থেকে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে।

আয়াত ঃ ২৭০

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

نذر শব্দের মর্মার্থ

'নযর' শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যক্তি মান্নত করলো, যদি আমার অমুক আশা পূরণ হয় তবে আমি অমুক ইবাদাত কিংবা সাধনা অথবা এত পরিমাণ সাদকা করবো। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, ইসলামে মান্নত করাকে উত্তম কাজ বলে অভিহিত করা হয়নি। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোনো মান্নত করে বসে এবং তাতে শরীআতের দৃষ্টিতে কোনো দূষণীয় দিক না থাকে, তবে তাকে পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, এটি এক ধরনের প্রতিশ্রুতি যা মান্নতকারী তার রবের সাথে করছে। আর প্রতিশ্রুতি ছোট হোক কিংবা বড় হোক। যদি শরীআতের পরিপন্থী না হয় তবে তা পূরণ করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর দরবারে প্রতিটি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা ছোট কিংবা বড়। আমরা সূরা আল মায়েদায় বর্ণনা করবো যে, সব শরীয়াত ও যাবতীয় নৈতিক বিষয়ের ভিত্তি প্রতিশ্রুতির ওপরই। এ কারণে ইসলাম এ দিকটাতে কোনোরূপ শিথিলতা বরদাশত্ করেনি।

فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ঃ এ বাক্যাংশটি শব্দের জবাব স্বরূপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অথবা তার জন্য কোনো মান্নত মানে তবে সে যেনো এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যে, আল্লাহ তার দান-খয়রাত এবং তার মান্নত প্রতিটি বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল। আর 'ওয়াকিফহাল' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার অনিবার্য ফল সম্পর্কে নিশ্চিত করা। অর্থাৎ তিনি যখন ওয়াকিফহাল তখন এটা অনিবার্য যে, স্বীয় ওয়াদা মুতাবিক এর পুরস্কারও প্রদান করবেন। ভাষার এ রীতি আরবী ভাষায় ও কুরআন মজীদে বহুল প্রচলিত।

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ঃ যালেম মানে এখানে খোদ নিজের নফসের ওপর যুলুমকারী, অর্থাৎ সেসব লোক যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদকেই মা'বুদ বানিয়ে বসেছে। আল্লাহর পথে মোটেই ব্যয় করে না। কিংবা ব্যয় করে ঠিকই, কিন্তু প্রদর্শনী, খোঁটা দান এবং মনে ব্যথা দিয়ে তা সম্পূর্ণ বরবাদ করে ছাড়ে। বলা হলো, এরা হচ্ছে দুর্ভাগা। ইনফাক, স্বার্থের কুরবানী এবং আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের পরিবর্তে নিজেদের ধন-

সম্পদ ও নিজেদের মিথ্যা মা'বুদগুলোর ওপর রয়েছে তাদের সমস্ত ভরসা। তাদের আশায় এরা বসে আছে। অথচ আল্লাহর দরবারে কেউ এদের সাহায্যকারী হবে না।

আয়াত ঃ ২৭১

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করার মর্যাদা

এখানে আলোচ্য বিষয় যেহেতু সাধারণ দান-খয়রাত—ওয়াযিব সাদকাহ নয়, যা প্রকাশ্যে দেয়া হয়। তাই এ ব্যাপারে এ প্রশ্নটি সৃষ্টি হয় যে, এটি গোপনে দেয়া উত্তম না প্রকাশ্যে ? কুরআন মজীদ এখানে তার জওয়াব দিয়েছে। অর্থাৎ যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও ভাল। কেননা এরও কিছু উত্তম দিক রয়েছে। যেমন, এর ফলে অন্যদের মাঝেও আল্লাহর পথে ব্যয় করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যখন কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড লোকদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু যদি অবস্থা এ ধরনের না হয় তবে এটাই উত্তম যে, গোপনে গরীবদেরকে দিয়ে দাও। যাতে করে রিয়া ও প্রদর্শনীর ফিতনা থেকে বাঁচতে পারো এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন অভাবীদের আত্মসম্মানও রক্ষা পায়। তারপর বলা হয়েছে, গোপন আর প্রকাশ্যের ব্যাপারটা তো তোমাদের হিসেবে। আল্লাহর কাছ থেকে তো কোনো কিছুই গোপন নেই। তোমরা যা কিছুই করবে, যে স্থানেই করবে আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

আয়াত ঃ ২৭২

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللَّهِ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

পুরো আয়াতটির প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যাবে যে, এতে একই সময়ে নবী করীম (স)-কেও সৌজন্যমূলক সম্বোধন করা হয়েছে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকেও।

হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাত বা চিরন্তন নীতিমালা

নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করে হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সূরাতেই একাধিক স্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন আঙ্গিকে তা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর সেই নির্ধারিত নীতি হচ্ছে এই যে, লোকদের

www.pathagar.com

হেদায়াতের ব্যাপারে নবীর দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, তিনি আল্লাহর শিক্ষা ও দিক নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে উত্তমরূপে অবহিত করবেন। যদি এ কাজটি তিনি সম্পাদন করে থাকেন তবে তার দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাঁর ওপর এ দায়িত্ব নেই যে, লোকেরা সেই শিক্ষা ও হেদায়াত বা দিকনির্দেশনাকে কবুলও করুক। তাদেরকে কবুল করার তাওফিক দান করা আল্লাহর কাজ। আর এ তাওফিক তিনি যাদেরকে চান তাদেরকেই দান করেন। আল্লাহর এই 'চাওয়ার' জন্য স্বয়ং তাঁরই প্রণীত নীতিমালা রয়েছে। যার ব্যাখ্যা ২৫৬-২৬০ আয়াতের অধীনে আমরা করেছি।

আল্লাহর এ সুন্নাত বা শাশ্বত নীতিমালার প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ইনফাক বিষয়ে যা যা বলার প্রয়োজন ছিলো তা আপনি (হে নবী) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানিয়ে দিন। তাহলেই আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। এখন লোকেরা তা গ্রহণ করবে নাকি প্রত্যাখ্যান করবে সেটা তাদের ব্যাপার। আপনি এজন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। লোকেরা যদি এর মূল্যায়ন না করে তবে তার জন্য পরিণাম তাদেরকেই ভুগতে হবে।

আল্লাহকে দেয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের জন্য সঞ্চয় করা

মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে চূড়ান্ত সতর্কবাণী হিসেবে বলা হলো, যে অর্থই তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, একথা মনে করো না যে, এটা অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছ, বরঞ্চ এটা তুমি নিজের জন্যই সঞ্চয় করছো। যা একদিন তুমি সাতশ' গুণ বর্ধিত আকারে ফেরত পাবে। শর্ত শুধু এই যে, তোমার এ ব্যয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেন না হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় করবে তার সবটাই তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।

আয়াত ঃ ২৭৩

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَايَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

لِلْفُقَرَآءِ শব্দের পূর্বে মুবতাদা (অর্থাৎ বাক্যের প্রথমাংশ) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এ দান-খয়রাত ও ইনফাকের যে আহ্বান জানানো হচ্ছে তা সেসব অভাবী লোকদের জন্য যাদের গুণাবলী বা পরিচয় হলো এই এই। মুবতাদা উহ্য রাখার একটি কারণ তো এই যে, বর্ণনার ধরন থেকেই তা বুঝা যায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এতে দান-খয়রাতের ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রতিও সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ আয়াতটি আঙ্গুল উচিয়ে অভাবীদের প্রতি ইংগিত করলো ঠিকই। কিন্তু কি কাজের জন্য ইংগিত করা হলো তা সম্বোধিত ব্যক্তির বোধ-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হলো। এভাবে সাদকার

www.pathagar.com

গোপনীয়তা রক্ষার সাথে সাথে অভাবীদের সেই আত্মসম্মানবোধও রক্ষা পেলো যে দিকটির প্রতি আয়াতেও ইংগিত দেয়া হয়েছে।

أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঃ অর্থাৎ কোনো দীনি উদ্দেশ্য বা দায়িত্ব তাকে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা-সাধনা থেকে বিরত রেখেছে। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক সফর করতে পারে না।

ضَرْبٌ فِي الْأَرْضِ-এর অর্থ হচ্ছে সফর করা। যেমন সূরা মুয্যাম্মিলে বলা হয়েছে وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ- "এবং অপর কিছু লোক এমনও হবে যারা আল্লাহর অনুগ্রহের অন্বেষণে ভূ-পৃষ্ঠে সফর করবে।"–সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ঃ এখানে জাহেল শব্দের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞ বা বেখবর। আর তাআফ্ফুফ্ (تَعَفُّف) শব্দের অর্থ আত্মসম্মানবোধ। অর্থাৎ এসব লোক আত্মসম্মানবোধের কারণে কারো সামনে ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত করে না। এবং নিজের অভাব-অভিযোগের কথাও প্রকাশ করে না। তাই যে ব্যক্তি এদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর সে তাদেরকে অভাবমুক্ত বলেই ধারণা করে।

تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ঃ 'সীমা' سيما শব্দের অর্থ হচ্ছে বেশভূষা ও চিহ্ন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ -"তাদের চেহারার ওপর সেজদার চিহ্নই তাদের পরিচয়।"

لَا يَسْئَلُوْنَ আয়াতের মর্মার্থ

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا। اِلْحَافَ-এর অর্থ হচ্ছে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চাওয়া। -"তারা লোকদের নিকট ইনিয়েবিনিয়ে ভিক্ষা চায় না।" এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তির নিষিদ্ধতা বর্ণনা করা। তার সাথে اِلْحَافًا শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ভিক্ষুকদের সাধারণ অবস্থার চিত্র এবং তাদের ঘৃণ্য পন্থাকে প্রকাশ করার জন্যে। যেমন বলা হয়েছে ঃ لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ- "অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশংকায় নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।" এখানে মূলত হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু তাদের ঘৃণ্য পন্থাকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যে অথবা যেমন বলা হয়েছে لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُضٰعَفَةً -"চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।" এখানে নিষেধাজ্ঞা মূলত সুদ খাওয়ার ব্যাপারে। اَضْعَافًا مُضٰعَفَةً কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু তার নিকৃষ্টতা প্রকাশ করার জন্যে। আরো বলা হয়েছে ঃ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا- "নিজেদের দাসীকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করো না। যদি তারা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়।" এখানেও উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জবরদস্তি বা বাধ্য করাকে নিষিদ্ধ করা। اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে শুধু তাদের ঘৃণ্য পন্থাটি প্রকাশ করে দেয়ার জন্য।

www.pathagar.com

এমনিভাবে لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا বাক্যটিতেও উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি নিষেধ করা। اِلْحَافًا শব্দটি লাগানো হয়েছে ভিক্ষুকদের সাধারণ অবস্থা প্রকাশ করার জন্যে। অর্থাৎ যে লোকগুলো এতটা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন যে, যারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় তারা তাদেরকে ধনী মনে করে, এরা ভিক্ষুক বা ফকীরদের ন্যায় আচরণ কিভাবে করতে পারে ? তাই তাদের এ আত্মসম্মানবোধ ও শালীনতাবোধের কারণে কুরআন অর্থ ব্যয়কারীদেরকে তাদের খোঁজ দেয়ার জন্য তাদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছে যে, তাদেরকে শুধু মুখাবয়ব দেখে খোঁজার চেষ্টা কর এবং স্বয়ং তাদের নিকট যাও। এটা আশা করো না যে, সাধারণ ফকীরদের ন্যায় এরা তোমার পেছনে পেছনে ঘুরবে।

কুরআন নাযিলের যুগে এর উত্তম নমুনা ছিলেন আসহাবে সুফ্‌ফা এবং এতে সন্দেহ নেই যে, বিভিন্ন হাদীসে তাদের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা হুবহু কুরআনের উপরোক্ত ইংগিতসমূহের অনুরূপ। কুরআন এসব আয়াতে ঈমানদার ফকীরদের বৈশিষ্ট্য যেমন হওয়া উচিত তাও তুলে ধরেছে এবং এসব ফকীরদের ব্যাপারে ঈমানদার ধনীদের কী নীতি অবলম্বন করা উচিত তারও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আজকের ফকীর ও আজকের ধনীদেরকে এ আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে নেয়া উচিত।

অবশেষে বলা হলো, যা তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত। অর্থাৎ এ ধরনের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভিক্ষুকদের খুঁজে বের করে চুপি চুপি তাদের প্রয়োজন পূরণ করাটা সৃষ্টির কাছ থেকে গোপন থাকলেও স্রষ্টার নিকট গোপন থাকবে না। তিনি তোমাদের প্রতিটি ব্যয় সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং এর পুরোপুরি বিনিময় তিনি প্রদান করবেন।

আয়াত ঃ ২৭৪

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

এ আয়াতে রাত ও দিন, গোপন ও প্রকাশ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক ও মুখোমুখি অবস্থান রয়েছে তা লক্ষণীয়। সময় এবং অবস্থা উভয়ই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া ঈমানদারদের মধ্যে ইনফাকের যে উদ্দীপনা থাকা উচিত তা আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পাচ্ছে। এতদ্ভিন্ন আল্লাহর নিকট ইনফাকের যে প্রতিদান রয়েছে তাও পুরোপুরি বিধৃত হয়ে গেছে। এ আয়াতটিকে ইনফাক সম্পর্কিত অধ্যায়ের সমাপ্তি বলা চলে।

৮৬. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৭৫-২৮৩ আয়াত

ইনফাকের আলোচনা শেষে এবার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুদের অবৈধতা। সুদের সম্পর্ক যেহেতু ঋণের সাথে। তাই ঋণের লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

নির্দেশনাও এ প্রসংগে দেয়া হয়েছে। বন্ধকও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়। এ কারণে তার হুকুমও এর সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদ হচ্ছে দান বা ইনফাকের বিপরীত

সুদ সম্পর্কে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা হচ্ছে ইনফাকের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনফাকের চালিকা শক্তি হচ্ছে উঁচুমানের সাহসিকতা, সহানুভূতি, বদান্যতা, ত্যাগ ও দয়া পরবশতা। আর সুদের চালিকা শক্তি হচ্ছে, ভীরুতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা এবং অন্যদের অসুবিধার সুযোগে স্বার্থ উদ্ধারের প্রবণতা, ইনফাক অভাবীদের সহযোগিতা দিতে চায় আর সুদ দুর্দশাগ্রস্তদের রক্ত চুষতে চায়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিপরীতমুখী সম্পর্ক। প্রকৃতির নিয়ম হলো, কোনো বস্তুর হাকীকত বা তাৎপর্য ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোভাবে প্রকাশ পায় না যতক্ষণ না তার সাথে তার বিপরীত বস্তুর বর্ণনা দেয়া হয়। এ নিয়ম বা নীতির ভিত্তিতেই কুরআন অধিকাংশ বিষয়ে বর্ণনার ক্ষেত্রে এ পন্থার অনুসরণ করেছে এবং দুই বিপরীত মেরুর উল্লেখ পাশাপাশি করেছে। যেমন ঈমানদারদের প্রসঙ্গ এলো। তখন তার সাথে কাফিরদের বর্ণনাও করা হয়েছে। জান্নাতের উল্লেখ যখন এসেছে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পাশাপাশি জাহান্নামের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এমনকি এ জিনিসটি কুরআনের গ্রন্থনার ক্ষেত্রে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের রূপ লাভ করেছে। এ নীতির আলোকেই কুরআন ইনফাকের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃপণতার উল্লেখ করেছে অথবা সুদ খাওয়ার বিষয় আলোচনা করেছে। এখানে সুদের উল্লেখ ইনফাকের পরে এসেছে। সূরা আলে ইমরানে ১২৭ আয়াতে রয়েছে ইনফাকের বর্ণনার পূর্বে। কিন্তু উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রে একটাই। আর তাহলো, একটির অন্ধকারাচ্ছন্নতা, অপরটির আলোকময়তা, একটির ঔজ্জ্বল্য, অপরটির বিশ্রী চেহারাকে উন্মোচিত করে দেয়া। এ বাকরীতি অবলম্বনের ফলে যৌক্তিকতার কিছু এমন দিক প্রতিভাত হয়ে ওঠে যা অন্য কোনো পন্থায় প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। এবার এ আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ
وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

২৭৫. যারা সুদ খায় তারা ওঠবে (কিয়ামত দিবসে) ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা বলেছে, বেচাকেনাও তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। অতপর যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী পৌঁছেছে এবং সে বিরত থেকেছে সে যা কিছু ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছে তা তার জন্য এবং তার বিষয়টা আল্লাহর বিবেচনাধীন। আর যারা এখন তাতে লিপ্ত হবে তারাই হবে জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। ২৭৬. আল্লাহ সুদকে হ্রাস করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ তাআলা অকৃতজ্ঞ ও অধিকার হরণকারীদেরকে পসন্দ করেন না। ২৭৭. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে। নামায কায়েম করেছে। যাকাত আদায় করেছে। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের জন্য কোনো শংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাক তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং যে সুদ তোমাদের বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ করো। ২৭৯. যদি তোমরা এরূপ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য সতর্ক হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তাওবা করে নাও তবে আসল মূলধনের তোমরা অধিকারী হবে। তোমরা কারো হক আত্মসাত করো না। তোমাদের হকও আত্মসাত করা হবে না। ২৮০. আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত

www.pathagar.com

তাকে অবকাশ দাও। আর যদি ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম। যদি তোমরা বুঝতে পার। ২৮১. সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতপর প্রত্যেক ব্যক্তি পুরোপুরি পেয়ে যাবে যা সে উপার্জন করেছে। তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।

২৮২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়। আর যে লিখতে সক্ষম সে যেনো লিখতে অস্বীকার না করে। বরং আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তেমনিভাবে সে অন্যদের জন্য লিখতে সহায়ক হবে। আর এ দস্তাবিজ লিখাবে সেই ব্যক্তি যার ওপর হক আরোপিত হয় (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) এবং সে তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করবে। লিখতে গিয়ে যেনো কোনোরূপ কমতি না করে। আর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় কিংবা লিখাতে অক্ষম হয় তবে যে তার অভিভাবক হবে সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখায়ে দেয়। আর এ ব্যাপারে তোমাদের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা যথেষ্ট। এ সাক্ষী তোমাদের পসন্দনীয় লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে। দু'জন মহিলা এজন্য যে, একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে। আর সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে তখন তাদের আসতে অস্বীকার করা উচিত নয়। ঋণ ছোট হোক কিংবা বড় তাকে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত লিখে রাখতে অলসতা করো না। এটি আল্লাহর নিকট সুবিচারের অধিক নিকটবর্তী, সাক্ষীকে অধিক সুসংহতকারী এবং এতে তোমাদের সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। হাঁ, যদি কারবার নগদ হাতে হাতে আদান-প্রদান পর্যায়ের হয় তবে তা না লিখলে কোনো অসুবিধা নেই। যখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় কর তখনও সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। যদি তোমরা এরূপ কর তবে তা হবে তোমাদের জন্য বড় ধরনের নাফরমানী। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

২৮৩. আর তোমরা যদি প্রবাসে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে তবে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে সে যেনো তার আমানত আদায় করে দেয় এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ গোপন করো না। যে তা গোপন করে সে যেনো মনে রাখে যে, তার অন্তর গুনাহগার এবং যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে জ্ঞাত।

www.pathagar.com

৮৭. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৭৫

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

ربوا (রিবা) শব্দের মর্মার্থ

رَبَا، يَرْبُوْ، رِبَاءً এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া, এবং অধিক হওয়া। এ থেকেই উৎপত্তি ربو শব্দটির। যার অর্থ হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট বর্ধিত পরিমাণ অর্থ যা একজন ঋণদাতা শুধুমাত্র অবকাশের সময়ের বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে মূল অংকের অতিরিক্ত আদায় করে। জাহেলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগেই এ পরিভাষাটি উপরোক্ত অর্থেই পরিচিতি লাভ করে। এর স্বরূপ বা প্রকৃতি বিভিন্ন আকারে ছিলো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তার সংজ্ঞা হচ্ছে এটাই যে, ঋণদাতা তার দেয় টাকার ওপর ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী মুনাফা আদায় করবে শুধু এ অধিকারের বলে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে তাকে টাকাটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে এটা দেখার বিষয় নয় যে, ঋণ কোনো গরীব ও নিঃস্বকে দেয়া হয়েছে নাকি কোনো ধনী ও রাজা-বাদশাহকে দেয়া হয়েছে এবং এ কারণেও তাতে কোনো পার্থক্য হয় না যে, এ ঋণ কোনো মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের জন্য দেয়া হয়েছে নাকি কোনো কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য দেয়া হয়েছে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের কোনো একক বা সামষ্টিক পরিকল্পনার জন্য দেয়া হয়েছে। জাহেলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগে 'রিবা'র পারিভাষিক যে অর্থটি সর্বজন স্বীকৃতি এ বাহ্যিক মতভেদের কারণে তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য সূচিত হয় না। যারা এটা মনে করে যে, ঋণের উদ্দেশ্য ও ঋণগ্রহীতার অবস্থান ও শ্রেণীভেদে রিবার প্রচলিত অর্থ ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনি সামনে লক্ষ করুন, খোদ কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা এ ধারণা বাতিল হয়ে যায়।

تخبط শব্দের বিশ্লেষণ

تخـبـط শব্দটির উৎপত্তি خبط الليل থেকে। যার অর্থ হচ্ছে রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলা। خَابِطُ اللَّيْلِ ঐ ব্যক্তিকে বলে যার ডান-বাঁয়ের কোনো খবর নেই। বিনা কারণে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এ থেকেই يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءِ এ বাগধারাটি সেসব লোকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যারা সূক্ষ্মদৃষ্টি বা বিচক্ষণতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং

www.pathagar.com

অন্ধ মহিষের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়ায়। এ থেকেই تَخَبَّطَهُ الشَّيْطٰنُ এর উৎপত্তি। এর অর্থ হচ্ছে مَسَّهُ الشَّيْطٰنُ بِخَبْلٍ اَوْجُنُوْنٍ শয়তান তাকে তার অপবিত্র স্পর্শ দ্বারা পাগল ও উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে।

مس শব্দের অর্থ

مس শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্পর্শ করা। কোনো অনিষ্ট, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে এর অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্ণনা ক্ষেত্রের দিক লক্ষ করে আমি এর অর্থ করেছি ছুত বা অপবিত্র স্পর্শ—যা শব্দগতও এবং অর্থবহও বটে। এমনিতে তো দুনিয়ায় যা কিছু হয় আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব কাজের জন্য শয়তানকে সুযোগ ও অবকাশ দেয়া আছে সেসব কাজের কর্তা বলে অনেক সময় তাকেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন আইয়ুব (আ)-এর দোয়ার মধ্যে আছে اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ - ص : ٤١-"শয়তান আমাকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেছে।-"সূরা সোয়াদ ঃ ৪১। নেক বান্দাহদের ওপর তো অপবিত্র আত্মার প্রভাব বড়জোর এতটুকুই হতে পারে যে, তাদেরকে কিছু দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু যাদের নিজ আত্মাই অপবিত্র ও কলুষিত হয়ে থাকে তাদের অন্তর যেমন শয়তানের মুঠোর মধ্যে থাকে, তেমনিভাবে কখনো কখনো তাদের বিবেক ও মস্তিষ্ক সবকিছুর ওপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং বাহ্যিকভাবেও সে উন্মাদ হয়ে নিজের পোশাক পরিচ্ছদ ও জামার কলার ছিঁড়ে ফেলে। মুখে ফেনা তোলে এবং অস্থির অবস্থায় বিক্ষিপ্ত মনে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভবঘুরের ন্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ফিরতে থাকে।

আল্লাহর পথে ব্যয়কারী ও সুদখোরের সাথে আল্লাহর আচরণ

ওপরে আল্লাহর পথে ব্যয়কারীদের সম্পর্কে আপনি পাঠ করে এসেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাদের ইল্‌ম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা দান করেন। তাদের ব্যয়ের মধ্যে বরকত দান করেন। তাদের অভিভাবক হয়ে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, তাদেরকে হেকমতের অনন্ত ভাণ্ডার দান করেন এবং সর্বোপরি আখেরাতে তাদেরকে لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-এর অনন্ত ও চিরস্থায়ী আনন্দে উদ্ভাসিত করেন।

এবার এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পালনকারী অর্থাৎ সুদখোরদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা যখন কিয়ামত দিবসে ওঠবে তখন ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় ওঠবে যার ওপর কোনো জ্বীন বা ভূতের ছায়া পড়েছে। যার ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে এ সাদৃশ্যের বেশী ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। কেননা এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেই যাবতীয় ব্যাখ্যা বিদ্যমান। যেমন কুরআন মজীদের এক স্থানে رُءوسُ الشَّيَاطِيْنِ (শয়তানের মুণ্ড)-এর উপমা রয়েছে। এর শব্দগুলো শুনতেই অন্তরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। তেমনিভাবে تَخَبَّطَهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ-এর শব্দগুলো থেকে আপনাতেই

ভীতিকর এবং অস্থির অবস্থার এমন একটি ছবি ভেসে ওঠে যা কোনোরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তীতে বলা হলো, তাদের এহেন অবস্থা এ কারণে হবে যে, সুদের অবৈধতার ব্যাপারে তারা এ বলে আপত্তি তুলেছিলো যে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মতই। তাহলে আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করলেন কেন ? যেহেতু এমন কথা ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে যার মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত, যার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং যাকে শয়তান তার অপবিত্র স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এ কারণে 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এ নীতির ভিত্তিতে এরূপ ব্যক্তি যখন কিয়ামত দিবসে ওঠবে তখন উন্মাদ ও পাগলদের ন্যায় ওঠবে। যেমনটা কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে مَنْ كَانَ فِى هٰذِهٖ أَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ أَعْمٰى -"যারা দুনিয়াতে বিবেক ও অন্তরের দিক থেকে অন্ধ হবে তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়েই ওঠবে।"

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا-এর অবস্থান

এখানে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। তার কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। কারণ একথাটির অসারতা এতটা স্পষ্ট যে, এর প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। এমন কথা কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই বলতে পারে যে বদ্ধ পাগল। আর পাগলদের কোনো কথার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণত وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا বাক্যাংশটিকে তাদের কথার প্রতিবাদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এ আঙ্গিকেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বস্তুর হালাল বা হারাম ঘোষণা করাটা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দলিল যে, বিবেক ও সহজাত প্রকৃতি এবং জাগতিক ও পারলৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে বস্তুটির হালাল বা হারাম হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এ দলিল তো শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অবিশ্বাসীদের তো এর দ্বারা কোনোরূপ উপকার হতে পারে না। এ কারণে আমার বারবার এ ধারণা হয় যে, এ অংশটি কোনো পৃথক বাক্যাংশ নয় বরং قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا-এর সাথেই সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তারা বলে,.ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই। একজন ব্যবসায়ী যখন তার মূলধনের ওপর মুনাফা নেয় তখন একজন পুঁজিপতি তার পুঁজি থেকে মুনাফা অর্জন করলে সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে কেন ? তাহলে আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম ঘোষণা করলেন কেনো ? যদিও এ বাক্যটি প্রশ্নের আকারে নয়, কিন্তু তার মধ্যে সে একই প্রশ্ন বা আপত্তি নিহিত আছে যা প্রথমাংশের মধ্যে রয়েছে।

ব্যবসায়ী ও সুদখোরের মূলধনের পার্থক্য

এ প্রশ্ন উত্থাপনের ফলে এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্টভাবে সামনে এসে গেছে যে, সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অনুমানকারী পাগলদের বংশধর দুনিয়াতে নতুন নয় বরং অতি পুরাতন। কুরআন মজীদ এ অনুমানকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। যেমনটা আমি ওপরে ইংগিত করেছি। তার কারণ হচ্ছে, এটা সুস্পষ্ট বাতিল ধারণা এবং

www.pathagar.com

অনুমানকারীদের মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ। একজন ব্যবসায়ী তার মূলধন এরূপ একটি পণ্যের ব্যবসায় নিয়োজিত করে লোকদের নিকট যার চাহিদা রয়েছে। সে কষ্ট ও পরিশ্রম করে এবং নানা ধরনের ঝুঁকি নিয়ে সে পণ্যটি লোকদের জন্য সহজলভ্য করে দেয়। যা তারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রথমত খুব সহজে লাভ করতে পারতো না। আর লাভ করতে পারলেও ব্যবসায়ী যে মূল্যে তাদেরকে সরবরাহ করেছে তার চাইতে অনেক চড়া মূল্যে। এরপর ব্যবসায়ী তার পণ্য খোলা বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য রেখে দেয় এবং বাজার দরের ওঠানামা পণ্যের মুনাফার হার নির্ধারণ করে। এ ওঠানামার ফলে এমনও হতে পারে সে একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেলো। আবার এমনও হতে পারে, কিছু মুনাফা অর্জন করলো। তেমনিভাবে এ ব্যাপারেও তার হাত বাধা রয়েছে যে, সে একবার এক টাকার জিনিস এক টাকা দু'আনা অথবা চার আনা বিক্রি করে, তারপর সে টাকা থেকে এক আধুলি পরিমাণও কোনো মুনাফা অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার সে টাকা যাবতীয় ঝুঁকি ও ওঠানামা অতিক্রম করে আবার ময়দানে না আসে এবং সমাজের খেদমতের মাধ্যমে নিজের উপকারিতা সৃষ্টি করতে না পারে।

এবার বলুন তো, একজন ব্যবসায়ীর এ পরিশ্রমী, মর্যাদাপূর্ণ ও সমাজসেবী মূলধনের সাথে একজন পাষণ্ড, কাপুরুষ, নির্লজ্জ ও মানবতার শত্রু সুদখোরের মূলধনের কিভাবে তুলনা করা যায়, যে সামান্যতম কষ্ট স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়। অথচ মুনাফা হাতিয়ে নেয়ার জন্য মাথায় চড়ে বসে। সুদখোরের মূলধন দুই আকারে প্রকাশ পায়। আর উভয়টাতেই সে সমভাবে কাপুরুষ ও রক্তখেকো। এক হচ্ছে, এ সুদী কারবারীরা মহাজন, কাবুলীওয়ালা ও ইহুদীদের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। এ অবস্থায় তাদের রক্ত চোষার ব্যাপারটা কারো পক্ষে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কারণ একজন সুদখোর মহাজন বা কাবুলীওয়ালা যখন একবার কাউকে তার জালে আটকে ফেলতে পারে তখন সে মযলুম লোকটির দেহে এক টুকরো গোশ্তও যদি অবশিষ্ট না থাকে তবুও প্রতিটি নির্ধারিত মেয়াদে এসে তার এক পাউণ্ড গোশ্ত সে কেটে নেবেই। এভাবে বছরের পর বছর কেটে নেয়ার পরও অনেক সময় এমন হয় যে, আসল মূলধনের পুরোটাই ঋণগ্রহীতার ঘাড়ে চেপে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং আসল চক্রবৃদ্ধি আকারে বেড়ে মযলুম ঋণগ্রহীতার বাড়ী-ঘর, তার গৃহ সমগ্রী ও তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সবকিছুকে গ্রাস করে নেয় এবং একের পর এক বহু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়ে। বলুন তো! কোন্ সৎ ব্যবসায়ীর মূলধন এ ধরনের যুলুম করার শক্তি রাখে। সে বড়জোর এতটুকু করতে পারে যে, বাজারের ওঠানামার মোকাবেলা করে সুযোগ পেলে এক টাকার জিনিস দেড় টাকা বা দু' টাকা বিক্রি করলো এবং তাও একবারের জন্য।

সেবামূলক কাজ ও সামাজিক বিভিন্ন প্রকল্পের সুদ

সুদখোরের মূলধনের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে, সেবামূলক কাজ বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রকল্পসমূহ তত্ত্বাবধানের নামে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে বর্তমান যুগে অনেক সরলমনা লোক এই বেশে একে অত্যন্ত নিষ্কলুষ বা মহৎ মনে করে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই

বুঝা যাবে যে, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার নিকৃষ্ট স্বভাব তার এ রূপের ভেতরেও তেমিনভাবে বর্তমান যেমনিভাবে পূর্বোক্ত রূপের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। একে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। মনে করুন, দেশের সরকার দেশের কোনো অংশকে বন্যার ধ্বংসলীলা থেকে কিংবা অন্য কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় এবং এজন্যে শতকরা পাঁচ কিংবা সাত টাকা হার সুদে লোকদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলো। হতে পারে কোটি কোটি টাকা খরচ করার পর সরকারের নেয়া পরিকল্পনাটি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বরবাদ হয়ে গেলো। এখন বলুন, রাষ্ট্র তো সামগ্রিকভাবে এক বিরাট ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হলো। কিন্তু যেসব সুদখোর এজন্য ঋণ দিয়েছিলো তাদের মূলধনই শুধু সংরক্ষিত থাকছে তা নয় বরং একটি নির্দিষ্ট হারে তার সুদও দিনের পর দিন চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলছে। বলুন তো, এটা কোন্ ধরনের জাতীয় সেবা! একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, (সুদের) প্রথম রূপ বা অবয়বের মধ্যে আর এ দ্বিতীয় অবয়বের মধ্যে মৌলিক দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। প্রথম পদ্ধতিতে সুদখোরের টার্গেট হচ্ছে শুধু এই যে, তার মূলধন সংরক্ষিত থাকবে আর মুনাফার এক পাউণ্ড গোশ্‌ত কোনোরূপ ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যতিরেকে মওসুমে মওসুমে সে পেতে থাকবে। চাই ঋণগ্রহীতার সাত পুরুষ ক্ষুধার তাড়নায় মরে যাক। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতেও তার সামনে এটাই বিবেচ্য বিষয় যে, তার মূল পুঁজি অক্ষতভাবে সংরক্ষিত থাকবে। নির্ধারিত সুদ তার একাউন্টে জমা হতে থাকবে। থাকলো জাতির লাশ। তা সে চাই নরকেই যাক কিংবা স্বর্গেই যাক, তাতে তার কি যায় আসে ?

পক্ষান্তরে একজন ব্যবসায়ীর মূলধন দেশ ও জাতির খেদমতের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম নিজকে নিজেই ঝুঁকির কবলে নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতির পরিবর্তন, বাজারের উত্থান-পতন অথবা অন্য কোনো কারণে যদি তার লোকসান হয় তবে এ লোকসানের বোঝা সে নিজেই বহন করে। তার পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও এটা সম্ভব নয় যে, সে কোনো গোপন অবস্থানে ঘাপটি মেরে বসবে আর সুদখোর মূলধনের ন্যায় অন্যদের কাছ থেকে তার মুনাফা উসূল করতে থাকবে। যদি বিরাট অনুকূল পরিবেশও সে লাভ করে, তবুও সর্বাবস্থায় তার মুনাফার হার বাজারই চূড়ান্ত করে। আর এভাবে সে যা কিছু লাভ করে তা হচ্ছে মূলত তার কষ্টার্জিত বৈধ প্রাপ্য। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ব্যবসায়ীর মুনাফাকে তাঁর অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। আর সুদখোরের মূলধনকে যা আমি সূরা রূমের তাফসীরে বর্ণনা করবো—সে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করেছেন যে অন্যদের চারণক্ষেত্রে চরে মোটাতাজা হচ্ছে।

সুদখোরদের প্রতি সতর্কবাণী

فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ الاية : মাও'ইযাত শব্দের মধ্যে হুমকি ও সতর্ক করণের দিকটা প্রবল থাকে। তাই তার মূলভাবকে সামনে রেখেই আমি এর অনুবাদ করেছি সতর্কবাণী। مِنْ رَّبِّهٖ শব্দটি এ সতর্কবাণীকে আরো শক্তিশালী করেছে। অর্থাৎ এ সতর্কবাণী হাওয়া থেকে পাওয়া কোনো বার্তা নয়। বরং এ হচ্ছে সকলের মালিক ও

www.pathagar.com

মনিবের পক্ষ থেকে সতর্কবাণী। তাই একে মামুলী বা সাধারণ মনে করা উচিত নয়। فَلَهٗ مَا سَلَفَ অর্থাৎ এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়ার পর যারা সুদী লেনদেন থেকে বিরত হয়েছে, তার কাছ থেকে অতীতের নেয়া সুদ ফেরত চাওয়া হবে না। যদি এ আইনের কার্যকারিতা অতীতের ওপরও প্রভাব ফেলতো তবে এতে করে এমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতো যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়তো। কিন্তু তার সাথেই এটাও বলা হলো ঃ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ এ ধরনের লোককে পূর্বের সুদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র যদিও পাকড়াও করবে না, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেও সে ক্ষমা পেয়ে গেছে। বরং তার বিষয়টা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আখেরাতের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ আর সুদী লেনদেন করবে না, বরং মানুষের অন্তর থেকে সুদের যাবতীয় কলুষতাও দূর হওয়া অপরিহার্য। এতে এ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকের আখেরাত থেকে নির্ভীক হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। বরং যতটা সম্ভব তার অতীত অন্যায়ের প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত। কেননা এ অন্যায় বান্দাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত। আর বান্দাহর হকের ব্যাপারটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুত্বের অধিকারী।

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ঃ অর্থাৎ এ সুস্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণের পরও যে ব্যক্তি সুদী কারবার করবে সে জাহান্নামবাসী হবে এবং সর্বদা সে জাহান্নামে থাকবে। আমার মতে এরূপ লোকদের জন্য জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তির কারণ এই যে, তাদের এহেন আচরণ একথার অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তারা আল্লাহর এ নির্দেশ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আল্লাহ তাআলার হুকুমসমূহের নাফরমানি যদি আবেগের প্রাবল্যের কারণে হয়ে যায় তবে তাওবার মাধ্যমে তার সংশোধনের পথ খোলা রয়েছে। এরও সম্ভাবনা আছে যে, তাওবার ব্যাপারে অবহেলা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কাউকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা তার গুনাহের পরিমাণ শাস্তি দিয়ে তাকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্ট উপদেশ ও সতর্ককরণের পরও যখন দেখা যায় এক ব্যক্তি কোনো হুকুমের ক্রমাগত বিরোধিতা করেই যাচ্ছে, তখন তার অর্থ হবে এই যে, সে আল্লাহর এ হুকুমকে অস্বীকার করে। যদি সে তার প্রতি বিশ্বাসী বলেও দাবি করে তবে এটি হচ্ছে স্রেফ একটি মুনাফিকী বা কপটতাপূর্ণ আচরণ যা সেই অদৃশ্য জ্ঞাতার নিকট গোপন নেই। যিনি অন্তরের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। তাই আল্লাহ তাআলা এরূপ লোকদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন যা তাদের প্রাপ্য। অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের সেই সার্বক্ষণিক আযাবে নিক্ষেপ করবেন যা কাফির ও মুনাফিকদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

গুনাহের পরিবেষ্টন সার্বক্ষণিক আযাবের কারণ

এখানে এ সূক্ষ্ম দিকটি স্মরণ রাখা দরকার যে, গুনাহের সাথে জড়িত হওয়া এক জিনিস। আর গুনাহকে সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত করা আরেক জিনিস। যে গুনাহ সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়, তা গুনাহগারের জীবনের কোনো একটি দিককেই শুধু প্রভাবিত করে না। বরং তার জীবনের প্রতিটি দিক এর আওতায় এসে যায়। তার

www.pathagar.com

প্রকাশ্য অবস্থা, তার গোপন অবস্থা, তার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। তার বাস্তব কর্মকাণ্ড এবং তার ঈমান ও ইসলাম সবকিছুতেই সেই গুনাহের ছাপ লেগে যায়। এ অবস্থাকেই কুরআন মজীদ اَحَـاطَه শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে। আর এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলার নিকট এদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবের ব্যবস্থা। যেমন এরশাদ হচ্ছে ঃ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُه فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - البقرة : ٨١ "অবশ্য যে ব্যক্তি কোনো মন্দ উপার্জন করেছে এবং তার গুনাহ তাকে স্বীয় বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে, সেই হবে জাহান্নামী। সেখানে এ ধরনের লোকেরা সর্বদা অবস্থান করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮১

আয়াত ঃ ২৭৬-২৭৭

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

محق শব্দের অর্থ হচ্ছে হ্রাস করা, নিশ্চিহ্ন করা। এ থেকেই مَحَقَ اللّٰهُ الشَّئَ নির্গত। যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ এ বস্তুটির বরকত নিশ্চিত করে দিয়েছেন। ارباء শব্দের অর্থ বৃদ্ধি করা এবং অতিরিক্ত করা।

সুদের প্রাচুর্যহীনতা এবং দানের প্রাচুর্য

অর্থাৎ সুদখোর তো মনে করে যে, সুদের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি পায় আর দান খয়রাতের ফলে হ্রাস পায়। কিন্তু আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ সুদকে হ্রাস করেন আর দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধি দুনিয়াবী জিন্দেগীর সীমাবদ্ধ ধারণার হিসেবে নয় বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সামগ্রিক জীবনের দিক থেকে। যখন পরকালীন জীবনের সকাল হবে, তখন সুদখোর দেখবে যে, দুনিয়ার ব্যাংকে তো তার লাখ লাখ টাকা জমা ছিলো। কিন্তু আল্লাহর ব্যাংকে তার একটি কানাকড়িও নেই। শুধু অনুতাপ আর অনুশোচনাই হচ্ছে তার মূলধন। কিন্তু আল্লাহর পথে যে ব্যয় করেছে পরকালীন জীবনে চোখ খুলতেই সে দেখতে পাবে যে, তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দানের বিনিময়ে এখানে স্থায়ী মূল্যমানের মণিমুক্তার পাহাড় তৈরী হয়ে আছে। কুরআনে অন্যত্র এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কটা হচ্ছে পরকালীন জীবনের সাথে। যেমন ঃ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ - روم : ٣٩ "এবং মানুষের সম্পদের সাথে লালিত হয়ে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা যা কিছু সুদ দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।

www.pathagar.com

অপরদিকে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত প্রদান কর, মূলত এসব লোকেই আল্লাহর নিকট (সম্পদ) বৃদ্ধিকারী।"–সূরা আর রূম ঃ ৩৯

বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। একটি হাদীসের অনুবাদ লক্ষ্য করুন ঃ

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা দান-খয়রাতকে কবুল করেন এবং ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। অতপর তিনি তোমাদের জন্য তাকে সেইভাবে লালন-পালন করেন যেভাবে তোমাদের কেউ তার বাছুরের লালন-পালন করে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের দান করা একটি গ্রাস আল্লাহর নিকট ওহুদ পাহাড়ের আকার ধারণ করে।"

যদিও সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে এ দুনিয়ার জীবনেও কোনোরূপ কল্যাণ ও বরকত হয় না। কিন্তু আয়াতের বক্তব্য আখেরাতের পরিণাম ও ফলাফলের সাথেই সম্পর্কিত।

সুদের প্রাচুর্যহীনতার কারণ

كَفَّار শব্দের অর্থ এখানে অকৃতজ্ঞ। আর أَثِيم শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যের অধিকার হরণকারী। অন্যত্র আমি ব্যাখ্যা করেছি। এ বাক্যাংশ একথাটি সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে, কেন আল্লাহ তাআলা সুদখোরদের ধন-সম্পদকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। বলা হলো, এর কারণ হচ্ছে, সে অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর বান্দাগণের হক বিনষ্টকারী। আল্লাহ সেসব লোককে কখনো ভালোবাসেন না যারা না শোকরী করে এবং তার সৃষ্টির হক নষ্ট করে। আল্লাহ তাআলা কাউকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করলে তা এজন্য দান করেন যাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে নিজেকে পেশ করে এবং যেভাবে আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেছেন তেমনিভাবে সে যেনো অন্যদের প্রতি করুণা করে। কিন্তু সম্পদ লাভ করার পর যখন সে এ সম্পদেরই গোলামে পরিণত হয় এবং অন্যদের সেই যোগ্যতা দানের পরিবর্তে একে তাদের রক্ত চোষার এবং তাদের বিভিন্ন অধিকার হরণ করার হাতিয়ারে পরিণত করে তখন এরূপ পাষণ্ডমনা ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির ধন-সম্পদ পরকালে শুধু শাস্তি আর ধ্বংসেরই কারণ হবে এবং বঞ্চনা ছাড়া তার ভাগে আর কিছুই জুটবে না, আর এটাই তার উপযুক্ত পাওনা।

তারপর ঈমানদারদের বিরাট পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এখানে সেই ঈমানদারদের কথাই বলা হয়েছে যাদের দান-খয়রাতের বরকত সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। এ আয়াতের পুরো অংশের ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

আয়াত ৪ ২৭৮

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

সুদী লেনদেনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত

এ আয়াতে সরাসরি ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহকে ভয় করে চলতে এবং ঋণগ্রহীতার নিকট সুদের যে অংশটি তখনো বাকী ছিলো তা থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে নিতে বলা হয়েছে এবং একে ঈমানের অপরিহার্য দাবি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সুদ সম্পর্কে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তার ধরন ছিলো নসিহত ও উপদেশমূলক আর তার ভিত্তি ছিলো এই যে, আসমানী ধর্মসমূহে এবং দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম-নীতিতে এটি সর্বদাই একটি হারাম অথবা কমপক্ষে একটি মাকরূহ বা অপসন্দনীয় জিনিস বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। আরববাসীর কাছেও এ সত্য অজানা ছিলো না। এ কারণে কুরআন মজীদ মক্কী যুগ থেকেই এটি যে একটি যুলুম তা প্রকাশ করতে শুরু করে। এ সম্পর্কে সূরা রূমেও উল্লেখ করা হয়েছে, যা একটি মক্কী সূরা। কিন্তু যেহেতু এটি ছিলো এক ব্যাপক সমাজবিধ্বংসী কাজ যার সংস্কার সংশোধন ছাড়া রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাপনা কার্যত ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনা সম্ভব ছিলো না, তাই বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে এর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হলো। এ আয়াতগুলো সেখানেই অবতীর্ণ হয়েছে। বিষয়বস্তুর সাযুজ্যের কারণে এগুলোকে বিন্যাসগতভাবে এখানে স্থান দেয়া হয়েছে।

আয়াত ৪ ২৭৯

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

সুদখোরদের প্রতি চরমপত্র

এটি হচ্ছে পুরোপুরি আল্টিমেটাম বা চরমপত্র। অর্থাৎ এখন যারা এ আদেশ অমান্য করবে তারা যেনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সুদ সম্পর্কে এ আয়াতগুলোর যে বাচনভঙ্গি, নবী করীম (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে ঠিক একই বাচনভঙ্গি লক্ষ করা যায়। যদ্দারা এ আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার সময়কাল অনুমান করা যায়। এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যবস্থায় সুদী কারবারীরা বিদ্রোহী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। যাদেরকে দমন করার জন্য প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালানো যেতে পারে। এ বিষয়ে সূরা আল মায়েদায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ চরমপত্র প্রদানের পর সুদী কারবারে জড়িতদের শুধু এ বিষয়ে অনুমতি দেয়া হলো যে, তারা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে তাদের মূল টাকা ফেরত নিতে পারবে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় তারা যেনো কোনোরূপ চালাকীর মাধ্যমে সুদের কোনো অংক যোগ করে ঋণগ্রহীতার হক নষ্ট করার পথ খুঁজতে চেষ্টা না করে। আর ঋণগ্রহীতার জন্যও এটা বৈধ নয় যে, এ সংশোধনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহাজনের মূল টাকাটাও গ্রাস করার চেষ্টা করবে। এ সতর্কবাণী উচ্চারণ এজন্য প্রয়োজন হয়েছে যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার যখন কার্যকরী করা হয় তখন এর ফলে ভুক্তভোগী শ্রেণীর মধ্যে বিরাট তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এ সংস্কারের ফলে যাদের ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় তারা এমন সব চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করে যার মাধ্যমে সে নিজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আর যাদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারাও ঐ পরিমাণ লাভে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না যা আইনানুগভাবে তারা লাভ করে। বরং আইনের সীমালংঘন করে অরো অধিক অর্জন করতে চায়। এ বাড়াবাড়ি ও টানাটানি রুখে দেয়ার জন্য কুরআন প্রথমত অনেক আগে থেকেই মন-মানসিকতাকে প্রস্তুত করেছে। অতপর যখন সর্বশেষ নির্দেশ দিল তখন তার সাথে এ হেদায়াত দেয়া হলো ঃ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ। এ হেদায়াত এমন সুফল বয়ে আনলো যে, আরব দেশে এ বিষয় অর্থনৈতিক সংস্কার কোনোরূপ শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-কলহ ছাড়াই কার্যকর হয়ে গেলো। না মহাজনদের ওপর কোনো আপদ নেমে এলো, না ঋণগ্রহীতাদের কোনোরূপ ক্ষতি হলো, বরং এ সংস্কারের ফলে উভয়েই সমভাবে উপকৃত হলো। যদি আলোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশংকা না হতো তবে এখানে আমি দেখিয়ে দিতাম দুনিয়ায় অপরাপর জাতিসমূহকে এ ধরনের সংস্কারের জন্য কত চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

আয়াত ঃ ২৮০-২৮১

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۣ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

ওপরে মহাজনদেরকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তারা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে মূল টাকা ফেরত নিতে পারবে। তার সাথে তাদেরকে এ হেদায়াতও দেয়া হলো, ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর এমতাবস্থায় যদি নিজের মূল টাকাটাও মাফ করে দাও তবে এটা খুবই উত্তম। এর পুরস্কার ও প্রতিদান অপরিমেয়।

সুদের পৃষ্ঠপোষকদের একটি দাবি ও তার জবাব

বর্তমান যুগে কিছু স্বল্প শিক্ষিত অনভিজ্ঞ লোক এ দাবি করে যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বযুগে আরব দেশে যে সুদের প্রচলন ছিলো তা ছিলো শুধু মহাজনী সুদ, গরীব ও দুঃস্থ লোকেরা তাদের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হতো। আর এ মহাজনরা সেই মযলুমদের কাছ থেকে মোটা অংকের সুদ আদায় করতো। এ সুদকেই কুরআন 'রিবা' নামে অভিহিত করেছে এবং এখানে সেটাকেই হারাম ঘোষণা করেছে। বাকী বর্তমান যুগে যে

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন রয়েছে সে যুগে না তার প্রচলন ছিলো, না তার অবৈধতা ও ঘৃণিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন কোনো কথা বলেছে।

আরব দেশে ব্যবসায়িক ঋণের ওপরও সুদ নেয়ার প্রচলন ছিলো

এসব লোকের সুস্পষ্ট জবাব স্বয়ং এ আয়াতের মধ্যেই বিদ্যমান। কুরআন যখন এ নির্দেশ দিচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত (ذُوْ عُسْرَةٍ) হয় তবে সচ্ছলতা (مَيْسَرَه) আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও, তখন এ আয়াতটি বজ্রকণ্ঠে যেনো এটাই জানিয়ে দিলো যে, সে যুগে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ধনী ও বিত্তশালী লোকেরাও ছিলো। বরং যদি এখানে বর্ণনাভঙ্গীর যথাযথ সুবিচার করা হয় তবে একথাটিই প্রকাশ পায় যে, ঋণ আদান-প্রদানের ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের মধ্যেই হতো। অবশ্য এমনও সম্ভাবনা ছিলো যে, কোনো ঋণগ্রহীতা অসচ্ছল হয়ে পড়ার কারণে মহাজনের মূল টাকাটা ফেরত দেয়াই তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং তার সম্পর্কে এ হেদায়াত দেয়া হলো, মহাজন তাকে যেনো তার আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়। আর যদি মূল টাকাটাও মাফ করে দেয় তবে এটা আরো উত্তম, আয়াতের শব্দগুলো থেকেই এ অর্থের আভাস পাওয়া যায়। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ- "যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত যেনো তাকে অবকাশ দেয়া হয়" আরবী ভাষায় اِنْ। -এর ব্যবহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক অবস্থার জন্য হয় না। বরং সাধারণত বিরল ও দুর্লভ অবস্থা বর্ণনা করার জন্য হয়ে থাকে। সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য আরবী ভাষায় اذا। ব্যবহার করা হয়। এ আলোকে চিন্তা করুন। আয়াতের শব্দাবলী থেকেই একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, সে যুগে ঋণগ্রহীতারা সাধারণত ذُوْ مَيْسَرَةٍ (সচ্ছল) হতো। কিন্তু কখনো কখনো এরূপ চিত্রও দেখা যেতো যে, ঋণগ্রহীতা গরীব কিংবা ঋণ গ্রহণের পর গরীব হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার প্রতি এ অনুগ্রহ করার (অবকাশ অথবা ক্ষমা) হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থে আমি যা লিখছি মূলত তা সবই আমার উস্তাদ ফারাহী (রহ)-এর শিক্ষা ও প্রেরণার ফল। কিন্তু বিশেষ করে এ আয়াত সম্পর্কিত তাঁর কিছু সুস্পষ্ট বক্তব্য আমার হস্তগত হয়েছে যা কমপক্ষে আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে তার লেখনী থেকে বেরিয়েছিলো, যখন সুদের ব্যাপারে সমালোচকদের এতসব খুঁটিনাটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়নি যা এখন সৃষ্টি হয়েছে। তখনকার সময় মাওলানা মরহুম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে একমাত্র কুরআনের শব্দাবলী থেকে এ বিষয়ে যে রায় পেশ করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ يلوح من هذه الكلمات انهم كانوا ياخذون الربو من ذى ميسرة والقريش كانت تجارا واصحاب الربوا فلا ادى فرقا بين حالهم وحال ابناء زماننا فى الربوا واللّٰهُ اعلم بالصوب۔

www.pathagar.com

"وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ الاي" আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আরবরা সচ্ছলদের কাছ থেকেও সুদ গ্রহণ করতো। তদুপরি কুরাইশরা ছিলো ব্যবসায়ী এবং সুদের লেনদেন তাদের মধ্যে চালু ছিলো। এ কারণে সুদের ব্যাপারে তাদের অবস্থা ও আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থার মধ্যে কোনো বিশষে পার্থক্য আমার চোখে পড়ে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ"

এটা স্পষ্ট যে, বিত্তশালীরা নিজেদের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য মহাজনদের নিকট ধর্ণা দিতো না। বরং তারা নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই ঋণ-গ্রহণ করতো। তাহলে তাদের ঋণ এবং বর্তমান যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গৃহীত ঋণের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

আয়াত ঃ ২৮২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ط وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ط وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ط وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ط وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতাদেরকে ক্ষতি ও ঝগড়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য কিছু দিকনির্দেশনা

সুদী ঋণ সম্পর্কে আলোচনা শেষে এখানে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের উভয়কে ঝগড়া-বিবাদ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

ক. যখন কোনো ঋণের আদান-প্রদান একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়, তখন তার বিবরণ সম্বলিত দলিল যেনো লিখে রাখা হয়।

খ. এ দলিল উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে একজন লেখক ইনসাফের সাথে লিখবে। তাতে কোনোরূপ হেরফের করবে না। আর যে ব্যক্তি দলিল লিখতে পারদর্শী সে যেনো এ খিদমতটি আঞ্জাম দিতে অস্বীকার না করে। লিখতে পারাটা আল্লাহর একটি নিয়ামত। আর এ নেয়ামতের শুকরিয়া হচ্ছে, মানুষ প্রয়োজনে লোকদের উপকার করবে। এ নসিহত করার প্রয়োজন এ কারণে দেখা দিয়েছিলো যে, তখনকার দিনে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য। দলিল লেখা ও রেজিষ্ট্রি করার সরকারী ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত না কার্যকর ছিলো, না তা কার্যকর করা অতটা সহজ ছিলো।

গ. দলিল লেখানোর দায়িত্ব ঋণগৃহীতার। সে দলিলে স্বীকারোক্তি করবে যে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের কাছে এত টাকা ঋণ আছি। এবং লেখকের ন্যায় তার ওপরও এ দায়িত্ব রয়েছে, স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে সে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে এবং হকদারের হকের ব্যাপারে কোনোরূপ কম করার চেষ্টা করবে না।

ঘ. যদি লোকটি অজ্ঞ অথবা দুর্বল হয় এবং দলিল লেখার যোগ্যতা না রাখে তবে যে তার অভিভাবক বা উকীল হবে সে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইনসাফ ও সততার সাথে দলীল লেখানো ব্যবস্থা করবে।

ঙ. দলিলে দু'জন পুরুষের স্বাক্ষর থাকবে। যাদের সম্পর্কে একটি নির্দেশ হচ্ছে, তারা مِنْ رِّجَالِكُمْ অর্থাৎ নিজস্ব লোকদের মধ্য থেকে হবে। এতে করে একই সাথে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এক. সাক্ষীদ্বয়কে মুসলমান হতে হবে। দুই. নিজস্ব বলয়ের পরিচিত জন হতে হবে। যাদেরকে উভয় পক্ষ চেনে ও জানে। দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে তারা مِمَّنْ تَرْضَوْنَ অর্থাৎ চরিত্র ও আমলের দিক থেকে পসন্দনীয়, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও ঈমানদার হতে হবে।

চ. যদি উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন দুজন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে এর জন্যে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক নির্বাচন করা যেতে পারে। দুজন স্ত্রীলোকের শর্ত এজন্যে যে, যদি একজনের পক্ষ থেকে কোনোরূপ স্খলন ঘটে তবে দ্বিতীয়জনের স্মরণ করানো ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে তার নিরসন করা যাবে। এ পার্থক্যটা (অর্থাৎ পুরুষ ১ জন সমান স্ত্রীলোক ২ জন) স্ত্রীলোকদের অবমূল্যায়ন করা নয়। বরং তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাদের বিভিন্ন অবস্থা ও ব্যস্ততার নিরিখে এ দায়িত্ব তাদের জন্য একটি কঠিন দায়িত্ব। তাই এ দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআত তাদের জন্য সহযোগীর ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে সূরা নিসায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ছ. যারা কোনো দলিলে সাক্ষী হয়, ডাক পড়লে সাক্ষ্য দেয়া থেকে তাদের বিরত থাকার কিংবা পালিয়ে বেড়াবার অনুমতি নেই। কারণ সত্যের সাক্ষ্য দেয়া যেমন এক বিরাট

সামাজিক সেবা তেমনি তা شُهَدَاءَ لِلَّهِ বা আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে এ উম্মাতের দায়িত্বের একটি অংশও বটে।

জ. ঋণ আদান-প্রদানের বিষয়টা ছোট হোক কিংবা বড়, যদি তা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়। নগদ লেনদেন জাতীয় না হয় তবে তা লিখিত আকারে রাখাটাকে কঠিন বা বোঝা মনে করা উচিত নয়। যারা একে কষ্টকর মনে করে উপেক্ষা করে, তারা এ অলসতার কারণে অনেক সময় এমন ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় যার পরিণাম বহুদূর পর্যন্ত গড়ায়।

ঝ. উপরোল্লিখিত হেদায়াত বা নির্দেশাবলী সত্য ও ন্যায়ের নিকটবর্তী সাক্ষকে সুসংহতকারী এবং সন্দেহে ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বাঁচার একটি উপায়। তাই সামাজিক কল্যাণের জন্য এর অনুশীলন অতীব জরুরী।

ঞ. হাত-বহাত অর্থাৎ নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে লিখে রাখার বাধ্য-বাধকতা নেই।

ট. হাঁ যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে কাউকে সাক্ষী করা উচিত। যাতে করে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসা করা যায়।

ঠ. বিবাদ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে লেখক বা সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা কোনো পক্ষের জন্যে বৈধ নয়। লেখক ও সাক্ষী একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও তামাদ্দুনিক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই অযথা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বা হয়রানীর চেষ্টা করা হলে ফল হবে এই যে, নির্ভরযোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সাক্ষদান ও লিখে দেয়া ইত্যাদির দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে এবং পেশাদার সাক্ষী ছাড়া কোনো নির্ভযোগ্য সাক্ষী পাওয়া লোকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। এ যুগে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান লোকেরা সাক্ষ্য ইত্যাদির দায়িত্ব থেকে যে পালিয়ে থাকতে চায় তার কারণ এটাই যে, কোনো ঘটনা যদি ঝগড়া-বিবাদের রূপ নেয় তখন তার সাক্ষীদের ওপর বিরাট দুর্ভোগ নেমে আসে। এ বেচারা অপমান, অপহরণ, ধন-সম্পদের ক্ষতি এমনকি অনেক সময় হত্যাকাণ্ডেরও শিকার হয়। কুরআন মজীদ এ ধরনের ঔদ্ধত্য ও অনিষ্টকর পথ বন্ধ করে দিতে চায়। তাই যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে তাদের মনে রাখা উচিত এটা কোনো ছোটখাটো নাফরমানী নয় যা সহজে মাফ হয়ে যাবে। বরং এটা এমন এক গুনাহর যা তার সাথে লেগে থাকবে এবং তার মন্দ পরিণতি থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। এটা সেই সাক্ষের ভিতকে ধ্বসিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা যা এ উম্মাত প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য।

আয়াতের শেষে বলা হলো, আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আল্লাহ তাআলা নাফরমানীর কারণে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন তার হাত থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না। অতপর বলা হলো, এটি "আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন" যার মধ্যে একমাত্র তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে। আর তিনিই তো সর্ব বিষয়ে অবগত। তাই শিক্ষা ও নির্দেশনা দানের অধিকার একমাত্র তারই রয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াত ঃ ২৮৩

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

رِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ-এর মর্মার্থ

رِهَانٌ শব্দটি رُهُنٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বস্তু যা ঋণদাতার ঋণের জামানত হিসেবে তার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। অর্থাৎ যদি লেখাপড়া বা সাক্ষী-সাবুদের ব্যবস্থা না করা যায় তবে বন্ধক হিসেবে কোনো বস্তু গচ্ছিত রেখেও ঋণের আদান-প্রদান করা যেতে পারে। সূরা ইউসুফে যেভাবে فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ বাক্যটি ব্যবহার হয়েছে এখানে فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ বাক্যটিও ঠিক তেমনি ধরনের একটি বাক্য। এটাকে 'মুবতাদা' বা শুরু ধরে নিয়ে এর 'খবর'কে উহ্য রাখা যায় এবং একে 'খবর' ধরে নিয়ে তার 'মুবতাদা'কেও উহ্য রাখা যায়।

امن فلان فلانا -এর অর্থ হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি নিজেকে অমুকের দিক থেকে আশংকামুক্ত মনে করে, তার দিক থেকে সে নিরাপদ, তার ওপর ভরসা করতে পারে।

اثم قلبه -এর তাৎপর্য

اٰثِمٌ قَلْبُهٗ। (তার হৃদয় পাপ-পঙ্কিলতায় অপবিত্র) এর তাৎপর্য এই যে, কিছু গুনাহ এমন যার প্রভাব শুধুমাত্র মানুষের বাহ্যিক দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। তার ধরন অনেকটা দেহোপরি ধূলো-বালির ন্যায়। যেমন অর্থহীন কসমসমূহ যা অহেতুক করা হয়ে থাকে। এ ধরনের গুনাহ হয়ত মানুষের প্রতিদিনকার সাধারণ নেক কাজসমূহ দ্বারা আপনা আপনিই ঝরে যায়। অথবা মামুলী চেষ্টাতেই তার সংশোধন হয়ে যায়। আরেক ধরনের গুনাহ রয়েছে যা অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত হয়। এরূপ পাপের নানামুখী প্রভাবও অন্তর পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। গুনাহের এ প্রকারটি হচ্ছে খুবই ভয়ংকর। এটি অন্তরের বিপর্যয়ের ইংগিত দেয়। এ পাপ থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা হলে কিংবা সংঘটিত হবার পর সাথে সাথে তার সংশোধনের চেষ্টা না করা হলে তার শিকড় গজাবার ভয় থাকে। এখানে বলা হয়েছে যে, সাক্ষী গোপন করা এ দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহ। তার কারণ—যেমনটা আমি ওপরে উল্লেখ করেছি—"শাহাদাত আলান্নাস" অর্থাৎ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ প্রদান এ উম্মাতের এমন একটি মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যার জন্য তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। তাই এক্ষেত্রে যে কোনো দুর্বলতা সুদূরপ্রসারী পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

www.pathagar.com

رهن বা বন্ধকের হুকুম

এ আয়াতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি সফর অবস্থায় ঋণ আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং লেখার ও সাক্ষীর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় আর ঋণদাতা জামানত ছাড়া ঋণ দিতে না চায় তবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যে, কোনো বস্তু বন্ধক হিসেবে তার দখলে দিয়ে দেবে। কিন্তু এ পদ্ধতি শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত সময়ের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণদাতার জন্য নিশ্চিন্ততার ও নির্ভরতার পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, একজন অপর জনের ওপর আস্থাশীল হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা যোগাড় হয়ে গেলো। যেমন সফর শেষ করে লোকালয়ে এসে গেলো। দলীল লেখার জন্য লেখক এবং সাক্ষীও পাওয়া গেলো। আপনজনদের মধ্যে ঋণ লেনদেন বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হলো এবং এ বিষয়টির জন্য এমন কোনো যৌক্তিক কারণ অবশিষ্ট রইলো না যে, ঋণদাতা বন্ধক ছাড়া ভরসা করতে পারছে না। এমতাবস্থায় তার উচিত বন্ধকী বস্তুটি তাকে ফেরত দিয়ে দেয়া এবং নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছা করলে সে ওপরে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। (অর্থাৎ সাক্ষীসহ লেখার ব্যবস্থা করতে পারে) এখানে বন্ধকী বস্তুটিকে আমানত বলে অভিহিত করা হয়েছে। যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঋণদাতার নিকট বন্ধকী বস্তুটি আমানত স্বরূপ, যার সংরক্ষণ অপরিহার্য এবং যা দ্বারা কোনোরূপ লাভবান হওয়া অবৈধ।

মুজাহিদ ও দাহাক সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা বন্ধকের ব্যাপারটাকে সফরের সাথে নির্দিষ্ট মনে করতেন। আমার নিকট তাঁদের এ মতামত শক্তিশালী মনে হয়। কুরআনের শব্দাবলী থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়, আস্থা রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা যখন বিদ্যমান থাকে তখন বন্ধক দখল করে রাখার কোনো কারণই আর অবশিষ্ট থাকলো না। এ আমানত আমানতকারীকে ফেরত দেয়া উচিত। বিশেষ করে লেনদেনটা যখন দুজন মুসলমানের মধ্যে হয় তখন এ জিনিসটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের শুধু পরিপন্থী নয় বরং এটি এক ধরণের নীচতা ও হীনতারও পরিচায়ক। যখন এক ব্যক্তি দলীল ও সাক্ষের নিশ্চয়তা লাভে সক্ষম তখন এটা খুবই কুৎসিত ব্যাপার যে, সে তার ঋণের জামানত স্বরূপ ঋণগ্রহীতার বাড়ীঘর অথবা ক্ষেত-খামার কিংবা তার বাগান অথবা তার ঘোড়া বা তার ছাগল কিংবা তার বিবি-বাচ্চার পরিধানের অলংকার বা পোশাক-পরিচ্ছদ নিজের হস্তগত করে রাখবে।

বন্ধক সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) কিছু যবের বিনিময়ে তার লৌহ বর্মটি এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। আমি তাকে অস্বীকার করি না কিন্তু এ থেকে বড় জোর যে কথাটি প্রকাশ পায় তা হচ্ছে, যদি কোনো মুসলমান কোনো মহাজন অথবা ইহুদীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে একান্ত বাধ্য হয় এবং সে বন্ধক ছাড়া অন্য কোনোভাবে লেনদেন করতে প্রস্তুত নয় এমতাবস্থায় তার সাথে এভাবে লেনদেন করা যেতে পারে। আর বড়জোর এ থেকে একথাটিও বের করা যেতে পারে যে, কোনো সংকীর্ণমনা মুসলমানের সাথেও বাধ্য হয়ে এভাবে লেনদেন করা যেতে পারে। কিন্তু

সাধারণ মুসলমানদের জন্য পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যখন একটি সুস্পষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের দাবি মোতাবেক একটি পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে তখন তা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়া তারা বন্ধকের ভিত্তিতে লেনদেন করবে, একে কিভাবে পসন্দনীয় বলা যেতে পারে। এটি তো কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর হাদীসটি দ্বারাও বন্ধকের সাধারণ বৈধতার দলিল পেশ করা কোনোভাবেই সঠিক নয়। প্রথমত, এ লেনদেনটি হয়েছিলো এক ইহুদীর সাথে—যেমনটা আমি ইংগিত করেছি। দ্বিতীয়ত, ঘটনার চিত্র পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নিতান্ত মজবুরী বা অনন্যোপায় অবস্থায়ই এটা হয়েছিলো।

আলোচ্য আয়াতে মুফাস্সিরগণ আমানত দ্বারা সাধারণত সেই ঋণকে বুঝিয়েছেন যা কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনোরূপ বন্ধক ছাড়াই শুধুমাত্র বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে প্রদান করে থাকে। কিন্তু ঋণের জন্য আমানত শব্দের ব্যবহার আমার দৃষ্টিতে বহু দিক থেকে ভ্রান্ত। মূলত এসব মুফাসসির যেহেতু এটা মানতে প্রস্তুত নন যে, সফর শেষ হবার পর যখন নিশ্চিত ও আস্থাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন বন্ধক ফেরত দেয়া উচিত। সে কারণেই তাদেরকে আমানতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এ কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তাতে কুরআন ও হাদীস উভয়ের অবস্থান পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং কোনোরূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়ারও প্রয়োজন নেই। এবং তা প্রত্যাখ্যানের জন্য দলিল সংগ্রহেরও আবশ্যকতা নেই।

৮৮. পরবর্তী আলোচনা ঃ ২৮৪-২৮৬ আয়াত

এ বৃহৎ সূরাটি এখন সমাপ্তির পথে। সামনের আয়াতগুলো অনেকটা সমাপ্তি ভাষণের মত। এ সমাপ্তি পর্যায়ে প্রথমে রয়েছে সতর্কবাণী যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই মালিকানাধীন এবং তারই ইখতিয়ার ভুক্ত। তিনি বান্দাহর যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তিনি প্রতিটি বস্তুর হিসেব নেবেন এবং স্বীয় একচ্ছত্র ক্ষমতাবলে যাকে ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করবেন তাকে ক্ষমা করে দেবেন আর যাকে শাস্তির যোগ্য মনে করবেন তাকে শাস্তি দেবেন। তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই।

এটাই হচ্ছে দীনের সেই মৌলিক তাৎপর্য যার সঠিক উপলব্ধি সেই আমানতের যোগ্য করে গড়ে তোলে যা এ সূরার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে সেই মূলতত্ত্ব যা ভুলে যাওয়ার কারণে ইহুদী ও খৃস্টান এ আমানতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ গুরুত্বের কারণে যেমনিভাবে এ সূরার স্থানে স্থানে এ বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে সমাপ্তি লগ্নেও তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো।

তারপর বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার বান্দাগণ তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে কবুল করেছেন। তারাই এর প্রতি ঈমান আনার যোগ্য ছিলেন। এরা ইহুদী ও খৃস্টানের ন্যায় আল্লাহর নবী-রাসূলদের ব্যাপারে কাউকে মানবে

www.pathagar.com

আর কাউকে মানবে না, এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামীতে লিপ্ত ছিলো না। তাই আল্লাহ তাআলা এদের জন্য হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তারা সফল হলো। আর ঐ সমস্ত লোক যারা গোঁড়ামী বা পক্ষ পাতিত্বের ফাঁদে আটকে পড়ে আছে আল্লাহ তাদেরকে কোনো পরোয়াই করেন না। যে ময়দানে ইচ্ছা তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াক। নিজেদের পরিণতি নিজেরাই স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

অতপর সেই শ্রেষ্ঠ দোয়াটি উপস্থাপিত হয়েছে যা এ উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থার প্রতিফলক। এর প্রতিটি শব্দ থেকে উপচে পড়ছে সেই কঠিন দায়িত্বানুভূতিও, যা এ উম্মাতের কাঁধে তুলে দেয়া হয়েছে, প্রকাশ পাচ্ছে সেই স্বীকৃতিও যা ঈমানের রূপ বা প্রাণশক্তি। সেসব বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার আকুতিও ফুটে উঠেছে যা অতীত উম্মাতদের জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়েছে। এবং কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে তার জন্য সাহায্য কামনা আর যেসব ভুল-ত্রুটির আশংকা রয়েছে তা থেকে ক্ষমার আবেদনও রয়েছে। এবার এ আলোকে পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

www.pathagar.com

২৮৪. যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহরই। যা কিছু তোমার মনের মধ্যে আছে তাকে প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসেব নেবেন। অতপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

২৮৫. রাসূল ঈমান এনেছেন সে জিনিসটির প্রতি যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এবং মু'মিনরাও ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তাদের স্বীকৃতি হচ্ছে, আমরা রাসূলদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে পরওয়ারদিগার! আমরা তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬. আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেকে তাই পাবে যা উপার্জন করবে এবং প্রতিফল তাই পাবে যা সে করবে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা অন্যায় করে বসি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা তুলে দিও না যা বহন করতে আমরা অক্ষম। আমাদেরকে মাফ করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের মনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

৮৯. বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ঃ ২৮৪

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

"যাকিছু আকাশসমূহে এবং যমীনে আছে সব আল্লাহরই" এ বাক্যটি একাধারে তিনটি অর্থ বহন করে। এক, প্রতিটি বস্তু আল্লাহরই মালিকানাধীন। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বস্তু তাঁরই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারাধীন। তৃতীয়ত, অবশেষে প্রতিটি বস্তুর ঠিকানা হচ্ছে আল্লাহই।

অন্তরের গোপন বিষয়ের হিসেব নেয়ার মর্মার্থ

অন্তরের গোপন বিষয়ের হিসেব নেয়ার অর্থ এ নয় যে, মনের মধ্যে যেসব ধারণা বা খটকার সৃষ্টি হয় তারও হিসেব নেয়া হবে। বরং এর দ্বারা কেবলমাত্র মনের সেসব দৃঢ় সিদ্ধান্তকে বুঝানো হয়েছে যা কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকাশ হতে পারেনি কিংবা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। যেমন এক ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করার মনে মনে পাকা ইরাদা রাখে। এমতাবস্থায় কোনো ভয় কিংবা বাধার কারণে যদিও তার ইচ্ছা বাস্তবে প্রতিফলিত হতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহর নিকট এ ইচ্ছা পোষণ করার কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে।

আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর হেকমতের সাথে সংযুক্ত

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ الاية ঃ এ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতসমূহে যেমন আমি বার বার আমার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি—প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়ে থাকে তা হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছায় বাধা প্রদান করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরককে প্রত্যাখ্যান করা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছার জন্য আদতেই কোনো নিয়ম-নীতির বালাই নেই। আল্লাহর প্রতিটি ইচ্ছার পেছনে হেকমত বা যৌক্তিকতা রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষমা ও শাস্তির বিষয়টাও সেই হেকমত বা যৌক্তিকতার নীতির অধীনেই কার্যকর হবে যা তার জন্য তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, অন্য কারো পক্ষে এতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই।

২৮৪ আয়াতে দু ধরনের যোগসূত্র রয়েছে

পুরো আয়াতটির অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করুন। তাহলে বুঝা যাবে যে, একদিক থেকে এ আয়াত তার পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিক থেকে এটি হচ্ছে সূরার সমাপ্তির অত্যন্ত ব্যাপক ও মনোজ্ঞ ভূমিকা, ওপরে বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছিল, "সাক্ষ গোপন করো না, যে সাক্ষ গোপন করে তার অন্তর পাপ-মলিন হয়ে যায়। আর তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।" এবার এর সাথে যদি এ বাক্যগুলো জুড়ে দেন। "যা কিছু আকাশসমূহ ও যমীনে আছে সব আল্লাহরই। আল্লাহ তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ের হিসেব নেবেন। অতপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।" তাহলে বিষয়টি পুরোপুরি প্রমাণ ভিত্তিক ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলো।

পূর্বের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, এটি তাওহীদের আয়াত। বিভিন্ন হুকুম ও বিধানের ক্ষেত্রে যেমন নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক তেমনিভাবে আকায়েদের ক্ষেত্রে তাওহীদ দীনের মূলভিত্তির মর্যাদা রাখে। সুতরাং স্মরণ থাকার কথা যে, এ সূরার যেখান থেকে উম্মাতের জন্য শরীআত শিক্ষার অধ্যায় শুরু হয়েছে সেখানে সর্বাগ্রে তাওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর নামায। এখন সমাপ্তি পর্বে এসে উম্মাতকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়ার জন্য পুনরায় তাওহীদ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। আর স্মরণ

www.pathagar.com

করাতে গিয়ে শিক্ষার চেয়ে সতর্কীকরণের দিকটাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, উম্মাত এ আমানতের কঠিন বোঝাকে উপলব্ধি করবে এবং ভুল আশ্রয়ের ওপর ভরসা করার পরিবর্তে একমাত্র এক ও লা-শারীক আল্লাহর নিকট জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আয়াত ঃ ২৮৫

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

বেঈমানদের প্রতি বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন

এখানে রাসূল ও মুসলমানরা ঈমান এনেছে—এ খবর দেয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটি ঘটনার সংবাদ দেয়া নয়। বরং কুরআন বিরোধীদের বিশেষ করে ইহুদীদের বিরোধিতায় ওপরে বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ করাও এর লক্ষ। এটা স্মরণ থাকার কথা, সূরার সূচনা একথা দিয়েই হয়েছিলো যে, কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে তো কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এর প্রতি তারাই বিশ্বাসস্থাপন করবে যাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহভীতি। যারা হবে সত্য সন্ধানী ও তত্ত্ব জ্ঞানী। যারা গোত্র পূজা, গোঁড়ামী ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় নিমজ্জিত তারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এখন সমাপ্তি লগ্নে এ ঘোষণা দেয়া হলো যে, রাসূল (স) এবং তাঁর সাথের ঈমানদার ব্যক্তিগণ এটা স্পষ্ট করে দিলো যে, কারা ছিলো ঈমানের সৌভাগ্যের অংশীদার। যেনো দুধের ভেতরে যতটুকু মাখন ছিলো তা বের করে সামনে রেখে দেয়া হলো এবং তার দিকে আংগুল উচিয়ে ইংগিত করা হলো, এই দুধের মধ্যে এটি ছিলো মাখন যা বেরিয়ে এসেছে। এখন যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হচ্ছে ঘোল। এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

আইন পালনের ক্ষেত্রে নবী ও তাঁর উম্মাত সমান

এখানে এ সূক্ষ্ম দিকটিও লক্ষণীয় যে, আল্লাহর কিতাবের ওপর ঈমান আনয়ন-কারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার উল্লেখ রয়েছে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রাসূল (স)-এর সত্তা। এতে বুঝা গেলো ইসলামে আইনের আনুগত্য ও অনুসরণের ব্যাপারে একজন নবীও সাধারণ ঈমানদারদের সমপর্যায়ে অবস্থান করে থাকেন। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ প্রজাদের জন্য যে আইন রচনা করেন তিনি নিজে সে আইনের উর্ধে অবস্থান করেন। কিন্তু আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে খোদ সেই বিধান তিনি নিয়ে আসেন যিনি শুধু তার অধীন হন না বরং সবার আগে তাকে اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বলে সে আইনের রশিতে নিজেকে আবদ্ধ করেন। এটি এ নবীদের সত্যবাদিতার এমন এক জ্বলন্ত সাক্ষ যাকে একমাত্র কোনো হঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতে পারে।

www.pathagar.com

সকল নবী ও সব কিতাবের প্রতি সমভাবে ঈমান পোষণ করতে হবে

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ الاية ঃ আয়াতে ঈমানের যেসব অংশের উল্লেখ করা হয়েছে তা আমি এ সূরারই ১৭৭ আয়াতের অধীনে আলোচনা করেছি। সেখানে আল্লাহ, ফেরেশতাকূল, কিতাবসমূহ ও নবীদের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সেখানে আমি বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। অবশ্য একটি দিকের প্রতি এখানেও ইংগিত দেয়া জরুরী। আর তা হলো, সেখানে 'কিতাব' শব্দ রয়েছে। আর এখানে 'কিতাব' শব্দের পরিবর্তে 'কুতুব' শব্দ বলা হয়েছে—যা কিতাব শব্দের বহুবচন। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সকল রাসূলের প্রতি যেমন আমাদের ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন জরুরী তেমনি সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অপরিহার্য। আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃস্টান) শুধু নিজেদের কিতাব এবং শুধু সে নবী অথবা সেসব নবীর প্রতি ঈমান প্রকাশ করে—যাদেরকে তারা নিজের কিংবা নিজেদের নবী বলে মনে করে। পক্ষান্তরে এ উম্মাত আল্লাহর সকল নবী এবং সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণ করে। মৌলিকভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনার অর্থে আমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও অন্যান্য নবী, কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করি না। অবশ্য অন্যান্য নবী ও তাদের সহীফাসমূহের শিক্ষা যেহেতু সংরক্ষিত নেই, তদুপরী সেসব সহীফা এবং সে সকল নবী স্বয়ং বলেছিলেন যে, তাদের শরীআত পূর্ণাংগ নয়। পূর্ণাঙ্গ শরীআত কুরআন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী লাভ করবে। এ কারণে আমরা কুরআন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি শুধু সংক্ষিপ্তাকারে নয় বরং ব্যাপক ও পুংখানুপুংখরূপে ঈমান পোষণ করি এবং সাথে সাথে এ ব্যাপক ঈমানের দাওয়াত দুনিয়াবাসীকেও দিয়ে থাকি।

বর্ণনাভঙ্গির পরিবর্তনে বালাগাত বা বাগ্মীতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ঃ এ অংশটির ব্যাখ্যা আমি এ সূরারই ১৩৫ আয়াতের অধীনে "উম্মাতে ওয়াসাত" বাক্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছি। অবশ্য এখানে হঠাৎ বর্ণনাভঙ্গি যে পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ শব্দরূপ তৃতীয় পুরুষ (غائب) থেকে যে প্রথম পুরুষে (متكلم) পরিবর্তিত হয়েছে তা চিন্তায় রাখা দরকার। ওপরের অংশের কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু এ বাক্যটি সরাসরি উম্মাতের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি ও সাক্ষ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এতে বাগ্মীতা বা অলঙ্কার শাস্ত্রের (بلاغت) এ সূক্ষ্ম দিকটি নিহিত রয়েছে যে, ওপরের অংশে মুসলমানদের যে ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, গোটা উম্মাত এই বলে তার স্বীকৃতি ও সাক্ষ দিচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর রাসূলদের ব্যাপারে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামীতে বন্দী নই। সকল নবী একই সোনার শিকলের বিভিন্ন আংটা বিশেষ। কাজেই ইহুদী ও খৃস্টানদের ন্যায় কাউকে মানবো আর কউকে প্রত্যাখ্যান করবো—এটা আমরা করি না।

www.pathagar.com

سمع وطاعت -এর মর্মার্থ

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ঃ এখানে سمع শব্দটি শুধু শোনার অর্থে নয় বরং মানা ও কবুল করার অর্থে। এ অর্থে এ শব্দটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। উর্দু ভাষায়ও سننے 'শোনা' শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে سَمِعْنَا শব্দটি আন্তরিক কবুল করার এবং اَطَعْنَا শব্দটি বাস্তব অনুগত্যের অর্থ প্রকাশ করে। আর ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে এটাই। এতে ইহুদীদের سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا উক্তিটির প্রতি একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষও নিহিত রয়েছে।

ক্রিয়া বিলোপ করার উপকারিতা

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ঃ এখানে 'غُفْرَانَكَ' শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বিলোপ প্রার্থনাকারীর পেরেশানী বা অস্থিরতাকে প্রকাশ করে, যা দোয়া কবুলের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর সুপারিশ।

শোনা ও মানার স্বীকৃতির সাথে দোয়ার সম্পর্ক

শোনা ও মানার স্বীকৃতির পর সাথে সাথে মুখ থেকে দোয়া নিঃসৃত হওয়া একথাটি প্রকাশ করছে যে, এ স্বীকৃতি হচ্ছে এক বিরাট দায়িত্বের স্বীকৃতি। এ হচ্ছে প্রেমের শাহাদাতগাহে কদম রাখা। এ পথে বিরাট বিরাট পরীক্ষা সামনে আসবে। প্রতি পদে পদে সম্ভাবনা রয়েছে ত্রুটি-বিচ্যুতির। দুর্বলতা ও হোচট খাওয়ার। এ মূলতত্ত্বের উপলব্ধিই سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ শোনা ও মানার স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথেই ক্ষমা প্রার্থনার দিকে নিবিষ্ট করে দিলো। কেননা, রাস্তাও যখন কঠিন এবং জিজ্ঞেসও করা হবে প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে যেমনটা ওপরে বলা হয়েছে। আর আযাব ও রহমত যখন আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ তখন তার ক্ষমার আশা ছাড়া সব আশাই অসার ও তাৎপর্যহীন। وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ বাক্যটিতে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণের ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যে কোনো দিক থেকে ঠিকানা বা আশ্রয়স্থল হতে পারে। এতে ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতিও একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষ রয়েছে। কেননা তারা নিজেদের বাপ-দাদা এবং শরীক ও সুপারিশকারীদের ওপর ভরসা করে শোনা ও মানার সবরকমের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে। কিন্তু এ উম্মাতের নিকট এ মৌলিক সত্যটি সুস্পষ্ট যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাঁর সামনে দাঁড়াতে এবং তারই নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াত ঃ ২৮৬

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ

www.pathagar.com

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَابِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفه

وَاغْفِرْلَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

দোয়ার মাঝখানে পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাক্য

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ঃ "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের অধিক কোনো কাজের ভার দেন না।"দোয়ার মাঝখানে এটি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বাক্য (জুমলাহ মু'তারাজাহ)। আর এ বাক্যটিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ শোনা ও মানার এ দায়িত্ব যা এ উম্মাতের ওপর অর্পিত হয়েছে তা অবশ্য একটি কঠিন দায়িত্ব। কিন্তু এর কাঠিন্যের উপলব্ধির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার করুণা ও অনুগ্রহের এ দিকটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, তিনি বান্দাহদের ওপর তাদের সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু ততটুকু করতে বাধ্য যতটুকু করার সামর্থ তাকে দান করা হয়েছে। যা কিছু তার শক্তি ও সামর্থের বাইরে তার জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। খোদ শরীআত তার বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেছে এবং অপারগতার ক্ষেত্রে তা থেকে বান্দাহদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে। এ কারণে বান্দাহ স্বয়ং নিজেকে কোনো সাধ্যাতীত কাজে জড়িয়ে ফেলুক এটা যেমন আল্লাহর নিকট পসন্দ নয় তেমনি অন্য কারো জন্যেও এটা বৈধ নয় যে, সে তার ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিক যা সে বহন করতে অক্ষম।

এখানে একথাটিও স্মরণ রাখা দরকার। হাদীসে এসেছে, নবী করীম (স) যখন লোকদের কাছ থেকে 'শোনা ও মানার' অঙ্গীকার নিতেন তখন নিজ থেকেই তাদের প্রতি 'যথাসাধ্য' শর্তটি যোগ করে দিতেন। এটা তার পক্ষ থেকে এ আয়াতেরই বাস্তব প্রতিফলন ছিলো। এতে যে ঈমানদারদের জন্য সহজসাধ্য করণ ও সুসংবাদ রয়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিশেষ করে যখন তাদের ওপর এক বিরাট শরীআতের দায়িত্বভার তুলে দেয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটি একটি সুসংবাদ।

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ঃ "যা সে উপার্জন করেছে তা পাবে এবং যে কর্ম করেছে তার ফল ভোগ করবে।" একথাটি যেহেতু ওপরে বর্ণিত কথাটিরই অংশবিশেষ। এ কারণে তার থেকে পৃথক না করে তার সাথেই একে জুড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ লাভ কিংবা ক্ষতি যা কিছুই হোক তা তার নিজস্ব আমলের কারণেই হবে। অন্য কোনো কারণে নয়। যে বীজ সে বপন করবে, তারই ফসল সে ঘরে তুলবে। যেমন কর্ম করবে তেমনি ফল পাবে। অন্যদের নেক আমলের কৃতিত্ব যেমন তার ভাগে পড়বে না। অন্যদের বদ আমলও তার খাতে জমা হবে না। তার বোঝাও অন্য কেউ মাথায় তুলে নেবে না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তার শক্তি ও ক্ষমতার পাল্লায় পরিমাপ করে রেখেছেন। তাই প্রতিটি ব্যক্তির সফলতা ও ব্যর্থতা তার দায়িত্বের সাথে বাঁধা রয়েছে। كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

نَسِيْنَا ও خَطَا -এর মধ্যে পার্থক্য এবং এ দোয়ার যৌক্তিকতা

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ঃ ওপরের পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাক্যটি ছিলো ঈমানদারদের সান্ত্বনা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলতত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। এবার পুনরায় মূল দোয়ার সুর বেজে উঠেছে। দোয়ার এ অংশে ভুল-ত্রুটির জন্য পাকড়াও না করার আকুতি জানানো হয়েছে। نِسْيَان হচ্ছে মানুষ শোনা ও মানার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো বিষয় ভুলে যাওয়া। আর خَطَأٌ হচ্ছে নিজের না বুঝার কারণে কোনো কাজে ভুল করে বসা। যদিও এ বিষয়গুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আগে থেকেই ক্ষমাকৃত। কিন্তু ক্ষমাকৃত বিষয়গুলোর জন্য ক্ষমার আবেদন হচ্ছে বান্দার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মানের ভীতির বহিঃপ্রকাশ যার ফলে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের অনেকগুলো দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। নবী করীম (স)-এর পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ ছিলো। তবুও তিনি ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর কষ্ট স্বীকার করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন। আমি কি আমার রবের কৃতজ্ঞ বান্দাহ হতে চাইবো না !

اصر শব্দের মর্মার্থ এবং এ দোয়ার রহস্য

اصْرٌ ঃ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব। যেমন ঃ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ - ال عمران : ٨١ –"তোমরা কি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ এবং এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮১। এখান থেকেই বহন করা কষ্টকর এমন ভারী বোঝা ও কঠিন দায়িত্বের অর্থে শব্দটি ব্যবহার হতে থাকে। এ অর্থেই এ শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ইহুদীদের শরীআতে এ ধরনের কাঠিন্য বর্তমান ছিলো। সূরা আল আরাফের তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য এও ছিলো যে, তিনি আল্লাহর শরীআতকে এ কঠিন জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে সহজাত প্রকৃতির ভিত্তির ওপর কায়েম করবেন। যেমন ঃ আল্লাহ বলেন ঃ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ - الاعراف : ١٥٧ -"এবং তিনি তাদের ওপর থেকে সেই বোঝা ও জিঞ্জির অপসারণ করবেন যা আগে থেকেই তাদের ওপর চাপানো ছিলো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭। এখানে দোয়ার এ শব্দগুলোতে এ দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে, আমাদের ওপর এমন বোঝা যেনো চাপিয়ে দেয়া না হয় যেমন বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো ইহুদীদের ওপর তাদের বিদ্রোহের কারণে। যা শেষ পর্যন্ত তারা বহন করতে সক্ষম হয়নি। দোয়ার এ শব্দগুলো বলে দিচ্ছে যে, এ উম্মাতের স্বভাব-প্রকৃতি ও তাদের প্রাপ্ত শরীআতের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে।

সাধ্যাতীত পরীক্ষাসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দোয়া

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ঃ শব্দের অর্থ কারো ওপর কোনো ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া। অর্থাৎ এই শোনা ও মানার পথে ভবিষ্যতে যেসব পরীক্ষা আসবে তাতে

এরূপ কোনো পরীক্ষা যেনো না হয় যা আমাদের ধৈর্য শক্তির বাইরে এবং যা আমাদেরকে তোমার আনুগত্যের পরীক্ষায় অকৃতকার্য করে দেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটা মূলত ঈমান ও ইসলামের বরং জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যা থেকে এ দুনিয়ায় পালাবার কোনো জায়গা নেই, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ এবং বান্দাহর যোগ্যতার বিকাশের জন্য এ পথ অতিক্রম করা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বান্দাহদেরকে এ দোয়া করতে থাকা উচিত যে, কোনো পরীক্ষা যেন তার সাধ্যাতীত না হয় আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার ব্যাপারে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্বীকৃতিই হলো সঠিক পদ্ধতি। যেসব লোক নিজেদের ওপর অধিক আস্থাশীল হয়ে পড়ে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। বিভিন্ন হাদীসে নানাভাবে এটা নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে দোয়ার ওপরের অংশ ও এ অংশের মধ্যকার পার্থক্যও লক্ষ রাখা উচিত। ওপরের অংশে তো এ আকুতি জানানো হয়েছে যে, আমাদের শরীআত যেনো এ ধরনের কাঠিণ্য ও গুরুভার থেকে মুক্ত থাকে যা অতীতের শরীআতসমূহে বর্তমান রয়েছে। আর এ দ্বিতীয় অংশে সেসব সাধ্যাতীত পরীক্ষাসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন করা হয়েছে, এ শরীআতের হক আদায় করতে গিয়ে যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْلَنَا ، وَارْحَمْنَا : এখানে একসাথে তিনটি বিষয়ের আবেদন রয়েছে। গুনাহ মোচন, ক্ষমা ও দয়া, عَفْوٌ শব্দের অর্থ চোখ বুঁজে থাকাও হয়। দেখেও না দেখার ভান (OVER LOOK) করা এবং ক্ষমা করে দেয়ার অর্থও হয়। এখানে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থ বহন করে। غَفْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢেকে দেয়া। رحم শব্দের অর্থ তো সবারই জানা। বান্দাহর পূর্ণ ভরসা কেবলমাত্র এ তিনটি জিনিসের ওপরই হওয়া উচিত। পরম দয়ালু প্রভু ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন, পাপসমূহকে ঢেকে দিন এবং স্বীয় রহমত দ্বারা আপ্লুত করুন, শুধুমাত্র এ তিনটি জিনিসই আখেরাতের আশা-ভরসা।

اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ : مَوْلٰى শব্দের অর্থ আশ্রয়স্থল বা ঠিকানা। সমস্যা সংকুল অবস্থায় যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। সবশেষে এটি হচ্ছে ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন। এটা এজন্যে যে, শোনা ও মানার এ ভারী বোঝা উম্মত এমতাবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়েছে যখন অন্যান্যরা —যেমনটা বিগত আলোচনা থেকে বিস্তারিত জানা গেছে—এ বোঝাকে নিজেদের কাঁধ থেকে শুধু ছুঁড়ে ফেলেছিলো তা নয় বরং তাদের ছুঁড়ে ফেলা এ বোঝা মুসলমানরা কেন কাঁধে তুলে নিলো এ কারণে তারা মুসলমানদের প্রাণঘাতী শত্রুতে পরিণত হয়েছিলো।

এটাই হচ্ছে শেষ কয়টি লাইন যা এ সূরার তাফসীর প্রসংগে এ গুনাহগার লিখতে সক্ষম হয়েছে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

www.pathagar.com